বিদেশের

নিষিদ্ধ উপন্যাস

বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস

তৃতীয় খণ্ড

তুলি-কলম
১, কলেজ রো কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : প্রভাস অধিকারী, স্বপ্না প্রেস, ৩৫।২।১এ, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

ডি. এইচ. লরেন্স	**অনুবাদ**	
লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	১
Lady Chatterly's Lover		
লিও টলস্টয়		
ক্রয়ৎ্জার সোনাতা	মণীন্দ্র দত্ত	৩২১
Kreutzer Sonata		
স্তাঁদাল		
লাল ও কালো	ভৈরবপ্রসাদ হালদার	১
Scarlet and Black		

Bidesher Nisiddha Uppanyas

VOL. III

Translated by

Sudhansu Ranjan Ghose

Manindra Dutta

&

Bhairab Prasad Halder

প্রকাশকের নিবেদন

"বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস" সিরিজের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ডি. এইচ. লরেন্স-এর আলোড়নসৃষ্টিকারী দুঃসাহসিক উপন্যাস Lady Chatterly's Lover, স্তাঁদাল-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Scarlet and Black এবং লিও তলস্তয়-এর Kreutzer Sonata—বিশ্ব-সাহিত্যের এই তিনটি দুর্ধর্ষ রচনা এই খণ্ডে সংযোজিত হল। প্রথম দুটি খণ্ডের মতই তৃতীয় খণ্ডটিও যদি রসিক পাঠকসমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় তবেই আমাদের সব শ্রম ও উদ্যোগ সার্থক হবে।

লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক

বিশ্বসাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারে'র মত আর কোন উপন্যাস অশ্লীলতার পঙ্কতিলকে এমনভাবে ভূষিত হয়নি। এক অন্তহীন বিতর্কের প্রবলতম ঝড়ের প্রহারে এমনকরে জর্জরিত হয়নি আর কোন উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের মূল কথা হলো এই যে এখানে নরনারীর যৌনক্রিয়া ও কামকলা নৈপুণ্যের যে নিখুঁত চিত্র এঁকে এসেছেন, উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার ও চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে তার কোন প্রকরণগত সম্পর্ক নেই। যে যৌনসম্পর্ক কামনায় অত্যুগ্র, নিবিড়তায় সতত উত্তপ্ত, এক অন্তহীন তৃপ্তিলাভের চিরচঞ্চল লালসায় পঙ্কিল সে সম্পর্কের এমন বিচিত্র প্রকাশকলায় চিত্রিত করার কি প্রয়োজন ছিল এখানে?

লরেন্স এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে বলেন, Inspite of all antagonism I put forth this novel a healthy book necessary for us today. The words that shock so much at first do not shock at all after a while. Is this because the mind is depraved by habit? Not a bit. It is that the words merely shocked the eye, they never shocked the mind at all···People with minds realize that they are'nt shocked and never really were and they experience a sense of relief.

লরেন্স বলেছেন, যে যাই বলুক, যে যতই বিরোধিতা করুক এটিকে এমন এক সৎ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন বই হিসাবে রচনা করেছি যা আমাদের সকলের

পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান যুক্তি হলো এই যে এ বই পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে যে আপাত-আঘাতের এক বিচলন অনুভব করি আমরা সে আঘাত আসলে যৌনজীবন সম্পর্কিত কতকগুলি অনভ্যস্ত শব্দের আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়, সে আঘাতের বিচলন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে পীড়িত করে শুধু, মনের মর্মমূলে তা প্রবেশ করতে পারে না। আসলে যাদের মন আছে তারা অবশ্যই এ বই পাঠ করে যত সব অবরুদ্ধ আবেগের নিষ্ক্রমণজনিত এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তারা।

উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের আধুনিক প্রতিভূ ও অভিনব সংস্করণ স্যার ক্লিফোর্ডের স্ত্রী তার অক্ষম পঙ্গু স্বামীর কাছ থেকে কোন যৌনসুখ না পেয়ে একের পর এক করে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার পর অবশেষে স্থায়ীভাবে মিলিত হলো তাদেরই শিকার রক্ষক অলিভার মেলর্সের সঙ্গে। কিন্তু যদি সাধারণ এক নারীর যৌন সমস্যার কদর্য সমাধানই এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হত, কামকেলিপটীয়সী রতিবিলাসিনী এক নারীর যথেচ্ছ যৌনাচার ও ব্যভিচারই যদি এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হত তাহলে এ উপন্যাসকে অশ্লীলতার পঙ্কতিলকে পরিচিহ্নিত করা চলত স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু আসলে এ উপন্যাসে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন লরেন্স। তিনি আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত নরনারীর ক্রমজটিল যৌন সমস্যার স্বরূপটিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে এক অসাধারণ শিল্প-রূপ দান করেছেন।

লরেন্সের মতে শিল্পনির্ভর যন্ত্রসভ্যতা এ কালের মানুষের মধ্যে এমন এক আত্মিক সংকটকে ঘণীভূত করে তুলেছে যার ফলে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সব অখণ্ডতাকে হারিয়ে ফেলেছে। আজকের মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে যেমন তার দেহমনের দ্বৈত চেতনার সুষম সমন্বয়ে এক অখণ্ড ও সুসংবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে পারছে না, তেমনি দ্বিধাহীন স্বার্থহীন মমতা আর ভালবাসা আর অবাধ অকুণ্ঠ মেলামেশার দ্বারা এক অখণ্ড ও সুসংবদ্ধ সমাজজীবন যাপন করতে পারছে না। লরেন্স মনে করেন এক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনে অক্ষমতা আর সাধারণভাবে যৌনজীবন সম্বন্ধে এক অহেতুক লজ্জা আর ঔদাসীন্যই মানুষের খণ্ড জীবনচেতনার জন্য দায়ী।

তিনি বলেন, Life is only bearable when the mind and the body are in harmony · and each has a natural respect for the other. Obscenity only comes in when mind despises and fears the body. অর্থাৎ খণ্ড জীবনের সব অপূর্ণ স্তরগুলিকে পার হয়ে মানুষ এক অখণ্ড জীবনচেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তখনি যখন এক সহজ সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে তার দেহমন। যখন দেহের সমস্ত জৈবিকতা আর মনের সমস্ত সূক্ষ্ম চেতনা অভিন্নতায় লীন হয়ে যায়। অশ্লীলতার উদ্ভব হয় তখনি যখন মন

তার উদ্ধত অহমিকা দিয়ে দেহকে ঘৃণার চোখে দেখে।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় লালিত ও পুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা যে দেহ ও যৌন-জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শুধু মনের জীবন ও মনের স্বাস্থ্যকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় লরেন্স তা স্যার ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধুদের মাধ্যমে ভালভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন দেহ ও মনের মিলিত মূল্যবোধের উপর শুধু মানুষের প্রেমসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মূল ধাতুটি এই মূল্যবোধকে ভিত্তি করেই বলিষ্ঠ-ভাবে গড়ে উঠতে পারে। যৌনক্রিয়ার আতিশয্য যেমন মানুষের জৈব প্রাণ-শক্তির অনেকখানি হরণ করে তাকে মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তিভূমি থেকে কেন্দ্রচ্যুত করে তেমনি প্রয়োজনীয় ও নিয়মিত যৌনতৃপ্তির অভাব মানুষের মনের ভারসাম্যকে যে নষ্ট করে তাতে কোন সন্দেহই নেই। মনে রাখতে হবে আমরা যাকে মন ও আত্মা বলি তার সব কিছু লীলাবৈচিত্র্য দেহের আধারেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি লাভ এই দেহের অন্যতম প্রধান দাবি এবং এ দাবি দাবিয়ে রেখে আমরা যদি শুধু মনের স্বাস্থ্যকে সম্বল করে আত্মিক কৃতিত্বের ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াই তাহলে আমরা অবশ্যই জীবনধর্ম হতে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্যুত হব এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও অখণ্ড ব্যক্তিত্ব কখনই লাভ করতে পারব না।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সমাজের প্রতিভূ স্যার ম্যালকমের যে দেহগত মূল্যবোধ আছে আধুনিক পুঁজিবাদী অভিজাত সমাজের প্রতিভূ ক্লিফোর্ডের তা নেই। শুধু ক্লিফোর্ডের নেই তা নয়, তার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বন্ধু, মাইকেলিস বা অন্যান্য বন্ধুদের কারোরই নেই।

আসলে বইখানি পড়তে পড়তে মনে হয় ক্লিফোর্ডের দেহগত পঙ্গুত্ব যেন বিকৃতপথগামী আধুনিক সমাজজীবনেরই প্রতীক। কৃত্রিম কথাসাহিত্যের সৌখীন সাধক আত্মাভিমানী স্যার ক্লিফোর্ড ঘটনাক্রমে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত না হলেও যৌবনবতী কনির অপূর্ব গঠনসৌকর্যসম্পন্ন দেহের উপযুক্ত মূল্য কোনদিনই দিতে পারত না। আসলে তার কোলিয়ারির শ্রমিকদের মত তার মনটাও কয়লার মত কালো আর লোহা ও ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে গেছে। তাই কনির দুরন্ত দুর্বার যৌবনকে সে ভয় পায়, যে অরণ্যপ্রীতি কনির সবুজ সজীব প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক সে অরণ্যপ্রীতিকে ভয়ের চোখে দেখে, তারই শিকার রক্ষক যে মেলর্স আরণ্যক প্রাণপ্রাচুর্যের মূর্ত প্রতীক সে মেলর্সকে সে তুচ্ছ ভেবে এড়িয়ে চলে। অন্যদিকে যে জীবনের শাশ্বত রূপ ও রংকে কোলিয়ারির কয়লার ধোঁয়া ম্লান করে দিচ্ছে, লোহা ও ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান তাণ্ডব যে জীবনের সব মমতাটুকুকে নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে প্রস্তরকঠিন করে তুলছে তাকে। নাগরিক সভ্যতার করাল পদক্ষেপ যে জীবনের সমস্ত সবুজ প্রাণচঞ্চলতাকে নিষ্পেষিত করে ফেলছে সেই জীবনই বিচিত্র রঙ্গভঙ্গের এক তরঙ্গ দোলায় লীলায়িত হয়েছে কনি আর মেলর্সের মধ্যে। র‍্যাগবির গভীর

বনান্তরালে কনি ও মেলর্সের যৌনমিলনের মধ্যে এই জীবনের জয়ই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে এক অভিনব ও বিরল গৌরবে। যে জীবনের আস্বাদ দুজনেই খুঁজে চলেছিল অকস্মাৎ তা পেয়ে গেল দুজনে দুজনের মধ্যে। যে জীবন বনস্পতির পত্রশ্যাম বৃক্ষশাখায় ছন্দায়িত, যে জীবন পাখির কলকণ্ঠে ও বাতাসের শ্বাসে নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, ফুল্লকুসুমের বর্ণগন্ধের বিচিত্র সুষমায় যে জীবন প্রস্ফুটিত ও সুরভিত, ওরা যেন সেই জীবনেরই সাধনা করে এসেছে ওদের দেহ-সঙ্গমের মাধ্যমে। সেই জীবনই যেন ভিন্ন এক রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে ওদের শৃঙ্গার ও রতিক্রিয়ার বিচিত্র ছন্দে।

এখানে মনে রাখা উচিত কনি বা মেলর্স কেউই দেহবাদী বা উগ্রকাম নয়। যে সংযত ও নিয়মিত যৌনমিলন সমগ্রভাবে জীবনের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে একান্তভাবে সহায়ক ওরা শুধু সেই মিলনেরই পক্ষপাতী। এ মিলনের অহেতুক আতিশয্যকে প্রশ্রয় দিয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি ওরা কেউ। কর্তব্যের খাতিরে কনি ভেনিসে গেছে। মেলর্সও পরে ছমাস পৃথক থাকতে রাজী হয়েছে প্রয়োজনের খাতিরে। একটি চিঠিতে সে জানিয়ে দিয়েছে কনির কাছ থেকে একদিন যে অগাধ রতিতৃপ্তি লাভ করে সেই তৃপ্তিই তার চিত্তে এনে দিয়েছে এক আত্মিক প্রশান্তির স্তব্ধতা, সহজ করে তুলেছে তার সংযমসাধনা। এই তৃপ্তি সারা জীবনে কখনও যারা পায়নি তারা কখনই সংযমে শাসিত করতে পারবে না নিজেদের, তারা কখনই বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না পরস্পরের প্রতি। দাম্পত্য সম্পর্কের সকল শুচিতা ও বিশ্বস্ততা এই যৌনতৃপ্তির নিবিড়তার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল। লরেন্স তাই বলেছেন, The instinct of fidelity is perhaps the deepest instinct in the great complex we call sex. Where there is real sex, there is the underlying passion for fidelity. এক নিবিড়তম যৌনতৃপ্তির দ্বারা সমৃদ্ধ যে দাম্পত্য-সম্পর্ক সে সম্পর্কের মধ্যে কোনদিন কোন অবিশ্বস্ততা আসতে পারে না। মেলর্সের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েও মেলর্সকে ভুলতে পারেনি কনি।

তবে লরেন্স এটাও দেখিয়েছেন যে দেহহীন মনোমিলন যেমন এক অলীক অর্থহীন ভাবসর্বস্বতা, তেমনি মনহীন দেহমিলনও এক অন্ধ জৈবিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম প্রথম মেলর্সের সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হয়ে তাকে ভালবাসতে না পারায় নিবিড় দেহমিলনের মাঝেও কেঁদেছে কনি। তারপর একদিন যখন এ মিলন নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে লাভ করে এক আশ্চর্য প্রগাঢ়তা, যখন একদিন মেলর্সের প্রতিটি জীবকোষ হতে নিঃসৃত দেহনির্যাস-স্বরূপ তার স্খলিত বীর্যের সঙ্গে তার আত্মাটা এক নিমেষে সঞ্চারিত হয় কনির গর্ভদেশের গভীরে, তখন হঠাৎ গভীরভাবে মেলর্সকে ভালবেসে ফেলে কনি। কনি যেন তাদের এই দেহমিলনের মধ্য দিয়ে জৈবচেতনার সব রং রসের স্তরগুলি পার হয়ে এক আত্মিক মিলনের পরম সুখস্বর্গে উন্নীত হয়।

যে যৌনক্রিয়া সকল সৃষ্টির প্রাণরঙ্গভূমি, যে যৌনক্রিয়া দেহমনের স্বাস্থ্য ও ভারসাম্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক সে যৌনক্রিয়ার এমন নিখুঁত চিত্রায়ণ ও তার এমন শৈল্পিক বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল সাহিত্যে। যে প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে অপূর্ণতার অগৌরবে লজ্জানত ও হৃতম্লান হয়ে থাকতে হত বিশ্বসাহিত্যকে সে প্রয়োজন সিদ্ধ করে লরেন্স অর্জন করেছেন এক বিরল অবিস্মরণীয়তার গৌরব। এক অসাধারণ উপন্যাস হিসাবে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার একাধারে ভীষণ সুন্দর, তৃপ্তিলোলুপ অবাধ কামপ্রবৃত্তির পঙ্কিল জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা স্থিতবদ্ধ যেন এক নীলাকমল যার সহাস্য দৃষ্টির নির্মল শুভ্রতা দেহলালসার পঙ্কশয্যা হতে শুরু করে আত্মার আকাশটিকে পরিচুম্বন করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

ক্রয়ত্জার সোনাতা

দাম্পত্য জীবনের গোলাপ-শয্যার অন্তরাল থেকে একবার যদি ফণা বিস্তার করে ঈর্ষা ও সন্দেহের কাল-সর্প তাহলে তার পরিণতি যে কতদূর শোকাবহ হতে পারে তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে শেক্সপীয়রীয় নাটকে ওথেলো-ডেস্‌ডিমনার বিয়োগান্ত জীবনকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের রুশ অভিজাত সমাজের পশ্চাৎপটে ঈর্ষাদীর্ণ সেই একই দাম্পত্যজীবনের বিষাদান্ত পরিণতির মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন জীবন-শিল্পী লিও তলস্তয় "ক্রয়ত্জার সোনাতা'র সীমিত পরিধিতে। ১৮৮৭ সালে শুরু করে ১৮৮৯ সালে তিনি এই ক্ষুদ্রায়তন রচনাটি সম্পূর্ণ করেন। রুশ অভিজাত সমাজের তৎকালীন মানসিকতার এই উলঙ্গ প্রকাশে বিপন্ন হয়ে জার-সরকারের তৎকালীন সেন্সর-ব্যবস্থা বইখানির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। লেখকের স্ত্রী সোফিয়া তলস্তয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৯১ সালে রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি লাভ করে।

লাল ও কালো

আঠার শ' তিরিশ সাল। ফরাসী বুদ্ধিজীবি মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সুরু হল সদ্য-প্রকাশিত একখানা উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসখানার নাম 'লা রুজ এত্ লা নয়ার' (দি স্কারলেট এ্যাণ্ড ব্ল্যাক)। লেখক স্তাঁদাল। ফরাসী সাহিত্যক্ষেত্রে স্তাঁদাল নবীন আগন্তুক নন—কেননা ইতিমধ্যে তাঁর খান তিনেক প্রবন্ধধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবং প্রেমের উপর তাঁর

রসঘন গ্রন্থ 'দ্য লা আমুর' ফরাসী রসিক সমাজকে মুগ্ধও করেছে। তবে উপন্যাস এই প্রথম লিখলেন।

ফরাসীভূমির রাজনৈতিক আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। দশম চার্লস (১৮২৪-৩০) তখন ফরাসীভূমির রাজা। নেপোলিয়নের পতন ঘটেছে। দেশের সীমান্ত ঘিরে ওৎ পেতে রয়েছে তামাম ইউরোপের যুদ্ধ-বাজ রাজা-রাজড়ারা··· ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেশের মধ্যেও অস্থিরতা। যুবক-মনে নেপোলিয়নের দুরন্ত প্রভাব। উপযুক্ত দেশ-নায়কের অভাবে তারা চঞ্চল। সর্বশক্তিমান ধর্মগুরুরা ক্ষমতা আর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। গীর্জার চত্তর রাজনীতির আখড়া। ফাদার আর বিশপদের ইঙ্গিতে মানুষের জীবনের উঠা-নামা ঘটছে। অভিজাত, মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ জনসাধারণ সকলের উপরই ফাদারদের অখণ্ড প্রভাব। দেশের মধ্যে দুটো দল—জানসেন-পন্থী আর জেসুইট-পন্থী। তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের অবিরাম লড়াই। এই পটভূমিতে ফরাসীভূমির গ্রাম-অঞ্চলের এক মেধাবী ছুতারের ছেলের উত্থান-পতনের কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে এই উপন্যাস। দুটি নারী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভালবাসে এই তরুণ ছুতারের ছেলে জুলিয়ান সোরেলকে। একদিকে উচ্চাশা এবং অন্যদিকে কাম-লালসায় পীড়িত নায়কের মন। কখনও সে উত্তেজনায় অধীর আবার কখনও বিষণ্ণ।

উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাসক মহলে ভয় সঞ্চারিত হল। দেশের অস্থির রাজনৈতিক-অবস্থাকে এই উপন্যাস আরও অস্থির করে তুলবে। নেপোলিয়নের ভাবধারায় বিপ্লব সংগঠনে ইন্ধন জোগাবে। আর যাজক সমাজে আশঙ্কা দেখা দিল, মানব-মানবীর প্রেম-বন্ধনে এই উপন্যাস আবিলতা সৃষ্টি করবে। এর রচনা অশ্লীলতাদোষদুষ্ট। সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ ও নীতির চেতনা ছারেখারে যাবে। সুতরাং রাজ-দরবারে অভিযুক্ত হলেন লেখক স্তাঁদাল। নিষিদ্ধ হল 'লা রুজ এত্‌ লা নয়ার' উপন্যাসখানা। স্তাঁদাল দেশ ছেড়ে ইতালিতে চলে গেলেন। তিরিশ সালের বিপ্লবের পর দেশে ফিরলেন স্তাঁদাল। অভিযোগ মুক্ত হল তাঁর উপন্যাস। বিশ্ব-সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্তাঁদালের এই উপন্যাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে আজও···এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

স্তাঁদাল লেখকের ছদ্মনাম। আসল নাম হেনরি ম্যারি বেইল (Henri Marie Beyle)। তাঁর বাবা ছিলেন গ্রেনবল শহরের একজন উকিল। সতের শ' তিরাশী সালের তেইশে জানুয়ারী এই গ্রেনবলে হেনরির জন্ম হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে হেনরি মাকে হারান। গৃহ-শিক্ষকের কাছে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। পরে ইকোল সেন্ট্রালে পড়েন। ষোল বছর বয়সে ফরাসী সমর-বিভাগে চাকরী পান। ফরাসী রাজনীতির ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের আবির্ভাবে হেনরির জীবন-দর্শন গেল বদলে। তিনি নেপোলিয়নের নানা সমর অভিযানে

যোগদান করেন। সেনাবাহিনীব সেকেণ্ড লেফটন্যাণ্ট হিসাবে তাঁর জীবন স্থুরু হয়। ইতালি, জার্মানী, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রতিটি দেশের বিরুদ্ধে তিনি সৈনিক ছিলেন। নেপোলিয়নের অনুরাগী ছিলেন হেনরি। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক জুলিয়ানও ছিল নেপোলিয়ন অনুরাগী। শুধু জুলিয়ান কেন সে সময় ফরাসীভূমির গ্রামাঞ্চলের মানুষরাই ছিল নেপোলিয়নের ভক্ত। আঠার শ' বিয়াল্লিশ সালের ১৫ই মার্চ হেনরীর মৃত্যু হয়।

রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শের যুগে স্তাঁদাল ছিলেন একান্তভাবেই বাস্তববাদী সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাস রাজ-রোষে নিষিদ্ধ হলেও ফরাসী জন-মনে ভয়ানক এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। অশ্লীল ত নয়ই বরং তাঁর 'লা রুজ এত্‌ লা নয়ার' উপন্যাসকে বিশ্বের একখানা সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস বলেন সমালোচকরা। আর ফরাসীভূমিতে তিরিশ সালের বিপ্লবে এই উপন্যাস প্রভাবও সৃষ্টি করেছিল। আজও এই উপন্যাস পাঠকদেব কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

—কল্যাণব্রত দত্ত

লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক

Lady Chatterley's Lover

১

ডি. এইচ. লরেন্স

অধ্যায় ১

এ যুগ দুঃখ ও বিষাদের যুগ, তাই আমরা এ যুগকে ঠিক দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই না। যেন এক বিরাট ও ব্যাপক ধ্বংসকার্য ঘটে গেছে, আমরা অমিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা নূতন করে ঘর বাঁধতে শুরু করেছি, বুকের মাঝে পোষণ করে চলেছি ছোট ছোট আশা আকাঙ্খা। কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন, কারণ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যাওয়ার কোন সহজ মসৃণ পথ নেই। সেখানে যেতে হলে আমাদের অনেক পথ ঘুরতে হবে, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে। আমাদের মাথার উপর অনেক আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমাদের বাঁচতে হবে।

কনস্ট্যান্স চ্যাটার্লির অবস্থাও তখন ছিল ঠিক এইরকম। যুদ্ধ তার মাথার উপর ছাদটাকে ধসিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে তাকে বাঁচতে হবে আর জীবনে ঠেকে ঠেকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

ক্লিফোর্ডকে সে বিয়ে করল ১৯১৭ সালে। সে তখন এক মাসের জন্য ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। বিয়ের পর এক মাস তারা কাটিয়েছিল মধুচন্দ্রিমায়। তারপর ক্লিফোর্ড চলে যায় ফ্ল্যাণ্ডার্সে। কিন্তু ছয় মাস পরেই আবার তাকে আহত অবস্থায় ফেরৎ পাঠানো হয়। তখন তার বয়স উনত্রিশ এবং তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সএর বয়স তেইশ।

আঘাতের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রামের পর কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেল ক্লিফোর্ড। কিন্তু দুটি বছর শয্যাগত হয়ে চিকিৎসাধীনে থাকতে হলো তাকে। এর পর সে আরোগ্য হয়ে উঠল। আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মাঝে ফিরে এল সে। কিন্তু তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত গোটা নিম্নাঙ্গটা পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

এটা হলো ১৯২০ সালের কথা। ক্লিফোর্ড তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সকে নিয়ে ফিরে গেল তার পৈত্রিক বাড়ি র‍্যাগবি হলে। তার বাবা তখন মারা গেছেন। তার বাবা একজন ব্যারণ ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই সে হলো একজন

ব্যারনেট এবং সে স্যার ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি নামে অভিহিত হতে লাগল। তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সকে বলা হতে লাগল লেডি চ্যাটার্লি। তাদের আয় খুব একটা স্বচ্ছল ছিল না এবং সেই আয়ের উপর ভিত্তি করেই তারা এই নির্জন বড় বাড়িটাতে ঘর-সংসার করতে এল। তাদের দাম্পত্য জীবন যাপন করতে এল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশে। ক্লিফোর্ডের এক বোন ছিল, কিন্তু তিনি আগেই গত হয়েছেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। তার বড় ভাই, গত যুদ্ধেই প্রাণ হারায়। সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে ক্লিফোর্ড বাস করতে এল তার পৈত্রিক নিবাস মিডল্যাণ্ডে। সে জানত সে কোনদিন সন্তানের পিতা হতে পারবে না আর জানত সে যতদিন বাঁচবে ঠিক ততদিনই বেঁচে থাকবে চ্যাটার্লি বংশের নাম বা ধারাটা।

ক্লিফোর্ড কিন্তু খুব একটা ভেঙ্গে পড়েনি। তাকে খুব একটা বিষণ্ণ দেখাল না। তার একটা চাকাওয়ালা চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারে করে সে ইচ্ছামত বাগানে ও বিষাদসুন্দর পার্কটায় ঘুরে বেড়াত। পার্কটার জন্য সত্যিই গর্ব অনুভব করত সে। যদিও মুখে সেটাকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দিত না।

জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে করে সহনশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ক্লিফোর্ড। তবু তাকে হাসিখুশিতে উজ্জ্বল দেখাত সব সময়। তার মুখখানা দেখে কিছু বোঝাই যেত না। আপাত দৃষ্টিতে দেখে মুখখানাকে স্বাস্থ্যে প্রদীপ্ত মনে হত। তার নীলচে চোখগুলোতে একটা উদ্ধত ভাব ছিল। তার কাঁধ দুটো ছিল চওড়া আর বলিষ্ঠ। তার হাত দুটো ছিল লোহার মত শক্ত। বণ্ড স্ট্রীট থেকে কেনা দামী সুন্দর নেকটাই বা গলবন্ধনী পরত সে। তবু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যেত তার দু' চোখের দৃষ্টির মধ্যে পঙ্গুজীবনের এক অসহায়তাবোধ ও একটা শূন্যতার ভাব ছিল।

মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেছে সে। মৃত্যুর হাত থেকে কোনরকমে যে জীবনকে ফিরে পেয়েছে, সে জীবনেব অবশিষ্টাংশটুকু তার কাছে পরম মূল্যবান। সে জীবন উপভোগের এক আশ্চর্য আকুলতা উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে থাকে তার দু'চোখের তারায়। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে এক চরম আঘাত সহ্য করেও সে বাঁচতে পেরেছে বলে এক বিরল জয়ের গর্বে ও গৌরবে ফুলে ওঠে তার বুকটা। তবু সে বুঝতে পারে কি যেন সে হারিয়েছে। তার প্রাণ-শক্তির এক উত্তপ্ত ধাতু হারিয়ে ফেলায় তার অনুভূতির জগতের এক বিরাট অংশ যেন এক শীতল শূন্যতায় ভরে গেছে।

তার স্ত্রী কনস্ট্যান্সএর মুখের মধ্যে একটা গ্রাম্যতার ভাব ছিল। তার দেহটা ছিল বেশ বলিষ্ঠ আর তার চুলগুলো ছিল বাদামী। তার চোখগুলো ছিল বড় বড় এবং বিস্ময়াবিষ্ট। তার গলার স্বরটা ছিল খুব নরম আর নিচু। মনে হত সে যেন গ্রাম থেকে সদ্য এসেছে। তার মা ছিলেন প্রাক-র‍্যাফায়েল যুগের একজন ফেবীয়ান সমাজবাদী। সমাজবাদের কিছু প্রভাব

থাকা সত্ত্বেও বলা যায় কনস্ট্যান্স আর তার বোন হিল্‌দা শিল্পীসুলভ আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে। একদিকে তাদের যেমন কলাবিদ্যার লীলাভূমি প্যারিস, রোম ও ফ্লোরেন্সে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি তাদের সমাজবাদী শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ও পীঠভূমি হেগ ও বার্লিনেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বক্তা এসে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দিতেন সমাজবাদের উপর।

দুই বোনই তাদের ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলা আর আদর্শ রাজনীতি—এই দুটি বিদ্যাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা ছিল একই সঙ্গে গ্রাম্য ও নাগরিক। তাদের সরল শিল্পাদর্শ ছিল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাদের বয়স যখন পনের তখন তাদের ড্রেসডেনে পাঠানো হয় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গানবাজনা শেখবার জন্য। সেখানে সময়টা তাদের ভালভাবেই কাটতে থাকে। তারা সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করত। তারা দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করত। পুরুষদের মত সব বিষয়েই তারা অগ্রণী ছিল। তারা গিটার হাতে শক্ত সমর্থ চেহারার যুবকদের সঙ্গে বেড়াতে যেত শহরের বাইরে দূর বনাঞ্চল দিয়ে। তারা গাইত ওয়াণ্ডারভোগেদএর গান। তারা ছিল একেবারে স্বাধীন। উগ্রকাম মধুকণ্ঠ যুবকদের সঙ্গে বাইরের জগতে প্রথম সকালের বনভূমিতে বা যে কোন জায়গায় খেয়ালখুশিমত বাধাবন্ধহীনভাবে ঘুরে বেড়াত তারা। তারা যা খুশি করত, যা খুশি বলত। তবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলাটাই ছিল বড় কথা, ভালবাসাবাসিটা ছিল গৌণ ব্যাপার।

তাদের বয়স যখন মাত্র আঠারো তখন হিলদা আর কনস্ট্যান্স দুজনেই সাময়িক ভালবাসাবাসির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। ভালবাসার আস্বাদ লাভ করে। যে সব যুবকদের সঙ্গে তারা আবেগের সঙ্গে কথা বলত, যাদের সঙ্গে দ্রুত গান করত, যাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গাছতলায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করত তারা স্বভাবতই এক প্রেম সম্পর্কে বাঁধতে চাইত তাদের। মেয়েরা কিন্তু সন্দেহ না করে পারছিল না। কিন্তু তখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ছেলেরা ছিল বিনয়ী, কিন্তু তারা মেয়েদের নিবিড়ভাবে কামনা করত। দানশীলা রাণীর মত মেয়েরা কেন নিজেদের বিলিয়ে দেয় না তা তারা বুঝতে পারত না।

এইভাবে তাদের যে সব নির্বাচিত যুবকদের সঙ্গে তারা মেলামেশা করত ও বেশী কথাবার্তা বলত, যাদের সঙ্গে সূক্ষ্মনিবিড় এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করত ওরা। আলোচনা আর তর্কবিতর্কটাকেই ওরা বড় করে দেখত, ভালবাসাবাসি বা দেহ-সংসর্গের কাজটাকে এক আদিম অস্বস্তিকর ব্যাপার বলে মনে করত ওরা। এটা যেন প্রগতির পরিপন্থী একটা

কিছু। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কোন পুরুষবন্ধুকে ভালবাসা ত দূরের কথা, তাকে ঘৃণা করত। ভাবত কোন পুরুষ তার জীবনে এল মানে ব্যক্তিগত শুচিতা ও অন্তর্জীবনের স্বাধীনতার সীমা কারো অনধিকার প্রবেশের দ্বারা লঙ্ঘিত হলো। কারণ তারা নারী বলে তারা মনে ভাবত তাদের নারী-জীবনের সকল মর্যাদা ও অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত আছে। নারীজীবনের আর কি অর্থ থাকতে পারে? প্রাচীন প্রথাগত অধীনতামূলক সম্পর্কের বন্ধনগুলো সব ছিঁড়ে ফেলার থেকে নারী হিসাবে তাদের বড কাজ আর কি হতে পারে? প্রাচীন প্রথাগত নারী পুরুষের এই যৌন সম্পর্কটাকে অনেকে আবার আবেগের সঙ্গে আদর্শায়িত করে তুলতে পারে। যে সব কবি এই সম্পর্ককে তাঁদের কাব্যে গৌরবান্বিত করে তোলে তাঁরা সকলেই পুরুষ ছিল।

নারীরা এর থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর একটা কিছুকে চায়। নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কোন যৌনভিত্তিক প্রেমের থেকে অনেক বেশী সুন্দর ও আশ্চর্য-জনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরুষরা এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। কুকুরদের মত তারা যৌনসংসর্গের উপর জোর দেয় বেশী।

নারীরা পুরুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। একজন ক্ষুধার্ত পুরুষ শিশুর মতই অশান্ত অবুঝ। তখন তারা যা চায় নারীদের তাই দিতে হয় তাদের শান্ত করার জন্য। শিশুর মতই তখন পুরুষগুলো এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে তারা নরনারীর মধুব সম্পর্কটাকে অহেতুক নোংরা করে তোলে। কিন্তু একজন নারী তার অন্তর্জীবনের স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ কবতে পারে। অথচ কবিরা ও যৌন বিজ্ঞানের লেখকগণ এ কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেননি। কোন একজন নারী নিজেকে একেবারে বিলিয়ে না দিয়েও কোন পুরুষকে গ্রহণ করতে পারে। সে পুরুষের প্রভাবের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় না; বরং সে যৌন সংসর্গের ব্যাপারটাকে কৌশলগত এক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে পুরুষের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে চলে। যৌনসঙ্গমকালে নারীরা যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকতে চায়, তারা চায় এ বিষয়ে পুরুষরাই যথাসাধ্য তাদের শক্তি ও উদ্যমের অপচয় ঘটিয়ে নিঃস্ব হয়ে উঠুক। এইভাবে তাদের মধ্যে এক অতৃপ্তিকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের যৌনসম্পর্ককে দীর্ঘায়িত করতে চায় নারীরা। এইভাবে তাদের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য পূরণের যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে পুরুষরা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই দুই বোন প্রেম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাড়ি পাঠানো হয়। ওদের কাছে ভালবাসাবাসির অর্থ হলো কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় হয়ে ওঠা। যখনি কোন যুবককে ভাল লেগেছে ওদের তখনি ওরা যত সব মিষ্টি কথাবার্তার সেতু পার হয়ে পরস্পরের অন্তরের মাঝে আনাগোনা করেছে।

ওদের চোখে ভাললাগা কোন সুচতুর যুবকের সঙ্গে বিচিত্র রসালাপে মত্ত হয়ে উঠতে গিয়ে এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ও অতিনিবিড় পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের দেহ। এ রসালাপ চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল, কেমন করে প্রেম জাগল তাদের হৃদয়ে তা তারা বুঝতেই পারল না। সে কি স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি! কথা বলার জন্য মনের মত এক মানুষ পাওয়া গেল। প্রতিশ্রুতিটা আসলে কি তা জানতে পারার আগেই সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে গেছে।

দীর্ঘ অন্তরঙ্গ রসালাপের পর তাদেব সত্তার গভীরে যদি কোন দেহগত এক জৈব কামনা জেগে উঠত আর সেই কামনার তাড়নায় অপরিহার্য হয়ে উঠত তাদের দেহসংসর্গ, তাহলে সে দেহসংসর্গে কোন আপত্তি থাকত না তাদের। যেন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হত এ সংসর্গে।

এ সংসর্গের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক বিশেষ রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সারা দেহ জুড়ে অনুভব করত তারা এক অদ্ভুত উত্তেজনার স্পন্দন, আত্মপ্রতিষ্ঠার এক অদম্য আবেগ। কোন এক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিসূচক কতকগুলি তারকা চিহ্নের মত এ স্পন্দন এ রোমাঞ্চ এ আবেগ যেন এক অভিজ্ঞতার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করত।

১৯১৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটিব সময় যখন হিলদা আর কনি বাড়ি এল তখন হিলদাব বয়স কুড়ি আর কনির বয়স আঠারো, তখন তাদের বাবা বেশ বুঝতে পারল তারা প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

অনেকে বলেন, L' amour await passe par la কিন্তু ওদের বাবা অভিজ্ঞ লোক। তিনি জানতেন প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি নিজস্ব ধারা আছে। তাই তিনি তাঁর মেয়েদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথে কোন বাধা সৃষ্টি করতেন না। ওদের মা তাঁর শেষ জীবনে কয়েক মাস ধরে স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করুক এবং স্বাধীনভাবে তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করুক। তিনি নিজে কখনো নিজের মতে স্বাধীনভাবে চলতে পারেননি। কিন্তু কেন তা কেউ জানে না, একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন। কারণ তিনি চাকরি করে টাকা রোজগার করতেন এবং তাকে কোন ব্যাপারে কেউ কোন বাধা দিত না। তবু তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন না। তার কারণ তাঁর মনে প্রভুত্বের একটা ধারণা এবং অধীনতামূলক একটা ভাব ছোট থেকেই ছিল। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে তাঁর স্বামী স্যার ম্যালকমের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর প্রতি স্নায়বিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ও উদার মনোভাবাপন্ন স্ত্রীর হাতে সংসার চালনার সব ভার দিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর মেয়েরা আবার ফিরে গেল ড্রেসডেনে। আবার তারা সেই পুরনো জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে গেল। সেই গানবাজনা,

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, যুবকবন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা—আবার সব কিছু আগের মতই চলতে লাগল। তারা তাদের আপন যুবকবন্ধুদের তেমনি ভালবাসতে লাগল। তাদের যুবকবন্ধুরাও তাদের প্রিয় বান্ধবীদের তাদের প্রেমাবেগের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে ভালবাসত। তারা যা কিছু লিখত, যা কিছু ভাবত বা প্রকাশ করত সবই তাদের বান্ধবীদের সম্বন্ধে। কনির যুবকবন্ধুটি ছিল গানের লোক আর হিলদার ভাবের লোকটি ছিল কারিগরী বিদ্যার লোক। কিন্তু তারা যেই হোক, তাদের দেখে মনে হত তারা যেন তাদের আপন আপন প্রেমিকাদের জন্যেই বেঁচে আছে। তাদের মানসিকতা আর মানসিক উত্তেজনা দেখে তাই মনে হত। এই উত্তেজনার জন্যই অন্য কোথাও জীবনে তারা প্রতিহত হলেও তারা তা জানতেই পারত না।

তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল প্রেম তাদের সত্তার গভীরে জড়িয়ে আছে। তাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার পরতে পরতে ঢুকে গেছে। এই প্রেম নরনারীর দেহে কি অভ্রান্ত রূপান্তর নিয়ে আসে, একথা ভাবতে সত্যিই অদ্ভুত লাগত তাদের। এই প্রেম আর দেহসংসর্গের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যটা আরো উজ্জ্বল হয়, তাদের দেহের শক্ত জায়গাগুলো বেশ নরম হয়, চেহারাটা মোটের উপর গোলগাল হয়ে ওঠে। পুরুষরা এর ফলে আগের থেকে শান্ত হয়, তারা আরো অন্তর্মুখী হয়। তাদের কাঁধ বুক চওড়া হয়, তাদের হঠকারিতার ভাবটা কমে যায়, কোন কাজ তারা ভাবনা করে করতে শেখে।

দেহে প্রথম যৌন রোমাঞ্চ জাগার সময় ওরা দুই বোনেই পুরুষদের আশ্চর্য শক্তির কাছে প্রথম প্রথম বিলিয়ে দেয় নিজেদের। কিন্তু কিছু পরেই তারা সামলে নেয় নিজেদের। এই যৌন রোমাঞ্চটাকে একটা সাধারণ চেতনা হিসাবে জ্ঞান করতে থাকে এবং নিজেদের সত্তার স্বাধীনতা আবার ফিরে পায়। এদিকে পুরুষরা তাদের যৌনতৃপ্তির জন্য নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাদের কাছে বিলিয়ে দিত নিজেদের আত্মাকে এবং পরে এমন একটা ভাব দেখাত যাতে মনে হত তারা এক শিলিং খরচ করে মাত্র ছয় পেনি পেয়েছে। কনির প্রেমিক ছিল একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অন্য দিকে হিলদার প্রেমিক ছিল হাসিখুশিতে ভরা। তবে অন্যান্য পুরুষদের মত তারাও ছিল চির অকৃতজ্ঞ, চির অতৃপ্ত। পুরুষজাতটার রীতিই হলো এই। মেয়েরা তাদের সঙ্গে কখনো কোন কারণে সহবাস করতে রাজী না হলেই তারা ঘৃণা করবে মেয়েদের, আবার সহবাস করতে রাজী হলেও তারা অন্য কোন না কোন কারণে ঘৃণা করবে তাদের। অনেক সময় আবার বিনা কারণেই ঘৃণা করতে থাকবে। মেয়েরা যাই করুক, অতৃপ্ত অবুঝ শিশুর মত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না তারা।

যাই হোক, এমন সময় জোর যুদ্ধ লাগায় কনি আর হিলদা দুজনেই বাড়ি ফিরে এল। এর কিছুদিন আগে মে মাসে তাদের মা মারা যাওয়ায় তারা

একবার বাড়ি এসেছিল তাদের মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে। ১৯১৪ সালের খৃস্টের জন্মদিন আসার আগেই তাদের দুই বোনের দুই জার্মান প্রেমিকই মারা যায়। তাদের হারিয়ে ওরা শোকাবেগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ভুলে যেতে থাকে।

দুই বোনই তাদের বাবার কাছে তাদের মার বাড়ি কেনসিংটনে বাস করতে লাগল। তারা দুজনেই কেম্ব্রিজের সেই যুবকগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশা করত যারা ছিল অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তারা ছিল অভিজাত বংশের ছেলে। কিন্তু ফ্লানেলের শার্ট আর পায়জামা পরত। তারা নিচু মেয়েলি গলায় কথা বলত, সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় দিত। আবেগানুভূতি প্রকাশের দিক থেকে তারা ছিল নৈরাজ্যবাদী, কোন নিয়মকানুন মেনে চলত না।

যাই হোক, এই যুবকগোষ্ঠীরই একজনকে বিয়ে করল হিলদা। যুবকটি তার থেকে দশ বছরের বড়। যুবকটিব মোটা রকমের টাকা পয়সা ছিল। সে একটা সরকারী চাকরি করত এবং মাঝে মাঝে সে কিছু দার্শনিক প্রবন্ধ লিখত। ওরা ওয়েস্টমিনস্টারে একটা ছোট ঘরে বাস করত। ওরা একটা ছোট ঘরে বাস করলেও এমন সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত যারা ছিল দেশের মধ্যে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ, যারা অনেক সব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলত।

কনি মিশত কেম্ব্রিজের পায়জামাপরা সেই সব উন্নাসিক যুবকদের সঙ্গে যারা সব কিছু উপহাস করে উড়িয়ে দিত। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি। ক্লিফোর্ড তখন বাইশ বছরের যুবক। সে বনে কয়লা খনি সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে করতে হঠাৎ চলে আসে। এর আগে সে দুবছর কেম্ব্রিজে ছিল। তারপর সে সেনাদলে যোগ দেয় এবং প্রথম লেফটন্যাণ্টের পদে উন্নীত হয়। এবার সে সামরিক পোষাক পরে সহজেই সব কিছুকে উপহাস করে উড়িয়ে দিতে পারত।

ক্লিফোর্ড ছিল কনির থেকে উঁচুস্তরের লোক। কনি ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু ক্লিফোর্ড ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের। খুব একটা বড় দরের না হলেও তার বংশটা ছিল অভিজাত। তার বাবা ছিল একজন ছোটখাটো ব্যারণ আর তার মা ছিল কোন এক ভিস্‌কাউণ্টের মেয়ে।

ক্লিফোর্ড কিন্তু কনির থেকে বড় বংশের ছেলে এবং সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ হলেও সে ছিল গ্রাম্য আর ভীরু প্রকৃতির। সে তার ভৌম আভিজাত্যের ছোট জগৎটায় বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত, কিন্তু শহরের বৃহত্তর পরিবেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করত। সত্যি কথা বলতে কি সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ভয় করত। সে অনেক শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও একটা অসহায়তা বোধ করত মনে মনে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও আজকাল সচরাচর এটা প্রায়ই দেখা যায়।

কনস্ট্যান্স রীডের নরম আশ্বাসের কথাগুলো তাই বড় ভাল লেগেছিল ক্লিফোর্ডের। বাইরের জগতে এই আশ্চর্য মেয়েটি যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করত সে ব্যক্তিত্ব তার ছিল না।

তবু ক্লিফোর্ডও একদিক দিয়ে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী ছিল। আপন শ্রেণীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত সে। বিদ্রোহ কথাটা হয়ত একটু বেশী কড়া হয়ে যায়। যে কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন সাধারণ মানুষের মনে যে একটা বিরূপ মনোভাব জেগেছিল, সে মনোভাবের হাওয়া তার মনেও লেগেছিল। প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত সব রীতিনীতিই নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ মনে হত তার। এমন কি নিজের বাবাকেও হাস্যাস্পদ মনে হত ; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। দেশের সরকারের মধ্যে কোন অর্থ বা সারবত্তা খুঁজে পেত না। যুদ্ধ, সেনাবাহিনী, সেনানায়ক সব কিছুকেই হাস্যাস্পদ মনে হত তার।

আসলে প্রভুত্বমূলক যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যা কিছু জড়িয়ে ছিল তাকেই কম বেশী হাস্যাস্পদ বলে মনে হত তার। বিশেষ করে শাসকশ্রেণীর লোকদের বেশী হাস্যাস্পদ মনে হত। তার বাবা স্যার জিওফ্রেও কম হাস্যকর ছিলেন না। তিনি যত সব গাছ কেটে বন সাবাড় করতে থাকেন আর কোলিয়ারী থেকে লোকদের তাড়িয়ে যুদ্ধে পাঠাতে থাকেন। তিনি যুদ্ধ বিপর্যয়ের বাইরে নিরাপদে থেকে মুখে দেশপ্রেমিক হিসাবে জাহির করতেন নিজেকে। গ্রামাঞ্চলে সাধ্যের অতীত টাকা খরচ করতেন।

ক্লিফোর্ডেব বোন মিস্ চ্যাটার্লি লণ্ডনে যায় নার্সিংএর কাজ করতে। তার বড় ভাই হার্বার্ট তা নিয়ে হাসাহাসি কবতে থাকে। আসলে ওরা সবাই ছিল হাস্যকর। ক্লিফোর্ড নিজেকেও কিছুটা হাস্যকর ভাবতে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর এক মেয়ে কনিকে দেখে তাকে এক সত্যিকারের মানুষ বলে মনে হয় তার, কারণ সে একটা কিছু বিশ্বাস করত।

কনিরা অবশ্য টমি আর তার বন্ধুদের বলপূর্বক যুদ্ধে পাঠানোর ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী ছিল। আর একটা বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাদের। সেটা হলো কফি আর চিনির দুষ্প্রাপ্যতা। এই সব কারণেই তারা শাসন কর্তৃপক্ষকে হাস্যকর ভাবত।

তখনকার শাসনকর্তৃপক্ষ নিজেরাও হাস্যকর ভাবতে লাগল নিজেদের। হাস্যকরভাবেই সব কাজ সম্পন্ন করতে লাগল তারা। তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হতে লাগল এটা যেন পাগল টুপীওয়ালাদের চায়ের মজলিশ। এমন সময় ঘটনা আরো ঘোরালো হয়ে উঠলে লয়েড জর্জ এলেন অবস্থাকে উন্নত করার জন্য। কিন্তু তাঁর কাজকর্ম আবার হাস্যকরতাকেও ছাপিয়ে গেল। উচ্ছল প্রকৃতির যুবকরাও হাসাহাসি বন্ধ করে দিল।

১৯১৬ সালে হার্বার্ট চ্যাটার্লি নিহত হতে ক্লিফোর্ডই উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হলো সব কিছুর। কিন্তু এতেও ভয় অনুভব করত সে। স্যার

জিওফ্রের পুত্র এবং র‍্যাগবির বংশধর হিসাবে তার যে একটা গুরুত্ব আছে একথাটা কখনো ভুলতে পারেনি সে। আবার এটাও সে জানত যে বৃহত্তর জগতের পটভূমিকায় এ মনোভাব হাস্যকর। সে র‍্যাগবির উত্তরাধিকারী এবং তার সব কিছুর জন্য দায়ী এটা যেমন ভাবতে ভয় লাগত তেমনি ভালও লাগত। আমার মনে হয় এটা অবান্তর।

স্যার জিওফ্রের কিন্তু এ ধরনের কোন মনোভাব ছিল না। তাঁর মুখখানা ছিল ম্লান অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাত সব সময়। তিনি সব সময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। দেশ ও জাতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদমর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য তিনি ছিলেন অনমনীয়ভাবে বদ্ধপরিকর। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার যোগ এতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে হোরেশিও বটমলিকেও ভাল মনে হত তাঁর। স্যার জিওফ্রে ছিলেন ইংল্যাণ্ড আর লয়েড জর্জের পক্ষে আর তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইংল্যাণ্ড আর সেণ্ট জর্জের পক্ষে।

স্যার জিওফ্রে চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে ক্লিফোর্ড বিয়ে করে বংশ রক্ষা করুক। ক্লিফোর্ড ভাবত তার বাবা একেবারে সেকালের মানুষ। কিন্তু সব কিছুকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার নিজের আর কি গুণ ছিল? তার নিজের অবস্থাও ত ছিল সমান হাস্যাস্পদ। তাই সে তার সামন্তপদ আর র‍্যাগবির পৈত্রিক বাড়ি নেহাৎ অবহেলাভরেই গ্রহণ করে।

যুদ্ধের প্রথম প্রথম যে আনন্দের উত্তেজনা খুঁজে পেয়েছিল তার মধ্যে, অত্যধিক মৃত্যুর বিভীষিকার ফলে সে উত্তেজনা পরে উবে যায়। বাঁচতে হলে জীবনে আরাম চাই, অবলম্বন চাই। জগতে এক নিরাপদ আশ্রয় চাই। পুরুষ মানুষ মাত্রই একজন স্ত্রী চায়।

চ্যাটার্লি পরিবারের দুই ভাই এক বোন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাড়ির ভেতরেই দিন কাটাত। আত্মীয় পরিজন অনেক থাকলেও কারো সঙ্গে বড় একটা মিশত না তারা। তাদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাদের নিজেদের পারিবারিক সম্পর্কটাকে আরো নিবিড় করে তোলে। তাদের বংশগত উপাধি ও ভূসম্পত্তি থাকা সত্বেও তারা অসহায়বোধ করত। তারা শিল্পাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং স্যার জিওফ্রের একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য তাদের নিজেদের শ্রেণীভুক্ত লোকজনদের সঙ্গে কোন মেলামেশা ছিল না। তাদের বাবার কাজকর্মকে তারা উপহাসের চোখে দেখলেও তাঁকে তারা উপেক্ষা করতে পারত না কোন বিষয়ে।

তারা তিন ভাইবোনে বলাবলি করত তারা চিরদিন একসঙ্গে বাস করবে। কিন্তু হার্বার্টের অকালমৃত্যুর ফলে তা আর হয়ে উঠেনি। স্যার জিওফ্রে খুব কম কথা বলতেন। তিনি ক্লিফোর্ডের বিয়ের কথাটা শুধু একবার বললেন। কিন্তু তিনি বেশী কথা না বললেও ক্লিফোর্ডের দিদি এম্মা তা চায়নি। তার ইচ্ছা ছিল তাদের বাড়ির কোন ছেলে বিয়ে করবে না। এম্মা

ছিল ক্লিফোর্ডের থেকে দশ বছরের বড়। তার মতে তাদের বংশের ছেলেরা একদিন যে আদর্শ অন্তরে পোষণ করত, যার কথা সব সময় বলত, তাদের বিয়ে করাটা হবে সে আদর্শের পরিপন্থী।

তা সত্ত্বেও কনিকে বিয়ে করল ক্লিফোর্ড এবং তার সঙ্গে এক জায়গায় মধুচন্দ্রিমা করতে গেল। সেটা ছিল ১৯১৭ সালের সেই ভয়ঙ্কর বছর। নিমজ্জমান একই জাহাজের যাত্রীদের মত সেই দুর্বছরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। বিয়ে করলেও অক্ষত রয়ে গেল ক্লিফোর্ডের কৌমার্য। কারণ যৌন বিষয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। দেহসংসর্গের ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে শুধু মনের মিলকে সম্বল করে পরস্পরে নিবিড় হয়ে উঠেছিল তারা এটাই যথেষ্ট ছিল তার কাছে। কনি কিন্তু যৌনসংসর্গহীন দেহতৃপ্তিহীন মিলন ও মেলামেশায় কোন আনন্দই পেল না। কিন্তু আর পাঁচজন মানুষের মত এই যৌনতৃপ্তিতে কোন আগ্রহ ছিল না ক্লিফোর্ডের। তার মতে কামগন্ধহীন এই মনোমিলনই নরনারীর সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। তাব মনে যৌন ব্যাপারটা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, হঠাৎ যে কোন সময়ে ঘটে যেতে পারে; কিন্তু সেটা প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক ব্যাপার নয়। সে ভাবত, যৌনসংসর্গ একটা প্রাচীন সেকেলে ব্যাপার যা আসলে বড কদর্য। অথচ কনি তার ননদ এম্মার হাত থেকে ভবিষ্যতে বাঁচার জন্য সন্তান চাইত।

কিন্তু ১৯১৮ সালে ক্লিফোর্ড পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে বাডি ফিরে এল। তখনো পর্যন্ত তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। জিওফ্রে সেই দুঃখে মারা যান।

অধ্যায় ২

১৯২০ সালের হেমন্তকালে র‍্যাগবির বাড়িতে এসে উঠল ক্লিফোর্ড আর কনি। ক্লিফোর্ডের বোন তার ভাইএর এই দুর্ঘটনায় তিতিবিরক্ত হয়ে চলে যায় পৈত্রিক বাসভবন থেকে। সেখান থেকে গিয়ে লণ্ডনের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাস করতে থাকে।

লম্বা নিচু ধরনের র‍্যাগবির বাড়িটা বাদামী পাথরে তৈরি। বাড়ি তৈরির কাজটা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। তারপর ক্রমাগত বাড়ানো হতে হতে বৈশিষ্ট্যহীন একটা খোঁয়াড়ে পরিণত হয়। ওক গাছে ঘেরা একটা পার্কের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। কিন্তু হায়, অদূরেই চোখে পড়বে তেভারশাল খনির চিমনিটা। দেখা যাবে, চাপ চাপ ধোঁয়া আর বাষ্পের মেঘ জমে রয়েছে তার উপর সব সময়ের জন্ত। দূরে কুয়াশাঢাকা এক অসম

পাহাড়ের উপর দেখা যায় সংগ্রামশীল তেভারশাল গ্রামের ছবি। গ্রামটা শুরু হয়েছে পার্কের গেটের কাছ থেকে এবং এক মাইলব্যাপী লম্বা হয়ে এলোমেলো ও বিশ্রীভাবে চলে গেছে। গ্রাম মানে পথের দুধারে বা একটু ভিতরে ইটের ছোট ছোট বাড়ি, তাদের মাথায় কালো কালো ছাদ। কেমন যেন একটা সীমাহীন শূন্যতা খাঁ খাঁ করত সারা বাড়িটাতে।

কনি মোটামুটি তিন জায়গায় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। সে জায়গাগুলো হলো কেনসিংটন, স্কটল্যাণ্ডের পাহাড় অঞ্চল আর সাসেক্সের ঢালু নিম্নাঞ্চল। কনি তখন ইংল্যাণ্ড বলতে এই তিনটে জায়গা বোঝাত। লোহা আর কয়লাখনিতে ভরা মিডল্যাণ্ডের ভূপ্রকৃতিটাকে ভাল না লাগলেও একরকম শিশুসুলভ ঔদাসিন্যের সঙ্গে সব কিছু দেখত কনি।

র‍্যাগবির বাড়ির নির্জন নিরানন্দ ঘরের জানালা থেকে খনিটার নানারকমের আওয়াজ শুনতে পেত। খনির চালুনির শব্দ, এঞ্জিনের হুস্ হুস্ শব্দ। ট্রাক শান্টিং করার ক্লিং ক্লিং, কয়লাখনির সঙ্গে সংযুক্ত রেলের বাঁশির আওয়াজ অনবরত কানে আসত তার। তেভারশালের খাদের পাশটায় কত সব আগুন জলছে। এ আগুন বছরের পর বছর ধরে জলছে। এ আগুন নেভাতে হলে হাজার হাজার টাকার দরকার। কাজেই এ আগুন সমানে জলে যাচ্ছে। আর যখন সেদিক থেকে বাতাস বয় তখন গন্ধকের সঙ্গে খনিগর্ভস্থ ময়লার গন্ধ মিলেমিশে একটা উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং বাতাসে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। যখন বাতাস সেদিকে বয় না তখনও ভূগর্ভস্থ লোহা, কয়লা বা এসিডের একটা না একটা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে। এমন কি খৃস্টোৎসবের গোলাপের উপরেও কয়লার গুঁড়ো জমে থাকে। নরকের আকাশ থেকে ঝরে পড়া এক কালো নির্যাসের মতই অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার যেন।

অন্যান্য সব কিছুর মত এ ব্যাপারটাও ছিল বিধিনির্দিষ্ট। দুর্বিসহও বটে। কিন্তু পা ছুঁড়ে লাভ কি? লাথি মেরে ত আর কোন অবস্থাকে সরানো যায় না। অন্য সব কিছুর মত জীবনও চলতে লাগল। রাত্রিবেলায় আকাশে ঝুলতে থাকা কালো মেঘের গায়ে লাল ফুটকির মত, যন্ত্রণাদায়ক লাল দগদগে ঘায়ের মত সেগুলো জলতে থাকত। কখনো বাড়ত, কখনো কমত। সেগুলো ছিল চুল্লীর আগুন। প্রথম প্রথম সেগুলো ভাল লাগলেও ভয় লাগত। ওর মনে হত ও যেন মাটির নীচে বাস করছে। পরে সেগুলো গা সওয়া হয়ে যায় তার। সকালের দিকে প্রায়ই বৃষ্টি হত।

ক্লিফোর্ড বলত, র‍্যাগবি লণ্ডনের থেকে ভাল লাগে তার। এই গ্রামাঞ্চলের যেন নিজস্ব একটা ইচ্ছাশক্তি আর স্বাধীনতা আছে। এখানকার অধিবাসীদেরও আছে একটা বলিষ্ঠতা। কিন্তু কনি অবাক হয়ে ভাবত, এখানকার লোকগুলোর আর যাই থাক, চোখ বা মন বলে কোন পদার্থ নেই। তার মতে এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির মতই এখানকার লোকগুলোও কুৎসিত, বিকৃতদেহী, নীরস,

অসামাজিক। শুধু তারা যখন এ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা দিয়ে ফিরত তখন তাদের খোলা ভরাট গলার আওয়াজে, ইতর কথাবার্তায় আর কাঁটামারা খাদের জুতোর শব্দে এমন একটা কিছু থাকত যা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর আর রহস্যময়।

এক যুবক জমিদার হিসাবে ক্লিফোর্ড যখন তার বাড়িতে এসে উঠল, কেউ তখন তাকে কোন অভ্যর্থনা জানাল না। তার জন্য কোন উৎসব হলো না। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এল না। শুধু ওরা মোটর গাড়িতে করে ছায়া-ঘেরা ঢালু পথের উপর দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে একটা ঘোর বাদামী রঙের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তখন সে বাড়ির কাছে কতকগুলো ভেড়া চড়ছিল আর বাড়ির ঝি আর তার স্বামী কোন রকমে দুটো অভ্যর্থনার কথা বলার জন্য ঘোরাফেরা করছিল।

র‍্যাগবি হল আর তেভারশাল গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে কোন যোগাযোগ হলো না। কেউ টুপী খুলে বা কোন ভাবে কোন সম্মান বা সৌজন্য প্রকাশ করল না। কোলিয়ারির লোকরা তাদের দিকে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ব্যবসায়ীরা পরিচিত জনের মতই কনির পানে তাকিয়ে টুপী তুলে অভ্যর্থনা জানাল। ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে শুধু একবার অস্বস্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু এই পর্যন্ত। উভয় পক্ষের মধ্যে একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়ে গেল। উভয় পক্ষেই মৃদু ক্রোধের একটা অনুচ্চারিত বাধা রয়ে গেল। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের এই মানসিক বিচ্ছিন্নতায় কষ্ট পেত কনি। পরে সে তার মনটা শক্ত করে নেয়। অবাঞ্ছিত অথচ অপরিহার্য টনিকের মতই এ অবস্থা মেনে নেয়। ক্লিফোর্ড বা কনির আচরণ অসামাজিক ছিল বলেই যে এ অবস্থার উদ্ভব হয় তা নয়। এর আসল কারণ হলো এই যে, ওরা ওদের খনি শ্রমিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলে মনে করত। সুতরাং ব্যবধানটা বরাবর অনতিক্রম্য আর অবর্ণনীয় রয়ে গেল। ট্রেন্টের দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণতঃ এ ধরনের অবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু মিডল্যাণ্ড আর উত্তরাঞ্চলে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়ে যায়। তুমি তোমার দিকে থাক, আমি আমার দিকে। এই ধরনের একটা মনোভাব। এ ব্যবধান অতিক্রম করে সাধারণ মানবতার কোন নিবিড় স্পন্দন অনুভূত হয় না।

তবু উপরে উপরে মুখে সহানুভূতি জানাত কনি আর ক্লিফোর্ডকে। কিন্তু সে শুধু মুখে। উভয়পক্ষের মধ্যে কোন দেহগত সান্নিধ্য ছিল না।

রেক্টর ভদ্রলোক মানুষ হিসাবে ভালই ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ষাট এবং তিনি ছিলেন বড়ই কর্তব্যপরায়ণ। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁকে ত্যাগ করেছিল বলে তাঁকেও একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হত। খনি শ্রমিকদের স্ত্রীরা ছিল খৃস্টানধর্মাবলম্বী এবং মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ খনিশ্রমিকরা নিজেরা কোন ধর্মেই বিশ্বাস করত না। তাছাড়া গ্রামের যাজককে তাঁর পোষাকপরা অবস্থায় দেখলেই তারা ভাবত উনি আর যাই হোন আর পাঁচজন

সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক। তিনি মেণ্টর এ্যাসাবি নামে কোন এক প্রার্থনা আর প্রচার প্রতিষ্ঠানের লোক এছাড়া তারা আর কিছু ভাবত না।

ওরা লেডি চ্যাটার্লি সম্বন্ধেও এই কথাই ভাবত। ভাবত, তুমি যেই হও আমরাও তোমার থেকে কিছু কম নই। গ্রামবাসীদের এই অনমনীয় মনোভাব দেখেই হতবুদ্ধি হয়ে যায় কনি প্রথম প্রথম। যে সব শ্রমিকমেয়েরা লেডী চ্যাটার্লির কাছে দেখা করতে আসত তারা ছিল কৌতূহলী আর সন্দেহবাতিক। তাদের চোখে মুখে ছিল এক কপট মিত্রতার ভাব। তারা গর্বের সঙ্গে ভাবত, আমি লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু তারা কখনো ভাবত না, 'যোগ্যতার দিক থেকে আমি অনেক কম।' কিন্তু একথা তাদের মুখে কোনদিন শোনা যাবে না। অবস্থাটা ভয়ঙ্করভাবে দুঃসহ হলেও তার থেকে মুক্তিলাভের কোন আশা নেই।

ক্লিফোর্ড গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। তার দেখাদেখি কনিও তাদের এড়িয়ে চলত। কনি যখন তাদের সামনে দিয়ে কোথাও যেত তখন সে তাদের পানে তাকাত না। আর তারা কনির পানে এমনভাবে তাকাত যাতে মনে হবে সে যেন একটা চলমান মোমের পুতুল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে যখন ক্লিফোর্ডের কোন কাজ পড়ত বা গ্রামবাসীরা কোন ব্যাপারে তার কাছে আসত তখন ক্লিফোর্ড তাদের সঙ্গে দম্ভের সঙ্গে কথা বলত। তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। সে তার নিজের নীতির উপর শক্ত ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের সঙ্গে মিটমাটের কোন চেষ্টাই করত না। সে তার নিজের শ্রেণীর বাইরে যে কোন লোককেই ঘৃণার চোখে দেখত। অন্য দিকে গ্রামবাসীরা ক্লিফোর্ডকে পছন্দ অপছন্দ কিছুই করত না। তারা তাকে তাদের চারপাশের ভূ-প্রকৃতির কোন একটা বস্তুর মত জ্ঞান করত।

কিন্তু পঙ্গু হয়ে যাবার পর থেকে ক্লিফোর্ড অত্যন্ত লাজুক আর আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। সে তার ব্যক্তিগত চাকর ছাড়া আর সবাইকেই ঘৃণা করত। কারণ তাকে সব সময় চাকাওয়ালা চেয়ারে বা স্নানের চেয়ারে বসে থাকতে হত। তবু সে আগের মতই ভাল দর্জিদের দ্বারা তৈরি দামী পোষাক পরত পরিপাটি করে। বণ্ড স্ট্রীট থেকে আনা দামী নেকটাই পরত গলায়। উপর থেকে এক নজরে তাকে দেখলে আগের মতই চটপটে আর সুদর্শন দেখাত। সে কোন দিনই আজকালকার মেয়েলি ভাবওয়ালা যুবকদের মত ছিল না। তার লাল মুখ আর চওড়া কাঁধ সত্ত্বেও সে বরং ছিল কিছুটা গ্রাম্যভাবাপন্ন। তার আসল স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তার উদ্ধত ও ত্রস্ত, নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত চোখের তারায়। তার স্বভাবটা ছিল আক্রমণাত্মকভাবে উদ্ধত ও দাম্ভিক, আবার একই সঙ্গে নম্রতা ও শালীনতায় ভরা, আত্মবিলীয়মানতায় মৃদু বিকম্পিত।

কিন্তু কনি একথা না ভেবে পারত না যে আসলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে

তার কোন সম্পর্ককে স্বীকার করতে চাইত না ক্লিফোর্ড। খনিশ্রমিকদের সে কোন মানুষ বলে জ্ঞান করত না, তারা যেন তার খনিরই একটা নির্জীব অংশ। তারা যেন রূঢ় ভূপ্রকৃতির একটা অংশ, জীবন্ত মানুষ নয়। খনি-শ্রমিকদের কিছুটা ভয়ও করত ক্লিফোর্ড। ওর পানে তারা তাকিয়ে থাক তা সে চায় না। বিশেষ করে সে পঙ্গু বলেই এটা মনে হয়। শ্রমিকদের রূঢ় স্থূল জীবনযাত্রা বনশুয়োরদের মতই অস্বাভাবিক মনে হত তার কাছে।

আসলে কোন বিষয়েই আগ্রহ ছিল না তার। কোন অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা দূরবীক্ষণযন্ত্রে নিবদ্ধ দৃষ্টির মত তার দৃষ্টি ছিল বর্তমান হতে বিচ্ছিন্ন। আসলে কারো সঙ্গেই তার কোন নিবিড় সংস্পর্শ ছিল না। একমাত্র র‍্যাগবির এই পৈত্রিক বাড়িটার সঙ্গে এক প্রথাগত বংশগত সম্পর্ক আর এম্মার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়া কারো সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই ছিল না তার। এ ছাড়া কোন কিছুই মনকে স্পর্শ করতে পারত না তার। কনি বেশ বুঝতে পেরেছিল মনের দিক থেকে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার স্বামীর। সে যেন কারো কাছ থেকে কিছুই চায় না, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না। সে যেন চিরদিন এইভাবে মানবসম্পর্কবিহীন অবস্থাতেই থাকতে চায়।

কনির সঙ্গে তার মনের কোন সম্পর্ক না থাকলেও কনির উপর প্রতিটি মুহূর্তেই নির্ভর করতে হত তাকে। তার দেহটা বলিষ্ঠ ও লম্বাচওড়া হলেও সে ছিল অসহায়। অবশ্য সে তার চাকাওয়ালা চেয়ারটাকে ইচ্ছামত ঘোরাতে ফেরাতে পারত, সে তার যন্ত্রবসানো স্নানের চেয়ারটা নিয়েও পার্কের চারপাশে ঘুরে আসতে পারত। তবু সে এক মুহূর্তও একা থাকতে পারত না। একা থাকলেই সে যেন তার নিজের অস্তিত্বকে নিজেই খুঁজে পেত না। মনে হত সে যেন কোন অজানায় হারিয়ে গেছে চিরতরে। তাই সে চাইত কনি তার কাছে সব সময় থাকুক, তার জীবনের চলমান অস্তিত্বকে প্রকটিত করে তুলুক তার কাছে।

এত কিছু সত্ত্বেও একটা উচ্চাভিলাষ ছিল ক্লিফোর্ডের। সে গল্প লেখা শুরু করেছিল। সে যাদের কথা ভালভাবে জানত তাদের সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গল্প লিখত সে। সে লেখার মধ্যে চাতুর্য ছিল ; আবার কিছু বিদ্বেষও ছিল কিছু মানুষের প্রতি। তবে সেগুলি রহস্যময়ভাবে অর্থহীন। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং অদ্ভুত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, ছিল না কোন সংস্পর্শের নিবিড়তা। মনে হত গল্পবর্ণিত সব ঘটনা ঘটেছে শূন্যে। যেহেতু বর্তমান জীবন কৃত্রিম আলোয় ভরা এক রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেইহেতু তার আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে গল্পগুলোর একটা আবেদন ছিল। আধুনিক মানুষের মনের সঙ্গে তার একটা মিল ছিল।

বিশেষ করে তিনটি গল্পের প্রতি ক্লিফোর্ড ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। এ

বিষয়ে তাকে কিছু অপ্রকৃতিস্থ দেখাত। সে চাইত সকলেই ঐ গল্পগুলোর প্রশংসা করুক। ওগুলো এক বিশেষ ও অতিরিক্ত একটি গুণে ভূষিত। গল্পগুলি আধুনিক কতকগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাগুলি বিদগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই পায়। কিন্তু ক্লিফোর্ডের কাছে নিন্দাটা তার বুকে শেলের মত বেঁধে। তার মনে হত কে যেন ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে তার বুকে। তার মনে হত তার সমগ্র সত্তাটা গল্পের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কনি যতদূর পারত সাহায্য করত তাকে। প্রথম প্রথম এতে রোমাঞ্চ জাগে তার দেহে। সে জোর করে কনির সঙ্গে সব বিষয়ে একটানা কথা বলে যেত। তাকে জোর করে বসিয়ে রেখে কথা বলত এবং কনিকে বাধ্য হয়ে তার কথায় সাড়া দিতে হত। তার মনে হত তার দেহ, আত্মা আর তার যৌন জীবন যেন জাগ্রত হয়ে সেই গল্পগুলির মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। একথা মনে করে রোমাঞ্চ জাগত তার দেহে। তাদের দেহগত সংসর্গ বলতে কিছুই হত না। কনিকে বাড়ির সব কিছু তত্ত্বাবধান করতে হত। অবশ্য এ বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য অনেক আগে হতেই একজন ঝি ছিল। সে স্যার জিওফ্রের আমল থেকে চল্লিশ বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করে আসছে। খাবার পরিবেশন থেকে সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে করে আসছে। মেয়েটির বয়স হয়েছিল। কিন্তু ওর এই বয়োপ্রবীণতাটাই একেবারে ভাল লাগত না কনির। ও তাই সংসারের সব কিছু তারই উপর ছেড়ে দিত। বিরাট প্রাসাদের অসংখ্য শূন্য অব্যবহৃত ঘরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি সব কাজ যান্ত্রিকভাবে চলত। বাড়ির সব কাজ যন্ত্রচালিত কাজের মত হয়ে যায়। তবু ক্লিফোর্ড একজন অভিজ্ঞ রাঁধুনিকে জোর করে নিযুক্ত করল। রাঁধুনি মানে একজন বয়স্ক মহিলা যে মহিলা ক্লিফোর্ড লণ্ডনের একটি বাড়িতে থাকাকালে তার সেবা করে। সারা সংসারের মধ্যে মাত্র এইটুকু পরিবর্তন ছাড়া আর সব কিছুই যথারীতি চলতে লাগল। কিন্তু কনির কাছে এই চলাটা এক যান্ত্রিক অরাজকতা বলে মনে হত। ঘর পরিষ্কারের কাজ, রান্নাবান্নার কাজ যন্ত্রের মত হয়ে যায়। সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই হয়ে যায়! যথাসময়ে এক সুকঠোর নিষ্ঠা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সব কিছু হয়ে যায়। তবু কনির মনে হয় এটা নিয়মিত বা নিয়মমাফিক অরাজকতা। এর মধ্যে প্রাণ নেই। কোন অনুভূতির উত্তাপ তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ককে উত্তপ্ত ও নিবিড় করে তুলতে পারেনি। পরিত্যক্ত রাজপথের মতই বাড়িটাকে নীরস ও নির্জন মনে হত কনির।

বাড়ির সব ব্যাপারগুলোকে এইভাবে চলতে না দিয়েই বা কি করবে সে? মিস চ্যাটার্লি তার অভিজাতসুলভ সরু মুখখানা নিয়ে মাঝে মাঝে আসত। এসে যখন দেখত বাড়ির ভিতর আগের থেকে কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি তখন একটা জয়ের উল্লাস অনুভব করত। কনি তার ভাইএর সঙ্গে মনের দিক

থেকে তার যোগসূত্রটা ছিন্ন করে দিয়েছে, তার ভাইএর সঙ্গে তার আগেকার সেই অন্তরঙ্গতা আর নেই, এজন্য সে কনিকে ক্ষমা করতে পারেনি। অথচ সে অর্থাৎ এম্মা আর ক্লিফোর্ড এই দুজনেই বিরাট চ্যাটার্লি পরিবারের বংশগত ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। সুতরাং এম্মারই উচিত ছিল এ পরিবারের অতীতের যত সব অদ্ভুত কাহিনী বলে ক্লিফোর্ডকে গল্প লিখতে সাহায্য করা।

কনির বাবা একবার র‍্যাগবিতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি একদিন কনিকে গোপনে বললেন, ক্লিফোর্ডের লেখা গল্পগুলোর মধ্যে কিছুই নেই। এগুলো টিকবে না।

কনি তার বাবার কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা বুঝতে না পেরে সে তার বড় বড় নীল চোখদুটো তুলে তার বাবার পানে অপার বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বলল, গল্পগুলোর মধ্যে একেবারে কিছু নেই, তার বাবার একথার মানে কি। তাতে কিছু যদি না থাকবে তাহলে সমালোচকরা তার প্রশংসা করবে কেন? তাহলে ক্লিফোর্ডই বা এত নাম করছে কি করে আর তার থেকে টাকাই বা পাওয়া যায় কি করে? ক্লিফোর্ডের লেখার মধ্যে কিছু নেই একথার মানে কি বোঝাতে চাইছেন তার বাবা? তাহলে তার মধ্যে কি আছে?

আজকালকার যুবক যুবতীরা যা বলে কনির কথাও হলো তাই। তাদের মধ্যে জগৎ ও জীবনে সব সত্যই তাৎক্ষণিক। প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছে। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত স্বতন্ত্র, স্বয়ংসিদ্ধ, একটির পর একটি করে পরপর বয়ে চলেছে; কিন্তু কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই।

র‍্যাগবিতে আসার পর দ্বিতীয় বছরে শীতকালে কনিব বাবা একবার এসে তাকে বললেন, অবস্থার দ্বারা বাধ্য হয়ে তুমি নিশ্চয় আধা কুমারী অবস্থায় জীবন কাটাবে না?

কনি অস্পষ্টভাবে উত্তর করল, আধা কুমারী! কেন, কেন নয়?

তার বাবা তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অবশ্য তুমি যদি এটা না চাও।

ক্লিফোর্ডকেও একদিন দুজনে বেড়াবার সময় একই কথা বলল কনির বাবা। বলল, আমার মনে হয় এইভাবে আধা কুমারী থাকাটা কনির পক্ষে নিশ্চয়ই শোভা পাবে না।

প্রথমে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলল, আধা কুমারী! তাবপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে রাগে লাল হয়ে উঠল। ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, কোন্ অর্থে এটা তার পক্ষে শোভা পাচ্ছে না?

কনির বাবা বলল, সে ত আর রোগা পটকা ছোট একটা মেয়ে নয়। হাড় শক্ত বলিষ্ঠ চেহারার সে এক স্কটদেশীয় যুবতী।

ক্লিফোর্ড বলল, সেই সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক নিশ্চয়?

এই আধা কুমারীর ব্যাপারটা সম্বন্ধে ক্লিফোর্ডও কিছু বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বলতে পারেনি। কারণ একদিকে সে যেমন কনির সঙ্গে ছিল বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ, অন্যদিকে তেমনি কোন অন্তরঙ্গতাই ছিল না তার কনির সঙ্গে। মনের দিক থেকে তারা দুজনেই ছিল পরস্পরের খুব কাছাকাছি, দুজনে দুজনের গভীরভাবে অন্তরঙ্গ, কিন্তু দেহগত সম্পর্কের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। দেহের দিক থেকে তারা ছিল পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। মনের দিক থেকে এত অন্তরঙ্গ হয়েও তাদের মধ্যে কোন দেহগত সম্পর্ক না থাকায় দেহগত আনন্দের ব্যাপারে কোন কথা তুলতে পারত না। তুলতে দারুণ একটা দ্বিধা বোধ করত তারা।

কনি এটা অনুমান করেছিল যে তার বাবা যেকথা বলতে চেয়েছেন সেকথা ক্লিফোর্ডের মনে আগেই জেগেছে। সে জানত সে আধা কুমারী থাক বা না থাক তাতে ক্লিফোর্ডের কিছু যায় আসে না, কারণ তার কুমারী-জীবনের সব কথা, তার যৌন অভিজ্ঞতার কথা সে কিছুই জানে না আর সে তা জানে না বলেই তা মিথ্যা তার কাছে।

কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে র‍্যাগবির বাড়িতে দু' বছর ধরে বাস করে আসছে। তাদের কাজ বলতে শুধু ক্লিফোর্ড আর তার লেখার কাজে মগ্ন হয়ে থাকা। কিন্তু তাদের এই মগ্নতার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি ছিল, একটা শূন্যতা ছিল। এই লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যৌথ আগ্রহের ধারাটি থেমে যায়নি কখনো। তারা এই লেখার রচনাশৈলী নিয়ে কথা বলত, তর্কবিতর্ক করত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করত শূন্যে কোথায় কি যেন একটা ঘটছে, কিন্তু সেটা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

আসলে জীবন বলতে যা বোঝায় তা বোধ হয় আছে সেই দুরান্বিত শূন্যে। তার বাইরে অর্থাৎ বাস্তবে যে জীবন তারা যাপন করে চলেছে আসলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। সেই র‍্যাগবি ঠিকই আছে, বাড়ির মধ্যে আছে ঝি চাকর। কিন্তু তারা যেন সব ভূতুড়ে মানুষ। আসলে তাদের যেন কোন অস্তিত্ব নেই। কনি প্রায়ই পার্ক ও পার্কসংলগ্ন বন দিয়ে বেড়াতে যায় এবং সে বনের নির্জনতা ও রহস্যময়তাকে উপভোগ করে। যাবার পথে হেমন্তের বাদামী ঝরা পাতা মাড়িয়ে যায়, বসন্তের গোলাপ কুড়িয়ে নেয় হাতে। কিন্তু এ সব স্বপ্নমাত্র, বাস্তবের নকল মূর্তিমাত্র। যে সব ওক পাতা ও দেখছে তা আয়নায় দেখা আসল ওক পাতার প্রতিফলনমাত্র। সে নিজেও যেন বইয়ে পড়া গোলাপ ফুল কুড়ুতে থাকা কোন নারী চরিত্রমাত্র। একটা ছায়া বা বাস্তবের কাল্পনিক প্রতিরূপমাত্র। কোন বস্তু নেই তার মধ্যে, নেই কোন প্রাণের স্পর্শ। কোন কিছুর মধ্যে কোন বস্তু নেই। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার এই জীবনযাপন, মাকড়সার মত এক অন্তহীন জাল বুনে চলা, সব সময় এক খণ্ড চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলা, আর সেই সব গল্প শুনে চলা যাস্থার ম্যাল-কম বলে গেছেন একেবারে অর্থহীন, যার মধ্যে কোন বস্তু নেই এবং যা টিকবে

না। কিন্তু কেন তার মধ্যে বস্তু থাকবে এবং কেনই বা তা টিকবে? যে জিনিস যত বেশী টেকে তার মধ্যে তত বেশী অশুভ শক্তির জন্ম হয়, তার মধ্যে সত্য তত কম থাকে। আজকের এই মুহূর্তের জন্য সত্যের প্রতিভাসটুকুই যথেষ্ট।

ক্লিফোর্ডের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, ছিল অনেক পরিচিত ব্যক্তি। সে তাদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করত তার র‍্যাগবির বাড়িতে। সে সব রকম লোকদেরই নিমন্ত্রণ করত, বিশেষ করে সেই সব সমালোচক আর লেখকদের যারা তার লেখা বইএর প্রশংসা করবে অথবা আলোচনার দ্বারা মানুষকে তা বুঝতে সাহায্য করবে। তারা র‍্যাগবিতে নিমন্ত্রিত হওয়ার জন্য গর্ববোধ করত। তারা সত্যি সত্যিই ক্লিফোর্ডের লেখার প্রশংসা করত। কনি সব কিছু ভালভাবেই বুঝত। কিন্তু কিছু মনে করত না। সে ভাবত কেন তা হবে না? এই সব কিছুই ত আয়নায় প্রতিফলিত চলমান ক্রমবিলীয়মান এক জীবনধারার ছবি। সব কিছু মিথ্যা। সুতরাং এতে দোষের কি থাকতে পারে?

কনি এই সব লোকদের দেখাশোনা করত। গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাকেই আপ্যায়িত করতে হত নিমন্ত্রিতদের। ক্লিফোর্ডের অভিজাত বংশের যত সব আত্মীয় কুটুম্ব এলেও সে-ই সবার দেখাশোনা করত। তার চেহারাটা নরম রক্তিম আর গ্রাম্য বালিকার মত দেখতে। তার চোখদুটো ছিল নীল, বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল আর মেদুর কণ্ঠস্বর। তার কটিদেশ ছিল বেশ শক্ত। সেই জন্য তাকে অনেকে সেকেলে আর একটু বেশী মেয়েলি ভাবাপন্ন বলত। আবার ছেলেদের মত ছোট্ট হেরিং মাছের মত ছিল না। কিন্তু তার বুকটা ছিল ছেলেদের মতই সমতল আর নিতম্ব ছিল খুবই সরু।

কনির ভাল লাগত সেই সব লোকদের যারা যৌবনকাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছে। কিন্তু সে যদি তাদের সঙ্গে ক্ষণপ্রণয়ের খেলায় মেতে ওঠে তাহলে মনে মনে কতখানি কষ্ট ও যন্ত্রণা পাবে ক্লিফোর্ড সে তা জানত বলেই সে তাদের প্রতি কোন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাত না। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন মেলামেশা ছিল না তার। সে ছিল তাদের কাছে যেমন শান্ত তেমনি নিরুত্তাপ। সে তাদের কাউকে কখনো চাইত না। তাই ক্লিফোর্ড তার স্ত্রীর জন্য গর্ব অনুভব করত।

ক্লিফোর্ডের আত্মীয়রা কনিকে একটু দয়ার চোখে দেখত। কনি বুঝত মানুষ যতক্ষণ না তোমার কাছ থেকে কোন বিষয়ে ভয় না পাবে ততক্ষণ সে তোমায় ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু এতে তার কিছুই যেত আসত না। কারণ তাদের সঙ্গে কোন নিবিড় সংস্পর্শ ছিল না। তাই সে নীরবে সব কিছু সহ্য করে তাদের বুঝিয়ে দিল তাকে দয়া করে বা ঘৃণা করে তাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না। তার সঙ্গে বিরোধিতা বা শত্রুতা করে কোন লাভ হবে না। আসলে তার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে।

দিন কেটে যেতে লাগল। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। কিন্তু কনির মনে হতে লাগল কিছুই ঘটছে না। কারণ সব কিছুর থেকেই সে ছিল সুন্দরভাবে বিচ্ছিন্ন। আসলে ক্লিফোর্ড আর কনি বেঁচে ছিল তাদের ভাবের মধ্যে, ডুবে থাকত ক্লিফোর্ডের লেখা বইএর মধ্যে। সে সবাইকে আপ্যায়ণ করে···বাড়িতে সব সময়ই লোক আসে। ঘড়ির মতই সময় এগিয়ে চলে। সাড়ে সাতটার বদলে সাড়ে আটটা বাজে।

অধ্যায় ৩

এক ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রতি ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছিল কনি। তার বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে উদ্ভূত হয়ে একটা অস্থিরতা উন্মত্ততার মতই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার সমগ্র দেহমনকে। সে ইচ্ছা না করলেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যখন মুচড়ে উঠত। যখন স্থির হয়ে আরামে বসে থাকতে চাইত তখন তার মেরুদণ্ডটা কেঁপে কেঁপে উঠত। তার দেহের মধ্যে পেটের ভিতরে অকারণে একটা রোমাঞ্চ জাগত আর ঠিক তখনি তার মনে হত এই উন্মাদসুলভ অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে অবশ্যই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে হবে। অকারণে তার বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দনটা বেড়ে যেত। তার শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল।

শুধু একটা অস্থিরতা, একটা উন্মাদনা। মাঝে মাঝে সে ক্লিফোর্ডকে ছেড়ে বেগে পার্কের দিকে চলে যায়, পাতাবাহার গাছের তলায় শুয়ে পড়ে। এ বাড়ি, আর এ বাড়ির সকলের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে তাকে। ঐ বনই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল, জগতের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র জায়গা।

কিন্তু আসলে জায়গাটা তার আশ্রয়স্থল হতে পারে না কারণ জায়গাটার সঙ্গে তার কোন নিবিড় যোগাযোগ নেই। আসলে এ বন এমনই একটা জায়গা যেখানে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে উঠতে পারে। বনের আত্মা বলে যদি কোন জিনিস থেকে থাকে তাহলে সে আত্মা সে কোনদিনই স্পর্শ করেনি।

অস্পষ্টভাবে একটা কথা জানতে পারল কনি। জানতে পারল, সে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সে অস্পষ্টভাবে আরও জানল জগতের প্রাণকেন্দ্র হতে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। ক্লিফোর্ড আর তার বইকে কেন্দ্র করে যে জগৎ সে গড়ে তুলেছে সে জগতের আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। সে জগতে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। শূন্যতার শূন্য। সে জানতে পেরেছে সব কিছু। কিন্তু কি লাভ তাতে? পাথরে মাথা ঠোকার মত এ যেন এক অর্থহীন প্রয়াস।

তার বাবা আবার তাকে সাবধান করে দিলেন। তিনি একদিন বললেন,

তুমি কেন কোন এক সুন্দর ছেলে দেখে বিয়ে করছ না কনি? তাতে তোমার যথার্থ কল্যাণ হবে।

সেবার শীতকালে মাইকেলিস কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এল ওদের বাড়িতে। এরই মধ্যে সে তার লেখা নাটক আমেরিকায় বিক্রি করে প্রচুর টাকা করেছে। সে ছিল এক আইরিশ যুবক। অভিজাত সমাজ নিয়ে লেখা তার নাটক লণ্ডনের অভিজাত সমাজের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। পরে যখন অভিজাত সমাজের লোকেরা বুঝতে পারে এই সব নাটকে ডাবলিনের এক ভবঘুরে যুবক তাদের উপহাসের পাত্র করে তুলেছে তখন তারা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। তাদের চোখে মাইকেলিস তখন নীচতা ও ইতরতার প্রতীক। আরও দেখা গেল, সে নাকি ইংরেজবিদ্বেষী এবং যে শ্রেণীর লোকেরা এটা আবিষ্কার করল তারা মাইকেলিসের কাজটাকে জঘন্যতম অপরাধের থেকে খারাপ কাজ বলে মনে করতে লাগল। তাই তারা মনে মনে তাকে জ্যান্ত জবাই করে তার লাসটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

এই সব কিছু সত্ত্বেও মাইকেলিস মেফেয়ারে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতে লাগল। সে বণ্ড স্ট্রীট দিয়ে চকচকে পোষাক পরে একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের মতই ঘুরে বেড়াত। পয়সা দিলে দর্জিরা ভাল পোষাক তৈরি করে দেবেই।

এই যুবকের কর্মজীবনে সবচেয়ে দুঃসময়ে ক্লিফোর্ড তাকে আমন্ত্রণ জানাল তার বাড়িতে। সব কিছু জেনে শুনেও কোন দ্বিধা করল না সে এ বিষয়ে। মাইকেলিসের কথা তখন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শুনেছে। ক্লিফোর্ড ভাবল তার এই দুঃসময়ে অভিজাত সমাজের অন্য সব লোকেরা যখন তার গলা কাটছে তখন সে তাকে আমন্ত্রণ জানালে ঠিক সে আসবে। আর মাইকেলিস নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে ক্লিফোর্ডের কাছে। এই কৃতজ্ঞতার জন্য সে হয়ত তার অনেক উপকার করবে আমেরিকা গিয়ে। কোন মানুষের মধ্যে কোন পদার্থ না থাকলেও শুধু প্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ক্লিফোর্ড নবাগত। সে উদীয়মান লেখক, তবু তার প্রচার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এবং কুশলী। অবশেষে মাইকেলিস তার একটা বড় উপকার করে। একটা নাটকে সে ক্লিফোর্ডকে নায়ক হিসাবে চিত্রিত করে। ক্লিফোর্ড হঠাৎ জনপ্রিয় নায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে যখন সে দেখল আসলে তাকে উপহাসের পাত্র করে তোলা হয়েছে তখন এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার মনে।

যে জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই তার, যে জগৎ তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা, সেই বিশাল জগতের মাঝে ক্লিফোর্ডের নিজেকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলার এক অন্ধ অত্যুগ্র প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কনি। আসলে যে জগৎকে কিছুটা ভয়ের চোখে দেখে ক্লিফোর্ড, সেই জগতেই সে একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসাবে নাম করতে চায়। তার বাবা বৃদ্ধ স্যার ম্যালকমের কথা থেকে কনি আগেই জেনেছিল শিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের ঢাক পিটিয়ে

নিজেদের মাল চালাবার জন্য বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে বাবা কথাটা বলেছিল সেই সব শিল্পীদের সূত্র ধরে যারা নিজেদের ছবি নিজেরাই বিক্রি করে বেড়াত। এদিকে ক্লিফোর্ড আত্মপ্রচারের এক অভিনব ফন্দি খুঁজে পায়। সব রকমের উপায়ই পেয়ে যায় সে। নিজেকে কারো কাছে ছোট না করে তার র‍্যাগবির বাড়িতে সব রকমের লোককেই আমন্ত্রণ জানাত সে। আসলে নামযশ বা আত্মখ্যাতির এক বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে সে আর এজন্য হাতের কাছে যে ভাঙ্গা পাথরটা পেত তাকেই কাজে লাগাত।

যথাসময়ে মাইকেলিস এসে হাজির হলো। সে এল একটি চকচকে গাড়িতে করে, একজন চালক আর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। সে যেন খাঁটি বণ্ড স্ট্রীটের লোক। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ডের গ্রাম্য ভাবাপন্ন অন্তরে কেমন যেন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তার মনে হলো মাইকেলিসকে বাইরে যেমনটি দেখাচ্ছে আসলে সে যেন ঠিক তা নয়, ...মোটেই তা নয়। তবু লোকটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করল ক্লিফোর্ড, তার বিস্ময়কর সাফল্যকে সহজ-ভাবে মেনে নিল। সাফল্যের যে গর্জনশীলা কুক্কুরীদেবী আধা-বিনীত ও আধা-দুর্বিনীত ক্লিফোর্ডের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল, সে দেবীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। কারণ সে নিজেও নিজেকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছিল সে দেবীর কাছে। কারণ সে দেবী চাইলে সেও সাফল্য লাভ করবে।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে দামী পোষাক, টুপী, জুতো প্রভৃতি কিনে পরলেও এবং সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে চুল দাড়ি ছাঁটা সত্ত্বেও সে পুরোপুরি ইংরেজ হয়ে উঠতে পারেনি। তাকে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় সে ইংরেজ নয়। তার গোলগাল ম্লান মুখখানার ভাব দেখলেই বোঝা যায় কোথায় যেন একটা গলদ আছে। বোঝা যায় কার বিরুদ্ধে তার যেন একটা বিদ্বেষ আছে, কার বিরুদ্ধে তার যেন একটা অভিযোগ আছে। এ ভাব যে কোন সত্যিকারের ইংরেজের থাকে। কিন্তু সে তার হাবভাব বা আচরণে কখনো সেটা প্রকাশ করে না। তাকে দেখে বোঝা যায় সে অনেক ঘা খেয়েছে, অনেক পদাঘাত সে সহ্য করেছে, তাই চোখে আহত পশুর ত্রস্ত ভাব। সে তার বুদ্ধি আর দক্ষতার দ্বারা নাটক লিখে সাফল্য অর্জন করে। জনগণের হৃদয় জয় করে। আজ তাই মাইকেলিস ভাবে তার অপমানের দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক তা হয়নি। মাইকেলিস এখন ইংরেজ অভিজাত সমাজে উঠতে চাইছে। অথচ এই অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই একদিন তাকে পদাঘাত করে। তারা তার দুঃখে মজা দেখে। আজ তাই সে তাদের ঘৃণা করে। আজ সে তাদের সমাজে উঠে তাদের দেখিয়ে দিতে চায়।

তবু ভাবলিনের এই খচ্চরটা তার চকচকে গাড়ি আর তার চাকর সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মাইকেলিসের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা কনি পছন্দ করত। সে কোন বিষয়ে কোন ভাণ করত না। কোন কপটতা ছিল না তার মধ্যে। ক্লিফোর্ড তার কাছে যা যা জানতে চাইত সেই সেই বিষয়ে সে সংক্ষেপে সুন্দর-ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলত। সে বেশী কথা বলত না। অথবা আবেগে বিগলিত হত না। সে জানত র‍্যাগবিতে তাকে কোন্ কাজের জন্য ডাকা হয়েছে। সেও তাই সুচতুর বড় ব্যবসায়ীর মত সব প্রশ্ন চুপ করে ধৈর্য্য ধরে শুনে যথাসম্ভব অল্প কথায় কোন আবেগানুভূতির অপচয় না করেই উত্তর দেয়।

সে বলল, টাকা! টাকা এক ধরনের প্রবৃত্তি। টাকা রোজগার করা, টাকা সঞ্চয় করা মানুষের স্বভাবের একটা ধর্ম। আসলে এর মধ্যে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। তোমার স্বভাবের বশেই তুমি টাকা রোজগার করে যাবে। একবার শুরু করলেই হলো। আপনা থেকে তুমি টাকা সঞ্চয় করে যাবে। তারপর একটা সীমায় গিয়ে থেমে যাবে।

ক্লিফোর্ড বলল, আপনি ত শুরু করেছেন সবেমাত্র।

হ্যাঁ ঠিক তাই। একবার শুরু করলে আর রক্ষে নেই। তখন আর কোন কাজ করতে পারবেন না।

ক্লিফোর্ড প্রশ্ন করল, আচ্ছা, নাটক ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা কি আপনি টাকা রোজগার করতে পারতেন?

সম্ভবতঃ তা নয়। আমি ভাল লেখক হিসাবে ভাল বা মন্দ যাই হতাম তাতে কিছু যেত আসত না। আমি লেখক এবং নাট্যকার বলেই এই টাকা রোজগার সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

কনি বলল, আপনি কি মনে করেন লোকে যে ধরনের নাটক চায় সেই ধরনের নাটক লিখতে হবে?

ঠিক তাই। কনির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে উত্তর দিল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, তবে কি জানেন? জনপ্রিয়তার কোন দাম নেই। কিছুই নেই জনপ্রিয়তার মধ্যে। আমি আমার নাটকগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কিছুই করিনি। জনপ্রিয়তা ব্যাপারটাই বড় ক্ষণভঙ্গুর। ঠিক আবহাওয়ার মত। কখন কোন্ দিকে মোড় ফিরবে কেউ জানে না।

এক অপরিসীম মোহমুক্তির স্বচ্ছ গভীরতায় স্থির দুচোখের পূর্ণায়ত দৃষ্টি কনির উপর এমনভাবে ফেলল মাইকেলিস যে কনির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল সহসা। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার অসুখ হয়েছে। শিলা-ভূগর্ভনিহিত বিভিন্ন স্তরের মত মোহমুক্তির যে সব স্তর আছে তার জীবনে তার গভীরে ঢুকে গেছে সে। তার জীবনের যত কিছু অভিজ্ঞতা এই মোহমুক্তির শিলাস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার উপর সে শিশুর মত একা। সে যেন সমাজচ্যুত। কিন্তু তার এই ইঁদুরসুলভ অস্তিত্বের মাঝে তার একটা বেপরোয়া ভাব আছে। আছে অপরিসীম সাহস।

ক্লিফোর্ড কি ভাবতে ভাবতে বলল, অন্ততঃ আপনি এই বয়সে যা করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

হঠাৎ এক অদ্ভুত হাসি হেসে মাইকেলিস বলে উঠল, হ্যাঁ আমার বয়স তিরিশ।

মাইকেলিস হাসছিল, কিন্তু হাসিটার মধ্যে জয়ের একটা গর্ব থাকলেও সে হাসি ছিল যেমন অসার তেমনি তিক্ত।

কনি প্রশ্ন করল, আপনি কি একা?

মাইকেলিস বলল, কি বলছেন আপনি? আমি একা বাস করি? আমার চাকর আছে। সে বলে জাতিতে গ্রীক। কিন্তু আসলে সে অপদার্থ। তবু আমি তাকে রেখেছি। আমি বিয়ে করতে চলেছি। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।

কনি এবার জোর হেসে উঠল। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি টনসিল অপারেশন করতে চলেছেন। বিয়ে করবেন ত আবার চেষ্টার কি আছে?

কনির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল মাইকেলিস। বলল, বিশ্বাস করুন লেডি চ্যাটার্লি, যেমন করে হোক আমি একটা মেয়ে খুঁজে পাবই। তবে আমি কোন ইংরেজ বা আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করতে পারব বলে মনে হয় না।

ক্লিফোর্ড বলল, তাহলে এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করুন।

আগের মতই এক অসার হাসি হেসে মাইকেলিস বলল, আমেরিকান? না না। আমি আমার লোকটিকে বলে দিয়েছি একজন তুর্কী বা প্রাচ্যদেশীয় মেয়ে খোঁজার জন্য।

এক অসাধারণ সাফল্যে সমৃদ্ধ এই অদ্ভুত মানুষটাকে দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেত কনি। লোকে বলত শুধু আমেরিকা থেকেই সে নাকি বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পায়। মাঝে মাঝে পাশ থেকে বা নিচের থেকে আলোটা যখন তার উপর লম্বভাবে পড়ে তখন তাকে খুব সুন্দর দেখায়। তার খোদাই করা মুখ, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল, বড় বড় চোখের পূর্ণায়ত দৃষ্টি—সব মিলিয়ে তাকে সুন্দর দেখায়। তার ঠোঁটচাপা মুখের মধ্যে আছে এক যুগ হতে যুগান্তের গতিহীন অন্তহীন এক স্তব্ধতা। এই অবিচল স্তব্ধতা মুখের উপর ফুটিয়ে তোলার জন্য বুদ্ধ কত সাধনা করেছিলেন এবং নিগ্রোরা বিনা চেষ্টাতেই তা পেরেছিল। এই ভাব হচ্ছে জাতিগত। ব্যক্তিগত প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই জাতিগত ভাবটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অকস্মাৎ তার জন্য এক সহানুভূতি অনুভব করল কনি, সহানুভূতির সঙ্গে মিশে ছিল এক ঘৃণা, আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকর্ষণের ভাব। আবার এই মিশ্র অনুভূতি ধীরে ধীরে পরিণত হলো প্রেমে। কিন্তু সে বাইরের লোক। লোকে তাকে বলে ইতর। কিন্তু তার থেকে ক্লিফোর্ড কত ইতর, প্রভুত্বমূলক। তাছাড়া কত নির্বোধ।

মাইকেলিসও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কনির উপরেই সে এই ক'দিনেই একটা রেখাপাত করেছে। সে তার বিস্ফারিত চোখের আরও উজ্জ্বল ও অনাসক্ত দৃষ্টি কনির উপর নিবদ্ধ করে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তার মনের উপর কতখানি প্রভাব সে বিস্তার করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সে বুঝল, ইংরেজদের সঙ্গে যত মেলামেশাই করো তারা পরকে আপন করে নিতে পারে না, ভালবাসাবাসি সত্ত্বেও তাদের কাছে বাইরের লোক হিসাবেই থাকতে হয়। তাকেও তাই থাকতে হবে। তবু মেয়েদের মন মানে না। এই বাইরের লোককেই মাঝে মাঝে ভালবাসে তারা। ইংরেজ মহিলারাও তাই করে।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার আসল সম্পর্কটা কি তা সে জানত। তারা যেন দুটি বিক্ষুব্ধ কুকুর, একে অন্যের প্রতি গর্জনে ফেটে পড়তে চাইত। আবার তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে জোর করে দেঁতো হাসি হাসত একে অন্যকে দেখে। কিন্তু মেয়েদের কাছে সে এই মনের জোর খুঁজে পেত না।

শোবার ঘরেই সবাইকে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হত। দুপুরের খাওয়ার সময় ছাড়া ক্লিফোর্ড খাবার ঘরে আসত না। সকাল থেকে দুপুর পযন্ত তাই কেমন যেন নীরস ও নিরানন্দ দেখাত খাবার ঘরটাকে। কফি খাওয়ার পর মাইকেলিস আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। অথচ ভেবে পেল না সে কি করবে। সেদিন ছিল নভেম্বরের কোন এক উজ্জ্বল দিন। র‍্যাগবিকে এই সব দিনে ভালই দেখায়। সহসা বিষণ্ণ নির্জন পার্কটার পানে একবার তাকাল মাইকেলিস। কী চমৎকার জায়গা।

সে একবার তার চাকরকে লেডি চ্যাটার্লির কাছে পাঠাল। জানতে চাইল তার কোন প্রয়োজন আছে কি না। তার ইচ্ছা ছিল সে শেফিল্ড যাবে গাড়িতে করে বেড়াতে। খবর এল, সে একবার লেডি চ্যাটার্লির বসার ঘরে গেলে ভাল হয়।

কনির বসার ঘরটা চারতলায়। এইটাই হচ্ছে এ বাড়ির শেষ তলা। ক্লিফোর্ডের ঘরগুলো একতলায়। লেডি চ্যাটার্লির চারতলার ঘরে মাইকেলিসের ডাক পড়ায় তার গর্ববোধ হচ্ছিল। সে চাকরের পিছু পিছু অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল। তার আশেপাশে কোন দিকে একবার তাকালও না। কনির বসার ঘরে বেনোয়ার আর সেজামির দুটো ছবি দেখল।

মাইকেলিস তার মুখে অদ্ভুত এক কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলল, এ জায়গাটা ত চমৎকার! আপনি এই উপরতলাটা বেছে নিয়ে খুব ভাল করেছেন।

কনি বলল, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সারা বাড়িটার মধ্যে একমাত্র এই ঘরটাই আধুনিক আসবাবপত্র ও আনন্দের আধুনিক উপকরণে সজ্জিত। সারা র‍্যাগবির মধ্যে এইখানেই কনির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত। ক্লিফোর্ড এ সব কোন

দিন দেখেনি এবং এখানে কাউকে বড় একটা ডাকে না কনি।

ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের দুধারে কনি আর মাইকেলিস বসে কথা বলতে লাগল দুজনে। কনি মাইকেলিসকে তার বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। তার বাবা, মা ও ভাইএর কথা। বাইরের যে কোন লোক, ভিন্ন শ্রেণীর যে কোন লোক এক পরম বিস্ময়ের বস্তু তার কাছে। কিন্তু যখনি এই ধরনের কারো প্রতি তার সহানুভূতি জাগত তখনি সে শ্রেণীগত সব পার্থক্য ভুলে যেত। সরলভাবে কোন ভাণ না করে সব কথা বলল মাইকেলিস। সঙ্গে সঙ্গে তার উদাসীন ভবঘুরে আত্মার কথাটাও ভুলে ধরল সে। তারপর এক অজানিত সাফল্যে প্রতিশোধাত্মক এক গর্বের হাসি হাসল সে।

কনি এক সময় জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি এমন নিঃসঙ্গ পাখির মত ঘুরে বেড়ান কেন ?

মাইকেলিস আবার তার পানে তেমনি তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে তাকাল। সে বলল, কোন কোন পাখি এমনি নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে।

তারপর সাধারণ রসিকতার সুরে বলল, কিন্তু আপনার খবর কি ? আপনি নিজেও কি এক নিঃসঙ্গ পাখির মতই ঘুরে বেড়াচ্ছেন না ?

কথাটা শুনে কিছুটা চমকে উঠল কনি। একটু ভেবে বলল, কিছুটা, আপনার মত পুরোটা নিঃসঙ্গ নই।

মাইকেলিস একটু নীরস হাসি হেসে বলল, আমি কি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ ?

তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টির মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় বিষাদ না ঔদাসীন্য, না মোহমুক্তি, না ভয় কি আছে তা কিছুই বোঝা যায় না।

তার পানে শ্বাসরুদ্ধভাবে তাকিয়ে কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, কেন, আপনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নন ?

কনি অনুভব করল মাইকেলিসের কাছ থেকে একটা তীব্র আবেদন এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে আর সেই আবেদনের আঘাতে সে তার সত্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

আপনি ঠিকই বলেছেন। কথাটা বলেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কনির পানে পাশ থেকে অপাঙ্গে তাকাতে লাগল মাইকেলিস। তার স্থির দৃষ্টির মধ্যে এমন এক অকপট শুভ্রতা ছিল যা আজকাল দেখা যায় না। আর তা দেখে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলল কনি। তার কেবলি মনে হতে লাগল মাইকেলিস যেন তার স্থিরনিবদ্ধ এই দৃষ্টি তার উপর থেকে কথনো ফিরিয়ে না নেয়।

এবার মাইকেলিস তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে কনির পানে তাকিয়ে তার ভিতরের সব কিছু যেন দেখে নিল। তার সত্তার গভীরের সব কিছু বুঝে নিল। হঠাৎ কনির বুকের মধ্যে একটা শিশু কেঁদে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মাইকেলিস বলল, আপনি যে আমার কথা ভাবেন এটা ভাবতে আমার ভয়ঙ্করভাবে ভাল লাগে।

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে কোন রকমে কনি বলল, কেন ভাবব না আপনার কথা ?

মাইকেলিস একটুখানি হাসির শব্দ করে বলল, আচ্ছা, আমি কি আপনার হাতটা মিনিট খানেকের জন্য ধরতে পারি ?

কনির উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল মাইকেলিস। তার মদির দৃষ্টির মধ্যে এমনই এক মায়াময় আবেদন ছিল যা সোজা কনির পেটের ভিতরে গিয়ে আঘাত করল।

কোন কথা না বলে কনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল মাইকেলিসের পানে। হঠাৎ মাইকেলিস উঠে গিয়ে কনির পায়ের তলায় বসে তার পা দুটো দু হাতে ধরে তার পা দুটোর মধ্যে মুখটা মাথাটা রেখে স্থির হয়ে বসে রইল। কনি তার বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে মাইকেলিসের ঘাড়ের উপরটা দেখতে লাগল আর মাইকেলিস তার মুখটা কনির জানুদুটোর উপর ঘষতে লাগল। কনির কেমন ভয় হচ্ছিল। একটা জ্বালা-জ্বালা ভয়ের সঙ্গে কনি মাইকেলিসের ঘাড়ের উপর হাত বোলাতে লাগল। কনির হাতের স্পর্শে মাইকেলিস কেঁপে উঠল।

মাইকেলিস এবার মুখ তুলে তাকাল কনির মুখপানে। তার উজ্জ্বল চোখের সে দৃষ্টির মধ্যে এমন এক ভয়ঙ্কর আবেদন ছিল যা কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারছিল না কনি। তার অন্তরের গভীর থেকে একটা ব্যাকুল কামনা উৎসারিত হয়ে মাইকেলিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল। তার মনে হলো সে এই মুহূর্তে তার সব কিছু দিয়ে দিতে পারবে মাইকেলিসকে।

প্রেমিক হিসাবে মাইকেলিস বড় শান্ত, বড় ভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে সে বড় মার্জিত। এক অদম্য কামনার উত্তাপে বুকটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল যখন ঠিক তখনি এক নিগূঢ় অনাসক্তি পিছন থেকে টেনে ধরে অবদমিত করে রেখেছিল সে কামনাকে। সে কামনার প্রবলতায় একেবারে অন্ধ বা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েনি সে। তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিটি শব্দের প্রতি সে ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

কনি তখন নিজেকে মাইকেলিসের কাছে বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। এদিকে অবশেষে সমস্ত কম্পন থেমে গেল মাইকেলিসের। সে স্থিরভাবে মাথাটা কনির হাঁটুর উপর রাখল। কনি তখন তার হাতের আঙুলগুলো দিয়ে তার কোলের উপর রাখা মাইকেলিসের মাথাটার উপর হাত বোলাতে লাগল।

মাইকেলিস উঠে কনির হাতদুটো চুম্বন করল। তারপর তার উপর ঝুঁকে পড়ে তার চটিপরা পাদুটোও চুম্বন করে ঘরের একপাশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কনির দিকে পিছন ফিরে তাকাল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মাইকেলিস কনির কাছে ফিরে এল।

কনি আগুনের পাশে তখনো সেইভাবেই বসেছিল।

শান্ত কণ্ঠে মাইকেলিস বলল, এবার থেকে আপনি নিশ্চয় ঘৃণা করবেন আমাকে?

কনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কেন ঘৃণা করব?

মাইকেলিস বলল, মেয়েরা সাধারণতঃ তাই করে। বেশীর ভাগ মেয়েই তাই করে।

কনি গম্ভীরভাবে কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল, আমি কখনই আপনাকে ঘৃণা করব না।

কণ্ঠটা করুণ করে মাইকেলিস বলল, আমি জানি তাই হবে। তবু ভীষণ-ভাবে ভয় লাগছে আমার।

কিন্তু মাইকেলিসের দুঃখের কারণটা কোথায় কনি তা বুঝতে পারল না। সে সহজভাবে বলল, আপনি আর বসবেন না?

মাইকেলিস দরজার পানে তাকাল। সে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড···তিনি রাগ করবেন না ত?

কনি তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ক্লিফোর্ডকে এসব কথা জানাতে চাই না। সে জানলে ব্যথা পাবে। কিন্তু এতে কোন অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি কি মনে করেন?

মাইকেলিস বলল, অন্যায়! হা ভগবান, অন্যায় কিসের? আপনাকে আমার দারুণ ভাল লাগছে। ··আমি আর থাকতে পারছি না।

মাইকেলিস ঘুরে দাঁড়ালে কনি দেখল তার চোখদুটো ছলছল করছে। একটু পরেই সে হয়ত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ডকে জানাবার কোন দরকার নেই। জানলে সে খুব দুঃখ পাবে। না জানলে কোন সন্দেহও করবে না আর কোন ব্যথাও পাবে না।

মাইকেলিস হেসে বলল, আমার কাছ থেকে উনি কিছুই জানতে পারবেন না। আমি কখনো নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দেব না।

এ ধরনের ধারণাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল সে। তার পানে তাকিয়ে তার রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। মাইকেলিস এবার বলল, আমি কি আপনার হাতদুটো একবার চুম্বন করে চলে যেতে পারি? আমি একবার শেফিল্ড যাব। সেখানে গিয়েই লাঞ্চ খাব। তারপর চা খাবার সময় ফিরে আসব। আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি? আপনি যে আমাকে ঘৃণা করেন না এবং কোনদিন ঘৃণা করবেন না এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি ত?

কথাটার মধ্যে কেমন একটা সকরুণ হতাশার সুর ছিল।

কনি বলল, না, আমি আপনাকে ঘৃণা করি না। আমার মতে আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক।

উৎসাহিত হয়ে মাইকেলিস বলল, ভালবাসার কথার থেকে এ কথাটা আমার

কাছে অনেক দামী।···বিকালের আগে আর আমাদের মধ্যে দেখা হবে না। এর মধ্যে আমি অনেক কিছু ভাবতে পাব।

এই কথা বলে কনির হাতদুটো চুম্বন করে চলে গেল মাইকেলিস।

লাঞ্চ খাবার সময় ক্লিফোর্ড বলল, ছোকরাটাকে আর আমার ভাল লাগছে না। আমি ওকে সহ্য করতে পারব বলে মনে হয় না।

কনি বলল, কেন?

ক্লিফোর্ড বলল, লোকটা ভদ্র আচরণের অন্তরালে একটা ইতর ছাড়া কিছুই নয়।·· আমাদের ঠকাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

কনি বলল, লোকে অন্যায়ভাবে অনেক বাজে কথা বলে ওঁর সম্বন্ধে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি এতে আশ্চর্য হচ্ছ? তুমি কি মনে করো ও সময় নষ্ট করে পরের উপকার করে যাচ্ছে?

আমার মনে হয় এক ধরনের উদারতা ওর মধ্যে আছে।

উদারতা, কার প্রতি?

আমি তা ঠিক জানি না।

না জানাটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় কুণ্ঠা বা দ্বিধাহীনতাটাকে উদারতা ভাবছ।

কনি থামল। সে কি সত্যিই তাই ভাবে? তা হতেও পারে। তবু মাইকেলিসের এই দ্বিধাহীনতাটার একটা মোহময় আবেদন আছে। ক্লিফোর্ড যেখানে ভীরুতার সঙ্গে কয়েক পা গেছে মাইকেলিস সেখানে সারা জগৎটাকে জয় করেছে। এই জগৎ ক্লিফোর্ড জয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। এই জয়ের জন্য মাইকেলিস যে পথ যে উপায় অবলম্বন করে তা কি ক্লিফোর্ডের পথের থেকে বেশী ঘৃণ্য? এই বহিরাগত যুবকটি পিছনের দরজা দিয়ে যে পথ অবলম্বন করেছে সে পথ কি ক্লিফোর্ডের জয়ঢাক নিনাদিত আত্মপ্রচারের পথের থেকে খারাপ? হাজার হাজার যে সব পথকুক্কুর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় স্তুতিগান করতে করতে সাফল্যের কুক্কুরী দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের মধ্যে যে প্রথম সে দেবীকে ধরতে পারে সে-ই হচ্ছে আসল কুকুর। মাইকেলিস ঠিক তাই। তাই সে তার লেজ সগর্বে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে তা করে না। বৈকালিক চা-পানের সময় সে ঠিক এসে গেল। সঙ্গে নিয়ে এল একমুঠো ভায়োলেট আর পদ্ম ফুল। মুখে সেই প্যানপেনে কথা। কনির মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাইকেলিসের কথা বলার এই ভঙ্গিমা প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করার এক ছলনাময় মুখোসমাত্র। সত্যিই কি সে এক দুঃখী কুকুর?

সারাটা সন্ধ্যে ধরে এক দুঃখী কুকুরের মতই তার নিস্তেজ নিরুত্তাপ অন্তরের যত সব কথা বলে চলল মাইকেলিস। আর ক্লিফোর্ড ভাবল এসব কথা অহঙ্কারের এবং এ সব কথার মধ্যে এক আক্রমণাত্মক মনোভাব গোপনে লুকিয়ে

আছে। কনি কিন্তু তা ভাবে না, কারণ এ সব কথার মধ্যে নারীজাতির প্রতি কোন আক্রমণ নেই। আক্রমণ যেটুকু আছে তা হলো পুরুষদের দুঃসাহসিকতা আর উদ্ধত অসঙ্গত কল্পনার প্রতি। এক অজ্ঞেয় অন্তর্নিহিত আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্যই মাইকেলিসের উপর সব পুরুষরাই চটে যায়। বাইরে যতই সে ভালমানুষি দেখাক তার সামান্য উপস্থিতির মধ্যেই একটা আক্রমণের ভাব আছে।

কনি মাইকেলিসের প্রেমে পড়ে গেছে। তবু সে একমনে সেলাইএর কাজ করে চলেছিল। আর ওরা দুজনে কথা বলতে লাগল। ওদের কথায় সে যোগদান না করলেও সে চলে গেল না সেখান থেকে। এদিকে মাইকেলিস গতকালকার সন্ধ্যার মতই সমানভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে রইল। হয়ে রইল একই সঙ্গে সমান মনোযোগী আর উদাসীন। তার গৃহস্বামীদের সঙ্গে প্রয়োজনমত অল্প দু চারটে কথা বললেও আসলে তাদের কাছ থেকে মনে মনে অনেক দূরে রয়ে গেল। একটি বারের জন্যও কাছে এল না। কনির মনে হলো মাইকেলিস হয়ত আজকের সকালের সেই ঘটনার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু সত্যিই সে ভুলে যায়নি। সে জানে আসলে সে কোথায়…তার প্রকৃত অবস্থা কি। সে জানে আসলে সে জন্মগতভাবে বিদেশী। বিদেশীরা যেখানে থাকে সে সেখানেই আছে বা থাকবে। তাই সে কনির ভালবাসাবাসির ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। এই সব ভালবাসাবাসি তার মত এক প্রভুহীন মালিকানাহীন পথকুক্কুরকে তার গলদেশে সোনার শিকল থাকা সত্ত্বেও উঁচু সমাজের এক গৃহস্থ কুক্কুরে পরিণত করতে পারবে না।

মোট কথা হলো এই যে আসলে অন্তরের দিক থেকে মাইকেলিস একজন বিদেশীই ছিল। মনেপ্রাণে একজন বিদেশী এবং অসামাজিক। বাইরে সে কেতাদুরস্ত বণ্ড স্ট্রীটের লোকের মত দেখতে হলেও অন্তরের দিক থেকে সে একজন বিদেশীই রয়ে গিয়েছিল। বাইরে সমাজের ভদ্র ও ধুরন্ধর লোকদের মেলামেশার যেমন একটা প্রয়োজন ছিল তার তেমনি অন্তরের দিক থেকে এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতারও তার একটা প্রয়োজন ছিল।

তবে সাময়িক এক আধটু ভালবাসাবাসি বেশ কিছুটা সান্ত্বনার বস্তু তার কাছে। সেটা এমন কিছু খারাপ লাগত না তার ; বরং সে এর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল কনির প্রতি। কনি তার প্রতি স্বতস্ফূর্ত ও অশ্রুসিক্তপ্রায় যে করুণা দেখিয়েছে তার জন্য এক উত্তপ্ত ও মর্মস্পর্শী আবেগে ফেটে পড়ছিল সে। তার আপাতমলিন, আপাতকঠোর ও মোহমুক্ত মুখমণ্ডলের অন্তরালে তার শিশুসুলভ আত্মাটা এই নারীর জন্য কৃতজ্ঞতায় কাঁদছিল। নিঃসঙ্গ সে আত্মা এক জ্বলন্ত সঙ্গপিপাসায় কাছে আসতে চাইছিল তার। কারণ সে জানত সে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

হলঘরে বাতি জ্বালাবার সময় কনির সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে

গেল মাইকেলিস। বলল, আসতে পারি?

কনি বলল, আমি আপনার কাছে যাচ্ছি।

খুব ভাল।

মাইকেলিস অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল···অবশেষে অবশ্য সে এল।

মাইকেলিস এমনই একজন প্রেমিক, দেহসংসর্গের সময় যার চরম উত্তেজনার কম্পমান ক্ষণ আসে আর তাড়াতাড়ি চলে যায়। তার উলঙ্গ দেহটার মাঝে কেমন যেন এক শিশুসুলভ অসহায়তার ভাব আছে। অবশ্য রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তার কিছু কলা-কৌশল ও চাতুর্য জানা আছে। কিন্তু সে কৌশল ও চাতুর্যের ভূমিকা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার উলঙ্গতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। চরম পুলকলাভের আগে সে তখন তার শিথিল ও অশক্ত পুরুষাঙ্গটি নিয়ে অসহায় ও অর্থহীনভাবে লড়াই করে যেতে থাকে।

এইভাবে সে কনির মধ্যে একই সঙ্গে তার প্রতি এক করুণা আর এক দুর্বার দেহগত কামনা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু সে কামনা সে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সব রতিক্রিয়ার সময় তার কাজ শুরু হতে না হতে তার সব উদ্যম ও উত্তেজনা ফুরিয়ে যায়। সে তখন কনির বুকের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। কিছু পরে সে যখন তার কিছুটা শক্তি ফিরে পায়, আবার একটা তৎপরতার ভাব দেখায় তখন দেখে কনি হতাশ হয়ে পড়ে আছে।

পরে ব্যাপারটা শিখে নিল কনি। মাইকেলিসের উত্তেজনা স্তিমিত বা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কনি তাকে জড়িয়ে ধরে নিজে তৎপর হয়ে তার পুরুষাঙ্গটি নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে মেতে উঠত এক বিপরীত রতিক্রিয়ার আশ্চর্য আবেগে। তখন মাইকেলিসও হঠাৎ আশ্চর্যভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। মাইকেলিস যখন দেখত তার শক্ত, উত্থিত অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষাঙ্গটি নিয়ে কনি তার পূর্ণ দেহতৃপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তখন সে এক অদ্ভুত গর্ব আর তৃপ্তি অনুভব করত।

এক কম্পিত পুলকাবেগে কনি ফিস ফিস করে বলল, আঃ কী আরাম! এই বলে মাইকেলিসকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। মাইকেলিস তখন মনে মনে একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা গর্বও বোধ করত।

সেবার মাইকেলিস মাত্র তিন দিন ছিল ওদের বাড়িতে। কিন্তু এই তিন দিনের শেষেও সে প্রথম দিনের মত পরবাসী রয়ে যায় তাদের দুজনের কাছেই। তাদের অন্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে বহিরাগত অতিথির মতই চলে যায়।

চলে যাওয়ার পর কনিকে প্রায়ই চিঠি লিখত মাইকেলিস। কিন্তু সে চিঠির মধ্যে থাকত এক সকরুণ বিষণ্ণতার সুর। থাকত বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কামগন্ধহীন ভালবাসার সুর। দূরত্বের ব্যবধানজনিত এক হতাশার সুর ফুটে উঠত সে ভালবাসার মধ্যে। আসলে মাইকেলিস যেন মনেপ্রাণে হতাশাটাকে পছন্দ করত। সে যেন আশাকে ঘৃণার চোখে দেখত। কোন কিছু কাম্যবস্তুর

প্রাপ্তির কোন আশাকেই পছন্দ করত না সে।

কনি কোনদিন ঠিকমত বুঝতে পারেনি মাইকেলিসকে। তবু সে তার নিজের মত করে ভালবাসতে থাকে। তবু ঠিক সময় মাইকেলিসের সেই সর্বগ্রাসী হতাশার একটা আশ্চর্য প্রতিফলন অনুভব করে তার অন্তরে। কিন্তু এই হতাশার মধ্যে ঠিকমত ভালবাসতে পারে না সে। আর মাইকেলিস মনেপ্রাণে বরাবর হতাশ থেকে যাওয়ায় একেবারেই ভালবাসতে পারে না।

এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল। তারা দুজনেই দুজনকে চিঠি দিত মাঝে মাঝে। আবার লণ্ডনে মাঝে মাঝে তাদের দেখা হত। তাদের দেহসংসর্গও ঘটত। কনি আগের মতই চাইত যৌনতৃপ্তির এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। মাইকেলিসের অপেক্ষাকৃত ছোট উত্থিত জননাঙ্গটিকে নিয়ে নিজের মত করে তেমনিভাবে মেতে উঠত এক বিপরীত রতিক্রিয়ায়। আর মাইকেলিসও এইভাবে নিজের দেহটাকে সঁপে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকত। তাদের সম্পর্কটাকে বজায় রাখার পক্ষে এই মিলনই ছিল যথেষ্ট।

এই ধরনের মিলনের মধ্য দিয়ে এক সূক্ষ্ম অন্ধ অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠল কনির মনে। আপন জৈবশক্তির প্রতি এই অন্ধ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা বিষাদের সুর থাকলেও তাতে আনন্দ পেত কনি। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত সে।

র‍্যাগবিতে ফিরেই ভীষণভাবে মত্ত হয়ে উঠত কনি সে আনন্দের উচ্ছলতায়। তার সেই তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভব ক্লিফোর্ডের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিত বিভিন্নভাবে, যার ফলে ক্লিফোর্ডও সেই কৃত্রিম আনন্দের উচ্ছ্বাসে কিছু ভাল লেখা লিখে ফেলত। এইভাবে জঠরাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট মাইকেলিসের নিষ্ক্রিয় জননাঙ্গের উত্থিত দৃঢ়তায় যে যৌনতৃপ্তি লাভ করত কনি সে তৃপ্তির ফসল অন্ধের মত অজানিতে ভোগ করে যেত ক্লিফোর্ড। সে অবশ্য এর কিছুই জানত না। জানলে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দিত না কনিকে।

তবু যখন সেই আনন্দ আর তৃপ্তির আস্বাদে ধন্য দিনগুলি একেবারে হারিয়ে ফেলল কনি, যখন সে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হয়ে থাকত সময় সময় তখন ক্লিফোর্ড সেই দিনগুলোকেই ফিরে পেতে চাইল ব্যাকুলভাবে। যদি সে এর রহস্যময় কারণটা জানত তাহলে ক্লিফোর্ড হয়ত কনি ও মাইকেলিসকে এক সঙ্গে এক বাড়িতেই রেখে দিত।

অধ্যায় ৪

মিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কখন অবনতি ঘটে বা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ নিয়ে আশঙ্কার অন্ত ছিল না কনির মনে। লোকে মাইকেলিসকে সংক্ষেপে

মিক বলে ডাকত। কিন্তু এ নিয়ে আর কারো কোন মাথা-ব্যথা ছিল না। ক্লিফোর্ড তার কাছ থেকে চাইত সেই প্রাণ-মাতানো আনন্দের উচ্ছ্বাস, সেই উদ্দাম প্রাণোচ্ছলতা। কিন্তু কনি চাইত এক শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষের সঙ্গসুখ যা ক্লিফোর্ড তাকে দিতে পারত না। মাঝে মাঝে মিকেব কথাটা মনে পড়ত তার। একটা ভীষণ কম্পন অনুভব করত সারা অঙ্গে। কিন্তু অনেক আগে হতেই এ বিষয়ে একটা ভয় ছিল তার মনে। ভয় ছিল মিকের সঙ্গে তার এ সম্পর্ক টিকবে না। মিক সে মানুষ নয়, সে এ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে না। এটা তার স্বভাব। কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে না উঠতে তা ভেঙ্গে দেওয়ার একটা প্রবণতা তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আসলে সে মুক্তি চায়, নিঃসঙ্গ পথকুকুরের সেই অবাধ মুক্তি। এটা তার জীবনের যেন এক জৈবিক প্রয়োজন। অথচ সে বাইরে বলে বেড়াত কনিই তাকে ত্যাগ করেছে।

এ জগৎ কত সম্ভাবনায় ভরা, কিন্তু কিছু লোকের কাছে এ জগৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমুদ্রে অনেক ভাল মাছ আছে ঠিক। কিন্তু বেশীর ভাগ মাছই ম্যাকারীণ অথবা হেরিং। সুতরাং ভাল মাছ ধরা শক্ত।

ক্লিফোর্ড এবার যশ আর অর্থ দুটোই বেশ পাচ্ছিল; তাকে অনেকে দেখতে আসত। র‍্যাগবিতে অতিথির অভাব ছিল না। কিন্তু সমুদ্রের হেরিং অথবা ম্যাকারীণ মাছের মতই অতি সাধারণ তারা। কখনো কখনো দু-একটা ভাল মাছের দেখা পাওয়া যেত।

কিছু লোক বেশ কিছুদিন থেকে যেত। তাদের বেশীর ভাগ ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেছে। এদের মধ্যে ছিল টমি ডিউক, সেনাবিভাগে কাজ করত। ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদে উন্নীত হয়েছিল। সে বলত, সেনাবিভাগে কাজ করার জন্য আমি ভাববার সময় পাই। তাছাড়া যুদ্ধে যোগদান করতে গিয়ে অনেক কঠোর জীবনসংগ্রাম আমি এড়াতে পেরেছি।

একবার চার্লস মে নামে একজন লেখক আসে। সে নক্ষত্রের উপর কিছু বৈজ্ঞানিক লেখা লেখে। এছাড়া হামণ্ড নামে আর একজন লেখক আসে। এরা সবাই তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং ক্লিফোর্ডের সমবয়সী। এরা সবাই মনের স্বাস্থ্য আর মানসিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। মনের বাইরের যে কোন কাজকেই তারা ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয় ব্যাপার বলে মনে করত। এসব ব্যাপারে তাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। কেউ মলমূত্র ত্যাগ করতে গেলে যেমন তার কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না তেমনি কারো কোন দেহগত ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করাটা অশোভন বলে ভাবত তারা।

দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারকেই তারা ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয় ব্যাপার হিসাবে এড়িয়ে যেত। কে কিভাবে টাকা রোজগার করে, কে তার স্ত্রীকে ভাসবাসে কি না অথবা কে কোন প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে আছে কি

না এ সব মলমূত্র ত্যাগের মত ছোটখাটো ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব বিষয়ে অন্য কারো কোন কৌতূহল থাকা উচিত নয়।

ওদের মধ্যে হামণ্ডের চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা। তার স্ত্রী এবং দুটো ছেলে ছিল। তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এক মেয়ে টাইপরাইটারের সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়েছিল সে। সে বলল, আসলে যৌন সমস্যাটা কোন সমস্যাই নয়। কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে শোবার ঘরে গেলে আমরা তার পিছু পিছু যাই না। এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলটাই অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক এবং সমস্যাটা সেইখানে।

ওদের মধ্যে একজন তখন হামণ্ডকে বলল, ঠিক ঠিক, হামণ্ড। কিন্তু কেউ যদি তোমার স্ত্রী জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে এবং সে যদি বাড়াবাড়ি করে বা অনেক দূর এগিয়ে যায় তাহলে তুমি রাগে ফেটে পড়বে।

হামণ্ড তখন বলল, নিশ্চয়। কেউ যদি আমার বসার ঘরের এক কোণে প্রস্রাব করে তাহলে আমি নিশ্চয় রাগ করব। এসব কাজের উপযুক্ত জায়গা আছে।

তাহলে কি তুমি বলতে চাও কেউ যদি কোন নির্জন গোপন জায়গায় জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করে তাহলে তুমি কিছু মনে করবে না?

চার্লি বেশ রসিক প্রকৃতির লোক। সে কিছুদিনের জন্য জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করায় হামণ্ড তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে।

হামণ্ড বলল, যৌন সম্পর্কটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ সম্পর্ক শুধু আমার আর জুলিয়ার মধ্যে। সে সম্পর্কের মধ্যে অন্য কেউ নাক গলাতে এলে সেটা অবশ্যই আমি সহ্য করব না।

এবার টমি ডিউক উত্তর দিল। টমি ডিউকের চেহারাটা রোগা রোগা। তাকে দেখে চার্লস মে'র থেকেও বেশী আইরীশ বলে মনে হয়। সে বলল, আসল কথা হলো হামণ্ড, সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটা তোমার খুব বেশী। তুমি জীবনে সাফল্য চাও, জয় চাও। আমি একদিন সৈন্য-বিভাগে ছিলাম, মানবসমাজ থেকে অনেক দূরে ছিলাম। সেখান থেকে মানুষের সমাজের মাঝে এসে দেখলাম, সাফল্য আর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটা অতিশয় প্রবল সব মানুষের মধ্যে। এ প্রবৃত্তি এমনই প্রবল যে এর দ্বারা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তোমার মত লোক অবশ্যই স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে বড় হতে চায়। এই জন্যই তুমি ঈর্ষান্বিত। তোমার কাছে যৌনসম্পর্কের অর্থ হলো তাই। তোমার ও জুলিয়ার মধ্যেও যে যৌনসম্পর্কের কথা বললে আসলে তা সাফল্য অর্জনের একটা বলিষ্ঠ ও গতিশীল উপায় বা অস্ত্র মাত্র। যদি তুমি প্রথম থেকে অসাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে জীবন শুরু করতে তাহলে চার্লির মত প্রেম করতে পারতে। তোমাদের মত বিবাহিত লোকদের বিদেশী ভ্রমণকারীদের বাক্সের মত একটা করে ছাপ

আছে। যেমন ধরো তোমার স্ত্রীর নাকের উপর একটা ছাপ আছে। মিসেস বি আর্ণল্ড, তোমার নামের উপর আছে আর্ণল্ড বি হামণ্ড, কেয়ার অফ মিসেস আর্ণল্ড বি হামণ্ড। তোমরাই ঠিক, কারণ মনের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য আরামপ্রদ একটা বাড়ি আর ভাল রান্নাবান্না চাই। আবার বংশধারা রক্ষার জন্য সন্তানসন্ততিও চাই। কিন্তু এই সব কিছুর মূলে আছে কিন্তু সাফল্য-লাভের প্রবৃত্তি বা উচ্চাভিলাষ। এই একটি জিনিসকে কেন্দ্র করেই সব জিনিস আবর্তিত হয়।

হামণ্ডকে দেখে প্রসন্ন মনে হলো। সে তার মানসিক সংহতি আর মনের অখণ্ডতার জন্য গর্বিত, সে সব সময় কাল বা অবস্থার দাস হয়ে তার দ্বারা বাধ্য হয়ে কাজ করে চলে না। তা সত্ত্বেও সে অবশ্য সাফল্য চায়।

এবার চার্লস মে বলল, একথা ঠিক যে টাকা ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। জীবনে বাঁচতে হলে কিছু টাকা তোমার চাই। এমন কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হলেও তোমার কিছু টাকা চাই, কারণ তোমার পাকস্থলী শূন্য থাকলে তুমি কোন চিন্তাই করতে পারবে না। কিন্তু আমার মতে বিয়ের ছাপটা অন্ততঃ ত্যাগ করতে পার। আমরা যদি স্বাধীনভাবে যে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি তাহলে কোন মেয়ে আমাদের সঙ্গে ভাব করতে চাইলে কেন আমরা ভালবাসব না তাকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার মধ্য দিয়ে এক উগ্রকামী ব্যভিচারী মন কথা বলছে।

চার্লস মে বলল, তা যদি বল ত বলতে পার। কোন মেয়েছেলের সঙ্গে নাচলে যেমন তার কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি তার সঙ্গে শুলে বা রাত্রিবাস করলেও তার কোন ক্ষতি হয় বলে আমার মনে হয় না। অথবা যদি কোন মেয়ের সঙ্গে আবহাওয়ার কথা বলি তাহলেও তার কোন ক্ষতি হয় না। কারো সঙ্গে কথা বলে যেমন আমরা পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করি তেমনি কোন মেয়ের সঙ্গে দেহসংসর্গ করে দেহগত এক জৈবচেতনার বিনিময় করি।

হামণ্ড বলল, তার থেকে খড়গোসদের মত মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করে থাকতে পার।

কেন, ক্ষতি কি তাতে? খড়গোসদের কি ক্ষতি হচ্ছে তাতে? মানসিক রোগ ও বাতিকগ্রস্ত, বিদ্রোহাত্মক মনোভাবাপন্ন, স্নায়বিক ঘৃণাভাববিশিষ্ট ও নিঃসঙ্গ মানুষদের থেকে তারা কি কিছু খারাপ?

হামণ্ড বলল, তা হলেও আমরা ত আর খড়গোস নই।

মে বলল, ঠিক তাই। আমার মনে আছে, আমার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বা প্রভাব নিয়ে আমাকে অনেক সময় গণনা করতে হয়। অনেক সময় বদহজম হলে আমার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ক্ষুধাও আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। এইভাবে অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধাও আমাকে

বিচলিত করে আমার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাহলে কি করব?

হামণ্ড রসিকতার সুরে হাস্যোচ্ছলে বলল, খাদ্যদ্রব্যের বদহজমের মত অনেক সময় যৌনক্রিয়ার আতিশয্যের বদহজমও মানুষের মনকে সমানভাবে বিচলিত করে।

মোটেই তা নয়। আমি যেমন বেশী খাই না তেমনি যৌনক্রিয়ার ব্যাপারেও আমার কোন বাড়াবাড়ি নেই। কোন কোন লোক অবশ্য বেশী খেতে ভালবাসে। কিন্তু তুমি ত আমাকে একেবারে না খাইয়ে মারতে চাও।

না, তা নয়। তবে তুমি বিয়ে করতে পার।

কেমন করে জানলে তুমি যে আমি বিয়ে করতে পারি? এটা আমার মনের সঙ্গে খাপ খেতে নাও পারে। বিয়ে আমার মনের গতিকে রুদ্ধ বা স্তব্ধ করে দিতে পারে। আমি ঠিক ও পথের পথিক নই। কিন্তু তা বলে কি সন্ন্যাসীর মত কোন একটা ঘরে ভরে রাখবে? যত সব বাজে ধারণা। মাঝে মাঝে আমাকে যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ের গণনা করতে হয় তেমনি মাঝে মাঝে কোন নারীকে আমার দরকার হয়। আমি যেমন এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করতে চাই না, তেমনি কারো কোন নিষেধাজ্ঞাও শুনতে চাই না। পোষাকভরা ছাপ দেওয়া বাক্সের মত কোন মেয়েকে নামের উপর ছাপ নিয়ে রেলস্টেশান বা কোথাও ঘুরে বেড়াতে দেখলে আমার বড় লজ্জা হয়।

জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারটা ওরা দুজনে কেউ ভুলতে পারেনি।

এবার ডিউক বলল, মজার কথা হলো এই যে যৌন ব্যাপারটা মুখে বলার নয়, হাতে কলমে করার। আমার মনে হয় তোমার কথাটা ঠিক। আমার মনে হয়, কোন মেয়ের সঙ্গে যেমন আমরা সহজভাবে আবহাওয়ার অবস্থা নিয়ে কথা বলতে পারি তেমনি তার সঙ্গে আমাদের জৈবিক চেতন বা আবেগানুভূতির বিনিময় করতে পারি। যৌনসংসর্গের কাজটা নরনারীর মধ্যে এক দেহগত সংলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন না কোন মনের বা ভাবধারার মিল না হলে কোন মেয়ের সঙ্গে যেমন কথা বল না, তেমনি পারস্পরিক কোন আবেগ বা সহানুভূতির মিল না হলেও তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পার না।

চার্লি মে বলল, কোন মেয়ের সঙ্গে যদি ঠিকমত মনের ও আবেগানুভূতির মিল হয় তাহলে তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া ও ঘুমোন হবে উচিত কাজ। কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে যেমন তুমি তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বল তেমনি কোন মেয়ের সঙ্গে কোন বিষয়ে মনের বা মতের মিল হলে তার সঙ্গে দেহসংসর্গও ঘটাতে পার। কারো সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দাঁতের মাঝে জিবটাকে ভরে রেখে তা কামড়াও না। তোমার যা বলার তা বলে ফেল। তেমনি সহানুভূতিসম্পন্না কোন নারীকে পেয়েও যৌন আবেগকে চেপে রাখার

কোন অর্থ হয় না।

হামণ্ড বলল, না এটা অন্যায়। কোন নারীর সঙ্গে যৌনসংসর্গের ক্ষেত্রে তোমার অন্তর্নিহিত পৌরুষশক্তির অর্ধেক ব্যয় করেও তুমি তোমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে না, তোমার মন যতই ভাল থাক, যতই মনের মিল থাক। যৌন ব্যাপারে বাড়াবাড়ির ফল উল্টো হয়।

বাড়াবাড়ির ফল যেমন উল্টো হয় তেমনি যৌনক্রিয়ার আত্যন্তিক অভাবের ফলও উল্টো হয়, বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হও। কোনরূপ যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে তুমি তোমার মনের পবিত্রতা বা অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পার, কিন্তু সে মন হয়ে উঠবে শুকনো বাঁশের কাঠির মতই শুকনো। তুমি এ ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে কথার কচকচি দিয়ে ছোট করে দিচ্ছ।

টমি ডিউক জোরে হেসে উঠল। সে বলল, তোমরা দুজনে মন নিয়ে যত খুশি তর্ক করতে পার। কিন্তু আমার পানে তাকাও দেখি, আমি মনের কোন বড় কাজ করি না, শুধু কিছু চিন্তার জট পাকাই মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি বিয়ে করি না অথবা কোন মেয়ের পিছনে ছুটে বেড়াই না। আমার মনে হয় চার্লি ঠিক। সে যদি কোন মেয়ের পিছনে ছুটে চলে আমি তাকে বাধা দেব না, এ বিষয়ে তার স্বাধীনতা আছে। আবার হামণ্ডও ঠিক। তার সম্পদ-এষণা প্রবল। সুতরাং তার জন্য চাই সোজা লম্বা রাস্তা আর ছোট দরজা। সে ক, খ, গ শেখার মস্ত বড় বিদ্বান হতে চায়। আমার কথা যদি বল, আমি একটা হাতেছোঁড়া রকেট। আচ্ছা ক্লিফোর্ড, তুমি কি মনে করো, জগতে মানুষকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবার ব্যাপারে যৌন সম্পর্কের কোন প্রয়োজন আছে?

এই সব ক্ষেত্রে ক্লিফোর্ড কোন কথা বলে না। এই সব কথাবার্তা শুনে সে এমনই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে যে এ বিষয়ে সে কোন সুস্পষ্ট ধারণা খাড়া করতে পারত না। সব কিছু শুনে সে একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

ক্লিফোর্ড এক সময় বলল, যেহেতু আমি যৌনশক্তি হারিয়ে ফেলেছি, আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই।

এটা কোন কথাই নয়। তোমার দেহের উপর দিকের অংশটা ঠিক আছে, ওদিকটার প্রাণশক্তির কোন অভাব নেই। তোমার মনের স্বাস্থ্য বলিষ্ঠ ও অটুট আছে। সুতরাং তোমার মনোভাবের কথা আমরা শুনব।

ক্লিফোর্ড বলল, এ বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। আমি মনে করি ছেলেমেয়ের মধ্যে বোঝাপড়া এবং অন্তরঙ্গতা থাকলে বিয়ে এবং ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা খুবই ভাল কথা।

টমি বলল, কেন ভাল কথা? কোন্ দিক থেকে?

এই সব আলোচনায় মেয়েরা যেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে, ক্লিফোর্ডও

সেই রকম অস্বস্তিকর এক লজ্জার মধ্য দিয়ে বলল, বৈবাহিক সম্পর্ক নরনারীর অন্তরঙ্গতাকে পূর্ণতা দান করে।

টমি তখন বলল, ঠিক আছে, চার্লি এবং আমি বিশ্বাস করি যৌন সংসর্গ দ্বৈত সংলাপের মতই এক সহজ যোগাযোগের ব্যাপার। কোন নারী আমার সঙ্গে এই ধরনের কোন যোগাযোগ করতে চাইলে আমি যথাসময়ে তাকে নিয়ে বিছানায় যেতে পারি। কিন্তু কোন মেয়ে আমার কাছে এজন্য আসে না বলে আমাকে একাই বিছানায় শুতে যেতে হয়। কিন্তু এতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও কোন গণনার কাজ আমার নেই। কোন অমর সাহিত্য রচনার কাজও আমার নেই। আমি হচ্ছি একজন সৈনিকমাত্র।

এবার সকলেই চুপ করল। নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। চারজন বন্ধুই ধূমপান করতে লাগল নীরবে। ওদিকে কনি চুপচাপ সেলাই করে যেতে লাগল। তার সেখানে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত এক স্তব্ধ নীরবতায় জমাট বেঁধে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ এই চারজন চিন্তাশীল লোকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করার মত সামর্থ্য তার ছিল না। তবে তার সেখানে থাকার একটা প্রয়োজনও ছিল। কারণ তাকে ছাড়া ওদের চিন্তা-ভাবনার স্রোত এমন স্বচ্ছন্দভাবে বইতে পারত না। কনির অনুপস্থিতিতে ক্লিফোর্ড কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে উঠত মনে মনে। তার পা দুটো ঠাণ্ডা হয়ে উঠত। কনির উপস্থিতিতে টমি ডিউক একটা প্রেরণা পেত। হামণ্ডকে কনি মোটেই পছন্দ করত না, কারণ তাকে তার বড় স্বার্থপর মনে হত। মানসিকতার দিক থেকে চার্লস মেকে কিছুটা ভাল লাগলেও কিছুটা খারাপ লাগত।

কতদিন সন্ধ্যায় কনি এখানে বসে এই চারজন অথবা দুজন বন্ধুর মনের কথা শোনে। ওরা কখনো কোনভাবে খুব একটা আঘাত করে না তাকে। তাকে কোন কষ্ট দেয় না। বিশেষ করে টমি সেখানে থাকলে ওদের কথাবার্তা শুনতে ওর খুব ভাল লাগত। টমি থাকলে খুব মজা হত। তার মনে হত কতকগুলি আলোচনারত পুরুষ তাদের অনাবৃত দেহ নিয়ে তাকে চুম্বন বা আলিঙ্গন না করলেও তাদের মনটা যেন অনাবৃত করে দিচ্ছে তার সামনে। তবে তাদের সেই মনটা ছিল কিন্তু বড় নীরস।

আবার কিছুটা বিরক্তিকরও ছিল। কনি মাইকেলিসকে শ্রদ্ধা করত। অথচ মাইকেলিসের নামটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন তাদের একরাশ ঘৃণার গড়ল ঢেলে দিত। সে যেন ওদের চোখে একটা জন্তুবিশেষ বা অশিক্ষিত একটা ইতর। কিন্তু যাই হোক, মাইকেলিস যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত, ওদের মত মনের স্বাস্থ্য নিয়ে আঁকাবাঁকা ঘুরপথে অজস্র কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে যেত না শোভাযাত্রা করে।

ওদের এই মনের স্বাস্থ্যটাকে কনি যে একেবারে পছন্দ করত না, তা নয়।

এর থেকে রোমাঞ্চকর এক পুলক অনুভব করত সে। তবে তার মনে হত ওরা যেন কথাটা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে। তবু এই ধরনের কয়েকটি নিবিড় সন্ধ্যায় কয়েকজন পুরুষের মুখ থেকে উদ্‌গারিত সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকতে বড় ভাল লাগত তার। যখন সে ভাবত তার নীরব উপস্থিতি ছাড়া তাদের আলোচনা চলতে পারে না তখন তার বেশ মজা লাগত। বেশ কিছুটা গর্ববোধও করত। চিন্তার প্রতি একটা বিরাট আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল কনির। এই লোকগুলো অন্ততঃ সৎভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে চিন্তার কোথায় যেন একটা গলদ ছিল যে গলদ যাবার নয়। তারা কিছু একটা বোঝাতে চাইত তাদের অজস্র কথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যাই বোঝাতে চাক, তার জীবনে কি তার দাম তা বুঝতে পারত না কনি। অবশ্য মিকও জীবনে খুব একটা অর্থময় হয়ে উঠতে পারেনি।

অবশ্য মিকও তখন এমন কিছু করছিল না। গতানুগতিকভাবে এগিয়ে চলেছিল জীবনের পথে আর পাঁচজনের মত। সত্যিই মিক অসামাজিকও ছিল। ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধুরা এ অভিযোগ প্রায়ই করত তার বিরুদ্ধে। আর যাই হোক, ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধুরা অসামাজিক ছিল না। তারা অল্পবিস্তর মানবজাতির উপকারের জন্য কিছু উপদেশ দিতে চাইত। মানবজাতিকে একটা সমস্যা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।

সেদিন রবিবার সন্ধ্যাবেলা। আবার প্রেম সম্বন্ধে কথা উঠল।

টমি ডিউক বলল, যে বন্ধন আমাদের অন্তরকে পরস্পরের মধ্যে আপন করে বেঁধে দেয় সে বন্ধন সত্যিই বড় মধুর। কিন্তু আমি জানতে চাই যে বন্ধনটা কি। যে বন্ধন আমাদের বেঁধে দেয় এক করে সেই বন্ধনই আবার দুজনের বিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। আমরা পরস্পরে পৃথক হয়ে উঠে ঘৃণার কথা ছুঁড়ে মারি পরস্পরের প্রতি। জগতে অনেক বুদ্ধিজীবিও তাই বলে। যারাই এ কাজ করে তাদের সকলকেই দেখ। আবার আমরা যত সব মিথ্যা মনগড়া কৃত্রিম কথার প্রলেপ দিয়ে আমাদের মনের অনুভূত ঘৃণাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, মনের গভীর ও অন্তহীন ঘৃণার মধ্যে শিকড় চালিয়ে রস আহরণ করেই মনের স্বাস্থ্য বেঁচে থাকে, সজীব হয়ে বেড়ে ওঠে। সব সময় তাই হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও তার শিষ্যদের পানে তাকিয়ে দেখ। দেখবে কেবল ঘৃণার ছড়াছড়ি। কাউকে না কাউকে ছোট করে তাকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার মধ্যে কত আনন্দ পেতেন তাঁরা।... তা সে প্রোতাগোরাস বা যেই হোক না কেন।

তাতে আলসিবিয়াদ ও অন্যান্য শিষ্যরা কুকুরের মত এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করত। আমি বলতে পারি, হয়ত অনেকে বৃক্ষতলে যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমৌন বুদ্ধকে পছন্দ করবেন, অথবা মনের কোন জৌলুস না দেখিয়ে শিষ্যদের উপদেশ দানরত যীশুকে পছন্দ করবেন অনেকে। কিন্তু যাই হোক, এঁদের সকলের

মনের স্বাস্থ্যের মধ্যে কোথায় একটা মূলগত গলদ আছে, ফাঁকি আছে। এর সব কিছুর মূলে আছে যেন এক ঘৃণা বা ঈর্ষা। ফল দেখেই আমরা গাছের পরিচয় পাই।

ক্লিফোর্ড এর প্রতিবাদ করে বলল, আমার মনে হয় না আমরা সকলে ঘৃণাকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়ে চলি।

টমি বলল, হে আমার প্রিয় ক্লিফোর্ড, কিভাবে আমরা একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় একে অন্যকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করি? আমি নিজে এ বিষয়ে সবচেয়ে খারাপ, কারণ আমি আবার মিষ্টিমাখানো ঘৃণার থেকে স্বতস্ফূর্ত ঘৃণাকে বেশী পছন্দ করি। মিষ্টিমাখানো ঘৃণা বিষের সমান। যদি আমি উপরে মুখে বলি ক্লিফোর্ড কত ভাল লোক, কিন্তু ওর পিছনে ওর নিন্দা করি তাহলে ওর অবস্থাটা কেমন হয়? ঈশ্বরের নামে তাই বলছি যত সব ঘৃণার কথা আমার মুখের সামনে বলো। তখন আমি বুঝব তোমাদের কাছে আমার তবু অন্ততঃ কিছুটা মূল্য আছে। তা না হলে আমার সমূহ সর্বনাশ।

হামণ্ড বলল, কিন্তু আমরা সংজ্ঞার সঙ্গে একে অন্যকে ভালবাসি।

টমি বলল, হাঁ তা অবশ্যই বাসি। কিন্তু সেক্ষেত্রে একে অন্যের পিছনে ঘৃণার কথা বলাবলি করে। এ বিষয়ে আমি নিজে সবচেয়ে খারাপ।

চার্লি বলল, আমার মনে হয় তুমি মনের স্বাস্থ্য আর সমালোচনামূলক কাজকর্মকে এক করে দেখছ। আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত যে সক্রেটিস সমালোচনামূলক কাজকর্মগুলোকে বড় করে দেখতেন।

টমি ডিউক সক্রেটিস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাল না।

হামণ্ড বলল, সমালোচনা আর জ্ঞান এক জিনিস নয়।

বেরি নামে এক বাদামী রঙের লাজুক প্রকৃতির যুবক ডিউকের সন্ধানে এসে থেকে যায়। সেও সেদিন ওদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। বেরি হামণ্ডের কথা শুনে বলল, তা অবশ্য নয়।

ওরা সবাই তখন বেরির পানে তাকাল। ওদের মনে হলো যেন একটা গাধা কথাটা বলেছে।

ডিউক হেসে বলল, আমি বলছিলাম জ্ঞানের কথা, মানসিক স্বাস্থ্যের কথা। প্রকৃত জ্ঞান শুধু তোমার মন আর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসে না, বেরিয়ে আসে তোমার জঠর আর যৌনাঙ্গ থেকে, চেতনার সব স্তর ও দিক থেকে। মন শুধু সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার আর বিশ্লেষণ করতে পারে। যদি তোমার মন আর যুক্তিকে অন্যান্য সব চেতনার স্তর বা দিকের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে দাও তাহলে দেখবে সব চেতনা ও অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে আর তাদের শূন্য শ্মশানপটে তোমার মন আর যুক্তি শুধু দৈতকণ্ঠে সমালোচনা করে চলেছে। আমি বলছি এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না আমরা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এখন সারা দুনিয়াটাই যেন সমালোচনা

চায়। তাতে মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই। এখন আমাদের সকলের মানসিক স্বাস্থ্য ভোগ করি। আমাদের ঘৃণাভয়ে গৌরবান্বিত করি যাতে সেই পুরনো পচা নাটকের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। কিন্তু মনে রাখবে আসল ব্যাপারটা হলো এই : তুমি যখন সমগ্রভাবে জীবন যাপন করবে তখন জীবনের সমস্ত অঙ্গ ও আন্তরযন্ত্রীয় ক্রিয়া বিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যখন তুমি মনের স্বাস্থ্য চাও, তখন তুমি সমগ্র জীবনরূপ বৃক্ষ হতে আপেলটিকে ছিঁড়ে নাও। তার মানে গাছ থেকে ফলকে বিচ্ছিন্ন করার মত সমগ্র জীবন থেকে একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। আর তুমি যদি মনসর্বস্ব হও, মনের স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু না জান তাহলে বুঝতে হবে তোমার অবস্থা হবে এক বৃন্তচ্যুত আপেলের মতই। তখন তুমি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ঘৃণাভাব পোষণ করতে থাক যেমন গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আপেল স্বাভাবিকভাবে পচে যায় টক হয়ে যায়।

ক্লিফোর্ডের এসব কথা ভাল লাগছিল না। সে বড় বড় চোখ তুলে তাকাল। কনি নিজের মনে মনে হাসল।

হামণ্ড একটু তিক্ত ও রাগতভাবে বলল, তাহলে সবাই আমরা বৃক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন আপেল।

চার্লি বলল, তাহলে আমাদের জীবন থেকে আপেলের রস বানাও সবাই।

বেরি এবার হঠাৎ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে তোমরা কি মনে করো ?

চার্লি লাফিয়ে উঠল কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে, সাবাস ! বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কি মনে করো ?

ডিউক বলল, এস, এবার বলশেভিকবাদের শ্রাদ্ধ করা যাক।

হামণ্ড তার মাথা নেড়ে বলল, আমার মনে হয় বলশেভিকবাদ একটা পুরনো ব্যাপার।

চার্লি বলল, আমার মতে বলশেভিকবাদ হচ্ছে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যাপারটা কি তা তাতে ভাল করে বলা হয়নি। আসলে এটা এক ধরনের পুঁজিবাদ। বলশেভিকবাদের মতে মানুষের যত সব আবেগ অনুভূতি বুর্জোয়া। তাহলে ওদের মতে সেই মানুষই সবচেয়ে ভাল যার কোন আবেগ অনুভূতি নেই।

তাহলে যে কোন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়া। অতএব তাকে দমন করতে হবে। তোমাদের নিজেদের সব ব্যক্তিসত্তাকে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার আদর্শে ডুবিয়ে দিতে হবে। সুতরাং অনুভূতি বা চেতনাবিশিষ্ট যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বুর্জোয়া। তাহলে এই মতবাদ বা আদর্শ যান্ত্রিক হতে বাধ্য। যা একই ধরনের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি অথচ যার কোন জৈব চেতনা নেই তা হচ্ছে যন্ত্র। ওদের মতে প্রতিটি মানুষ এক একটা যন্ত্র আর সে যন্ত্রকে চালায় একটা মাত্র জিনিস। তা হলো বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঘৃণা। আমার মতে এটাই হলো

বলশেভিকবাদ।

টমি ডিউক বলল, যথার্থ বলেছ। তবে আমার মতে এটাই হলো আমাদের যুগের চূড়ান্ত শিল্পগত আদর্শ। এর মুখে রয়েছে ঘৃণা। মুখে স্বীকার করুক বা না করুক এই ঘৃণাই হলো কারখানার মালিকদের আদর্শ।

আসলে এটা সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি ঘৃণা। মিডল্যাণ্ডের এই সব অঞ্চলের দিকে চেয়ে দেখ। এটা তাদের মানসিক জীবন বা স্বাস্থ্যের অন্যতম পরিচয়।

হামণ্ড বলল, বলশেভিকবাদ কোন যুক্তি বা তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে বলে মনে হয় না। আশ্রয়বাক্যের প্রধান অংশকে অস্বীকার করে।

টমি বলল, বিশুদ্ধ মনের মত এই বলশেভিকবাদ একান্তভাবে আশ্রয়বাক্যের বস্তুগত দিকটাকে মেনে নেয়।

চার্লি বলল, অবশেষে বলশেভিকবাদ তার তল খুঁজে পেয়েছে।

টমি বলল, তল খুঁজে পেয়েছে! সেই তল খুঁজে পেয়েছে যার কোন তল নেই। সারা জগতে ভাল ভাল যন্ত্রপাতি যত বাড়বে ততই বলশেভিকবাদীদের শক্তি বাড়বে। যন্ত্রপাতিই হলো ওদের সেনাবাহিনী।

হামণ্ড বলল, কিন্তু এ ধরনের জিনিস চলতে পারে না। এই ঘৃণার ব্যাপারটাই খারাপ। এর একটা প্রতিক্রিয়া হবেই।

আমরা দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছি। আমাদের ঘৃণার ভাবটা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ঘৃণা হচ্ছে জীবনের উপর কতকগুলো অনুভূতি ও প্রবৃত্তি জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রতিফল। আমাদের কতকগুলো বদ্ধ ধারণা অনুসারে আমাদের অনুভূতিগুলিকে চাপিয়ে দিই জীবনের উপর। যন্ত্রের মত কতকগুলো সূত্রকে ব্যবহার করি আমরা। আমরা আমাদের যুক্তিগত মন নিয়ে দেহকে শাসন করার চেষ্টা করি, তখন দেহটা পরিণত হয় ঘৃণায়। তখন দেহ ও মনের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। দেহ মনকে ঘৃণা করে, মন করে দেহকে ঘৃণা। আমরা সবাই বলশেভিক, আমরা সবাই বস্তু। কারণ আমরা মুখে তা স্বীকার করি না। রুশীয়রা বলশেভিকবাদী, কিন্তু ভণ্ড নয়।

হামণ্ড বলল, কিন্তু সোভিয়েত পন্থা ছাড়াও বলশেভিকবাদী হবার অন্য পথ আছে। বলশেভিকবাদীরা মোটেই বুদ্ধিমান নয়।

মোটেই তা নয়। অনেক সময় দেখবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিমানের ভাণ করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলশেভিকবাদকে আধাবুদ্ধিসম্পন্ন এক মতবাদ বলে মনে করি ; কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্যের সমাজজীবনটাও ঠিক তাই নয় কি? আমরা গলাফোলা রোগীদের মতই নিরুত্তাপ, নির্বোধদের মতই নিস্তেজ। আমরা সবাই বলশেভিকবাদী, শুধু তার নামটা অন্য নিই। আমরা ভাবি আমরা ঈশ্বর, মানুষ হয়েও ঈশ্বর। এই মনোভাবটাই বলশেভিকবাদীদের মনোভাব। কেউ যদি ঈশ্বর বা বলশেভিকবাদী হতে চায় তাহলে তার কথা আলাদা। কিন্তু কেউ যদি সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হতে চায় তাহলে

তার হৃদয় আর যৌনাঙ্গ দুটোই চাই। বলশেভিক আর ঈশ্বর, দুটোই সমান। প্রকৃত পক্ষে ভালই হোক মন্দই হোক এই দুটোর কোনটাই বাস্তবে ঠিকমত হওয়া সম্ভব না।

এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে অনেকক্ষণ কাটিয়ে বেরি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আচ্ছা টমি, তুমি প্রেমে বিশ্বাস করো ?

টমি বলল, হে সুন্দর কিশোর আমার, মোটেই না, দশভাগের ন'ভাগও না। আজকাল প্রেমও হচ্ছে আধাবুদ্ধিসম্পন্ন একটা ব্যাপার। কতকগুলো লোক ছেলেদের মত পাছাওয়ালা কতকগুলো নাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে সঙ্গম করে।

এটাকে তুমি সঙ্গম বল ? ঠিক যেন সঙ্গমরত দুটো ঘোড়া। প্রেম মানে 'আমার স্বামী', 'আমার স্ত্রী' এই ধরনের যৌথ সম্পত্তিমূলক এক অধিকারগত মনোভাব। না, আমি এসবে মোটেই বিশ্বাস করি না।

কিন্তু তুমি কিছু একটাতে বিশ্বাস করো।

আমি ? হ্যাঁ, বুদ্ধিগতভাবে কিছু একটাতে করি। আমি চাই এক সৎ ও সরল অন্তঃকরণ, এক প্রাণবন্ত পুরুষাঙ্গ, সতেজ সজীব বুদ্ধি আর মেয়েদের সামনে সোজা হয়ে কথা বলার সাহস।

বেরি বলল, মনে করো তুমি এ সব পেয়ে গেছ।

জোর হাসিতে ফেটে পড়ল টাম ডিউক। হাসতে হাসতে বলল, যদি সত্যিই আমি তা পেতাম হে বালক ! না, আমি কিছুই পাইনি হে দেবদূত। আমার অন্তর আলুর মতই নিস্তেজ, আমার পুরুষাঙ্গ নত হয়ে থাকে, মাথা তুলতে চায় না। আমার মা বা পিসির সামনে সঙ্গমের কথা বলার থেকে আমি আমার পুরুষাঙ্গটিকে একেবারে কেটে ফেলব। আমি প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান নই, শুধু মানসিক জীবন ও স্বাস্থ্যে বিশ্বাসী। প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান হওয়া সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহলে সে দেহ মনের ব্যক্ত অব্যক্ত প্রতিটি অংশের প্রতি সমানভাবে সচেতন হয়ে উঠবে। তখন তার পুরুষাঙ্গটি মাথা তুলে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে কেমন আছ ? শিল্পী রেনয়ের বলত, সে নাকি তুলির বদলে তার লিঙ্গ নিয়ে ছবি আঁকত, আমিও যদি আমার লিঙ্গ নিয়ে কিছু একটা করতে পারতাম। হা ভগবান ! মানুষ যদি তার দেহমনের সব কথা পরিষ্কার করে বলতে পারত ! এই অব্যক্ত কথার হাহাকার আর এক নরকযন্ত্রণা। সক্রেটিস এই কথা বলার প্রথম চেষ্টা করেন।

অবশেষে কনি মুখ তুলে বলল, পৃথিবীতে অনেক ভাল মেয়েও আছে।

পুরুষরা সবাই এটা চায়নি। কারণ কনি এতক্ষণ আনমনে সেলাই করতে করতে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যাতে সকলের মনে হচ্ছিল সে তাদের কথা শুনছে না কিছুই। তারা যখন শুনল কনি তাদের সব কথা শুনেছে তখন তারা বিরক্তিবোধ করতে লাগল।

টমি বলল, হে ভগবান! যদি তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে তাহলে আমিই বা তাদের কাছে ভাল হতে যাব কেন? না, না, কোন আশা নেই। কোন নারীর সঙ্গে মিলনের সময় আমি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে পারি না। কোন নারীকে হাতের মধ্যে পেয়েও তার সঙ্গে মিলতে পারি না। মন চায় না। আর আমি জোর করে নিজের উপর তা চাপিয়ে দিতেও চাই না। আমি যা আছি তাই থাকতে চাই এবং বরাবর মানসিক জীবন যাপন করে যেতে চাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। সে আনন্দ পবিত্র কিন্তু নৈরাশ্যজনকভাবে পবিত্র। আমার আর কোন আশা নেই। তুমি কি বল হিলদেব্রাণ্ড, মুরগীশাবক?

বেরি বলল, যত পবিত্র থাকবে জীবন তত কম জটিল হবে।

হ্যাঁ, জীবন খুবই সরল।

অধ্যায় ৫

ফেব্রুয়ারি মাসের বরফপড়া এক সকাল। ক্লিফোর্ড আর কনি পার্কের ভিতর দিয়ে বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার মানে ক্লিফোর্ড তার যান্ত্রিক চেয়ারে করে যাচ্ছিল আর কনি তার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল।

শুকনো বাতাসে ছিল গন্ধকের গন্ধ। কিন্তু ওরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তুষার আর ধোঁয়ায় দিগন্তটা কুহেলিকাচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ওদের মাথার উপরে ছিল নীল আকাশ। সব মিলিয়ে একটা বেষ্টনী রচনা করেছিল ওদের চারপাশে। আসলে মানুষের জীবনটাই যেন বেষ্টনীঘেরা এক স্বপ্ন অথবা এক অর্থহীন মত্ততা।

পার্কের ঘাসের উপর বরফ জমে ছিল। সে ঘাস খেতে গিয়ে ভেড়াগুলো কাশছিল। পার্কের মধ্য দিয়ে বনের কাছ পর্যন্ত সোজা একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল। পথটা দেখাচ্ছিল গোলাপী রঙের একটা বেতের মত। ক্লিফোর্ড কয়লাখনির ধার থেকে পাথর এনে পথটা সম্প্রতি পাকা করেছে। গোলাপী রঙের পাথরগুলোর উপর দিয়ে পথ হাঁটতে বড় ভাল লাগছিল কনির। উজ্জ্বল গোলাপী পাথরগুলোর উপর সাদা বরফ পড়ায় একটা নীলচে ভাব দেখা দিয়েছে।

বনে যাবার গেটটা খুলে দিল কনি। ক্লিফোর্ড তার যান্ত্রিক চেয়ারটা ধীর গতিতে চালিয়ে দিল। পথটা সোজা বনের দিকে চলে গেছে। পথের দুদিকে ছাটা গাছের বেড়া। এই বনে অতীতে রবিনহুড শিকার করে বেড়াত। এই বনের ভিতর দিয়ে ম্যানসফিল্ড যাবার রাস্তা ছিল। কিন্তু

বর্তমানে এটা ক্লিফোর্ডদের ব্যক্তিগত বনে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণের রাস্তাটা উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে গেছে।

সারা বনস্থলী একেবারে নিস্তব্ধ। বরফের উপর শুকনো ঝরা পাতাগুলো পড়ে ছিল। অনেক ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে বনে আর শিকার হত না। শিকারের মত কোন পাখি ছিল না। যুদ্ধের সময় সব পাখি মরে যায়, সব নিহত হয়। বর্তমানে ক্লিফোর্ড আবার শিকারের জন্য লোক রেখেছে একজন।

ক্লিফোর্ড এই বনটাকে বড় ভালবাসত। ভালবাসত সব গাছগুলোকে। তার মনে হত এই গাছগুলো পুরুষানুক্রমে তাদের অধিকারে। সে তাদের সংরক্ষণে তৎপর ছিল। সে চাইত এই নির্জন অরণ্যঅঞ্চলটা সমস্ত জগৎ থেকে পৃথক হয়ে থাক।

ক্লিফোর্ডের যান্ত্রিক চেয়ারটার চাকাগুলো যেতে যেতে বরফের উপর আটকে যাচ্ছিল প্রায়ই। যেতে যেতে হঠাৎ বাঁদিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেখানে তখনো অনেক বড় বড় গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল। তার মাঝে মাঝে কিছু কালো দাগ দেখা গেল। কাঠুরিয়ারা কিছু ঝরা পাতা আর বাজে কাঠ পোড়ানোর জন্য ঐ দাগগুলো হয়।

স্যার জিওফ্রে যুদ্ধের সময় এই জায়গার গাছগুলো পরিখার কাঠের জন্য কাটেন। জায়গাটা ডান দিকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে। তার মাথার কাছটায় যেখানে একদিন অনেক ওকগাছ দাঁড়িয়ে ছিল আজ সেখানটা একেবারে ফাঁকা, জায়গাটার অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়ালে দূরে কলিয়ারির রেলপথ দেখা যায়। দেখা যায় আরো কিছু নূতন কল কারখানা। কনি সেখানে দাঁড়িয়ে এই সব দেখেছে কিন্তু ক্লিফোর্ডকে সে কথা কিছু বলেনি।

এই জায়গাটা দেখলেই ক্লিফোর্ডের রাগ হয়। সে নিজে যুদ্ধে গিয়েছিল। এখানকার গাছগুলো কেন কাটা হয়, তাতে কি হয়, তা সে সব জানে। তবু এই ছোট টিলার মত জায়গাটার গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য তার রাগ হয় আর সেই রাগের বশবর্তী হয়ে সে ঘৃণা করতে থাকে স্যার জিওফ্রেকে।

তার চেয়ারটা যখন ধীর গতিতে উঠে যাচ্ছিল তখন ক্লিফোর্ড তার মধ্যে গম্ভীর মুখে বসে ছিল। কিন্তু উপরে ওঠার মুখটায় সে থেমে গেল। এতটা খাড়াই পথ কোন রকমে উঠে গেলেও নামার সময় অসুবিধা হবে বলে সে আর উঠল না। সে শুধু স্থির হয়ে ঢালু পথের দুধারের সবুজ গাছগুলোর পানে তাকিয়ে রইল। পথটা টিলাটার বুকের কাছ পর্যন্ত গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়।

ফেব্রুয়ারী মাসের ম্লান নিস্তেজ সূর্যালোকে আলোকিত জায়গাটায় ক্লিফোর্ড কনিকে বলল, এই জায়গাটাকে ইংল্যাণ্ডের আত্মা বলে মনে করি।

পথের উপর পড়ে থাকা একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে কনি বলল, তাই নাকি? তার পরনে ছিল নীল রঙের এক পোষাক।

ক্লিফোর্ড বলল, এটা হলো পুরনো ইংল্যাণ্ডের আত্মা এবং আমি এটা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই।

কনি বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কলিয়ারি থেকে এগারোটার ভোঁ বাজার শব্দ শুনতে পেল। এ শব্দ শুনতে অভ্যস্ত ছিল ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি এই বনটাকে একেবারে অক্ষত রাখতে চাই। কেউ যেন কোনভাবে একে স্পর্শ করতে না পারে, কেউ যেন এর মাঝে প্রবেশ করতে না পারে।

এই বনভূমির সঙ্গে এক সকরুণ দুঃখের কাহিনী জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের অরণ্যসমাচ্ছন্ন ভূপ্রকৃতির একটা রহস্য। কিন্তু স্যার জিওফ্রে এই বনভূমির একটা অংশে কিছু গাছ কেটে সে রহস্যকে একটা আঘাত দেন। ধূসর রঙের মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছগুলো তাদের সুজটিল শাখাপ্রশাখাগুলো আকাশের পানে তুলে ধরে কেমন সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকত টিলার পাথরের উপর। কত স্বচ্ছন্দভাবে এবং নিরাপদে পাখিরা উড়ে বেড়াত সে বনভূমিতে। একবার এ বনভূমিতে কিছু হরিণ দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কিছু তীরন্দাজ শিকারী। বনভূমির মধ্যবর্তী পথ দিয়ে গাধার পিঠে কত সন্ন্যাসী যাওয়া আসা করত। এই সব কিছুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এ বনভূমির সঙ্গে।

মসৃণ সুন্দর চুল আর রক্তাক্ত মুখের উপর শীতের দিনের স্তিমিতম্লান সূর্যের আলো মেখে এই সব কিছু ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড। তার মুখ-চোখের উপর ফুটে উঠেছিল বিষাদঘন এক রহস্যময়তার ভাব।

থমথমে গম্ভীর মুখখানা নিয়ে তার রহস্যঘন চোখের এক বিষাদময় দৃষ্টি ছড়িয়ে ক্লিফোর্ড বলল, আর কোথাও নয়, শুধু এই জায়গাটাতে এলেই আমার মনে হয় আমার একটি পুত্রসন্তান থাকলে ভাল হত।

কনি শান্তভাবে বলল, এই বনটা তোমাদের পরিবারের থেকে অনেক পুরনো।

ক্লিফোর্ড বলল, তা ত বটেই। কিন্তু আমরা এতদিন এটা রক্ষা করে এসেছি। আমরা ছাড়া এ বন কে রক্ষা করবে? এই অংশটার মত গোটা বনটাই চলে যেত। পুরনো ইংল্যাণ্ডের নিদর্শনস্বরূপ এ বনটা রক্ষা করা আমাদের উচিত।

কনি বলল, তাই নাকি? কিন্তু প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের সংরক্ষণ করতে গিয়ে যদি নূতন যুগের বিরোধিতা করতে হয় তাহলে সেটা হবে সত্যিই দুঃখজনক।

ক্লিফোর্ড বলল, প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের এই সব অংশ বা নিদর্শন যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে ইংল্যাণ্ড দেশটারই কিছু থাকবে না; বিশেষ করে আমাদের মত লোকের যাদের এই ধরনের সম্পত্তি আছে আর আছে সম্পত্তিগত

অধিকারবোধ তাদের এটা পরম কর্তব্য।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইল।

কনি বলল, হ্যাঁ কিছুকালের জন্য।

ক্লিফোর্ড বলল, কিছুকালের জন্য মানে? এটা আমাদের এক বিরাট কর্তব্য। আমরা অবশ্য এর অল্পই করতে পারি। এই জায়গাটা আমাদের অধিকারে আসার পর থেকে আমাদের বংশের লোকেরা তাদের কর্তব্যের খুব অল্পই করতে পেরেছে। আমরা পুরনো প্রথাকে লঙ্ঘন করতে পারি, কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করতে পারি না।।

আবার দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

কনি বলল, কিসের ঐতিহ্য?

ক্লিফোর্ড বলল, এই ধরনের প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের ঐতিহ্য।

কনি শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ।

ক্লিফোর্ড বলল, এই জন্যই ছেলের দরকার। পুত্রসন্তানই বংশধারার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখে।

কনির কিন্তু এই বংশধারার ধারাবাহিকতায় কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে কোন কথা বলল না। সে শুধু ক্লিফোর্ডের এই সন্তানকামনার অদ্ভুত নির্বিশেষত্ব নিয়ে ভাবতে লাগল।

অবশেষে কনি বলল, আমরা কোন সন্তান পেতে পারি না এজন্য দুঃখিত আমি।

তার আয়তম্লান চোখের নীলাভ দৃষ্টি ছড়িয়ে কনির পানে স্থিরভাবে তাকাল ক্লিফোর্ড। তারপর বলল, তুমি যদি অপর কোন লোকের দ্বারা একটি সন্তান ধারণ করতে পারতে তাহলে বড় ভাল হত আমাদের পক্ষে। আমরা যদি সে সন্তানকে এই র‍্যাগবিতে রেখে পালন করি তাহলে সে আমাদেরি সন্তান হবে। এবং আমাদের বংশেরই নাম রাখবে। আমি আমার পিতৃত্বে খুব একটা বিশ্বাস করি না।। কোন ছেলেকে এখানে রেখে মানুষ করে তুললেই সে আমাদের বংশের নাম রাখবে। সেইটাই যথেষ্ট। তুমি কথাটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করো না?

কনি এবার ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। হ্যাঁ। সন্তান—তার সন্তান। সে সন্তান হবে একান্তভাবে তার, ক্লিফোর্ডের কাছে সেটা একটা সামান্য ব্যাপার। কনি বলল, কিন্তু কে সে অপর লোক যার দ্বারা সন্তান লাভ করব?

সেটা কি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? তার সঙ্গে আমাদের খুব একটা গভীর সম্পর্ক নেই। একদিন তোমার এক প্রেমিক ছিল জার্মানিতে। তাতে কি যায় আসে এখন? কিছুই না। আমার মনে হয় এই সব ছোটখাটো কাজ বা সম্পর্ক যা আমরা বিভিন্ন সময়ে করে থাকি তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই আমাদের জীবনে। ওগুলো খুবই ক্ষণস্থায়ী। দুদিন পরে তারা আর থাকে না।

যেমন ধরো গত বছরের পড়া বরফ আর এ বছরে থাকে না।...জীবনে যা দীর্ঘদিন থাকে, যা স্থায়ী হয় তারই গুরুত্ব আছে জীবনে। যেমন আমার এই জীবন সে জীবন বিভিন্ন বিবর্তন ও স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। এ জীবনের মাঝে সাময়িক ক্ষণভঙ্গুর সম্পর্কের দাম কোথায়? বিশেষ করে সাময়িক যৌনসম্পর্ক? লোকে যদি তা নিয়ে হাস্যাস্পদভাবে বাড়াবাড়ি না করে তাহলে মানুষের এই সব যৌনসম্পর্ক বা সাময়িক দেহমিলনের ব্যাপারটা পাখিদের ক্ষণকালীন যৌন মিলনের মতই তুচ্ছ। তাতে কিছুই যায় আসে না। যে মিলন যে সঙ্গ যে সাহচর্য সারা জীবনব্যাপী স্থায়ী হয় তারই একটা গুরুত্ব বা মূল্য আছে। কার সঙ্গে আমরা দিনের পর দিন জীবন যাপন করি সেইটাই হচ্ছে আমাদের কাছে বড় কথা, কার সঙ্গে দু একদিন বিছানায় শুলাম বা ঘুমোলাম সেটা বড় কথা নয়। তুমি আমি দুজনে বিবাহিত। আমাদের দুজনের অভ্যাসগত ক্রিয়াকর্ম এক। এ ক্ষেত্রে আমাদের কার জীবনে ছোটখাটো দু-একটা ঘটনা কখন কি ঘটল তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মতে মানুষের যে ক্রিয়া অভ্যাসগত, যে ক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় দিনের পর দিন চলতে থাকে সে ক্রিয়া সাময়িক উত্তেজনা বা সংক্ষোভগত ক্রিয়ার থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। কোন সাময়িক উত্তেজনা বা আবেগ নয়, যা ধীরগতি, দীর্ঘস্থায়ী এবং পৌনপুনিক তাই আমাদের জীবনধারণে সহায়তা করে। দিনের পর দিন দুজনে বাস করতে করতে দুটি মানুষ এক গভীর অন্তরঙ্গতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের অন্তর এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় স্পন্দিত হতে থাকে পরস্পরের সুখে দুঃখে। এইটাই বিয়ের মূলমন্ত্র। এটা মোটেই যৌনক্রিয়ার ব্যাপার নয়। যৌন সম্পর্ক ত কখনই পারে না। তুমি আমি আমরা দুজনে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা যদি এই বন্ধনের প্রতি সারা জীবন শ্রদ্ধাশীল থাকি তাহলে যৌন ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সহজে বোঝাপড়া করতে পারি দুজনের মধ্যে। যেমন দাঁতে ব্যথা হলে আমরা দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাই। নিয়তি যখন আমাদের সামনে এক দেহগত বাধা এনে দিয়েছে তখন সে বাধা অপসারণের চেষ্টা করতেই হবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে এক ধরনের ভয় আর বিস্ময় অনুভব করতে লাগল কনি। সে বুঝতে পারল না ক্লিফোর্ড ঠিক বলছে না ভুল বলছে। সে মনে মনে বলল, তার হাতের কাছে রয়েছে মাইকেলিস। মাইকেলিসকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে এক সাময়িক প্রমোদভ্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘ দিনের অন্তরঙ্গতা, সুখদুঃখ আর সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে তাদের এই বিবাহিত জীবন। তবু মানুষের ক্লান্ত মন মাঝে মাঝে চায় সাময়িক প্রমোদ-ভ্রমণ। সে বিষয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রমোদভ্রমণের অর্থ হলো দুদিন পরেই আবার সেই অভ্যস্ত জীবনধারায় ফিরে আসা।

কনি এবার জিজ্ঞাসা করল, কার সন্তান আমি গর্ভে ধারণ করছি সে বিষয়ে তুমি কিছু মনে করবে না ?

ক্লিফোর্ড বলল, কেন কনি, তোমার স্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্তির উপরেই নির্বাচনের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। কারণ তাতে আমার বিশ্বাস আছে। তুমি নিশ্চয় কোন বাজে লোককে নির্বাচিত করবে না।

কনি ভাবছিল মাইকেলিসের কথা। ক্লিফোর্ডের মতে মাইকেলিস নিশ্চয়ই একটা বাজে লোক।

কনি বলল, কিন্তু বাজে লোকের ধারণা সব নরনারীর সমান নয়।

ক্লিফোর্ড বলল, তা অবশ্য নয়। তুমি নিশ্চয় আমার কথা ভেবে নির্বাচন করবে। তুমি অবশ্যই এমন লোককে নির্বাচন করবে না যে আমার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করত। তোমার মনের স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম তা তোমায় করতে দেবে না।

কনি চুপ করে রইল। যে যুক্তিতে অন্তর সায় দেয় না সে যুক্তির উত্তর দেওয়া অর্থহীন।

কনি চঞ্চলভাবে ক্লিফোর্ডের পানে চোখ তুলে বলল, তুমি কি চাও আমি কোন লোকের নাম বলি ?

ক্লিফোর্ড বলল, না, মোটেই। সে নাম আমাব পক্ষে না জানাই ভাল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবে যে সাময়িক যৌন সম্পর্ক সুদীর্ঘলালিত কোন দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে কিছুই নয়। তুমি কি আমার মতে মত দিতে পার না ? যৌন ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক প্রয়োজনীয় বস্তুরাজির অধীন! এখন এটা প্রয়োজন। অতএব এটা ব্যবহার করো। এই সব সাময়িক উত্তেজনার কি কোন দাম আছে ? দীর্ঘদিন ধরে এক অখণ্ড ও সুসংহত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা ও অখণ্ড জীবন যাপন করাই হলো মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। খণ্ডিত জীবন যাপনের কোন অর্থই হয় না। যৌন অভিজ্ঞতা বা যৌন তৃপ্তির অভাব যদি তোমার জীবনবোধকে খণ্ডিত করে রাখে তাহলে অবশ্যই কারো সঙ্গে প্রেমসম্পর্কের মধ্য দিয়ে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করো। যদি সন্তানের অভাব তোমার জীবনবোধকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তাহলে সম্ভব হলে যে কোনভাবে এক সন্তান লাভ করো। কিন্তু এই সব কিছু এমনভাবে করবে যাতে তুমি অখণ্ড জীবন যাপন করতে পার। এই অখণ্ড জীবনবোধই আমাদের ছিন্নভিন্ন প্রাণ-শক্তিগুলিকে এক দীর্ঘায়িত ঐক্য দান করে। তুমি আমি দুজনে মিলে তাই করতে পারি। তুমি কি মনে করো ? প্রয়োজনের সঙ্গে অবশ্যই আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে নিজেদের। কিন্তু আমরা যে জীবন যাপন করছি সে জীবনের সঙ্গে এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটার যেন সংগতি থাকে। তুমি কি বলো ?

কথাগুলো শুনে স্তব্ধ ও অভিভূত হয়ে গেল কনি। সে বুঝল তত্ত্বগতভাবে ক্লিফোর্ড ঠিক বলছে। কিন্তু যখন বাস্তবে সে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে যৌথভাবে যাপিত তার জীবনের কথাটা ভাবল তখন কুণ্ঠার কাঁটা এসে বিঁধতে লাগল তার মনটাকে। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে চিরদিন ধরে এক যৌথ জীবনের জাল বুনে চলাই কি হবে তার একমাত্র বিধিনির্দিষ্ট কাজ? তার অমোঘ নিয়তির অনপনেয় লিখন? এর থেকে কোন অব্যাহতি নেই?

তাই কি? চিরদিন ধরে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে এক অখণ্ড জীবনের একখানি বস্ত্র বয়ন করেই কি তৃপ্ত থাকতে হবে তাকে? তবে হয়ত সে বস্ত্রের উপর থাকবে সাময়িক প্রমোদভ্রমণরূপ কিছু ফুলের কারুকার্য। কিন্তু কি করে সে বলবে পরের বছর তার মনের ভাব তার মনের অনুভূতি কি থাকবে? কি করে তা জানা সম্ভব? বছরের পর বছর ধরে একই 'হাঁ' কথাটা কে বলে যেতে পারে? এই ছোট হাঁ কথাটা কোথায় উড়ে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। যে কথা প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে যায় সে কথার পলাতক প্রতিশ্রুতিজালে কেমন করে একটি মানুষ সারাজীবন আবদ্ধ থাকতে পারে? উড্ডীয়মান প্রজাপতির মত এই হাঁ বা না কথাটা অন্য কথার চাপে কোথায় উড়ে যেতে পারে।

কনি বলল, তুমি ঠিক বলেছ ক্লিফোর্ড। যতদূর আমি বুঝছি আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। তবে আমার মনে হচ্ছে এর থেকে জীবনের একটি ভিন্ন মুখ আমরা দেখতে পাব।

ক্লিফোর্ড বলল, যতদিন জীবন তাব নূতন মুখে নূতনরূপে দেখা না দেয় ততদিন ত তুমি একমত আছ আমাব সঙ্গে?

কনি বলল, নিশ্চয়। একমত আছি।

একটা বাদামী রঙেব কুকুর নাকটা তুলে ওদের দিকেই আসছিল। কনি সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। কুকুবটা মৃদু স্বরে শব্দ করছিল। কুকুরটার পিছু পিছু বন্দুক হাতে একটা লোক হঠাৎ ওদের সামনে এসে হাজির হলো। লোকটা এত দ্রুত এসে হাজির হলো যে কনি ভয় পেয়ে গেল। লোকটাও প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে ওদের সামনে একবার এসে অভিবাদন করে চলে গেল। ও হচ্ছে এ বনের নূতন রক্ষক ও পশুপালক।

লোকটার পরনে ছিল সেকেলে ধরনের ঘন সবুজ রঙের মখমলের পোষাক। তার মুখটা লালচে ধরনের। তার মোচটাও লাল। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ভাসা ভাসা, কেমন যেন দূরগামী। ঢালু পথটা দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছিল সে।

ক্লিফোর্ড ডাক দিল, মেলর্স।

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে সৈনিকের মত অভিবাদন জানাল ক্লিফোর্ডকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি চেয়ারটা ঘুরিয়ে একটু চালিয়ে দেবে?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে শান্ত অথচ দ্রুত ভঙ্গিতে চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়াল। সে মাঝামাঝি ধরনের লম্বা; চেহারাটা দোহারা। কথা প্রায় বলেই না। সে কনির দিকে একবার তাকালও না, শুধু চেয়ারটার উপরেই নিবদ্ধ রাখল তার দৃষ্টি।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি, এ আমাদের বাগানের নূতন মালী। মেলর্স, তুমি তোমার গিন্নীমার সঙ্গে কথা বলনি এখনো?

শান্ত ও নির্বিকার কণ্ঠে লোকটি বলল, না স্যার।

লোকটি দাঁড়িয়ে তার টুপীটা মাথা থেকে তুলল। তার মাথার ঘন সুন্দর চুলগুলো দেখা গেল। এরপর সে কনির মুখপানে তার স্থির আয়ত অথচ নির্বিকার দৃষ্টি মেলে ভাল করে তাকাল, যেন কনি কি ধরনের মেয়ে তা সে খুঁটিয়ে দেখে নিল। কনি কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেল। লোকটি তার টুপীটা বাঁ হাতে ধরে কনির উদ্দেশ্যে মাথাটা একটু নত করল। কিন্তু কোন কথা বলল না। টুপীটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

কনি তাকে বলল, তুমি হয়ত এখানে বেশ কিছুদিন আছ?

সে তখন শান্তভাবে বলল, আট মাস ম্যাডাম।

কনি আবার বলল, জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়?

কথাটা বলে লোকটার মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটা তার চোখ দুটো কিছুটা সংকুচিত করে কনির পানে তাকাল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা শ্লেষ আর নির্লজ্জতার ভাব ছিল।

হ্যাঁ, ম্যাডাম, ধন্যবাদ।

কথাটা বলেই মাথাটা একটু নত করে টুপীটা পরে চেয়ারটা ধরার জন্য এগিয়ে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে। তার শেষ কথাটার মধ্যে একটা আঞ্চলিক টান ছিল। তবে তার মধ্যে একটা কৃত্রিম সচেষ্টতা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ এর আগে সে যে সব কথা বলেছিল তার মধ্যে কোন আঞ্চলিকতার ছাপ ছিল না। হয়ত সে একজন প্রচ্ছন্ন ভদ্রলোক। যাই হোক, আর পাঁচজন লোক থেকে সে পৃথক, একক এবং আত্মস্থ, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এদিকে ক্লিফোর্ড এঞ্জিনটা চালাতে শুরু করল। লোকটা চেয়ারটার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে তারা সমতলবর্তী বনের দিকে এগিয়ে চলল।

লোকটি বলল, হয়েছে ত স্যার ক্লিফোর্ড?

ক্লিফোর্ড বলল, না তুমি সঙ্গে এস, যদি কোথাও আটকে যায়। উঁচু-নিচু পথের পক্ষে এঞ্জিনটা তত ভাল নয়।

লোকটি তখন কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে কুকুরটার পানে তাকাল। কুকুরটা তার পানে তাকিয়ে তার লেজ নাড়ল। একটুখানি মৃদু উপহাসের হাসি ফুটে উঠল লোকটির মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। ঢালু পথটা বেয়ে ওরা নেমে যেতে লাগল। লোকটি তার হাতদুটো চেয়ারের হাতলে রেখে

এগিয়ে চলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের ভৃত্য নয়, একজন স্বাধীন সৈনিক। তাকে দেখে টমি ডিউকের কথা মনে পড়ছিল কনির।

ওরা হেজেল বনের কাছে আসতেই কনি ওদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গিয়ে গেটের দরজাটা খুলে ধরে রইল। সে যখন গেটের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন গেটটা পার হবার সময় ওরা দুজনেই একসঙ্গে তাকাল তার পানে। ক্লিফোর্ডের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষের ভাব আর লোকটার দৃষ্টির মধ্যে ছিল এক শান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মনিরপেক্ষতার ভাব। কিন্তু আত্মনিরপেক্ষ হলেও সে দৃষ্টির মধ্যে উত্তাপ ছিল। তার নীল নির্বিকার চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে কনি দেখল, সে দৃষ্টির মধ্যে এক দীর্ঘ দুঃখভোগ আর অনাসক্তির ভাব ছিল। তার চোখে কিছু উত্তাপও ছিল। কিন্তু কেন সে একা একা থাকে? কেন আর পাঁচজন থেকে সে পৃথক? সৌজন্যসহকারে ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা থামাল গেটটা পার হয়ে। লোকটি তাড়াতাড়ি গিয়ে গেটটা বন্ধ করে দিল।

ক্লিফোর্ড কনিকে বলল, তুমি কেন গেটটা খুলতে গেলে? মেলর্স রয়েছে, ও খুলত।

শান্ত কণ্ঠে ক্লিফোর্ড কথাটা বললেও তার কথা শুনে বোঝা গেল সে অসন্তুষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে কনির প্রতি।

কনি বলল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা চলে যাবে গেটটা খোলা পেলে।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমাকে আমাদের পিছনে ছোটবার জন্য ফেলে যাব?

কনি বলল, আমি মাঝে মাঝে ছুটতে চাই।

মেলর্স আবার চেয়ারটা ধরে এগিয়ে চলল। সে যেন এসব কোন কথায় কান দেয়নি এমন একটা ভাব দেখাল। কিন্তু কনির মনে হলো সে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। সে যখন পার্কের উঁচু জায়গাটায় চেয়ারটা ঠেলছিল তখন হাঁপাচ্ছিল। তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে ছিল। তার দেহটা রোগা রোগা, কিন্তু অদ্ভুতভাবে প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর। রোগা হলেও সে শান্ত প্রকৃতির। কনির নারীমন খুঁটিয়ে দেখে এই সব বুঝতে পারল।

কনি ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়ল। ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা চলে যাক। দিনের আলো সব নিবে গিয়ে ধূসর হয়ে উঠছিল চারদিক। দিগন্তে ঢলে পড়া আকাশটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল কুয়াশায়। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। শীঘ্রই বরফ পড়তে শুরু করবে। চারদিক শুধু ধূসর আর ধূসর। একেবারে নিস্তেজ প্রাণহীন দেখাচ্ছিল সারা পৃথিবীটা।

উঁচু পথটায় উঠে গিয়ে চেয়ার থেকে পিছন ফিরে তাকাল ক্লিফোর্ড। বলল, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

কনি বলল, কই না ত।

কিন্তু সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কনি। ক্লান্ত পুরাতন এক কামনার ব্যাকুলতা, এক অদম্য অতৃপ্তি আবার মাথা তুলে উঠল তার মধ্যে। ক্লিফোর্ড তা লক্ষ্য করেনি। এ সব সে কোনদিনই লক্ষ্য করে না। এ সব তার কাছে লক্ষ্যনীয় বস্তু নয়। কিন্তু কনির নবপরিচিত লোকটি এ সব লক্ষ্য করেছে মনে হলো। কনির মনে হলো সমস্ত জগৎ ও জীবন অতিশয় প্রাচীন আর প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। মনে হলো, তার অতৃপ্তি ঐ পাহাড়টার থেকেও পুরনো।

ওরা বাড়ির কাছে আবার ফিরে এল। কিন্তু তখন যান্ত্রিক চেয়ারটা হতে তাব বাড়ির চাকাওয়ালা চেয়ারটায় নিজে থেকেই উঠে বসল। তারপর কনি তার অসাড় পাদুটো তুলে দিল। কনি যখন তার পাদুটো হাত দিয়ে তুলছিল তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা ঘুরিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মেলর্সকে বলল, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ মেলর্স।

মেলর্স যেন কি ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে আনমনে বলল, আর কোন কাজ নেই স্যার ?

না।

নমস্কার স্যার।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে কনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মেলর্সকে লক্ষ্য করে বলল, উঁচু পথে চেয়ারটা দয়া করে ঠেলে নিয়ে গিয়ে অনেক উপকার করেছ। তোমার কি খুব ভারী লাগছিল ?

সহসা কনির প্রতি সচেতন হয়ে উঠল মেলর্স। ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠে যেন সে কনির পানে তাকাল চোখ মেলে। বলল, না না। মোটেই ভারী লাগেনি।

তারপর তার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, নমস্কার ম্যাডাম।

খাবার সময় ক্লিফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল কনি, লোকটা কে ?

ক্লিফোর্ড বলল, মেলর্স, তুমি ত দেখলে।

হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু লোকটা কোথা থেকে এসেছে ?

কোথাও থেকে নয়, ও এখানকারই এক খনিশ্রমিকের ছেলে।

ও নিজেও কি খনিশ্রমিকের কাজ করত ?

ক্লিফোর্ড বলল, ও আগে কামারের কাজ করত খাদের ধারে। যুদ্ধের দুবছর আগে ও আমাদের বাগানের মালী হিসাবে ঢোকে। তারপর যুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধ থেকে ও ফিরে এসে আবার কামারের কাজ শুরু করতে গেলে আমি ওকে এ কাজে নিযুক্ত করি, কারণ লোকটা সম্বন্ধে বাবার একটা ভাল ধারণা ছিল। আমি ওকে পেয়ে খুশি, কারণ এ কাজে ভাল লোক পাওয়াই যায় না। বিশেষ এমন একজন লোক যে এখানকার লোকদের চেনে।

লোকটি কি বিবাহিত ?

হ্যাঁ, বিয়ে একটা হয়েছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে যায়। এর তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। শেষে এক খনিশ্রমিকের সঙ্গে ঘর করতে থাকে। এখনো সেখানেই আছে।

তাহলে লোকটি একাই এখানে থাকে?

ক্লিফোর্ড তার উপর ম্লান চোখ তুলে কনির পানে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট হয়ে উঠল। সে যেন শুধু তার জীবনপথের সামনেটুকুই দেখতে পাচ্ছে, সেইটুকুর প্রতিই সচেতন পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু সে পথের অতিক্রান্ত সমগ্র পশ্চাদভূমিটি ধোঁয়া-ধোঁয়া এক নিবিড় কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সহসা তার মনে হলো পিছনের সেই কুয়াশাটা তার সামনে এসে হাজির হয়েছে। সে যখন মেলর্সএর জীবনকথা বলার সময় কনির পানে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিল তখন কনির মনে হচ্ছিল ক্লিফোর্ডের মনের সমগ্র পটভূমিটা জুড়ে বিবাজ করছে কুয়াশাঘেরা এক অন্তহীন শূন্যতা। তা দেখে ভয় পেয়ে গেল কনি। তার মনে হলো এই শূন্যতাই এক অর্থহীন ঔদাসীন্য আব অজ্ঞতার স্থষ্টি করেছে ক্লিফোর্ডের মধ্যে।

সহসা মানবাত্মার এক সাধারণ নিয়মের প্রতি অস্পষ্টভাবে সচেতন হয়ে উঠল কনি। মানুষের আবেগানুভূতিশীল আত্মা যে আঘাত লাভ করে সে আঘাত তার দেহকে স্পর্শ করে না। কিন্তু দেহের আঘাত যেমন ধীরে ধীরে আবোগ্যলাভ করে তেমনি আত্মা বা মনের আঘাতও আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু এই আরোগ্যতা আপাতসত্য মাত্র। মন সে আঘাত আবার অনুভব করতে থাকে ধীরে ধীরে, ঠিক যেমন দেহগত গভীর ক্ষতস্থানের ব্যথাটি দেহের অভ্যন্তরভাগে গিয়ে অনুভূত হতে থাকে ধীরে ধীরে। যখনি আমাদের মনে হয় মন বা আত্মার সে আঘাত থেকে আরোগ্য হয়ে উঠেছি তখনি ভয়ঙ্কর-ভাবে অনুভূত হতে থাকে সে আঘাতের ব্যথা।

ক্লিফোর্ডেরও তাই হলো। র‍্যাগবিতে আসার পর একবার তার মনে হলো সে একেবারে সেবে উঠেছে দেহেমনে। দেহগত বিপর্যয়ের জন্য যে আঘাত সে মনে পায় লেখালেখি করার সময় ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে সে আঘাতের ব্যথা। দীর্ঘ দিন পর জীবনে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সে। তার মনের ভারসাম্য আবার সে ফিরে পায়। কিন্তু আজ কনির মনে হলো কয়েক বছর পর সেই কঠিন শঙ্কা আর বিপন্ন ভাবটা আবার যেন ফিরে এসেছে ক্লিফোর্ডের মনে। তার মনের সমগ্র পটভূমি জুড়ে সে ভাব সে আঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। এক সময় সে আঘাতের ব্যথাটা এত গভীর ছিল যে তা সে অনুভূত করতেই পারত না। মনে হত, ব্যথাটা যেন আর একেবারেই নেই। আজ আবার সে ব্যথা দেখা দিয়েছে। পক্ষাঘাত রোগের মত সেই কঠিন শঙ্কাটা ছড়িয়ে পড়ছে তার মনে। মনে মনে আজও সে সতেজ এবং সজীব থাকলেও সেই আঘাতজনিত ক্ষতের ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিহত আত্মায়।

. কনির মনে হলো শুধু ক্লিফোর্ডের মনে বা আত্মায় নয়। সে আঘাতের ব্যথাটা তার মনেও ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। একটা নিগূঢ়নিবিড় শঙ্কা, একটা শূন্যতা, সব কিছুর প্রতি একটা ঔদাসীন্য আর অনাসক্তি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে তার সমগ্র অন্তরাত্মা জুড়ে। একটু পরে ক্লিফোর্ডের চমক ভাঙ্গলে সে চমৎকারভাবে কথা বলতে লাগল। যেমন একটু আগে বনভূমিতে বেড়াতে বেড়াতে তাকে সন্তান ধারণের কথা ও র‍্যাগবির উত্তরাধিকারীর কথা বলছিল। কিন্তু একদিন পরেই সেই সব কথা শুকনো ঝরা পাতার মতই অর্থহীন মনে হলো কনির যে কথার পাতা একটু পরেই গুঁড়ো হয়ে উড়ে যাবে যে কোন দমকা বাতাসে। সে কথা কোন ফলপ্রসূ জীবন-বৃক্ষের অঙ্গীভূত কোন সজীব পাতা নয়, সে কথা হলো বন্ধ্যাবিশুষ্ক এক ব্যর্থ জীবনের ঝরা পাতা।

এই শুকনো ঝরা পাতা শুধু ক্লিফোর্ডের জীবনে নয়, সর্বত্র দেখতে পেল কনি। ত্রেভারশালের খনিশ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের কথা বলছিল। কনি এই ধর্মঘটের কথার মধ্যে কোন প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেল না, পেল এক অবদমিত সংগ্রামের পুনরুদ্দীপিত এক উদ্দামতার পরিচয়। এই উদ্দামতা আজ নূতন করে এক অশান্তির বেদনা, এক অতৃপ্তির আবেশ জাগিয়ে তোলে মনের মাঝে। এ সংগ্রামের প্রবৃত্তি ঢুকে গেছে উভয়পক্ষের রক্তের গভীরে এবং এ সংগ্রামের অবসানের জন্য উভয় পক্ষকেই বংশানুক্রমে রক্ত দান করে যেতে হবে।

হায়, বেচারী কনি। একটা শূন্যতাবোধ, একটা অনস্তিত্বের আশঙ্কা আচ্ছন্ন করে ফেলল তার সমগ্র মনকে। ক্লিফোর্ড ও তার দুজনেরই মন এ শূন্যতাকে অনুভব করতে শুরু করল। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, তাদের দুজনের অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা যা শুধু একটা মনগড়া অন্তরঙ্গতার অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা দুদিন পরে একটা মিথ্যা শূন্যতায় হবে পযবসিত। এ শুধু কথার কথা। সব মিথ্যা, এক্ষেত্রে একমাত্র সত্য হলো শূন্যতা, অন্তহীন অর্থহীন শূন্যতা।

ক্লিফোর্ড অবশ্য সাফল্য লাভ করেছে। সেই পথকুক্কুরীর কৃপালাভ করেছে। একথা সত্য যে সে এখন অনেকটা খ্যাতি লাভ করেছে। তার বই থেকে হাজার পাউণ্ড সে পেয়েছে। তার ছবি এখন সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। চিত্রশালায় তার আবক্ষ মূর্তি সংরক্ষিত আছে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে আধুনিক বলে গণ্য করা হয়। প্রচারের জন্য লালায়িত তার পঙ্গু ও বিকৃত প্রবৃত্তির দৌলতে সে মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যেই তরুণ উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ও খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্লিফোর্ডের লেখার মধ্যে বুদ্ধির ব্যাপারটা কোথা থেকে কিভাবে এল। একটা দিকে খুবই চালাক ক্লিফোর্ড। সে তার লেখার মধ্যে কিছুটা হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষ আর তার যৌন প্রবৃত্তিগুলোকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা ছিন্নভিন্ন

করে দিয়েছে। কিন্তু তার কাজটা কুকুর-ছানাদের ঘরের সোফার গদি ছেঁড়ার মতই অর্থহীন। তবে তফাৎটা এই যে ক্লিফোর্ড বয়সে কুকুরছানার মত নবীন নয়, তার বয়স হয়েছে এবং সে একগুঁয়ে আর অহংকারী। সমস্ত ব্যাপারটাই কনির কাছে ভূতুড়ে আর অর্থহীন। এই কথাটাই কনির অন্তরাত্মার তল-দেশের গভীরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বারবার, আসলে এগুলো কিছুই না। শুধু এক অর্থহীন শূন্যতার বিস্ময়কর ও বর্ণাঢ্য প্রকাশমাত্র। শুধু এক বর্ণাঢ্য প্রকাশ। অর্থহীন আত্মপ্রচার।

ক্লিফোর্ডকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে একটা নাটক লিখছে মাইকেলিস। প্রথম অঙ্ক ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গেছে। কনির মতে এর কারণ হলো, এই অসার শূন্যতার প্রচারের দিক থেকে ক্লিফোর্ডের থেকে মাইকেলিস বেশী পারদর্শী। আত্মপ্রচারই এই লোকগুলোর জীবনের একমাত্র ধর্ম। এই আত্মপ্রচারের আবেগ ওদের অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে এ ছাড়া আর ওরা কিছুই জানে না। যৌন ব্যাপারে ওদের কোন আবেগ নেই, উৎসাহ নেই; এ ব্যাপারে ওরা একেবারে মৃত। মাইকেলিস এখন আর টাকা চায় না, চায় আত্মপ্রচার। কখনই তা চায়নি, আত্মপ্রচারের পথে যেতে যেতে ঘটনাক্রমে যা পেয়েছে তাই নিয়েছে। ক্লিফোর্ডও তা চায়নি, যখন যা পেয়েছে নিয়েছে। তাছাড়া টাকাটা সাফল্যের সীলমোহর বলে এই টাকা ওদের করতে হয়েছে। ওরা চেয়েছিল সাফল্য আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল টাকা। আসলে এই দুটোই আত্মপ্রচারের চরম উপাদান বলে ওরা এই দুটোই চেয়েছিল। চেয়েছিল এই চূড়ান্ত আত্মপ্রচারের মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য জনগণের হৃদয় জয় করতে।

সত্যিই কি আশ্চর্যের কথা! সেই পথকুক্কুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি করা। কনির কাছে এর কোন দাম নেই, এসব অর্থহীন, অসার শূন্যতা কারণ সে এ সবের বাইরে আছে চিরদিন, কারণ ওদের এই সব সাফল্যের ঘটনা রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগাতে পারেনি কোনদিন। যদিও যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য বার সেই পথকুক্কুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি করে এসেছে তবু কনি জানে আসলে এ সাফল্যের কোন মূল্য নেই, কোন অর্থ নেই, কোন সারবত্তা নেই। মাইকেলিস একদিন ক্লিফোর্ডের কাছে চিঠি লিখে জানাল নাটকটার কথা। একথা সে আগেই জানত। কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলকের শিহরণ জাগল ক্লিফোর্ডের মধ্যে। এর মাধ্যমেও তার প্রচার ঘটবে। এ ক্ষেত্রে সে নিজে নিজের প্রচার করছে না, প্রচার করছে অন্য জন। ক্লিফোর্ডকে নাটকটার প্রথম অঙ্ক নিয়ে র‍্যাগবিতে আসতে বলল।

মাইকেলিস এল গ্রীষ্মকালে। তার পরনে ছিল হালকা রঙের স্যুট। হাতে ছিল সাদা দস্তানা। আর কনির জন্য কিছু ফুল। ফুলগুলো সত্যিই ছিল

বড় সুন্দর। নাটকের প্রথম অঙ্কটা সত্যিই চমৎকার হয়েছে। ক্লিফোর্ডের মত সেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তা পড়ে। তার দেহের মধ্যে যেটুকু অস্থি-মজ্জা অবশিষ্ট ছিল তা শিহরিত হয়ে উঠল। মানুষের মধ্যে এই রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগানোর এক বিরল ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারায় মাইকেলিসকে বিস্ময়করভাবে সুন্দর দেখাচ্ছিল কনির চোখে। কনি মাইকেলিসের মধ্যে খুঁজে পায় প্রাচীন সেই মানবজাতির এক সনাতন অপরিবর্তনীয়তার ছবি যে মানুষ তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পবিত্রতা সম্পর্কিত ভাবমূর্তি হতে মোহমুক্ত হতে চায় না কোনক্রমে। সেই পথকুক্কুরী সাফল্যের দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপারে মাইকেলিস যেন হাতির দাঁতের এক আফ্রিকান মুখোস যা পবিত্রতার মাঝে অপবিত্রতার স্বপ্ন দেখে।

যে মুহূর্তে মাইকেলিস চ্যাটার্লি পরিবারের এই নায়ক-নায়িকাকে আনন্দে আত্মহারা করে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই মুহূর্তটি তার জীবনে যেন সবচেয়ে মূল্যবান এক চরম মুহূর্ত। সত্যিই সে সফল হয়েছে। সার্থক হয়েছে তার শ্রম। তাদের সে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষণিকের জন্য হলেও ক্লিফোর্ডও তাকে ভালবেসে ফেলে।

পরের দিন সকালে মিককে দারুণ অশান্ত ও চঞ্চল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিসের একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করছে সে। কনি গত রাতে তার কাছে আসেনি।···মিক কনির শোবার ঘর খুঁজে পায়নি রাতে। তার এই জয়ের গৌরবময় মুহূর্তে কনি যেন ছলনা করছে তার সঙ্গে।

সকাল হতেই তাই মিক সোজা কনির বসার ঘরে চলে গেল। কনি জানত সে আসবে। মিকের মধ্যে চঞ্চল ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মিক তার নাটকের কথা জানতে চাইল কনির কাছ থেকে। জানতে চাইল নাটকটা তার ভাল লাগছে কি না। এ নাটকের প্রশংসা কনির মুখ থেকে শুনতে চায় সে। এ প্রশংসা হৃদয়ে তার যে শিহরণ জাগাবে সে শিহরণ যে কোন যৌন-তৃপ্তিসঞ্জাত শিহরণের থেকে অনেক বেশী দামী। কনি আবেগের সঙ্গে তার প্রশংসা করল। কিন্তু মুখে এ কথা সে বললেও অন্তরের গভীরে সে বেশ বুঝতে পারছিল আসলে ওটা কিছুই হয় নি।

হঠাৎ মিক বলে বসল, দেখ, কেন আমরা পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটার মোকাবিলা করছি না? কেন আমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি না?

কনি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। কিন্তু আসলে কথাটার মধ্যে কোন গুরুত্ব সে খুঁজে পেল না। সে শুধু বলল, কিন্তু আমি ত বিবাহিত।

মিক বলল, তাতে কি হয়েছে। ও না হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ করবে। তুমি আমি কেন আমরা বিয়ে করছি না? আমি এখন বিয়ে করতে চাই। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়। এখন আমাকে বিয়ে করে নিয়মিত

সংসার-জীবন যাপন করতে হবে। আমি কি ভয়ংকর জীবন যাপন করছি তা ভেবে দেখ একবার। আমি শুধু নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি। একবার ভেবে দেখ, আমরা দুজনে পরস্পরের জন্যই তৈরি হয়েছি। যেমন হাত আর দস্তানা, অভিন্নহৃদয় দুজনে। কেন তবে বিয়ে করছি না আমরা? এর কারণ তুমি কিছু জান কি?

কনি মিকের দিকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কিন্তু মিকের এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন গুরুত্ব অনুভব করল না। তার মনে হলো, এই সব পুরুষগুলো সকলেই স্বভাবতঃ এক। তারা সব কিছু প্রকাশ করে ফেলতে চায়। কোন কিছু গোপন করে রাখতে পারে না। তারা আতসবাজীর মত মাথা ফুঁড়ে ফেটে বেরিয়ে পড়ে আকাশের পানে ছুটে যেতে চায়।

কনি বলল, কিন্তু আমি বিবাহিত। তুমি জান ক্লিফোর্ডকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না।

মিক জোর গলায় বলল, কেন পার না? তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার ছ মাস পরেও সে জানতে বা বুঝতে পারবে না। সে একমাত্র নিজের ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখে না। আমি যতদূর দেখছি তোমাকে ভদ্রলোকের কোন প্রয়োজনই নেই। সে একেবারে নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে আছে।

একথার সত্যতা বুঝতে পারল কনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারল যে মিক নিঃস্বার্থভাবে একথা বলছে না, তার একথার মধ্যেও আছে আত্ম-প্রচারের মোহ।

কনি বলল, সব মানুষই কি নিজেকে নিয়ে মত্ত হয়ে নেই?

মিক বলল, আমি স্বীকার করি অল্পবিস্তর সব মানুষই তাই। বাঁচতে হলে সকলকেই তাই করতে হবে। কিন্তু সেটা এমন বড় কথা নয়, বড় কথা হলো এই যে, একটা মানুষ কতখানি সময় তার স্ত্রীকে দিতে পারবে। যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি বেশী সময় দিতে না পারে তাহলে তার স্ত্রীর উপর কোন অধিকারই নেই।

এবার মিক তার চোখগুলো বড় বড় করে কনির মুখপানে তাকাল। তারপর আবার বলল, আমি এখন কোন নারীকে তার প্রয়োজনমত অনেক সময় দান করতে পারি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কি ধরনের সময়? প্রশ্নটা করেই মিকের দিকে তাকাল কনি। তার দৃষ্টির মধ্যে তখনো ছিল সেই বিস্ময় আর রোমাঞ্চকর মাদকতা। তবু মিকের কথার মধ্যে কোন গুরুত্ব খুঁজে পেল না সে।

মিকের প্রতিটি কথার মধ্যে এক বিজয়গর্বের উদ্দামতা আর উজ্জ্বলতা ফেটে পড়ছিল। কনি তার দিকে তেমনি এক আপাতমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মিক তার সামনে যে উজ্জ্বল লোভনীয় ছবি তুলে ধরল তাতে তার

মনের উপরিপৃষ্ঠে বিস্ময়ের যত রোমাঞ্চই জাগুক না কেন তার মনের গভীরতম তলদেশে কোন অনুভূতিই জাগল না সে ছবির উদ্দীপনায়। সে মিকের দিকে তেমনিই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কিন্তু অন্তরে কিছুই অনুভব করল না। শুধু তার কথার মধ্যে, আশ্বাসের উজ্জ্বল নিবিড়তার মধ্যে সেই কুক্কুরীদেবীর একটা গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিকর। কেমন যেন দুঃসহভাবে উৎকট।

তার চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে রইল মিক। কনির উপর নিবদ্ধ তার অপ্রকৃতিস্থ চোখের জলজ্বলে দৃষ্টি ছড়িয়ে তখনো সেইভাবে তাকিয়ে রইল। তার প্রস্তাবেব উত্তরে কনি কি বলবে সে বিষয়ে অহঙ্কার না আশঙ্কা কি ছিল তার মনে তা তার দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

কনি বলল, ব্যাপাবটা নিয়ে ভাবতে হবে। এখনি কিছু বলতে পাবছি না। তোমার মনে হচ্ছে ক্লিফোর্ড আমার উপব গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেন তা তাব দেহগত অসামর্থ্য বা পঙ্গুতাব কথা বিবেচনা করে বোঝা উচিত।

রেখে দাও ও সব কথা। একটা লোক যদি তার পঙ্গুতাকে ভাঙ্গিয়ে সাবাজীবন খায়, যদি তার এই পঙ্গুতা ছাড়া আব কোন গুণ না থাকে তাহলে কি বলতে হয়? তার থেকে তার একা থাকাই ভাল সাবাজীবন।

কথাটা বলে তাব পায়জামাব পকেটের ভিতবে হাত রেখে ঘুবে দাঁড়াল মিক। সেদিন সন্ধ্যায় সে কনিকে বলল, আজ রাতে আমার ঘরে আসছ ত? তোমার ঘরটা কোথায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।

কনি বলল, ঠিক আছে।

সেদিন রাতে মিকের যৌন উত্তেজনার পবিমাণটা বেশী মনে হলো আগের থেকে। তবু তার নগ্ন দেহটা ছোট ছেলের মতই কেমন যেন অপুষ্ট ও অশক্ত মনে হচ্ছিল কনির। তাদেব সঙ্গম শুরু হলে কনি তার অন্তানন্দ পাওয়ার আগেই অর্থাৎ তাব চরম মুহূর্তটা আসতে না আসতেই মিকের কাজ শেষ হয়ে গেল। শায়িত হয়ে পড়ল-তাব শক্তোত্থিত লিঙ্গটি অথচ মিকের গোপনাঙ্গের এই নগ্নতা ও তাব অনুত্থিত লিঙ্গের মেদুরতা কনির কামনা ও যৌন ক্ষুধাকে দুর্বারভাবে জাগিয়ে তুলল। সে ক্ষুধা তৃপ্ত করার জন্য তার পাছা দুলিয়ে এক আদিম উদ্দামতায় সক্রিয় হয়ে উঠল কনি আর মিক তার তলায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বীরের মত পড়ে রইল। তাব চবম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত এইভাবে এক বিপরীত রতি যৌনক্রিয়ায় মেতে রইল কনি। পরে সে তার আকাঙ্ক্ষিত যৌনতৃপ্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে এক তৃপ্তিসূচক শব্দ করল।

কনির কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মিক কিছুটা তিক্তভাবে বলল, তোমরা পুরুষদের মত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পার না। আরো আগে আমাকে তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

মিকের কথাটা এই মুহূর্তে বিরাট হয়ে দেখা দিল কনির জীবনে। কারণ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকাটাই মিকের একমাত্র সঙ্গমপ্রক্রিয়া। একে তার পুরুষোচিত যৌন সক্রিয়তা বা সামর্থ্য নেই, তার উপর সে যদি এই নিষ্ক্রিয়তার মাঝেও কনিকে এই সময় দান না করে, যদি সে এতেও বিরক্তি বোধ করে তাহলে কি করে চলতে পারে?

কনি বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

মিক বলল, তুমি জান আমি কি বলতে চাইছি। আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তোমার কাজ চালিয়ে যাও এবং তুমি নিজে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকতে হয়।

ঠিক এই মুহূর্তে কনি যখন এক অনির্বচনীয় পুলকের শিহরণ তার সারা অঙ্গে অনুভব করছিল, যখন মিকের প্রতি একটা ভালবাসা তার দেহগত অস্তিত্বের গভীর হতে উঠে আসতে শুরু করছিল ঠিক তখনি মিকের এই কথার তিক্ততাটা এক অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতায় আঘাত হানল কনির মনে। মিকের এটা বোঝা উচিত আজকালকার বেশীর ভাগ পুরুষ মানুষদের মত তার যখন যৌনক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তখন মেয়েদের সক্রিয় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

কনি বলল, কিন্তু আমি তৃপ্তি পাই এটাও তুমি চাও ত?

একটুখানি ম্লান হাসি হাসল মিক। তা আমি চাই। তা অবশ্য ভাল। তবে তুমি যখন আমার বদলে কাজ চালিয়ে যাবে আমাকে দাঁত চেপে শুয়ে থাকতে হবে।

কনি বলল, তা কি তুমি একান্তই চাও না?

এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মিক। সে বলল, সব মেয়েগুলোই এই একরকম। হয় তারা সঙ্গমকালে পুরুষদের ছাড়তে চায় না। মড়ার মত তাদের উপর পরে থাকে বা জড়িয়ে থাকে অথবা সে একেবারে ক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত তার উপর পীড়ন চালিয়ে যাবে। আমি একটা মেয়েকেও দেখলাম না যে সঙ্গমকালে আমার সঙ্গে একই সময়ে তার যৌনক্রিয়া শেষ করে ছেড়ে দিল আমাকে।

কনি পুরুষদের যৌনক্রিয়াসম্পর্কিত এই সব তথ্য ভাল করে শুনল না। তার বিরুদ্ধে মিক যে অভিযোগ এনেছে তা শুনে সে শুধু অভিভূত হয়ে পড়ল। তার প্রতি মিকের এই নিষ্ঠুরতার অর্থ ঠিক সে বুঝতে পারল না। তার শুধু মনে হতে লাগল সে একেবারে নির্দোষ এ ব্যাপারে।

কনি আবার বলল, আমি তৃপ্তি পাই এটা তুমি নিশ্চয় চাও। তা চাও না কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক, আমি অবশ্যই তা চাই। তবে তুমি কখন তৃপ্তি পাবে তার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আমি এ ব্যাপারে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলব…

এটা কিন্তু কনির জীবনে চরম আঘাত। মিকের একথা, এ অভিযোগ তার জীবনের পরম আকাঙ্খিত কি একটা বস্তুকে যেন হত্যা করে ফেলল। সে কিন্তু এ সঙ্গমের ব্যাপারে মাইকেলিসকে কখনই চায়নি। মাইকেলিসই এ বিষয়ে প্রথম তৎপর হয়ে এ কাজ শুরু করে। তার আগে এ ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মাইকেলিস যখন যৌনসংসর্গের এ কাজ শুরু করে তখন অবশ্যই তার থেকে তার যৌনতৃপ্তি লাভ করতে হবে। তাকে সেই চরম মুহূর্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। আর এই তৃপ্তির জন্যই সে রাত্রিতে সে তাকে হঠাৎ ভালবেসে ফেলে। তাকে সে বিয়ে পর্যন্ত কবতে চায় মনে মনে। একথা মিকও হয়ত ধরতে পারে। হয়ত এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাব অবচেতন মনের গভীরে আর সেই জন্যই হয়ত অকস্মাৎ এক শক্ত কথার অপ্রত্যাশিত আঘাতে বৈবাহিক বন্ধনের ব্যাপারটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চায় সে, দু'দিনের জন্য বাঁধা তাদের ঘরটাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। সেই রাত্রিতে মিকের প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি তার নিগূঢ়নিবিড় আসক্তিটা তার নারীসত্তার গভীরে জেগে উঠতে না উঠতেই ঘুমিয়ে পড়ে তা চিরদিনের মত। মিকের কাছ থেকে তার জীবনটাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিল সে যাতে তার মনে হলো মিক বলে কোন লোকের অস্তিত্বই ছিল না কখনো। যেন সে লোকটা কখনো কোনদিন আসেনি তার জীবনে।

এর পর থেকে আবার নীরসভাবে তার একঘেঁয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি করে চলল কনি। ক্লিফোর্ড যে জীবনকে অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা বলে অভিহিত করে সেই শূন্য অসাব জীবনের দুর্বিসহ বৃত্তেব মধ্যে আবার আগের মতই ঘুরপাক খেতে লাগল কনি। ঘুরপাক খেতে লাগল অন্তহীনভাবে। মনের দিক থেকে পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে থেকেও শুধু এক অভ্যাসগত সান্নিধ্যে দুজনে পাশাপাশি বাস করে যেতে লাগল একই বাড়িতে।

সেই শূন্যতা। সেই অর্থহীনতা। যে বস্তুটাকে তাদের এই যৌথ জীবন-যাপনের পবিত্রতম লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে আসলে সেটা অর্থহীন অসার এক শূন্যতা আর সেই শূন্যতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে তাদের। দিনের পর দিন যন্ত্রচালিতের মত তাদের সেই সব কাজ করে যেতে হবে যে সব কাজের সমষ্টিগত সমন্বয় সেই শূন্যতাকেই বাড়িয়ে দেবে।

অধ্যায় ৬

আচ্ছা আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেন পরস্পরকে সত্যি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে চায় না?

কথাটা একদিন টমি ডিউককে প্রশ্ন করে বসল কনি। একমাত্র টমির

কথাগুলোকেই দৈববাণীর মত মনে হ'ত কনির।

তারা অবশ্যই তা করে। আজকাল ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে যত বেশী পছন্দ করে এমনটি এর আগে আর কখনো করেছিল বলে আমার মনে হয় না। আমার কথাই ধর না··· আমি পুরুষদের থেকে মেয়েদের বেশী পছন্দ করি। তারা বেশী সাহসী। যে কোন মানুষ তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারে।

কথাটা ভেবে দেখতে লাগল কনি।

কনি বলল, কিন্তু তাদের নিয়ে তোমার করার কিছু ত নেই।

টমি বলল, আবার কি করব? একজন নারীর সঙ্গে সরলভাবে প্রাণ খুলে কথা বলছি, আর কি করব?

হ্যাঁ, শুধু কথা···

তুমি যদি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতে তাহলে এইভাবে কথা বলা ছাড়া আর কি করতাম?

হয়ত আর কিছু নয়। তবু একজন নারী···

একজন নারী চায় কোন পুরুষ একই সঙ্গে তাকে পছন্দ করুক আর তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলুক, আবার সেই সঙ্গে তাকে কামনা করুক আর তাকে ভালবাসুক। কিন্তু আমার মতে এই দুটো জিনিস আলাদা, একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই।

কিন্তু এই পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

হয়ত জলের সিক্ততা গুণ খুব বেশী, অন্য সব বস্তুকে তা ছাড়িয়ে যায়। তবু জল যা তাই থাকবে। আমি মেয়েদের পছন্দ করি, তাদের আমার ভাল লাগে এবং আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি। আর তাই বলেই আমি তাদের কামনা করি না বা তাদের ভালবাসি না। এই দুটো জিনিস একসঙ্গে আমার হয় না।

আমার মতে তা হওয়া উচিত।

তা হয়ত উচিত, কিন্তু কোন জিনিস আসলে যা তাই আমি মেনে নিই। কোন জিনিসের এটা না হয়ে ওটা হওয়া উচিত ছিল, এটা আমি কখনই বলি না। এটা আমার ধাতুতে সয় না।

কনি একটু ভেবে বলল, এটা সত্য নয়। মানুষ কোন নারীকে ভালবাসে আবার তার সঙ্গে কথাও বলে। কেমন করে কোন মানুষ কোন মেয়েকে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কথা না বলে ভালবাসতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। কি করে হতে পারে?

টমি বলল, কেমন করে তা হয় তা জানি না। তাছাড়া সামান্যীকরণ করে আমার লাভ কি? আমি শুধু আমার কথাটাই বলতে পারি। মেয়েদের আমার ভাল লাগে, কিন্তু তাদের আমি কামনা করি না। আমি তাদের

সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি। কিন্তু তাদের কথা বলতে গিয়ে আমি যেমন একদিক দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি তাদের সঙ্গে, তেমনি চুম্বন ইত্যাদি শৃঙ্গার বা দেহসংসর্গের ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ রয়ে যাই। কথাটা হলো এই। কিন্তু আমার কথাটা সর্বসাধারণের কথা বলে ধরা উচিত নয়। এটা এক বিশেষ ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের আমার ভাল লাগলেও আমি তাদের ভালবাসি না এবং যদি তারা আমায় তাদের প্রতি ভালবাসার ভাণ করতে বাধ্য করে অথবা কোন জটিল প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলে তাহলে তাদের আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু এতে তোমার মনে কষ্ট হয় না?

কেন হবে? একটুও না। চার্লি যে বা অন্য সব লোকের দিকে দেখ যারা প্রেম করে বেড়ায়। আমি তাদের মোটেই ঈর্ষা করি না। ভাগ্য যদি আমার কাছে কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় ত ভাল। কিন্তু এমন কোন মেয়েকে আমি জানি না যাকে আমি চাই। তবে আমি উপরে যত উদাসীন ভাব দেখাই না কেন কোন কোন মেয়েকে আমি খুবই পছন্দ করি।

কনি বলল, তুমি কি আমাকে পছন্দ করো?

খুব পছন্দ করি। কিন্তু পছন্দ করি বলেই যে চুম্বন করতে হবে এমন কোন মানে নেই। এর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কনি বলল, মোটেই না। তবু এটা করা উচিত নয় কি?

ঈশ্বরের নামে বল কেন উচিত হবে? আমি ক্লিফোর্ডকে পছন্দ করি বলে যদি আমি এখনি গিয়ে তাকে চুম্বন করি তাহলে তুমি কি বলবে?

কিন্তু এ দুইয়ে পার্থক্য নেই কি?

কিন্তু আসলে পার্থক্যটা কোথায়? আমরা সবাই বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এখানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এসব কথা এখন সরিয়ে রাখ। এখন আমি যদি এক মার্কামারা পুরুষরূপে সারা বিশ্বে যৌন ব্যাপারে আমার বাহাদুরির কথা জাহির করে বেড়াই তাহলে কি তুমি বলবে? তুমি কি তাই চাও?

আমি তা ঘৃণাই করব।

তাহলে শোন, আমি যেহেতু একজন পুরুষ, আমি কোন মেয়ের পিছনে ছুটি না। আবার আমি মেয়েদের পছন্দও করি। কিন্তু কেউ আমাকে জোর করে তাদের ভালবাসার ভাণ করাতে পারবে না বা যৌনখেলায় মাতিয়ে তুলতে পারবে না।

না, আমি তা করছি না। কিন্তু তোমার এই গোঁড়ামিটা অন্যায় নয় কি?

তুমি তা মনে ভাবতে পার, কিন্তু আমি তা মনে করি না।

বুঝেছি, আজ পুরুষদের কাছে মেয়েদের কোন আকর্ষণ নেই।

মেয়েদের কাছে পুরুষদেরই কি আছে?

কনি এবিষয়ে অর্থাৎ তার কথার উল্টো দিকটা একটু ভেবে দেখল। তারপর তার অনুভূত সত্যের কথাটা বলে ফেলল। বলল, যদিও এমন বেশী কিছু নয়, তাহলে ও সব বাদ দাও। মানুষের মত সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো। কৃত্রিম যৌন উত্তেজনার কথা দূরে ঠেলে দাও। আমি ও উত্তেজনা চাই না।

কনি জানত সে ঠিকই বলছে। সত্যিই ঠিক বলছে। তবু সে অন্তরের নিভৃতে এক নিঃসঙ্গ একাকীত্বের একটা বেদনাকে অনুভব করতে লাগল। কোন জনহীন সরোবরের অসহায় মীনের মত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তার নিজের যুক্তির সারবত্তাই বা কোথায় তা বুঝে উঠতে পারল না।

তার যৌবন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল হঠাৎ। এই সব পুরুষগুলো সবাই যেন বৃদ্ধের মত হিমশীতল হয়ে উঠেছে একেবারে। তাদের মধ্যে সব কিছুই নিরুত্তাপ, নিস্তেজ। মাইকেলিসও একটা অপদার্থ। পুরুষ কখনো পুরুষকে চায় না, তারা আসলে চায় নারীকে। কিন্তু মাইকেলিস কোন নারীকে চায় না।

কনির মনে হলো যে সব ইতর অভদ্র লোকেরা নারীদের চায় এবং যখন তখন যৌনসংসর্গ শুরু করে দেয়, তারা আবার ওদের থেকে আরও খারাপ।

ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হলেও তা সহ্য করে যেতে হবে। আসলে নারীদের কাছে পুরুষদের কোন চমক নেই। যদি কোন নারী কোন পুরুষের মধ্যে এই চমক খুঁজে পায়, যেমন কনি একদিন মাইকেলিসের মধ্যে পেয়েছিল তাহলে সে একটি আস্ত বোকা। একথা জেনেও পুরুষদের নিয়ে চলতেই হবে। সম্পর্কের এই শূন্যতা সত্বেও এর উপরেই বাঁচতে হবে। কনি এবার ভালভাবেই বুঝতে পারল কেন লোকে রাতের পর রাত ককটেল পার্টিতে যায়, জাজ নৃত্যের সান্ধ্য আসরে ভিড় জমায়, কেন তারা একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঢলে না পড়া পর্যন্ত নেচে চলে। যৌবনের উদ্দাম অদম্য বেগ এইভাবে মানুষকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তা না হলে সেই অবদমিত বেগ মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাক করে ফেলবে। কী ভয়ঙ্কর বস্তু এই যৌবন! তুমি নিজেকে যত বৃদ্ধ যত হিমশীতল ভাব না কেন, যৌবনের জ্বালা তোমাকে অহোরহঃ পীড়িত করবেই। তোমাকে একটুও স্বস্তি দেবে না। কী হীন জীবন না তোমাকে যাপন করতে হবে। কোন আশা নেই। আশা নেই বলেই কনির ইচ্ছা হচ্ছিল, সে মিকের সঙ্গে চলে গিয়ে ঘর বাঁধবে নতুন করে। ককটেল পার্টির রাত বা জাজ নৃত্যের সান্ধ্য আসরের মতই জীবনটা কাটিয়ে দেবে তার। এইভাবে একা একা বসে বসে হা-হুতাশ করে জীবন কাটানোর থেকে সেটা অনেক ভাল।

একদিন একা একা যখন সময় কাটছিল না তখন আনমনে বেড়াতে বেড়াতে তাদের বাড়ির সংলগ্ন বনটা দিয়ে চলে গেল। কোন দিকে দৃষ্টি বা খেয়াল ছিল না তার। এক মনে কি ভাবছিল সে। এমন সময় অদূরে হঠাৎ একটা বন্দুকের

গুলির শব্দে চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো তাব।

আর একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকজন মানুষের গলার আওয়াজ পেল কনি। এখানেও আবার লোক! সে লোকের মুখ দেখতে চায়নি বলেই এই নির্জন বনভূমি দিয়ে বেড়াতে এসেছে। হঠাৎ কনি কান্নাব শব্দ পেল তার কানে। দেখল একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁদছে। নিশ্চয় কেউ দুর্ব্যবহাব কবছিল মেয়েটার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সে ঘটনাস্থলের দিকে। রাগে ফুলে উঠতে লাগল। এই নিয়ে একটা হৈ চৈ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল মনে মনে।

কনি দেখল সেখান থেকে কিছু দূরে তাদের শিকার রক্ষক দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে তার কাছে।

শিকার রক্ষক মেলর্স বেগে বলল, চুপ কর, কুকুরী কোথাকার।

তার কথায় মেয়েটি আবো জোরে কেঁদে উঠল।

কনি তাদেব দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। বাগে তার চোখ-গুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। লোকটি ঘুবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল কনিকে। তারও মুখখানা বাগে মলিন হয়েছিল।

কনি রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি হয়েছে, ও কাঁদছে কেন?

মেলর্স তার আঞ্চলিক ভাষায় বলল, ও কিছু না, ম্যাডাম। তাব মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

কনির মনে হলো, মেলর্স যেন তার মুখে একটা চড মেরেছে। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তার নীল জ্বলজ্বলে চোখগুলো তুলে মেলর্সের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞাসা কবেছি?

এতক্ষণে তাব মাথার টুপীটা তুলে একটু নত হয়ে সম্মান জানাল সে কনির প্রতি। বলল, হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি জিজ্ঞাসা কবেছিলেন।

মুখে এক ম্লান বিরক্তি নিয়ে এক অদ্ভুত সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে রইল মেলর্স।

কনি এবার মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি হয়েছে তোমার? মেয়েটির বয়স নয় কি দশ। তার মাথাব চুল কালো। কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব মধুর করে কনি আবার বলল, বল আমাকে কেন কাঁদছ?

মেয়েটি আরো জোরে কেঁদে উঠল। কনি কণ্ঠটাকে আরো মধুর করে বলল, কেঁদো না। বল আমাকে ওরা তোমার কি করেছে?···কনি এমন সময় তার জ্যাকেটটার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছয় পেনি মুদ্রা খুঁজে পেল। মেয়েটির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, কেঁদো না, এই দেখ, এটা তোমার জন্য আমি এনেছি।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে তার কালো চোখের দৃষ্টি মেলে পেনিটার পানে তাকাল। তার কান্নার বেগটা একেবারে না থামলেও তার শব্দটা চাপা হয়ে উঠল। কনি তার নোংরা হাতে পেনিটা গুঁজে দিয়ে বলল, বল কি হয়েছে?

মেয়েটি বলল, আমার বিড়াল···বিড়াল।

আবার চাপা কান্নার শিহরণ।

কনি বলল, কোন বিড়াল বল ত ?

ঐ যে।

মেয়েটি হাতের মুঠোর মধ্যে পেনিটা ধরে অদূরে একটা ঝোপের ধারে হাত বাড়িয়ে দেখাল। আবার বলল, ঐখানে।

কনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল একটা বড় কালো বিড়াল গায়ে রক্তের দাগ নিয়ে পড়ে রয়েছে।

কনি বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওঃ।

মেলর্স তাচ্ছিল্যভরে বলল, বন্দুকের গুলিটা লেগে গেছে।

কনি রাগের সঙ্গে তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি যখন গুলি করো, তখন ও নিশ্চয় বিড়ালটা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল তোমায়।

মেলর্স স্থিরভাবে কনির মুখপানে তাকাল যাতে সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হলো সে বাড়াবাড়ি করেছে এবং লোকটি তাকে মানছে না।

কনি মেয়েটিকে খেলার ছলে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ? তোমার নাম বলবে না ?

একটা হাঁচি হেঁচে মেয়েটি বলল, কনি মেলর্স।

কনি বলল, কনি মেলর্স। ঠিক আছে। সুন্দর নাম। তুমি তাহলে তোমার বাবার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলে আর তোমার বাবা বিড়ালটাকে গুলি করে। কিন্তু বিড়ালটা পাজী বিড়াল। খারাপ বিড়াল।

মেয়েটি তার চোখ মেলে এবার ভাল করে কনির পানে তাকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, আমি আমার ঠাকুর্মার কাছে থাকতে চেয়েছিলাম।

কনি বলল, কোথায় তোমার ঠাকুর্মা ?

মেয়েটি দূরে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল, আমাদের কুটিরে।

কুটিরে ? তুমি তোমার ঠাকুর্মার কাছে ফিরে যেতে চাও ?

ঠাকুর্মার কথা মনে পড়ায় একবার শিউরে উঠে মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

কনি বলল, তাহলে এস। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার বাবা তাহলে তার কাজ সব ঠিকমত করতে পারবে।

এরপর মেলর্সের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, এটি তোমার মেয়ে ?

মেলর্স অভিবাদন করে সমর্থনে ঘাড় নাড়ল।

কনি বলল, আমি ওকে কুটিরে নিয়ে যেতে পারি ?

ম্যাডাম ইচ্ছা করলে নিশ্চয় যেতে পারেন।

মেলর্স আবার তার শান্ত অথচ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কনির পানে তাকাল। সে দৃষ্টির মধ্যে কনির মনের কথা জানার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের

অনাসক্তি আর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক অব্যক্ত বেদনা ছিল।

কনি মেয়েটিকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে তোমাদের কুটিরে যাবে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ যাব।

কনি মেয়েটিকে ভবিষ্যৎ নারীর এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হিসাবে খুব একটা পছন্দ না করলেও তার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে তার হাত ধরল রাস্তা হাঁটার জন্য।

নীরবে অভিবাদন জানাল মেলর্স। কনি বলল, প্রাতঃ নমস্কার।

সেখান থেকে ওদের কুটিরটা এক মাইল পথ। পথ চলতে চলতে ছোট কনি সাহস পেয়ে কথায় কথায় পাগল করে তুলতে লাগল বড় কনিকে। বড় কনি কিছুটা বিরক্তিও অনুভব করল মনে মনে। অবশেষে কুটিরটা দেখা গেল।

কুটিরের দরজাটা খোলা ছিল। ছোট কনি ঢুকে গেল তার মধ্যে। ঢুকেই চিৎকার করে বলল, ঠাকুর্মা, ঠাকুর্মা।

এর মধ্যেই ফিরে এলি কেন?

সেদিন ছিল শনিবারের সকাল। ঠাকুর্মা একটা স্টোভ জ্বালছিল। সে দরজার কাছে এগিয়ে এল। তার হাতে নাকে কালো দাগ ছিল।

কনিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মেলর্সের মা হাত মুখ মোছার চেষ্টা করল।

কনি বলল, প্রাতঃ নমস্কার। ও কাঁদছিল বলে আমি ওকে নিয়ে এলাম।

ঠাকুর্মা ছোট কনির পানে তাকিয়ে বলল, কাঁদছিলি কেন, তোর বাবা কোথায় ছিল?

মেয়েটি তার ঠাকুর্মার আঁচলটা আঁকড়ে ধরে রইল জড়োসড়ো হয়ে। কনি বলল, ওর বাবা ওখানেই ছিল। কিন্তু সে একটা বিড়াল মেরে ফেলায় ও বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়ে।

মেলর্সের মা ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনার অশেষ দয়া লেডি চ্যাটার্লি। কিন্তু ওর অতখানি বিচলিত হওয়া উচিত হয়নি।

তারপর মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, দেখছ বাছা, তোমার জন্য ওঁর কত কষ্ট হলো। ওঁর অবশ্য এতখানি চিন্তিত হওয়া উচিত হয়নি।

কনি হেসে বলল, এতে বিচলিত হওয়া বা কষ্টের কিছু নেই। আমি একটু বেড়িয়ে গেলাম।

মেলর্সের মা বলল, আপনার অশেষ দয়া। তবু মেয়েটা কাঁদছিল। আমি তখনই বুঝেছিলাম, ওরা দুজনে দূরে গেলেই এমনি কিছু একটা হবে। মেয়েটা ওর বাবার কাছে থাকতে চায় না। ওর কাছে ওর বাবাকে বিদেশী লোক বলে মনে হয়। ওর বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে।

কনি কি বলবে তা খুঁজে পেল না।

মেয়েটি তার ঠাকুর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এই দেখ ঠাকুর্মা!'…এই বলে তার হাতের পেনিটা দেখাল।

বুড়ী তখন মেয়েটার হাতের পেনিটা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, ও বাবা, ছয় পেনি! না ম্যাডাম, ওকে এটা দেওয়া উচিত হয়নি।

তারপর মেয়েটিকে বলল, তোমার খুব ভাগ্য ভাল যে ম্যাডাম তোমাকে পেনি দিয়েছেন। লেডি চ্যাটার্লি তোমাকে ভালবেসে কি দিয়েছে দেখ।

বুড়ী যখন তার হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে মুখখানা মুছছিল তখন তার মুখ বিশেষ করে তার নাকটার পানে তাকিয়ে রইল কনি।

কনি বলল, ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি। সে চলে যাচ্ছিল।

বুড়ী বলল, আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত লেডি চ্যাটার্লি।

মেয়েটি বিদায়কালে কনিকে বলল, ধন্যবাদ।

কনি হেসে বলল, তোমাকেও ধন্যবাদ। এই বলে চলে গেল সে।

বাইরে বেরিয়ে বাড়ির পথে যেতে যেতে কনি ভাবতে লাগল মেলর্সের মত এমন অহঙ্কারী ছেলের এমন আলাপী ও অতিথিবৎসলা মা হলো কিকরে।

কনি চলে গেলে মেলর্সের মা ঘরের ভিতর গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখে অবাক হয়ে গেল। ভাবল, উনি আমার মোটা জামা আর নোংরা মুখখানা দেখে ফেলেছেন। আমার সম্বন্ধে কি ধারণা হবে ওর?

র্যাগবির বাড়িতে চলে গেল কনি। হঁ্যা বাড়িই বটে……একটা ক্লান্তিকর বিরাট বাসাকে এই ভাল নামটা দেওয়া হয়েছে শুধু। নামটা শুনে মনে হবে কতই যেন আন্তরিকতার উত্তাপে ভরা। কিন্তু একদিন অর্থাৎ অতীতে, কনির মতে, মানুষের বাড়িগুলো আন্তরিকতার উত্তাপে ভরা ছিল। এখন এ নামের আর কোন মাহাত্ম্য নেই। এখন প্রেম, আনন্দ, সুখ, ঘর, বাবা, মা, স্বামী প্রভৃতি এই সব বড় বড় নামগুলো তাদের মাহাত্ম্য হারিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এখন বাড়ি মানে মানুষ যেখানে বাস করে। প্রেম মানে যা দিয়ে মানুষ পরস্পরকে বোকা বানায়। সুখ হচ্ছে এমন এক ভণ্ডামি যা মিথ্যা আশা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে। বাবা হচ্ছেন এমনই এক ব্যক্তি যার একটা অস্তিত্ব আছে, স্বামী এমন একজন লোক বিয়ের পর যার সঙ্গে মেয়েরা বাস করে এবং মনের দিক থেকে মানিয়ে চলে। তারপর কাম বা যৌন ব্যাপার যা এই সব বড় বড় কথাগুলোর শেষ কথা। ব্যাপারটা অনেকটা ককটেল পার্টিতে অনুভূত এক তরল উত্তেজনার মত যা ক্ষণিকের জন্য সমগ্র দেহমনে এক উন্মাদনা এনে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ক্লান্ত ও নিঃশেষিত করে দিয়ে যায়। যেন মনে হয় আমরা যে ধাতু দিয়ে তৈরি তা যেন খুব সস্তা এবং তা যেন সব ফুরিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল।

যা শুধু বাকি রইল তা হলো স্টইক সন্ন্যাসবাদ। স্টইক সন্ন্যাসীদের এই ত্যাগের মন্ত্রে সত্যিই একটা আনন্দ আছে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে জীবন ও জগতের এই অসারতার উপলব্ধিতে সত্যিই একটা আনন্দ আছে। ঘরবাড়ি,

প্রেম, বিবাহ, মাইকেলিস এইগুলোকে শেষ কথা বলে মানুষ মনে করে জীবনে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথাগুলো অর্থহীন অলীক হয়ে যায়।

টাকা? এখানেও সেই একই কথা। লোকে সব সময়েই টাকা চায়। সকলেই টাকা ও সাফল্যস্বরূপা সেই পথকুক্কুরীদেবীব ভজনা করে। হেনরি জেমসের এই কথাটা টমি ডিউক প্রায়ই বলে। টাকা আর সাফল্য—এই দুটো জিনিসের মানুষের সব সময়েই প্রয়োজন। তুমি কখনই তোমার হাতের শেষ কপর্দকটা খরচ করে দিয়ে বলতে পার না টাকার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে যদি আর দশটা মিনিটও বাঁচতে হয় তাহলে আবো কিছু কপর্দক চাই কোন না কোন কারণে। তোমাব এই জৈব জীবন যান্ত্রিকভাবে যাপন করে যেতে হলে টাকা চাই। টাকা তোমার চাই-ই। জীবনে যদি সত্যিকারের প্রয়োজন বলে কিছু থাকে ত সে হলো টাকা। প্রয়োজনের এমন তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা আর কোন বিষয়ে অনুভব করা যায় না। এটাই হলো আসল কথা। অবশ্য বেঁচে থাকাটা কাবো ইচ্ছার উপব নির্ভব করে না, এটা কাবো দোষ নয়। কিন্তু বাঁচতে হলে টাকা চাই। এটা এক সর্বাত্মক প্রয়োজন। অন্যান্য সব প্রয়োজনকে তুমি কাটিয়ে উঠতে পাব, টাকার প্রয়োজন কাটানো যায় না। এটাই হলো জগতের রীতি।

কনি একবার মাইকেলিসের কথা ভাবল। ভাবল, মাইকেলিস অনেক টাকা করেছে এবং মাইকেলিসের সঙ্গে তার জীবনকে যুক্ত করলে সেও অনেক টাকা পাবে। তবু তা চাইল না সে। তার সহায়তায় ক্লিফোড লিখে যে টাকা রোজগাব করছে ও করবে তাব পরিমাণ অল্প হলেও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চাইল। সে মনে মনে বলল, আমি ও ক্লিফোড দুজনে মিলে লেখালেখির মধ্যে দিয়ে বছবে বারোশো পাউণ্ড রোজগার করব। এর বেশী টাকা চাও ত করো। এ আর এমন কি কথা কোথাও কিছু নেই, কল্পনার সাহায্যে শূন্যতা থেকে শুধু গল্প বানিয়ে যাও। তবে বেশী টাকা করলে তাতে অহঙ্কারের ভয় আছে।

কনি তাই বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল। বাড়ি গিয়ে সে ক্লিফোর্ডের কাছে তার শক্তি যোগাবে, তাকে প্রেরণা দেবে সে যাতে শূন্যতা থেকে আবার একটা গল্প বানাতে পারে। আব গল্প মানেই টাকা। ক্লিফোড অবশ্য দেখতে চায় তার লেখা গল্পগুলো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকৃতি হিসাবে গণ্য হচ্ছে কিনা। কিন্তু সে নিজে তা চায় না। কনির বাবা বলে, এসব লেখার মধ্যে আসলে কিছুই নেই। তার উত্তরে কনি তাড়াতাড়ি বলেছিল, এই লেখা থেকে বছরে বারোশো পাউণ্ড এসেছে। এটাই যথেষ্ট।

তোমার বয়স যদি কম থাকে ত তুমি দাঁতে দাঁত দিয়ে লেগে থাকতে পার। দেখবে কোন অদৃশ্য উৎস থেকে টাকা জলের স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে, দরকার শুধু তোমার মনের জোর আর ইচ্ছাশক্তি। আসলে এই ইচ্ছাশক্তিই সব। মানুষের এই ইচ্ছাশক্তিই শূন্যতার ভিতর থেকে টাকার মত একটা

অসার বস্তুকে এনে দেয় মানুষের হাতে। এই শূন্যত হলো কাগজের উপর একটুকরো লেখা। এ এক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কি? এ এক বিরাট জয়। সেই কুক্কুরীদেবীর কথা এসে গেল। কাউকে যদি কারো কাছে বেশ্যাবৃত্তি করতেই হয় তাহলে সেই দেবীর কাছে করাই ভাল। অনেকে আবার সেই দেবীর কাছে বেশ্যাবৃত্তি বা দাসত্ব করেও সে দেবীর নিন্দা করে মুখে।

ক্লিফোর্ডের আবার কতকগুলো শিশুসুলভ বাতিক আছে। সে চায় লোকে সত্যি সত্যিই তাকে ভাল বলুক। এই ভাল কথাটাই বাজে কথা। মোরগ নাচের মতই একটা বাজে ব্যাপার। সত্যিকারের ভাল হয়ে কোন লাভ নেই। জীবনে শুধু ভাল নিয়ে থাকলে আর কিছু হবে না। যারা শুধু ভাল নিয়ে থাকে জীবনে তারা বাস ফেল করা লোকের মত পিছিয়ে থাকে জীবনের পথে। আসল কথা, তোমাকে বাঁচতে হবে, জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে। কিন্তু যদি তুমি বাস ফেল করো তাহলে তোমাকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার মানে তুমি পিছিয়ে পড়বে জীবনের পথে। তখন শুধু ব্যর্থতার বোঝা জমে উঠবে তোমার ঘাড়ে।

কনি ভাবছিল শীতকালটা এবার লণ্ডনে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কাটাবে। যেন তারা দুজনে একই জীবনপথের যাত্রী, একই পথ ধরে পথের শেষ পর্যন্ত যেতে চায় এবং যাবেও।

তবে ক্লিফোর্ডের একটা দোষ। ও আবার মাঝে মাঝে কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে ওঠে ওর কথাবার্তা। এক বিষাদময় শূন্যতাবোধ আচ্ছন্ন করে তোলে ওর মনটাকে। আসলে এর মাধ্যমে ওর মনের ক্ষতটাই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কনির তাতে খুব খারাপ লাগে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, হে ভগবান, মনের ভিতর চেতনার যন্ত্রটা যদি একবার বিকল হয়ে যায় তাহলে কি হবে? চুলোয় যাক। তাহলে কি সারাজীবন বিষাদে মগ্ন হয়ে থাকতে হবে তাকে? তার থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই?

মাঝে মাঝে কনি ফুঁপিয়ে চিড়িবিড়ি করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু যখন সে কাঁদতে থাকে এইভাবে তখনও সে নিজেকে বোঝায়। নিজেকে নিজে বলে, বোকা কোথাকার! এতে কিছু হবে? এমনভাবে কাঁদছ যেন এতে তোমার সব সমস্যার সমাধান হবে।

মাইকেলিসের সংস্পর্শে আসার পর থেকে কনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে সে আর কিছুই চাইবে না জীবনে। জীবনে যে সমস্যা সমাধানের অতীত সে সমস্যার এমন সরলতম সমাধান আর কিছু হতে পারে না। জীবনে যা সে সহজভাবে পেয়েছে শুধু তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। যা পেয়েছে তাই নিয়েই সে এগিয়ে যেতে চায়। ক্লিফোর্ড, তার লেখা গল্প, র‍্যাগবি, লেডি চ্যাটার্লি, ব্যবসার কথা, টাকাকড়ি ··এই সব নিয়েই থাকতে চায় সে। প্রেম,

যৌনাচার প্রভৃতি বিষয়গুলো জলজমা বরফের মতই অর্থহীন, একটুতেই গলে যায়। এগুলোকে যত পার ভুলে যাও। এ নিয়ে যদি খুব বেশী মাথা না ঘামাও, ওসব কথা মনে যদি বেশী না করো তাহলে এ সব কিছুই না। বিশেষ করে যৌন ব্যাপার··· আসলে যা কিছুই না। এ ব্যাপারে তুমি দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে ফেল দেখবে আর কোন সমস্যাই নেই। যৌন ব্যাপার আর ককটেল পার্টি দুটোই একই ব্যাপার। দুটো ব্যাপারের স্থায়িত্ব এক, পরিণাম এবং উদ্দেশ্য এক।

কিন্তু সন্তান বা একটা ছেলে! ব্যাপারটা কেমন যেন উত্তেজনাময়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এগোতে হবে তাকে। প্রথমে তাকে ঠিক করতে হবে কার সন্তান সে ধারণ করবে তার গর্ভে। মিকের সন্তান! ভাবতেও ঘৃণাবোধ হয়। তার থেকে একটা খড়গোশের বাচ্ছা পেটে ধরা ভাল। টমি ডিউক? লোকটা ভাল, কিন্তু যে সন্তান একটা যুগ ধরে প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের বংশধারার সে সন্তান টমির কাছে চাওয়া যায় না। কারণ সে নিজের মধ্যেই নিজে ফুরিয়ে যায়। এছাড়া ক্লিফোর্ডের পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের বৃত্তটা বেশ বিস্তৃত হলেও তার মধ্যে এমন একজনও নেই যার সন্তান গর্ভে ধারণ করার কথা ভাবতে গেলে কোনরূপ ঘৃণা জাগে না কনির মনে। তাদের মধ্যে অনেককেই প্রেমিক হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে, যেমন মিক। কিন্তু তাদের কাউকে তার সন্তান উৎপাদন করতে দিতে পারে না কনি। আঃ, কী অপমান আর ঘৃণার কথা!

সুতরাং ব্যাপারটা এইভাবেই রয়ে গেল।

তবু সন্তানের কথাটা ঠিক জেগে রইল মনের পশ্চাদ্‌পটে। থাম, থাম, সে গোটা পুরুষ জাতটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে তাদের মধ্যে কার সন্তান গর্ভে ধারণ করা যেতে পারে। সে জেরুজালেম শহরে গিয়ে তার পথে পথে ও অলিতে গলিতে ঘুরে বেরিয়ে সেরকম কোন যোগ্য লোক পাওয়া যায় কি না দেখবে। পবিত্র পয়গম্বরের জেরুজালেম নগরীতে হাজার হাজার পুরুষ আছে ঠিক, কিন্তু প্রকৃত মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

একবার কনির মনে হলো সে মানুষ যেন ইংরেজ বা আয়ারবাসী না হয়। অবশ্যই তাকে হতে হবে একজন বিদেশী।

থাম, থাম। অত অধৈর্য হবার কিছু নেই। পরের শীতে ও ক্লিফোর্ডকে লণ্ডনে নিয়ে যাবে। তার পরের বছর ও তাকে নিয়ে যাবে দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইটালিতে। থাম, থাম, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সন্তানের জন্য এমন কিছু ব্যগ্রতা তার নেই। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে সে তার সমগ্র অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশ পযন্ত তোলপাড় করে ভেবে দেখছে। কোন আগন্তুক বা হঠাৎ এসে-পড়া কোন লোককে দিয়ে এ কাজ করানোর কোন ঝুঁকি সে নিতে পারে না। যে কোন সময়ে একটা লোককে প্রেমিক হিসাবে ধরে নিয়ে ভালবাসা যায় কিন্তু কাউকে দিয়ে সন্তান উৎপাদন করানোটা ভিন্ন·

ব্যাপার। এটা সামান্য ভালবাসাবাসির কথা নয়, কথা হলো মানুষের মত একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া। এমন কি যার সন্তান তুমি ধারণ করছ গর্ভে তাকে তুমি ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু সে যদি সত্যিকারের মানুষ হয় তবে তার সন্তান ধারণ করতেই হবে। সেখানে ব্যক্তিগত ঘৃণা বা ভালবাসায় কিছু যায় আসে না। এটা হলো ব্যক্তিসত্তার অন্য একটা দিক।

অন্য দিনকার মত সেদিনও বৃষ্টি পড়ছিল। পথ ঘাট জলে ভিজে গেছে। ক্লিফোর্ডের চেয়ার চলবে না। কনি তবু বাইরে যাবে বেড়াতে। এই সময় রোজ সে বন দিয়ে বেড়াতে যায়। সেখানে কাউকে দেখা যায় না। সে বেশ একা একা বেড়ায়।

আজ কি একটা কাজে মালীর কাছে লোক পাঠাবার দরকার ছিল ক্লিফোর্ডের। যে ছেলেটা ফরমাস খাটে সে ছেলেটার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। র‍্যাগবিতে প্রায়ই কারো না কারো ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। কনি তখন বলল সে খবর দিতে যাবে তার কুঁড়েতে।

আজ বাতাসটা একেবার নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ। মনে হচ্ছিল সারা জগৎটা যেন মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে। একটু পরেই মরবে। আজ কোলিয়ারির খাদগুলো বন্ধ থাকায় সেখানেও কোন কর্মব্যস্ততা নেই।

আজ জগতে যেন সব কিছুই নিষ্ক্রিয় আর স্তব্ধ অচল হয়ে আছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু গাছের শাখাগুলো থেকে বরফ পড়ার একটা শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা গভীর ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল গাছগুলো। সব কিছুই আশাহীন, অনড়, স্তব্ধ, শীতল এক শূন্যতায় ভরা।

বিষণ্ণভাবে ধীর গতিতে পথ হাঁটতে লাগল কনি। পুরনো বনভূমি হতে উঠে আসা এক শীতল শায়িত বিষাদটাকে বাইরের জগতের দুঃসহ নিষ্প্রাণতার থেকে অনেক ভাল লাগছিল। অবশিষ্ট বনভূমির স্থিতিশীলতা আর গাছগুলোর ভাষাহীন অব্যক্ত গম্ভীর ভাব ভাল লাগছিল তার। দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা যেন কথা বলতে পারলেও স্তব্ধ হয়ে আছে জোর করে। এর দ্বারা তাদের নীরব থাকার ক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে থাকলেও ওদের উপস্থিতির একটা মূল্য বেশ বোঝা যায়। তারাও যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছে যুগ যুগ ধরে। স্টইক সন্ন্যাসীদের মত কিসের প্রতীক্ষা করতে গিয়ে নীরব থাকার পরিচয় দান করছে। হয়ত তারা তাদের শেষ দিনের কথা ভাবছিল। হয়ত সেই শেষ দিনের জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। কবে তাদের কাটা হবে ওরা যেন তারই প্রতীক্ষা করছিল। দেখতে দেখতে কবে এই সমগ্র বনভূমিটা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের কাছে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে ওরা হয়ত তাই ভাবছিল। ওদের কাছে এই আভিজাত্যসূচক সুপ্রাচীন নীরবতার একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

বন থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে কিছুটা যেতেই ওদের ঘন বাদামী রঙের

কুটিরটা নজরে পড়ল। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হলো তার মধ্যে কোন লোক নেই। কুটিরটা একেবারে নির্জন আর স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। শুধু চিমনি থেকে সুতোর মত একটা সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছিল। কুটিবটার সামনে বেড়া দেওয়া বাগানটায় সদ্য মাটি কোপানো হয়েছে। বাগানটাকে বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। সদর দরজাটা বন্ধ ছিল।

বাড়িটার এত কাছে এসে লজ্জা করছিল কনির লোকটার কাছে যেতে। তার অদ্ভুত দুটো চোখেব দুবান্বিত উদাস দৃষ্টিটাব কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছিল তার। একবাব চলে যেতে ইচ্ছা করল তাব। বন্ধ দবজার উপর মৃদু টোকা দিল কনি। কিন্তু কেউ এসে দরজা খুলল না। সে আবার খুব আস্তে দরজাব কড়া নাড়ল। এবারও কেউ এল না। কনি তখন একটা আধখোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাল। ভিতবটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল বলে কিছু দেখতে পেল না। বাইরের কেউ হঠাৎ যাতে এই ছোট ঘরখানাব ভেতবটা দেখতে না পায় তার জন্যই একটা গোপনতা রক্ষাব চেষ্টা কবা হয়েছে।

জানালাব ধাবে দাঁড়িয়ে কান পেতে বইল কনি, কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগল। তার মনে হলো বাড়িব পিছন দিক থেকে কার কথা বলাব শব্দ আসছে। কনিব তাতে আশা হলো। এতটা এসে সে ফিরে যাবে না দেখা না কবে।

তাই বাড়িটার পিছনেব দিকে চলে গেল কনি। বাড়িব পিছনটা একটা পাথরেব দেওয়াল দিয়ে ঘেবা। কনি একটা কোণ দিয়ে উঠোনে ঢুকে দেখল লোকটা সাবান জল দিয়ে গা ধুচ্ছে। তার কোমব পযন্ত গা-টা নগ্ন ছিল। সে সাবান জলেব উপব পিঠ বেঁকিয়ে গা-মুখ ধুচ্ছিল। সে জানত বাড়িতে সে একেবাবে একা এবং কেউ কোথাও আশেপাশে নেই বলে নিশ্চিন্তে স্নান কবছিল। কনি তা একবার দেখে যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গেল। আবার সে বনে চলে গেল। এ বিষয়ে সে কিছু মনে না কবলেও তাব গা-টা শিউরে উঠল। কিন্তু একটা লোক গা ধুচ্ছে এটা ত একটা নিতান্ত সাধাবণ দৃশ্য।

তবু কনি এটা অস্বীকাব করতে পাবল না যে দৃশ্যটা মনে রাখার মত। তার সারা দেহটাব ভিতব পযন্ত শিউবে উঠল এ দৃশ্য দেখে। লোকটাব সাদা ধবধবে সরু কোমবটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কনির যেটা মনে ধবল সেটা লোকটার দেহেব নগ্নতা নয়, সৌন্দর্যেব কোন উপাদান তাব এই নগ্ন দেহগাত্রের মধ্যে খুঁজে পায়নি সে। এ দৃশ্য দেখে কনির যেটা সবচেয়ে ভাল লাগল সেটা হলো অবাধ অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার মাঝে যাপন করতে থাকা এক নিঃসঙ্গ জীবনের নিবিড়তা। সেই নিঃসঙ্গ নিবিড় জীবনেব একটা শুভ্রমধুর উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা যেন তার মনেব মধ্যে উপচে পড়ছিল, তাব দেহগাত্রের মধ্যে ঝবে পড়ছিল।

এই দৃশ্যের একটা অবাধ্য শিহরণ তার পেটের মধ্যে অনুভব করল কনি

সে আরও অনুভব করল এ শিহরণ ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়নি জাগতে না জাগতে, এ শিহরণ তখনো সমানে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল তার দেহের মধ্যে। কিন্তু তার দেহের মধ্যে যাই হোক, মনে মনে এ দৃশ্যের সমস্ত গুরুত্বটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল কনি। একটা লোক নিশ্চয় দুর্গন্ধওয়ালা একটা হলদে রঙের সাবান দিয়ে গা ধুচ্ছে। বরং তার কিছুটা বিরক্তিও হলো। কেন সে দাঁড়িয়ে এই সব নোংরা দৃশ্য দেখবে?

তাই সে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে যেতে যেতে থেমে গিয়ে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। কি করবে সে তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এই বিমূঢ়তা সত্ত্বেও মনে মনে একটা সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠল কনি। সে কিছুতেই হার মেনে চলে যাবে না। সে লোকটাকে অবশ্যই খবরটা দেবে। যে কাজের জন্য এসেছে সে কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করে যাবে ও। লোকটা স্নান সেরে পোষাক পরে নিশ্চয় কোথাও যাবে। ও যতক্ষণ বাসা থেকে না বার হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করবে ও।

কিছুক্ষণ পর কুটিরটাতে আবার ফিরে গেল কনি। বাড়িটাকে আগের মতই নির্জন ও পরিত্যক্ত দেখাচ্ছিল। কনি কান পেতে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা দেখতে লাগল। দেখল কোন জনমানবের শব্দ নেই, শুধু একটা কুকুর ডাকছে, কনি দরজার কড়া নাড়ল। সে শক্ত থাকার চেষ্টা করলেও তার বুকটা লাফাচ্ছিল। সে শুনতে পেল লোকটা ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই কনি যেন চমকে গেল লোকটাকে দেখে। লোকটা যেন অস্বস্তিবোধ করল হঠাৎ কনিকে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, লেডি চ্যাটার্লি! দয়া করে ভিতরে আসবেন?

লোকটার আচরণ সত্যিই বড ভদ্র এবং সহজ ও সাবলীল। কনি দরজাটা পার হয়ে তার ছোট্ট বসার ঘরটাতে গিয়ে ঢুকল। কনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি বলল, আমি স্যার ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে একটা খবর এনেছি দেবার জন্য।

লোকটা তার নীল চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে এমনভাবে কনির পানে তাকাতে লাগল যাতে কনি বাধ্য হয়ে তার মুখটা ঘুরিয়ে নিল। কনিকে তার ভালই লাগছিল। তার লজ্জানত ভঙ্গিতে তার দেহসৌন্দর্য আরো বেড়ে গিয়েছিল।

কনিকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বলল, দয়া করে বসবেন?

কিন্তু কনি বসবে না ধরে নিয়ে ঘরের দরজাটা খোলা রেখে দিল।

কনি বলল, না থাক, ধন্যবাদ। স্যার ক্লিফোর্ড ভেবেছিল তুমি কোথাও যাবে…বলতে বলতে কনি নিজের অগোচরেই লোকটার চোখের পানে তাকাল। কনি দেখল এখন তার চোখের দৃষ্টিটা বেশ সহজ আর আন্তরিকতায় নিবিড়

হয়ে উঠেছে।

লোকটা বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি এখনি দেখছি।

মালিকের আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারাটা একেবারে বদলে গেল, কেমন যেন কড়া হয়ে গেল তার মনটা। আবার তার দৃষ্টিটা উদাস ও দূরান্বিত হয়ে উঠল আগেকার মত। কনিকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কনি পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। যেতে গিয়েও যেতে পারল না। ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করছিল তার।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি একেবারে একা থাক ?

হ্যাঁ ম্যাডাম, একেবারে একা।

কিন্তু তোমার মা·· ?

মা বাস করে তার গাঁয়ের ঘরে।

বাচ্চাটা তারই কাছে থাকে ?

হ্যাঁ সেখানেই থাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার সবল সাদাসিদে মুখখানায় কেমন যেন এক অব্যক্ত উপহাসের ভাব ফুটে উঠল। তার মুখখানা এমনই এক অদ্ভুত রহস্যময় মুখ যার ভাবটা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। কনিকে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বলল, আমার মা প্রতি শনিবার এসে ঘরগুলো পরিস্কার করে দিয়ে যায়, বাকি দিনগুলোতে আমিই করি।

কনি আবার তাকাল তার মুখপানে। এবার দেখল তার মুখখানায় হাসি ফুটে উঠেছে। সে হাসিতে ছিল কিছু উপহাসের ভাব। তবে তার নীল চোখের দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা আন্তরিকতার ভাবও ছিল।

কনি যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটার পরনে ছিল পাজামা, একটা ফ্লানেলের শার্ট আর ছাই রঙের নেকটাই। তার মুখখানা ভিজে ভিজে আর ম্লান মনে হলেও দেখতে ভাল লাগছিল। তার চোখ মুখের হাসিটা থেমে গেলেও সে মুখের উপর আন্তরিকতার একটা ভাব ছিল। তবু নিঃসঙ্গতার ভাবটা কাটল না সে মুখ থেকে। কনি তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার উপস্থিতির যেন কোন দাম নেই তার কাছে।

কনির যেন অনেক কিছু বলার ছিল। অনেক কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলল না। শুধু তার পানে আবার একবার তাকাল। তাকিয়ে বলল, আমি নিশ্চয় তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি।

লোকটার চোখের কোণে আবার এক চিলতে উপহাসের হাসি খেলে গেল। বলল, আমি তখন মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। আমি তখনো কোটটা পরিনি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার এখানে কেউ ত আসে না, কেউ কড়া নাড়ে না। তাই অপ্রত্যাশিত কড়ানাড়ার শব্দে কোন অশুভ ঘটনার

আভাস পেয়ে চমকে উঠেছিলাম।

লোকটা কনির সঙ্গে তাদের বাগান পার হয়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এল। তার গায়ে তখন সেই বিশ্রী ভেলভেটের কোটটা না থাকায় ভালই লাগছিল। কনি দেখল লোকটার চেহারাটা রোগা। কিন্তু তা হলেও তার মাথার চুলের সৌন্দর্যে আর চোখের দৃষ্টির মৃদু চঞ্চলতায় যৌবনের একটা অদম্য উজ্জ্বলতা ছিল। কনির মনে হলো তার বয়স সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ হবে।

কনি হেঁটে চলল নির্জন বনভূমির ভিতর দিয়ে। সে বেশ বুঝল লোকটা তাব পিছনে সমানে তাকিয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠল সে।

এদিকে লোকটা তার বাসার ভিতরে গিয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটা সত্যিই দেখতে সুন্দরী। খুবই সুন্দরী। ও কত সুন্দরী ও তা নিজেই জানে না।

কনি একথা যতই ভাবছিল ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল যে লোকটাকে দেখে মালী বা শিকার রক্ষক বলে মনেই হয় না। অথবা যে কোন সাধারণ শ্রমিকের মতও নয়। সে দেখতে কিছুটা সাধাবণ মানুষের মত হলেও আবার কিছুটা অসাধারণত্বও তার মধ্যে আছে।

ক্লিফোর্ডের কাছে কনি সেদিন বলল, শিকার রক্ষক মেলর্স এক অদ্ভুত ধরনের লোক। ও সত্যিকাবেব একজন ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারত।

ক্লিফোর্ড বলল, পাবত? আমি তার কিছু দেখিনি।

কনি আবার জোব দিয়ে বলল, কিন্তু তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওনি?

ক্লিফোর্ড বলল, আমার মতে লোকটা ভাল, কিন্তু তার বিষয়ে আমি বেশী কিছু জানি না। লোকটা মাত্র এক বছর আগে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় ও ছিল ভারতবর্ষে। সেখানে ও হয়ত কোন অফিসারের চাকর ছিল। সেখান থেকেই ও কিছু কলাকৌশল শিখে এসেছে। সেই অফিসারের দৌলতেই ওবও উন্নতি হয়। ওদেব জাতের লোকরা এমনি করেই উন্নতি করে। কিন্তু এর ফল খুব একটা ভাল হয় না ওদেব জীবনে। কারণ দেশে ফিরে এসে আবার ওদের সেই পুরনো পেশা আর পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হয়।

ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কনি। অভিজাত সমাজের লোকদের এইটাই হলো রীতি। তথাকথিত নিচু শ্রেণীর কোন লোক ছোট থেকে বড হোক, উন্নতি করুক এটা ওরা চায় না।

কনি আবার বলল, কিন্তু লোকটার মধ্যে নিশ্চয় একটা বৈশিষ্ট্য আছে তুমি এটা লক্ষ্য করনি?

না, লক্ষ্য করিনি সত্য কথা বলছি।

ক্লিফোর্ড অস্বস্তির সঙ্গে কনির পানে তাকাল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা

কৌতূহল আব কিছুটা সন্দেহ ছিল। কনি বুঝতে পাবল ক্লিফোর্ড তাকে সত্য কথা বলছে না। নিজেব কাছেও সত্য বললে না সে। ব্যাপাবটা হলো তাই। সে চায় পৃথিবীব সব লোক তাব স্তবেব নিচে অথবা সমান হয়ে থাকবে। অসাধাবণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মানুষ তাব সামনে বড হযে উঠুক এটা সে চায় না।

কনি এ যুগেব মানুষদেব মানসিক সংকীর্ণতাব কথাটা ভাবতে লাগল নূতন কবে। একদিক দিযে কঠোব হতে গিযে আসলে জীবন থেকেই দূবে সবে যায় ওবা।

অধ্যায় ৭

সেদিন বাতে তাব শোবাব ঘবে গিযে এমন একটা কাজ কবল কনি যা এব আগে কোনদিন কবেনি সে। একটা বড আযনাব সামনে দাঁডিযে সব পোষাক একে একে খুলে ফেলে বাতি হাতে নিজেব নগ্ন মূর্তিটাকে দেখতে লাগল এক দৃষ্টিতে। কিন্তু তাব এই আপন দেহেব নগ্নতাব মধ্যে কি সে খুঁজছে, কি সে চাইছে তা জানে না। নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পাবে না। তবু জ্বলন্ত বাতিটা ধবে তাব আলোয দেখে যেতে লাগল খুঁটিযে। তাব একটা কথা কেবলি মনে হতে লাগল, কত অসহাযভাবে ভঙ্গুব, কত শোচনীযভাবে অপূর্ণ এই মানুষেব দেহ। তাব উপব নগ্ন হলে তা কত খাবাপ দেখায। তাব চেহাবাটা দেখে লোকে তাকে স্কুন্দবী বলে। কিন্তু তাব মনে হলো সে আব ঠিক তরুণী নেই, যৌবনেব তাকণ্য পাব হযে সে এখন পবিণতবযস্কা নাবীতে পবিণত হযে উঠেছে। সে খুব একটা লম্বা নয, ববং স্কটদেব মত কিছুটা বেঁটে। কিন্তু তাব চেহাবাব মধ্যে এমন একটা সবল সাবলীল ভাব আছে যেটাকে এক নজবেই সৌন্দর্য বলে মনে হয। তাব গাযেব বংটা তামাটে, তাব দেহেব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটা কেমন শক্ত শক্ত। তাব দেহটা আবো পুষ্ট আবো স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হযে উঠতে পাবত। কিন্তু তা হযনি। কোথায যেন একটা অপূর্ণতা বযে গেছে সে দেহেব মাঝে। তা ছাডা তাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোব মধ্যে কোন কমনীয়তা নেই।

তাব চেহাবাটা দেখে যেমন সত্যিকাবেব নাবী বলে মনে হয না, তেমনি সে চেহাবাটা কোন যুবক পুরুষেব মতও মনে হয না। তাব প্রতিটি অঙ্গ কোন না কোন কাবণে উপযুক্ত পূর্ণতা বা পুষ্টতা না পেয়ে দুর্বোধ্য ও অপূর্ণ রয়ে গেছে, একটা সুন্দর স্বচ্ছতা পায়নি।

তার বুকের স্তনগুলো কেমন ছোট ছোট, ঠিকমত পুষ্ট হয়ে ওঠেনি। একটু ঝুলন্ত ভাব আসেনি। সেই জার্মান ছেলেটার সঙ্গে যখন তার দেহসংসর্গ ছিল, যার সঙ্গে তার একটা দেহগত প্রেম বেশ জমে উঠেছিল তখন তার পেটের মধ্যে একটা মাংসল ও নধর ভাব ছিল, এখন সেটা নেই। তেমন মাংস না থাকায় সেটা পাতলা ও শক্ত কাঠ-কাঠ দেখাচ্ছে। আগেকার মত যৌবনসুলভ চকচকে ভাব নেই। কেমন যেন থলথলে হয়ে গেছে বুড়ীদের মত। তার জানুগুলোও আগে বেশ কেমন সুবর্তুল ছিল, কেমন গোলগাল দেখাত। এখন সেগুলো সরু হয়ে গেছে।

এখন তার সারা দেহটাই যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। হয়ে উঠেছে অস্বচ্ছ ও গুরুত্বহীন। কথাটা ভেবে অস্বাভাবিকভাবে বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে উঠল কনি। আর কোন আশা নেই তার জীবনে। মাত্র এই সাতাশ বছর বয়সেই সে বুড়ী হয়ে গেছে। তার গাত্রত্বকের সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সে। ক্রমাগত অবহেলা আর উপযুক্ত সমঝদারের অভাবে তার যৌবনসৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে অকালে। তাকে দিয়েছে এক শোচনীয় অকালবার্ধক্য। সৌখীন-মনা নারীরা বাইরের সমঝদারদের সপ্রশংস দৃষ্টির সাহায্যেই অটুট ও উজ্জ্বল রাখতে পারে তাদের দেহসৌন্দর্যকে। কিন্তু সে তা পারে না, চায় না। কারণ তার মন। হয়ত তার মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই তা পারেনি। কথাটা মনে পড়তেই এক প্রচণ্ড রাগে ও ঘৃণায় ফেটে পড়ল কনি।

এবার পিছনের দিকের আয়নাটার পানে তাকাল কনি। সে আয়নায় প্রতিফলিত তার দেহের পিছনটা দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। তার কোমর, পাছা প্রভৃতি যতই দেখতে লাগল সে ততই তার মনে হতে লাগল এগুলো সব যেন ক্লান্ত ও বিষাদম্লান হয়ে উঠেছে। অথচ আগে একদিন এখানে ছিল আনন্দের উজ্জ্বলতা। তার পাছা জঘন ও জঙ্ঘাদেশের ঢালু জায়গাটা আগে কত মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাত যেটা একমাত্র সেই জার্মান যুবকটা ভালবাসত। কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর থেকে এ জায়গার সে উজ্জ্বলতা আর নেই। দশ বছর হলো সে মারা গেছে। আজ সে মাত্র সাতাশ বছরের এবং তার সারা জীবনটাই পড়ে আছে। বলিষ্ঠদেহী সেই জার্মান যুবকটা ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তার ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যে একটা কুৎসিত নগ্নতা ছিল যেটাকে সে তখন ঘৃণা করত। কিন্তু আজ সে মনে প্রাণে সেইটাই চায় অথচ কোথাও পাবে না আর। আজকালকার পুরুষদের মধ্য থেকে ইন্দ্রিয়াবেগের সেই কদর্য বলিষ্ঠতা, নর্ম-ক্রীড়ার সেই নোংরামির নিবিড়তা নিঃশেষে চলে গেছে। আজকালকার পুরুষদের যৌনক্রিয়া মানে মাইকেলিসের মত দু সেকেণ্ডের এক তরল উত্তেজনা। কিন্তু পৌরুষসুলভ যে দুরন্ত ও বলিষ্ঠ যৌনাবেগ নারীদেহের শায়িতশীতল রক্তকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে তোলে, তাদের সত্তাকে সজীব করে তোলে সে যৌনাবেগ আজ কোন পুরুষের মধ্যেই পাওয়া যায় না।

তবু তার মনে হলো তাব পিঠের যে দিকটা ঢালু হয়ে পাছার দিকে নেমে গেছে সেইখানেই কিছুটা সৌন্দর্য অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তার দেহের সামনের দিকটা দেখে একেবারে হতাশ হয়ে উঠল সে। তার পেট বুক যেন সব যৌবন-সুলভ পুষ্টতা, পবিণতি আর উজ্জ্বলতা পাবার আগেই বার্ধক্যসুলভ এক জড়তা আর বিশুষ্কতায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবতে লাগল যে সন্তানের কথা ভাবছে সে সন্তান কি করে গর্ভে ধারণ করবে সে? তার এই দেহ কি সন্তান ধারণের যোগ্য?

যাই হোক, বাতেব পোষাক পরে বিছানায় চলে গেল কনি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগল। অন্তহীন তিক্ততার মাঝে ক্লিফোর্ড, তাব লেখা, তাব কথাবার্তা, তাব বন্ধুবান্ধব সব কিছুর প্রতি একটা হিমশীতল ঘৃণা আব রাগ শক্ত হয়ে দানা বেঁধে উঠতে লাগল ক্রমশঃ। ক্লিফোর্ড ও তার বন্ধু-বান্ধববা সব এক জাতের। এবা কোন নাবাকে তার উপযুক্ত দেহগত মর্যাদা দিতেও জানে না।

অবিচার, ঘোব অবিচাব। দেহগত অবিচাবেব এক প্রতিহত চেতনা একটা দুঃসহ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল তাব সমগ অন্তবাত্মাব গভীবে।

সে যাই হোক, তবু তাকে পরদিন সকালে ঠিক সাতটার সময়েই উঠতে হলো। উঠেই ক্লিফোর্ডের কাছে নিচের তলায় চলে গেল কনি। কারণ ক্লিফোর্ডকে তার কতকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্মে সাহায্য করতে হবে তাকে। এ ব্যাপাবে সাহায্য কবার জন্য তার কোন পুরুষ বা মেয়ে চাকব নেই। বাড়ির যে পুবনো চাকব তাকে এই সব কাজে সাহাযা কবে তার বয়স হওয়ায় সে ভারী জিনিস তুলতে পারে না। কনি তাই স্বেচ্ছায় সেই সব কবে। তার দ্বারা যা যা সম্ভব সব করে যায়।

এই জন্যই মাত্র দু একদিনের জন্য ছাড়া র‍্যাগবি থেকে কোথাও যেত না কনি। কনি না থাকলে ক্লিফোর্ডের পুরাতন ভৃত্যের স্ত্রী মিসেস বেটস্ এই সব কাজকর্ম করে আর ক্লিফোর্ডও তা বাধ্য হয়ে মেনে নেয়।

তবু তার মনের গভীরে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতারণাজনিত এক অবিচার-বোধ তুষের আগুনের মত অনতিতীব্র অথচ অবিচ্ছিন্ন ধারায় জ্বলে যাচ্ছিল। তার জ্বালায় মনটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল কনির। দেহগত প্রতারণা বা অবিচারের এই আশাহত চেতনা, এই ব্যর্থতাবোধ একবার জাগলে বড় ভয়ংকর, বড বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ চেতনা এ বোধের উপযুক্ত আত্মপ্রকাশের পথ অবশ্যই করে দিতে হবে। তা না হলে যাকে কেন্দ্র করে এ চেতনা জ্বলে ওঠে তাকে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। বেচারা ক্লিফোর্ডকে এ জন্য দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সে কনির থেকে বড় রকমের এক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পড়েছে। আসলে এর জন্য দায়ী তাদের এক বিরাট ভাগ্য-বিপর্যয়।

তবু একদিক দিয়ে সে কি দোষের পাত্র নয়? সব কিছু সত্ত্বেও তাদের দেহগত সান্নিধ্যের একটা নিবিড়তা ও আন্তরিকতার অভাবের জন্য তাকে কি দায়ী করা যায় না? কনির প্রতি আচরণে কোনদিনই সে আন্তরিকতা বা এমন কি একটু দয়ামায়ারও পরিচয় দেয়নি। অভিজাত সমাজের চিন্তাশীল লোকদের মত শুধু এক নীরস স্ববিবেচনার পরিচয় দিয়ে এসেছে কনির প্রতি। কিন্তু একজন পুরুষের একজন নারীর প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিত, তার পৌরুষ-সুলভ হাসিখুশির উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা দিয়ে যেভাবে হিমশীতল নারীমনের অস্ফুট কুসুমকোরকগুলিকে ফুটিয়ে তোলা উচিত তা কোনদিন করেনি ক্লিফোর্ড।

কিন্তু ক্লিফোর্ড এই ধরনের পুরুষ নয়। শুধু সে নয়, তাদের সমাজের কোন পুরুষই তা করে না। আসলে অন্তরের দিক থেকে ওরা সকলেই স্বতন্ত্র এক অবিগলিত অবিচলিত কাঠিন্যে প্রস্তরীভূত। ওদের কাছে আন্তরিকতা হলো সুরুচির পরিচায়ক। আন্তরিক না হয়েও জীবনে বেশই চলা যায়। ওদের জীবনের পথে চলার সময় সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে, নিজের সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে চলবে। যদি তুমি অভিজাত শ্রেণীর লোক হও, তাহলে কোন কথা নয়। তাহলে আপন শ্রেণীগত আধিপত্যের কথা ভেবে স্বচ্ছন্দে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পার। কিন্তু তুমি যদি অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক হও, তোমার সে সম্ভ্রমবোধ থাকতে পারে না, তুমি অভিজাত বা শাসকশ্রেণীর লোক একথা কখনই ভাবতে পার না। তাছাড়া যারা অভিজাত সমাজের চূড়ামণি তাদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই যাকে তারা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হিসাবে ধারণ করে চলতে পারে। সুতরাং কি তার শাসন করবে? তাদের শাসন হলো হাস্যাস্পদ এক কুশাসন। আসলে এর মধ্যে সত্য কোথায়? গোটা ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় করে যাওয়া এক বাজে বোকামির কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক বিদ্রোহের ভাব ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল কনির মধ্যে। এর মধ্যে ভাল বলতে কি আছে? তার এই তিল তিল আত্মত্যাগ আর ক্লিফোর্ডের প্রতি তার এই অনুরক্তি ও আনুগত্যের মধ্যে কি ভাব থাকতে পারে? তাছাড়া তার দেখারই বা কি অর্থ থাকতে পারে? যে সেবার মধ্যে কোন মানবিক আন্তরিকতার কোন স্পর্শ নেই তা নীচ জাতের ইহুদীদের কুক্কুরীদেবী উন্নতির কাছে বেশ্যাবৃত্তির মতই দুর্নীতিমূলক। যে ক্লিফোর্ড বলে সে শাসকশ্রেণীর লোক সেই ক্লিফোর্ড আবার উন্নতির কুক্কুরীদেবীর পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলে। এ বিষয়ে কোন লজ্জা সে অনুভব করে না বা তার জিবটা মুখ থেকে খসে পড়ে না। এ ব্যাপারে মাইকেলিসের তবু আত্মমর্যাদাবোধ আছে। অথচ সে ক্লিফোর্ডের থেকে বেশী উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেছে। যদি কেউ খুঁটিয়ে দেখে ক্লিফোর্ডকে তাহলে সে বুঝবে ক্লিফোর্ড একটা বোকা ভাঁড়। মাইকেলিস

যদি ইতর হয় ত হোক, ভাঁড় হওয়াটা ইতর হওয়ার থেকে বেশী অপমানজনক।

যদি বিচার করা হয় মাইকেলিস আর ক্লিফোর্ড এই দুইজন মানুষের মধ্যে কার প্রয়োজন বেশী তার কাছে তাহলে দেখা যাবে মাইকেলিসের প্রয়োজনই বেশী কনির কাছে। ক্লিফোর্ডের প্রয়োজন মানে ত শুধু সেবা আর যে কোন একজন ভাল নার্স ক্লিফোর্ডের পঙ্গু পায়ের সেবা করতে পারে।

ক্লিফোর্ডদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তাকে নিয়ে কথা হয় মাঝে মাঝে। এঁদের মধ্যে আছেন ক্লিফোর্ডের পিসি লেডি বেনারলি বা ইভা পিসি। তাঁর বয়স ষাট, রোগা-রোগা চেহারা। তিনি অভিজাত বংশের মেয়ে এবং এই আভিজাত্যের ধারাটা সারা জীবন ধরে বজায় রেখে চলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নিজেদের আভিজাত্যের গরিমা আর বংশগৌরবকে সব সময় বড় করে আর অপর সকল মানুষকে হীন মনে করার এক সামাজিক খেলায় পারদর্শিনী তিনি।

ইভা আর যাই হোক, কনিকে কিন্তু তিনি ভালবাসতেন। একটু স্নেহের চোখে দেখতেন। একদিন তিনি আভিজাত্যসুলভ ভারিক্কী চালে কনিকে বললেন, সত্যিই তুমি অদ্ভুত মেয়ে আমার মতে। তুমি ক্লিফোর্ডের জন্য যা করছ তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমি কোন উদীয়মান প্রতিভা চোখে দেখিনি, কিন্তু ক্লিফোর্ড হলো তাই।

ইভা পিসি ক্লিফোর্ডের সাফল্যে গর্বিত। অবশ্য ক্লিফোর্ড কি বই লিখেছে তা তিনি দেখতে চান না। দেখার দরকার আছে বলে মনেও করেন না।

কনি বলল, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

ইভা পিসি বললেন, তোমার কাজ বা কৃতিত্ব আর কার বা হবে? আর আমার মনে হয় তার উপযুক্ত প্রতিফল বা পুরস্কার তুমি পাও না।

ও কথা কেন বললেন?

আচ্ছা দেখ ত, কেমন করে তুমি বন্দী হয়ে থাক বাড়িটার মধ্যে। আমি একদিন ক্লিফোর্ডকে বলেছিলাম, মেয়েটা যদি কোনদিন বিদ্রোহ করে তাহলে তোমাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে তাকে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড ত আমাকে কোন কিছু দিতে অরাজী হয় না।

কনির ঘাড়ের উপর তাঁর রোগা রোগা হাতটা রেখে ইভা পিসি বললেন, দেখ বাছা, নারী হয়ে যখন জন্মেছ তখন নারীদের মত করে বাঁচতে হবে। তা না হলে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

আর এক পাত্র মদ খেলেন ইভা পিসি।

কনি বলল, কেন, আমিও ত নারীজীবন যাপন করে চলি।

কিন্তু আমার মনোমত নয়। ক্লিফোর্ডের উচিত তোমাকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া। সেখানে তোমাকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে দেওয়া উচিত। তার বন্ধুবান্ধবরা তার কাছে ভাল। তার কাছে তাদের দাম আছে। কিন্তু

তোমার কাছে কি মূল্য তাদের ? আমি ত এর মধ্যে কোন ভাল দেখি না। আমি চাই না তোমার যৌবন এইভাবে বিনষ্ট হয়ে যাক আর তুমি মধ্য বয়সে ও শেষ বয়সে এর জন্য অনুশোচনা করতে থাক।

ইভা পিসি এবার চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন। আর এক পাত্র করে মদ খেতে লাগলেন।

কনি কিন্তু আপাততঃ লণ্ডনে গিয়ে লেডি বেনারলির সমাজে মেলামেশা করতে চাইল না। সে নিজেকে চটপটে আধুনিকা হিসাবে কোনদিনই ভাবতে চায় না। তার মনে হলো এই সব আনন্দোচ্ছলতার অন্তরালে একটা হিমশীতল শুষ্কতা আছে, ঠিক যেন শীতল লাব্রাডার স্রোত, যার উপরিপৃষ্ঠে কিছু হাসিখুশির ফুল ভেসে গেলেও ভিতরে পা ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে হিমে পা জমে যায়।

টমি ডিউক তখন র‍্যাগবিতে ছিল। তার সঙ্গে এসেছিল হ্যারি উইণ্টারলো আর জ্যাক স্ট্রেঞ্জওয়েজ আর তার স্ত্রী অলিভ। তখন আবহাওয়াটা খারাপ ছিল বলে বাইরে কেউ বেরোত না। শুধু বসে বসে গল্প আর গল্প করছিল সবাই। গল্প হল আর মাঝে মাঝে বিলিয়ার্ড খেলা চলল।

অলিভ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিল। বইটাতে ছিল সেই অনাগত যুগের কথা যখন বোতলে শিশুর জন্ম হবে আর নারীদের সন্তান ধারণ করতে হবে না। ফলে নারীরা ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবে জীবনটাকে অর্থাৎ নারীদের এমনভাবে নির্বীর্যকরণ করা হবে যাতে তারা সন্তান ধারণ করতে না পারে অথচ যাতে তাদের দেহসৌন্দর্যের কোনরূপ বিকৃতি না ঘটে।

পড়তে পড়তে অলিভ একসময় বলল, কী মজা হবে তখন। তখনই একমাত্র মেয়েরা সত্যিকারের উপভোগ করতে পারবে জীবনটাকে।

তার স্বামী স্ট্রেঞ্জওয়েজ সন্তান চায়, অলিভ চায় না।

উইণ্টারলো দুষ্টু হাসি হেসে অলিভকে জিজ্ঞাস করল, আপনি কি ধরনের নির্বীযকরণ চান ?

অলিভ বলল, আমি এমনিতেই নিরাপদে আছি। আশা করি ভবিষ্যতে মানুষের বোধশক্তি আরও বাড়বে এবং নারীদের সন্তানধারণের কাজে টেনে আনা হবে না।

ডিউক বলল, হয়ত তখন নারীরা আকাশে ভাসবে।

ক্লিফোর্ড বলল, সভ্যতা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহগত বাধা-বিপত্তিগুলোকে অপসারিত করা উচিত। আমার মনে হয় যদি আমরা বোতলের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করতে পারি তাহলে ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা একেবারে চলে যাবে।

অলিভ বলল, বোধ হয় না। মনে হয় তা আরও বেড়ে যাবে।

চিন্তান্বিতভাবে লেডি বেনারলি বললো, যদি ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা চলে যায় একেবারে তাহলে তার জায়গায় অন্য কোন একটা নেশা এসে জুটবে

মানুষের মধ্যে। হয়ত মর্কিয়ার নেশা। এ নেশা খুব ভাল। উন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে সকলের মধ্যে।

জ্যাক স্ট্রেঞ্জওয়েজ বলল, প্রতি শনিবার যদি বাতাসে একটু করে মর্ফিয়া ছড়িয়ে দেয় ত ভাল হয়, সপ্তার শেষটা ভাল কাটে। কথাটা হয়ত শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু তার পরের দিনগুলো কি করে কাটবে ?

লেডি বেনারলি বললেন, যতদিন মানুষ তার দেহটার কথা ভুলে থাকবে ততদিন ভাল। কিন্তু দেহের কথা একবার মনে পড়লেই তুমি গেলে। যদি সভ্যতা মানুষের কোন মঙ্গল বা উপকার করতে পারে ত তা যেন মানুষকে তার দেহের কথা ভুলিয়ে দেয়। তাহলে দিনগুলো আমাদের কোন দিকে কেটে যাবে তা আমরা বুঝতেই পারব না।

উইণ্টার্লো বলল, হ্যাঁ আমাদের দেহের পীড়ন থেকে মুক্ত করতে হবে। এখন সত্যিই তার সময় এসেছে। মানুষের স্বভাবের দিকটা দেহগত বা জৈবিক সেদিকটার উন্নতি সাধন করা উচিত।

কনি বলল, ধরে নাও, আমরা সিগারেটের ধোঁয়ার মত শূন্যে ভাসতে থাকি।

ডিউক বলল, তা হতেই পারে না। তা যদি হয় অর্থাৎ আমাদের দেহগত কামনা বাসনা বলতে কিছু না থাকে ত আমাদের সভ্যতাই থাকবে না। তা কোন অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। তখন সে সভ্যতাকে সেই অতলগর্ভ থেকে একটামাত্র জিনিসই আবার তুলতে পারে। আর তা হলো মানুষের জননেন্দ্রিয়।

অলিভ বলল, না সেনাপতি মশায়, তা অসম্ভব।

ইভা পিসি বললেন, আমাদের সভ্যতা ধ্বংস হতে বসেছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তার বদলে কি আসছে ?

ইভা পিসি বললেন, আমার সে বিষয়ে কোন ধারণা নেই। তবে কিছু একটা আসবে ঠিক তার বদলে।

কনি বলে, কিছুই হবে না। লোকে ধোঁয়া ছাড়া কিছুই চায় না। সব শূন্যতা। অলিভ বলে ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেদিন নারীদের আর সন্তান ধারণ করতে হবে না। এবং বোতলের ভিতর শিশুর জন্ম হবে। ডিউক বলে, মানুষের সব সভ্যতা অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। শুধু মানুষের জননেন্দ্রিয়টাই সেই অতল গহ্বরের উপর এক নূতন সভ্যতার সেতু বন্ধন করবে। ক্লিফোর্ড বলে, আসলে এর পরিবর্তে কোন সভ্যতা আসবে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

অলিভ বলল, ওসব নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। কেবলমাত্র বোতলে যাতে বাচ্চা হয় তার জন্য চেষ্টা করো। আমাদের অর্থাৎ নারীজাতিকে অব্যাহতি দাও সন্তানধারণের দুঃসহ পীড়ন থেকে।

টমি বলল, মানবসভ্যতার পরের স্তরে আসতে পারে এক বিরাট পরিবর্তন। তখন হয়ত প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত নরনারী আসতে পারে যারা হবে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা কেউ সত্যিকারের মানুষ নই। সত্যিকারের মনুষ্যত্ব

অর্জন করতে পারিনি আমরা। আমরা আমাদের সব বুদ্ধিগত ও কারিগরী বিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাচ্ছি। এর পর যে নূতন সভ্যতা আসবে সে সভ্যতা হয়ত আজকের এই সব চতুর কুশলী লোকদের পরিবর্তে সত্যিকারের নরনারী নিয়ে আসবে। তারা ধোঁয়ার মানুষ হবে না, আবার বোতলের বাচ্চাও হবে না।

অলিভ বলল, লোকে যখন প্রকৃত নারীর কথা বলে তখন আমি হাল ছেড়ে দিই একেবারে।

উইণ্টার্লো বলল, আমাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভাল বস্তু সেটা হলো আমাদের আত্মা। আধুনিক জীবনধারা থেকে আর কোন উপাদান আমরা পেতে পারি না।

জ্যাক মদ খেতে খেতে বলল, আত্মা?

ডিউক বলল, তুমি কি ভাব? আমি চাই সভ্যতা মরে যাক। মানুষগুলো মরে যাক, তারপর তাদের দেহগুলোর শুধু পুনরভ্যুত্থান হোক। মন বস্তুটাকে আমরা যেন চিরতরে নির্বাসন দিতে পারি। আমরা মন না থাকলেই টাকা পয়সা বা অন্যান্য বস্তুকে পরিহার করে চলতে পারব। তখন আমরা সকলেই সকলের দেহকে স্পর্শ করতে পারব। অবশ্য তাই বলে সকলের টাকা সকলে পাবে না।

কথাটা যেন বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কনির অন্তরে। সে বলতে লাগল মনে মনে দেহাস্বাদের প্রতিভূস্বরূপ স্পর্শের স্বাধীনতা আমাকে দাও। এ কথার অর্থ কি তা ঠিক জানে না ও, তবু কথাটা ভাল লাগছিল তার। যেমন অনেক অর্থহীন কথাই তার ভাল লাগে।

আসলে সব কিছুই বাজে। সব কিছুর উপরেই রাগ হচ্ছিল কনির। ক্লিফোর্ড, ইভা পিসি, অলিভ, জ্যাক, উইণ্টার্লো, ডিউক—সব। এরা সবাই বাজে। শুধু কথা আর কথা। এই সব অন্তহীন কথার কচকচির অর্থ কি?

কিন্তু এই সব কথার কচকচি যখন থেমে গেল, যখন সবাই চলে গেল তখনও কিছু সুবিধা হলো না কনির। ক্লান্তির বোঝাটা দিনে দিনে বেড়ে চলতে লাগল তার মনে। রাগ আর অসহিষ্ণুতার অব্যক্ত প্রচণ্ডতাটা তার মন থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসে তার দেহের নিম্নাঙ্গটাকে গ্রাস করে ফেলল। তার থেকে কোনক্রমেই অব্যাহতি পেল না সে। মনে হতে লাগল এক দুঃসহ বেদনায় নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তার সারা নিম্নাঙ্গটা। তার শরীরটা কেমন যেন শুকিয়ে প্যাকাটি হয়ে যেতে লাগল।

তাদের বাড়ির পুরনো ঝি এটা লক্ষ্য করল। টমি ডিউক একদিন বলল তার শরীরটা নিশ্চয় ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু কনি তা স্বীকার করল না। বলল ভালই আছে। শরীরটা যতই তার শুকিয়ে যাক তার জন্য যেন কোন ভয় নেই কনির। কনির শুধু একটা বিষয়ে ভয় হয়। সে যখন বাগানে বা বনভূমিতে বেড়াতে গিয়ে তাদের পারিবারিক সমাধিভূমির পানে তাকায় অথবা তার

চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ পড়ে যায় তার উপর তাহলে তখন যেন সেই সব ভূতুড়ে সমাধিস্তম্ভগুলো এক ভয়ঙ্কর দেঁতো হাসিতে ফেটে পড়ে যেন তার পানে তাকিয়ে। তাকে যেন এক অমোঘ অদৃশ্য ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দেয় তাকেও একদিন ওখানে তাদের মাঝখানে যেতে হবে। নীরবে শায়িত ও সমাহিত হয়ে থাকতে হবে তার এই ব্যর্থ প্রতিহত জীবনের যত সব অসার লীলাখেলা সাঙ্গ করে।

তার বোনকে একটা চিঠি লিখল কনি। তার বোন হিলদা থাকে স্কটল্যাণ্ডে। চিঠি পেয়ে তার ছোট গাড়িটা নিজে চালিয়ে সোজা চলে এল হিলদা। তখন মার্চ মাস। কনি লিখেছিল, আমি মোটেই ভাল নেই। অথচ রোগটা কি তা ধরতে পারছি না।

হিলদার গাড়িটা কনিদের বাড়ির সামনে এসে থামতেই কনি ছুটে গেল। গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই বোনকে চুম্বন করল হিলদা। বলল, কি ব্যাপার?

কনি লজ্জা পেয়ে বলল, কিছু না।

মুখে কিছু না বললেও কনি তার মনে প্রাণে হাড়ে হাড়ে জানে কিভাবে এক দুঃসহ যন্ত্রণার নিবিড়তার দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে সে প্রতি মুহূর্তে। দুই বোন, একই ধরনের সোনালী উজ্জ্বল গাত্রত্বক, নরম বাদামী চুল, আর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য পেয়েছে জন্মসূত্রে। হিলদা মাত্র দু বছরের বড় তার থেকে। তবু এরই মধ্যে চেহারাটা কত রোগা হয়ে গেছে কনির। তার চেহারার সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সে।

হিলদা আর কনি দুজনেরই গলার স্বর এক। কনির মতই মোলায়েম নরম গলায় হিলদা বলল, কিন্তু সত্যিই তুমি অসুস্থ বোন।

মুখে সামান্য একফালি সকরুণ হাসি হেসে কনি বলল, মোটেই না। মনে হয় আমি কিছুটা ক্লান্ত। মানসিক ক্লান্তির জন্যই এরকম মনে হচ্ছে।

হিলদার মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। নারীসুলভ কমনীয়তা আর উজ্জ্বলতার অভাব নেই তার দেহে। তবু কোন পুরুষের সঙ্গে খুব বেশী খাপ খায় না তার। পাকা পীয়ার ফলের মত দেখাচ্ছিল তাকে।

হিলদা র‍্যাগবির চারদিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে বলল, এই জায়গাটা একেবারে বাজে।

এবার তাড়াতাড়ি ক্লিফোর্ডের কাছে চলে গেল হিলদা। হিলদাকে দেখে ক্লিফোর্ড ভাবতে লাগল, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে। তবু তার শ্বশুরবাড়ির কোন লোকদের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায় না ক্লিফোর্ড। কারণ তাদের জীবনযাত্রা ও রুচিবোধের সঙ্গে ওদের মেলে না। তবে হিলদার আচরণের মধ্যে এমনই একটা অপ্রতিরোধ্য আবেদন আছে যাতে সাড়া না দিয়ে পারে না ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড একটু দূরে চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসল। তার মাথার সুন্দর চুলগুলো বেশ চকচক করছিল। তার চোখ ও মুখখানা ম্লান দেখালেও তার চোখের মধ্যে একটা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ছিল আর তার মুখের মধ্যে একটা আভিজাত্যসুলভ গাম্ভীর্যের ভাব ছিল। সে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু হিলদা তার এই ভাবটাকে ধৃষ্টতা বলে ধরে নিল। ভাবল একটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। ক্লিফোর্ডের এই গাম্ভীর্যের ভাবটাকে মোটেই গ্রাহ্য করল না হিলদা। ক্লিফোর্ড যদি পোপের পদে অধিষ্ঠিত থাকত তাহলেও তাতে তার কিছু যেত আসত না।

তার সুন্দর দু চোখের দৃষ্টির শর দিয়ে ক্লিফোর্ডকে বিদ্ধ করে হিলদা বলল, কনিকে দারুণ অসুস্থ দেখাচ্ছে। কনির মতই হিলদাকেও কুমারী কুমারী দেখাচ্ছিল। তবু ক্লিফোর্ড বেশ বুঝতে পারল ওদের আপাতসরল কৌমার্য-ভাবের অন্তরালে স্কটদেশীয় একটা দৃঢ়তা আর একগুঁয়েমি লুকিয়ে আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, ও একটু রোগা হয়ে গেছে।

হিলদা বলল, এ বিষয়ে তুমি কিছু করনি ?

ক্লিফোর্ড প্রশ্ন করল, এ বিষয়ে করার কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন ? তার কণ্ঠের মধ্যে ভদ্রতার সঙ্গে ইংরেজসুলভ একটা কঠোরতার ভাব মিশে ছিল।

হিলদা কোন কথা না বলে শুধু ক্লিফোর্ডের পানে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। কনির মত মুখের উপর সঙ্গে সঙ্গে কারো কথার জবাব দেওয়া তার স্বভাব নয়। হিলদার চোখপানে ক্লিফোর্ড একবার তাকিয়েই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। তার মনে হলো হিলদা এভাবে তার পানে না তাকিয়ে যদি তার কথার কোন কড়া জবাব দিত তাহলে ভাল হত।

অবশেষে হিলদা বলল, আমি তাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুমি কাছাকাছি কোন ভাল ডাক্তারের নাম বলতে পার ?

ক্লিফোর্ড বলল, দুঃখিত, এমন কোন ডাক্তারের নাম আমার জানা নেই।

হিলদা বলল, আমি ওকে লণ্ডনে নিয়ে যাব। সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত একজন ডাক্তার আছে।

জ্বলন্ত রাগের আগুনে তার মনটা টগবগ করে ফুটলেও ক্লিফোর্ড মুখে কিছুই বলল না।

হিলদা বলল, আজ রাতটা আমি এখানেই থাকব। পরদিন ওকে আমি গাড়িতে করে লণ্ডনে নিয়ে যাব।

রাগে মুখখানা হলুদ পাণ্ডুর হয়ে গেল ক্লিফোর্ডের। তবু হিলদার চেহারাটাকে দেখতে বড় ভাল লাগছিল তার।

রাত্রিতে খাবার পর কফি খাবার পর হিলদা ক্লিফোর্ডকে বলল, তোমাকে দেখাশোনার জন্য একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করো। এজন্য তোমার একজন

পুরুষ ভৃত্য রাখা উচিত।

কথাগুলো হিলদা বেশ নরম মোলায়েম গলায় বললেও ক্লিফোর্ডের মনে হচ্ছিল সে যেন তার মাথায় একটা ধারাল অস্ত্রের কামড় বসিয়ে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ড নীরসভাবে বলল, আপনি তাই মনে করেন?

হিলদা বলল, হঁ্যা, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। এটা যদি দরকার হয় তা করো, তা না হলে বাবা ও আমি কনিকে কয়েক মাসের জন্য নিয়ে যাব। এ ধরনের ব্যাপার চলতে পারে না।

কি ধরনের ব্যাপার চলতে পারে না?

হিলদা পরিপূর্ণভাবে ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছ? তুমি দেখনি কি অবস্থা হয়েছে ওর?

ক্লিফোর্ডকে ঠিক সেই মুহূর্তে দেখে সিদ্ধ ক্রে মাছের মত মনে হচ্ছিল হিলদার।

ক্লিফোর্ড বলল, কনিতে আমাতে ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখব।

হিলদা বলল, তাতে আমাতে আগেই আলোচনা করেছি ব্যাপারটা।

ক্লিফোর্ড এর আগে অনেকদিন ধরে নার্সদের হাতে ছিল। কিন্তু ওরা ক্লিফোর্ডকে একবারও ঠিকমত একা থাকতে দেয় না। আর পুরুষচাকর? পুরুষচাকর একটা ঘাড়ের কাছে সব সময় ঝুলতে থাকবে এটা মোটেই পছন্দ করে না সে। তার থেকে যে কোন মেয়ে একজন হলেই ভাল। তবে কনিই বা থাকবে না কেন?

পরদিন সকালে দুই বোনে বেরিয়ে গেল। হিলদার পাশে কনিকে ঈস্টারের শান্ত মেষের মতই দেখাচ্ছিল। হিলদা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। স্যার ম্যালকম তখন বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু বাড়িটা খোলা ছিল।

ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করল কনিকে। তার জীবন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সবকিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। ডাক্তার বলল, আমি আপনার ও স্যার ক্লিফোর্ডের ছবি কিছু সচিত্র পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। আমি আপনাকে দেখলাম, দেহযন্ত্রের কোণ কিছু বিকল হয়নি। কিন্তু আপনার জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে। এভাবে চলতে পারে না। আপনাকে শহরে আসতে হবে। আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হবে। আপনার জীবনীশক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আপনার হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুগুলো এর মধ্যেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। হঁ্যা, শুধু স্নায়ুগুলো। আমি আপনাকে অবশ্য আপাততঃ মাসখানেকের মধ্যে ঠিক করে দেব। সুস্থ করে দেব। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। আপনারা যদি আমার কথা না শোনেন, যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন না করেন তাহলে পরে কোন অশুভ পরিণামের জন্য আমাকে যেন দোষ দেবেন না। আপনি আপনার জীবনীশক্তির ক্ষয় করে যাচ্ছেন দিনে দিনে। কিন্তু তা পূরণ করছেন না। তা পূরণ হচ্ছে না। যে কোন রকমের হাসিখুশি, বলিষ্ঠ আমোদ-প্রমোদ আপনার দরকার। এই

বিমর্ষ ভাবটা অবশ্যই কাটাতে হবে।

হিলদা সমর্থনে তার চোয়ালটা একবার নাড়ল।

মাইকেলিস শুনতে পেল কনি শহরে এসেছে তার দিদির সঙ্গে। খবর পাবামাত্র গোলাপ ফুল নিয়ে ছুটে এল দেখা করতে। কনিকে দেখেই সে চিৎকার করে উঠল, এ কি দশা হয়েছে তোমার? নিশ্চয় কিছু একটা গলদ হয়েছে কোথাও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমার ছায়ামাত্র। চেহারার এমন পরিবর্তন কখনো দেখিনি আমি। একথা আমাকে জানাওনি কেন তুমি? আমার কাছে চলে আসনি কেন? চল, আমার সঙ্গে সিসিলি চল। এখন সিসিলি জায়গাটা দারুণ ভাল লাগবে। তোমার এখন দরকার সূর্যালোকের। তোমার চাই এখন প্রাণের উত্তাপ। কেন তুমি নিজেকে এভাবে ক্ষয় করে চলেছ? চল, আফ্রিকা চল আমার সঙ্গে। গুলি মেরে দাও ক্লিফোর্ডের কথায়। ও চুলোয় যাক, জাহান্নামে যাক। ওকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এস। যে মুহূর্তে ও তোমার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে সেই মুহূর্তে আমি তোমাকে বিয়ে করব। চলে এস, এক নতুন জীবন শুরু করো। ঈশ্বরের নামে বলছি, ঐ র‍্যাগবি জায়গাতে যে থাকবে সেই মরবে। ওখানে মানুষ থাকে না, পশু থাকে। বাজে জায়গা, মানুষ মারা সর্বনেশে জায়গা। তার চেয়ে আমার সঙ্গে সূর্যালোকের রাজ্যে চল। তোমার এখন চাই প্রচুর সূর্যালোক। চাই পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আর স্বাভাবিক জীবনের এক মধুর উত্তাপ।

কিন্তু ক্লিফোর্ডকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করার কথা ভেবে কনির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থেমে গেল। সে তা পারবে না। না না……সে তা কিছুতেই পারবে না। ওকে র‍্যাগবি ফিরে যেতেই হবে।

কথাটা শুনে মাইকেলিস বিরক্ত হয়ে উঠল। হিলদা মাইকেলিসকে দেখতে পারত না ঠিক। তবু ক্লিফোর্ডের থেকে অনেক ভাল সে। যাই হোক দুই বোনে আবার সেই মিডল্যাণ্ডেই ফিরে এল।

ক্লিফোর্ডের চোখের তারাগুলো তখনো রাগে হলুদ হয়ে ছিল। হিলদা ক্লিফোর্ডের কাছে কথাটা তুলল। ক্লিফোর্ড এসব কিছু শুনতে না চাইলেও কনি তা বলল। ডাক্তার যা যা বলেছে তা সব বলল হিলদা। বলল না শুধু মাইকেলিসের কথাগুলো। অস্বস্তিকর অবাঞ্ছিত এক নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে সব কিছু শুনে যেতে লাগল ক্লিফোর্ড।

অবশেষে হিলদা বলল, এই হচ্ছে এক পুরুষ চাকরের ঠিকানা। ও একটা পঙ্গু লোককে দেখাশোনা করত। লোকটা মারা যাওয়ায় এখন তার ছুটি হয়েছে।

কিন্তু ক্লিফোর্ড বোকার মত বলল, আমি ত আর পঙ্গু নই একেবারে। আমি পুরুষচাকর চাই না।

হিলদা বলল, এই নাও দুটি মেয়ের ঠিকানা। ওদের মধ্যে আমি একটিকে

আগেই দেখেছি। বছর পঞ্চাশ বয়স। শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা। মন খুব ভাল। শান্ত প্রকৃতির, বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্না।

ক্লিফোর্ড তেমনি সেই নীরবতায় স্তব্ধ গাম্ভীর্যে জমাট বেঁধে রইল পাথরের মত। কথাটার কোন উত্তর দিল না।

হিলদা বলল, ঠিক আছে, ক্লিফোর্ড, কালকের মধ্যে যদি একটা ব্যবস্থা না করো তাহলে আমি বাবাকে টেলিগ্রাম করব। আমরা কনিকে নিয়ে যাব।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি যাবে?

সে যেতে চায় না। তবু তাকে যেতেই হবে। আমাদের মা ক্যান্সারে মারা যায়। আমরা আর কোন ঝুঁকি নেব না।

পরের দিন ক্লিফোর্ড নার্সের জন্য মিসেস বোল্টনের নাম প্রস্তাব করল। মিসেস বোল্টন হলো ত্রেভারশালের গ্রাম্য মিশনারী হাসপাতালের ধাত্রী। সেখান থেকে অবসর পেয়ে এখন সে ব্যক্তিগতভাবে লোকের বাড়িতে রোগীর সেবা করার কাজ করে বেড়ায়। ক্লিফোর্ড কোন অপরিচিত মেয়েকে নার্স হিসাবে পছন্দ করে না। মিসেস বোল্টন আগে একবার ক্লিফোর্ডের সেবা করে। তাই এবারও ক্লিফোর্ড তারই নাম করল।

পরদিন সকালেই দুই বোনে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে দেখা করল। বছর চল্লিশ বয়স। বলিষ্ঠ চেহারা। নার্সের পোষাক পরনে। তার আচরণ খুবই ভদ্র। কথাবার্তা বেশ মিষ্টি। গাঁয়ের সব লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে।

মিসেস বোল্টন ওদের মুখ থেকে সব কিছু শুনে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই লেডি চ্যাটার্লিকে দেখে ভাল মনে হচ্ছে না। ওঁর শরীর ভাল হবে, না কোথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। সত্যিই দুঃখের বিষয়। বেচারা ক্লিফোর্ড। সেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা যুদ্ধ। এর উপর কোন কথা নেই, প্রতিকার নেই।

মিসেস বোল্টন আগামীকালই র‍্যাগবিতে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ডাক্তার শার্লো যদি তাকে ছেড়ে দেন। কারণ সে এখন যেখানে কাজ করছে সেখানে সরকারীভাবে এখনো পনের দিনের কাজ তার হাতে আছে। নিয়মমত এটা সেরে দিয়ে যাওয়া উচিত মিসেস বোল্টনের। তবে ডাক্তার ইচ্ছা করলে তার একটা বিকল্প যোগাড় করে নিতে পারেন।

হিলদা নিজে গিয়ে দেখা করল ডাক্তার শার্লোর সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে গেল। ডাক্তার শার্লো মিসেস বোল্টনকে ছেড়ে দিলেন। পরের রবিবার মিসেস বোল্টন বাক্স প্যাটরা নিয়ে র‍্যাগবি রওনা হয়ে পড়ল। হিলদা মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কথা বলে দেখল তার বয়স সাতচল্লিশ হলেও তাকে দেখে অনেক কম বয়সের মনে হয়।

মিসেস বোল্টনের স্বামী টেড বোল্টন আজ হতে বাইশ বছর আগে খাদে কাজ করতে করতে মারা যায়। তখন ছিল খৃস্টোৎসব। দুটি শিশুকে স্ত্রীর হাতে দিয়ে অকালে চলে গেল স্বামী। তাদের মধ্যে একটি শিশু ছিল

দুগ্ধপোষ্য। সেদিনের সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু এডিথ আজ বিবাহিত। শেফিল্ডের এক কেমিস্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। আর একজন স্কুল মাস্টার চেস্টারফিল্ডে মাস্টারি করে। বোল্টনদের দুটি সন্তানই মেয়ে।

টেড বোল্টন যখন খাদের ভিতর এক বিস্ফোরণের ফলে মারা যায় তখন তার বয়স আটাশ। বিস্ফোরণের সময় মোট চারজন এক জায়গায় ছিল। তারা সবাই শুয়ে পড়ে সময়ে। কিন্তু টেড একা সেই বিস্ফোরণে মারা যায়। ওরা বলে টেড ভয় পেয়ে পালাতে যায়। তাই মারা যায়। এটা যেন তার দোষ। তাই তার মৃত্যুর জন্য মালিকরা মাত্র তিনশো পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়। তারা বলে টেড সময়মত কর্তৃপক্ষের আদেশ মানেনি। এটা যেন তাদের দয়ার দান। তাও টাকাটা একবারে দেয়নি। বলেছিল মিসেস বোল্টন মদ খেয়ে তা উড়িয়ে দেবে। তাই তাকে প্রতি সপ্তায় তিরিশ শিলিং করে তুলে নিতে হবে। মিসেস বোল্টন চেয়েছিল টাকাটা একসঙ্গে পেলে সে তাই দিয়ে একটা দোকান খুলবে। যাই হোক, এই টাকাটা তোলার জন্য তাকে প্রতি সোমবার অফিসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কিন্তু এই সামান্য টাকা সারা সপ্তাটা দুটো ছেলে নিয়ে কি করে চলবে? তবে টেডের মা বড় দয়াবতী নারী ছিলেন। তিনি আইভি বোল্টনকে স্নেহের চোখে দেখতেন। আইভি যখন শেফিল্ডে নার্সিং শেখার জন্য ক্লাস করতে যেত তখন টেডের মা শিশু দুটির দেখাশোনা করতেন। চার বছর শিক্ষার পর নার্সিং ভালভাবে পাশ করে একটা হাসপাতালে কাজ নেয় আইভি। তারপর স্যার জেভারশালে খনি কোম্পানি খুললে সেখানকার গ্রাম্য হাসপাতালে তাকে কাজ দেন। লোকে ভাবত কোম্পানি তার জন্য অনেক কিছু করেছে।

কথাটা শুনে মিসেস বোল্টন একবার বলে, হ্যাঁ কোম্পানি আমার অনেক ভাল করেছে। টেডের সম্বন্ধে কোম্পানি যে কি বলে আমি তা ভুলিনি। টেডকে কোম্পানি দেখতে পারত না কারণ সে ছিল নির্ভীক, সে ছিল দৃঢ়চেতা। তবু তাকে বাধ্য হয়ে খাঁচার বন্ধন মেনে নিতে হয় এবং লোকে তাকে কাপুরুষ ভাবত।

মিসেস বোল্টনের কথার মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ অনুভূতির এক অদ্ভুত মিশ্রণ ছিল। সে কোলিয়ারির খনি শ্রমিকদের ভালবাসত, তাদের অনেকদিন থেকে সেবা শুশ্রূষা করে আসছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের থেকে নিজেকে বড় ভাবত। নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হিসাবে ভাবত, আবার সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর লোকদের ও মালিকপক্ষকে সে ঘৃণা করত। যে কোন শ্রমিক মালিক বিরোধের ক্ষেত্রে সে শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করত। কিন্তু যখন কোন বিরোধ থাকত না, তখন নিজেকে উচ্চ অভিজাত শ্রেণীরই একজন হিসাবে ভাবত। উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তার একটা মোহ ছিল, কারণ তার মনের মাঝে ইংরেজ-সুলভ যে প্রভুত্বস্পৃহা ছিল সে স্পৃহা একমাত্র উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই

মেটাতে পারে। তাই স্যার জিওফ্রের বাড়ি র‍্যাগবিতে যেতে ভাল লাগত তার। সেখানে যেতে গায়ে রোমাঞ্চ জাগত তার। রোমাঞ্চ জাগত তার লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে যখন সে কথা বলত। তবু একটু লক্ষ্য করলেই যে কেউ বুঝতে পারত তার কথার ফাঁকে ফাঁকে র‍্যাগবির মালিকদের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিদ্বেষ উঁকি মারত। তার কারণ এই যে র‍্যাগবির এই বর্তমান বংশধরেরাই খনির মালিক।

সব কিছু শুনে মিসেস বোল্টন র‍্যাগবিতে এসে কনিকে বলল, এ রোগ আপনার দেহটাকে ক্ষয় করে দেবে একেবারে। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে আপনার এই বিপদে সাহায্য করার মত এমন এক বোন ছিল। কি উঁচু কি নিচু সব সমাজের পুরুষরাই এক। তারা মেয়েদের কথা মোটেই ভাবে না; শুধু তাদের সেবার সব কাজ গ্রহণ করে। আমি একথা কতবার কোলিয়ারির লোকদের বলেছি। তবে ক্লিফোর্ডের পক্ষে আঘাতটা সত্যিই মর্মান্তিক। এমনভাবে পঙ্গু হয়ে থাকা সারাজীবন। ওঁরা মানুষ হিসাবে বড় অহঙ্কারী ছিলেন। অভিজাত সমাজের লোক অহঙ্কারী হবারই ত কথা। কিন্তু সে অহঙ্কারের প্রতিফল এমন হবে এটা কেউ ভাবতে পারেনি। এর প্রতিফল সবচেয়ে বেশী ভয়ংকর ও দুর্বিসহ হয়ে উঠল লেডি চ্যাটার্লির জীবনে। উনি জীবনে যা হারালেন তা আর ফিরে পাবেন না কখনো। আমিও টেডকে হারিয়েছি। তাকে মাত্র পেয়েছিলাম তিন বছরের জন্য। কিন্তু স্বামী হিসাবে এমন গুণবান ছিল যে এই তিন বছরের মধ্যেই এক চিরস্থায়ী দাগ কেটে যায় আমার মনে। তাকে কোনদিন ভুলতে পারব না আমি। সে ছিল দিবালোকের মতই সব সময় হাসিখুশিতে উজ্জ্বল। এমন লোক এত তাড়াতাড়ি মরবে কেউ ভাবতেই পারেনি। আমি নিজেও একথা বিশ্বাস করতে পারিনি। তার মৃত-দেহটাকে আমি নিজের হাতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেও একথা আজও বিশ্বাস করতে পারি না। সে আমার কাছে আজও ঠিক মৃত নয়। আমার কাছে তার মৃত্যু কোনদিনই ঘটেনি।

এ ধরনের কথা র‍্যাগবিতে এই প্রথম। এমন কথা কোনদিন কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি এ বাড়িতে। কনি একথা জীবনে আজ প্রথম শুনল। একেবারে নতুন ঠেকল তার কানে। একথার মানে খোঁজার এক আশ্চর্য আগ্রহ জাগল তার মনে।

মিসেস বোল্টন এবার কিন্তু প্রথম খুব গম্ভীরভাবে কাজকর্ম করে যেতে লাগল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন নতুন মানুষ। সেই হাসিখুশির ভাব আর নেই। ক্লিফোর্ডের কাছে থেকে কেমন লজ্জা আর ভয়ে ভয়ে সব কাজ নীরবে নিঃশব্দে করে যেতে থাকে। ক্লিফোর্ডও সব সময় তার স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য আর মালিকসুলভ মনোভাব বজায় রেখে চলে।

মিসেস বোল্টন সম্বন্ধে ক্লিফোর্ড কনিকে একদিন বলল, কাজ করে ভালই।

কিন্তু শুধু প্রয়োজনই মেটায়। এর বেশী কোন মূল্য নেই।

একথার কোন প্রতিবাদ করল না কনি। শুধু ভাবল একই ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মনোভাব কত ভিন্ন হতে পারে।

ক্লিফোর্ডের কাছে এই ধরনের আচরণ ও মনোভাবই প্রত্যাশা করেছিল মিসেস বোল্টন। সে জানত একই ধরনের ব্যবহার সকলের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সে যখন কোলিয়ারির খনি শ্রমিকদের কোন ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিত অথবা কোন রোগীর সেবা করত তখন তারা সরলভাবে তার জীবনের কত কথা বলত, তাকে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। তাদের কাছে মিসেস বোল্টনের মনে হত সে যেন মানবী নয়, দেবী অথবা অনেক উচ্চশ্রেণীর মানুষ। আর আজ ক্লিফোর্ডের কাছে থেকে তার ব্যবহারে মনে হয় সে কত ছোট, সে একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। তবু নীরবে অবনত চিত্তে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় নতুন পরিবেশে।

তার লম্বাটে ধরনের সুন্দর নির্বাক মুখখানা নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্লিফোর্ডের কাছে এসে মিসেস বোল্টন বলত, এটা করব স্যার ক্লিফোর্ড? ওটা করব?

ক্লিফোর্ডও কড়াভাবে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, না পরে হবে। এখন থাক।

বোল্টন তখন বলে, ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

আধ ঘণ্টা পরে এস।

ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

আসবার সময় পুরনো কাগজগুলো নিয়ে এস। বুঝলে?

ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। আবার আধ ঘণ্টা পরে তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এল। তাকে ছোট ভাবা হয় তবু তাতে সে কিছু মনে করে না। অভিজাত সমাজের লোকদের সম্বন্ধে সে শুধু এক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। ক্লিফোর্ডকে সে অপছন্দ করে না বা তার উপর রাগও করে না। সে যেন অমোঘ অপরিহার্য ঘটনার এক নিষ্প্রাণ অংশ। যে অভিজাত সমাজ এক মূঢ় অহঙ্কারে ও মিথ্যা আত্মগরিমায় ভরা ক্লিফোর্ড তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতদিন এটা সে ভাল করে জানত না, আজ জানছে। সে বরং লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশত, কথা বলত।

মিসেস বোল্টন রাতে বিছানায় শুতে যেতে সাহায্য করত ক্লিফোর্ডকে। তারপর তার ঘরের বাইরে বারান্দাটায় নিজে শুত। রাতে কোন দরকার পড়লে ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজালেই উঠে আসত বোল্টন। আবার সকালে উঠতে সাহায্য করত তাকে। তাকে মুখ হাত ধুইয়ে দাড়ি কামিয়ে পর্যন্ত দিত নারী-সুলভ নরম হাতে। সে ছিল যেমন যোগ্য তেমনি মধুরস্বভাবা। সে জানত কিভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষকে বশীভূত করতে হয়। ক্লিফোর্ডের মুখে

দাড়ি কামানোর আগে সাবান ঘষতে ঘষতে তার মনে হত একদিক দিয়ে সে অন্য সব মানুষ থেকে খুব একটা পৃথক নয়। ক্লিফোর্ডের আভিজাত্যসুলভ স্বাতন্ত্র্যভাব আর সরলতার অভাবটাকে আর তেমন খারাপ লাগত না মিসেস বোল্টনের। মোটের উপর সে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে জীবনে।

ক্লিফোর্ড কিন্তু তার নিজের কাজের ভার অপর একজন বাইরের মেয়ের উপর তুলে দেওয়ার জন্য কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না কনিকে। সে নিজেকে মনে মনে প্রায়ই বলত, এর ফলে তার সঙ্গে কনির আসল অন্তরঙ্গতার ফুলটি অকালে ঝরে গেল। কনি কিন্তু মোটেই তা মনে করত না। তার বরং মনে হতে লাগল সেই অন্তরঙ্গতার ফুল কাঁটা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জীবন-রূপ বৃক্ষের এক বোঝাসর্বস্ব পরগাছা। সে ফুল বড় ম্লান আর বিবর্ণ ঠেকতে লাগল তার চোখে।

কনি এখন আগের থেকে অনেক সময় পেয়েছে। এখন সে পিয়ানো বাজিয়ে গান করে। কাঁটাভরা ফুলের গাছে কখনো হাত দিয়ো না···প্রেমের হাত আলগা করা ঠিক হবে না। এর আগে কনি কখনো এমন করে বুঝতে পারেনি প্রেমের হাত আলগা করার বেদনা কতখানি। তবু এ হাত আলগা করার জন্য আজ সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না। এখন সে সম্পূর্ণ একা থাকতে কত খুশি সে! অনবরত এখন আর কথা বলতে হয় না। এর আগে ক্লিফোর্ড যখন নিজের মনে টাইপ করে যেত তখন সে নিজের কাজ নিয়েই থাকত শুধু। কিন্তু হাতে যখন তার কোন কাজ থাকত না তখন সে শুধু কথা বলে যেত কনির সঙ্গে। কত শত মানুষের চরিত্র আর তাদের আশা আকাঙ্খা এষণা, বৃত্তি প্রবৃত্তি ও তাদের বিচিত্র পরিণতি সম্পর্কে অনর্গল বকে যেত ক্লিফোর্ড। সে কথার যেন আর শেষ থাকত না। শুনতে শুনতে বিরক্ত বোধ হত কনির। বছরের পর বছর ধরে এই ক্লান্তিকর বিরক্তির কথাগুলো একটানা শুনে এসেছে ও। প্রথম প্রথম ও শুনতে ভালবেসেছে। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। এখন তার বিরক্তবোধ হয়। এখন সে একা থাকতে পেয়ে সেই সব কথার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে ধন্য।

যেন তাদের প্রেমের ছোট চারাগাছটাকে ঘিরে তাদের দুজনের অজস্র সুতোর জট পাকিয়ে উঠেছিল। সেই সব জটের চাপে গাছটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল। কনি জটগুলোকে একে একে খুলে ফেলে। মুক্তিলাভের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠে সেই সব চেতনার সুতোগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু ছিঁড়তে গিয়ে বোঝে বন্ধনের বেদনার থেকে বন্ধনচ্ছেদের বেদনা আরও বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে এটাও বোঝে যে মিসেস বোল্টন এ বাড়িতে আসাতে তার অনেক উপকার হয়েছে।

ক্লিফোর্ড তবে আজও প্রতি সন্ধ্যায় কনিকে কাছে পেতে চায়। সে চায় সারা সন্ধ্যাটা কনির সঙ্গে কথা বলে যাবে, অথবা কনির সামনে সে চেঁচিয়ে

তার লেখা পড়ে যাবে। কনি তাতে রাজী হয়েছে একটা শর্তে। এই শর্তে যে মিসেস বোল্টন ঠিক দশটা বাজলেই এসে পড়বে ক্লিফোর্ডের কাছে আর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কনি উপরতলায় উঠে যাবে। উপরতলায় নিজের ঘরে গিয়ে আবার সে একা থাকতে পারবে। এখন ক্লিফোর্ড মিসেস বোল্টনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে।

মিসেস বোল্টন থাকে বাড়ির পুরনো ঝি মিসেস বেটস্‌এর ঘরের কাছে। তার ফলে একতলায় ক্লিফোর্ডের বসবার ঘরের অনেক কাছেই যেন ঝি চাকরের ঘরগুলো এগিয়ে এসেছে। ক্লিফোর্ডের বসার ঘরে তার কাছে বসে থেকে তাদের কথা কানে শুনতে পায় কনি।

সন্ধ্যাবেলাটা এইভাবে ক্লিফোর্ডের কাছে কাটালেও মুক্তির এক অফুরন্ত আস্বাদ লাভ করল কনি। তার মনে হতে লাগল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে সে যেন এই প্রথম প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। তবু একটা বিষয়ে ভয় হয় কনির। তার মনে হয় যৌথ চেতনার জটিল জটগুলো ছিঁড়ে দিলেও তাদের নীতিগত অনেক জট আজও জড়িয়ে আছে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে। সে যাই হোক, আগের থেকে সে এখন অনেক মুক্ত, তার জীবনে এক নূতন স্তর যেন শুরু হতে চলেছে।

অধ্যায় ৮

মিসেস বোল্টন শুধু ক্লিফোর্ডের সেবা নয়, কনির উপরেও সমানে স্নেহশীল দৃষ্টি রেখে চলত। কনি যখন তার ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে বসে থাকত, বই পড়া বা সেলাই করার ভাণ করত সে তখন তাকে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করত। ঘরে একা একা বসে না থেকে বাইরে যাবার জন্য প্রায়ই তাড়া দিত তাকে। এইভাবে তার মমতাময় প্রভুত্ব ধীরে ধীরে কনির উপর বিস্তার করেও তার চাকরির ভিত্তিটাকে পাকা করে তোলার ব্যবস্থা করল মিসেস বোল্টন।

হিলদা র‍্যাগবির বাড়ি থেকে চলে যাবার পর কদিন ধরে জোর হাওয়া বইতে লাগল। এই রকম এক দিনে মিসেস বোল্টন কনিকে বলল, আপনি এখন ঘরে বসে? বন দিয়েও ত একটু বেড়িয়ে আসতে পারেন। মালীর ঘরের পিছনের দিকটায় প্রচুর ডাফোডিল ফুল ফুটেছে। দৃশ্যটা দেখতে বড় চমৎকার লাগবে। আপনি দুটো ফুল আপনার ঘরের জন্যও আনতে পারেন।

কথাটা ভেবে দেখল কনি। তবু ভাল ডাফোডিল ফুল দেখা। মানুষ ঘরে বসে বসে নিজের আত্মার রস ত আর পান করে যেতে পারে না।

ঋতুবৈচিত্র্যের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রস পান করে যেতে হয়। কনি দেখল বসন্ত এসেছে। এক ঋতু গিয়ে আর এক ঋতু আসে, দিন গিয়ে রাত্রি আসে। কিন্তু তার জীবনে ছোট বড় কোন পরিবর্তন নেই। তার কাছে দিন রাত্রি সকাল সন্ধ্যা শীত বসন্ত যেন তাদের আপন আপন প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

আর মালী বা শিকার রক্ষক মানে ত রোগা-রোগা চেহারার সাদা ধবধবে রংওয়ালা একটা লোক, অবশ্য ফুলের মত সে একা একা থাকে। এই কদিনের ঝামেলায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল কনি। এখন আবার মনে পড়ল। মনে পড়ল তার সেই চিরমলিন নিঃসঙ্গ মুখখানা।

এখন একটু গায়ে বল পেয়েছে কনি। এখন সে হাঁটতে পারে স্বচ্ছন্দে। বনের মধ্যে গিয়ে দেখল বাতাসটা তত জোর নয়। পথ হাঁটতে হাঁটতে কনির মনে হলো এ জগতের সব কিছু ভুলে যেতে চায় সে। ভুলে যেতে চায় পচা দুর্গন্ধওয়ালা দেহধারী সব মানুষগুলোকে। কিন্তু দেহ থাকলেই তার থেকে নতুন দেহ বেরিয়ে আসবে। দেহের পুনরভ্যুত্থানে সে বিশ্বাসী। বসন্তের উতল বাতাসের মদির আঘাতে দুলে উঠল যেন তার চেতনা আর দোদুল্যমান সেই চেতনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথাই উঁকি মারতে লাগল তার মনে। তার মনে হলো, ফুলের কুঁড়িগুলো যখন ফুটে উঠছে তখন আমার শুকনো মরা দেহটাতেও আবার ফুল ফুটবে। আমি আবার সূর্য দেখব। আবার অফুরন্ত সূর্যালোকে অভিস্নাত হব।

বনের ভিতর বাতাসের বেগ তত নেই। তবে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার এক একটা বেগ এসে গাছগুলোকে ভীষণভাবে দুলিয়ে দিচ্ছিল আর এক ঝলক করে সূর্যরশ্মি এসে বনভূমিতে পড়ছিল। আর তাতে বনছায়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কনির মনে হচ্ছিল, নরক থেকে উঠে আসা পার্সিফোনের হিমশীতল দীর্ঘশ্বাসের এক সকরুণ আঘাতে যেন সারা বনভূমিটা এমন করে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে; এ্যাবসালমের মত ক্রুদ্ধ বাতাস গর্জন করছিল মাথার উপরে। কনির মনে হচ্ছিল বড় বড় গাছগুলোর জটিল শাখা-প্রশাখায় আবদ্ধ বাতাস যেন নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। তবু তারই মাঝে ফুলগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠছে একে একে।

গা-টা শীত শীত করছিল কনির। সমগ্র বনস্থলী জুড়ে যেন হিমশীতল কনকনে ঠাণ্ডার একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল আর মাথার উপরে শোনা যাচ্ছিল ক্রুদ্ধ গর্জন। সহসা কেমন এক উত্তেজনা দেখা দিল কনির মধ্যে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি তার মুখের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গালগুলো রঙীন হয়ে উঠল। এক নীল আলো ফুটে উঠল তার চোখে। পথে যেতে যেতে ভায়োলেট, প্রিমরোজ প্রভৃতি কিছু ফুল তুলে নিল। ফুলগুলো ঠাণ্ডা কিন্তু তাদের

গন্ধ বড় মিষ্টি। কোথায় যাচ্ছে তা না জেনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে লাগল কনি।

বনটা এইভাবে পার হয়ে ওদের কুটিরটার সামনে এসে পড়ল। কুটিরটাকে সূর্যের আলোয় কেমন গোলাপী দেখাচ্ছিল। ব্যাঙের ছাতার বুকের নিচে যে গোলাপী রং থাকে সেই রকম গোলাপী দেখাচ্ছিল বাড়িটা। দরজার সামনে যুঁই ফুল ফুটে ছিল। কিন্তু বাড়িটার ভিতরে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। চিমনিতে কোন ধোঁয়া উঠছিল না। কুকুরটাও আজ ডাকছিল না।

কনি নিঃশব্দে সোজা বাড়িটার পিছন দিকে চলে গেল। সে শুধু ডাফোডিল ফুলগুলো দেখতে চায়। অন্য কোন দরকার নেই।

সত্যিই অপূর্ব। অসংখ্য ফুল একসঙ্গে বাতাসে কাঁপছিল, দুলছিল। কিন্তু কোথাও লুকোবার জায়গা পাচ্ছিল না। বাতাসের ঘায়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও তারা যেন দুলতে ভালবাসছিল।

একটা ছোট পাইন গাছে হেলান দিয়ে বসে রইল কনি। সূর্যের আলোয় সোনার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ফুলগুলোকে। মাথায় সূর্যালোকের মুকুটপরা পাইন গাছটাকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল কনির। সূর্যের এক ফালি তপ্ত রশ্মি তার কোলে এসে পড়েছিল। সেই সূর্যের আলোয় ডাফোডিল ফুলগুলোকে সোনার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে ফুলের কিছু গন্ধও সে পাচ্ছিল। তার এই একান্ত-বাঞ্ছিত একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে কনি ভাবছিল সে যেন তার আকাঙ্খিত পরিণতির রাজ্যে এসে পড়েছে। যে অচ্ছেদ্য রজ্জুর দ্বারা তার জীবনতরীটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সহসা একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে যেন তার বন্ধন। তাই আপন মনে অবাধে ভেসে চলেছে যেন সে তরীটি।

সূর্যরশ্মিগুলো সরে যেতেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ফুলগুলো। আবার ঠাণ্ডা হিম হয়ে উঠল ফুলগুলো। ঘনায়মান এই গোধূলিবেলা হতে শুরু করে সারা রাত তাদের এইভাবে থাকতে হবে।

গোটাকতক ডাফোডিল ফুল নিয়ে উঠে পড়ল কনি। ফুলগুলোকে গাছ থেকে ছিঁড়তে তার ইচ্ছা করছিল না। তবু দু একটা ফুল সে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিল। তাকে আবার র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে হবে। সেই বিরাট প্রাচীর আর ঘন দেওয়ালের মাঝে ফিরে যেতে ঘৃণা বোধ করছিল তার। তবু হিমশীতল বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সেই দেওয়ালের মধ্যে ঢুকতেই হবে মানুষকে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ড তাকে বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

কনি বলল, বন দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখ দেখ, কি সুন্দর ডাফোডিল ফুলগুলো।

ক্লিফোর্ড বলল, প্রচুর আলোবাতাসের জন্যই এরকম হয়েছে।

কিন্তু মাটিতেই ওদের জন্ম।

ক্লিফোর্ডের কথাটাকে এত তাড়াতাড়ি খণ্ডন করার জন্য নিজেই বিস্ময় বোধ করছিল কনি।

পরের দিন বিকালে আবার বন দিয়ে বেড়াতে গেল কনি। আজ সে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছায়াঘেরা একটা ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছল। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। নিচের দিকটা অন্ধকার। ঝর্ণাটার গায়ে কতকগুলো পাথরনুড়ি পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বসার পর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলো কনি। অল্প কিছুটা যাবার পর কাঠ কাটার শব্দ পেল পথের ডান দিকে। মনে হলো হয় কোন কাঠুরিয়া গাছ কাটছে অথবা কোন কাঠঠোকরা পাখি গাছ ঠোকরাচ্ছে।

শব্দটা শুনতে শুনতে এগিয়ে যেতে লাগল কনি। ছোট ছোট ফার গাছের মাঝখান দিয়ে একটা ছোট পথ দেখতে পেল সে। পথটা কোথায় গেছে বোঝা গেল না। কনি দেখল পথটা কিছুদূর গিয়ে ওক গাছের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কনি পথটা ধরে যতই এগিয়ে যেতে থাকে ততই কাঠ কাটার শব্দটাও কাছে মনে হয়।

কনি তার সামনে একফালি ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। এদিকটায় সে কখনো আসেনি এর আগে। কনি বুঝতে পারল এই নির্জন ফাঁকা জায়গাটাতেই শিকারী পাখিগুলোকে লালন করত। শিকার রক্ষক মালী নতজানু হয়ে হাতুড়ী পিটছিল কি একটা কাজে। হঠাৎ কনিকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। কিন্তু কনিকে তার দিকে নীরবে এগিয়ে আসতে দেখে বিরক্তি আর রাগ অনুভব করছিল মনে মনে। কারণ এক অবাধ নির্জনতা দিয়ে ঘেরা তার এই একমাত্র স্বাধীনতার আস্বাদনে কেউ ব্যাঘাত ঘটাক তা সে চায় না।

লোকটা এমনভাবে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়েছিল যে তা দেখে কনি যেন ভয় পেয়ে গেল। তার উপর অনেকখানি পথ হেঁটে বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। কনি ক্লান্তির সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি ভাবছিলাম শব্দটা কিসের।

লোকটা বলল, আমি পাখির ছানাগুলোর জন্যে খাবার তৈরি করছিলাম।

এর উত্তরে কনি কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। তেমনি ক্লান্তভাবেই সে বলল, আমি কিছুক্ষণের জন্য বসতে চাই।

লোকটি তখন তাড়াতাড়ি কনির সামনে দিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে একটা কাঠের চেয়ার বার করে বলল, এটাতে বসুন।

তারপর আবার বলল, আমি আগুন জালাব?

কনি বলল, না, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

কিন্তু সে শুনল না। কনির হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল হাতগুলো

ঠাণ্ডায় নীলচে মত হয়ে গেছে। আর কোন কথা না বলে কিছু কাঠ এনে কনির সামনে একটা উনোনের মধ্যে আগুন জ্বেলে দিল। কনি সেই চেয়ারটায় বসে সেই আগুনের আঁচে হাত পা শেঁকতে লাগল। লোকটার কণ্ঠের মধ্যে এমন এক স্নেহশীল প্রভুত্বের সুর ছিল যা কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারল না কনি। হাত শেকতে শেকতে নিজেও তখন কাঠের টুকরো ফেলে দিতে লাগল আগুনটায়।

কুঁড়ের ভিতরটায় চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল কনি। ঘরটার মধ্যে কোন জানালা নেই। দরজার কপাট খোলা। খোলা দরজা দিয়ে সব সময়েই আলো আসে। তার চেয়ারটার পাশে একটা কাঠের টেবিল ছিল। একদিকে একটা বেঞ্চি পাতা। আর এখানে সেখানে কিছু যন্ত্রপাতি ছড়ানো।

লোকটা আগুন জ্বেলে দিয়ে আবার তার কাজে চলে গেছে। আবার তেমনি হাতুড়ীর শব্দ হতে লাগল। শব্দটা শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না কনির। এদিকে লোকটারও ভাল লাগছিল না। লোকটা চাইছিল মনেপ্রাণে একা থাকতে। তার এই নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রায় কেউ এসে ব্যাঘাত ঘটালে বিশেষ করে কোন একজন নারী হলে তার খুবই খারাপ লাগে। তথাপি এক্ষেত্রে সে অসহায়। তার আকাঙ্খিত ও একান্তবাঞ্ছিত এই নিঃসঙ্গতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না সে। কারণ কনি ওর মালিক, তার প্রভু আর ও তাদের বেতনভোগী কর্মচারী।

একজন নারীর কাছ থেকে যে বিরাট আঘাত সে পেয়েছে সেই আঘাতের ফলেই সে আর কোন নারীর সংস্পর্শে আসতে চায় না। তার মনে হয় সে যদি একা থাকতে না পায় তাহলে সে মরে যাবে। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে এই বনের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে সে। এই বনটাই যেন জীবনে তার একমাত্র আশ্রয়।

ঘরের মধ্যে যে আগুনটা জ্বলছিল তা আগের থেকে বড় হয়ে গেছে। সেই আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কনির গাটা। সে উঠে দরজার চৌকাঠের উপর একটা টুলের উপর বসে লোকটার কাজ দেখতে লাগল। লোকটা এমনভাবে একমনে কাজ করে যেতে লাগল যাতে মনে হবে সে কনিকে একেবারে দেখছে না। কিন্তু ও জানত কনি কি করছে। ও কাজ করে যাচ্ছিল আর ওর বাদামী রঙের কুকুরটা লেজের উপর ভর দিয়ে বসেছিল।

কৃশকায় ও ক্ষিপ্রগতি লোকটা পাখিদের খাবার প্রস্তুত করার পর তা যথাস্থানে নিয়ে গেল। কনিকে সে একটা কথাও বলল না। কনির উপস্থিতিটা সে যেন ইচ্ছা করে লক্ষ্যই করছে না। কনির উপস্থিতি সম্বন্ধে সে যে সচেতন সে বিষয়ে কোন লক্ষণই দেখাল না সে।

কনি স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। দেখল সেদিন লোকটা যখন স্নান করছিল তখন তার মধ্যে যে নিঃসঙ্গতা যে বিষাদ লক্ষ্য করেছিল আজও

সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাকে জমাট বেঁধে থাকতে দেখছে। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন কোন ভারবাহী পশু নীরবে নিঃশব্দে আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে একা একা। সে যেন ইচ্ছা করেই মানবজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। নীরবে পরম ধৈর্যসহকারে লোকটা কনিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কনির কিন্তু মনে হলো, লোকটার এই অন্তহীন ধৈর্য আর নীরবতার মধ্যে অধীর অশান্ত একটা কিছু লুকিয়ে আছে আর সেই অজানিত আবেগটার এক নীরব আঘাতে শিউরে উঠল তার পেটের ভিতরটা। কনি একমনে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তার মাথাটা নত করে ঘাড়টা বাঁকিয়ে ও পাছাটা নাড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা। কনির মনে হলো লোকটার নিম্নাঙ্গের অভিজ্ঞতা তার থেকে অনেক বেশী। সে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ব্যাপক আর গভীর।

বর্তমানের স্থান কাল সব কিছু ভুলে স্বপ্নের এক মধুর উত্তাপে মশগুল হয়ে রইল কনি। এমনই আনমনা হয়ে সে ভাবছিল যে একবার তার পানে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল লোকটা। তার মনে হলো কনির আপাতশূন্য দৃষ্টির মধ্যে কার জন্য এক নিরুচ্চার প্রতীক্ষা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তার অন্তরে বাইরে আজ যে নিঃসঙ্গতা নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে সেই নিঃসঙ্গতাবোধই এই প্রতীক্ষার ছদ্মরূপ ধরে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টির শূন্যতায়। সহসা তার পিঠের নিচের দিকটায় তার মেরুদণ্ডের ভিত্তিমূলে একটা জ্বালা অনুভব করল লোকটা। মানুষ যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, যেমন এড়িয়ে চলতে চায়, আজও তেমনি কোন মানুষের বিশেষ করে কোন নারীর সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে সে। সে এখন মনেপ্রাণে একটা জিনিসই চাইছিল। তা হলো এই যে কনি এই মুহূর্তে চলে যাক তার কাছ থেকে। আধুনিক নারীমনের যে প্রভুত্বস্পৃহা তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রবৃত্তিকে ভয় করে সে, কনি যেন সেই স্পৃহা ও প্রবৃত্তিরই মূর্ত প্রতীক। তার উপর কনি আবার অভিজাত সমাজের মেয়ে। তার প্রভুত্বের স্পৃহাটা আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মোট কথা এখানে কনির উপস্থিতিটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখে।

হঠাৎ একটা তীব্র অস্বস্তিবোধের সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেল কনি। সে উঠে দাঁড়াল। বিকাল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়েছে। তবু সে চলে যেতে পারছিল না। লোকটার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তারই পানে তাকিয়ে। তার মুখখানা কেমন শক্ত, কড়া কড়া ভাব, তার দু চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা।

কনি বলল, জায়গাটা এত নির্জন, এত সুন্দর! আমি এর আগে কখনো আসিনি।

আসেননি?

আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে বসব।

ঠিক আছে।

আচ্ছা, তুমি যখন এখানে থাক না তখন কি ঘরটায় চাবি দেওয়া থাকে ?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

কনি বলল, দুটো চাবি আছে ? একটা আমার কাছে থাকলে আমি যখন মন হবে এখানে এসে বসতে পারতাম।

আমি যতদূর জানি দুটো চাবি নেই।

কনির একটু দ্বিধাবোধ হচ্ছিল। তার মনে হলো লোকটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে। ঘরটা কি তার নিজের ?

আমরা কি আর একটা চাবি করিয়ে নিতে পারি না ?

কথাটা কনি শান্ত কণ্ঠে বললেও লোকটার মনে হলো সে কণ্ঠের মধ্যে নারী-সুলভ একটা জেদ লুকিয়ে আছে।

লোকটা রাগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আর একটা চাবি ?

কিছুটা লজ্জা পেয়ে কনি বলল, হ্যাঁ, আর একটা।

লোকটা বলল, ক্লিফোর্ড হয়ত জানতে পারে।

কনি বলল, হ্যাঁ, তার কাছে একটা থাকতে পারে। তা না হলে আমরা আর একটা চাবি করিয়ে নিতে পারি। মাত্র একদিনের ব্যাপার।

লোকটা বলল, কিন্তু ম্যাডাম, আমি জানি এ অঞ্চলে চাবি তৈরি করতে পারে এমন কোন লোক নেই।

কনি হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে। আমি দেখব পাওয়া যায় কি না !

ঠিক আছে ম্যাডাম।

তাদের দুজনের চোখ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো। লোকটার চোখে ছিল এক কুৎসিত বিতৃষ্ণা, ঘৃণা আর ঔদাসিন্যের ভাব। কনির চোখে ছিল এক তপ্ত ক্রোধের ভাব।

কনির চোখে যাই থাক তার অন্তরটা কেমন যেন জমে গেল। কনি লক্ষ্য করল কোন বিষয়ে সে লোকটার অমতে গেলেই তার চোখে মুখে কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে। কনি বুঝতে পারল লোকটা তাকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

কনি বলল, বিদায়। শুভ সন্ধ্যা।

বিদায়। শুভ সন্ধ্যা।

কনিকে কোনরকমে দায়সারা গোছের অভিবাদন জানিয়েই পিছন ফিরে চলে গেল লোকটা। সে বুঝতে পারল স্বৈরিণী স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েদের বিরুদ্ধে পোষণ করতে থাকা তার সেই পুরনো ক্রোধের ঘুমন্ত কুকুরটাকে জাগিয়ে তুলেছে কনি। অথচ সে জানে, সে অসহায় এ বিষয়ে।

এদিকে কনিও রেগে গেল লোকটার উপর। তার মনে হলো, লোকটা স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক। একটা সামান্য চাকর হয়ে এতটা দম্ভ দেখানো উচিত

নয়। মনে এক নিদারুণ ক্রোধের আবেগ নিয়ে বাড়ি ফিরল কনি।

কনি দেখল, বাড়ির বাইরে বড় বীচ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস বোল্টন। সে যেন তারই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোল্টন বলল, আমি ভাবছিলাম ম্যাডাম কখন আসবেন।

কনি বলল, আমার কি দেরি হয়ে গেছে?

মিসেস বোল্টন বলল, কেন, স্যার ক্লিফোর্ড চা খাবার জন্য বসে আছেন।

কেন, তুমি তৈরি করে দাও নি?

আমার মনে হয়, এটা আমার কাজ নয়। আমার মনে হয় উনি তা পছন্দ করবেন না।

কনি বলল, কেন করবেন না, তা আমি বুঝতে পারছি না।

কনি সোজা ক্লিফোর্ডের পড়ার ঘরে চলে গেল। দেখল ট্রের উপর পিতলের কেটলিটা বসানো রয়েছে।

কনি টেবিলের উপর হাতের ফুলগুলো রেখে চায়ের ট্রেটা ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কি খুব দেরি হয়ে গেছে ক্লিফোর্ড?

তার মাথার টুপীটা না খুলেই চা করতে শুরু করে দিল কনি। বলল, তুমি মিসেস বোল্টনকে চা করতে দাওনি কেন?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি চাই না, চায়ের টেবিলেও সে সভাপতিত্ব করুক।

চা করতে করতে কনি বলল, চায়ের রূপোর পাত্রটা এমন পবিত্র একটা কিছু নয়।

কনির মুখপানে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ক্লিফোর্ড বলল, সারা বিকালটা কি করো তুমি?

কনি বলল, বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই বিরাট জাম গাছটায় এখনো জাম ধরে আছে জান কি?

কনি স্কার্টটা খুলে রাখল। কিন্তু টুপীটা খুলল না। টোস্টে মাখন লাগাতে হবে। কনি হঠাৎ উঠে এক গ্লাস জল এনে ভায়োলেট ফুলগুলোকে রেখে দিল তাতে।

কনি বলল, ফুলগুলো আবার বেঁচে উঠবে।

এই বলে ফুলসমেত গ্লাসটা ক্লিফোর্ডের সামনে রেখে দিল যাতে সে ফুলগুলোর গন্ধ উপভোগ করতে পারে।

ক্লিফোর্ড বলল, জুনোর চোখের পাতার থেকে আরো সুন্দর।

কনি বলল, আমি ত আসল ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে এ কথার অর্থের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাই না।

কনি ক্লিফোর্ডের চা ঢেলে দিল।

কনি বলল, আচ্ছা জনের ঝর্ণার কাছে যে কুঁড়েটায় শিকারী পাখিগুলোকে পোষা হয় সেটার আর একটা চাবি আছে?

ক্লিফোর্ড বলল, থাকতে পারে। কিন্তু কেন?

কনি বলল, জায়গাটা আজই খুঁজে পেলাম। এর আগে কখনো যাইনি। জায়গাটা কিন্তু চমৎকার। আমি ওখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতে পারি। তাই নয় কি?

মেলর্স ওখানে ছিল?

হ্যাঁ, তার হাতুরীর শব্দ শুনেই ত ওখানে গিয়ে পড়ি আমি। ওখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ায় ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। আমি ওকে দ্বিতীয় একটা চাবি চাওয়ায় ও আমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে।

ও কি বলে?

না, এমন কিছু না। ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় শুধু বলে ও চাবির বিষয়ে কিছুই জানে না।

একটা চাবি হয়ত বাবার পড়ার ঘরে আছে। বেটারা জানে তা। আমি দেখছি ব্যাপারটা তাকে ডেকে।

না না, থাক।

তাহলে মেলর্স এরকম অভদ্র আচরণ করে?

এমন কিছু না। তবে আমার মনে হতো, ও চায় না যে আমি ঐ ঘরটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করি।

আমার মনে হয় ঠিক তা নয়।

তবু আমি বুঝতে পারি না কেন সে এবিষয়ে কিছু মনে করবে। এটা তার বাড়ি নয়। ব্যক্তিগত বাসভবন নয়। বুঝতে পারি না কেন আমি আমার ইচ্ছা হলে সে ঘরে বসতে পাব না।

ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ নিশ্চয় পাবে। লোকটা ভাবে ও খুব বেশী বোঝে। হ্যাঁ ঐ লোকটা।

তুমি কি তাই মনে করো?

নিশ্চয়। ও ভাবে ও অসাধারণ একটা কিছু। তুমি শুনেছ ওর একটা স্ত্রী ছিল যার সঙ্গে ওর বনিবনাও হয়নি। তাই ও যুদ্ধে যোগদান করে। ওকে ভারতে পাঠানো হয়। আমার মনে হয় মিশরে যুদ্ধ চলাকালীন অশ্বারোহী বিভাগে কামারের কাজ করে। ওর কাজ ছিল যত সব ঘোড়া নিয়ে। তাই ও খুব চালাকচতুর হয়ে ওঠে। তারপর ভারতের কোন এক কর্ণেলের চোখে পড়ে যায় ও। সেই কর্ণেল ওকে পরে লেফট্‌ন্যান্ট করে তোলে। কর্তৃপক্ষ আবার ওকে ভারতে পাঠায়। আমার মনে হয় ওর কর্ণেলের সঙ্গে আবার ভারতে ফিরে যায়। ওরা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও একটা বৃত্তি পায় আজো। কিন্তু ওর মত লোকের পক্ষে আবার তার সেই পুরনো জীবনযাত্রার স্তরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অসংগতি দেখা দিতে বাধ্য। তবে আমার সব কাজ ও ঠিকমত করে যায়। ও কর্তব্যপরায়ণ। তবে

আমি ওর মধ্যে লেফটন্যান্ট জাতীয় মনোভাব আশা করতে পারি না।

ও যখন এখনো দেহাতী ভাষায় কথা বলে তখন ওকে কি করে লেফটন্যান্টের পদ দান করল?

আসলে ও কাজই করত না। করতো কখনো কেমনে। ও নিজের দেহাতী কথা ভালই বলতে পারে। তবে আমার মনে হয় যে আবার ওর শ্রেণীগত জীবনযাত্রার মাঝখানে ফিরে এসেছে।

কনি বলল, ওর কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

এসব রোমান্সের ব্যাপারে আমার কোন ধৈর্য নেই। কোন আগ্রহ নেই। এসব সত্যিই এক দুঃখজনক ঘটনা এবং প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে।

কনিও এ বিষয়ে একমত হলো। যারা সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট এবং কারো সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তাদের মধ্যে কোন ভাল গুণ থাকতে পারে না।

এরপর আবহাওয়া ভাল থাকলে ক্লিফোর্ডও এক একদিন বনের মাঝে সেই কুঁড়েটা দিয়ে বেড়াতে যেতে লাগল। সেদিন আবহাওয়াটা ভাল দেখে ক্লিফোর্ড বেড়াতে গেল সেখানে কনিকে নিয়ে। বাতাসটা ঠাণ্ডা থাকলেও খুব একটা খারাপ লাগছিল না। সূর্যের আলোয় ছিল এক মধুর উত্তাপ।

কনি একসময় বলল, দিনটা কেমন উজ্জ্বল, বাতাসটা কত চমৎকার। কিন্তু কত মানুষ তার বিদ্বেষের বিষ দিয়ে ভারী করে তুলছে এই বাতাসটাকে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তা কি মনে করো?

হ্যাঁ কনি। মানুষের অকারণ অসন্তোষ, বিতৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণার বিষ এই বাতাসের আনন্দোচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্যটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাকে হত্যা করছে।

ক্লিফোর্ড বলল, হয়ত আবহাওয়ার কোন প্রতিকূল অবস্থা মানুষের প্রাণপ্রাচুর্যটাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

কনি জোর দিয়ে বলল, না, মানুষই পৃথিবীটাকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তার নিজের মাথাটাকে নিজেই কলুষিত করে দিচ্ছে।

ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা এগিয়ে চলল। কনি দেখতে লাগল পথের ধারে আগের মতই কত বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আছে। কয়েকটা ফুল তুলে এনে ক্লিফোর্ডকে দিল কনি। একটা ফুল থেকে আপেলের কুঁড়ির গন্ধ আসছিল।

ক্লিফোর্ড ফুলগুলো নিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল। তারপর আপনমনে বলল, শান্তির আর নীরবতার অধর্ষিতা অক্ষতযৌবনা কন্যা।

কনি বলল, অধর্ষিতা কথাটা কেন? একমাত্র মানুষই ধর্ষণ করে।

ক্লিফোর্ড বলল, মানুষ করে, না শামুকে করে তা আমি জানি না।

কনি বলল, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব ধর্ষণ করে না।

ক্লিফোর্ডের উপর রাগ হলো কনির। তার একটা বড় দোষ। যে কোন বস্তু বা ঘটনাকে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে শুধু কথার জাল বুনবে। শুধু কথা আর

কথা। কোন ফুল জুনোর চোখের পাতা, কোন ফুল শান্তির অধর্ষিতা কন্যা। কথাকে ঘৃণা করে কনি। তার মনে হয় এই কথাই আজ সব সময় মানুষ আর জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব সুখের অন্তরায় হচ্ছে। তার নিজের জীবনের সামনেই এই কথার অন্তরায়। অর্থহীন কথার অচলায়তন। যদি কেউ ধর্ষণ করে ত তা হলো এই কথা। এই কথার অবাঞ্ছিত অচলায়তনই মানুষের জীবনকে ধর্ষণ করে তার সব প্রাণরস শোষণ করে নিচ্ছে।

কিন্তু কনির সঙ্গে ক্লিফোর্ডের এই বেড়ানোর ব্যাপারটা খুব একটা শান্তিপূর্ণ হত না। ওরা স্বীকার করতে না চাইলেও ওদের দুজনের মাঝখানে এক অঘোষিত মানসিক দ্বন্দ্বের অদৃশ্য অথচ অস্বস্তিকর প্রাচীর ধীরে ধীরে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা ওরা নিজেরাই জানে না। তার গূঢ় এষণা আর নারীসুলভ প্রবৃত্তির সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্লিফোর্ডকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল কনি। ক্লিফোর্ডের চিন্তা চেতনা, কথাবার্তা, তার উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল সে। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল তার কথা। তার কথা শুনতে আর মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

ভাল আবহাওয়াটা আবার খারাপ হয়ে উঠল। বৃষ্টি নামল। তবু একদিন বৃষ্টির মধ্যেই বেড়িয়ে পড়ল কনি। একমনে বনের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটে যেতে লাগল।

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডাটা সেদিন খুব একটা বেশী ছিল না। কনির মনে হলো, বৃষ্টিস্নাত এই বনভূমির নির্জনতা যেন আরো বেড়ে গেছে। মেঘচ্ছায়ামণ্ডিত এই গোধূলিবেলায় বাইরের জগৎ থেকে এ বনভূমির দূরত্বটা সহসা যেন অনেক বেড়ে গেছে।

কনি সেই কুঁড়েটার সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে থামল। ঘরটা তালা দেওয়া আছে। তবু সে দরজার কাছে একটা কাঠের উপরে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। বাতাসের মধ্যে কোন বেগ ছিল না। তবু গাছের উপরকার ডালগুলো কাঁপছিল। জায়গাটার নিচেটা পরিষ্কার। বিশেষ কোন আগাছা নেই। চারদিকে শুধু বড় বড় ওক গাছ। গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়িগুলো বৃষ্টির জলে কালো দেখাচ্ছিল। কনির মনে হলো জগতের মধ্যে এই জায়গাটাই একমাত্র অধর্ষিত। অবিচ্ছিন্ন নীরবতায় চিরস্তব্ধ। কিন্তু পরক্ষণেই কথাটা মনঃপূত হলো না তার। তার মনে হলো সারা জগৎটাই ধর্ষিত। এ জগতের মধ্যে সত্যিকারের অধর্ষিত জায়গা বলে কিছু নেই।

কনি ভাবল, কতকগুলো জিনিস আছে যা ধর্ষণ করা যায় না। যেমন সার্ডিন মাছের টিন। যেমন কোন কোন মেয়ে। কিন্তু পৃথিবী···।

বৃষ্টিটা কমে আসছিল। বৃষ্টির জন্য ওক গাছের ছায়াগুলো খুব বেশী ঘন দেখাচ্ছিল। কনি এবার উঠে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। শীত লাগছিল গায়ে। তবু অনির্দেশ্য অব্যক্ত এক চাপা ক্রোধের আতিশয্য

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত তাকে সেইখানে অবশ জড় পদার্থে পরিণত করে বসিয়ে রাখল।

নিজের মনে মনে বলতে লাগল কনি। ধর্ষিত! অনেক সময় কেউ কারো দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়েও ধর্ষিত হতে পারে। সে নিজে যেমন কতকগুলো মৃত কথা, মৃত চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে। বিপন্ন ও বিব্রত হচ্ছে ধর্ষিতা নারীর মত।

বাদামী রঙের একটা ভিজে কুকুর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো। লেজটা তুলে সে নাড়তে লাগল। কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাও এসে হাজির হলো। তার পরনে ছিল কালো চামড়ার একটা জ্যাকেট। কনির মনে হলো তাকে দেখেই কিছুটা দমে গেল লোকটা। কনি উঠে দাঁড়াল। লোকটা কোন কথা না বলে অভিবাদন জানাল কনিকে। কনির দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই কনি সরে গেল। বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

কনির দিকে না তাকিয়ে লোকটা বলল, আপনি কি ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন?

কনি বলল, না, আমি শুধু একটু বসেছিলাম ছাদের তলাটায়। বিশেষ আত্মমর্যাদার সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথাটা বলল কনি।

লোকটা কনির পানে তাকাল। কনিকে কেমন ঔদাসিন্যে শীতল দেখাল। লোকটা বলল, ক্লিফোর্ডের কাছে আর চাবি নেই?

কনি বলল, না নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি ঘরের বাইরে ছাঁচের তলায় এই জায়গাটুকুতে বসেই কিছুক্ষণ কাটাতে পারি। আচ্ছা বিদায়।

লোকটার দেহাতী আঞ্চলিক ভাষার কথাবার্তা।

কনি পিছন ফিরে চলে যাবার জন্য উদ্যত হতেই লোকটা তার জ্যাকেটের পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবি বার করে বলল, আপনি চাবিটা নিয়ে যান। আমি বরং পাখিগুলোকে নিয়ে অন্য কোন একটা জায়গায় যাব।

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?

লোকটা বলল, আমি বলতে চাইছি, আমি এই পাখিগুলোকে অন্য কোথাও লালন পালন করব। আপনি চাবিটা নিয়ে যান। আপনাকে তাহলে আর অপেক্ষা করতে হবে না বাইরে বসে।

তার আঞ্চলিক ভাষার অস্পষ্টতা থেকে একটা মানে খুঁজে বার করল কনি। তারপর বলল, তুমি সাধারণ ইংরাজি ভাষায় কথা বল না কেন?

লোকটা বলল, আমার সে সাধারণ ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না।

রাগের চাপে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল কনি।

লোকটা বলল, যদি দরকার হয় তাহলে চাবিটা নিতে পারেন। আর যদি বলেন ত ঘরের সব জিনিসগুলো সরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে পারি।

কনি আরও রেগে গেল। বলল, আমি তোমার চাবি চাই না। আমি

তোমাকে ঘরের জিনিসপত্র সরাতেও বলছি না। আমি তোমাকে ঘর থেকে সরে যেতেও বলছি না। আমি আজকের মত বাইরেই বসতে পারি। ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে হবে না।

লোকটা তার নীল চোখের কুটিল দৃষ্টি দিয়ে তাকাল কনির পানে। বলল, কেন ম্যাডাম, আপনি এ কুঁড়েতে আসবেন। খৃস্টোৎসবের মতই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। সারা শীতকাল ধরে পাখিগুলোকে লালন পালন করে যেতে হয়। বসন্ত এলেও ওগুলোকে কাজে নামাতে হয়। আপনি যখন এখানে থাকেন তখন ম্যাডাম নিশ্চয়ই চান না আমি আপনার কাছে ঘুরঘুর করি।

এক অস্পষ্ট ও তরল বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটার পানে তাকিয়ে রইল কনি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার কাছে থাকলে কেন আমি কিছু মনে করব?

লোকটা আবার অদ্ভুতভাবে তাকাল কনির দিকে। বলল, এটা আমার খারাপ লাগে।

কনি কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তবে এটা যেন তুমি মনে করো না যে তুমি এখানে পাখিদের কাজ করলে আমি কিছু মনে করব। আমি বসে বসে তা দেখি। দেখতে বরং ভালই লাগে। তবে তোমার যখন ভাল লাগে না তখন আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই। মনে রেখো, তুমি ক্লিফোর্ডের কর্মচারী, আমার নও।

কথাটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগল কনির। কেন সে এ কথা বলল তা বলতে পারবে না। তবু তার মুখ থেকে এমনি বেরিয়ে গেল।

লোকটা বলল, না ম্যাডাম। এটা আপনার নিজস্ব ঘর মনে করবেন। যখন খুশি আসবেন। আপনি এক সপ্তার নোটিশেই আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন। শুধু…

কনি বলল, কি শুধু?

লোকটা বলল, শুধু বলতে চাই যে আপনি যখন এখানে থাকবেন তখন আমি এখানে থেকে গোলমাল করে আপনার শান্তি নষ্ট করি এটা ঠিক নয়।

কনি রেগে গিয়ে বলল, কিন্তু কেন? তুমি কি একজন সভ্য মানুষ নও? কেন তোমাকে আমি ভয় করব? তুমি এখানে থাকলেই যে তোমাকে দেখতে হবে তার মানে কি?

লোকটা এবার তার মুখে চতুর হাসি ফুটিয়ে কনির পানে তাকাল। বলল, না, ঠিক তা বলছি না ম্যাডাম।

তবে কি? কনি জিজ্ঞাসা করল।

একটা চাবি দেব কি আপনাকে?

না, ধন্যবাদ। তার আর দরকার হবে না।

আমি যেমন করে হোক আর একটা চাবি করিয়ে রাখব। কখন কি দরকার হয় তার ঠিক নেই।

কনি রাগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি মনে করি তুমি বড় দুর্বিনীত। কথা শোন না।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না না, ওকথা বলবেন না। তা আমি বলতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম আপনি থাকলে বা এখানে এলে আমাকে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তার ফলে আমার কাজকর্ম অনেক বেড়ে যাবে। আমার কাজকর্ম ছাড়াও ওদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু আপনি ওসব কিছু যদি লক্ষ্য না করেন, আমি কি কাজ করছি না করছি যদি তা লক্ষ্য না করেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার যখন যা ইচ্ছা যায় তাই করবেন।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে চলে গেল কনি। সে রেগে গেছে না অপমানিত বোধ করছে লোকটার ব্যবহারে তা সে নিজেই বুঝতে পারল না ভাল করে। হয়ত লোকটা যা বলছে তাই সত্যি। সে ভেবেছিল কনি এটা চায় না সে তার কাছে বসে কাজ করুক। কনি একথা যে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তা তার জ্ঞান নেই। সে আরও ভেবেছিল সে এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যার দিকে কনি বসে থাকতে থাকতে প্রায়ই তাকাবে। ভেবেছিল তার মত একটা বোকা লোকের উপস্থিতিরও কোন দাম আছে কনির কাছে, অনেক দাম আছে?

ভাবতে ভাবেত বাড়ি ফিরে এল কনি। অথচ সে বুঝতে পারল না, কি সে ভাবছে। আসলে কি সে অনুভব করছে।

অধ্যায় ৯

ক্লিফোর্ডের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান বিরাগ দেখে নিজেই আশ্চয হয়ে গেল কনি। তার আরও মনে হলো, সে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি ক্লিফোর্ডকে। তবে অবশ্য ঘৃণাও করেনি। আসলে তার প্রতি তার সম্পর্কে ঘৃণা বা ভালবাসার কোন আবেগই ছিল না। দেহের দিক থেকে কোনদিনই তাকে পছন্দ করেনি কনি। তার মনে হলো, দেহের দিক থেকে ক্লিফোর্ডকে সে কোনদিন পছন্দ করতে পারেনি বলেই তাকে সে বিয়ে করেছে। সে তাকে বিয়ে করেছে এই কারণে যে মনের দিক থেকে তার একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিল সে। তার নারীসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। আসলে তাকে দেখে তার মনে হয়েছিল সে যেন তার শিক্ষাগুরু। তার থেকে বড়।

এখন যেহেতু সেই মানসিক উত্তেজনাটা আর নেই কনির মধ্যে, ক্লিফোর্ডের

প্রতি তার দেহগত বিতৃষ্ণাটাই প্রকট হয়ে উঠল তার মনে। এ বিরাগ এ বিতৃষ্ণা তার অস্তিত্বের গভীর হতে উৎসারিত হচ্ছে এবং সে বুঝল এটা তার জীবনটাকে ভিতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাক করে ফেলছে।

একই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে একটা নিদারুণ দুর্বলতা আর নিঃসঙ্গতা অনুভব করল কনি। তার প্রায়ই ইচ্ছা জাগছিল মনে, বাইরে থেকে কোন একটা সাহায্য এসে অকস্মাৎ উদ্ধার করে ফেলুক তাকে। কিন্তু সারা জগতের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা সাহায্য নেই। সমস্ত সমাজটা ভয়ঙ্কর, কারণ সে সমাজের সব মানুষই অপ্রকৃতিস্থ। সভ্য সমাজ মাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। টাকা আর তথাকথিত ভালবাসা হচ্ছে তার দুটো বাতিক এবং তার মধ্যে বাতিক হিসাবে টাকাটাই প্রধান। ছিন্নভিন্ন এক অপ্রকৃতিস্থ চেতনার বশবর্তী হয়ে মানুষ এই দুটো জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে নিজেকে। টাকা আর ভালবাসা। মাইকেলিসের কথাটাই একবার ভাব : তার গোটা জীবন আর সমস্ত কাজকর্মই এক মানসিক অপ্রকৃতিস্থতায় ভরা। তার ভালবাসার আসল প্রকৃতিটাই হলো ঠিক তাই।

আর ক্লিফোর্ডও ঠিক তাই। তার সমস্ত কথাবার্তা, সমস্ত লেখা, যশ মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য তার উন্মাদসুলভ সংগ্রাম—এই সব কিছুই তার অপ্রকৃতিস্থ মনোভাবের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।. আর এগুলো ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এগুলো সব একে একে বাতিকে পরিণত হচ্ছে।

কনির মনে হলো তার মধ্যে নিঃসঙ্গতার একটা অব্যক্ত বেদনা থাকতে পারে, কিন্তু কোন ভয় নয়। সব নদী পার হয়ে এক নিরাপদ কূলে উঠে এসেছে ও। এদিকে ক্লিফোর্ড তার আসক্তিটা কনির উপর থেকে তুলে নিয়ে তা মিসেস বোল্টনের উপর স্থাপন করেছে। কিন্তু ক্লিফোর্ড নিজেই তা বুঝতে পারেনি। অনেক অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতই তার অপ্রকৃতিস্থতার মূল কারণটা তার চেতনায় ধরা পড়ে না।

কতকগুলো বিষয়ে মিসেস বোল্টনের সত্যিই প্রশংসনীয় গুণ ছিল। কিন্তু তার আবার অদ্ভুত ধরনের এক খবরদারির ভাবও ছিল। সব বিষয়ে নিজের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশিকে অপরের উপর চাপিয়ে দেবার এই প্রবণতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অশান্ত আবেগ আজকাল অনেক আধুনিক নারীর মধ্যেই অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। মিসেস বোল্টন ভাবল, সে অপরের অধীনে থেকে অপরের ভালর জন্যই সব কাজ করে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডকে তার ভাল লাগে, কারণ তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগটা তার থেকে আরো সূক্ষ্ম। তার প্রবৃত্তিটা আরো মার্জিত। তাই ক্লিফোর্ডের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো প্রায়ই হার মেনে যায়। ক্লিফোর্ডকে এই জন্যই ভাল লাগে তার।

হয়ত এই জন্যই কনিরও ভাল লেগেছিল ক্লিফোর্ডকে।

কোনদিন হয়ত মিসেস বোল্টন স্নেহশীল কণ্ঠে বলল, দিনটা কী চমৎকার। আমার মনে হয় এখন চেয়ারে করে আপনি একটু বেড়িয়ে আসুন। সূর্যের আলোটা আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ক্লিফোর্ড তখন বলল, হ্যাঁ। আমাকে সেই বইটা একটু দেবেন? সেই হলুদ রঙের বইটা? আমার মনে হয় সেই ফুলগুলো ওঘর থেকে বার করে আনলে ভাল হয়।

তখন বোল্টন বলল, ফুলগুলো সত্যিই বড় সুন্দর। গন্ধটাও বড় চমৎকার। 'সুন্দর' কথাটার উপর জোর দিয়ে বলল।

ক্লিফোর্ড বলল, গন্ধটা আমি পছন্দ করি না। এর মাঝে কেমন একটা মরা মরা ভাব।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি তাই মনে করেন?

ক্লিফোর্ডের কথায় মনে মনে একটুখানি রুষ্ট হলেও গন্ধের প্রতি তার এই দার্শনিকসুলভ এক মহত্তর বিরাগ দেখে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গেল মিসেস বোল্টন। সে তখন নীরবে ফুলগুলো পাশের ঘর থেকে বার করে আনল।

মিসেস বোল্টন এর পর জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে এখন কামিয়ে দেব না, আপনি নিজেই কামাবেন?

সব সময়েই বোল্টনের কণ্ঠে থাকে একই রকমের সুর। তার কণ্ঠটা সব সময় একইভাবে থাকে মেদুর, স্নেহশীল আর আত্মপ্রতিষ্ঠাসূচক।

ক্লিফোর্ড তার উত্তরে বলল, ঠিক এখনি এটা ভাবছি না। আপনি একটু অপেক্ষা করবেন? আমি আপনাকে ডাকব তৈরি হয়ে।

মিসেস বোল্টন উত্তরে বলল, ঠিক আছে স্যার ক্লিফোর্ড।

কথাটা নরম আর আত্মসমর্পণের সুরে বললেও তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তার দুর্মর ইচ্ছাশক্তির এক প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা।

ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো।

তখন ক্লিফোর্ড বলল, আজ আমাকে আপনিই দাড়িটা কামিয়ে দিন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং সে কণ্ঠটাকে আরো বেশী মেদুর করে বলল, খুব ভাল কথা স্যার ক্লিফোর্ড।

প্রথম প্রথম তার দাড়ি কামানোর সময় মিসেস বোল্টনের নরম হাতের আঙ্গুলগুলো অনেকক্ষণ ধরে ছুঁয়ে থাকত তার গালটাকে তখন খারাপ লাগত, রাগ হত ক্লিফোর্ডের। কিন্তু এখন ভাল লাগে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা জারজ লালসাও জাগে। প্রায় প্রতিদিনই মিসেস বোল্টনের হাতে দাড়ি কামাত ক্লিফোর্ড। মিসেস বোল্টনের মুখটা তার মুখের অনেক কাছে চলে আসত, তার একাগ্র দৃষ্টি নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত হত তার গালের উপর তার আঙ্গুলগুলো ক্লিফোর্ডের সারা মুখমণ্ডলের প্রতিটি অংশ নির্ভুলভাবে চিনে ফেলেছিল। শুধু ক্লিফোর্ড নয়, মিসেস বোল্টনেরও একাজ করতে ভাল লাগত।

ক্লিফোর্ডের মুখ, তার গণ্ড ও গলদেশ দেখতে সুন্দর। তার খাওয়া দাওয়া ভাল, সে ভদ্র ও অভিজাত বংশীয়। তার গাত্রত্বক সুন্দর ও মসৃণ।

মিসেস বোল্টনও দেখতে বেশই সুন্দরী। তার মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের ও ম্লান মনে হলেও তা বেশ শান্ত এবং শুদ্ধ। তার চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল এবং সপ্রতিভ। ধীরে ধীরে তার মোলায়েম আচরণের অন্তহীন মেদুরতা দিয়ে ক্লিফোর্ডের ঘাড় ধরে তাকে কাছে যেন টেনে আনছিল মিসেস বোল্টন আর ক্লিফোর্ডও এক নীরব আত্মসমর্পণে ঢলে পড়ছিল তার মাঝে।

মিসেস বোল্টন এখন ক্লিফোর্ডের খুঁটিনাটি সব কাজই করে। আর তার এই সব কাজে তার সেবা গ্রহণে আগের মত আর কোন লজ্জা অনুভব করত না ক্লিফোর্ড। এখন সে মিসেস বোল্টনের কাছে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। কনির কাছে সে যতটা সহজ হতে না পারে মিসেস বোল্টনের কাছে তার চেয়ে বেশী সহজ হতে পারে। মিসেস বোল্টনও ক্লিফোর্ডের দেহটা যত বেশী সম্ভব ধরা ছোঁয়া করতে ভালবাসে। তাই তার সব কাজ সে করে দিতে চায়। করে দেবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। মিসেস বোল্টন একদিন কনিকে বলল, আসলে সব পুরুষই একদিক দিয়ে শিশু। আমি এর আগে তেভারশালের বহু কড়া লোকের সেবা করেছি। আসলে তারা সবাই বড় শিশু। আসলে সব পুরুষ মানুষই এক।

মিসেস বোল্টন প্রথমে ভেবেছিল ক্লিফোর্ডের মত ভদ্রলোকরা সাধারণ পুরুষদের থেকে পৃথক। কিছু একটা পার্থক্য তাদের মধ্যে আছে। প্রথম প্রথম তার এই ধারণাটা সত্য বলেই মনে হয়। সে তাই তাকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করে চলত। একটা ব্যবধান রেখে চলত মাঝখানে। কিন্তু যতই তার গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, তার তলদেশে নামতে লাগল ততই সে দেখল আসলে সে আর পাঁচজন পুরুষের মতই একটা শিশু। তবে তার মনটা একটু সংযত। তাছাড়া অন্যান্য পুরুষের মত ক্লিফোর্ডও নারীমন জয় করার মত এমন কতকগুলো ছলাকলা জানে যা সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন এবং যা দিয়ে সে তাকে পীড়িত করছে মনে মনে।

মাঝে মাঝে ক্লিফোর্ডকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছিল কনির। কথাটা বলার একটা লোভ জাগছিল মাঝে মাঝে। বলতে ইচ্ছা করছিল, দয়া করে ঈশ্বরের খাতিরে ঐ মেয়েটার মধ্যে এমন ভয়ঙ্করভাবে এমন শোচনীয়ভাবে ডুবে যেও না। এমন করে নিজেকে ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল কনি, একথা বলার এখন আর কোন অর্থই হয় না। কারণ ক্লিফোর্ডের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহই অনুভব করে না। এত কিছু সত্ত্বেও সন্ধ্যেবেলাটা কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে একসঙ্গে কাটাত। রাত্রি দশটা পর্যন্ত থাকত সন্ধ্যে থেকে। তারপর তারা হয় কথা বলত দুজনে, অথবা বই পড়ত। অথবা ক্লিফোর্ডের পাণ্ডুলিপিটা ঘাঁটাঘাঁটি করত। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিটা দেখে বা পড়ে আর কোন আনন্দের

উত্তেজনা অনুভব করে না। তবু সে কর্তব্যের খাতিরে ক্লিফোর্ডের লেখাগুলো টাইপ করে দেয়। কিন্তু যথা সময়ে মিসেস বোল্টন সে কাজটা করে দেবে।

কনি একদিন মিসেস বোল্টনকে বলল যে তাকে টাইপ করার কাজটা শিখে নিতে হবে। মিসেস বোল্টনও সঙ্গে সঙ্গে তা বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে তা শিখতে শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে ক্লিফোর্ড তাকে একটা চিঠি টাইপ করতে দেয়। শক্ত কথাগুলোর বানান বলে দেয়। মিসেস বোল্টনের টাইপ করতে দেরি হয় বলে ক্লিফোর্ড ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে ফরাসী শব্দগুচ্ছ থাকলে তারও বানান বলে দেয়। মিসেস বোল্টনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। এই লেখার নির্দেশ দানের ব্যাপারে ক্লিফোর্ডও বেশ আনন্দ অনুভব করে।

আজকাল খাওয়ার পর ক্লিফোর্ডের ঘরে যায় না কনি। প্রায়ই মাথা ধরার অজুহাত দেখায়। ক্লিফোর্ডকে বলে, এখন মিসেস বোল্টন হয়ত পিকেত খেলবে তোমার সঙ্গে।

ক্লিফোর্ড বলে, ঠিক আছে প্রিয়তমা, আমি বেশ থাকব। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পার।

কনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস বোল্টনকে ডাকে। তারপর তাস বা দাবা খেলতে বলে তার সঙ্গে। সে তাকে এই সব খেলা শিখিয়েছে। কনি যখন দেখে মিসেস বোল্টন অল্প বয়সী তরুণীর মত এক মদির লজ্জায় রাঙা হয়ে বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে তাদের রাণী বা সাহেবের উপর কুণ্ঠিত আঙুল দিয়ে আবার সরিয়ে নেয়, তখন তার কাছে সেটা খুবই আপত্তিকর মনে হয়। এদিকে ক্লিফোর্ড তখন মৃদু হেসে কিছুটা বিদ্রূপাত্মক প্রভুত্বের ভঙ্গিতে বলে, বল 'যাহবে।'

মিসেস বোল্টন উজ্জ্বল চোখ তুলে ক্লিফোর্ডের পানে লজ্জানত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একান্ত বশংবদের মত বলে, 'যাহবে'।

ক্লিফোর্ড তাকে সত্যিই সব কিছু শেখাচ্ছে। এসব শেখাতে ভাল লাগে ক্লিফোর্ডের। এতে তার প্রভুত্ববোধ তৃপ্ত হয় তির্যকভাবে। মিসেস বোল্টনেরও গাটা পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। একে একে সে সেই সব জিনিস শিখে নিচ্ছে যা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জানে। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যে জীবন যাপন করে, যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের সব রীতিনীতি, আদব কায়দা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর সব খুঁটিনাটি শিখতে গিয়ে রোমাঞ্চ জাগে তার। তার মনে হয় একমাত্র টাকা আর ধনসম্পত্তি ছাড়া অভিজাত সমাজের সব ঐশ্বর্য পেয়ে গেছে। এটা ভাবতে মিসেস বোল্টনের সত্যিই রোমাঞ্চ জাগে যে এক সূক্ষ্মগভীর তোষামোদের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ক্রমশই প্রিয় করে তুলছে, তার উপস্থিতিকে অত্যাবশ্যক করে তুলছে তার কাছে।

কনির কাছে ক্লিফোর্ডের যথার্থ স্বরূপটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরকার খোলস বা ছদ্ম আবরণটা সরিয়ে নিয়ে তার সামনে যথার্থ স্বরূপে বেরিয়ে আসে ক্লিফোর্ড। তার মনে হয় ক্লিফোর্ড আর পাঁচজন পুরুষের মতই সাধারণ, কুৎসিত কুরুচিসম্পন্ন, নিস্তেজ এবং স্থূল। সঙ্গে সঙ্গে আই ভি বোল্টনের ছলাকলা আর খবরদারি মনোভাবটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। ক্লিফোর্ডের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে মিসেস বোল্টনের মধ্যে তা দেখে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়ে যায়। মিসেস বোল্টন ক্লিফোর্ডের প্রেমে পড়ে গেছে একথা বলা হয়ত ঠিক হবে না। ক্লিফোর্ড একজন উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোক; সে গল্প কবিতা লিখতে পারে, তার ছবি ছাপা হয় পত্র পত্রিকায়। এই ধরনের একজন লোকের সংস্পর্শে আসার জন্য এক বিরল পুলকের রোমাঞ্চ জাগে মিসেস বোল্টনের মধ্যে আর সেই রোমাঞ্চ তার চোখে মুখে ও সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে। ক্লিফোর্ড যখন তাকে কোন বিষয়ে কিছু শেখায় তখন অজানা অব্যক্ত এক আবেগের এমন এক উত্তেজনা অনুভব করে বোল্টন যা তা প্রেমের উত্তেজনার থেকে অনেক গভীর। তাছাড়া ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কোন ভালবাসাবাসির ব্যাপার সম্ভব নয়, এই ভেবে তার পুলকের আবেগ আর জানার আকাঙ্ক্ষাটা বেড়ে যায়।

আমরা প্রেম বলতে যাই বুঝি না কেন, মিসেস বোল্টন নামে মহিলাটি যে ক্লিফোর্ডকে কিছুটা ভালবাসতে শুরু করেছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। মিসেস বোল্টনকে এখনো বেশ সুন্দরী বলেই মনে হয়। বয়স অনুপাতে তাকে কম বয়সী এবং যুবতী বলে মনে হয়। তার ধূসর চোখগুলো সুন্দর দেখায়। এক সূক্ষ্ম জয়ের গর্বের সঙ্গে মেদুর তৃপ্তির একটা বিরল আনন্দ প্রতিনিয়ত এক শিহরণ জাগায় যেন তার সর্বাঙ্গে।

এদিকে ক্লিফোর্ডও এই মহিলাটির কাছে ধরা দিয়ে ফেলেছে নিজেকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার স্বভাবসুলভ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে তাকে শ্রদ্ধা করে যায়, তার সেবায় সঁপে দেয় নিজেকে। ক্লিফোর্ড তাকে দিয়ে যা খুশি করতে পারে, খুশিমত তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। ক্লিফোর্ডও এতে আনন্দ পায়।

আইভি বোল্টন আর ক্লিফোর্ড যখন এক দীর্ঘ আলোচনায় মেতে উঠত তখন সে আলোচনা খেয়াল করে শুনত কনি। সে আলোচনায় বোল্টনের কথাই বেশী শোনা যেত। সে বলত তেভারশাল গাঁয়ের কথা। একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না বোল্টন। সে যেন কোন লেখিকার মত অনর্গল মানবচরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞানের কথা সব বলে যাচ্ছে কারো অনুলিখনের জন্য। তার কথা শুনে মনে হত তেভারশালের যত সব নোংরা লোকের কথা তার মুখ থেকে এইভাবে শোনাটা অপমানজনক। প্রথম প্রথম তেভারশালের কথা বলতে সাহস পেত না মিসেস বোল্টন। কিন্তু একবার শুরু করার পর থেকেই

তা আর থামতে চাইছে না। ক্লিফোর্ড এই সব কথা থেকে তার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করে। প্রচুর পরিমাণে সে উপাদান পেয়েও যায়। কনি এখন বেশ বুঝতে পারে ক্লিফোর্ডের যা কিছু প্রতিভা তা শুধু ব্যক্তিগত কথাবার্তাগুলোকে প্রাঞ্জলভাবে লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার প্রতিভা হলো আপাতনৈর্বক্তিক এক কৃত্রিম চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মিসেস বোল্টন কিন্তু তেভারশালের এই সব কথা বলতে বলতে আবেগের তাড়নায় আর থামতেই চায় না। যে সব কাহিনী বাস্তবে একদিন ঘটে গেছে, সে সব কাহিনীর সব কিছু সে জানে। সে কথা বলতে বলতে সে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করে। তার সব কথা ও কাহিনী ঠিকমত লিখলে হয়ত ডজনখানেক মোটা মোটা বই লেখা হবে।

কনিও তার কথা শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরে কিছুটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। ভাবে এমন উন্মাদসুলভ এক কৌতূহলের সঙ্গে একথা শোনা তার উচিত হয়নি। তবে অবশ্য যে কেউ অন্য সব মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা, তাদের সংগ্রামের কথা একটা শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে শুনতে পারে। এমন কি বিদ্রূপ বা হাস্যরসাত্মক কাহিনীর মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি থাকে। এইখানে উপন্যাসের এক বিরাট সার্থকতা অনুভব করা যায়। ঠিকমত লিখতে পারলে কোন উপন্যাস আমাদের সহানুভূতিশীল সংবেদনশীল চেতনার প্রবাহকে যথাস্থানে চালিত করে নিয়ে যেতে পারে। মৃত ব্যক্তির উপর থেকে সে চেতনাকে সরিয়ে এনে জীবন্ত মানুষের উপর নিবদ্ধ করতে পারে। তাছাড়া উপন্যাস মানবজীবনের সেই সব গোপন আবেগ অনুভূতির উৎসগুলিকে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় যার কথা জানলে আমাদের চেতনা সজীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু উপন্যাস আবার আমাদের মনের পক্ষে ক্ষতিকর সহানুভূতিও জাগাতে পারে। উপন্যাস আমাদের কুরুচিপূর্ণ অনুভূতিগুলিকেও গৌরবান্বিত করতে পারে। পরচর্চার মত উপন্যাসের কাহিনী অনেক সময় দুরভিসন্ধিমূলক হতে পারে। মিসেস বোল্টনের পরচর্চার মধ্যে একটা জিনিস বুঝতে পারল কনি, মিসেস বোল্টন সব সময় মেয়েদের পক্ষে। সে যে সব কাহিনী শোনায় তাদের তাতে মেয়েরা সব ভাল। আর পুরুষরা সব খারাপ। সে প্রায়ই বলত কথায় কথায়, 'লোকটা এত খারাপ আর মেয়েটা এত ভাল।' আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কথায়। মেয়েরা সব মিষ্টভাষিণী আর পুরুষরা সৎ হলেও কটুভাষী। ক্রুদ্ধস্বভাব সৎ লোকের কোন দাম নেই, তাই মিসেস বোল্টনের সমস্ত সহানুভূতির প্রবাহ নারীদের দিকেই প্রবাহিত হয়েছে।

বক্তার এই অকারণ পক্ষপাতিত্বের জন্যই যে কোন পরচর্চা খারাপ। আর এই কারণেই বেশীর ভাগ জনপ্রিয় উপন্যাস খারাপ। তাতে পরনিন্দা থাকে বলেই সাধারণ মানুষ তা বেশী পড়ে।

তবু মিসেস বোল্টনের কথা থেকে তেভারশাল গাঁ সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা

হলো ওদের। গাঁটা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারল ওরা। ওদের কাছে তেভারশাল গাঁটা একটা ভয়ঙ্কর জায়গা বলে মনে হত যেখানে যত সব কুৎসিত লোকগুলো থাকে। মিসেস বোল্টন যাদের কথা গল্পে বলত ক্লিফোর্ড তাদের অবশ্য অনেককেই চিনত। কিন্তু কনি শুধু তাদের মধ্যে দু একজনকে চিনত। তাদের মনে হত আসলে তেভারশাল যেন ইংল্যাণ্ডের একটা গাঁ নয়, ওটা যেন মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত একটা জঙ্গল।

মিসেস বোল্টন একদিন একটা গল্প বলতে গিয়ে বলল, আপনি এ্যালসপের বিয়ের কথাটা শুনেছেন? গত সপ্তায় তার বিয়ে হয়। এ্যালসপ হচ্ছে বুড়ো জেমস্-এর মেয়ে। ওরা একটা বাড়িও করেছিল। বুড়ো জেমস্ তিরাশি বছর বয়সে গত বছর পড়ে গিয়ে মারা যায়। লোকটা কিন্তু শিশুর মত সরল ছিল। পাহাড়ের ঢালু থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় আর উরুটা ভেঙ্গে যায়। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। বুড়ো কিন্তু ছেলেদের একটা পয়সাও দিয়ে যায়নি; সব টাকা মেয়ে তাত্তিকে দিয়ে যায়। তাত্তির বয়স গত শরতে তিপ্পান্ন বছরে পড়েছে। ও চ্যাপেল স্কুলে অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছে। তাত্তি অবশেষে একটা বুড়ো লোককে ভালবাসে। লোকটার বয়স এখন পঁয়ষট্টি। হ্যারিসনের কাছে কাজ করে। কিন্তু ওদের দেখলে মনে হবে ওরা যেন দুটি তরুণ তরুণী। যেন কূজনরত দুটি কপোত-কপোতী। তারা প্রায়ই হাত ধরাধরি করে হাঁটে, গেটের কাছে তারা পরস্পরকে চুম্বন করে। পাই ক্রফট্ রোডের ধারে খোলা জানালার গায়ে মেয়েটা সকলের চোখের সামনে লোকটার হাঁটুর উপরে বসে থাকে। লোকটার প্রায় চল্লিশ বছরের উপর বয়সের ছেলে আছে। দুবছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। এই লোকটার সঙ্গে এ্যালসপের সম্প্রতি বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর ওরা কিলক্রকে চলে যায় নতুন ঘর বাঁধতে। লোকে বলে মেয়েটা নাকি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা ড্রেসিং গাউন পরে সব জায়গায় যাওয়া আসা করে। বিশ্রী ব্যাপার! বুড়োদের কাজকর্ম দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। যুবক যুবতীদের থেকে ওরা অনেক খারাপ এবং বিরক্তিকর। আমি ছায়াছবির লোকদের ব্যাপারটা বলেছিলাম। আপনিও এগুলো এড়িয়ে যেতে পারেন না। বুড়োরা শিশু ও যুবকদের থেকে অনেক খারাপ। নীতির কথা বলছেন? কেউ নীতি মেনে চলে না। কেউ তা গ্রাহ্য করে না। লোকে যে যা চায় তাই করে। কিন্তু এখন তাদের রস গুটিয়ে এসেছে অনেকটা। খাদের কাজকর্ম ভাল চলছে না।

এখন তাদের টাকা নেই। ফলে ঝগড়া হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে মেয়েরা বেশী উগ্র ও অধৈর্য। অপেক্ষাকৃতভাবে পুরুষরা অনেক বেশী সহনশীল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, কোলিয়ারির ছেলেমেয়েরা পোষাকের প্রতি বেশী নজর রাখে। কি ছেলে কি মেয়ে, তাদের খরচের বেশীর ভাগ খরচ করে পোষাকে। ছেলেরা আবার মদ খেয়েও অনেক খরচ করে। সপ্তায়

তু তিন দিন তাদের শেফিল্ড শহরে যাওয়া চাই। বয়স্ক লোকেরা ধৈর্যশীল; মেয়েদের বাড়াবাড়ি ও উচ্ছৃংখলতা দেখেও কিছু বলে না। ফলে মেয়েরা এক একটা দানবী হয়ে ওঠে। আবার ছেলেরা তাদের বাবাদের মত হয় না। তাদের যদি তাদের বাবাদের মত কিছু করে সঞ্চয় করতে বলা হয় তাহলে তারা বলবে, ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা এখন জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

তাদের গাঁটা সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা পেল ক্লিফোর্ড। আগে গাঁটার নাম শুনলেই ভয় হত। সে সমস্ত গাঁটাকে একটা ঘোড়ার আস্তাবল মনে করত। কিন্তু এখন··· ?

ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল, গাঁয়ের লোকগুলো সমাজবাদ, বলশেভিকবাদ প্রভৃতির ভক্ত হয়ে উঠেছে নাকি ?

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কিছুসংখ্যক সোচ্চার লোকের কথা শুনেছেন। তাদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগ মেয়ে। পুরুষগুলোর এসব বিষয়ে কোন খেয়াল নেই। আমার মনে হয় না তেভারশাল গাঁটাকে আপনি কখনো লালে লাল করে তুলতে পারবেন। সেদিক দিয়ে তারা খুব ভাল। শুধু কিছু যুবক মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, তারা এই সব আদর্শে বিশ্বাস করে। আসলে তারা পকেটে পয়সা না থাকলেই ওই সব দিকে মন দেয়। তারা শহরে গিয়ে কিছু খরচ করার জন্য কিছু টাকা চায়। পকেটে টাকা না থাকলেই তারা ঐ বামপন্থী রাজনীতির বক্তৃতা শুনবে। কিন্তু আসলে তারা এসবে বিশ্বাস করে না।

তাহলে আপনি বলছেন বিপদের কোন আশঙ্কা নেই ?

মোটেই না। যতদিন ওদের হাতে রস থাকবে ততদিন কোন বিপদের ভয় নেই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওদের আর্থিক অবস্থা খারাপ চললে তরুণ যুবকরাও খারাপ হতে শুরু করবে। আসলে ওরা সবাই স্বার্থপর বকাটে ছোকরা। কিন্তু আমার মনে হয় না সত্যি সত্যিই তারা কিছু করবে। তারা শুধু মাঝে মাঝে মটর বাইকে চড়া আর শেফিল্ডে গিয়ে একবার করে নাচা ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেয় না। আপনি তাদের কোন বিষয়েই কোন গুরুত্ব দান করতে দেখতে পাবেন না। যে কাজে তারা গুরুত্ব দেয় তা শুধু হলো সন্ধ্যের সময় ভাল পোষাক পরে হয় বাসে না হয় মোটরে অথবা মোটর-বাইকে চেপে মেয়েদের সঙ্গে করে নাচতে যাওয়া। আর একটা ব্যাপারে তারা গুরুত্ব দেয় তা হলো ডার্বি, জনকাস্টার প্রভৃতি রেস খেলার ব্যাপারে। যে কোন রেস খেলাতেই তারা বাজী ধরে। আর ফুটবল ? তারা বলে ফুটবল খেলা দেখাটা একটা পরিশ্রমের কাজ। তার চেয়ে মোটরবাইকে করে শনিবার বিকালে শেফিল্ড অথবা নটিংহাম যাওয়া অনেক ভাল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কি করে ?

শুধু ঘুরে বেড়ায়। হয় মিকাডো বা অন্য কোন চায়ের দোকানে চা খাবে অথবা কোন ছায়াছবি দেখবে বা কোন থিয়েটারে যাবে। যেখানেই থাক তাদের সঙ্গে থাকবে কোন না কোন মেয়ে। ছেলেদের মত মেয়েরাও স্বাধীন। যা ইচ্ছা করে।

আর যখন তাদের হাতে টাকা থাকে না তখন কি করে?

তখন তারা পরস্পরের মধ্যে যত সব বাজে কথা নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ওরা যখন ভাল পোষাক পরে ফূর্তি করার জন্য টাকা ছাড়া আর কোন কিছুই জানে না তখন আপনি ওদের কিভাবে বলশেভিকবাদে দীক্ষিত করে তুলবেন? ছেলেদের মত মেয়েদেরও ঐ একই অবস্থা। সমাজবাদী হওয়ার মত মাথা নেই ওদের। কোন চিন্তাশক্তি নেই। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে মন দেবার মত ওদের মনই নেই আর সে মন কখনো হবেও না।

কনি এই সব শুনে শুধু একটা কথাই ভাবল, অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের মত নিম্নশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদেরও একই অবস্থা। তেভারশাল, মেফেয়ার বা কেনসিংটন সব জায়গারই অবস্থা এক। কনির মনে হলো আজকের দিনে সারা দুনিয়ায় শুধু একটা শ্রেণীই আছে আর তা হলো অর্থলোলুপ মানুষের শ্রেণী, কি মেয়ে কি পুরুষ সব মানুষ শুধু টাকা চাইছে। তফাৎ শুধু পাওয়ার তারতম্যে। চাইছে সবাই। যে বেশী পায় সেই হয় ধনী। যে চেয়েও কিছু পায় না সে থেকে যায় গরীব।

মিসেস বোল্টনের কথাবার্তার প্রভাবে পড়ে আশপাশের খনিগুলোর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ক্লিফোর্ড। একটা মালিকানা ও প্রভুত্বচেতনা পেয়ে বসল তাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা আবেগ জেগে উঠল ধীরে ধীরে তার মধ্যে। আসলে সেই হচ্ছে তেভারশাল গাঁয়ের মালিক, এখানকার খনি-গুলোর মালিকও সে। যে প্রভুত্বের ভাবটা আগে এক অহেতুক ভয়ের চাপে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আজ সেটা আবার জেগে উঠল।

তেভারশালের খাদগুলো খুব একটা ভাল চলছে না। মাত্র দুটো খনি চলছে, তেভারশাল আর নিউ লণ্ডন। তেভারশাল একদিন এক বিখ্যাত খনি ছিল। কিন্তু আজ তেভারশালের সে দিন আর নেই। খনি হিসাবে নিউ লণ্ডন কোনদিনই ভাল ছিল না। আজ তার অবস্থা আরো খারাপ।

মিসেস বোল্টন বলল, তেভারশাল খাদের অনেক লোক আজ স্ট্যাকগেট অথবা হোয়াইটওভারে চলে গেছে। যুদ্ধের পর খোলা স্ট্যাকগেট কোলিয়ারি আপনি বোধহয় কখনো দেখেননি স্যার ক্লিফোর্ড? একদিন দেখে আসবেন। একেবারে নতুন। গেটের সামনেটা দেখে মনে হবে যেন এক বিরাট ওষুধের কারখানা। দেখে কোলিয়ারি বলে মনেই হবে না। ওরা বলে ওষুধের জিনিসপত্র বেচে কয়লার থেকে বেশী টাকা পায়। কত বড় বড় বাড়ি তৈরি

হয়েছে কর্মচারিদের থাকার জন্য। দেশের বহু জায়গা থেকেই লোক আসছে ; সেখানে কাজ করছে। তবু তেভারশালের অনেক লোক আজ যেখানে কাজ করছে তারা ভালই আছে ওখানকার খনিতে কাজ করতে থাকা লোকদের থেকে। তারা বলে, তেভারশাল খনির প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েক বছর। তারপর এ খনিকে বন্ধ করে দিতে হবে। নিউ লণ্ডন খনি তার আগেই যাবে। কিন্তু তা যদি সত্যিই হয় তাহলে ব্যাপারটা কি খুব খারাপ হবে না? এ খনি কি আজকের? আমি যখন বাচ্চা মেয়ে ছিলাম তখন এ খনি ছিল দেশের একটা সেরা খনি। এখানে যারা কাজ করত তারা ভাগ্যবান মনে করত নিজেদের। কত টাকা রোজগার হয়েছে এ খনি থেকে। আর আজ লোকে বলে এটা নাকি এক নিমজ্জমান জাহাজ। এটা শুনতে খারাপ লাগে না কি? অবশ্য এমন কিছু শ্রমিক আছে যারা আজকের কোন নতুন খনিতে কাজ করতে যাবে না। এই সব নতুন খনিগুলোর গভীরতা কনেক বেশী আর এতে সব কাজ হয় যন্ত্রপাতিতে। শ্রমিকরা বলে মেশিন নয়, ওরা যেন যন্ত্রদানব। আগে মানুষে যে কয়লা তুলত আজ মেশিনে তা তুলছে। এতে কয়লা কিছু লোকসান হলেও বেতনে পুষিয়ে যায়, কারণ এতে কম লোক দরকার হয়। মনে হয় কিছুকাল পরে পৃথিবীতে সব কাজই হয়ত যন্ত্রের দ্বারা হবে ; কোন কাজের জন্য কোন লোকের দরকার হবে না। ওরা বলে, যারা নতুন যুগের সূচনাকে সহ্য করতে পারে না, যারা পুরনো ব্যবস্থাকে ছাড়তে চায় না, তারাই এসব কথা বলে। ওরা বলে স্ট্যাকগেট কোলিয়ারির কয়লা থেকে যে সব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায় তা তেভারশালের কয়লা থেকে পাওয়া যায় না। অথচ দুটো কোলিয়ারির মাঝখানে মাত্র তিন মাইলের ব্যবধান। কিন্তু পাঁচজনে বলাবলি করছে, এটা লজ্জার কথা যে খনিটার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করা হচ্ছে না। এখানকার মেয়েরা শেফিল্ড যাচ্ছে কাজ করতে। অথচ তাদের এ খনিতে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। আমার মতে লোকে যখন বলছে তেভারশাল কোলিয়ারি ডুবন্ত জাহাজের মত ডুবছে আর তার মধ্যে কাজ করতে থাকা লোকগুলো ইঁদুর, তখন খনিটার পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় এ খনির চরম সুদিন গেছে। লোকে একথাও বলে। স্যার জিওফ্রে এতে প্রচুর টাকা লগ্নী করে প্রচুর লাভ করেন। কিন্তু আজ সবাই বলছে এ খনি থেকে মালিকরা কিছুই পাচ্ছে না। কিন্তু কেন এমন হয়? আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন ভাবতাম কোন কোলিয়ারি কোনদিন বন্ধ হবে না। চিরকাল এমনি করে চলবে। অথচ আমাদের চোখের সামনে কত কোলিয়ারি বন্ধ হয়ে গেল। নিউ ইংল্যাণ্ড, কনউইচ প্রভৃতি কোলিয়ারি চিরদিনের মত নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। আজ সে সব কোলিয়ারি দেখলে মৃত্যুপুরী বলে মনে হয়। আজ সেই সব অচল খাদের মুখে যত গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। তেভারশাল খনি বন্ধ হয়ে

গেলে আমরা কি করব? জগৎটা সত্যিই কি মজার। কী অদ্ভুত। আপনি কখন কি হবে তা বলতে পারেন না।

মিসেস বোল্টনের কথাবার্তায় ক্লিফোর্ডের মনে এক নতুন আগ্রহ জাগে। খনি সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ বা মাথাব্যথা নেই। তার বাবা যে টাকা লগ্নী করে গেছেন তা একেবারে নিরাপদ। তার থেকে লভ্যাংশ প্রতি বছর ঠিক আসবে। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা সে দেখতে চায় না। তার জগৎ হচ্ছে সাহিত্যের জগৎ। এই সাহিত্যের জগতে সে চায় আপন প্রতিষ্ঠা ও যশের প্রসার।

হঠাৎ ক্লিফোর্ডের একটা কথা মনে হলো। তার মনে হলো দুরকমের উন্নতি আছে মানুষের জীবনে—লৌকিক উন্নতি আর সত্যিকারের উন্নতি। সংসারে একদল লোক আছে কাজ করার জন্য আর একদল লোক আছে আনন্দ বা হাসিখুশি করার জন্য। সংসারে যারা কাজের লোক তাদের দরকার মত রসদ যোগানোই হলো বেশী কঠিন কাজ। ক্লিফোর্ড ভাবল সে নিজে সুখবাদী। আনন্দ পায় বলেই এতদিন খনির কাজকর্ম বা উন্নতির দিকে কোন খেয়াল রাখেনি।

ক্লিফোর্ডের আরও মনে হলো উন্নতির কুক্কুরীদেবীর দুরকমের ক্ষুধা আছে। জগতের দু শ্রেণীর লোক দেবীর দু ধরনের ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে। যারা শিল্পী, সাহিত্যিক তারা দেবীকে তাদের তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট করে আর যারা ব্যবসা করে তারা দেবীকে হাড়মাংস দিয়ে তৃপ্ত করে।

সত্যিই দু দল কুকুর উন্নতির সেই কুক্কুরীদেবীর পিছনে পিছনে ঘোরে আর তার কৃপা পাবার জন্য ঝগড়া করে। যারা গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা সে দেবীকে প্রীত করার চেষ্টা করে, আর একদল কুকুর দেবীকে তার আসল খাবার হাড় মাংস অর্থাৎ টাকা পয়সা দিয়ে তৃপ্ত করে। দ্বিতীয় দল আত্মপ্রচারে কিছুটা বিমুখ, কিন্তু লোভলালসার দিক থেকে আরো ভয়ঙ্কর। আপাতমার্জিত প্রথম শ্রেণীর কুকুরগুলো সেই কুক্কুরীদেবীর কৃপালাভের জন্য নিজেদের মধ্যে অনবরত ঝগড়া-ঝাঁটি তর্জন গর্জন করতে থাকে। কিন্তু তাদের এই তর্জনগর্জন দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনপণ নীরব সংগ্রামের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ দেবীকে যারা হাড় মাংস এনে দেয় সেই দ্বিতীয় দলের কুকুররাই দেবীর কাছে অপরিহার্য এবং বেশী প্রিয়পাত্র।

কিন্তু মিসেস বোল্টনের প্রভাবে পড়ে শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে টাকা করে সেই কুক্কুরীদেবীর অন্তর জয় করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। জীবনে প্রথম এক নতুন সংগ্রামে প্রবেশ করতে চাইল। যাই হোক সে একটা প্রেরণা পেল জীবনে। মিসেস বোল্টন তাকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে চাইছে। কনি তা কোনদিন পারেনি। কনি তাকে সব সময় দূরে দূরে রাখত এবং তাকে শুধু নিজের সম্বন্ধে ও অন্তরজগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। মিসেস বোল্টন

তাকে বাইরের জগৎ ও পরিবেশ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন করে তোলে। অবশ্য অন্তরের দিক থেকে সে অনেকটা নরম হয়ে উঠছে, কিন্তু বাইরে তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশই প্রভাবশালী হয়ে উঠছে।

একদিন তার খনি সম্বন্ধে এমনই একটা আগ্রহ জেগে উঠল যে সে নিজে তা দেখতে গেল। একটা টবের মধ্যে বসে সে খাদের নিচে নামল। আবার টবে করেই তাকে কয়লা কাটার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। খাদের নিচে ম্যানেজার তাকে সব ঘুরিয়ে দেখাল টর্চ হাতে। ক্লিফোর্ড মুখে কম কথা বলল। কিন্তু সব কিছু দেখল। দেখে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। নতুন করে সবকিছু ভাবতে লাগল। খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

কয়লাখনি শিল্পসংক্রান্ত কারিগরি ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে পড়াশুনা শুরু করে দিল ক্লিফোর্ড। এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টও সব পড়ে ফেলল। খনি সম্বন্ধে আধুনিককালে যে সব পরীক্ষা নীরিক্ষা হয়েছে তাও খুঁটিয়ে দেখল। জার্মানিতে লেখা কয়লার রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে লেখা বইগুলোও পড়ল। এই সব পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে যে সব নতুন বিষয় জানতে পারল তা গোপন রাখা হলো। তা কাউকে কিছু বলল না। তবে এ বিষয়ে যতই পড়াশুনো করল ও খোঁজখবর নিল ততই বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড, আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের মাধ্যমে খনিশিল্পের, বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। ক্লিফোর্ড আরও বুঝল, খনিশিল্পে যা উন্নতি হয়েছে তা শিল্প সাহিত্য বা আবেগধর্মী সৃষ্টির থেকে অনেক বড়। এই শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানবের কাজ করছে। দেবতারূপে যা তারা আবিষ্কার করছে, এক দানবীয় কর্মতৎপরতার সঙ্গে কাজে পরিণত করে তুলছে সেই সব আবিষ্কারকে। এই সব ব্যাপারে মানুষ স্বচ্ছন্দে তার মানসিক বয়সকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য আবেগানুভূতির দিক থেকে মানুষ কিছুটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে।

তা হোক। মানুষ তার মন ও আবেগানুভূতির দিক থেকে নিচে নেমে যাক, ক্লিফোর্ড তা গ্রাহ্য করে না। ও সব চুলোয় যাক। ক্লিফোর্ড এখন একমাত্র খনিশিল্পের উন্নতি আর তেভারশালকে অধঃপতনের অতল গহ্বর হতে টেনে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী।

আজকাল সে দিনের পর দিন খাদের ভিতর নামছে। খনির কাজকর্ম তদারক করছে। এমন সব যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করছে তার খনির ম্যানেজার বা এঞ্জিনীয়াররা যার নামও শোনেনি। হ্যাঁ, একেই বলে ক্ষমতা। একেই বলে প্রভুত্ব! জীবনে আজ প্রথম এক প্রভুত্বচেতনা অনুভব করল ক্লিফোর্ড। সে অনুভব করল আজ তার দেহমনসম্বলিত ব্যক্তিত্বটিকে ঘিরে যে প্রভুত্বের স্রোত বয়ে চলছে সেই প্রভুত্বের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে উঠছে সমগ্র খনি অঞ্চলটি। আজ ক্লিফোর্ড বুঝতে পারল, আজ তার খনির শত শত লোকের উপর সেই প্রভুত্ব

প্রতিষ্ঠিত। আজ তারা সবাই তার অঙ্গুলিহেলনকে মেনে চলছে। তার মতে সব কাজকর্ম চলছে।

আজ যেন ক্লিফোর্ডের নবজন্ম হলো। আজ সে প্রথম জীবনের আস্বাদ লাভ করল। সে একদিন কনির নিরুত্তাপ সাহচর্যে একরকম মরে যাচ্ছিল, সচেতন সংবেদনশীল সত্তার এক হিমশীতল সংকীর্ণ সীমার আবর্তে আবর্তিত শিল্পীজীবনের নিঃসঙ্গতার মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে এতদিন মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল সে। আজ সে শিল্পীজীবন জাহান্নামে যাক। সে জীবন ঘুমিয়ে থাক। আজ তার মনে হলো ঐ অবহেলিত কয়লার খাদ থেকে এক নতুন প্রাণের প্রবাহ দুর্বার বেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সে প্রবাহকে বরণ করে নেবে সে। আজ মনে হচ্ছে, কোলিয়ারির দূষিত বাতাস অক্সিজেনের থেকে অনেক ভাল। কোলিয়ারি থেকে ছুটে আসা সেই বেগবান প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আজ সে পেয়েছে সৃষ্টিশীল কর্মোদ্দীপনা ও কর্মক্ষমতার একটা বিরাট অবকাশ। আজ তার কেবলি মনে হচ্ছে সে একটা কিছু করছে, একটা কাজের মত কাজ করতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছে এক বিরল জয়ের গৌরব। এতদিন গল্প লিখে যে জয় যে গৌরব সে লাভ করেছে তা শুধু অর্থহীন এক নামপ্রচার মাত্র। আর তাতে হয়েছে শুধু তার কর্মশক্তির অহেতুক অপচয়। কিন্তু আজ সে সত্যিকারের জয়ের গৌরব লাভ করতে চলেছে।

প্রথমে সে ভেবেছিল বৈদ্যুতীকরণের মধ্যেই আছে সকল সমস্যার নিঃশেষিত সমাধান। কয়লাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে দাও। সব সমস্যার সমাধান হবে। তারপর এ বিষয়ে এক নতুন ধারণার উদ্ভব হয়। জার্মানরা এমন এক স্বয়ংচালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করে যা চালাবার জন্য কোন ফায়ারম্যানের দরকার হয় না। এই এঞ্জিন আবার এমন একরকম তেলে জ্বলে যা খুব কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েও খুব বেশী তাপ দেয় এবং অদ্ভুত অবস্থায় কাজ করতে পারে।

এত কম তেলে এত বেশী তাপ দিতে পারে—এটা প্রথম দেখে চমকে উঠেছিল ক্লিফোর্ড। সে দেখল শুধু বাতাস নয়, নিশ্চয় বাইরের জগতের কোন না কোন উদ্দীপনার জন্যই এমন হচ্ছে। এই নিয়ে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে। ঘটনাক্রমে সে এক কৃতী যুবককে সহকারী হিসাবে পেয়ে যায়। যুবকটি রসায়নবিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করে এবং তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এবার এক বিজয়গর্ব অনুভব করতে লাগল ক্লিফোর্ড। নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বিসহ একাকীত্বের অচলাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে অবশেষে। শিল্প সাহিত্য তাকে কখনো এভাবে বার করে আনতে পারেনি। বরং তার অবস্থা আরো খারাপ করে দেয়। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয়ে মিসেস বোল্টন তার পিছনে থেকে কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে সেটা ঠিক বুঝতে পারে না ক্লিফোর্ড। কিন্তু সে যাই হোক, একটা জিনিস

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে যে, মিসেস বোল্টন যখন তার কাছে থাকে তার গলার স্বরটা বেশ নরম থাকে। কিছুটা নির্লজ্জও হয়ে ওঠে সে।

কনির কাছে কিছুটা শক্ত হয়ে ওঠে ক্লিফোর্ড। সে বুঝতে পারে আজকের এই জয় এই ক্ষমতালাভ প্রভৃতি সব কিছুর জন্য সে কনির কাছে ঋণী। তাই কনি যখন তাকে যেভাবে মৌখিক এক কৃত্রিম সম্মান দান করে সেও তখন তাকে ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা দান করে। তবে এটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, কনিকে সে ভয় করে। তার প্রতি একটা গোপন ভয় সব সময় অনুভব করে সে। তার মধ্যে যে নতুন একিলিস জেগে উঠেছে সে একিলিস যতই বলশালী ও প্রতিপত্তিশালী হোক তার একটা দুর্বল অনাবৃত গোড়ালি আছে এবং কনির মত এক নারী, সম্পর্কে যে তার স্ত্রী, এক অব্যর্থ আঘাতে ধরাশায়ী করে দিতে পারে তাকে চিরদিনের মত। কনি যতক্ষণ তার কাছে থাকত এক অর্ধদাস মনোভাবমূলক ভয়ের বশবর্তী হয়ে খুব বেশী রকমের ভদ্র হবার চেষ্টা করত তার কাছে। কনির সঙ্গে কথা বলতে তার কণ্ঠটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেত, হয়ে যেত অস্বাভাবিক। তাই কনির কাছে কোন কথাই বলত না সে।

একমাত্র শুধু মিসেস বোল্টনের কাছেই যখন থাকত ক্লিফোর্ড তখন সে নিজেকে প্রভু ভাবতে পারত। প্রভুত্বমূলক মনোভাবের পরিচয় দিত। তার গলার স্বরটা তখন বেশ সহজ ও দরাজ হয়ে ওঠে। মিসেস বোল্টনের গলার মতই তার কণ্ঠ হয়ে ওঠে অবাধ আর সোচ্চার। সে মিসেস বোল্টনকে তার দাড়ি কামাতে দেয়, তার গাটা দলে দিতে বলে। সে যেন একটা বাচ্চা ছেলে। যেন সে সত্যিই শিশু হয়ে উঠেছে।

অধ্যায় ১০

কনি আজকাল একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। আজকাল তাদের র‍্যাগবির বাড়িতে কোন লোকই আসে না। কারো সঙ্গে কথা বলতেও পায় না। আজকাল ক্লিফোর্ড আর তাকে চায় না কোন বিষয়ে। ক্লিফোর্ড এখন তার বন্ধুদের থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আজকাল ক্লিফোর্ডকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়। আজকাল সে রেডিও শুনতে ভালবাসে। অনেক খরচ করে সে একটা রেডিও বসিয়েছে। আজকাল সে এই দূর মিডল্যাণ্ডে বসে মাদ্রিদ ও ফ্রাঙ্কফুর্টের খবর শুনতে পায়।

আজকাল ক্লিফোর্ড ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাউডস্পীকার শোনে। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় কনি। ক্লিফোর্ড স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। তার মুখচোখ দেখে মনে হয় যেন সে তার

মনটা হারিয়ে ফেলেছে এবং সে অনির্বচনীয় একটা কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

সে কি সত্যিসত্যিই কিছু শুনছে? অথবা আসলে সে কিছুই শুনছে না। শুধু তার মনের ভিতর একটা জোর আলোড়ন চলছে। কনি তার কিছুই জানে না। সে তার ঘরে চলে যায় অথবা বাড়ি ছেড়ে বনের ভিতর চলে যায়। মাঝে মাঝে এক ভয় তাকে পেয়ে বসে। তার ভয় হয় সে পাগল হয়ে যাবে। সমগ্র সভ্য জগৎকেই সে ভয় করে।

কিন্তু এখন আবার এক নতুন ভয় দেখা দিয়েছে। আজকাল আবার ক্লিফোর্ড শিল্পোৎপাদনের ব্যাপারে নজর দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, শামুকের মত দেখতে যে প্রাণীর বাইরেটা শক্ত আর সেই শক্ত খোলস বা আবরণের অন্তরালে একটা নরম মাংসল পদার্থ লুকিয়ে আছে। কনি আজ সত্যিই বিপদে পড়েছে। সে আজ একেবারে বন্দী হয়ে পড়েছে। সে আজকাল একবারেই মুক্তি পায় না। তার কোন কাজ না থাকলেও ক্লিফোর্ড তাকে প্রায়ই ডাকে। তার খোঁজ করে প্রায়ই। ক্লিফোর্ডও আজকাল এক স্নায়বিক ভয়ে ভুগছে। ভাবছে কনি তাকে ছেড়ে চলে যাবে যে কোন সময়ে। ক্লিফোর্ডের জীবনের যে দিকটা নরম, যে দিকটা তার একান্ত ব্যক্তিগত এবং মানবিক আবেগানুভূতিতে ভরা, সে দিকটা ভয়ে ভয়ে কনির উপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে সে শিশুর মত বোকা। কনিকে র‍্যাগবিতেই তার স্ত্রী লেডি চ্যাটার্লি হিসাবে থাকতে হবে। তা না হলে কোন এক বিশাল প্রান্তরে পথহারা এক নির্বোধ লোকের মতই ব্যর্থ হয়ে যাবে সে।

তার উপর ক্লিফোর্ডের এই আশ্চর্যজনক নির্ভরতার কথাটা কনি বুঝতে পেরে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্লিফোর্ড তার খনির ম্যানেজার, বোর্ডের সদস্য, তরুণ বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা বলেছে তা সব শুনেছে। এই সব বাস্তব ব্যাপারে সে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে তা দেখে অবাক হয়ে গেছে কনি। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের চালনা করার ব্যাপারেও অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে সে। সে নিজেও আজ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন লৌহকঠিন এক ক্ষমতাশালী প্রভুতে পরিণত হয়েছে। কনির মনে হলো মিসেস বোল্টনের প্রভাবের ফলেই এই সব কিছু সম্ভব হয়েছে। ক্লিফোর্ডের জীবনের এক সংকটজনক মুহূর্তে মিসেস বোল্টনের আবির্ভাব হয় আর তার ফলেই ঘটেছে তার এই বিস্ময়কর পরিবর্তন।

কিন্তু এই ক্ষমতাশালী কঠোর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি যখন একা একা বসে তার প্রক্ষোভগত জীবনের কোন বিষয়ে ভাবতে থাকে তখন কিন্তু সে কেমন অন্য রকম হয়ে যায়। সে তখন কনিকে পূজো করে। কনি তার স্ত্রী এবং কোন বর্বর আদিম মানুষ যেমন ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোন রহস্যময় দেবতার পূজো করত ক্লিফোর্ডও তেমনি ভয়ে ভয়ে তার স্ত্রীর প্রাণহীন প্রতিমাটাকে পূজো করে চলে।

সে শুধু চায় কনি যেন কোনদিন তাকে ছেড়ে চলে না যায়। সে যেন তাকে এ বিষয়ে কথা দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয়।

একদিন কনি ক্লিফোর্ডকে বলল, আচ্ছা ক্লিফোর্ড, তুমি কি সত্যিই একটা সন্তান চাও?

বনমধ্যবর্তী সেই কুঁড়েটার চাবিটা হাতে নেওয়ার পর এ কথাটা একদিন বলল কনি।

ক্লিফোর্ডের ম্লান চোখদুটোতে একটা অজানা আশঙ্কা ফুটে উঠল নিবিড়-ভাবে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, যদি এতে আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি না হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

কনি প্রশ্ন করল, কিসের ব্যবধান?

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান, তোমার আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যবধান। এ সন্তান যদি তাতে ব্যবধান সৃষ্টি করে তাহলে তাতে আমার ঘোর আপত্তি। যেমন আমার নিজেরও ত একটা সন্তান থাকতে পারত।

কনি তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। কনি তার বিস্ময়াহত দৃষ্টি ক্লিফোর্ডের উপর অনেকক্ষণ ধরে নিবদ্ধ করে রাখার জন্য ক্লিফোর্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অবশেষে কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে চাও না যে আমি একটা সন্তান লাভ করি।

ক্লিফোর্ড উত্তর করল, আমি তোমাকে আগেই বলেছি যদি এ সন্তান-প্রজননের ব্যাপার আমাদের ভালবাসার গায়ে কোনভাবে হাত না দেয় তাহলে এতে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। যদি তাতে হাত দেয় তাহলে আমি তার ঘোর বিরোধী।

কনি শুধু এক হিমশীতল ভয় আর ঘৃণায় স্তব্ধ ও নীরব হয়ে উঠল। ক্লিফোর্ড যা বলল তা একমাত্র কোন নির্বোধেই বলতে পারে। সে কি বলল, কি তার মানে তা সে নিজেই জানে না।

কনি কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে বলল, না, তোমার প্রতি আমার ভাব বা অনুভূতির কোন পরিবর্তন হবে না।

ক্লিফোর্ড বলল, এইটাই হলো কথা। তা যদি হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। একটা বাচ্চা সারা বাড়িময় ছুটে বেড়াবে—এটা দেখতে সত্যিই ভয়ঙ্করভাবে ভাল লাগবে। তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে—এই ভাবতেও ভাল লাগে। তখন তার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে, তার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু তার জন্য শত কষ্ট করলেও আমার তাতে কোন দুঃখ হবে না, কারণ তখন সব সময় একথাটা মনে রাখব এ সন্তান তোমার। তাই নয় কি প্রিয়তমা? আমি ভাবব এ সন্তান আমার। তা নয় ত কি? কারণ আমার না হলেও সে সন্তান ত তোমার। আমি কেউ নই। আমি নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে তোমার মধ্যে এক আমি বড় হয়ে বেঁচে থাকব। একটু ভেবে দেখতে গেলে দেখা যাবে

তুমি ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই। আমি তাই তোমার ভবিষ্যতের জন্যই জীবন ধারণ করব। আমার জীবন নিজের কাছে কিছুই না।

কনির এই সব কথাগুলো ক্রমবর্ধমান একটা আতঙ্ক আর ঘৃণার সঙ্গে এসে গেল। বুঝল এটা হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর অর্ধসত্য যা মানুষের অস্তিত্বকে বিষাক্ত করে তোলে। কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ কখনো একথা বলতে পারে তার স্ত্রীকে? কিন্তু অনেক পুরুষই অনেক সময় এমন কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে পড়ে। যার মধ্যে আত্মসম্মানবোধের সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গও আছে এমন কোন লোক এমন করে তার স্ত্রীকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর সারাজীবনের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে?

তার উপর, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কনি শুনতে পেল ক্লিফোর্ড আবেগের সঙ্গে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কথা বলছে। উপরে সে একটা আবেগানুভূতিহীন নীরস ভাব দেখলেও তার কথাবার্তায় এমনই একটা প্রেমানুভূতির তরল আবেগ ফুটে উঠছিল যাতে মনে হচ্ছিল মিসেস বোল্টন তার অর্ধ-প্রণয়িনী, অর্ধ-সহধর্মিণী আর অর্ধ-বিমাতা। মিসেস বোল্টন তখন তাকে সান্ধ্যপোষাক পরাচ্ছিল, কারণ বাড়িতে কিছু ব্যবসায়ী অতিথি দেখা করতে এসেছিল ক্লিফোর্ডের সঙ্গে।

কনির এই সময় এক একবার মনে হত সে সত্যি সত্যিই মরে যাবে। তার মনে হচ্ছে একটা ভূতুড়ে ভয়ংকর মিথ্যা আর নির্বুদ্ধিতার বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতার চাপে নিষ্পেষিত হতে হতে মরে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডের আশ্চর্য ব্যবসাগত যোগ্যতা দেখে আর ব্যবসাগত সাফল্যকে দেবীজ্ঞানে উপাসনা করার কথা ঘোষণাটা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে কনি। সতত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে সে। আজ সে ক্লিফোর্ডকে স্পর্শ করে না আর ক্লিফোর্ডও তাকে স্পর্শ করে না। তাদের মধ্যে প্রায় আর কোন সম্পর্কই নেই। ক্লিফোর্ড কখনো তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে সস্নেহে ধরেনি। অথচ যার দেহটা স্পর্শ করে না তাকেই প্রতিমারূপে পূজা করার কথা ঘোষণা করে প্রকাশ্যে আর এই ঘোষণার কথা শুনে মনে আরও বেশী যন্ত্রণা পায় কনি। এ হচ্ছে ক্লিফোর্ডের দেহমনের এক সর্বাত্মক জড়তার এক নিষ্ঠুর পীড়ন। এক অভ্রান্ত উদাহরণ। কনির মনে হলো সে যদি তার মতের পরিবর্তন না করে তাহলে সে মরে যাবে।

সেদিন বনের ভিতর দিকে একা একা চলে গেল কনি। আজ কুঁড়ের কাছে সেই ফাঁকা জায়গাটায় না গিয়ে সে ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসল। বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে ভাবতে জলের ছল ছল শব্দ শুনতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ সেখানে শিকার রক্ষক এসে হাজির হলো। কনিকে নমস্কার করে বলল, আমি ঘরটার একটা চাবি করিয়েছি ম্যাডাম।

কনি চমকে উঠে বলল, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

লোকটা বলল, ঘরটা কিন্তু তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই। আমি যতটা

পেরেছি পরিষ্কার করেছি।

কনি বলল, কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি কষ্ট করতে হবে না।

না, না, কোন কষ্ট নয়। আমি প্রায় এক সপ্তা হলো মুরগিগুলোতে তা দিচ্ছি। আপনি গেলে কোন ক্ষতি হবে না। তারা কোন ভয় পাবে না। আমাকে সেখানে দিনরাত থেকে তাদের উপর নজর দিতে হয়। আমি আপনার কোন ব্যাঘাত ঘটাব না।

কনি বলল, না, তুমি কোন ব্যাঘাতই করবে না। তুমি যদি তাই ভাব তাহলে আমি ওঘরে যাবই না।

এবার সে তার নীল চোখ তুলে তাকাল কনির দিকে। তার চোখে এক ধরনের মমতা ফুটে উঠল, তবু কেমন একটা দূর দূর ভাব। তবে আজ তাকে আগের থেকে আত্মস্থ ও সহজ বলে মনে হলো। লোকটা কাশছিল। কাশিতে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

কনি বলল, তোমার কাশি হয়েছে ?

ও কিছু না, ঠাণ্ডা লেগেছে। কিছুদিন আগে আমার নিউমোনিয়া হয়। সেই থেকে ওই কাশিটা হয়েছে। এটা এমন কিছু না।

লোকটা কিন্তু কনির দূরে দূরে থাকতে লাগল। কোনক্রমেই কাছে এল না তার।

এর পর থেকে সকালে বা বিকালে প্রায় রোজ একবার করে সেই কুঁড়েটাতে যেতে লাগল কনি। কিন্তু যখনি যেত লোকটাকে দেখতে পেত না। সে যেন ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যেত তাকে। নিজের একাকীত্বকে সব সময় বজায় রেখে চলত।

ঘরের ভিতরটা কিন্তু সে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। আগুনের জায়গাটার কাছে একটা চেয়ার আর টেবিল রেখে দিয়েছে। আগুনের কাছে কিছু জ্বালানি কাঠ রেখে দিয়েছে। টুল, ফাঁদ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যথাসম্ভব সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সব কিছু কাজের পিছনে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সে।

সেই ফাঁকা জায়গাটায় পাখি থাকার জন্য কিছু গাছের ডাল আর খড় দিয়ে একটা কুঁড়ে তৈরি করেছে। একদিন কনি সেখানে গিয়ে দেখল বাদামী রঙের দুটো মুরগী ডিমে তা দিচ্ছে। তাদের নারীদেহের রক্তের উত্তাপে নিবিড় আর মাতৃত্বের অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে বসে আছে তারা। এ দৃশ্য দেখে কনির হৃদয়টা একেবারে ভেঙ্গে গেল। তার নিঃসঙ্গতার বেদনাটা তীব্র হয়ে উঠল আরো। নারীত্ব ও মাতৃত্বের যে গৌরবে গৌরবান্বিত মুরগীগুলো সে গৌরব তার নেই। তার হঠাৎ মনে হলো সে যেন নারী হয়েও সত্যিকারের নারী নয়, শুধু এক হিমশীতল ভয়ে প্রস্তরীভূত এক বস্তু মাত্র।

তারপর দেখতে দেখতে আরো মুরগী এসে তা দিতে লাগল। তিনটে

বাদামী, একটা কালো আর একটা ধূসর রঙের। সব মুরগীগুলোই একভাবে ডিমগুলোর চারদিকে ছড়িয়ে বসে আছে। নারীসুলভ এক গূঢ় প্রবৃত্তির তাড়নায় গায়ের পালকগুলোকে ফুলিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছে মুরগীগুলো। কনি তাদের কাছে গেলে তাদের উজ্জ্বল চোখ মেলে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল তারা। কনিকে কাছে আসতে দেখে ওরা ভয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

কনি ঘরের মধ্যে বিচালি পেল। তাই থেকে কিছু এনে মুরগীগুলোকে খেতে দিল। কিন্তু তারা খাবে না। একটা মুরগী আবার কনির হাতে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিল। কনি তাতে ভয় পেয়ে গেলেও সে ওদের জল আর খাবার নিয়ে গেল। কিন্তু যে মুরগীটা তা দিচ্ছিল ডিমে, সে জল বা খাবার কিছুই খেল না। কিন্তু তাদের কিছু না কিছু দেবার ও খাওয়াবার জন্য ছটফট করছিল কনি। অবশেষে একটা মুরগী কিছুটা জল খেল একটা পাত্র থেকে।

এর পর থেকে রোজই মুরগীগুলোর কাছে আসতে লাগল কনি। সারা জগতের মধ্যে একমাত্র এই মুরগীগুলোই একটুখানি উত্তাপ দিত তার হিমশীতল অন্তরটাকে। ক্লিফোর্ডের কথা তার প্রতিবাদ কনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিমশীতল করে দিত। মিসেস বোল্টনের কথা ও বাড়িতে আসা ব্যবসাদারদের কথাতেও হাড়ে শীতের কাঁপন ধরে দেহের প্রতিটি অস্থি মজ্জায়। মাঝে মাঝে মাইকেলিসের কাছ থেকে যে সব চিঠি আসে সে সব চিঠি পড়েও হিম হিম হয়ে যায় সমস্ত শরীর। কনির মনে হলো এইভাবে চলতে থাকলে সে মরে যাবে।

কিন্তু কনির সারা অঙ্গটা বরফের মত হিম হিম মনে হলেও বসন্ত এল সারা দেশ জুড়ে। কোথা থেকে অসংখ্য নীলকণ্ঠ পাখি এসে জুটল। বনটায় সবুজ বৃষ্টিজলের মতই কচি কিশলয়গুলো চকচক করতে লাগল গাছের ডালে ডালে। সারা বনভূমি জুড়ে সারা দেশ জুড়ে যখন এক মধুর উষ্ণতা ছড়িয়ে বসন্ত এসেছে তখন কনির অন্তরটা শুধু নিবিড় নিঃসঙ্গতার সীমাহীন এক বেদনায় হিম হয়ে থাকবে, এটা সত্যিই কী ভয়ংকর ব্যাপার। সব কিছুকে বিস্বাদ ও নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল কনির। শুধু নারীদেহের এক মধুর উত্তাপে নিবিড় হয়ে ডিমের উপর তা দিতে থাকা মুরগীগুলোকে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হতে লাগল কনির।

সেদিন আকাশটা ছিল বড় উজ্জ্বল, সূর্যের আলোয় ভরা। বিকালের দিকে বনভূমির পথে বেরিয়ে পড়ল কনি। ভায়োলেট, প্রিমরোজ প্রভৃতি কত ফুল ফুটে আছে পথের দুপাশে। ডিমে তা দিতে থাকা সেই মুরগীগুলোর বাসাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কনি। দেখল তা দেওয়া ডিমগুলোর থেকে একটা ছানা বেরিয়ে এসেছে। ছানাটা তার মার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার মা ভয়ে ভয়ে চিৎকার করছে। ছানাটা ঘন বাদামা রঙের এবং মাঝে মাঝে কালো দাগ। কনির মনে হলো সারা বনভূমির মধ্যে সারা জগতের মধ্যে এই

মুহূর্তে এই ছোট্ট প্রাণীটাই একমাত্র এক অফুরন্ত প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর। এক জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেই প্রাণীটাকে ভাল করে দেখার জন্য নত হলো কনি। এক অদম্য আবেগে ফেটে পড়ল তার অন্তর। এক নতুন জীবন! সম্পূর্ণ নতুন, বিশুদ্ধ, উত্তপ্ত, নির্ভীক এক জীবন। এই নতুন প্রাণীটি কত ছোট, কিন্তু কত নির্ভীক। এমন কি যখন ছানাটা তার মার আবেদনে তার পালকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখনও সে একটুও ভয় পায়নি।

মার কোলে ঢোকা আর বার হওয়াটা তার কাছে যেন একটা খেলা, জীবন নিয়ে খেলা। তার মা যখন তার পালক দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় বা বাসার ভিতর ভরে রাখতে চায় ছানাটা তখন এমনি নির্ভীকভাবে এক প্রাণচঞ্চলতার খেলায় মেতে ওঠে। তার মার কোলের ভিতর ঢুকেও শান্ত থাকে না ছানাটা। তার মার বাদামী সোনালী পালকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বিরাট বিশ্বটাকে দেখতে চায় বার বার।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল কনি। সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃসঙ্গ নারীজীবনের অব্যক্ত বেদনাটা আশ্চর্যভাবে তীব্র হয়ে উঠল। সে বেদনা অসহ্য হয়ে উঠছিল তার কাছে।

কনির তখন শুধু বনের মাঝে তাই ফাঁকা জায়গাটায় যাবার ইচ্ছা হয়। এ ছাড়া আর সব কিছুই এক ব্যথাহত স্বপ্নের মতই শূন্য ও জ্বালাময় মনে হয়। কিন্তু এক একদিন তার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও বনে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বাড়ির গৃহিণী হিসাবে অনেক কাজ করার থাকে। অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। এই সব করতে করতে তার মনে হয় সে যেন পাগল হয়ে যাবে।

একদিন সন্ধ্যার আগে সব কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়ল কনি। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল সে যেন পালিয়ে যাচ্ছে কার ভয়ে। কে যেন তাকে ডাকবে পিছন থেকে। সূর্যটা তখনো একেবারে অস্ত যায়নি। শেষ অপরাহ্ণের গোলাপী রশ্মিগুলো গাছে, ডালপালার ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল বনস্থলীর উপর। কনি বনের ভিতর ঢুকে দেখল মাথার উপর সূর্যের আলোটা আরো কিছুক্ষণ থাকবে। দুপাশে ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল কনি।

অবশেষে প্রায় আচ্ছন্ন ও অর্ধচেতন অবস্থায় বনের মাঝখানে সেই ফাঁকা জায়গার উপর এসে পৌছল কনি। শিকার রক্ষক লোকটা তখন ছিল সেখানে। হাতগুটোন জামা পরে সে মুরগীদের খাঁচাগুলো গুটিয়ে নিচ্ছিল রাত্রির মত। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল তাদের। শুধু তিনটি সদ্যজাত ছানা তাদের মার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে খাঁচার বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কনি সলজ্জ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ছানাগুলোকে দেখার জন্য আমি এলাম। কথা বলার সময় সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল কনি লোকটার দিকে। প্রশ্ন করল, আর আছে?

লোকটা বলল, মোট ছত্রিশটা। এমন কিছু খারাপ নয়।

লোকটাও ছানাগুলোকে আগ্রহের সঙ্গে দেখাচ্ছিল। তাদের খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছিল।

শেষ খাঁচাটার পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল কনি। ছানা তিনটে ঢুকে গেছে তাদের মার কোলে। তবু তাদের মার সোনালী পালকের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট মাথাটা নিয়ে মার নিরাপদ কোল থেকে বাইরের জগৎটাকে দেখার চেষ্টা করছিল।

কনি তার হাতটা বাড়িয়ে একটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আমি ওদের গায়ে ভালবেসে হাত দেব।

কিন্তু ছানাগুলোর মা তার হাতে ঠুকরে দিতেই সরে এল কনি। আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ওদের আঘাত করিনি, তবু ঠুকরে দিচ্ছে।

লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল। হঠাৎ সে কনির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে খাঁচার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিল। ছানাগুলোর মাটা তাকে ঠুকরে দিল, তবে কনির মত অত জোরে নয়। লোকটা তার পালকের উপর হাত বুলিয়ে খাঁচার ভিতর থেকে একটা ছানাকে বার করে এনে কনির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নিন ধরুন।

এক অপূর্ব অভিনব অভিজ্ঞতার পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল কনির সারা অঙ্গ। ছানাটাকে তার হাতের তালুর উপর নিয়ে অবাক বিস্ময়ে অফুরন্ত পুলকের সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল। কত ছোট্ট একটা প্রাণী। তার ভার-হীন দেহের মধ্যে কত নিঃশব্দ কম্পনে স্পন্দিত হচ্ছে অনুপ্রমাণ এক প্রাণ। কিন্তু এত ছোট হয়েও কত নির্ভীক। তার ছোট সুন্দর মাথাটা তুলে ছানাটা নির্ভয়ে মার দিকে তাকাচ্ছে। কনি আপন মনে বলে উঠল, চমৎকার!

লোকটাও বেশ আনন্দের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে দেখল কনির চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে নীরবে। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য খাঁচার দিকে সরে গেল। সহসা সে অনুভব করল যে জারজ উত্তেজনাটা এত দিন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল তার নিম্নাঙ্গের মধ্যে আজ হঠাৎ সে অশান্ত হয়ে জেগে উঠেছে। সেটাকে শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করল সে। কনির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তবু সে উত্তেজনার উত্তাপটা কোমর থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়ল তার জানু পর্যন্ত।

আবার কনির দিকে ফিরে দাঁড়াল সে তাকে দেখার জন্য। দেখল, কনি নতজানু হয়ে বসে ছানাটা খাঁচার ভিতর রাখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুরগীটির ভয়ে পারছে না। কনির চেহারাটার মধ্যে নিঃসঙ্গতার এক অব্যক্ত বেদনা প্রকট হয়ে উঠছিল এমনভাবে যে সমবেদনার একটা তীব্র জ্বালা লোকটার আন্তরযন্ত্রের গভীর হতে ক্রমশঃ ঠেলে উঠছিল তার বুকের দিকে।

এবার সে কনির কাছে এসে তার হাত থেকে ছানাটা নিয়ে খাঁচার মধ্যে ভরে দিল। এবার সে তার সেই উত্তেজনার আগুন তার পাছার মধ্যে অনুভব করল।

কনির পানে ভয়ে ভয়ে তাকাল লোকটা। দেখল কনি মুখটা ঘুরিয়ে কাঁদছে। তার যুগান্তব্যাপী নিঃসঙ্গতার বেদনার হিমশীতল পাথরটা যেন সহসা গলে জল হয়ে ঝরে পড়ছে তার দুচোখ থেকে। তা দেখে তার অন্তরটাও গলে গেল। সে তখন তার হাত বাড়িয়ে তার আঙুলগুলো কনির হাঁটুর উপর রাখল। নরম স্বরে বলল, আপনি কাঁদবেন না।

কনি তার মুখে হাত দিয়ে দেখল সত্যিই সে অনেকখানি কেঁদেছে। তার অন্তরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু কোন দিকে কোন খেয়াল নেই।

লোকটা তখন তার হাতটা এবার আলতোভাবে কনির ঘাড়ের উপর প্রথমে রাখল। তারপর আস্তে আস্তে তার পিঠের উপর এক অন্ধ সহানুভূতির অপ্রতিরোধ্য আবেগে হাতটা বুলিয়ে যেতে লাগল। পিঠ থেকে হাতটা তার ক্রমশই কনির পাছা আর পাজরের মাঝখানে নরম অংশটায় নেমে এল।

কনি তার রুমালটা বার করে মুখ মুছতে লাগল।

লোকটা সহজভাবে শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি ঐ ঘরটায় একবার যাবেন?

তারপর সে কনির হাত ধরে তুলে তার কাঁধের কাছে হাতটা রেখে তাকে কুঁড়েটার দিকে নিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। কনি ঘরের ভিতর না ঢোকা পর্যন্ত তাকে ধরে রইল সে। কনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে চেয়ার টেবিলটা সরিয়ে একটা বাক্স থেকে একটা কম্বল বার করে ঘরের মেঝের মধ্যে বিছিয়ে দিয়ে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

কনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার মুখপানে তাকিয়ে দেখল তার মুখটা কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। যেন সে এক তীব্র সংগ্রামে ব্যর্থ পরাজিত হয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে চলেছে নির্মম নিষ্করুণ নিয়তির কাছে।

এক অদ্ভুত আনুগত্যের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই কম্বলটার উপর শুয়ে পড়ল কনি। লোকটা তখন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠল ঘরখানা। সেই অন্ধকারে কনি অনুভব করল একটা অদৃশ্য হাত তার দেহটাকে স্পর্শ করার পর তার মুখটাতে হাত বোলাচ্ছে। সে হাতের স্পর্শের মধ্যে এক অনন্ত সান্ত্বনা আর আশ্বাস ঝরে পড়ছিল যেন। হঠাৎ কনি তার গালের উপর একটা চুম্বন অনুভব করল।

স্বপ্নপরিবৃত এক তন্দ্রার ঘোরে স্থির হয়ে শুয়ে রইল কনি। তারপর যখন সে অনুভব করল লোকটার হাতটা এক নগ্ন নির্লজ্জতায় তার পোষাকটা সরিয়ে দিচ্ছে তখন একটু কেঁপে উঠল সে। লোকটা এক নীরব নিরুচ্ছার আনন্দের তরল উত্তেজনায় গলে গিয়ে কনির কোমরের পোষাকগুলো খুলে নামিয়ে তার পায়ের কাছে চাপিয়ে রাখল। তারপর তার যোনিটাকে চুম্বন করল। এর পর কনির নরম দেহটার মধ্যে তাকে প্রবেশ করতে হবে। দীর্ঘদিন পর নারী-দেহের মধ্যে প্রবেশ করাটা এক পরম আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হলো তার।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল কনি। যেন সে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে

আছে। তা থাক। এ ব্যাপারে তার কোন কাজ নেই, চেষ্টা বা তৎপরতার কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত কর্মতৎপরতা তার। সেই সব কিছু করছে। সেই তার শক্ত হাত দিয়ে কনির দেহটাকে জড়িয়ে আছে। কনির দেহের উপর তার দেহটাকে দ্রুত সঞ্চালিত করছে। তারপর সে-ই তার গর্ভদেশে বীর্যস্খলন করছে। এই সব কিছুই এক সুখনিদ্রার মধ্যে অভিভূত হয়ে এক সুখস্বপ্নের মত উপভোগ করল কনি। অবশেষে লোকটা যখন তার সব কাজ শেষ করে কনির বুকের উপর ঢলে পড়ল তখন ঘুমটা ভেঙে গেল তার।

সহসা নিজে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল কনি। এক অপার রহস্যময় বিস্ময়ের ঘোরে ভাবতে লাগল কনি, কেন, কেন? এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? কেন এই রতিক্রিয়া তার মনের উপর থেকে তার অন্তরের আকাশ থেকে এক যুগান্ত-সঞ্চিত মেঘভারকে অপসারিত করে দিল নিঃশেষে? আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেনই বা তার অন্তরের আকাশ জুড়ে শান্তির অমৃত ঝরে পড়তে লাগল? এসব কি সত্যি? এই মুহূর্তে যা ঘটে গেল তা কি সত্যি?

কনির আধুনিক যুক্তিবাদী মন কিন্তু তবু শান্তি পেল না। বার বার শুধু মনে হতে লাগল, এটা কি সত্যি? তবে এটাও সে বুঝল সে লোকটাকে দেহদান করেছে—এটা সত্যি। কিন্তু সে যদি লোকটাকে দেহদান না করে নিজের সতীত্বটাকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করত তাহলে সেটাই হত অর্থহীন কাজ। তার মনে হলো, সে যেন লক্ষ লক্ষ বছরের এক বৃদ্ধা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সে যেন অন্তহীন বোঝাভারের এক অবিচ্ছিন্ন বেদনার অভিজ্ঞতাকে বহন করে আসছে। লক্ষ বছরের সেই বোঝাভার আজ অপসারিত হলো।

লোকটা তার বুকের উপর আশ্চর্যভাবে স্থির হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কি ভাবছে সে? কি সে অনুভব করছে তা জানে না কনি। লোকটা তার কাছে অপরিচিত। সে তাকে চেনে না। তার মনের কথা জানে না। তা জানার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। লোকটা নিজে থেকে না উঠলে তার নিস্তব্ধতাকে ভাঙবে না সে। তার হাত দিয়ে কনির গাটাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর শুয়ে আছে লোকটা। তার ঘামে ভেজা গাটা কনির গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। কনির মনে হয়, লোকটার এই দেহগত নিস্তব্ধতাটা এক অপার মানসিক শান্তিরই প্রতীক।

লোকটা যখন কনির বুক থেকে উঠে গেল তখন সে তার মনের আসল ভাবটা জানতে পারল। সে কনির পোষাকগুলো পা থেকে টেনে কোমরের কাছে এনে জড়িয়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। নিজের পোষাকটা ঠিক করে নিল। তারপর নীরবে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে চলে গেল।

কনি উঠে দেখল বাইরে এক গাছের মাথার উপর একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোন আলো নেই। উঠে পোষাকটা ঠিক করে নিয়ে ঘরের বাইরে এল।

সমস্ত বনস্থলী নিবিড় আঁধারে ঢাকা। কিন্তু মাথার উপরে আকাশটা বেশ পরিষ্কার। লোকটা সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা ছায়ার মত কনির কাছে এগিয়ে এসে বলল, এবার তাহলে যাবেন ত?

কনি বলল, কোথায়?

লোকটা বলল, আমি আপনার সঙ্গে বাড়ির গেট পর্যন্ত যাব।

লোকটা ঘরটায় চাবি দিয়ে সব কিছু ঠিক করে চ:ল এল কনির কাছে।

কনির পাশে পথ হাঁটতে হাঁটতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দুঃখিত নন এ বিষয়ে?

কনি বলল, না না, মোটেই না। তুমি নও ত?

সে বলল, এর জন্য? না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লোকটা আবার বলল, কিন্তু তার পরের কথাটা?

কনি বলল, কি পরের কথা?

লোকটা বলল, কেন, স্যার ক্লিফোর্ড। তারপর সমাজের আর পাঁচজন লোক। কত সব জটিলতা।

কনি হতাশ হয়ে বলল, কিসের জটিলতা?

লোকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে বলল, এ সব ব্যাপারে এই সব জটিলতা সব সময়ই দেখা দেয়। আপনার ও আমার দুজনের পক্ষেই জটিলতা দেখা দেবে।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এজন্য দুঃখিত?

লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, একদিক দিয়ে কিছুটা দুঃখিত হয়েছি বৈকি। আমি ভেবেছিলাম সব কিছুর শেষ হয়ে গেছে জীবনে। কিন্তু আবার নতুন করে শুরু করতে হলো।

কি শুরু হলো?

জীবন।

কথাটার প্রতিধ্বনি করে কনি বলল, 'জীবন!' কথাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছিল যেন।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, জীবন। কোন পরিত্রাণ নেই। আপনি যদি এই জীবন থেকে দূরে সরে থাকেন তাহলে আপনাকে মরতে হবে। তাই আমাকে নতুন করে শুরু করতে হলো।

কনি এ দিকটা তলিয়ে দেখেনি। তবু...

কনি আনন্দের সঙ্গে বলল, একে বলে ভালবাসা।

লোকটা বলল, তা যাই হোক।

এবার ওরা অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল। অবশেষে ওরা গেটের কাছে এসে পৌছল।

কনি বলল, কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা করো না ত?

লোকটা বলল, না না। কথাটা বলেই সে কনিকে তার বুকে জোরে আবেগের সঙ্গে চেপে ধরল। বলল, না মোটেই না। আমার এতে ভালই হয়েছে। ভাল, খুব ভাল হয়েছে। আপনার?

কনি বলল, হ্যাঁ, আমারও হয়েছে।

কনির এ কথাটা কিন্তু পুরো সত্যি নয়। কারণ সে ঘটনাটার ভালমন্দ দিকগুলো এখনো তলিয়ে দেখেনি।

লোকটা কনিকে চুম্বন করল। তার সে চুম্বনের স্পর্শে এক মেদুর উষ্ণতা ছিল। সে হেসে বলল, পৃথিবীতে আর যদি কোন লোক না থাকত।

একথায় কনি হাসল। ওরা পার্কের গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা গেটটা খুলে দিল। সে বলল, আমি আর যাব না। আপনি যান।

কনি বলল, না তোমাকে আসতে হবে না। সে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দুটো নিজের দু হাতের মধ্যে ধরে নিল লোকটা। কনি বলল, আমি আবার আসব ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।

কনি পার্কের মধ্যে ঢুকে পা চালিয়ে চলতে লাগল।

লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কনিকে অন্ধকারের মধ্যে চলে যেতে দেখল। একটা তিক্ততার ভাব জেগেছিল মনে। কারণ এই কনিই সেই বন্ধনে আবার আবদ্ধ করল তাকে যে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল সে। যে নারীসঙ্গ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চেয়েছিল এই কনিই তাকে সঙ্গ দান করে তার সেই ঈপ্সিত নিঃসঙ্গতাটাকে খান খান করে ভেঙে দিল। যে লোক সম্পূর্ণ একা থাকতে চায় তার একাকীত্বকে কেড়ে নিতে চলেছ সে।

বনের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল লোকটা। চারিদিক নীরব নিঝুম। একেবারে নিস্তব্ধ। আকাশে জ্যোতিহীন যে একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছিল, তাও ডুবে গেছে। বাইরে থেকে শুধু স্ট্যাক গেট, এঞ্জিন আর বড রাস্তায় গাড়ি চলার শব্দ আসছিল তার কানে। আস্তে আস্তে টিলার চড়াইটাতে উঠে গেল লোকটা। উপর থেকে সে তেভারশাল খনির আর স্ট্যাক গেটের আলো দেখতে পেল ছোট বড। শূন্য অন্ধকার দিগন্তের নীরব পটভূমিকায় গরম চুল্লীর মুখে গলন্ত লোহার এক সোনালী আগুনের আভা দেখা যাচ্ছিল। এই অন্ধকার রাত্রির মাঝেও কোন এক শয়তান যেন এক অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ঐ খনি আর কলকারখানায় সব কাজ করে চলেছে। খনিতে তখন এক শিফটের কাজ শেষ করে একদল লোক বেরিয়ে আসছে।

সেখান থেকে নেমে আবার বনের অন্ধকার আর নির্জনতার মাঝে প্রবেশ করল সে। কিন্তু তার মনে হলো অন্ধকার বনভূমির এই নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা অর্থহীন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কলকারখানার একটানা অশান্ত শব্দে সে

নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে। কলকারখানার তীব্র আলো উপহাস করছে এ বনের অন্ধকারকে। সে বেশ বুঝতে পারল আজকাল কোন লোক চেষ্টা করলেও নির্জনে কোথাও একা থাকতে পারে না। সারা জগতের মধ্যে নির্জন তপোবন বলে কোন বস্তু নেই। আজ তাকে আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নারীর সংস্পর্শে আসতে হলো। তার সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হতে হলো। তার মানেই সে আবার দুঃখ আর সর্বনাশের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিল। কারণ সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছে এ সবের প্রকৃত অর্থ কি।

এটা কিন্তু কোন নারীর দোষ নয়, প্রেমের দোষ নয়, কাম বা যৌন ব্যাপারের দোষও নয়। দোষ যা কিছু তা হলো বৈদ্যুতিক আলোর আর যন্ত্র-দানবের গর্জনের। দোষ যা কিছু তা হলো এই যান্ত্রিক লোভ আর লোভী যান্ত্রিকতার বা যন্ত্রসভ্যতার। দোষ হচ্ছে ঐ আলো, ঐ গলন্ত লোহা, আর ঐ যানবাহনের শব্দের! এই সব মিলিয়ে যা কিছু যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না তা সব ধ্বংস করে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা সবাই শীঘ্রই এ বনটাকেও ধ্বংস করে ফেলবে। এ বনে তখন আর নীল ব্লুবেল ফুল ফুটবে না। গলন্ত লোহার স্রোতে পৃথিবীর সব সূক্ষ্ম ও সুকুমার বস্তু বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যে নারীর সঙ্গে একটু আগে দেহসংসর্গে মিলিত হয়েছিল তার কথাটা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখতে লাগল লোকটা। আহা বেচারা! হায়, পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ এক নারী! সে জানে না, সে সুন্দর। এই নিদারুণ নিষ্করুণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়েও কত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। তার মনে হলো মেয়েটি আজকালকার মেয়েদের মত অত কড়া বা শক্ত নয়। হায়াসিনথ্‌ ফুলের মতই অনেকটা নরম। আহা বেচারী মেয়েটির জন্য দুঃখ হয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চাপ মেয়েটাকে শেষ করে দেবে। এইভাবে সব সুকোমল বস্তুকেই ওরা শেষ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। মেয়েটির মনটা সত্যিই নরম। ওর মধ্যে ওর নারীসত্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা নরম অংশ আছে যা হায়াসিনথ্‌ ফুলের মত, যা আজকালকার আধুনিকা মেয়েদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে ও ওর সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে মেয়েটাকে কিছুদিন রক্ষা করে যাবে। হ্যাঁ, কিছুদিনই বটে, কারণ যতদিন মানস চেতনাহীন লোহার জগৎ আর যান্ত্রিক লোভটা এসে তাকে ও ওকে দুজনকেই একে একে গ্রাস না করে ততদিনই ও তাকে রক্ষা করে যেতে পারবে।

তার বন্দুক আর কুকুরটাকে সঙ্গে করে সে তার বাসায় চলে গেল। ঘরের ভিতর আগুন আর বাতিটা জ্বালল। তারপর রুটি, মাখন, কাঁচা পিঁয়াজ আর মদ দিয়ে নৈশভোজন সারল। ঘরের মধ্যে সে একেবারে একা। এই একাকীত্বই তার একান্ত প্রিয়, একান্ত কাম্য। তার ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে আগুনটা সমানে জ্বলে যাচ্ছিল। সাদা কাপড়পাতা টেবিলটার উপর বাতিটার আলোও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। অন্যদিন

আগুনের ধারে বসে একটা বই পড়ে সে। আজও ভারতবর্ষের উপর একখানা বই পড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। আর মন বসল না। আজ ধূমপানও করল না। শুধু হাতের নাগালের কাছে এক মগ মদ রেখে আগুনের পাশটায় বসে শুধু কনির কথা ভাবতে লাগল একমনে।

সত্যি কথা বলতে কি, যা ঘটে গেল তার জন্য সে দুঃখিত বেশ কিছুটা। দুঃখটা বিশেষ করে হয় কনির জন্য। এক অজানিত শঙ্কায় পীড়িত হচ্ছিল তার মনটা। কোন পাপচেতনা, অন্যায়বোধ বা বিবেকের দংশন অনুভব করছিল না সে। কারণ সে জানে, বিবেক মানেই একটা ভয়—হয় সমাজের ভয় না হয় আপন আত্মার ভয়। সে নিজেকে বা তার আত্মাকে ভয় করে না, তার একমাত্র ভয় এ ব্যাপারে শুধু সমাজকে। আপন অভিজ্ঞতা আর অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে জেনেছে সমাজ প্রধানত অপ্রকৃতিস্থ, বিকৃতমনা এবং অপকারী।

আবার সেই নারী। তার কথাই ভাবছিল সে। হায়, এই নারী যদি তার কাছে এই ঘরে থাকতে পেত। আর কেউ কোথাও যদি না থাকত! সমস্ত জনপদ ও জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা যদি দুজনে এক জায়গায় বাস করতে পারত। যৌন উত্তেজনার রূপ ধরে কামনার আবেগটা উদ্বেল হয়ে উঠল আবার তার মধ্যে। এক জীবন্ত পাখির মত উড়ু উড়ু হয়ে উঠল তার উত্থিত যৌনাঙ্গটা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই অবৈধ দেহ-সংসর্গের ব্যাপারটা বাইরে লোক সমাজে প্রকাশিত হয়ে পড়ার একটা ভয় পীড়িত করতে লাগল তার মনটাকে। যে ভয় ঐ বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকটিত, যন্ত্রের বিরামহীন গর্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সেই ভয়-ই এক বোঝা হয়ে চেপে ঝুলছে তার মনের উপর। কনি একজন বয়স্ক মহিলা হলেও তার কাছে যেন এক কুমারী তরুণী, এমনই এই তরুণী কুমারী, এক প্রথম পুরুষরূপে যার মধ্যে উপগত হয়েছে সে এবং যাকে সে আবার কাছে পেতে চায়।

আজ চার বছর ধরে সে কোন নারীর সংস্পর্শ হতে দূরে একা একা বাস করে আসছে। আজ চার বছর ধরে কোন কামনার আবেগ জাগেনি তার মধ্যে। দীর্ঘদিন পর নারীসংসর্গের ফলে আবার কামনা জাগল তার মধ্যে। সে কামনার তাড়নায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। বন্দুক আর কুকুরটা সঙ্গে করে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। একদিকে দুর্বার কামনার আবেগ আর অন্যদিকে নিষ্ঠুর সমাজের এক ভয়—এই দুইএর তাড়নায় সারা অন্ধকার বনময় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই অন্ধকার ভালবাসে সে। এই অন্ধকারে নিজেকে আবৃত রাখতে চায়। এই আদিম অন্ধকার তার অশান্ত কামনার অসংযত আবেগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তার উত্থিত যৌনাঙ্গের এক আদিম চঞ্চলতার যেন অন্ত নেই, তার বিক্ষুব্ধ নিম্নাঙ্গের বর্বর উত্তাপের যেন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু এই সব চঞ্চলতা আর উত্তাপকে

এই হিমশীতল নৈশ বনান্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখে দিতে চায় যেন। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সমাজে যদি এমন কিছু সহৃদয় মানুষ থাকত যাদের সঙ্গে মিলে মিশে ওরা ঐ বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গে ঐ যন্ত্রদানবগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম করে যেতে পারত, ওদের সেই যৌথ সংগ্রামের দ্বারা ওরা যদি জীবনের সজীবতা ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারত আর ওদের কামনার সম্পদের উপযুক্ত মূল্য দান করার জন্য এই সভ্যতাকে বাধ্য করতে পারত। কিন্তু সেরকম কোন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের জগতে দেখা যাচ্ছে সমাজের সব মানুষই এই অবাঞ্ছিত যন্ত্রসভ্যতার সব উপাদানকে বরণ করে নিচ্ছে এক পরম গৌরববোধের সঙ্গে। এক উন্মত্ত কৃত্রিম ও যান্ত্রিক লোভ আর প্রলোভিত এক যান্ত্রিকতার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে তারা জীবনের সব কিছু সুকুমার ও স্বাভাবিক সজীবতার ঐশ্বর্যকে পদদলিত করে যাচ্ছে।

এদিকে কনি তাড়াতাড়ি পার্কের ভিতর দিয়ে বাড়িতে এসে পৌছল। তার মনে তখন কোন চিন্তাই ছিল না। কোন অনুচিন্তন বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না তার মনে। এখন সে বাড়ি গিয়ে তার নৈশভোজন সারবে। যথাসময়ে সে নৈশ ভোজনে অংশ গ্রহণ করবে।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে সদর দরজা বন্ধ দেখেই বিরক্ত হয়ে উঠল কনি। দরজায় ঘণ্টা বাজাল। মিসেস বোল্টন দরজা খুলে দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি তাহলে এসেছেন! আমি ত ভাবছিলাম আপনি হারিয়ে গেছেন। স্যার ক্লিফোর্ড অবশ্য আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমার মনে হয় নৈশভোজনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই না কি?

কনি বলল, তাই মনে হয়।

মিসেস বোল্টনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল।

মিসেস বোল্টন বলল, খাওয়ার ব্যাপারটা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেব? আপনি তাহলে পোষাক ছাড়ার সময় পাবেন।

তাহলে ভালই হয়।

ক্লিফোর্ড তখন মিস্টার লিনলের সঙ্গে কথা বলছিল। লিনলে ছিল তাদের সব কয়লাখনির জেনারেল ম্যানেজার। উত্তরের লোক, বয়স হয়েছে। তবে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তেমন খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাবলী সম্বন্ধেও তেমন কোন ধারণা নেই। যুদ্ধোত্তর কালে শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে যে সব উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। তবু লোকটাকে কনির মোটামুটি ভাল লাগে। তবে তার স্ত্রীর কথার কচকচি মোটেই ভাল লাগে না তার। তার স্ত্রী সঙ্গে না আসায় একরকম বেঁচে গেছে কনি।

নৈশভোজন পর্যন্ত রয়ে গেল লিনলে। কনি গৃহিণী। এ বাড়ির পুরুষ

অতিথিরা সকলেই কনির এ গৃহিণীপনা ভালবাসে। তার আচরণ শুধু শোভন ভদ্র ও মার্জিত নয়, সকলের সুখ সুবিধার প্রতি সমান সচেতন। তার মুখের এক মেদুর প্রশান্তি, আয়ত নীল চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝাই যায় কি ভাবছে সে ঠিক এই মুহূর্তে। এই সময় কনির দ্বৈত নারীসত্তা কাজ করে। এক সুদক্ষ সংবেদনশীল গৃহিণীর ভূমিকায় নিখুঁতভাবে অভিনয় করে যায় কনি। কিন্তু স্বরূপতঃ সে গৃহিণীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তার আসল নারীসত্তার মাঝে সে গৃহিণীর কোন অস্তিত্ব নেই।

অতিথি চলে না যাওয়া পর্যন্ত নিচের তলাতেই রয়ে গেল কনি। উপরে তার শোবার ঘরে গেল না। তার নিজের কোন কথা ভাবতে পেল না। অতিথিদের জন্য এইভাবেই অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত কনি। এটাই তার স্বভাব।

কিন্তু তার ঘরের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে কিছু ভাবতেই পারল না নিজের কথা। সে বুঝতেই পারল না কি সে ভাববে। আসলে লোকটা কি ধরনের? সে কি সত্যি সত্যিই তাকে পছন্দ করে? তবে খুব একটা বেশী বলে মনে হয় না। তবে লোকটার মধ্যে এক সরল মমতা আছে। নারীদেহের প্রতি একটা প্রচণ্ড আগ্রহ আছে যে আগ্রহের বশবর্তী হয়েই এক আশ্চর্য অশ্লীল নিবিড়তার সঙ্গে সে তার যোনিদেশকে অনাবৃত করে ফেলে তার সামনে। অবশ্য যদিও সে অন্য যে কোন নারীর সঙ্গে সঙ্গমের সময় এটা সে করত তবু এটা ভাল লেগেছে কনির। কনি তার কাছে সামান্য এক নির্বিশেষ নারীমাত্র; তাকে সে বিশেষভাবে দেখে নি।

তা না দেখুক, তবু লোকটার কামপ্রবৃত্তি প্রবল। আর সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ কিভাবে করতে হয় তা সে জানে। সেক্ষেত্রে একই সঙ্গে তার দেহ মন দুটোই এক অখণ্ড জৈব চেতনায় যেমন নিবিড় তেমনি তৎপর। এইটাই ভাল। কনির মধ্যে যে নারী আছে তার প্রতিই তার সমস্ত আগ্রহ এক নিবিড় উত্তাপে ফেটে পড়েছে। এর আগে কোন পুরুষ তার নারীসত্তার প্রতি এতখানি আগ্রহের উত্তাপে ফেটে পড়েনি। তারা সবাই এর আগে তার এই নারীসত্তার প্রতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখিয়ে এসেছে। তারা তার পদমর্যাদাকে সম্মান দেখিয়ে এসেছে। তারা লেডি চ্যাটার্লি বা কনস্ট্যান্স চ্যাটার্লিকে শ্রদ্ধা ও মমতা জানিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা কেউ তার যোনিদেশ ও জঠরের প্রতি এত মমতা, এত আগ্রহ দেখায়নি। সে বিশেষ মমতার সঙ্গে তার স্তনযুগল মর্দন করেছে, তার পাছায় হাত বুলিয়েছে।

পরের দিন বিকালে আবার বনে গেল কনি। তখন ধূসর হয়ে উঠেছে শেষ অপরাহ্নের আলো। হিজল গাছের পাতাগুলো সবুজ পারদের মত দেখাচ্ছিল। কনির মনে হচ্ছিল সমস্ত গাছগুলোর মধ্যে তাদের কুঁড়িগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক নীরব প্রস্তুতি চলছিল। এই সব বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে যে সবুজ প্রাণশক্তির অদৃশ্য তরঙ্গ গুঁড়ির ভিতর থেকে তার প্রতিটি শাখায় ও পাতায়

প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল, কনি যেন সেই তরঙ্গ বিদেশীর দেহের মধ্যেও অনুভব করল। তার মনে হচ্ছিল, রক্তের মত লাল একটা ঢেউ তার বুকের ভিতর থেকে উঠতে উঠতে সমস্ত আকাশকে প্লাবিত করে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার নীল শূন্যের সীমাহীন বিশালতায়।

বনের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পৌছল কনি। কিন্তু লোকটা সেখানে ছিল না। আজ অবশ্য সে তাকে পুরোপুরি প্রত্যাশা করেনি। ভেবেছিল সে হয়ত থাকবে না। কনি ঘরটার বাইরে বসে বসে দেখতে লাগল খাঁচার ভিতর মুরগীগুলো বসে আছে আর ছানাগুলো ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। একসময় সে কিছুই দেখছিল না। শুধু প্রতীক্ষা করে যাচ্ছিল। প্রত্যাশা করে যাচ্ছিল নীরবে। এইভাবে শুধু সময় কেটে যাচ্ছিল। স্বপ্নের মত এক চেতনাহীন দীর্ঘতায় প্রলম্বিত হচ্ছিল সময়টা। তবু সে এল না। এ সময় সে আসে না। তাকে এখন চলে যেতে হবে, কিন্তু যেতে গিয়েও যেতে পারছিল না। তাকে জোর করে উঠতে হলো। এখন চায়ের সময়, তাকে যেতে হবে।

কনি বাড়িতে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। সে ক্লিফোর্ডের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিফোর্ড বলল, আবার বৃষ্টি পড়ছে?

কনি তার টুপীটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, গুড়ি গুড়ি পড়ছে। খুবই সামান্য।

নীরবে চা ঢালতে লাগল কনি। মুখে কোন কথা বলল না। এক অনমনীয় কাঠিন্যে স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সে। লোকটার আশায় সে আবার গিয়েছিল সেখানে। সে দেখতে চেয়েছিল ব্যাপারটা স্বপ্ন না সত্যি।

ক্লিফোর্ড বলল, আজ কিছুটা পড়ে শোনাব তোমায়?

তার মুখপানে তাকাল কনি। সে কি কিছু বুঝতে পেরেছে? সে বলল, বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত লাগে আমার। আমি এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার যা খুশি। তবে কোনরকম অসুস্থবোধ করছ না ত?

না, শুধু কিছুটা ক্লান্ত। বসন্ত কাল এলে এমনি আমার হয়। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে কিছু খেলবে?

না, থাক।

ক্লিফোর্ডের কণ্ঠের মধ্যে এক অদ্ভুত অসন্তোষ ফুটে উঠল। কনি তা বেশ বুঝতে পারল। যাই হোক, সে উপরতলায় তার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে দূর বড় রাস্তা থেকে আসা মিহি গলায় লাউডস্পীকারে বলা কথার যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেল। বেগুনি রঙের তার একটা পুরনো চাদর টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিটা সাদা কুয়াশার এক অবগুণ্ঠনের মত জড়িয়ে ছিল

পৃথিবীটাকে। সে আবরণ সত্যিই কেমন রহস্যময়। কোন ঠাঁও ছিল না তার মধ্যে। পার্কের ভিতর দিয়ে যাবার সময় গরম করছিল কনির।

সমগ্র বনভূমি নিস্তব্ধ নিঝুম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে সেখানে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির এক কুয়াশাসুলভ আস্তরণ, স্ফুটনোন্মুখ প্রাণের উত্তাপে উত্তপ্ত একরাশ ডিম, অর্ধস্ফুট কুসুমকলির অবদমিত উচ্ছ্বাস, অর্ধবিকশিত ফুলের সুবাসিত হাসি—সব মিলিয়ে তীব্র করে তুলেছে যেন এই সান্ধ্য বনভূমির রহস্যময়তাকে। সমস্ত পোষাক খুলে অনাবৃত উলঙ্গ দেহে দাঁড়িয়ে আছে যেন বড় বড় গাছগুলো।

বনের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে গিয়ে কনি দেখল তখনও সেখানে সে আসেনি। মুরগীর ছানাগুলো তাদের মার কাছে ঢুকে গেছে প্রায় সব। শুধু দু একটা দুঃসাহসী ছানা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে খাঁচাটার আশপাশে।

সে তাহলে এখনো আসেনি। হয়ত ইচ্ছা করেই আসেনি। অথবা হয়ত কোন কাজে আটকে পড়েছে। কনি একবার ভাবল সে তার বাসায় গিয়ে দেখবে।

তবু সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। চাবি দিয়ে ঘরের তালাটা খুলল সে। ঘরখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে কম্বলের উপর শুয়েছিল সেটা ভাঁজকরা অবস্থায় এক জায়গায় রাখা আছে। যেখানে সে শুয়েছিল সেখানে চেয়ার টেবিলটা আবার রাখা হয়েছে।

দরজার কাছে একটা টুলের উপর বসে রইল কনি। চারদিক কী অদ্ভুত-ভাবে নিস্তব্ধ। সাদা কুয়াশার মত গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিকণাগুলো তেমনি নিঃশব্দে ঝরে পড়ছিল। তেমনি তরঙ্গহীনভাবে বয়ে যাচ্ছিল বাতাস। কোথাও কোন শব্দ নেই। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপক নিস্তব্ধতা ও নৈঃশব্দের মধ্যেও প্রাণ আছে। নিরুচ্চার নিরুচ্ছ্বাস এক প্রাণশক্তির নিঃশব্দ প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল আপাতনিষ্প্রাণ বনভূমির অন্তরালে। সেই অমিত অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে এক একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষের মত দাঁড়িয়ে ছিল বড় বড় গাছগুলো।

রাত্রি আরো ঘন হয়ে উঠছিল। তাকে এবার চলে যেতে হবে। ইচ্ছা করে সে নিশ্চয় এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে।

হঠাৎ সে এসে গেল সেই ফাঁকা জায়গাটায়। চামড়ার কালো জ্যাকেটটা ছিল তার গায়ে। বৃষ্টির জল পেয়ে সেটা চকচক করছিল। ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা একটু নত করে একটুখানি অভিবাদন জানিয়ে সে মুরগীদের খাঁচাটার কাছে গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে রাখল।

অবশেষে সব কাজ সেরে সে কনির কাছে এল। কনি তখনো সেইভাবে সেই টুলটার উপর বসেছিল। সে এসে কনির সামনে দাঁড়াল। সে বলল, আপনি তাহলে এসেছেন?

কনি তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল, হ্যাঁ।

কনি টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ভিতরে আসবে তুমি?

লোকটা কনির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, আপনি এভাবে রোজ এলে লোকে যা তা বলবে না?

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, কেন, আমি ত বলেছিলাম আমি আসব। কেউ জানে না এসব ব্যাপার।

সে বলল, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে সব জানবে। তারপর কি হবে?

কনি কোন উত্তর খুঁজে পেল না। পরে বলল, কেন তারা জানবে?

সে বলল, এসব কথা লোকে ঠিক জানতে পারে।

কনির ঠোঁটদুটো একটু কেঁপে উঠল। সে আমতা আমতা করে বলল, যাই হোক, আমি না এসে পারি না।

লোকটা গলার স্বরটা নিচু করে বলল, আপনি যদি চান তাহলে ঠিক আসা বন্ধ করতে পারেন।

কনি বলল, না, আমি তা চাই না।

লোকটা বনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অবশেষে আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু লোকে যদি জানতে পারে? একবার ভেবে দেখুন। ভেবে দেখুন তখন কত ছোট আপনি হয়ে যাবেন? আপনার স্বামীর সামান্য একজন চাকর আমি।

তার নিস্পৃহ মুখটার পানে আবার তাকাল কনি। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আসলে তুমি আমাকে চাও না। তাই নয় কি?

লোকটা আবার সেই একই কথা বলল, একবার ভেবে দেখুন যদি লোকে জানতে পারে, যদি স্যার ক্লিফোর্ড জানতে পারে? যদি সবাই একথা বলাবলি করতে থাকে?

ঠিক আছে আমি তাহলে পালিয়ে যেতে পারব।

কোথায়?

যেখানে হোক। আমার টাকা আছে। আমার মা আমার জন্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড গচ্ছিত রেখে গেছে। ক্লিফোর্ড সে টাকা ছুঁতে পারবে না। আমি তা নিয়ে দূরে যেখানে হোক পালিয়ে যেতে পারি।

লোকটা বলল, কিন্তু আপনি নিশ্চয় চলে যেতে চান না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চাই। আমি কোন লোকনিন্দা গ্রাহ্য করি না।

আপনি বলছেন বটে, কিন্তু আপনাকে একদিন গ্রাহ্য করতে হবে। সবাইকে তা করতে হয়। আপনি মনে রাখবেন ম্যাডাম, আপনি সামান্য একজন শিকার রক্ষকের সঙ্গে প্রেম করছেন। তার মানে আমি ভদ্রলোক নই। আপনাকে একদিন লোকনিন্দা গ্রাহ্য করতেই হবে।

আমি করব না। আমার উপাধির সম্মান বা মর্যাদা আমি চাই না। আমি জানি লোকে যখন আমাকে লেডি বলে সম্বোধন করে তখন তাদের কণ্ঠের মধ্যে বিদ্রূপের ভাব ফুটে ওঠে। হ্যাঁ সত্যিই তাই। এমন কি তুমিও বিদ্রূপের সঙ্গে একথা উচ্চারণ করো।

আমি?

এবার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কনির মুখপানে তাকাল লোকটা। বলল, আমি আপনাকে কখনো উপহাস করিনি।

সে দেখল কনির পানে তাকাতে গিয়ে সে যেন চোখে অন্ধকার দেখছে। সে বলল, এইভাবে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভয় হয় না?

তার কণ্ঠে সতর্কতাসূচক এক অনুনয়ের ভাব ছিল।

কনি বলল, ভয় আমি কেন করব? আমার কোন কিছু হারাবার ভয় নেই। তুমি যদি জানতে আমার কথা তাহলে বুঝতে কত খুশি আমি এতে হব। তুমি কি ভয় পেয়ে গেছ?

সে বলল, হ্যাঁ, আমি ভয় করি। সমাজের ভয়, লোকনিন্দার ভয়।

কনি বলল, কিন্তু আসল ভয়টা কিসের?

সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, কত কি বাধা।

সহসা সে নত হয়ে কনির মুখে চুম্বন করল। তারপর বলল, না, আমিও কোন কিছু গ্রাহ্য করি না। আমরা যা করার করে যাব। চুলোয় যাক সব। তবে আপনি যেন আপনার কৃতকর্মের জন্য কোন অনুশোচনা না করেন পরে।

কনি বলল, আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিও না।

কনির গালে আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে আবার চুম্বন করল তাকে। বলল, তাহলে ঘরে যাই চলুন। আপনার চাদরটা খুলে ফেলুন।

এরপর সে বন্দুকটা ঝুলিয়ে রেখে তার জ্যাকেটটা খুলে কম্বলটা মেঝের উপর পেতে দিল। বলল, আমি আর একটা কম্বল এনেছি। দরকার হলে ঢাকা দেব।

কনি বলল, আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। সাড়ে সাতটায় রাতের খাওয়া হবে।

লোকটা তার হাতঘড়িটা দেখে বলল, ঠিক আছে।

এই বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা লণ্ঠনটা জ্বালল। বলল, একবার আমরা অনেকক্ষণ থাকব।

এরপর সে কনির দেহটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে তার পোষাকটা খুলে দিল। একটা পেটিকোট ছাড়া আর কিছুই রইল না কনির সারা দেহের মধ্যে। কনির কোমর আর পাছার উপর হাত বোলাতে বোলাতে সে বলল, এই জায়গাটা ছুঁতে কী মজা! তারপর মাথা নত করে কনির পেট আর দুটো জানুর উপর তার গালটা ঘষতে লাগল। তার এই আনন্দ দেখে

আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। কনি বুঝতে পারল না, তার এই ঐ সব গোপনাঙ্গের মধ্যে লোকটা কী এমন সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছে যা আনন্দের এমন এক গভীর আবেগ জাগাতে পারল তার মধ্যে। তার এই ধরনের শৃঙ্গারে কনির মধ্যেও কামনার আবেগ জেগে ওঠে। দুর্বার কামনার এই আবেগ যেখানে মরে যায় অথবা অনুপস্থিত থাকে কোন কারণে, যেখানে দুটি দেহের নিবিড় স্পর্শ ও ঘর্ষণজনিত উত্তাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক মধুর সৌন্দর্য দুর্বোধ্য ও অনমুভূত রয়ে যায়। এ সৌন্দর্য যে কোন দৃশ্যমান সৌন্দর্যের থেকে গভীর। যতই সে তার গালটা কনির পেট জানু আর জঙ্ঘার উপর ঘষতে লাগল ততই এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কনির হাঁটু দুটো। তার অনাবৃত নিম্নাঙ্গের মধ্যে এক অদ্ভুত কম্পন অনুভব করছিল সে। লোকটার এই ধরনের শৃঙ্গারের আতিশয্যে সত্যিই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল কনি। এই ধরনের শৃঙ্গারের মধ্য দিয়ে তার নারীদেহের এক অতলান্তিক রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চাইছে যেন সে। তবু কনি যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

অবশেষে লোকটি যখন কনির উপর উপগত হলো, একই সঙ্গে এক শ্রম ও তৃপ্তিসূচক অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তার দেহের রহস্যে ডুবে গেল, কনি তখনো কিন্তু কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল। তখনো সে একটা বিচ্ছিন্নতা, একটা ব্যবধান অনুভব করছিল লোকটার সঙ্গে। লোকটা তার সারা অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে থাকলেও সে একাত্ম হয়ে উঠতে পারছে না তার সঙ্গে। হয়ত এই নিবিড় দেহসংসর্গের অন্তরালে এক মানসিক বিচ্ছিন্নতাই সে চায়। এইটাই হয়ত তার বিধিনির্দিষ্ট। কনি এ ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে নিথর হয়ে শুয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে সব কিছু অনুভব করতে লাগল কনি। লোকটার দ্রুতগতি অঙ্গসঞ্চালন, তার যৌনাবেগের গভীরতা, বীর্যস্খলন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রবল বিকম্পন—আপন অঙ্গের মধ্যে একে একে সব অনুভব করল কনি। সহসা লোকটার অঙ্গসঞ্চালনের গতিটা মন্থর হয়ে যায়। সব পুরুষেরই তাই হয়। যে কোন রতিক্রিয়াকালে বীর্যস্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সব পুরুষেরই যৌন তৎপরতা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে। আর তখন তাদের সেই স্তিমিতপ্রায় তৎপরতা হাস্যাস্পদ মনে হয় কনির কাছে। তখন যে নারী সেই রতিক্রিয়ায় তাদের সঙ্গিনী হয় তার কাছে তাদের পাছার ক্লান্তস্তিমিত ওঠানামা আশ্চর্য রকমের হাস্যকর বলে মনে হয়। ঠিক এই সময় যে কোন নারীর কাছে যে কোন পুরুষ হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

কনি তবু কোনরূপ সক্রিয়তা দেখাল না। লোকটার যৌন তৎপরতা একেবারে শেষ হয়ে গেলেও কনি তার চরম তৃপ্তিলাভের জন্য কোনরূপ তৎপরতা দেখাল না। মাইকেলিসের সঙ্গে সঙ্গমকালে যা সাধারণতঃ সে করত। তার দুচোখ জলে ভরে এল এবং চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল।

লোকটাও কনির উপর স্থির হয়ে শুয়ে রইল। কনির দেহটাকে শক্ত করে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে তার নগ্ন পাগুলোকে নিজের পা দিয়ে চেপে সেগুলোকে গরম করার চেষ্টা করে শুয়ে রইল লোকটা।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল কনিকে, আপনার শীত লাগছে ?

লোকটা কত কাছে রয়েছে কনির। দেহগত নিবিড়তার এক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাদের দুটি অঙ্গ। তবু কনি তার কাছ থেকে মনে মনে কত দূরে।

কনি উত্তর দিল, না, আমাকে এখনি চলে যেতে হবে।

লোকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কনিকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল। তারপর আবার তার উপর শান্তভাবে শুয়ে পড়ল। কনির চোখের জল সে দেখতে পায়নি। তার মানসিক ব্যবধানটা ধরতে পারেনি। সে ভেবেছিল কনি একাত্ম হয়ে আছে তার সঙ্গে। তার দেহটার মত তার মনটাকেও পেয়ে গেছে তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

কনি আবার বলল, আমাকে এবার যেতে হবে।

এবার সে উঠে পড়ল কনির বুক থেকে। তার জঙ্ঘাদুটোর মাঝখানে নরম জায়গাটায় একবার চুম্বন করল। তারপর তার পোষাকটা টেনে ঠিক করে দিল। এবার নিজে দাঁড়িয়ে কনির সামনেই পোষাকটা পরল।

অবশেষে সে কনিকে বলল, একবার আমার বাসায় আসুন।

কনির মুখপানে আন্তরিকতার এক উত্তাপ নিয়ে সহজভাবে তাকাল সে।

কনি তবু কোন কথা বলল না। কোন নড়াচড়া করল না। শুধু স্থির হয়ে তেমনি করে শুয়ে রইল। মনে মনে বলতে লাগল, ও আজও আমার কাছে বিদেশীমাত্র। একজন বিদেশী। লোকটার উপর কিছুটা রাগও হলো তার।

লোকটা এদিকে পোষাক পরে টুপী মাথায় দিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে কনিকে বলল, চলুন। কনির পানে তেমনি সহজ আন্তরিকতার ভঙ্গিতে তাকাল।

ধীরে ধীরে উঠে বসল কনি। তার যেতে ইচ্ছা করছিল না। আবার থাকতেও বিরক্তিবোধ হচ্ছিল।

লোকটা তাকে ধরে উঠিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল। বাইরে তখন ঘন ঘোর অন্ধকার। তার কুকুরটা দরজার বাইরে বসেছিল এতক্ষণ। তার প্রভুকে বার হতে দেখে খুশি হলো সে। বাইরে তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল।

লোকটা বলল, লণ্ঠনটা সঙ্গে নিই, এখন কেউ কোথাও নেই।

সে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে কনির আগে আগে সরু পথটা দিয়ে চলতে লাগল। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় শুধু পথের দুপাশের ভিজে ঘাস আর বড় বড় গাছগুলোর ভিজে কালো কালো গুঁড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। এ ছাড়া আর সব কিছুই

নিবিড় নিঃসীম অন্ধকার আর কুয়াশায় ভরা।

লোকটা আবার বলল, আমার বাসায় একদিন আসবেন।

কথাটার এই পুনরাবৃত্তি কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল কনির কানে। তাদের মধ্যে যখন এখনো কোন সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠেনি, তার কথা যখন কনি ঠিকমত বুঝতে পারে না তখন লোকটা বার বার তার বাসায় যেতে বলছে কেন? তাছাড়া সে কথাটা এমনভাবে বলছে যাতে মনে হচ্ছে সে যেন যে কোন এক নারীকে সম্বোধন করে বলছে, কনি নামে বিশেষ কোন নারীকে বলছে না কথাটা।

লোকটা বলল, এখন স' সাতটা বাজে।

ওরা ততক্ষণে পার্কের গেটের কাছে উঁচু চড়াটার কাছে এসে পড়েছে। লোকটা বলল, এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে।

সে আলোটা নিবিয়ে দিল। হাত দিয়ে কনির গাটাকে জড়িয়ে ধরল আলতোভাবে।

আলোটা নিবিয়ে দিতেই ভীষণভাবে ঘন হয়ে উঠল চারদিকের অন্ধকারটা। সেই অন্ধকারের চাপে রহস্যময় ঠেকতে লাগল তাদের পায়ের তলার মাটিটা। কিন্তু লোকটা তাতে অভ্যস্ত। এই অন্ধকারে বনপথের মধ্য দিয়েই হেঁটে যাবে ও। কিন্তু কনির অসুবিধা হতো বলেই ও তাকে ইলেকট্রিক টর্চটা দিল। ও বলল, পার্কের ভিতর অন্ধকারটা অনেক পাতলা। তবু যদি ভয় লাগে তাই এই আলোটা রেখে দাও।

পার্কের ভিতরে সত্যিই অন্ধকারটা কম দেখাচ্ছিল। কারণ সেখানে তথা-কথিত উন্নতির ভূতুড়ে আলোর কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে। সহসা লোকটা সবেগে কনিকে চেপে ধরল বুকের উপর। তার জামার ভিতর হাতটা চালিয়ে দিয়ে তার গরম গাটায় হাত বোলাতে লাগল। বলল, আপনার মত মেয়েকে স্পর্শ করার জন্য আমি মরতে পারি। আর এক মিনিট যদি আপনি অপেক্ষা করতেন।

লোকটা তাকে চাইছে। তাকে চাওয়ার জন্য তার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণের বেগ অনুভব করল কনি। তবু বলল, না, আমাকে যেতে হবে। আর দেরী করলে মোটেই চলবে না।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে 'ঠিক আছে' বলে কনিকে যেতে দিল। কনিও যাবার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু যেতে গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে মুখটা বাড়িয়ে বলল, আমাকে চুম্বন করো।

লোকটা হেঁট হয়ে কনির চোখের উপর একটা চুম্বন করল। কিন্তু সে তার মুখটা বাড়িয়ে দিল। লোকটা তখন তার মুখের উপর খুব আলতোভাবে একটা চুম্বন করল। কোন মেয়ের মুখে চুম্বন করতে সে চায় না। ঘৃণা বোধ হয় তার।

কনি এবার যাবার জন্য পিছন ফিরে বলল, আমি কাল আবার আসব। যদি পারি।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, বেশী দেরী করবেন না। এই বলে সেও পিছন ফিরে অন্ধকারে পথ হাঁটতে শুরু করল। কনি তাকে আর দেখতে পেল না।

কনি বলল, শুভরাত্রি।

লোকটাও উত্তর দিল, শুভরাত্রি ম্যাডাম।

কনি ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে বলল, ওকথা কেন বললে?

লোকটা সংশোধন করে বলল, ঠিক আছে শুভরাত্রি।

এবার অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেল কনি। বাড়ি পৌঁছে দেখল, পাশের দিকের দরজাটা খোলা রয়েছে। সেইদিক দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল কনি। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজের মনে মনে বলল, আমাকে অবশ্যই স্নান করতে হবে। তবে আর দেরী করব না মোটেই। এটা সত্যিই বিরক্তিকর।

পরদিন আর বনে গেল না কনি। তার বদলে সে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আথওয়েট দিয়ে বেড়াতে গেল। ক্লিফোর্ড আজকাল প্রায়ই গাড়িতে করে বেড়াতে যায় এবং একজন শক্তিমান যুবককে ড্রাইভার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এই ড্রাইভার তাকে ধরে গাড়িতে উঠতে বা গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করতে পারে। আসলে ক্লিফোর্ড আজ তার ধর্মপিতা লেসলি উইন্টারকে দেখতে যাচ্ছিল। তিনি থাকেন আথওয়েটের অদূরে লিপলে হল নামে একটা জায়গায়। লেসলি উইন্টারের এখন বয়স হয়েছে। তিনি এখন কয়লাখনির ধনী মালিকদের অন্যতম। রাজা এডওয়ার্ডের আমলে উইন্টার প্রচুর উন্নতি করেন। একাধিকবার শিকার করতে গিয়ে রাজা এডওয়ার্ড লিপলে হলে ছিলেন। হলটা ছিল চমৎকার। চমৎকারভাবে সাজানো। লেসলি উইন্টার ছিলেন অবিবাহিত লোক। উইন্টার তাঁর বলার ভঙ্গিমার জন্য গর্ববোধ করেন। কিন্তু করলে কি হবে এই গোটা অঞ্চলটাই কোলিয়ারীতে ভরা। লেসলি উইন্টার ক্লিফোর্ডকে কিছুটা পছন্দ করলেও, তার ছবি প্রায়ই সচিত্র পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য তাকে শ্রদ্ধা করতেন না। উইন্টার ছিলেন রাজা এডওয়ার্ডের মত ও মনোভাবের লোক। তিনি সব সময় জীবনকে জীবন বলেই ভাবতেন এবং তাঁর মতে জীবনকে যারা উপভোগ করতে জানে বিচিত্রভাবে, তারাই মানুষ। লেসলি উইন্টার কনির প্রতি যথার্থ বীরের মত উদার ও সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, কনি মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু ক্লিফোর্ডের কাছে থেকে শুধু শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার জীবনটা। সে কোনদিন র‍্যাগবির কোন উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে পারবে না। তাঁর নিজেরও কোন উত্তরাধিকারী নেই।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল কনি। উইন্টার যদি একথা শোনেন যে

ক্লিফোর্ডের সামান্য এক শিকার রক্ষক তার সঙ্গে সহবাস করছে এবং তাকে তার বাসায় যেতে বলেছে তাহলে কি বলবেন উইণ্টার? তিনি নিশ্চয় কনিকে ঘৃণা করবেন, তাকে হীন ভাববেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে যত সব আপাত-উদ্ধত শ্রমিকদের ঘৃণার চোখে দেখেন। কনি ঠিক অভিজাত সমাজের না হলেও তার অঙ্গলাবণ্যের মধ্যে একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। এটা নিয়তির দান। উইণ্টার কনিকে 'প্রিয় বৎসে' বলে ডাকত এবং কথায় কথায় তাকে অষ্টাদশ শতকের অভিজাত সমাজের মহিলাদের একটা ছবি তার সামনে ফুটিয়ে তুলত। এবং সেটা করা হত কনির অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কিন্তু কনি তখন ভাবছিল সেই লোকটার সঙ্গে তার সহবাসের কথা। লেসলি উইণ্টার আর যাই হোক, তাকে এক স্বতন্ত্র মানুষ অর্থাৎ আর পাঁচজন থেকে পৃথক করে দেখে। তাকে আর পাঁচজন নারীর সঙ্গে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেখে না।

কনি সেদিন বা তার পরদিন বা তার পরদিনও বনে গেল না। লোকটা তাকে চাইছে, তাকে নিবিড়ভাবে কামনা করছে একথা যতই ভাবছিল ততই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু চতুর্থ দিন এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। দারুণভাবে অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন। তবু বনে গিয়ে তার সেই লোকটার কাছে তার নিম্নাঙ্গটা খুলে দিতে মন উঠছিল না। বনে না গিয়ে কিভাবে সময়টা কাটাবে তা নিয়ে অনেক ভাবল সে। সে শেফিল্ড দিয়ে বেড়াতে যেতে পারে, কারো বাড়ি দিয়েও বেড়াতে যেতে পারে। কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হলো না তার। অবশেষে সে বেড়াতে বার হলো, কিন্তু বন দিয়ে নয় পার্কের উল্টো দিক দিয়ে পথটা ধরে মেয়ারহে দিয়ে বেড়াতে গেল। পার্কের অন্য দিকে লোহার গেটটা পার হয়ে চলে গেল কনি। কোন দিকে না তাকিয়ে একমনে এগিয়ে চলল। সে কি ভাবছে মনে তাই সে জানে না। পথের দুপাশের কোন বস্তুর প্রতি নজর ছিল না তার। সহসা একটা কুকুরের জোর চিৎকারে হুঁস হলো তার।

কনি দেখল, মেয়ারহে খামারে এসে পড়েছে সে। খামারটা শুরু হয়েছে র‍্যাগবির সীমানাঘেরা বেড়াটার পাশ থেকে। খামারটা এত কাছে হলেও এদিকে বড় একটা আসে না কনি।

চিৎকার করতে থাকা বড় সাদা কুকুরটাকে কনি বলল, বেল, তুমি আমাকে ভুলে গেছ? তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?

কুকুরটা তেড়ে আসছিল কনিকে দেখে। কনি কুকুরকে ভয় করে। তার গলার শব্দ পেয়ে কুকুরটা সরে গিয়ে গর্জন করতে লাগল। কনি খামারটা পার হয়ে যেতে চাইছিল।

খামারবাড়ি থেকে মিসেস ফ্লিণ্ট বেরিয়ে এল। মিসেস ফ্লিণ্টের বয়সটা কনির মতই। আগে মাষ্টারি করত। কিন্তু কনির মনে হয় মেয়েটা একেবারে

অপদার্থ।

কনিকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল মিসেস ফ্লিন্ট। বলল, ও, লেডি চ্যাটার্লি! বেল, বেল, তুই লেডি চ্যাটার্লিকে দেখে চীৎকার করছিস?

হাতে একটা সাদা কাপড় ছিল। তাই নিয়ে কুকুরটাকে তেড়ে গেল মিসেস ফ্লিন্ট। তারপর কনির কাছে এল।

কনি বলল, ও আমাকে একদিন চিনত।

বেল ওকে সত্যিই চিনত। কারণ ফ্লিন্টরা আগে চ্যাটার্লিদের প্রজা ছিল।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, নিশ্চয় চিনত। ও চেনে আপনাকে। তবে এমনি ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ও অনেক আগে দেখেছে আপনাকে। আশা করি আপনি ভালই আছেন।

কনি বলল, ধন্যবাদ। আমি ভালই আছি।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, আপনাকে আমরা সারা শীতটা দেখিনি। দয়া করে ভিতরে আসুন। আমাদের বাচ্চাটাকে দেখুন।

কনি কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিক আছে। মিনিট খানেকের জন্য যেতে পারি।

মিসেস ফ্লিন্ট আগে ঘর পরিষ্কার করার জন্য ছুটে গেল বাড়ির ভিতরে। কনি ধীর গতিতে তার পিছু পিছু গেল। রান্না ঘরে কেটলিতে জল ফুটছিল।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, দয়া করে ভিতরে আসুন।

কনি গিয়ে দেখল বাচ্চাটা খুবই ছোট; তার বাবার মত মাথায় কটা বাদামী রঙের চুল। কনি দেখল বাচ্চাটা মেয়ে, কাঁথা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঘরের মধ্যে দশ বছরের একটা মেয়ে কনিকে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ছিল।

কনি বলল, বাঃ, চমৎকার হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খুব ভাল মেয়ে হয়ে উঠবে।

মিসেস ফ্লিন্ট বাচ্চাটাকে বলতে লাগল, জোসেফিন, দেখছ, কে তোমাকে দেখতে এসেছে—লেডি চ্যাটার্লি। তুমি জান লেডি চ্যাটার্লিকে?

মেয়েটার যখন জন্ম হয় তখন কনি ওদের একটা শাল আর খেলনার হাঁস দিয়েছিল।

তার মার কথা শুনে মেয়েটা কনির দিকে হাসিমুখে তাকাল।

কনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমার কাছে আসবে?

কনি তাকে দুহাত দিয়ে নিজের কোলে তুলে নিল। কচি বাচ্চা কোলে তুলে নিতে সত্যিই ভাল লাগে কনির। তার গাটা কত নরম, কেমন ঈষদুষ্ণ।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, আমি এক কাপ চা করছিলাম। লিউক বাজারে গেছে। খাবেন এক কাপ চা? আপনারা অবশ্য এ ধরনের চা খান না?

কনির খেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু অনুরোধে পড়ে খেল।

মিসেস ফ্লিণ্ট টেবিলটা ভাল করে পরিষ্কার করে ভাল কাপ বার করে যত্ন করে চা দিল কনিকে।

কনি বলল, তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

মিসেস ফ্লিণ্ট যখন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছিল কনি তখন মেয়েটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। তার নরম ঈষদুষ্ণ পাটা টিপে অদ্ভুত এক জৈব আনন্দ লাভ করতে লাগল। এত ছোট্ট একটা প্রাণী, তবু কত নির্ভীক। অথচ বড় মানুষরা তার তুলনায় সব সময় কত ভীতু।

কনি এক কাপ কড়া চা, কিছু ভাল রুটি আর মাখন খেল। তার খাওয়া দেখে মিসেস ফ্লিণ্ট আনন্দের উত্তেজনায় এমনভাবে লাফাতে লাগল যাতে মনে হবে সে যেন এক বীর নাইট। খাবারের পর তারা দুজনে গল্প করতে লাগল।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, এ চা আপনাদের ভাল লাগবে না।

কনি বলল, সত্যি বলছি, বাড়ির চা থেকে কোন অংশে কম নয়।

কথাটা শুনে খুশি হলো মিসেস ফ্লিণ্ট। কনি এবার উঠে পড়ল। বলল, আমাকে এবার যেতে হবে। আমি কোথায় আমার স্বামী তা জানেন না। তিনি ভাববেন আমার জন্য।

মিসেস ফ্লিণ্ট হেসে বলল, আপনি এখানে এসেছেন একথা তিনি ভাবতেই পারবেন না।

কনি বাচ্চাটাকে বলল, 'বিদায় জোসেফিন!' এই বলে তাকে চুম্বন করল।

মিসেস ফ্লিণ্ট তালাবদ্ধ দরজা খুলে দিতে চাইল। কিন্তু কনি বলল সে ওদের সামনের দিকের বাগানটার ভিতর দিয়ে যাবে। ছোট্ট বাগানটায় গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল কনির। কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে বাগানটাকে উজ্জ্বল করে। মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, কিছু ফুল নিয়ে যান।

মিসেস ফ্লিণ্ট কিছু ফুল তাকে দিতেই কনি বলে উঠল, থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

মিসেস ফ্লিণ্ট বলল, কোন দিকে যাবেন মনে করেছেন?

কনি বলল, ওয়াবেনের গেট দিয়ে।

কিন্তু গেটটা বোধ হয় এখন তালাবদ্ধ। আপনাকে উপর দিয়ে উঠে পার হতে হবে।

কনি বলল, আমি উঠতে পারব।

চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কিছুটা যাই।

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে একটা শূন্য প্রান্তরে এসে পড়ল। চারদিকে মানুষচলা পায়ের চাপে মাঠের ঘাস প্রায় সব উঠে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠটার আশেপাশে দু একটা গাছে ফিরে আসা পাখির দল তাদের একচ্ছত্র নৈশ আধিপত্যের কথা ঘোষণা করছিল কিচমিচ শব্দে। গরুর পাল ধীর গতিতে

বাড়ি ফিরছিল প্রান্তরটার উপর দিয়ে। একদল লোক একটা গরুকে ডাকছিল।

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, আজ গাই দোয়াতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওরা জানে লিউক হয়ত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন না হওয়া পর্যন্ত আসবে না।

ওরা দুজনে বেড়ার কাছে এসে পৌছল। বেড়ার ধার থেকে ফার গাছের বনটা ঘন হয়ে উঠেছে। মিসেস ফ্লিন্ট বলল, ঐটা শিকার রক্ষকের দুধের বোতল। আমরা এটা এখানে খালি রেখে যাই। ও একসময় এসে নিয়ে যায়।

কনি বলল, কখন আসে?

মিসেস ফ্লিন্ট বলল, প্রায়দিন সকালে। ঠিক আছে চলি, বিদায় চ্যাটার্লি, দয়া করে আবার আসবেন। আপনি এলে খুব ভাল লাগে।

বেড়ার মাঝখানে গেটটা তালাবন্ধ থাকায় কনি বেড়াটা ডিঙিয়ে পার হলো। ওপারে গিয়ে একটা সরু পথ ধরল সে। ওদিকে মিসেস ফ্লিন্ট তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

বনের এইদিকটা মোটেই ভাল লাগে না কনির। এদিকে বনটা দারুণ ঘন থাকায় এখানে তার মনে হয় শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। মনে হয় বনটা ভয়ঙ্কর। মিসেস ফ্লিন্টের বাচ্চা মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল কনি। তার মনে হলো মেয়েটার পা দুটো তার বাবার মত একটু বাঁকা হবে ধনুকের মত। সে যাই হোক, কচি ছেলের নরম তুলতুলে ঈষদুষ্ণ দেহটা কোলে তুলে নিতে বা বুকে ধরে টিপতে কত ভাল লাগে। এই জন্যই হয়ত মিসেস ফ্লিন্ট সন্তানগর্বে গরবিনী, আর এই জন্যই হয়ত সে মিসেস ফ্লিন্টকে ঈর্ষা না করে পারে না। যে সন্তান তার নেই এবং কোনদিন হবে না সেই সন্তানভাগ্যে মিসেস ফ্লিন্টকে ভাগ্যবতী দেখে একই সঙ্গে আনন্দ ও ঈর্ষা অনুভব না করে পারে না সে।

হঠাৎ সব চিন্তা ঝেরে ফেলে ভয়ে চিৎকার করে উঠল কনি। একটা মানুষ বনের মধ্যে তার পথের সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল লোকটা আর কেউ নয়, শিকার রক্ষক।

শিকার রক্ষকও কনিকে এখানে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠল। বলল, এখানে কি করে আসা হলো?

কনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি কেমন করে এলে?

আপনি কি কুঁড়েটায় গিয়েছিলেন?

না না, আমি মেয়ারহে গিয়েছিলাম।

তার অদ্ভুত সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল লোকটা, আপনি তাহলে কুঁড়েতে যাচ্ছেন ত?

কনি বলল, না না, আমি মেয়ারহেতে অনেকক্ষণ ছিলাম। আমি কোথায় আছি তা কেউ জানে না। আমাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

লোকটা মৃদু হেসে বলল, আমাকে এইভাবে ফাঁকি দিয়ে?

কনি মুখটা লজ্জায় একটু নত করে বলল, না না, ঠিক তা নয়, শুধু…

সে বলল, তাছাড়া আর কি হতে পারে?

লোকটা কনির খুব কাছে এসে তার কোমরে হাত রাখল। এমনভাবে সে কনির গা ঘেঁষে দাঁড়াল যে তার উত্থিত যৌনাঙ্গের জারজ উচ্ছ্বাসটা কনি বেশ অনুভব করতে পারল।

কনি বলল, এখন না। এই বলে কনি তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটা জোর করে চেপে ধরে বলল, কেন না? এখন মাত্র ছটা। আপনার যেতে সময় লাগবে মাত্র আধ ঘণ্টা। এখনও অনেক সময় আছে।

কনি বুঝতে পারল লোকটা দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কনির সমগ্র নারীসত্তাটা তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুদিকে যাচ্ছিল। একদিকে সে লোকটার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিল। কিন্তু আর একদিকে কোনরূপ বাধা দিতে না পেরে লোকটার কাছে বিলিয়ে দিতে চাইছিল নিজেকে অবাধে।

চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বলল, এখানে আসুন।

এই বলে সে কনির হাত ধরে কিছু কাঁটাগাছের পাশ দিয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল।

কনি একবার লোকটার দিকে তাকাল। দেখল, তার মুখটা কেমন কড়া হয়ে উঠেছে। কেমন যেন কামনায় কঠোর। সে মুখে ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। তবু কনি তার বুকের উপর কেমন যেন বোঝা অনুভব করল। সে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হলো।

কনিকে যে ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে গেল সেখানে কতকগুলো শুকনো গাছের গুড়ি পড়ে ছিল। এক জায়গায় তার থেকে দুটো ডাল ফেলে তার উপর নিজের কোট আর ওভারকোটটা পেতে তার উপর শুইয়ে দিল কনিকে। কনিকে ঠিকমত শুইয়ে দিয়ে তারপর তার নিম্নাঙ্গটা অনাবৃত করে দিল লোকটা। তারপর নিজের দেহের সামনের দিকটা অনাবৃত করল।

মুহূর্তমধ্যে লোকটার অনাবৃত দেহের নরম মাংসটা নিজের অঙ্গের মধ্যে অনুভব করল কনি। কনি আরও অনুভব করল লোকটার শক্তোত্থিত যৌনাঙ্গটা তার গর্ভদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রথমে নিশ্চল হয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর সজোরে অঙ্গ সঞ্চালন করতে লাগল লোকটা। এক সুনিবিড় রতিতৃপ্তির পুলকিত রোমাঞ্চের অসংখ্য ঢেউ খেলে গেল কনির সারা অঙ্গে। নিষ্ক্রিয়ভাবে সে পড়ে থাকলেও তার অজানিতেই তৃপ্তিসূচক এক শীৎকারধ্বনি বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে।

কিন্তু সে তৃপ্তি শুধু ক্ষণিকের জন্য। পুলকিত রোমাঞ্চের সে তরঙ্গের বেগ বড় ক্ষণভঙ্গুর। কনির মনে হলো, শিথিল হয়ে আসছে সেই যৌনাঙ্গের

সকল উচ্ছ্বসিত কাঠিন্য। তবু কনি তৎপর হলো না মোটেই। নিজের চরম তৃপ্তিলাভের জন্য একটুখানি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত সে। তৎপর হয়ে উঠতে পারত কিছুটা। কিন্তু কিছুই করল না কনি। শুধু এক তৎপরতাহীন নিষ্ক্রিয়তায় নীরবে শুয়ে থেকে সে তৃপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করে যেতে লাগল। অবশেষে কনি অনুভব করল লোকটা হয়ত উঠে পড়বে এখনি; চরম তৃপ্তি পাবার আগেই হতাশ হতে হবে কনিকে আর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি আসার দেরী নেই। আর এই কথাটা ভাবতে ও অনুভব করতেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা বেদনায় হিম হয়ে উঠল। তবু সে কিছুই করল না। একটুও তৎপর হল না। শুধু তার রসসিক্ত উন্মুক্ত গর্ভদ্বার তাকে চরম তৃপ্তিদানের জন্য নীরবে আহ্বান জানাতে লাগল লোকটার পুরুষাঙ্গটিকে। সে পুরুষাঙ্গটি যেন আবার নতুন উদ্যমে এক চরম রতিক্রিয়ায় মেতে উঠুক কনি এটা চায়। সহসা কনি লোকটাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল লোকটার শিথিল হয়ে আসা পুরুষাঙ্গটি ধীরে ধীরে আবার শক্ত হয়ে উঠছে তার মধ্যে। আবার সেই পুরুষাঙ্গটি এক উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত কাঠিন্যে এক ছন্দায়িত গতিশীলতায় সঞ্চালিত হতে লাগল তার জঠরাভ্যন্তরে। কনির জৈবচেতনার সব ফাঁক পূরণ করে দিয়ে, তার মনের মধ্যে মধুর সংবেদনের এক ঘূর্ণিচক্র সৃষ্টি করে, তার সমস্ত অনুভূতিকে নিঃশেষে বিগলিত করে তার গর্ভের গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে সঞ্চালিত হতে লাগল সেই জীবন্ত পুরুষাঙ্গটা। চুপচাপ শুয়ে রইল কনি। তার অস্তিত্বের গভীর হতে এক অব্যক্ত ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল অস্ফুটভাবে। যেন কোন সাধারণ শব্দ নয়, ধ্বনি নয়, নিথর নিস্পন্দ প্রাণহীন কোন রাত্রির গভীর হতে উঠে আসা এক নবজাত প্রাণের উল্লাস। এদিকে কনির গর্ভে লোকটার প্রাণবীর্য স্খলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন তার এক অশ্রুত ধ্বনি শুনতে পেল। বীর্য স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে লোকটা শিথিল হয়ে ঢলে পড়ল কনির বুকে আর কনি যে বাহুবন্ধনে লোকটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল সে বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। কনিও লোকটার মতই স্থির হয়ে পড়ে রইল। অবশেষে লোকটা হঠাৎ তার নগ্নতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সে উঠে পড়ল। কনি বুঝতে পারল তার বুকটা খালি আর শূন্য হয়ে পড়েছে। তার মনে হলো লোকটা যেন তার বুক জুড়ে যুগ যুগ ধরে শুয়ে থাকে, কোনদিন কখনো উঠে না যায়।

লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যিই উঠে গেল। কনিকে চুম্বন করে পোষাকটা তার উপর টেনে দিল। তারপর নিজে পোষাক পরল। কনি তবু উঠল না, যে গাছটার তলায় শুয়ে ছিল তার ডালপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কনি উঠতে পারছিল না। লোকটা পোষাক পরে চারদিকে তাকাল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় আরো স্তব্ধ হয়ে উঠেছে সমগ্র বনভূমি। শুধু লোকটার কুকুরটা থাবা গেড়ে বসে সব কিছু দেখছিল।

লোকটা কনির পাশে বসে তার একটা হাত ধরল। কনি কোন কথা বলল না। লোকটা বলল, কত লোকে এইভাবে চলে, তাদের কথা কেউ জানে না।

কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত কথাগুলো বলল। কনি তার এক ভাবনায় বিষাদে ভরা মুখখানার পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

কিছু পরে কনি বলল, তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি খুশি ত?

লোকটা কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল, খুশি? হ্যাঁ তবে কিছু মনে করি না।

লোকটা চায় না এ বিষয়ে কনি কোন কথা বলুক। সে নীরবে নত হয়ে কনিকে আবার চুম্বন করল। কনিব মনে হলো ও তাকে চিরকাল এইভাবে যেন চুম্বন করে যায়।

এবার উঠে বসল কনি। এক সবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বলল, আচ্ছা প্রায় লোকই কি ভালবাসতে বাসতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?

বেশীর ভাগই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কথাটা না ভেবেই বলল সে। সে আবার নারীর সংসর্গে এসে পড়েছে, এ জন্য একটা ক্ষোভ ছিল তার কণ্ঠে।

কনি বলল, তুমি কি এইভাবে কোন মেয়েব সঙ্গে মেলামেশা করেছ?

লোকটা এ কথায় কৌতুক অনুভব করে বলল, আমি তা জানি না।

কনি জানত ও তাকে এসব কথা বলবে না। যে কথা ও বলতে চায় না সেকথা ও কিছুতেই বলবে না। কনি একবার তার মুখের দিকে তাকাল। তার প্রতি নিবিড় আসক্তির আবেগ তার পেটের ভিতর গিয়ে নাড়ীভুঁড়ী-গুলোকে জড়িয়ে ধরল। এ আবেগকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল কনি, কারণ এ আবেগের কাছে ধরা দেওয়া মানেই নিজের কাছে নিজেকে হারানো।

লোকটা তার কোট আর ওয়েস্টকোটটা পরে এগিয়ে চলল সেই পথটা দিয়ে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল বনস্থলীর উপর। লোকটা বলল, আমি আর আপনার সঙ্গে যাব না।

চোখে এক জ্বলন্ত তৃষ্ণা নিয়ে লোকটার পানে তাকাল কনি। লোকটার কুকুরটা তার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছিল। তার আর কিছু বলার নেই।

ধীর পায়ে বাড়ির পথে এগিয়ে চলল কনি। তার মনে হলো, একটা জ্বলন্ত গলন্ত প্রাণপ্রবাহ তার জঠরাভ্যন্তরে তার নাড়ীভুঁড়ীর মধ্যে দুরন্ত বেগে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তার পেটের মধ্যে এই নতুন প্রাণসত্তার জন্মের জন্য লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার। সারা পথ সে শুধু ভেবে যেতে লাগল লোকটার কথা। শ্রদ্ধাসিক্ত এক আসক্তির আঠায় মনটা সর্বক্ষণ জড়িয়ে আছে লোকটার প্রতি। সে অনুভব করল তার নিজের সমস্ত প্রাণমনও গলে গিয়ে যেন তার এই

তার আর নাড়ীভূঁড়ীর মধ্যে ঐ নতুন প্রাণসত্তার মত ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে অবিরাম এক চঞ্চল প্রবহমানতায়। অন্যান্য সরলমনা মেয়েদের মত সেও যেন কেমন নরম হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল সহজলভ্যা। তার মনে হলো তার গর্ভের মাঝে সন্তান প্রবেশ করেছে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত তার গর্ভকোষের মধ্যে। এক নতুন প্রাণসত্তা সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে সে গর্ভকোষ। আর সহসা তৃপ্ত হয়েছে যেন তার সুদীর্ঘ সঞ্চিত এক তপ্ত তৃষ্ণা।

আপন মনে ভাবল কনি, সত্যি সত্যিই এক সন্তানের জন্ম হত যদি আমার মধ্যে। একথা যতই ভাবতে লাগল সে ততই তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গলে যেতে লাগল। গলে জল হয়ে গেল যেন তার নারীসত্তার সমস্ত যুগান্ত-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত দৃঢ়তা। সহসা অদ্ভুত একটা কথা মনে হলো তার। যে কোন পুরুষের ঔরসেই গর্ভসঞ্চার হতে পারে যে কোন নারীর মধ্যে। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যখন কোন নারী তার একান্তবাঞ্ছিত ও আকাঙ্খিত পুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে তখন যে পুলকের রোমাঞ্চ ঢেউ খেলে যায় তার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা সত্যিই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তার জীবনে। সহসা এক আশ্চর্য পরিবর্তন তার মধ্যে লক্ষ্য করল কনি। সে বেশ বুঝতে পারল একটু আগে অর্থাৎ আজকের এই গোধূলিবেলার সহবাসের আগে সে যা ছিল এখন যেন সে আর তা নেই। যে নতুন প্রাণসত্তা লালিত হতে শুরু হয়েছে তার মধ্যে সেই প্রাণসত্তার এক বহুবাঞ্ছিত বোঝাভারের চাপে সে যেন ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে। প্রথম সৃষ্টির এক রক্ততরল অন্ধকারের যে অতলান্তিক গভীরে সব প্রাণ একদিন ঘুমিয়ে থাকে কনি যেন তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

এ কোন নতুন কামনার্ত আবেগ বা প্রেমানুভূতি নয়, এ হচ্ছে এক শ্রদ্ধাসিক্ত ব্যাকুলতা যা এর আগে কখনো অনুভব করেনি কনি। এ ব্যাকুলতাকে ভয় করত কনি, কারণ আদিম যুগের বন্য নারীর মত ক্রীতদাসীর মত নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতে চায়নি সে, অবলুপ্ত করে দিতে চায়নি নিজের সত্তা আর তার স্বাতন্ত্র্যকে। সে কোন পুরুষের ক্রীতদাসী হবে না, কারো প্রতি ঐকান্তিক ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে সত্যিই ভয় করে সে। তবু এ-ব্যাকুলতার বিরুদ্ধে এখনই কোন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে চায় না সে। তা ছাড়া সে ক্ষমতাও তার নেই। অবশ্য তার ইচ্ছাশক্তির মধ্যে এমন একটা শয়তানসুলভ প্রবণতা আছে যা দিয়ে তার পেট আর বুকের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকা সেই ব্যাকুলতার নরম উচ্ছ্বাসটাকে পিষে ফেলতে পারত। ইচ্ছা করলেই সে তা পারে। একটু চেষ্টা করলেই সে তার ইচ্ছার অধীনে মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারে তার সমস্ত কামনার আবেগকে।

তা এখন পারবে না সে। তার মানেই ব্যাকান্তে বা বেকানলের মত সে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে আওকাসের পিছু পিছু বনে বনে ঘুরে বেড়াবে। অথচ

এই আওকাস ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন এক বলিষ্ঠ লিঙ্গের ধারক। এক বিধি-নির্দিষ্ট কর্তব্য হিসাবে সেই লিঙ্গের দ্বারা নারীদেহের তোষণ করে যাওয়াই ছিল তার কাজ।

পুরনো কামনার যে নব জাগরণ ঘটল কনির মধ্যে তার আবেগে উত্তাপে উন্মত্ত হয়ে উঠল সে। তার কাছে মানুষটা হারিয়ে গেল, তার সব ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখন তার একমাত্র পরিচয় সে এক বলিষ্ঠ লিঙ্গের ধারক আর বাহক। তার কাজ ফুরিয়ে গেলেই তাকে সে খণ্ড বিখণ্ড করে উড়িয়ে দেবে, কোথায় নস্যাৎ করে দেবে। তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক অমিত শক্তি অনুভব করল সে। এক ভয়ঙ্করী নারীশক্তি পুরুষকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে ক্রোধ আর কামনার উন্মত্ত অনলে। কিন্তু একথা ভাবতে গিয়ে বুকটা ভারী হয়ে উঠল তার। এটা সে চায় না। তার থেকে সেই ব্যাকুলতা, আসক্তির সেই নিবিড়তা অনেক ভাল। এ ব্যাকুলতা তার পরম সম্পদ। এ ব্যাকুলতা কত মেদুর, কত গভীর, কেমন অব্যক্ত। না না, তার চেয়ে সে তার নারীসত্তার সমস্ত দৃঢ়তা সমস্ত অনমনীয়তাকে সঁপে দেবে। এ দৃঢ়তার বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে। অনেক দুঃখ ভোগ করেছে সে এর জন্য।

এবার এক নতুন প্রাণরসে অভিস্নাত হবে সে। যে ব্যাকুলতা তার সমস্ত আন্তরযন্ত্রে ইন্দ্রজালের মত অশ্রুত ধ্বনিতে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সে ব্যাকুলতাকে সারা অঙ্গে জড়িয়ে তার আপন গর্ভের গভীরতার মধ্যে ডুবে যেতে চায় সে। এখন থেকে লোকটাকে এত ভয় করার কিছু নেই।

বাড়ি গিয়ে ক্লিফোর্ডকে বলল কনি, আমি মেয়ারহে দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং মিসেস ফ্লিন্টের সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। ওদের বাচ্চাটাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। মেয়েটা দেখতে চমৎকার হয়েছে। মাথায় লাল মাকড়সার জালের মত চুল। মিস্টার ফ্লিন্ট বাজারে গেছে তাই আমি আর মিসেস ফ্লিন্ট দুজনে মিলে বাচ্চাটাকে নিয়ে চা খেলাম। আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা নিয়ে তুমি ভাবছিলে নাকি?

ক্লিফোর্ড বলল, ভাবছিলাম ঠিক, তবে আবার ভাবলাম তুমি নিশ্চয় কোথাও কারো বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে চা খাচ্ছ।

একটা চাপা ঈর্ষা ছিল ক্লিফোর্ডের কণ্ঠে। তার চর্মচক্ষের বাইরে এক বিশেষ চক্ষের দৃষ্টি কনিকে দেখে তার হাবভাবের মধ্যে যেন এক নূতনত্বের সন্ধান পেল। কিন্তু সে নূতনত্ব বড় দুর্বোধ্য ঠেকল তার কাছে। তবে এক মদির আবেশের রহস্যময় আবরণে ঢাকা সে নূতনত্বের একটামাত্র অর্থই করতে পেরেছে ক্লিফোর্ড। তা হলো সন্তান কামনা। তার সন্তান নেই এই দুঃখের দ্বারাই সবচেয়ে পীড়িত হয় কনি। তাই সেই সন্তানের জন্যই হয়ত ব্যস্ত হয়ে

পড়েছে সে।

মিসেস বোল্টন তাকে বলল, আমি আপনাকে পার্কের ভিতর দিয়ে লোহার গেট দিয়ে যেতে দেখেছি। তাই ভাবছিলাম আপনি হয়ত পার্কে গেছেন।

ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হলো মেয়ারহের দিকে চলে গেলাম তার বদলে।

দুই নারীর দৃষ্টি মিলিত হলো। মিসেস বোল্টনের দৃষ্টি ধূসর তীক্ষ্ণ উজ্জল আর সন্ধানী; কনির সুন্দর নীল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মিসেস বোল্টন এ বিষয়ে নিশ্চিত যে কনির একজন প্রেমিক আছে। কিন্তু কে সেই প্রেমিক, কোথায় সে থাকে তা এখনো ধরতে পারেনি।

মিসেস বোল্টন বলল, খুব ভাল কথা, বাইরে গিয়ে এইভাবে মানুষের সঙ্গে মিশবেন। আমি স্যার ক্লিফোর্ডকে বলছিলাম ম্যাডাম যদি এইভাবে বাইরে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মেশেন তাহলে তাঁর শরীর মন ভাল হবে।

কনি বলল, হ্যাঁ ক্লিফোর্ড, বাচ্চাটাকে দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। ওর চুলগুলো কী সুন্দর, ঠিক লাল মাকড়সার জালের মত। ওর গালগুলো ফুলো ফুলো আর চোখগুলো নীল। বাচ্চাটা মেয়ে বলেই খুব সাহসী। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের থেকেও সাহসী আর নির্ভীক।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, ঠিক যেন ছোট মিসেস ফ্লিন্ট।

কনি বলল, তুমি একবার দেখবে ক্লিফোর্ড? তোমার দেখার জন্য আমি ওদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি।

এক নিবিড় অস্বস্তির সঙ্গে কনির পানে তাকিয়ে ক্লিফোর্ড বলল, কে?

মিসেস ফ্লিন্ট আর তার বাচ্চাটা। সোমবার।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তাদের নিয়ে তোমার ঘরে চা খাবে।

কনি বলল, কেন, বাচ্চাটাকে দেখতে চাও না তুমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখব, কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে চা খেতে পারব না।

ক্লিফোর্ডের পানে ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে কনি শুধু বলল, ওঃ। কনি যেন এত কাছে থেকেও ক্লিফোর্ডকে দেখতে পাচ্ছে না; ক্লিফোর্ডের পরিবর্তে দেখছে অন্য এক মানুষকে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি আপনার ঘরে ওদের নিয়ে আরাম করে চা খাবেন ম্যাডাম। আর মিসেস ফ্লিন্টও স্যার ক্লিফোর্ডের থেকে আপনার কাছেই বেশী সহজ হয়ে চা খেতে পারবে।

কনি যে একজনকে ভালবাসে এ বিষয়ে নিশ্চিত মিসেস বোল্টন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যেন তার সমগ্র অন্তরাত্মা। কিন্তু কে সেই লোক? হয়ত মিসেস ফ্লিন্ট এ বিষয়ে তাকে কোন হদিশ দিতে পারে।

আজ সন্ধ্যায় কনি আর স্নান করবে না। লোকটার বাঞ্ছিত ও একান্তপ্রিয়

যে পৌরুষস্পর্শ তার দেহগাত্রে এখনো আঠার মত লেগে আছে, স্নান করলে সে স্পর্শ ধুয়ে যাবে মুছে। আজ সে স্পর্শ পবিত্র বলে মনে হলো তার।

আজ ক্লিফোর্ড কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। কনি একা থাকতে চাইছিল, কিন্তু ক্লিফোর্ড আজ তাকে খাওয়ার পর ছাড়বে না। কনি তার পানে তাকাল। আজ তার দৃষ্টির মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত এক নম্রতা ছিল।

তেমনি অস্বস্তির সঙ্গে ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল কনিকে, আজ কোন খেলা করবে অথবা আমি কোন বই পড়ে শোনাব? অথবা কি হবে বল।

কনি বলল, তুমি বরং কোন কিছু পড়।

কি পড়ব? কবিতা না গদ্য রচনা, না নাটক?

তুমি বরং রেসিন পড়।

আগে আগে ফরাসী ভাষায় বড় সুন্দর করে চমৎকারভাবে রেসিন পড়ত ক্লিফোর্ড। কিন্তু আজ তার পড়ার মধ্যে আগেকার সেই উদ্যম নেই। আজ সে সব ভুলে পড়ার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে পারছে না। ক্লিফোর্ড যখন পড়ছিল কনি তখন সেলাই করতে লাগল। তারই পোষাকের কাপড় কেটে মিসেস ফ্লিন্টের বাচ্চা মেয়েটার জন্য একটা ফ্রক তৈরি করছিল। ক্লিফোর্ড জোরে পড়ে গেলেও কনি একমনে সেলাই করে যাচ্ছিল। ক্লিফোর্ডের পড়ার কোন কথা তার কানে যাচ্ছিল না।

বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনির এক শব্দময় রেশের মত তার মধ্যে দগ্ধাবশিষ্ট কামাবেগের এক নতুন উত্তাপ অনুভব করল কনি।

আগে প্রথমে রেসিন সম্বন্ধে কিছু বলল ক্লিফোর্ড। কনি তার সব কথা বলা শেষ হলে সব কথা না শুনেও তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চমৎকার।

কনির উজ্জ্বল নীল চোখের পানে তাকিয়ে আবার ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। এক শান্তমেদুর স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে বসে বসে সেলাই করছিল কনি। ক্লিফোর্ডের মনে হলো এতখানি স্তব্ধ ও মেদুর এর আগে কখনো দেখায়নি কনিকে। তাকে দেখে এতখানি মুগ্ধ এর আগে কখনো হয়নি ক্লিফোর্ড। তার মোহ থেকে কোন মতেই আজ মুক্ত করতে পারল না সে। কনির দেহগাত্র হতে বিচ্ছুরিত এক অজানা গোপন গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে তার মন। তাই মন্ত্রমুগ্ধের মত সমানে পড়ে চলল সে। তার গলার গম্ভীর আওয়াজটাকে চিমনির মুখের কাছে প্রবাহিত বেগবান বাতাসের মতই মনে হচ্ছিল কনির। কনি শুধু তার কণ্ঠের আওয়াজটা শুনছিল, রেসিন সম্বন্ধে বলা একটা কথাও বুঝতে পারছিল না।

-- বসন্তের সবুজ গাছে গাছে ফুটে ওঠা ফুলের কুঁড়ির মত এক মেদুর সুবাসিক্ত উল্লাসে ফুলে ফুলে উঠছিল কনি। যেদিকেই তাকাচ্ছিল সেইদিকেই সে যেন দেখতে পাচ্ছিল এক নামহীন নগ্ন পুরুষ এক জীবন্ত জননাঙ্গের উদ্ধত গৌরবে

গর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে দর্পিত পদভরে। শুধু বাইরের জগতে নয় তার দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় যেন সেই নামহীন পুরুষ আর তার ঔরসজাত সন্তানের এক রক্তনিবিড় অস্তিত্বকে অনুভব করল কনি।

কনির হঠাৎ মনে হলো তার যেন হাত পা নাক কান কিছুই নেই। মনে হলো সে হয়ে উঠেছে এক সুজটিল অরণ্য। ক্রমস্ফুটমান অসংখ্য কুসুমের উচ্ছ্বাসে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে তার অন্তরাত্মা। অসংখ্য কামনার পাখি ঘুমিয়ে আছে যেন তার দেহের শাখাপ্রশাখায়।

ক্লিফোর্ড তবু পড়ে চলল। কণ্ঠের উত্থানপতনের জন্য কত রকমের বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল। সত্যিই ক্লিফোর্ডকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সত্যিই বড় অদ্ভুত। বইএর উপর ঝুঁকে পড়ে বই পড়ছে, কত ভদ্র ও সুসভ্য ও মার্জিত দেখাচ্ছে। তার কাঁধগুলো কত চওড়া অথচ তার সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য পা নেই। কী অদ্ভুত এক প্রাণী, পাখিদের মতই তীক্ষ্ণ ও অনমনীয় এক ইচ্ছাশক্তি আছে তার। কিন্তু কত হিমশীতল! একটুও উত্তাপ নেই তার মধ্যে। আসলে সে এমনই এক প্রাণী যার আত্মা বলে কোন জিনিস নেই, আছে শুধু অতিমাত্রায় সতর্ক ও সতত সচেতন এক হিমশীতল এষণা বা ইচ্ছাশক্তি।

ক্লিফোর্ডকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল কনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল তার মধ্যে অতি মেদুর উত্তপ্ত যে প্রাণ আজ সদ্য জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে, সে প্রাণ ক্লিফোর্ডের থেকে অনেক বেশী বলিষ্ঠ। সে সব ঘটনা তার অগোচরে ঘটে গেছে তার কিছুই জানে না সে।

পড়া শেষ হলো। কনি চমকে উঠল। ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকিয়ে আবার চমকে উঠল সে। দেখল ক্লিফোর্ড তার ম্লান চোখের এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে। এক স্পষ্ট ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে সে চোখের দৃষ্টিতে।

কনি তবু শান্ত নরম কণ্ঠে বলল, অশেষ ধন্যবাদ, তুমি কিন্তু রেসিন চমৎকারভাবে পাঠ করো।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি যতখানি তার প্রতি মনোযোগ দাও ততটাই তার পড়া চমৎকার লাগে। তুমি ওটা কি তৈরি করছ?

আমি একটা শিশুর পোষাক তৈরি করছি। মিসেস ফ্লিন্টের বাচ্চার জন্য।

মুখটা ফিরিয়ে নিল ক্লিফোর্ড। শুধু সন্তান আর সন্তান। এইটাই তার একমাত্র দুশ্চিন্তা।

ক্লিফোর্ড উদাসীনভাবে বলল, রেসিনের মধ্যে যে যা চায় তা সব পায়। বিক্ষুব্ধ আবেগ আর অনুভূতির থেকে সাজানো সুসংবদ্ধ ও মার্জিত আবেগানুভূতি অনেক ভাল।

কনি তার দিকে বিস্ফারিত চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।

ক্লিফোর্ড আবার বলল, আধুনিক সভ্যতায় মানুষের বল্গাহীন অসংযত

আবেগ কুৎসিত কদর্য পথে ছুটে চলেছে। এখন সংযম দরকার।

কনি বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তার মনে হলো শূন্য দৃষ্টিতে রেডিওর দিকে মুখ করে বসে যে সব আবেগসর্বস্ব বাজে কথা শুনেছে তারই ফলে এই ধারণা হয়েছে তার। কনি বলল, লোকে আবেগ বা অনুভূতির কথা মুখে বলে, কিন্তু আসলে তারা কিছু অনুভব করে না। তাদের অনুভূতির মধ্যে কোন গভীরতা নেই। এই না থাকাটাই তাদের কাছে রোমাণ্টিক।

ক্লিফোর্ড বলল, সত্যিই ঠিক তাই।

আসল কথা, ক্লিফোর্ড আজ কেমন ক্লান্তি অনুভব করছে। আজকের সারা সন্ধ্যাটা কনির কাছে বই পড়ে কাটাতে গিয়ে অকারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। এর থেকে সে যদি কারিগরী বিদ্যার কোন বই পড়ে বা খনি-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে অথবা রেডিও শুনে সন্ধ্যাটা কাটাত তাহলে সে এমন করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত না। দেহমন এমন অকারণে ভারী হয়ে উঠত না।

মিসেস বোল্টন ক্লিফোর্ড আর কনির জন্য এক গ্লাস করে যবের গুঁড়ো মেশানো দুধ নিয়ে এল। ক্লিফোর্ডের এতে ঘুম ভাল হবে। আর কনি আরো মোটা হবে। রোজই আজকাল এটা ওরা খায়।

দুধের গ্লাসটা শেষ করে ট্রের উপর রেখে ট্রেটা নিয়ে উঠে পড়ল কনি। দরজার কাছে গিয়ে ক্লিফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, শুভরাত্রি ক্লিফোর্ড। রেসিন সুখস্বপ্নের মত তোমার নিদ্রাকে জড়িয়ে থাক।

রাত্রির মত বিদায় নেবার সময় ক্লিফোর্ডকে চুম্বন না করেই চলে গেল কনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্লিফোর্ড তার পানে একবার তাকাল। সারা সন্ধ্যেটা সে বই পড়ে তার সঙ্গে কাটিয়েছে। তবু সে যাবার সময় একবার চুম্বন করল না। যদিও এ চুম্বন নিছক একটা প্রথাগত ব্যাপার এবং এতে কোন আন্তরিকতা নেই, তবু সব দাম্পত্যজীবনই এই প্রথার উপর নির্ভরশীল। আসলে কনি হচ্ছে একজন বলশেভিক। তার গোটা মন আর প্রবৃত্তির কাঠামোটা একই ধাঁচে গড়া। এই কথা ভাবতে ভাবতে কনির চলে যাওয়া পথটার দিকে রাগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল সে।

রাত্রিটা কিভাবে কাটাবে তা ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড। যখন তার হাতে কোন কাজ থাকে না, যখন সে কোন কিছু মন দিয়ে শোনেও না, যখন তার মনটা কোন কর্মোদ্যমে ভরে থাকে না, তখন স্নায়বিক দুর্বলতার একটা বিরাট জাল তার মনের গোটা কাঠামোটাকে ঢেকে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এক অকারণ উদ্বেগ আর আসন্ন শূন্যতার এক ভয়ঙ্কর আভাস গ্রাস করতে আসে তাকে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল ক্লিফোর্ড। তবে আবার ভাবল, যতই হোক কনি কিছুতেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে না। না, কিছুতেই যাবে না। আসল কথা ও উদাসীন। ও তার জন্য কত কি করেছে,

তার সারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তার কাছে। তবু ওর প্রতি সে কত নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। সে শুধু নিজের পথে চলতে চায়, নিজের স্বার্থ বুঝতে চায়। মেয়েটা শুধু তার স্বাধীন ইচ্ছাকে ভালবাসে। এ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না।

এখন আবার কনির মাথায় শুধু একটা চিন্তাই ঘুরছে। একটা ইচ্ছাকেই সে লালন করে চলেছে মনের নিভৃতে। তা হলো সন্তান। কিন্তু সে সন্তান হবে যেন একান্তভাবে তারই। তাতে ক্লিফোর্ডের কোন ভাগ থাকবে না, কোন অধিকার থাকবে না।

ক্লিফোর্ডের স্বাস্থ্যটা আগের থেকে ভাল হয়েছে। তার মুখে একটা লাল আভা দেখা দিয়েছে। তার কাঁধগুলো চওড়া এবং বলিষ্ঠ। তার গায়ে মাংস গজিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে সে। একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা হাঁ করে গ্রাস করতে আসছে যেন, আর সেই শূন্যতার বিশাল গহ্বরে তার সব প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছে। সব প্রাণশক্তি হারিয়ে মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে যেন মরে গেছে।

আর ঠিক তখনি তার আয়ত ম্লান চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি ফুটে ওঠে। নিষ্ঠুরতায় হিমশীতল সে দৃষ্টি, তথাপি কেমন যেন এক লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যের ভাব। তার দৃষ্টির শূন্যতায় আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠা এই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের ভাবটা দেখে মনে হয় সে যেন জীবনে হেরে গিয়েও জয়লাভ করতে চাইছে জীবনের উপর। সে যেন এই কথাটাই বলতে চাইছে, সে কামনার সব রহস্য জানে, সে দেবদূতদেরও হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সারারাত্রি ধরে ভয়টা তার কিছুতেই যায় না আর তাই সে ঘুমোতেও পারে না। চারদিক থেকে মৃত্যুর ভয়টা এমনভাবে ছুটে আসে যে সে সহ্য করতে পারে না। প্রতিটি রাতে তার তাই মনে হয় এই ভাবে প্রাণহীনভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

তবে সে কিন্তু মিসেস বোল্টনকে যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতে পারে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে এসেও পড়বে। সে তাঁর ড্রেসিং গাউন পরে আর কুমারী মেয়েদের মত বাদামী চুলের বিনুনি ঝুলিয়ে এসে ঘরে ঢুকবে। তার সেই বাদামী চুলের বিনুনিতে এখন কিছু কিছু পাক ধরেছে। ঘরে এসে মিসেস বোল্টন হয় চা না হয় কফি করে। তারপর দাবা না হয় পিকেত খেলতে বসে। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলেও দাবা সে ভালই খেলে। তারপর মিসেস বোল্টন যখন বিছানার ধারে একটা চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলতে থাকে ক্লিফোর্ড তখন বাতিটা পাশে নিয়ে বই হাতে শুয়ে থাকে। সেই বাতিটা হতে বিস্ফুরিত আলোর একটা উজ্জ্বল বৃত্ত রচিত হয় তাকে কেন্দ্র করে। আর সে তাতে ডুবে যেতে থাকে। তারই কাছে থেকে মিসেস বোল্টন ধীরে ধীরে চলে যায় এক গভীর ঘুমের রাজ্যে আর সে চলে যায় এক ভয়ের রাজ্যে। এইভাবে সারারাত ধরে

ওরা দুজনে খেলা করে যায়। আর মাঝে মাঝে দুজনে কফি আর বিস্কুট খায়। কিন্তু ওদের চারদিকে ঘনিয়ে থাকা নৈশ স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ওরা কেউ কোন কথা বলে না। তবু ওরা মনে মনে পরস্পরকে আপন ভেবে একটা নীরব নিস্পৃচ্ছার সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

আজ রাতে মিসেস বোল্টনের নতুন করে মনে পড়ে গেল সেই কথাটা। তার মানে কিনা লেডি চ্যাটার্লির ভালবাসার মানুষটি কে হতে পারে। আর এই কথাটা ভাবতে গিয়ে অনেক আগে মরে যাওয়া তার স্বামী টেডের কথাটাও মনে পড়ে গেল। আজও তার মনে হয় টেড মরে নি। টেডের কথাটা মনে পড়লেই তার মালিকদের বিরুদ্ধে তার সেই পুরনো প্রতিহিংসার কথাটাও জেগে ওঠে নতুন করে। মনে হয় তারাই টেডকে মেরেছে। অবশ্য এ চিন্তাটা তার আবেগপ্রবণ মনের ক্রিয়াও হতে পারে। আসলে সে শূন্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী।

আধো ঘুম আর আধো জাগরণের তরঙ্গদোলায় দুলতে দুলতে তার টেডের কথা আর লেডি চ্যাটার্লির অজানা প্রেমিকের কথাটা এক করে মিশিয়ে ফেলল মিসেস বোল্টন। সঙ্গে সঙ্গে কনির মতই তার মনেও ক্লিফোর্ডের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা একসঙ্গে দুজনে পিকেত খেলছে। ছয় পেন্স বাজি রেখে জুয়ো খেলছে। এ খেলায় মিসেস বোল্টন সাধারণতঃ হেরে গেলেও তাতে গৌরব আছে কারণ সে একজন ব্যারনের সঙ্গে খেলতে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এটাই যথেষ্ট। এতে ছয় পেনি হারলেও তার কোন ক্ষতি নেই।

তাস খেললেই তারা জুয়ো খেলে। খেলতে খেলতে সব কিছু ভুলে যায় ক্লিফোর্ড। সাধারণতঃ সব খেলাতেই সে জেতে। আজ রাতেও সে জিতছিল। তাই নেশা ধরে গিয়েছিল খেলায়। তাই সে ঘুমোল না। দেখতে দেখতে ভোর সাড়ে চারটে বেজে গেল। তারপর শুল ক্লিফোর্ড।

কনি এদিকে সারারাত গভীরভাবে ঘুমোল। কিন্তু শিকার রক্ষক সারারাত একেবারেই ঘুমোতে পারল না। সব কাজকর্ম সেরে মুরগীর খাঁচা সামলে নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর বাসায় ফিরে গিয়ে রাতের খাওয়া সারল। কিন্তু খাওয়ার পর বিছানায় না গিয়ে আগুনের পাশে বসে ভাবতে লাগল।

প্রথমে সে ভাবল তেভারশালে কাটানো ছেলেবেলার কথা, তারপর ভাবল তার পাঁচ ছ বছরের বিবাহিত জীবনের কথা। এই প্রসঙ্গে তার স্ত্রীর কথা ভাবতে গিয়ে মনটা তিক্ততায় ভরে উঠল। তার স্ত্রীর প্রকৃতিটাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো। তবে ১৯১৫ সালের বসন্তকালের পর থেকে তাকে আর দেখতে পায়নি সে। এখন তার স্ত্রী যেখানে থাকে সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র বিশ মাইলের বেশী হবে না। তবু দেখা হয় না। না হওয়াই ভাল। তাকে আজকাল আগের থেকে আরো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবনে তার মুখদর্শন

করতে চায় না সে।

এরপর লোকটা তার বিদেশে কাটানো সামরিক জীবনের কথা ভাবতে লাগল। এই সময় ভাবত, মিশর এবং শেষে আবার ভারতেই ফিরে যায় সে। প্রথমে তাকে ঘোড়া নিয়ে থাকতে হত। তারপর সেই সদাশয় কর্ণেল যিনি তাকে খুব ভালবাসতেন, তাঁর দয়াতেই সে অফিসার হয়। লেফটন্যান্ট থেকে তার ক্যাপ্টেন হবারও সম্ভাবনা ছিল। তারপর নিউমোনিয়া রোগে সেই কর্ণেলের হঠাৎ মৃত্যুতে সব ওলট পালট হয়ে যায়। সে নিজে কোন রকমে বেঁচে যায়। তারপর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। আবার চাকরি করতে শুরু করে।

জীবনের সঙ্গে যেন আপোষ করে চলতে শুরু করে। সে এখানে চাকরি নেবার সময় ভাবে এই বনের আরণ্যক পরিবেশে নিরাপদে থাকতে পারবে সে। এখন আর শিকার হয় না; এখন শুধু তাকে পাখি আর মুরগীগুলো পুষতে হয়, পালন করতে হয়। আর তাকে বন্দুক নিয়ে শিকারের কোন কাজ করতে হবে না। আসলে সে যেন তার জীবন থেকেই দূরে পালিয়ে এসেছে। এইটাই যেন তার জন্মস্থান। তার মা অবশ্য এখনো আছে, কিন্তু তার জীবনে তার মার প্রভাব খুব একটা নেই। আজ তার জীবনে কোন আশা নেই, কামনা নেই, কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আজ সে শুধু কোনরকমে তার দেহগত অস্তিত্বটা দিনের পর দিন বজায় রেখে চলেছে। সে জানে না সে নিজেকে নিয়ে কি করবে, কোন পথে চলবে।

অফিসার থাকাকালে অন্যান্য অফিসার ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে জীবনের সব উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে সে। তাদের ছেলে পরিবার আর জীবনযাত্রা প্রণালীর সব কিছু দেখে শুনে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের ব্যাপার দেখে সব উচ্চাশা ত্যাগ করে সে। একেবারে নিস্পৃহ হয়ে ওঠে জীবনে।

তাই কিছুদিনের জন্য অফিসার হিসাবে সমাজের এক উঁচু স্তরে ওঠার পর সব কিছু দেখে শুনে ভয় পেয়ে আবার সে তার আগেকার জীবনের নিচু স্তরে নেমে এসেছে। মাঝখানে যে কয় বছর সে বাইরে কাটায় তার মধ্যে জীবনের যত কিছু নোংরামি আর সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়েছে সে। জীবনে সদাচরণের গুরুত্ব কতখানি তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে। জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারে যত নজর না দেওয়া হয় ততই ভাল। তবে সে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন কপটতা নেই।

তার উপর আর একটা জিনিস ভাল লাগে না তার। তা হলো বেতন নিয়ে ঝগড়া। তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বেশ বুঝেছে বেতন নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন শেষ নেই, সীমা নেই। তাই সে বেতন নিয়ে কোন মাথাই ঘামায় না।

অবশ্য যারা গরীব যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের বেতন নিয়ে অনেক সময় বাধ্য হয়ে মাথা ঘামাতে হয়। কিন্তু অবস্থার তাড়নায় বেতন নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে টাকার চিন্তাটা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয় তাদের জীবনে। আজ এই টাকার চিন্তাটা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ক্যান্সারের মতই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। আজ তাই ও টাকার কথা একেবারেই ভাবতে চায় না।

কিন্তু এর পরিণাম কি? জীবন থেকে টাকার কথাটা বাদ দিলে আর কি থাকে? কিছুই না।

তবু সে একা একা সব কিছু বাদ দিয়ে সব কিছুই ভুলে গিয়ে বেশ থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, তার এই নিঃসঙ্গ জীবনে, সীমাহীন একাকীত্বে সে সুখী, সে তৃপ্ত। কিন্তু একটা জিনিসের মানে সে বুঝতে পারে না। প্রাতরাশের পর যে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দেয়, মোটা মোটা শিকারী লোকগুলো তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। সব ব্যাপারটাই অর্থহীন। সারবত্তাহীন।

কোন কিছুই নিয়ে যখন সে মাথা ঘামায় না, কোন কিছু গ্রাহ্য করে না তখন এমন চিন্তা ভাবনারই বা প্রয়োজন কি? সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না এবং কোন কিছু ভাবত না সে যদি না এই নারী তার জীবনে এসে না জুটত। এই নারীর থেকে সে দশ বছরের বড়। অভিজ্ঞতার দিক থেকে সে তার থেকে যেন হাজার বছরের বড়। জীবনের বিচিত্র দিক ও স্বর সে দেখেছে। এই নারী ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে তার জীবনে। এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের সম্পর্ক গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠবে আরো এবং হয়ত একদিন তাদের একসঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে। ভালবাসার বাঁধন সহজে ছেঁড়া যায় না।

কিন্তু তারপর? তবে কি নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে তাকে? সে কি এই নারীকে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে? সে কি তবে এই নারীর পঙ্গু স্বামীর সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হবে? আবার তার যে স্ত্রী তাকে ঘৃণা করে সেই স্ত্রীর সঙ্গেও কি বিবাদ বাঁধাবে? আবার দুঃখ। যে দুঃখকে এড়িয়ে যেতে চায় জীবনে আবার সেই দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়া। এ ব্যাপারে যে তিক্ত ও কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাতে ও নিজে ও এই নারী দুজনেই আঘাত পাবে।

যদি তারা স্যার ক্লিফোর্ড ও তার নিজের স্ত্রীর কবল থেকে কোনরকমে মুক্তও হয় তাহলে কি করবে তারা শেষ পর্যন্ত? কি করবে সে জীবনে? যা কিছু হোক একটা করতে হবে। সে পুরুষ হয়ে একটা মেয়ে মানুষের টাকায় সারা জীবন কাটাতে পারে না। আর সে নিজে যা সামান্য মাইনে পায় তাতেও তাদের চলবে না।

আবার সেই সমাধানের অতীত এক সমস্যা। একটা মাত্র উপায় আছে

সে শুধু আমেরিকা চলে যাবার কথাটা ভেবে দেখতে পারে। সেখানে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

কিন্তু এভাবে বসে বিশ্রাম করতে পারল না, আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমোতেও পারল না। রাত্রি দুপুর পর্যন্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত এইভাবে বসে বসে ভাবার পর উঠে পড়ল সে। তারপর তার কোট আর বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তার কুকুরটাকে বলল, চলে আয় ল্যাস, আমরা বরং বাইরেই ভাল থাকব।

আকাশে সে রাতে অসংখ্য তারা ছিল, কিন্তু চাঁদ ছিল না। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল সে। এখানকার পথঘাট সব তার চেনা। অন্ধকারে পথ চলতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার। শুধু স্ট্যাক গেট কোলিয়ারির লোকদের দ্বারা খরগোসের জন্য পাতা ফাঁদগুলো পায়ে লাগছিল।

সারা বনটা একপাক ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। প্রায় পাঁচ মাইলের পথ। সেই টিলাটার উপরে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একমাত্র কোলিয়ারির অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। কয়লাখনির সারবন্দী বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। সারা পৃথিবীটা এক নিরন্ধ্র অন্ধকারের তলায় গা ঢাকা দিয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার সে অন্ধকার সে ঘুম বার বার বিদ্ধ হচ্ছে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন আর লরীর শব্দে আর চুল্লীর জলন্ত আগুনে। এ জগৎ হচ্ছে যত সব কয়লা, লোহা আর অ·হীন লোভলালসার নিষ্ঠুর কাঠিন্যে ভরা আব সেই কাঠিন্যের আঘাতে নৈশ পৃথিবীর সব ঘুম সব শায়িত শান্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

দারুণ ঠাণ্ডা। লোকটা কাশছিল। হিমেল কনকনে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল টিলাটার উপর দিয়ে। সহসা কনির কথাটা জেগে উঠল তার মনে। আজ এই মুহূর্তে সে যদি সেই নারীর নরম দেহটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একটা কম্বলের মধ্যে দুজনে শুতে পারত তাহলে তার বিনিময়ে সে তার জীবনের সব কিছু দিতে পারত। সেই নারীকে যদি একবার সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে ঘুমোতে পারত তাহলে সে তার অতীতের সমস্ত লব্ধ বস্তু ও অন্তহীন ভবিষ্যতের সমস্ত আনন্দের পশরা তুলে দিতে পারত, অকুণ্ঠভাবে ত্যাগ করতে পারত। তার মনে হলো সেই নারীর কাছে শোয়াটাই হলো তার সারা জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। একমাত্র কামনা।

সে তার বাসায় গিয়ে মেঝের উপর কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু দারুণ শীত লাগছিল। তাই ঘুম এল না। তাছাড়া তার একাকীত্বটাকে তার জীবনের একটা বিরাট অপূর্ণতা এক বিরাট ত্রুটি বলে মনে হলো। মনে হলো একমাত্র সেই নারীর নিবিড় সঙ্গ, আর দেহগত সান্নিধ্যই দূর করে দিতে পারে তার নিঃসঙ্গতাজনিত সকল অপূর্ণতাকে।

উঠে পড়ে সে পার্ক গেটের দিকে এগিয়ে চলল প্রথমে। তারপর ধীর

গতিতে কনিদের বাড়ির দিকে। তখন রাত চারটে বাজে। তবু তখনো ফর্সা হয়নি। ভোর হয়নি। কিন্তু সে অন্ধকারে অভ্যস্ত বলে পথ চিনে এগিয়ে যাচ্ছিল স্বচ্ছন্দে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। কনিদের বাড়িটা চুম্বকের মত আকর্ষণ করছিল তাকে। আসলে সেই নারীর কাছে যেতে চাইছিল ও। এটা কোন সাধারণ কামনা বাসনা নয়, এটা তার নিঃসঙ্গতাজনিত এক অপূর্ণতাবোধ। যে অপূর্ণতা দূরীভূত করার জন্য এক নীরব নিরুচ্চার নারীদেহের নিবিড় আলিঙ্গন দরকার। ঐ বাড়ির কাছে গেলে হয়ত তাকে দেখতে পাবে সে। হয়ত সে তাকে কাছে পাবে। অথবা তার কাছে যাবার জন্য কোন পথ খুঁজে পাবে। যে প্রয়োজন অমোঘ, নিষ্ঠুরভাবে অপরিহার্য তাকে পরিতৃপ্ত করতেই হবে।

আর একটু এগিয়ে বাড়ির সামনে পাতলা হয়ে আসা ভোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বীচ গাছ দেখতে পেল। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা। শুধু স্যার ক্লিফোর্ডের নিচেরতলার ঘরটায় একটা আলো জ্বলছিল। কিন্তু কোথায় সেই নারী, কোন ঘরে থাকে সে? যে নারী অন্য এক প্রান্ত থেকে সুতো ধরে তাকে দুর্বার বেগে টানছে, নিষ্ঠুরভাবে টানছে সে নারী এ বাড়ির কোন ঘরে থাকে?

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বাড়িটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাড়িটা এবার স্পষ্ট ও দৃশ্যগোচর হয়ে উঠেছে অনেকখানি। এবার সে নারীকে ঠিক দেখা যাবে। কুশলী চোরের মতই এক আশ্চর্য চাতুর্যে ও এক অবৈধ নিষ্ঠায় নিবিড় হয়ে আছে।

তখনো দাঁড়িয়ে রইল সে সেইভাবে। দেখতে দেখতে চারদিক ফর্সা হয়ে উঠল। বাড়ির সব আলো নিবে গেল। কিন্তু সে দেখতে পায়নি এর মধ্যে মিসেস বোল্টন একবার ক্লিফোর্ডের ঘরের জানালার কালো সিল্কের পর্দাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে দেখেই ভিতরে চলে যায়। ক্লিফোর্ড তখনো বুঝতে পারেনি সকাল হয়েছে কিনা। সকাল হলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

ঘুম জড়ানো চোখে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল মিসেস বোল্টন। ক্লিফোর্ডের কোন আদেশের প্রতীক্ষায় ছিল। সহসা একবার চোখ খুলে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকাতেই চমকে উঠল সে। প্রায় চিৎকার করে উঠল এক অপার বিস্ময়ের আতিশয্যে। কারণ একটা লোক আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে চোখদুটো খুলে আবার তাকাল মিসেস বোল্টন। হ্যাঁ, ঠিকই দেখছে লোকটাকে। কিন্তু পাছে স্যার ক্লিফোর্ড জেগে ওঠে তাই কোন শব্দ করল না।

প্রথমে লোকটা কে তা বুঝতে পারেনি মিসেস বোল্টন। কিন্তু ক্রমশই সকালের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতেই চিনতে পারল লোকটাকে। তার বন্দুক,

জামা সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। লোকটা অলিভার মেলর্স, শিকার রক্ষক। হ্যাঁ, সে-ই বটে, তার কুকুরটা ছায়ার মত লেপটে আছে তার সঙ্গে সব সময়।

কিন্তু এ সময় কি চায় লোকটা? সে কি বাড়ির কাউকে জাগাতে চায়? বাড়িটার উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ওখানে দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছে ও? যেন প্রেমাবেগ বিধুর কোন পথকুক্কুর কোন এক উত্তপ্ত মুহূর্তে তার কুক্কুরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

হা ভগবান! সহসা যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল মিসেস বোল্টনের মাথায়। মুহূর্তে বুঝে গেল সব ব্যাপারটা। ঐ লোকটাই অর্থাৎ শিকার রক্ষকই হলো লেডি চ্যাটার্লির প্রেমাস্পদ। হ্যাঁ হ্যাঁ ও-ই।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার এই প্রসঙ্গে। মিসেস বোল্টন অর্থাৎ আইভি বোল্টন নিজেও ঐ লোকটার সঙ্গে কিছুটা প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে ছিল। লোকটা তখন ষোল বছরের ছোকরা আর আইভি বোল্টনের বয়স ছাব্বিশ। বিধবা হবার পর ধাত্রী হবার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। তখন ঐ লোকটা প্রয়োজনীয় বইপত্র যুগিয়ে অনেক সাহায্য করে। তখন লোকটা ছিল দারুণ চতুর। শেফিল্ডের গ্রামার স্কুলে বৃত্তি পায় সে। সে ফরাসী ভাষা জানে। তার উপর সে কামারের কাজ শিখে ঘোড়ার ক্ষুরে পেরেক বসানোর কাজ করত। সে বলত সে ঘোড়া ভালবাসে বলেই এ কাজ করে সে। কিন্তু আসলে বাইরের জগতে বেরিয়ে গিয়ে আধুনিক সভ্যতা আর জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলেই সে এই কাজ বেছে নিয়েছিল।

তখন কিন্তু ছোকরাটা ভালই ছিল। অনেক উপকার করেছিল মিসেস বোল্টনের। একদিক দিয়ে সে স্যার ক্লিফোর্ডের মতই চতুর ; পুরুষদের থেকে মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে সে চাতুর্যের পরিচয় দেয় বেশী।

নিজেকে ঘৃণ্য করে তোলার জন্যই সে যেন বিয়ে করে। অনেক লোক সব জেনেশুনেই এইভাবে বিয়ে করে নিজেদের ঘৃণ্য করে তোলে, কারণ কোন না কোন একটা বিষয়ে ক্ষুব্ধ থাকে তারা এবং এইভাবে তারা চাপা দিতে চায় এই ক্ষোভটাকে। সে যেন তার প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েই যুদ্ধে চলে যায়। তারপর সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক হয়ে ওঠে সে। কিন্তু আবার তেভারশালে ফিরে এসে সামান্য এক শিকার রক্ষকের কাজ নেয়। তার পুরনো জীবনেই ফিরে আসে। দেহাতী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু আইভি বোল্টন ভালভাবেই জানে সে ভদ্রলোকের মত কথা বলতে পারলেও তা বলে না। অনেক মানুষ সুযোগ ও সৌভাগ্য জীবনে লাভ করেও তা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না।

যাই হোক, এবার লেডি চ্যাটার্লির মত মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে। অবশ্য লেডি চ্যাটার্লিই প্রথম মেয়ে নয় তার জীবনে, তবু এ প্রেম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার জীবনে। কোথায় তেভারশালের বস্তীর এক সাধারণ ছেলে আর

কোথায় র‍্যাগবি হলের অভিজাত সমাজের বধূ লেডি চ্যাটার্লি। এ যেন অভিজাত চ্যাটার্লি পরিবারের গালের উপর চরম অপমানের এক চড়।

কিন্তু এদিকে দিন বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিকার রক্ষক লোকটার মধ্যে চৈতন্যোদয় হলো। তার কেবলি মনে হতে লাগল এটা ভাল হচ্ছে না। নিজেকে বার বার বলতে লাগল মনে মনে, তোমার সুদীর্ঘলালিত নিঃসঙ্গতা হতে মুক্ত হয়ে এক নতুন সঙ্গিনীর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার এই প্রয়াস এই প্রবণতা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এ সঙ্গিনী সারা জীবন জড়িয়ে থাকবে তার জীবনের সঙ্গে। তার থেকে মাঝে মাঝে তার সঙ্গলাভই ভাল। বরং তার এই নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বটাকেই সারাজীবন ধরে আঁকড়ে ধরে তাকে লালন করে যাওয়া উচিত। সেটাই হবে তার পক্ষে শ্রেয়। তবে সে সঙ্গিনী যদি নিজে থেকে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে সে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে তার কাছে উপ-যাচক হয়ে এগিয়ে আসা ঠিক হবে না।

রক্তনিবিড় যে কামনাটা দুর্বার বেগে তাকে টেনে এনেছিল সে কামনার সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। সে ইচ্ছা করেই ছিঁড়ে দিল সে সুতোটা, কারণ এটা উচিত তার পক্ষে। দুজনে মিলিত হতে হলে উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। এটা এক পক্ষের ব্যাপার নয়। সে যদি না আসে তাহলেও নিজে থেকে তার কাছে এগিয়ে আসবে না, তার পিছনে ছুটে যাবে না।

ভাবতে ভাবতে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল ও। ওর স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতাকেই ওর জীবনের এক সহজ সত্য বলে মেনে নিল ও অন্তরের সঙ্গে। এইটাই ভাল। সে নারী যদি নিজে থেকে আসে ত আসবে। ও আর যাবে না তার কাছে।

মিসেস বোল্টন দেখল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে লোকটা। তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে তার কুকুরটা। মনে মনে সে বলল, অবশ্য ও আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ নয়। সারা জীবন আমি শুধু ওর কথাই ভাবিনি, তবু টেডকে হারাবার পর ওকে ভালবেসে আমি সত্যিই সুখী হয়েছিলাম। ওকে আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড যদি এসব কথা জানতে পারে তাহলে কি বলবে?

ঘুমন্ত ক্লিফোর্ডের পানে একবার বিজয়গর্বে তাকাল মিসেস বোল্টন। কালো রেশমের পর্দাঢাকা জানালা হতে ধীরে ধীরে সরে এল সে।

অধ্যায় ১১

কনি সেদিন তাদের বাড়ির যত সব ছবি আর মূল্যবান আসবাবপত্র রাখার ঘরে ঢুকে গোছাচ্ছিল ঘরটা। কিছু জিনিসপত্র বাছাই করছিল। স্যার

জিওফ্রের বাবা ছবি ভালবাসতেন এবং তিনি বেশ কিছু ভাল ছবি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু জিওফ্রের মার আবার ঝোঁক ছিল দামী আসবাবপত্রের উপরে। স্যার জিওফ্রে নিজে ওক কাঠের বড় বড় সিন্দুক পছন্দ করতেন। এদিকে ক্লিফোর্ড আধুনিক চিত্রকলার ভক্ত বলে সে এ যুগের কিছু ভাল ছবি কিনে রেখেছে। কনি আবার পুরনো আমলের যত সব অদ্ভুত ছবি ভালবাসে।

ঘরের এককোণে একটা জায়গায় গোলাপকাঠের তৈরি এ বংশের পুরনো আমলের দোলনাটা কাপড়ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। ঢাকাটা খুলে কনি দোলনাটার পানে তাকিয়ে রইল। দোলনাটার কেমন যেন নিজস্ব একটা মোহ আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল কনি।

মিসেস বোল্টন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এটা খুবই দুঃখের কথা যে এ দোলনাটার আর কখনো ব্যবহার হবে না। অথচ দোলনাটা এতদিনের পুরনো হলেও এখনো ভাল আছে।

কনি সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে বলল, একদিন এর ব্যবহার হতেও পারে। আবার সন্তান হতে পারে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কি বলতে চান স্যার ক্লিফোর্ড ভবিষ্যতে সেরে উঠতে পারেন?

কনি বলল, না, আমি বর্তমানের কথাই বলছি। ক্লিফোর্ডের পেশীগত পক্ষাঘাত তার পুরুষত্বকে নষ্ট করতে পারেনি।

কনির এই ধারণাটা ক্লিফোর্ডই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে। সে একদিন তাকে কথায় কথায় বলে, এখনো আমার সন্তান হতে পারে। আমার পুরুষত্ব একেবারে নষ্ট হয়নি। আমার পাছা আর পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকলেও আমার প্রজনন ক্ষমতা যে কোন সময়ে ফিরে আসতে পারে এবং আমি তখন সহজেই আমার প্রাণবীর্য কোন নারীদেহের গর্ভে সঞ্চারিত করে দিতে পারব।

ক্লিফোর্ড এটা সত্যিই অনুভব করে। সে যখন খনির ব্যাপারে প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে কাজকর্ম দেখাশোনা করছিল তখন তার মনে হচ্ছিল সে যেন তার যৌনক্ষমতাও ফিরে পেয়েছে। কনি প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে সে বুঝতে পারে ক্লিফোর্ডের একথার অন্তরালে একটা গভীর মানে লুকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড এই কথাই বলতে চাইছে কনি যে কোনভাবে সন্তান ধারণ করতে পারে এবং সে সন্তানের দায়িত্ব ও পিতৃত্ব সে মেনে নেবে। সে সন্তান তার ঔরসজাত না হয়েও হবে তার সন্তান।

কনির কথাটা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মিসেস বোল্টন। একথা বিশ্বাস করতে পারল না সে কোন মতে। তবে অবশ্য আজকাল ডাক্তাররা অনেক অসাধ্য সাধন করে।

মিসেস বোল্টন এবার মুখে বলল, সত্যিই ম্যাডাম, আমি আশা করি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার সন্তান হোক। তাহলে আপনার নিজের ও

সকলের পক্ষেই খুব ভাল হয়। র‍্যাগবির এই বাড়িতে সন্তান এলে সব কিছুই বদলে যাবে।

কনি বলল, তাই না কি ?

কনি এবার ষাট বছর আগেকার তিনখানা ছবি বেছে নিয়ে রেখে দিল আলাদা করে। শর্টল্যাণ্ডের ডিউকপত্নীকে পাঠাবে সে। তিনি আবার এইগুলো দাতব্য বাজারে কম দামে বিক্রি করবেন। ক্লিফোর্ড কিন্তু ডিউকপত্নীকে মোটেই দেখতে পারে না।

এদিকে মিসেস বোল্টন মনে মনে বলতে লাগল, হায় ম্যাডাম, তুমি অলিভার মেলর্সএর ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। হা ভগবান! তার মানে র‍্যাগবির দোলনায় আসবে তেভারশালের ছেলে। কী লজ্জার কথা!

পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে ষাট সত্তর বছর আগেকার তৈরি এক কালো কাঠের বড় একটা বাক্স পেল কনি। বাক্সর ঢাকনাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বই, কলম, দোয়াত, সেলাইএর জিনিসপত্র, ছুরি কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি নানারকমের জিনিস দেখতে পেল।

এ বাক্সটার কারুকার্য খুব সুন্দর হলেও চ্যাটার্লি পরিবারের উত্তরপুরুষরা এটা সেকেলে বলে ব্যবহার করতেন না। তাই এটা রুদ্ধ ঘরের এক কোণে পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

কিন্তু এই বাক্স দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল মিসেস বোল্টন। বলল, কি চমৎকার বাক্সটা! এর ভিতর দাড়ি কামানোর ব্রাশ আর তিনটে কী সুন্দর কাঁচি রয়েছে দেখুন। পয়সা দিলেও অমন জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে না।

কনি বলল, তাই নাকি ? তাহলে তুমি ওটা নাও।

না, না ম্যাডাম। একি বলছেন ?

কনি বলল, তুমি এটা না নিলে পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এটা এখানেই এইভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি তাহলে এটা ডিউকপত্নীকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তাঁকে ত আরো জিনিস পাঠানো হচ্ছে।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

কনি হেসে বলল, এর জন্য তোমায় আর চেষ্টা করতে হবে না।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বোল্টন সেই বড় বাক্সটা তুলে নিয়ে কোনরকমে চলে গেল সেখান থেকে। তার একটু পরে ড্রাইভার বেটস্ মিসেস বোল্টনকে নিয়ে তার তেভারশাল গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে পৌছে দিল। সেখানে পাড়ার মেয়েদের দেখাল বাক্সটা। তারা সবাই একবাক্যে প্রশংসা করল বাক্সটার। তারপরেই শুরু হলো লেডি চ্যাটার্লির সন্তান নিয়ে চাপা চর্চা আর যতসব জল্পনা কল্পনা।

কেমিস্টের স্ত্রী মিসেস উইডন বলল, যাই হোক, সন্তান হলেও এ বিষয়ে

বিস্ময়ের আর অবধি থাকবে না।

মিসেস বোল্টন এবিষয়ে নিশ্চিত যে লেডি চ্যাটার্লির যদি সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান হবে স্যার ক্লিফোর্ডেরই ঔরসজাত।

সেইদিনই কিছু পরে গাঁয়ের রেক্টর ক্লিফোর্ডের কাছে এসে বলল, র‍্যাগবির উত্তরাধিকারীর জন্য এবার কি তাহলে আমরা আশা করতে পারি? সবই দয়ালু ঈশ্বরের হাত।

কণ্ঠে একই সঙ্গে কিছু শ্লেষ আর বিশ্বাস ঢেলে ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি।

আজকাল সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে ক্লিফোর্ড, তার দ্বারা সন্তান উৎপাদন একদিন সম্ভব হবে।

একদিন বিকালে লেসলি উইণ্টার নামে একজন ভদ্রলোক বেড়াতে এল র‍্যাগবির বাড়িতে। লোকে তাঁকে স্কুয়ার উইণ্টার বলত। তিনি এসে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কোলিয়ারির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

ক্লিফোর্ডের ধারণা এই যে, তার কোলিয়ারিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তা গুণের দিক থেকে ভাল না হলেও সেগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে শক্ত করে এমন এক জ্বালানি কয়লায় রূপান্তরিত করা যায়, যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্বলবে।

লেসলি বললেন, কিন্তু সেই সব জ্বালানি কয়লা পোড়াবার এঞ্জিন পাবে কোথায়?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি নিজে সে এঞ্জিনের ব্যবস্থা করব। আমি নিজেই সে কয়লা পোড়াব। আমি তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব।

লেসলি বললেন, তা যদি হয় তাহলে তা চমৎকার হবে। আমার থেকে এবিষয়ে যদি কোন উপকার হয়, আমি যদি কোন প্রকারে কাজে লাগতে পারি তাহলে সানন্দে আমি তা করব। আমার এখন বয়স হয়েছে। আমার কোলিয়ারিগুলোও আমার মতই সেকেলে। আজ আমার ছেলে থাকলে সেও তোমার মতই নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা দিয়ে এই সব কোলিয়ারিকে নতুন করে ঢেলে সাজাত। সত্যিই চমৎকার তোমার পরিকল্পনা এবং আমি বলছি তুমি সফল হবেই। যাই হোক, আচ্ছা শুনছি নাকি র‍্যাগবিতে তোমার উত্তরাধিকারীর জন্ম হচ্ছে, এই সব কি সত্যি?

ক্লিফোর্ড পাল্টা প্রশ্ন করল, এ ধরনের গুজব রটেছে নাকি?

লেসলি বললেন, ফিলিংউডের মার্শাল আমাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন। এ ছাড়া আর আমি কিছু বলতে পারব না। তবে যদি এ গুজব মিথ্যা বা ভিত্তিহীন হয় তাহলে কথাটা আমি আর কোথাও তুলব না।

ক্লিফোর্ড কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করলেও তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে। তবে আশা আছে এই পর্যন্ত বলতে পারি।

লেসলি উইণ্টার আবেগের সঙ্গে ক্লিফোর্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা

টেনে নিয়ে মর্দন করে বলল, এ আশার গুরুত্ব আমার কাছে কতখানি তা বুঝতে পারছ? এইভাবে তোমার বংশরক্ষা হলে তেভারশালের শ্রমিকরা যুগ যুগ ধরে তোমার খনিতেই কাজ করে যাবে।

বৃদ্ধ লেসলি সত্যিই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

পরদিন কনি একটা কাচের ফুলদানিতে কতকগুলো হলদে ফুল সাজিয়ে রাখছিল।

ক্লিফোর্ড বলল, কনি, তুমি কি জান তুমি র‍্যাগবিকে এক উত্তরাধিকারী দান করতে চলেছ এই ধরনের গুজব রটেছে?

কনি ভয় পেয়ে গেল। ম্লান হয়ে গেল তার মুখখানা। তবু সে ফুলগুলো ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। পরে বলল, না। এটা কি তোমার ঠাট্টা না হিংসার কথা?

ক্লিফোর্ড একটু থেমে উত্তর করল, দুটোর কোনটাই নয়। এমনি আশা করছি। আশা করছি, এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য হয়।

কনি ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আমি আজ সকালে বাবার একখানি চিঠি পেয়েছি। ভেনিস থেকে স্যার আলেকজাণ্ডার কুপার তার ভিলাতে জুলাই আর আগস্ট এই দু মাস কাটাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাবা তা গ্রহণ করেছেন। বাবা এ বিষয়ে আমাকে সচেতন করে দিয়েছেন।

ক্লিফোর্ড বলল, জুলাই আর আগস্ট দু মাস?

কনি বলল, আমি অতদিন অবশ্য থাকব না। কিন্তু তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি বিদেশে যাব না।

কনি ফুলগুলো জানালার ধারে নিয়ে গেল। তারপর বলল, আমি গেলে তুমি কিছু মনে করবে না ত? তুমি জান এবারকার গ্রীষ্মটা ওখানে কাটানোর কথা আগেই হয়েছিল।

কতদিনের জন্য যাবে?

বোধহয় তিন সপ্তার জন্য।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর ক্লিফোর্ড বলল, আমি তিন সপ্তার জন্য তোমাকে অবশ্যই ছাড়তে পারি যদি তুমি কথা দাও তুমি আবার ফিরে আসবে।

কনি বলল, আমি ফিরে আসতেই চাই।

কথাটা জোর দিয়ে বলল কনি। সে কিন্তু আসলে ভাবছিল সেই লোকটার কথা।

ক্লিফোর্ড একথা বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করল কনি তারই জন্য ফিরে আসবে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটা আনন্দ অনুভব করল। বলল,

তাহলে সব ঠিক আছে। তুমি যেতে পার। তাই না কি?

কনি বলল, আমিও তাই মনে করি।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি তাহলে এই পরিবর্তনটা বেশ উপভোগ করবে?

কনি তার অদ্ভুত নীল চোখদুটো তুলে ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। তারপর বলল, আমি আবার ভেনিস দেখতে যাব, কোন এক নির্জন দ্বীপের সমুদ্রকূলে স্নান করব। তুমি জান আমি লিডোকে ঘৃণা করি। তার উপর আমার যতদূর মনে হয় আলেকজাণ্ডার কুপার আর লেডি কুপারকে আমার মোটেই পছন্দ হবে না। তবে হিলদা যদি আমার সঙ্গে যায় আর আমাদের একটা ডিঙি নৌকো থাকে তাহলে চমৎকার হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কথাটা কনি সত্যিই অন্তরের সঙ্গে বলল। সত্যিই সে এইভাবে সুখী করতে চেয়েছিল ক্লিফোর্ডকে।

ক্লিফোর্ড বলল, কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। ক্যালে বন্দরের ঘাটে ওভ্যু নর্দ প্রভৃতি জায়গায় আমার কি অবস্থা হবে?

কি আর হবে? যুদ্ধে আহত কত লোককে আমি চেয়ারে বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। তাছাড়া আমরা প্রায় সব রাস্তাই মোটরযোগে যাব।

তা সত্ত্বেও দুজন লোককে সঙ্গে নিতে হবে।

না, তার দরকার হবে না। হিলদা আর আমি দুজনেই আমরা সামলে নেব। তাছাড়া ওখানে ত একজন লোক থাকবেই।

তবু ঘাড় নাড়ল ক্লিফোর্ড। বলল, এ বছর নয় প্রিয়তমা, এ বছর নয়। পরের বছর চেষ্টা করব।

ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল কনি। পরের বছর! কে জানে কি হবে পরের বছর? ভেনিসে যাবার তার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবে সে যাচ্ছে কিছুটা সংযম সাধনার জন্য। এখানে থাকলে অসংযত কামনার ক্রমবর্ধমান তাড়নায় ক্রমশই লোকটার খপ্পরে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে। তাছাড়া সত্যি সত্যিই যদি তার গর্ভে সন্তান আসে তাহলে ভেনিস থেকে ঘুরে এলে ক্লিফোর্ড ভাববে ভেনিসে তার কোন প্রেমিক আছে এবং এ সন্তান তারই ঔরসজাত।

তখন মে মাস শুরু হয়ে গেছে। জুন মাসেই তাকে রওনা হতে হবে। এই সব যাওয়ার প্রস্তুতি মোটেই ভাল লাগে না কনির। এইভাবে সব সময়ই একজনের আবির্ভাবের জন্য একজনের জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। গাড়ির চাকা নয়, আসলে অদৃষ্টের চাকাই মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মে মাস পড়ে গেছে। তবু ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির বিরাম নেই। এই ধরনের আবহাওয়া ফসলের পক্ষে ভাল। কনিকে একবার তাদের আঞ্চলিক শহর আথওয়েটে যেতে হলো। ছোট শহর আথওয়েটে চ্যাটার্লি পরিবারের এখনো

বিরাট প্রতিপত্তি। কনি একাই গেল সেখানে। ফিল্ড গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

বসন্তের আগমনে সবুজ হয়ে উঠেছে চারদিক। তবু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে গাঁয়ের সমস্ত পথঘাট। একে কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। প্রায়ই বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছিল এক দূষিত বাষ্প ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

একের পর এক করে চড়াই পার হয়ে ছুটে চলল গাড়ি। পথের দুধারে শুধু কালো ইটের বাড়ি, মাঝে মাঝে মাটির বাড়িও আছে। কিন্তু কয়লার গুঁড়োয় সব ঘরবাড়ি ঢেকে যাওয়ায় কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আছে মুদিখানা, তরিতরকারি প্রভৃতির নানারকমের দোকান। প্রতিটি দোকানে পণ্যদ্রব্য সাজানো আছে। সব কুৎসিত লাগে চোখে। এর উপর আছে এক সিনেমা হল। সামনে নতুন ছবির ঘোষণা, 'নারীর প্রেম।' তারপর আছে চার্চ, স্কুল, খেলার মাঠ। একটা স্কুলে পাঁচটা মেয়েকে গান শেখানো হচ্ছিল। কিন্তু যখন গাড়ি থামিয়ে তাতে পেট্রোল ভরছিল তখন গাড়িতে বসে বসে সে গান শুনছিল কনি। কনির মনে হলো, এদের মধ্যে কোন প্রাণবন্ত সৃষ্টিশীল অনুভূতি নেই। এক যান্ত্রিক কৃত্রিমতা এদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। নিষ্প্রাণ করে রেখেছে।

উল্টো দিক থেকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কয়লাবোঝাই গাড়ি আসছিল। ড্রাইভার ফিল্ড সেটা কাটিয়ে চলে গেল। ডাকঘর, বাজার সব পার হলো একে একে। কয়েকজন পথচারী চ্যাটার্লিদের গাড়ি দেখে অভিবাদন জানাল। এই সব মিলিয়ে হচ্ছে তেভারশাল গাঁ। ইংল্যাণ্ডের এক গাঁ। শেক্‌সপীয়ারের ইংল্যাণ্ড। এ গাঁয়ে আসার পর থেকে কনি বুঝতে পারে আজকের এই ইংল্যাণ্ড এমন এক নতুন জাতের মানুষ সৃষ্টি করছে যারা অতিমাত্রায় অর্থসচেতন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাও প্রখর। কিন্তু স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টিশীল ভাব বা অনুভূতির দিক থেকে তারা অর্ধমৃত। এ সব দিক দিয়ে কিছুই ব্যক্ত করতে পারে না তারা। কোন বিষয়ে তাদের কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। কনি যখন দেখল লরীভর্তি শেফিল্ডের শ্রমিকরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে তখন তার গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল। তখন তার মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে এল, হা ভগবান! মানুষ মানুষের কি অবস্থা করেছে! লোকগুলোকে কেমন প্রাণহীন দেখাচ্ছে। ওদের নেতারা কি করছে ওদের নিয়ে? ওদের দ্বারা আর কোন কাজ হবে না।

আবার একটা ভয়ের ঢেউ খেলে গেল কনির মনে। এক ধূসর অসহায়তাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। যে দেশে এই সব লোক শিল্পশ্রমিক আর যেখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তার চেনাজানা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মত, সে দেশের সত্যিই কোন আশা নেই। তবু সে সন্তান চাইছে, চাইছে র‍্যাগবির এক উত্তরাধিকারী। ভয়ে কেঁপে উঠল কনি।

মেলর্স কিন্তু এই ধরনের সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, বেরিয়ে অবশ্য এসেছে, কিন্তু কনি যতখানি এসেছে ও এসেছে ঠিক ততখানি। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যেই বা তেমন মিল কোথায়? অন্তরঙ্গতা কোথায়? দুজনের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে শুধু ব্যবধান। অথচ এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ জুড়ে আছে এই সব মানুষ।

স্ট্যাক গেটের উঁচু জায়গাটায় গাড়ি উঠতে লাগল। তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাসে নতুন বসন্তের গন্ধ আর উজ্জ্বলতা ভেসে বেড়াচ্ছিল। এখানকার পথ উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো। এ পথ দক্ষিণে চলে গেছে একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে আর পূব দিকে গেছে ম্যানস্ফিল্ড আর নটিংহামের দিকে। কনি যাবে দক্ষিণে।

গাড়িটা যখন উপরে উঠছিল তখন কনি বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ঢালু জায়গার উপরে ডিউকদের ওয়ারটপ প্রাসাদের ছায়াচ্ছন্ন মাথাটা উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদটার নিচে চারদিকে গড়ে উঠেছে খনিশ্রমিকদের লালরঙের বাসাগুলো। তারও নিচে কয়লার একটা খাদ থেকে কালো ধোঁয়া আর সাদা বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। কনি ভাবল ঐ খাদ থেকে প্রতি বছর ডিউক আর অন্যান্য অংশীদারেরা হাজার হাজার পাউণ্ড পায়। পুরনো দিনের বিশাল প্রাসাদটার ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তকে আড়াল করে।

একটা মোড় ঘুরেই কনির গাড়িটা স্ট্যাক গেটের কাছে গিয়ে পড়ল। স্ট্যাক গেট হচ্ছে একটা নূতন বড় হোটেল যার সাদা আর লাল রঙের বাড়িটা ওর রাস্তা হতে দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সাধারণের পথ আর পথচারীদের সব সম্পর্ক হতে নিজেকে বাঁচিয়ে দূরে রেখে এক উদ্ধত অসামাজিক নির্জনতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল বাড়িটা। কিন্তু বাঁ দিকে তাকালেই দেখা যাবে সারবন্দী অজস্র আধুনিক ধাঁচের বাড়ি। প্রতিটা বাড়ির আশপাশে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা আর বাগান। সেটা পার হয়ে কিছু আধুনিক উন্নতমানের কয়লাখনি আর ওষুধের কারখানা দেখতে পাওয়া যায়।

এই হলো স্ট্যাক গেট। যুদ্ধের সময় নতুন করে তৈরি হয়। পুরনো স্ট্যাক গেটের বাড়িটা এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। তার আশপাশে ছিল একটা পুরনো আমলের ছোট্ট কোলিয়ারি আর কালো ইটের কতকগুলো পুরনো ধরনের বাড়ি। তার মাঝে একটা চার্চসংলগ্ন কবরখানা। তখন হোটেলটা খনিশ্রমিকদের মদ খাবার আড্ডাখানা ছিল।

কনি যখন র‍্যাগবিতে প্রথম আসে তখন হোটেলের ঐ নতুন বাড়িটা হয় আর তার চারপাশের ঐ বাড়িগুলোও গড়ে ওঠে।

চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া গড়িয়ে যাওয়া ঢালু পথ বেয়ে গাড়ি উপরে উঠতে লাগল। একদিন এ অঞ্চল ছিল এক সম্ভ্রান্ত জায়গা; যতসব অভিজাত শ্রেণীর লোকদের বাস। সামনের দিগন্তটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল

চাদউইক প্রাসাদ। প্রাসাদ হিসাবে এলিজাবেথের যুগের এ এক প্রসিদ্ধ নিদর্শন। এ প্রাসাদের দেওয়ালের থেকে জানালাগুলোই বেশী চোখে পড়ে। সুদূর অতীতের এক নীরব নির্জন সাক্ষী হিসাবে একটা পার্কের উপর একা একা দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদটা। অতীত আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবেই এ প্রাসাদের অস্তিত্বকে আজও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত পথিককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ প্রাসাদ যেন এক নীরব ভাষাময়তায় বলছে, দেখ, অতীতে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কেমনভাবে বাস করতেন, কত সম্পদের তাঁরা অধিকারী ছিলেন!

এ সব অতীতের কথা। সে সব দিন কেটে গেছে। বর্তমান কাল তাঁরই নিচে শায়িত আজ। ভবিষ্যৎ কোথায় তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। গাড়িটা এবার খনিশ্রমিকদের কালো কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে নিচু পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছিল আথওয়েটের দিকে। দিনটা কেমন ভিজে ভিজে থাকায় সারা আথওয়েটের আকাশ বাতাস জুড়ে জমে ছিল চাপ চাপ ধোঁয়া আর বাষ্পরাশি। আথওয়েট উপত্যকার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে ইস্পাতের এক মোটা রশির মত রেলপথ চলে গেছে শেফিল্ড পর্যন্ত। অন্য দিকে তার কয়লাখনি আর ইস্পাত কারখানা সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর তার থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বার হচ্ছিল। এ ধোঁয়া, এ কয়লা, এ ইস্পাত মনটা বিষিয়ে দেয় কনির। এ সব দেখতে মোটেই ভাল লাগে না তার। আসলে আথওয়েট জায়গাটা এক বাজারে শহর। এ শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল হলো চ্যাটার্লি আর্মস্। আথওয়েটের লোকেরা র‍্যাগবি বলতে শুধু র‍্যাগবি প্রাসাদটাকে বোঝায় না, তারা জানে র‍্যাগবি হলো একটা গ্রাম-অঞ্চলের নাম। জানে তেভারশাল গ্রামের পাশেই আছে র‍্যাগবি হল। তার মানে র‍্যাগবি প্রাসাদ।

খনিশ্রমিকদের কালো কালো বাড়িগুলো ফুটপাথের উপর ক্ষুদ্রতায় ও বৈশিষ্ট্যহীনতায় সমান হয়ে সকলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। এ সব কুঁড়েগুলো প্রায় একশো বছরের পুরনো। বাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগেকার লম্বা গ্রাম্য পথটা আজ পরিণত হয়েছে প্রশস্ত শহুরে রাজপথে। এই সব দেখে আজ আগেকার সেই উদার উন্মুক্ত গ্রাম্য পথের কথা নিঃশেষে মুছে যায় মন থেকে যে গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে এক প্রাণহীন প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে সেই ভূতুড়ে প্রাসাদটা। এবার পথের একদিকে ধার ঘেঁষে চলে গেছে রেললাইন আর একদিকে গড়ে উঠেছে নানারকমের কলকারখানার বিশাল প্রাচীর। তাদের প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবে লোহার ঘর্ষণজনিত আওয়াজ শোনা যায় অনবরত আর মাল বোঝাই বড় বড় লরীগুলো মেদিনী কাঁপিয়ে দিয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকে কলকারখানার মাঝে।

আবার ডান দিকে ঘুরতে হয় গাড়িটাকে। চার্চের পিছন দিয়ে গিয়ে ধরতে হয় শহরের আঁকাবাঁকা পথ। কিন্তু এ শহর এমনই প্রাচীন যে মনে হয় যেন দুই

শতাব্দী আগেকার এক রাজ্যে এসে পড়েছি সহসা পথ ভুলে। রাস্তার ধারে একটা পুলিশ হাত দেখিয়ে লরী পাশ করাচ্ছিল।

গাড়িতে করে পথে যেতে যেতে বর্তমান ইংল্যাণ্ডের ছবি দেখতে দেখতে দেশের অতীত ইতিহাসের কথা মনে পড়ল কনির। আজ কোন ইংল্যাণ্ডের ছবি দেখছে কনি? আজকের দিনের এ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে রাণী এলিজাবেথ বা রাণী এ্যানীর ইংল্যাণ্ডের কোন সম্পর্কই নেই। আজকের যুগে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও পুরনো আমলের বড় বড় প্রাসাদগুলো ছেড়ে শহর বাজারে গিয়ে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের আধুনিক উপকরণের খোঁজে প্রচুর টাকা খরচ করছে।

একেই বলে ইতিহাস। আজকের ইংল্যাণ্ড অতীতের ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিয়েছে ঠিক যেমন করে একদিন ভবিষ্যতের ইংল্যাণ্ড আজকের এই ইংল্যাণ্ডকে মুছে দেবে নিঃশেষে। আজকের যুগে যে সব খনি ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে তা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের হাতে অনেক ধনসম্পদ এনে দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরনো আভিজাত্যের প্রাচীন নিদর্শন তাদের স্থাপত্যকলা-মণ্ডিত বড় বড় প্রাসাদগুলোকে দিয়েছে একেবারে ধ্বংস করে। এমন কি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সেই কুটিরগুলোও আর নেই; তাদের জায়গায় গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের সারবন্দী কোয়ার্টার। কৃষিভিত্তিক ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিয়ে তার জায়গায় মাথা তুলে উঠেছে শিল্পভিত্তিক ইংল্যাণ্ড। কি, এ পরিবর্তন স্বতস্ফূর্ত হলে বলার কিছু ছিল না; আসলে এ পরিবর্তন যান্ত্রিক ও কৃত্রিম বলেই কনির তাতে আপত্তি।

কনি যে সম্প্রদায়ের মেয়ে সে সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ অলস বলে বর্তমান যুগে কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না নিজেদের। কনি তাই পুরনো ইংল্যাণ্ডকেই বেশী ভালবাসে। এটা বুঝতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছে কনির। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের আঘাত তাদের একান্ত প্রিয় পুরনো ইংল্যাণ্ডকে মুছে দিচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে একেবারে। শিপলের দিন ফুরিয়ে এসেছে। স্কুয়ার উইণ্টারের প্রিয় খনি শিপলে।

কনি একবার যাবার পথে শিপলের কাছে নামল। গেটটা খোলাই ছিল। সেইখানে একটু থেকে গাড়িটা নিয়ে লেসলি উইণ্টারের বাসভবনের সামনে চলে গেল। চমৎকার বাগান বাড়ির পাশে। এ বাড়ির শান্ত নির্জন পরিবেশ বড় মনোরম লাগে কনির। র‍্যাগবির থেকে এ জায়গাটা ভাল লাগে তার।

লেসলি উইণ্টার বাড়িতে একাই ছিলেন। তিনি বাড়িটাকে অতি যত্নে সাজিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোলিয়ারিগুলো তার সাজানো সুন্দর পার্কটার অনেকখানি গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে। উনি বলেন খনি আর খনিশ্রমিকরা তাঁকে অনেক অর্থ দান করেছে। এইভাবে তাঁর সৌন্দর্যবোধ আপোষ করে তাঁর অর্থলিপ্সার সঙ্গে।

একবার প্রিন্স অফ ওয়েলস লেসলির কাছে বেড়াতে এলে লেসলি তাঁকে বলেছিল, যে কোলিয়ারি আমাদের আয়ের উৎস সেই কোলিয়ারির জন্ত পার্কটা যায় ত যাক।

শুনে প্রিন্স অফ ওয়েলস বলেছিলেন, আমার বাড়ির উঠোনে যদি কয়লার খনি পাওয়া যায় ত খুবই ভাল হয়। আমি আমার বাড়ি ও বাগানের সমস্ত প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যের বিনিময়েও কয়লা খনিকে ভালবাসব।

কনির মনে হলো প্রিন্স অফ ওয়েলস তখন অর্থ ও ধনসম্পদের মধ্যে যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন, শিল্পোন্নতির মধ্যে যে বিধাতার আশীর্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন তা অতিশয়োক্তি। যাই হোক, এই যুবরাজই পরে রাজা হন। তারপর সে রাজা মারা যান। তাঁর জায়গায় এসেছেন নতুন রাজা।

কনি দেখল, এখন লেসলিদের পার্কটার চারধারে খনিশ্রমিকদের বস্তী গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে এক নতুন গ্রাম।

স্কুয়ার লেসলি উইণ্টার ছিলেন এক সৈনিক। তিনি জীবনে লাভের জন্য সব ক্ষয়ক্ষতিও বীরের মতই সহ্য করতে পারেন এবং করেছেনও তাই। কিন্তু আজকাল তিনি খাওয়ার পর রাত্রে পার্কে আর বেড়াতে যান না।

লেসলি উইণ্টার পার্ক দিয়ে বেড়াতে না গেলেও একথা ভেবে একটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন যে, এ খনি, এ শ্রমিকবস্তী, এ বাড়ি—এসব তাঁর। কিন্তু এই ব্যাপক অধিকারবোধের অন্তরালে লুকিয়েছিল ভীরু একটা শূন্যতাবোধ। তাঁর প্রায়ই মনে হত তাঁর এই খনি আর কলকারখানার একটা নিজস্ব জীবন আছে, একটা নিজস্ব ইচ্ছা আছে এবং এই সমন্বিত ইচ্ছার এক বর্বর ব্যাপকতা তাঁর মত এক ভদ্রলোকের অতি মার্জিত সৌখীন সুন্দর ইচ্ছাটাকে মুছে দিতে চাইছে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, সেই ইচ্ছার প্রবলতর ব্যাপকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কোন লাভ নেই। আসলে তিনি যেন হারিয়ে যেতে বসেছেন। অথচ তার বিরোধিতা করতে গেলে তাঁর জীবনটাই হয়ত চলে যেতে পারে।

পার্ক দিয়ে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন লেসলি। দিনরাত বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থাকতেন যেন তিনি। একদিন লেসলি এর আগে কনির সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলেন কথা বলতে বলতে কিন্তু হঠাৎ যখন একদল খনিশ্রমিক সেই দিকে চলে যাচ্ছিল তখন তিনি খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কারণ তারা ওঁদের কোন অভ্যর্থনাই জানাল না। কনির মনে হলো খনিশ্রমিকদের কাছে অস্বস্তি অনুভব করছেন লেসলি। একদল ব্যাধের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্তদৃষ্টি এক মৃগের মত মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। অথচ এই খনিশ্রমিকরা ব্যক্তিগতভাবে কোন যে শত্রুভাব পোষণ করে চলে লেসলির প্রতি তা নয়; তবে তারা আশ্চর্যভাবে উদাসীন তাঁর প্রতি। কোন সম্মান দেখানো দূরের কথা, তারা তাঁকে হৃদয়হীনভাবে উপেক্ষা করে চলে। তারা যেন তাঁর অভিজাত

ও ঐশ্বর্যপুষ্ট অস্তিত্বের প্রতি অস্বাভাবিক রকমের ঈর্ষান্বিত। 'আমরা যার জন্য এত কষ্ট করে চলেছি সে কত সুখে আছে' এই ধরনের একটা ভাব।

লেসলিও একজন ভূতপূর্ব সৈনিক হিসাবে তাঁর ইংরাজসুলভ যুক্তিবাদী অন্তরের অন্তঃস্থলে বেশ বুঝতে পারেন তাঁর খনিশ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর অবস্থাগত এই অসাম্যের মধ্যে তোমার যেন একটা গলদ আছে। এই অসাম্যের প্রতি তাদের চাপা বিক্ষোভের ও ঈর্ষার ভাবটা ন্যায়সঙ্গত। তবু এটাও ঠিক যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোন দোষ নেই, দোষ যা কিছু তা সমাজব্যবস্থার এবং তিনি এক সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র এবং এইভাবেই তাঁকে টিকে থাকতে হবে।

মৃত্যু ছাড়া কোন গতি নেই। কনির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই হঠাৎ মৃত্যু হয় লেসলির। মৃত্যুকালে তাঁর উইলে তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ ক্লিফোর্ডকেও দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর পার্কটার সব গাছ কেটে তাঁর পুরনো আমলের বাড়িটা ভেঙ্গে কোলিয়ারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। একটা বছরের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। নতুন ইংল্যাণ্ড এইভাবে পুরনো ইংল্যাণ্ডের একটা উপাদান এই শিপলে হল আর তার পার্ক বাগান সব গ্রাস করে নেয় নিঃশেষে। এরপর হয়ত একদিন র‍্যাগবি হলকেও গ্রাস করবে। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে কনি তা জানে না। জানতে চায় না, সে শুধু এক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত পুরুষের বলিষ্ঠ বুকের তলায় মুখ গুঁজে লুকিয়ে থাকতে চায় এই কালগত পরিবর্তনের সতত উত্তাল স্রোতোধারার মাঝে। এ স্রোতকে সব সময় আলগোছে এড়িয়ে চলতে চায় কনি। কী ভয়ঙ্কর করাল তার গতি।

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে দুপাশে খনিশ্রমিকদের দেখে তার কেবলি মনে হতে লাগল লোকগুলো কত শান্ত নিরীহ। কিন্তু বড় নিষ্প্রাণ। ওদের যেন কোন অস্তিত্বই নেই। ওরা ভাল, কিন্তু ওরা যেন এক একটা গোটা মানুষ নয়, মানসিক সত্তার অর্ধেক। কিন্তু ওদেরও সন্তান হয়। ওদের ঔরসজাত সন্তানকে নারীরা গর্ভে ধারণ করে। কথাটা মনে হতেই গাটা শিউরে ওঠে কনির। মনে মনে বলে উঠল, হা ভগবান, ওদের আবার সন্তান।

কিন্তু মেলর্স ত এদেরই একজনের সন্তান। তফাৎ শুধু চল্লিশটা বছরের। এই সব খনিশ্রমিকদের জীবনে কোন সৌন্দর্য নেই, তাদের মধ্যে কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই, জ্ঞান নেই। তারা শুধু খাদের ভিতর কাজ করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। বছরের পর বছর ধরে এইভাবে কাজ করতে করতে কয়লা আর লোহা তাদের দেহ মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়েছে। কুৎসিত করে তুলেছে তাদের জীবনটাকে।

জীবন কত কুৎসিত হতে পারে তার একটা মূর্ত প্রতীক যেন তারা। তথাপি জীবন্ত। এই কুৎসিত জীবনের বোঝাকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে তারা। পৃথিবী গর্ভে কয়লা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের অস্তিত্বও থাকবে। কয়লা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর কাছে অনবরত থেকে থেকে এক অমানবিক ধাতুগত

সৌন্দর্য অবশ্য তারা লাভ করেছে। কিন্তু জলের মাছের মত পুরনো পচা কাঠের পোকার মত তাদের সে সৌন্দর্য একান্তভাবে বস্তুগত, তার মধ্যে কোন প্রাণ বা মনুষ্যত্ব নেই।

বাড়িতে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কনি। ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কিছু আজেবাজে কথা বলতেও তার ভাল লাগছিল। সারা মিডল্যাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কয়লা আর লোহার এক ব্যাপক ভয়ের শিহরণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মত কাঁপিয়ে তুলতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

কনি বলল, বোল্টনের দোকানে নেমে চা খেতে হলো আমায়।

ক্লিফোর্ড বলল, উইণ্টার তোমাকে চা দিত।

তা অবশ্য বটে, কিন্তু বোল্টনকে হতাশ করতে পারলাম না। মিস বোল্টনের মেজাজটা বেশ রোমাণ্টিক। তাছাড়া ওর চা করার মধ্যে ধর্মগত একটা নিষ্ঠা আর পবিত্র ভাব আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, আমার কথা কিছু বলছিল?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে আমাকে বলল, 'স্যার ক্লিফোর্ড কেমন আছেন?' আমার মনে হয় সে তোমাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে নার্স ক্যাডেলের থেকেও।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আমি খুব ভাল আছি, ঠিক ফোটা ফুলের মত।

হ্যাঁ, তাই বলেছি। আর তা শুনে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে এমনি একটা ভাব হলো তার। আমি তাকে বললাম, ভেভারশালে এসে অবশ্যই যেন তোমাকে দেখতে আসে।

আমাকে দেখবে? কি জন্য?

কেন, হ্যাঁ তোমাকে ক্লিফোর্ড। সে তোমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে। তার প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। তার চোখে তোমার তুলনায় ক্যাপাডোসিয়ার সেণ্ট জর্জও কিছু নয়।

তোমার কি মনে হয় সে আসবে?

কনি বলল, তোমার কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখটা। মুহূর্তের জন্য তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আহা বেচারী! যে সব মেয়ে তাদের ভালবাসে শ্রদ্ধা করে পুরুষরা কেন যে তাদের ভালবাসে না?

ক্লিফোর্ড বলল, মেয়েরা বড় দেরী করে ভালবাসে। কিন্তু সে কি আসবে?

কনি বলল, সে আমাকে বলল, ম্যাডাম, আমার ত যেতে সাহসই হচ্ছে না।

ক্লিফোর্ড বলল, সাহস হচ্ছে না! কি অবাস্তর কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সে আসবে না। তার চা-টা কেমন ছিল?

লিপটনের চা এবং বড় কড়া। কিন্তু ক্লিফোর্ড তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি তার কাছে রোমের গোলাপের মতই সুন্দর।

আমি তোষামোদে গলি না।

কনি বলল, সচিত্র কাগজে তোমার যে সব ছবি বেরিয়েছিল সেই ছবিগুলো মিসেস বোল্টন সযত্নে রেখে দিয়েছে এবং মনে হয় সে প্রতি রাতে তোমার জন্য প্রার্থনা করে। সত্যিই বড় আশ্চর্য লাগে।

কনি উপরতলায় পোষাক পাল্টাবার জন্ত গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিফোর্ড কনিকে প্রশ্ন করল, বিয়ের বন্ধনের মধ্যে চিরন্তন একটা কিছু আছে এটা তুমি মনে কর না ?

কনি ক্লিফোর্ডের মুখপানে তাকাল। বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড, আমার মনে হচ্ছে অনন্ত বা চিরন্তন বলতে তুমি বোঝাচ্ছ একটা ঢাকনা বা লম্বা শৃংখল যা মানুষ যতদূরেই যাক তাকে পিছনে ছুটে গিয়ে ধরবে।

কনির পানে বিরক্তির সঙ্গে তাকাল ক্লিফোর্ড। সে বলল, আমি বলতে চাইছি, তুমি নিশ্চয় কারো সঙ্গে প্রেম করতে ভেনিসে যাচ্ছ না ?

কনি বলল, ভেনিসে প্রেম করার আশায় যাচ্ছি ? না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি।

এমন এক অদ্ভুত ঘৃণার সঙ্গে কথাগুলো বলল কনি যে সে তার পানে তাকিয়ে ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করল ক্লিফোর্ড।

পরদিন সকালে উপরতলা থেকে নিচের তলায় নামতেই ক্লিফোর্ডের ঘরের বাইরে মেলর্স-এর কুকুরটাকে বসে থাকতে দেখল। কুকুরটা চাপা গলায় এক মৃদু গর্জন করছিল। কনি তার কাছে গিয়ে বলল, কি ফ্লসি, এখানে তুমি কি করছ ?

এর পর কনি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল ক্লিফোর্ড তার বিছানায় বসে আছে আর তার পা তলার দিকে মেলর্স দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডের হুকুমের কথা শুনছে। দরজাটা খোলা পেয়েই তার কুকুর ফ্লসি ভিতরে ঢুকে পড়ল। মেলর্স তাকে ইশারা করতেই সে ঘরের বাইরে চলে গেল আবার।

কনি ক্লিফোর্ডকে বলল, প্রাতঃ নমস্কার ক্লিফোর্ড। আমি জানতাম না তুমি ব্যস্ত আছ।

তারপর মেলর্সএর দিকে তাকিয়ে তাকেও প্রাতঃ নমস্কার জানাল। মেলর্স অস্পষ্টভাবে কি বলল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কামাবেগের শিহরণ খেলে গেল তার সারা অঙ্গে।

কনি আবার বলল, আমি কি তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি ক্লিফোর্ড ?

ক্লিফোর্ড বলল, না, মোটেই না, আমার কাজটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি। দোতলায় গিয়ে জানালার ধারে বসে মেলর্সএর পথপানে তাকিয়ে রইল। মেলর্স তার স্বভাবসুলভ নীরব গাম্ভীর্যে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কনির মনে হলো মেলর্সএর চেহারাটার মধ্যে যেমন একটা উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ আর নিঃসঙ্গতার অহঙ্কার আছে তেমনি

তার সঙ্গে আছে এক হীনতাবোধ, এক দাসমনোবৃত্তির ভাব। আসলে সে ক্লিফোর্ডের চাকর। ক্যাসিয়াস বলেছিল, হে প্রিয় ব্রুটাস, আমরা যে হীন, আমরা যে ক্ষুদ্র তার জন্য গ্রহ নক্ষত্রদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, সে দোষ হলো আমাদের। কনি ভাবল, লোকটা কি সত্যিই নগণ্য এক চাকর? কিন্তু কনি সম্বন্ধে তার ধারণাটা কি?

সেদিন আকাশটা ছিল বেশ উজ্জ্বল। কনি তাদের বাগানে কাজ করছিল। মিসেস বোল্টন তাকে সাহায্য করছিল। এখন মিসেস বোল্টনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা মোটামুটি ভাল যাচ্ছিল। মানুষে মানুষে সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতির জোয়ারভাটার ব্যাপারটা এমনি করেই চলে।

ওরা কতকগুলো নরম শিকরওয়ালা চারাগাছ নরম মাটিতে বসাচ্ছিল। বসন্ত সকালের এক ঝলক মদির বাতাসে তার পেটের মধ্যে এক শিহরণ অনুভব করল কনি। মনে হলো বাতাসটা তার পেটের ভিতরে গিয়ে নাড়া দিচ্ছে। ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে সে বাতাসে। হঠাৎ সে মিসেস বোল্টনকে প্রশ্ন করল, তোমার স্বামী অনেক দিন হলো মারা গেছে না?

মিসেস বোল্টন বলল, তেইশ বছর হলো। আজ হতে তেইশ বছর আগে তার মৃতদেহটা হঠাৎ একদিন ওরা বয়ে নিয়ে আসে আমাদের বাড়িতে।

কনি আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের দুজনের মধ্যে ত বেশ সুখ ছিল। তবে কেন সে মরতে গেল?

এ প্রশ্ন একজন নারীর প্রতি অন্য এক নারীর। মিসেস বোল্টন বলল, কি করে তা জানব ম্যাডাম? সে বড় গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ ছিল। সে কোন বিষয়ে কোন কারণে কারো কাছে মাথা নত করত না। এমনি করে শক্ত হতে গিয়ে অনেকেই ভেঙ্গে যায়। আসলে সে খনির ভিতর কাজ করতে যেতে চাইত না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তার বাবাই প্রথমে তার ছেলেবেলা থেকেই তাকে খনিতে কাজ করতে পাঠায়। ছোটবেলায় একবার খনিতে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না।

কনি বলল, কিন্তু সে কি বলত, এ কাজ করতে ঘৃণা হয় তার?

মিসেস বোল্টন বলল, কোন কিছুর প্রতি কোন ঘৃণার কথা মুখে বলত না সে। সে শুধু মুখে অদ্ভুত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলত। সে একটার বেশী সন্তান চায়নি। কিন্তু তার মা তাকে রোজ রাতে আমার বিছানায় পাঠিয়ে দিত। সে আমাকে ছেড়ে খাদে যেতে চাইত না। আমি রোজ বুঝতে পারতাম যাবার সময় তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তার মৃতদেহটা দেখে মনে হচ্ছিল সে মুক্তি পেয়েছে, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। জীবনে যে মুক্তি সে কামনা করছিল আকুলভাবে জীবনের বিনিময়ে সে মুক্তি কিনে নিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে।

মিসেস বোল্টন কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। তার কান্না দেখে কনির চোখেও

জল এল। বলল, শোকের আঘাতটা তোমার বুকে খুব বেশী লাগে।

মিসেস বোল্টন বলল, প্রথম প্রথম আমি বুঝতেই পারিনি। রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হত সে আসবে। আমার পাশে এসে শোবে। তার দেহের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে আমার দেহ। এইভাবে কোন নারীর রক্তের ভিতর কোন পুরুষ মিশে গেলে তাকে সে ছাড়তে পারে না, ভুলতে পারে না।

কনি বলল, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে দেহসম্পর্কটা যদি নিবিড় হয়। আচ্ছা, কিন্তু পুরুষ ছাড়া তার স্পর্শের কথাটা কতদিন মনে থাকে, কতদিন বেঁচে থাকে দেহহীন স্পর্শের তাপহীন স্মৃতিটা ?

মিসেস বোল্টন বলল, তার সন্তান তার কথাকে অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি তাকে ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার অনুভূতির মধ্যে তার স্পর্শ এমনভাবে বেঁচে আছে যে আমি তাকে ভুলতে পারিনি। যে সব মেয়েরা কোন পুরুষের দেহের স্পর্শের উত্তাপ তাদের রক্তে কখনো অনুভব করেনি তাদের দেখে দুঃখ হয় আমার, তাতে সে যত ধন ঐশ্বর্য বা পোষাক আশাকের অধিকারিণী হোক না কেন। তবে আমি আমারটা নিয়েই থাকতে চাই। পরের কথায় বা ব্যাপারে কান দিয়ে বা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

অধ্যায় ১২

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পরেই বনে চলে গেল কনি। আকাশ থেকে অম্লানভাবে ঝরে পড়া উজ্জ্বল আলোয় ভেসে বেড়াচ্ছিল অজস্র ফুলের রং বেরঙের হাসি। প্রথম বসন্তে হলুদ ফুলের উজ্জ্বলতা সব চেয়ে বেশী।

সারা বনভূমি জুড়ে যেন অসংখ্য ফুল ফোটার এক বর্ণাঢ্য সমারোহ চলছিল। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মত কত দিনের অবরুদ্ধ অবদমিত প্রাণচঞ্চলতা শতধারায় ফেটে পড়তে চাইছিল।

বনের ভিতর সেই কুঁড়েটার কাছে গিয়ে কনি দেখল মেলর্স সেখানে নেই। চারদিক একেবারে শান্ত আর স্তব্ধ। বাদামী রঙের কতকগুলো মুরগীর ছানা চড়ে বেড়াচ্ছিল। কনি মেলর্সকে খুঁজছিল। তাই সে সোজা তার বাসায় চলে গেল।

বনের একদিকের প্রান্তভূমিতে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটা। তার পাশের বাগানে কত ড্যাফোডিল আর ডেইজি ফুল ফুটে ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে মেলর্সের কুকুর ফ্লসি এসে হাজির হলো ছুটতে ছুটতে। সে তার লেজ নাড়তে লাগল।

মেলর্স ভিতরে ছিল। সে উঠে দরজার কাছে এল। সে তখনো মুখে কি চিবোচ্ছিল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দরজার কাছে এল।

কনি বলল, ভিতরে আসতে পারি ?

হ্যাঁ, ভিতরে আসুন।

সূর্যের আলো ঘরের ভিতরটাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের উনোনে আগুন জ্বলছিল লাল হয়ে। ভেড়ার মাংসের চপের গন্ধ আসছিল। কেটলিতে জল ফুটছিল। টেবিলের উপর একটা ঝুড়িতে কিছু রুটি ছিল। টেবিলের উপর একটা পাত্রে কিছু আলু আর চপের কিছু অংশ ছিল। খাওয়ার টেবিলের উপর সাদা টেবিলক্লথ পাতা ছিল। মেলর্স দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে।

কনি বলল, তোমার দেরী হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও।

জানালার ধারে যেখানে সূর্যের আলো পড়েছিল সেখানে একটা কাঠের চেয়ারে বসল কনি।

মেলর্স টেবিলে বসে বলল, আমাকে আথওয়েট যেতে হয়েছিল।

সে তার খাওয়া আর শেষ করল না।

কনি বলল, নাও, খেয়ে নাও।

কিন্তু সে তার খাবার আর ছুঁল না। সে কনিকে বলল, আপনি কিছু খাবেন ? এক কাপ চা খাবেন ? কেটলিতে জল ফুটছে।

কনি বলল, তুমি যদি আমাকে চা করতে দাও তাহলে খাব। কনির মনে হলো মেলর্সকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মনে হলো ও হঠাৎ এসে পড়ায় সে বিরক্তিবোধ করছে।

মেলর্স তখন বলল, ঠিক আছে, ঐ দেখুন চায়ের পাত্র, চায়ের টিপট।

কনি চায়ের পাত্রটা নিয়ে গরম জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে জলটা ঘরের বাইরে ফেলে দিতে গেল। ঘরের বাইরেটা সত্যিই চমৎকার। এক নজর দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল কনি। ওক গাছে নতুন হলুদ রঙের পাতা বার হয়েছে। লাল ডেইজি ফুল ফুটে আছে বন আলো করে।

চারদিক শান্ত আর স্তব্ধ। সত্যিকারের সুন্দর বনভূমি বলতে যা বোঝায় তা হলো এই। ঘরের বাইরে দরজার কাছে একটা পাথরের বড় চাপ পড়ে ছিল পা রেখে ওঠানামার জন্য। কনির মনে হলো বাইরের খুব কম লোকই ঐ পাথরখণ্ডটার উপর পা দিয়েছে।

কনি বলল, কী চমৎকার জায়গাটা! কী সুন্দর একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে। এখানে সব কিছু জীবন্ত অথচ কত নীরব।

মেলর্স আবার খেতে শুরু করল। তবে খুব ধীরে এবং অনিচ্ছার সঙ্গে। কনি বেশ বুঝতে পারল লোকটার মধ্যে আগেকার আর সেই উদ্যম বা উৎসাহ নেই যৌন ব্যাপারে। কনি নীরবে চা করে দুটো কাপ টেবিলের উপর রাখল।

কনি জিজ্ঞাসা করল তাকে, তুমি চা খাবে ?

মেলর্স বলল, কাপবোর্ডে চিনি আছে। দুধ আছে একটা পাত্রে।

কনি বলল, তোমার প্লেটটা সরিয়ে নেব ?

মেলর্স রুটিতে মাখন লাগিয়ে খেতে খেতে বলল, আপনার ইচ্ছা হলে নিতে পারেন।

কনির পানে তাকিয়ে একটুখানি ক্ষীণ উপহাসের হাসি হাসল মেলর্স। কনি উঠেগিয়ে কাপবোর্ড থেকে একটুখানি দুধ এনে বলল, এ দুধ কোথা থেকে আন ?

মেলর্স বলল, ফ্লিন্টরা দেয়। এক বোতল দুধ তারা সেই জায়গাটায় রেখে দেয় আপনার সঙ্গে যেখানে আমার দেখা হয়েছিল একদিন।

কিন্তু সত্যিই আজ তার কথা বা কাজের মধ্যে কোন উদ্যম বা উৎসাহ নেই। কনি চা ঢালতে লাগল। মেলর্স বলল, আমাকে দুধ দেবেন না।

কানে কোথা হতে একটা শব্দ আসতেই কান খাড়া করে মেলর্স বলল, জানালা দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমাদের।

কনি উত্তর করল, কেউ আসবে না এদিকে। তার কোন দরকার হবে না। দুঃখের বিষয় কেউ এদিকে আসবে না।

অবশ্য কেউ বড় একটা আসে না, হাজারে একটা এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তা জানার কোন উপায় নেই আগে থেকে। বোঝাই যাবে না।

কনি বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। ভারী ত এক কাপ চা খাচ্ছি।

মেলর্স বসে বসেই ফ্লসিকে ডেকে বলল, ফ্লসি, যাও ত কেউ ঢোকে কি না দেখে এস।

কুকুরটা চলে গেল। কনি মেলর্সকে জিজ্ঞাসা করল, আজ তোমার মনটা খারাপ মনে হচ্ছে।

সে তার নীল চোখের স্থির দৃষ্টি কনির উপর মেলে বলল, মনটা খারাপ ? না ত। তবে দুজন অনধিকারপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে সমন করাবার জন্য আমায় থানায় যেতে হয়েছিল। আমার কোন লোককে ভাল লাগে না।

কথাগুলো নীরসভাবে কোন রকমে বলল মেলর্স। কনি লক্ষ্য করল তার কণ্ঠের মধ্যে রয়েছে ক্রোধের উত্তাপ।

কনি আবার তাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, তুমি কি তোমার এই কাজটাকে ঘৃণার চোখে দেখ ?

শিকার রক্ষকের কাজ ? না। আমি যদি একা থাকতে পাই তাহলে কাজটা তত খারাপ লাগে না। কিন্তু আমাকে প্রায়ই থানায় দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। অনেক লোকের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। নানারকম ঝামেলায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

কথাটা বলতে গিয়ে এক ক্ষীণ রসিকতার হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে পার না ?

আমি ? হ্যাঁ পারি, যদি বৃত্তির টাকায় কোনরকমে চালাতে পারি। তাও

আমি ঠিক পারতাম। কিন্তু কাজ না করে আমি থাকতে পারব না। একটা কিছু কাজে আমার ব্যস্ত থাকা চাই। কিন্তু আমার মেজাজটা একটুতেই বিগড়ে যায় বলে আমি নিজের কাজ করতে পারব না বেশী দিন। তাই অন্য কারো কাজ আমায় করতে হবে। তাই এখন এই কাজটা একরকম বেশই করে যাচ্ছি। একরকম ভালই আছি···বিশেষ করে সম্প্রতি কিছুকাল······

কনির দিকে তাকিয়ে সে পরিহাসের ছলে হাসল।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেন তোমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়? তোমার মেজাজটা কি সব সময়ই খারাপ থাকে?

মেলর্স হেসে বলল, হ্যাঁ, প্রায় ঠিক তাই। আমার খিটখিটে ভাবটাকে আমি ঠিক দমন করতে পারি না।

খিটখিটে ভাব? সে আবার কি?

খিটখিটে ভাব কাকে বলে তা জানেন না?

কনি চুপ করে রইল। ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছিল সে। সে দিকে কোন খেয়ালই নেই লোকটার।

কনি বলল, আমি পরের মাসে কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

মেলর্স বলল, কোথায়?

ভেনিস।

ভেনিস? স্যার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে নিশ্চয়। কত দিনের জন্য?

কনি বলল, একমাস বা তার কিছু বেশী দিনের জন্য। ক্লিফোর্ড যাচ্ছে না।

মেলর্স জিজ্ঞাসা করল, উনি এখানে থাকবেন?

হ্যাঁ, এই অবস্থায় ও দেশভ্রমণে যেতে চায় না।

সহানুভূতির সঙ্গে মেলর্স বলল, হায় হতভাগা শয়তান!

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

কনি বলল, আমি চলে গেলে আমার কথা নিশ্চয় ভুলে যাবে না? যাবে কি?

কনির পানে চোখ তুলে স্থির আয়ত দৃষ্টিতে তাকাল মেলর্স। তারপর বলল, ভুলে যাব? আপনি জানেন লোকে এসব জিনিস ভোলে না। এসব জিনিস জোর করে মনে রাখতে হয় না।

কনি বলতে চাইছিল, 'তারপর?' কিন্তু বলল না তা। তার পরিবর্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি ক্লিফোর্ডকে বলেছি আমার সন্তান হতে পারে।

এবার মেলর্স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনির পানে তাকিয়ে বলল, তুমি বলেছ? উনি কি বললেন?

কনি বলল, উনি কিছু মনে করবেন না। সন্তানটি যদি ওঁর সন্তান বলে পরিচিত হয় তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই ওঁর।

মেলর্সএর পানে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না কনি। অনেকক্ষণ

চুপ করে থাকার পর মেলর্স কনির মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমার নাম করনি ত?

কনি উত্তর করল, না, তোমার নাম করিনি।

মেলর্স বলল, না। আমাকে উনি সে সন্তানের জন্মদাতা বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। তাহলে কোথা থেকে সে সন্তান পাবে তাঁকে বলেছ?

কনি বলল, আমি তাকে বলেছি আমি ভেনিসে কারো প্রেমে পড়তে পারি।

মেলর্স ধীর কণ্ঠে বলল, তা পার। সেই জন্যই তুমি যাচ্ছ।

কনি মেলর্সএর মুখপানে নম্রভাবে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ার জন্য নয় কিন্তু।

মেলর্স বলল, প্রেমে পড়ার ভাণ।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল। মেলর্স জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। তার মুখে কিছু তিক্ততা আর কিছু উপহাসের একটা অদ্ভুত এক মিশ্র ভাবের হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি দেখে একটা ঘৃণার ভাব জাগল কনির মনে।

হঠাৎ মেলর্স জিজ্ঞাসা করল, যাতে ছেলে না হয় তার জন্য তুমি তাহলে সাবধান হওনি? আমি নিজেও হইনি।

কনি বলল, না, এসব কাজ আমি ঘৃণা করি।

তাহলে তুমি আমাকে সন্তানের জন্যই চেয়েছিলে?

একটু চুপ করে থাকার পর কনির পানে তাকিয়ে ক্ষীণ সূক্ষ্ম এক হাসি হেসে মেলর্স কথাটা বলল।

কনি বলল, তা ঠিক নয়। সত্যিই তা নয়।

মেলর্স বলল, তাহলে কোনটা সত্যি?

তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ছিল। কনি তার পানে তিরস্কারের একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে বলল, আমি তা জানি না।

মেলর্স জোর হেসে উঠে বলল, তাহলে আমি বোকার মত একাজ করেছি। এরপর দুজনেই চুপ করে রইল। হিমশীতল এক অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল দুজনের মধ্যে।

মেলর্স অবশেষে বলল, ঠিক আছে, তোমাদের চাকর আমি, তুমি যা চাও তাই হবে। তুমি যদি সন্তান পাও আর স্যার ক্লিফোর্ড যদি সে সন্তান বরণ করে নেয় তাহলে আমার তাতে ক্ষতি কিসের? তাছাড়া এতে আমার এক সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ হবে।

তার মুখের কোণে একফালি চাপা হাসি ফুটে উঠল। বলল, তুমি আমাকে যেমন প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছ তেমনি আগেও অনেকে তাই করেছে। তবে এটা ঠিক যে এবারকার অভিজ্ঞতায় আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি। অবশ্য এতে গৌরব বা মর্যাদাবোধের কিছু নেই।

মুখটা চেপে গাটা এলিয়ে দিল সে।

কনি অনুনয়ের স্বরে বলল, প্রয়োজনের খাতিরে আমি তোমায় ব্যবহার করিনি।

মেলর্স বলল, ম্যাডামের ভৃত্য আমি।

কনি বলল, না, তোমার দেহটাকে আমার ভাল লেগেছিল।

মেলর্স হাসল। হেসে বলল, তাই নাকি? তাহলে আমাদের দুজনের ত ঐ একই অবস্থা। তোমার দেহটাকে আমারও ভাল লাগে।

এবার কনির পানে অদ্ভুতভাবে তাকাল মেলর্স। চাপা গলায় বলল, এখন একবার উপরে যাবে?

কনি ভারী গলায় বলল, না, এখন নয়, এখানে নয়।

কথাটা বলে ফেললেও মেলর্স যদি জোর করত তাহলে কনি বাধা দিতে পারত না। কারণ মেলর্সএর গায়ের জোরে ও পেরে উঠতে পারত না।

মেলর্স মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে তাকে যেন ভুলে যাবার চেষ্টা করল।

কনি বলল, আমি কখনো নিজে থেকে তোমার দেহ স্পর্শ করিনি। তুমি আগে স্পর্শ করেছ, তারপর আমি করেছি।

কনির পানে তাকিয়ে আবার এক মদির হাসি হাসল। বলল, এখন একবার?

কনি বলল, না না, এখানে না, সেই কুঁড়েটায়। কিছু মনে করবে না ত?

মেলর্স বলল, আমি ত তোমার দেহ সব সময় স্পর্শ করি না।

কনি বলল, যখনি তুমি আমার কথা মনে করো তখনি মনে মনে আমার দেহটা স্পর্শ করা হয়।

মেলর্স তখন জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমার কথা মনে করলে বা তোমায় স্পর্শ করলে তোমার ভাল লাগে?

কনি বলল, হ্যাঁ, তোমার লাগে?

মেলর্স বলল, আমার? লাগে মানে? একথা জিজ্ঞাসা করতে হয়? তুমি নিজেই বুঝতে পারছ এ কথার উত্তর কি হতে পারে।

কনি উঠে দাঁড়িয়ে টুপীটা হাতে নিয়ে বলল, আমাকে অবশ্যই এখন যেতে হবে।

মেলর্স শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যাবে?

কনির ইচ্ছা হচ্ছিল মেলর্স তার দেহটা জড়িয়ে ধরুক, তাকে থাকতে বলুক। কিন্তু সে কিছুই করল না। শুধু ভদ্র ও শান্তভাবে স্থির হয়ে রইল

কনি বলল, তুমি আমাকে চা খাইয়েছ এজন্য ধন্যবাদ।

আমার চায়ের পাত্রটা স্পর্শ করার জন্য আমিও ম্যাডামকে ধন্যবাদ দিতে পারি।

কনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পথ ধরল। মুখে একফালি ক্ষীণ হাসি নিয়ে

তার চলার পানে তাকিয়ে রইল মেলর্স। ফ্লসি তার লেজটা তুলে তার সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে এল। কনি ধীর গতিতে বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। সে বেশ বুঝতে পারল যেতে যেতে লোকটা তার পিছনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুখে এক দুর্বোধ্য হাসির ক্ষীণ রেখা নিয়ে।

একই সঙ্গে বুকে একরাশ অব্যক্ত বিষাদ আর বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল কনি। সে তাকে প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছে, তার মুখ থেকে এ কথাটা শুনে দুঃখ পেয়েছে সে মনে। কথাটা অবশ্য ঠিক। তবু একথা বলা তার উচিত হয়নি। একদিকে তার উপর একটা রাগ আর অন্যদিকে তাকে বুঝিয়ে ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করার একটা ইচ্ছা—এই দুই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল সে।

মনে অস্বস্তি আর রাগ নিয়ে কোন রকমে চা খাওয়া সেরেই উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেল সে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। সে বসে থাকতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তাকে কিছু একটা করতে হবে। সে আবার সেই কুঁড়েটাতে যাবে সে থাক বা না থাক।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কনি। মনে কিছুটা রাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে বনের পথ ধরল। সেই পরিষ্কার জায়গাটায় গিয়ে দেখল লোকটা খাঁচা থেকে মুরগী বার করছে। মুরগীগুলোর সঙ্গে আছে অসংখ্য ছোট ছোট বাচ্চা।

সোজা মেলর্সএর কাছে গিয়ে কনি বলল, দেখছ, আমি আবার এসেছি।

মেলর্স কণ্ঠে কৌতুকের ভাব মিশিয়ে বলল, তাইত দেখছি।

কনি বলল, মুরগীগুলো বার করছ?

হ্যাঁ, মুরগীগুলো এমনভাবে ডিমগুলোর উপর বসে তাতে তা দিচ্ছে যে ওদের খাবার কথাও ভুলে গেছে।

কনি দেখল সত্যিই মুরগীমাতাগুলোর কী অসাধারণ নিষ্ঠা তাদের ডিমগুলোর উপর। তারা শুধু নিজের নয় অপরের ডিমগুলোতেও তা দিয়ে ডিমের উপর লেপ্টে বসে আছে। কিছুক্ষণ নীরবে তা দেখতে লাগল কনি।

মেলর্স এক সময় জিজ্ঞাসা করল, কী, আমরা ঘরটার মধ্যে যাব?

কনি অবিশ্বাসের সুরে বলল, তুমি আমাকে চাও?

যদি তুমি ঘরে এস।

কনি চুপ করে রইল। মেলর্স বলল, এস তাহলে।

তার সঙ্গে ঘরটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল কনি। মেলর্স ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতেই একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠল ঘরখানা। আগের মত লণ্ঠনের আলোটা জ্বালল। তারপর কনিকে বলল, তোমার নিম্নাঙ্গের পোষাকগুলো খুলেছ?

কনি বলল, হ্যাঁ, খুলেছি।

আমিও তাহলে খুলে ফেলছি।

মেলর্স কম্বলটা মেঝের উপর পাতল। কনি তার মাথার টুপীটা খুলে মাথার চুলটা হাত দিয়ে সরিয়ে বসল তার উপর। মেলর্সও বসে তার জুতো ও পোষাক খুলতে লাগল।

মেলর্স বলল, এবার শুয়ে পড়।

সে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর কনি নীরবে তার কথামত শুয়ে পড়ল। মেলর্স শুয়ে পড়ে ওদের দুজনের উপর একটা কম্বল টেনে দিল। তারপর কনির জামা সরিয়ে তার বুকটা খুলে ফেলল। এক লঘু শৃঙ্গারের ভঙ্গিতে তার স্তনাগ্রভাগদুটো মুখ দিয়ে চেপে ধরল। কনির পেটের উপর মুখটা ঘষতে ঘষতে বারবার বলতে লাগল মেলর্স, বড় সুন্দর, বড় চমৎকার।

কনিও এবার মেলর্সএর জামাপরা গাটা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার শক্ত পেশীবহুল নগ্ন গাটার কথা ভেবে ভয় পেয়ে উঠল কনি।

মেলর্স যখন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কী সুন্দর' তখন কনির মধ্যে তার অন্তরাত্মার গভীরটা কেঁপে উঠল, এক অব্যক্ত প্রতিবাদে কঠিন হয়ে উঠল। লোকটা তার দেহটা যতই পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল ততই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল তার মনের ভিতরটা। শত তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও তার কামাবেগ তার মনের এই বিচ্ছিন্নতাকে জয় করতে পারল না। সে স্থির হয়ে জড়বস্তুর মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল আর মেলর্সএর দেহটা এক তীব্র সক্রিয়তায় সঞ্চালিত হতে লাগল তার উপর। এই সঞ্চালনকালে তার ধনুকের মত বাঁকা পিঠটা দেখে হাসি পাচ্ছিল কনির। আবার তার যোনিগর্ভ হতে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে আসার জন্য তার জননাঙ্গের যে উত্তপ্ত প্রয়াস সেটাও সমান হাস্যাস্পদ। কনির সহসা মনে হলো হাস্যাস্পদ হলেও এই উত্তেজিত দেহ-সঞ্চালন, এই লালারসসিক্ত পুরুষাঙ্গের ক্ষণকালীন উচ্ছ্বাসই হলো প্রেম। ভালবাসা বলে যদি কোন জিনিস থাকে তবে তার সকল রহস্য নিহিত আছে এর মধ্যে। এই তুচ্ছ, অসহায় ক্ষণোচ্ছ্বাসসর্বস্ব পুরুষাঙ্গই হচ্ছে স্বর্গীয় প্রেম। আধুনিককালের বুদ্ধিজীবীরা অথচ এই রতিক্রিয়ার এই ব্যাপারটাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা এই কাজটাকেই ঘৃণা করে। কোন কবি বলেছেন, ঈশ্বরের রসিকতাবোধ আছে। তিনি মানুষকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে এমন এক অন্ধ কামাবেগ সঞ্চারিত করেছেন যা পরিতৃপ্ত করার জন্য তাকে রতিসুখসারসম্বলিত এই বিশেষ ভঙ্গিমায় একবার করে বসতেই হবে। মানুষ এই সঙ্গমের কাজটাকে মুখে ঘৃণা করলেও এর থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না নিজেকে কিছুতেই।

কনির দেহটা লোকটার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও তার মনটা দূরে সরে গিয়েছিল। সে স্থির ও অনড়ভাবে শুয়ে থাকলেও তার মন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিল। লোকটার কুৎসিত দেহের স্পর্শ আর তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছিল সে। যেন দেহগত পূর্ণতা লাভ

করতে পারেনি লোকটা। অন্য সব লোকের মতই সে কোন নারীদেহের সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া থাকতে পারে না। আর অপূর্ণ বলেই কুৎসিত তার দেহটা।

কাজটা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির হয়ে শুয়ে রইল কনির বুকের উপর। নীরব নিশ্চল হয়ে রইল একেবারে। কনির মনে হলো লোকটা তার গায়ের উপর শুয়ে থাকলেও আসলে সে অনেক দূরে চলে গেছে। এমন কি তার চেতনার দিগন্ত থেকে অনেক অনেক দূরে এক অন্তহীন প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিস্পন্দ হয়ে আছে যেন। কনির সমস্ত অন্তরটা কেঁদে উঠল। সে অনুভব করল লোকটা চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে। ভাটাপড়া অপস্রিয়মান জলস্রোতের মত সে চলে যাচ্ছে আর ও নিজে পরিত্যক্ত এক পাথরখণ্ডের মত নির্জন উপকূলভাগে পড়ে আছে। লোকটার দেহটাই শুধু কনির দেহটাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না; তার সমগ্র অন্তরাত্মাটাও যেন সেই সঙ্গে চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে।

কনি তার দ্বৈত চেতনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কাঁদতে লাগল। কিন্তু লোকটা তা দেখল না। সেদিকে কোন নজর দিল না। ফলে তার কান্নাটা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে তাকে জোর কাঁপাতে লাগল।

লোকটা বলল, তুমি যখন এখানে আসনা তখন খুব খারাপ লাগে।

কনি আরো জোরে কেঁদে উঠল।

লোকটা বলল, কি হলো তোমার! এতে কান্নার কি আছে? এ সব ব্যাপার ত আর রোজ হয় না, হয় কখনো কেমনে।

কনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না।

তার অন্তরটা সত্যিই যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

কনির বুকের উপর হাত দিয়ে লোকটা তখনো শুয়ে ছিল তার উপর। কিন্তু কনি লোকটার উপর থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিল।

লোকটার কথায় কিছুটা সান্ত্বনা ছিল। তবু সে কাঁদতে লাগল জোরে।

মেলর্স বলল, না না, কাঁদবে না। এর ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে॥

কনি তবু ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, তবু পারছি না। এটা ভয়ঙ্কর লাগছে আমার কাছে।

একই সঙ্গে তিক্ততা ও রসিকতা মিলিয়ে মেলর্স হাসল। হেসে বলল, তুমি যাই ভাব না কেন, এটা মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। এই ভালবাসার চিন্তা থেকে তুমি সহজেই মুক্ত করতে পার নিজেকে। সব মানুষ ত সমান না। সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে না।

কনির বুক থেকে এবার হাতটা সরিয়ে নিল মেলর্স। তার স্পর্শ থেকে এবার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলো কনি। সঙ্গে সঙ্গে এক বিকৃত অর্থহীন তৃপ্তি পেল। লোকটার দেহাতী ভাষা তার ভাল লাগছিল না। তার উপর লোকটা এখনই উঠে দাঁড়িয়ে তারই সামনে পোষাক পরবে। মাইকেলিস তবু

তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াত। কিন্তু ওর সে শালীনতাবোধ নেই। ওর নগ্ন মূর্তি দেখে কে কি ভাবছে সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই।

তথাপি লোকটা যখন সত্যি সত্যিই কনির পাশ থেকে উঠে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ তাকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরল কনি। কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, চলে যেও না, আমাকে ফেলে চলে যেও না, রাগ করো না আমার উপর। আমাকে জড়িয়ে ধর, আমাকে জোরে জড়িয়ে ধর।

এক অন্ধ উন্মত্ততার সঙ্গে কথাগুলো বলল কনি। কিন্তু কি বলল তা সে নিজেই জানে না। এক অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছিল যেন কনির উপর আর সেই শক্তি দিয়ে মেলর্সকে জড়িয়ে ধরল কনি। আসলে যে প্রতিরোধবাসনা, যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ তার মধ্যে তার থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল সে। কিন্তু সে বাসনা সে প্রবণতা এমনই প্রবল যে তার থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পেল না।

মেলর্স আবার দুহাত দিয়ে কনিকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর টেনে নিল তাকে। তার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে খুব ছোট দেখাচ্ছিল কনিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিরোধবাসনাটা দূর হয়ে গেল অন্তর থেকে। আর তার সমগ্র সত্তাটা গলে গিয়ে যেন সহসা শান্তির সমুদ্র হয়ে উঠল। মেলর্সএর তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে কনির দেহটা যখন গলে নরম হয়ে গেল আশ্চর্যভাবে তখন তার খুব ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহের মেদুর মর্মভেদী কমনীয়তার প্রতি শান্ত অথচ নিবিড় এক কামনার অসহনীয় উত্তাপে তার দেহের প্রতিটি শিরার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল যেন। সেই অদম্য অথচ শান্ত কামনার এক মেদুর তাড়নায় মেলর্স তার হাতটা কনির পাছায় বোলাতে লাগল। ক্রমে হাতটা তার তলপেটের উপর দিয়ে যোনিদেশ পর্যন্ত চলে গেল। কনির মনে হলো লোকটা যেন কামনার এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে সহসা। জ্বলন্ত হলেও সে কামনা বড় স্নিগ্ধস্পর্শী, তার ছোঁয়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না নিজের মধ্যে। নিঃশেষে গলে গেল তার সমগ্র নারীসত্তা।

এদিকে আবার জেগে উঠেছে লোকটার রতিক্লান্ত ও অবনতমুখী পুরুষাঙ্গটা। তার কঠিন আঘাতের আশ্চর্য শক্তি দেখে মৃত্যুভয়ে ভীত কোন প্রাণীর মত কেঁপে উঠতে শুরু করেছে কনির সর্বাঙ্গ। নিজেকে নিঃশেষে উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে দিল সে লোকটার কাছে। তবে মনে মনে বলল তার এই অকুণ্ঠ উন্মোচনে ও নিঃশেষিত সমর্পণে যেন খুব বেশী নির্মম না হয় লোকটা।

কিন্তু তার পুরুষাঙ্গটা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। বড় ভয়ঙ্করভাবে নিষ্ঠুর। তার মধ্যে তার অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশের দুর্দমনীয় দৃঢ়তায় কনির মনে হলো যেন একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ভেদ করল তার দেহটাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বড় শান্তি পেল কনি। সৃষ্টির আদিতে যে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি ঢেকে রেখেছিল শিশু

বিশ্বকে সেই আদিম প্রশান্তির এক প্রাণবন্যা ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার বুকের মধ্যে। সে বন্যার উত্তাল ব্যাপ্তি আর সচঞ্চল প্রসারতায় নিজের সব কিছু ভাসিয়ে দিল কনি নিঃশেষে। কোন কিছুই ধরে রাখল না নিজের মধ্যে।

কনির মনে হলো তার গোটা সত্তাটা যেন সহসা এক সমুদ্র হয়ে উঠেছে। এক অন্ধকার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে তার বুকের মাঝে। শুধু অসংখ্য উত্তাল তরঙ্গমালার সর্পিল খেলা ছাড়া আর কিছু নেই তার মধ্যে। তার মনে হলো, তার সেই অতল অন্ধকার সমুদ্রের তল খোঁজার জন্য ক্রমশই সে তার মধ্যে নেমে চলেছে। সে যতই নামছে ততই সে সমুদ্রটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, ততই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে তার অতলান্তিক গভীরতা। তারপর অবশেষে এক প্রবল আলোড়ন আর কম্পনের মধ্য দিয়ে সে যখন সত্যি সত্যিই তার তল খুঁজে পেল, সে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে শায়িত সত্তার অদৃশ্য প্রান্তভূমিটিকে স্পর্শ করল তখন সে স্পর্শের বিরল অনুভূতির অতলে কনি নিজেও তলিয়ে গেল। সে আর নিজের মধ্যে নিজে রইল না। এ অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব, এ পুলক অননুভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে যেন নবজন্ম লাভ করল। সত্যিকারের নারী হয়ে উঠল।

কী সুন্দর! কী সুন্দর! যতই স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল রতিক্রিয়ার সমস্ত তৎপরতা, যতই কমে আসতে লাগল আবেগের প্রচণ্ডতা ততই আরও ভাল লাগল তার। কনি তখন তার দেহের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে মনের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সেই অচেনা অজানা লোকটার দেহটাকে জড়িয়ে ধরল, এক প্রচণ্ড প্রমত্ততার পর তার যোনিগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা শিথিল হয়ে যাওয়া তার পুরুষাঙ্গটাকেও জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হলো কনির। কত সুন্দর এই সুপ্ত চেতনাসম্পন্ন নরম মাংসপিণ্ডটি কনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র শূন্যতা ক্ষতির এক বেদনা অনুভব করল সে। সে তার প্রাণের সব ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিল যেন এই গোপন পুরুষাঙ্গটির উপর।

এক সুকোমল কুসুমকোরকের মত এই পুরুষাঙ্গটির গোপন সৌন্দর্যের প্রতি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল কনি। এক অব্যক্ত বিস্ময়ের অস্ফুট একটা ধ্বনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল তার নারীমনের গভীর থেকে। বহু রমণক্ষম এই বস্তুটি কত প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েও কত দুর্বল, কত শিথিল, কত সংকুচিত হয়েও কত প্রসারণপটু।

অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল কনি, কী সুন্দর, সত্যিই কি সুন্দর।

কিন্তু মেলর্স কিছুই বলল না। শুধু তার বুকের উপর নীরবে শুয়ে থেকে তার মুখটাকে চুম্বন করল। সদ্যজাত এক প্রাণীর মত তার কণ্ঠ থেকে বিস্ময়বিমিশ্রিত আনন্দের এক অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল।

এবার লোকটার কথা ভাবতে গিয়ে বড় অদ্ভুত মনে হলো তাকে। লোকটাকে সে ভাল করে না চিনলেও তার পুরুষত্বের এক আশ্চর্য স্পর্শ আজ

তার সর্ব অঙ্গের প্রতিটি জীবকোষে অনুভব করেছে। এখনো তার গায়ে জড়িয়ে আছে তার হাতদুটো। এখনো ভয় করছে। ভয় করছে তার সেই ছোট্ট পুরুষাঙ্গটাকে যা সহসা এক প্রচণ্ড পৌরুষে ফেটে পড়ে আঘাতে আঘাতে এক তীব্র আলোড়ন তোলে তার দেহাভ্যন্তরে গিয়ে।

কনি এবার তার হাতদুটো লোকটার পিঠ থেকে নামিয়ে তার পুরুষাঙ্গটাকে স্পর্শ করল। এই উত্তপ্ত ও প্রাণবন্ত বস্তুটাকে স্পর্শ করার মধ্যে যে এমন অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে কনি তা আগে বুঝতে পারেনি। অথচ আগে এই বস্তুটাকেই কত ঘৃণা করেছে সে। জীবনের মধ্যে এ যেন আর এক জীবন। কী মনোরম তার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য! দুটো উরুর মাঝখানে ও পুরুষাঙ্গটার দুপাশে গোলাকার অণ্ডকোষদুটোকেও হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কনি। কত নরম অথচ ভারী। সকল সৌন্দর্যের উৎসস্বরূপ সকল প্রাণের অপার রহস্য যেন ভরা আছে ছোট্ট এই গোলাকার বস্তুদুটোর মধ্যে।

সহসা ভয়ে আবার দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। লোকটা কোন কথা বলছে না, শুধু তাকে নিবিড় হতে নিবিড়তরভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। তার এই নিবিড়তা দেখে ভয় পেয়ে গেল কনি আবার। কনিও তাকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। সহসা অনুভব করল কনি লোকটার স্থির হয়ে থাকা দেহের আপাতস্তব্ধতার অন্তরালে তার পুরুষাঙ্গটা আবার জেগে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অন্তরটা ভয়ে গলে গেল।

ঠিক এই সময় কনির সমস্ত সত্তাটা এমন নরম ও অশক্ত হয়ে পড়ল যে কোন চেতনা তাকে ধারণ করতে পারল না। তার মধ্যে যেন কোন চেতনা নেই। তার সমগ্র অন্তরাত্মা চেতনাহীনভাবেই কাঁপতে লাগল। কিন্তু সে মোটেই বুঝতে পারল না কেন সে কাঁপছে। কিন্তু সে যাই হোক, তার বড় ভাল লাগছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল এ কম্পন পুলকের রোমাঞ্চ। এ কম্পন এ রোমাঞ্চ কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল তা সে বলতে পারবে না। শুধু জানল কিছুক্ষণ পরেই ও স্থির হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল লোকটা। অপরিমেয়ভাবে গভীর এক নীরবতায় ও স্তব্ধতায় বিলীন হয়ে গেল ওরা দুজনেই।

যখন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে চেতনাটা জাগল কনির মধ্যে, তখন সে মরীয়া-হয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। মুখ থেকে তার আপনা হতে বেরিয়ে এল, 'হে আমার প্রিয়তম, আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি আমি তোমায়।' লোকটাও নীরবে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার বুকের মধ্যে নিঃশেষে হারিয়ে গেল কনি।

লোকটাও কনিকে চুম্বন করে বলল, তুমি আমার, আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

কনি চুপি চুপি বলল, তুমি আমাকে ভালবাস ত?

লোকটা দেহাতী ভাষায় বলল, তুমি তা ভালই জান।

কনি বলল, তুমি স্পষ্ট করে তা বল।

সে বলল, সত্যিই আমি তা অনুভব করি।

ভালবাসার দিক থেকে সত্যিই লোকটা বড় শান্ত, বড় আত্মস্থ, কনির মত আবেগের কোন উচ্ছ্বাস নেই তার মধ্যে। কনি শুধু ওর প্রতি তার ভালবাসার পরিমাণটাকে মাপতে চাইছিল।

কনি আবার চুপি চুপি বলল, তুমি আমাকে ভালবাস, আরো ভালবাস।

মেলর্স শুধু নীরবে কনির গায়ের উপর হাত বোলাতে লাগল। কনি যেন সুন্দর সুগন্ধি একটা ফুল। তার মধ্যে কনির মত যেন কোন অশান্ত কামনার কোন কম্পন নেই, কোন চঞ্চলতা নেই। কনি যেন এক অবুঝ আবেগের বশবর্তী হয়ে তার ভালবাসাটাকে হাতের মুঠোয় ধরতে চাইছিল।

কনি আবার বলল, সারাজীবন তুমি আমায় ভালবেসে যাবে।

তা শুনে লোকটা অন্য মনে বলল, হাঁ।

কনির মনে হলো তার এ প্রশ্ন তার মনটাকে যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে।

লোকটা অবশেষে বলল, এবার আমরা উঠব নাকি?

কিন্তু কনি বুঝতে পারল লোকটার কান বাইরের জগতের শব্দ শোনার জন্য খাড়া হয়ে উঠেছে।

লোকটা বলল, অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

তার কণ্ঠে কনি কাজের চাপের আভাস পেল। বুঝল এবার সে উঠে যাবে। কনি তাকে চুম্বন করল বিদায়ের ভঙ্গিতে।

মেলর্স এবার পোষাক পরতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের আলোটা সরিয়ে নিল। পোষাক পরতে পরতে কনির পানে বিস্ফারিত চোখে তাকাতে লাগল। হঠাৎ কনির মনে হলো, লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় লোকটার মুখচোখ, মাথার চুল সব অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন সুন্দর সে কখনো দেখেনি এর আগে। কনির মনে হলো, কেমন যেন রহস্যময় দূর-দূর ভাব সব সময়ের জন্য ঘিরে আছে লোকটাকে। তাদের দুজনের মধ্যে বিরাজ করছে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন দূরত্বের এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। সে যেন কোনদিনই পরিপূর্ণভাবে পাবে না লোকটাকে।

এদিকে কনি যখন সেই কম্বলটার উপর উলঙ্গ হয়ে পিঠটা বাঁকিয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিল তখন তার নরম দেহটার দিকে তাকাতেই তাকে খুব সুন্দর দেখাল মেলর্সের চোখে। সেও হঠাৎ বলে উঠল, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি এবং এ ভালবাসার জন্য তোমার জন্য আমি যে কোন কাজ করতে পারি, যে কোন জায়গায় যেতে পারি।

কনির অন্তরটা লাফাচ্ছিল। সে বলল, তুমি আমাকে সত্যিই পছন্দ করো?

সে বলল, আমি তোমাকে সত্যিই এত ভালবাসি যে তোমার জন্য যে কোন কাজ করতে পারি।

এবার বসে কনির নগ্ন নরম পাঁজরের উপর গাল ও মুখটা ঘষতে লাগল লোকটা।

কনি বলল, তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না?

লোকটা বলল, একথা জিজ্ঞাসা করো না।

কনি বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি একথা বিশ্বাস করো?

সে বলল, তুমি আমাকে প্রথম আজ ভালবাসলে এখন। এইমাত্র। এর আগে কখনো ভালবাসনি আমায়। তবে জানি না কখন কি ঘটবে, ওরা এসব জানতে পারবে?

কনি বলল, ওসব কথা বলো না। আর তুমি কখনই একথা মনে করো না যে আমি তোমাকে প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করেছি।

তার মানে?

তার মানে সন্তানের জন্য।

মেলর্স মোজা পরতে পরতে বলল, আমার সন্তান যে কেউ ধারণ করতে পারে।

কনি বলল, না, একথা বলো না।

কনির পানে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে মেলর্স বলল, ঠিক আছে।

কনি তখনো শুয়েছিল। ধীরে ধীরে দরজা খুলল মেলর্স। তখন কালো হয়ে উঠেছে নীল আকাশখানা। দরজা খুলে বাইরে গেল মেলর্স মুরগীগুলোকে ঘরে ঢুকিয়ে রাখার জন্য। কনি তখনো তেমনি শুয়ে শুয়ে মানবজীবন ও সত্তার এক পরম বিস্ময়ের কথা ভাবতে লাগল।

কাজ সেরে মেলর্স যখন ফিরে এল ঘরের মধ্যে তখনো শুয়ে ছিল কনি। মেলর্স তার পাশে একটা টুলের উপর বসল। তারপর কনির পানে চোখ তুলে তার দুটো হাঁটুর মাঝখানে হাত রেখে বলল, একদিন রাতে তুমি আমার বাসায় চলে এস। রাতে সেখানেই থাকবে আমার কাছে।

রসিকতার স্বরে ওর দেহাতী কথাটার অনুকরণ করে কনি বলল, থাকব?

মেলর্স হাসল। বলল, হ্যাঁ, থাকবে। আমার কাছে শোবে, ঘুমোবে। এখন আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে। কখন আসবে?

কনি বলল, কখন আসব?

মেলর্স বলল, না, তুমি আসতেই পারবে না। কখন আসছ তাহলে?

কনি বলল, প্রায় রবিবার।

মেলর্স হেসে প্রতিবাদের স্বরে বলল, না। তুমি আসতে পার না।

কনি বলল, কেন পারি না?

কনি ওর কথা নকল করায় মেলর্স হেসে উঠল। বলল, তুমি খুব ভাল মেয়ে।

কনিও হেসে বলল, ভাল মানে?

মেলর্স বলল, ভাল মানে জান না? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করার সময়

তোমার কাছ থেকে যা পাই। আবার আমার কাছ থেকে তুমি যা পাও।

কনি উপহাসের ভঙ্গিতে বলল, তোমার ভাল মানে তাহলে যৌন মিলন?

মেলর্স বলল, না যৌন মিলন পশুদেরও হয়। তুমি তার থেকে বড় নিশ্চয় এবং সেইখানেই তোমার নারী জীবনের আসল সৌন্দর্য।

কথা বলতে বলতে টুলের উপর কনির মুখে হাত বোলাচ্ছিল মেলর্স। কনি এবার উঠে মেলর্স-এর কপালে চুম্বন করল। মেলর্স তখন চোখদুটো তুলে কনির পানে তাকিয়েছিল। তার চোখগুলো বেশ কালো নরম আর অনির্বচনীয়ভাবে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কনি বলল, তাই নাকি? আমি খুব ভাল? তুমি আমার কথা মনে করো?

মেলর্স কোন কথা না বলে কনিকে চুম্বন করল। তারপর বলল, তুমি যাবে এবার? তোমাকে বিদায় দিই।

এই বলে মেলর্স কনির পায়ে হাত বোলাতে লাগল। তার সে স্পর্শের মধ্যে তখন কোন কামনার উত্তাপ ছিল না, শুধু এক শান্তনিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল।

সবশেষে কনি যখন গোধূলিবেলায় বাড়ি পৌছল তখন স্বপ্নের মত মনে হলো তার সমস্ত পৃথিবীটাকে। পার্কের গাছগুলোকে মনে হলো জোয়ারের জলে প্লাবিত কোন সমুদ্রবন্দরে নোঙর করা জাহাজ আর তাদের বাড়ির কাছে বন্ধুর জমির উৎরাইটা এক জীবন্ত উত্তাল ঢেউ।

অধ্যায় ১৩

রবিবার দিন ক্লিফোর্ড বনে যেতে চাইল। সেদিন সকালটা ছিল বড় সুন্দর। সাদা সাদা পিয়ার ফুল ফুটেছে সারা বনভূমি জুড়ে।

যখন ফোটা ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে বসন্তের পৃথিবী তখন ক্লিফোর্ডকে একটা চেয়ার থেকে উঠিয়ে অন্য এক চেয়ারে ধরে বসিয়ে দিতে হচ্ছে। এটা সত্যিই নিষ্করুণ নিয়তির এক নিষ্ঠুর বিধান। কিন্তু ক্লিফোর্ড তার জন্য কিছু মনে করে না। বরং তার এই পঙ্গুত্বের জন্য এক ধরনের গর্ববোধ করে। এখনো কনিকে তার পা দুটো ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে দিতে হয়। কনি কাছে না থাকলে মিসেস বোল্টন বা ফিল্ডকে তা করতে হয়।

কনি উঁচু জায়গাটায় অপেক্ষা করছিল। ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা ধীর গতিতে উঁচু পথটায় উঠতে লাগল। অবশেষে চেয়ারটা কনির কাছে এলে ক্লিফোর্ড বলল, স্যার ক্লিফোর্ড তার তেজী ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে উঠছে।

কনি হেসে বলল, কিন্তু অতি কষ্টে।

ক্লিফোর্ড একবার থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে র‍্যাগবির প্রাসাদটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, কই র‍্যাগবি আমাকে দেখে দুঃখে চোখের পাতা

ফেলছে না। ফেলবেই বা কেন। আমি দেহের দিক থেকে পঙ্গু হলেও মানুষের মনের ক্বতিত্বের চূড়ার উপর উঠে চলেছি। আর এই উৎক্রমণ যে কোন ঘোড়াকে হার মানিয়ে দেবে।

কনি বলল, আমারও তাই মনে হয়। একদিন প্লেটোর যে সব আত্মারা ছু ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে স্বর্গে যেত আজ তারা ফোর্ড গাড়িতে করে যাবে।

ফোর্ড কি, রোলস রয়েস বল। প্লেটো নিজেও একজন অভিজাত সমাজের লোক ছিলেন।

কনি বলল, ঠিক। প্লেটো তাঁর আমলে ভাবতেই পারেননি, সাদা বা কালো ঘোড়ায় টানা গাড়ির কোন প্রয়োজন হবে ভবিষ্যতে। চাই এঞ্জিন, বাষ্পযান।

ক্লিফোর্ড বলল, হ্যাঁ, এঞ্জিন আর গ্যাস সব কাজ করবে। আমার মনে হয় আগামী বছরে পুরনো জায়গাটার কিছু মেরামৎ করা যাবে। আমার যতদুর মনে হয় হাজার পাউণ্ড খরচ হবে।

কনি বলল, খুব ভাল হবে। তবে যদি আর ধর্মঘট না হয়।

ক্লিফোর্ড বলল, আবার ধর্মঘটের প্রয়োজন কি তা বুঝি না। শুধু সমগ্র-ভাবে শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। এর পরিণাম কি হবে? নিশ্চয় রাতপেঁচারা এর মাধ্যমে কোন কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে।

কনি বলল, তারা শিল্পের ক্ষতিটার কথা ভাবছে না।

কনি বলল, বোধহয় শিল্পের ক্ষতির ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করে না ওরা।

ক্লিফোর্ড বলল, মেয়েছেলের মত কথা বলো না। এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের পেট ভরায় ঠিক, কিন্তু তাদের পকেটে টাকার যোগান দিতে পারছে না।

ক্লিফোর্ড কথাগুলো এমনভাবে বলল যাতে বেশ বোঝা গেল একথায় মিসেস বোল্টনের প্রভাব আছে।

কনি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি একদিন বলনি যে তুমি একজন রক্ষণশীল নৈরাশ্যবাদী।

ক্লিফোর্ড সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলে? আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো এই যে লোকে যা খুশি বলতে বা করতে পারে, যা খুশি অনুভব করতেও পারে। কিন্তু সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। জীবনের কাঠামোটা ঠিক বজায় রাখতে হবে।

কনি নীরবে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডিমের উপরকার খোলাটা ঠিক থাকলেই ডিমটা চিরদিন ভাল থাকবে।

ক্লিফোর্ড বলল, মানুষ আর ডিম এক জিনিস নয়।

আজকের উজ্জ্বল সকালে ক্লিফোর্ডকে খুব হাসিখুশিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

পার্কের আকাশে চিল উড়ে বেড়াচ্ছিল। দূরের খাদ থেকে ধোঁয়া উঠছিল। সব কিছুই আগের মত ঠিক আছে। তর্ক করার কোন ইচ্ছা ছিল না কনির কিন্তু ক্লিফোর্ডের সঙ্গে চলে যেতেও ইচ্ছা করছিল না। সে অনিচ্ছার সঙ্গে ক্লিফোর্ডের চেয়ারের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল।

ক্লিফোর্ড একসময় বলল, না, ঠিকমত যদি কাজকর্ম দেখাশোনা করা হয় তাহলে আর ধর্মঘট হবে না।

কেন হবে না?

কারণ তখন ধর্মঘট করাটা অসম্ভব করে তোলা হবে যতটা সম্ভব।

কনি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু শ্রমিকরা কি তোমায় ছাড়বে?

ক্লিফোর্ড বলল, সেকথা আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করব না। আমরা শুধু তাদের মঙ্গলের জন্য আর শিল্পকে বাঁচাবার জন্য ধর্মঘট যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে যাব।

কনি বলল, তোমার মঙ্গলের জন্যও নিশ্চয়।

স্বাভাবিকভাবেই সকলের মঙ্গলের জন্য। তবে আমার থেকে এতে তাদের মঙ্গল হবে বেশী। কারণ খনি ছাড়াই আমার চলে যেতে পারে। কিন্তু তারা পারবে না। খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তারা খেতে পাবে না। আমার অন্য সংস্থান আছে।

ওরা যেতে যেতে একবার খনিসংলগ্ন উপত্যকা আর তেভারশাল গাঁয়ের কয়লার ধুলো ঢাকা কালো কালো বাড়িগুলোর পানে তাকাল। মনে হচ্ছিল সারবন্দী কালো কালো বাড়িগুলো একটা সাপের মত পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে এঁকে বেঁকে। বাদামী রঙের চার্চটা থেকে ঘণ্টাধ্বনি এসে আজ রবিবার একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

কনি বলল, কিন্তু ওরা তোমার শর্ত মেনে নেবে?

কিন্তু প্রিয়তমা, তাদের তা মানতেই হবে।

কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে কি কোন আপোষ মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়?

নিশ্চয় সম্ভব। যখন তারা বুঝবে শিল্প ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে তখন তা অবশ্যই সম্ভব।

কনি বলল, কিন্তু এই শিল্পের উপর তোমার মালিকানা কি একান্তই দরকার?

দরকার হয়ত খুব নেই। তবু যেহেতু মালিকানাটা রয়েছে তখন তা রক্ষা করতেই হবে। যীশু ও সেন্ট ফ্রান্সিসের কাল থেকে সম্পত্তির অধিকার এক পবিত্র ধর্মীয় ব্যাপার বলে গণ্য হয়ে আসছে। তোমার যা কিছু আছে তা গরীবদের বিলিয়ে দেওয়াই সমস্যার সমাধান নয়। তা না করে তোমার যে সম্পত্তি আছে তা এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলবে যাতে শিল্পের উন্নতি হয় এবং গরীবরা কাজ পায়। এইভাবে গরীবদের খাওয়া পরা দান করতে পারা

যায়। গরীবদের সব কিছু ছিনিয়ে নিলে শিল্পের কোন উন্নতি হবে না আর গরীবরাও না খেতে পেয়ে মরবে। তাদের দারিদ্র্য আরো বেড়ে যাবে।

কিন্তু ধনী গরীবের মধ্যে অসাম্যটা কিভাবে কমবে?

ওটা হচ্ছে ভাগ্য। জুপিটার গ্রহ নেপচুন গ্রহের থেকে বড় কেন? এই রকম অনেক বস্তুর গঠনপ্রকৃতিকে তুমি বদলাতে পার না।

কনি বলল, কিন্তু এই হিংসা, ঈর্ষা আর অসন্তোষ কখন প্রথম শুরু হয়?

শুরু যখন হয় হোক, এগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করো। এগুলোর অবসান ঘটাও। প্রতিষ্ঠান থাকলেই কেউ না কেউ মালিক হবেই।

কনি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মালিক কে হবে?

যারা সম্পত্তির মালিক এবং যারা কলকারখানা বা শিল্প চালায়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। কনি হঠাৎ বলল, তারা কিন্তু খারাপ মালিক।

তুমি তাহলে বলে দাও তারা কেমন হবে বা হওয়া উচিত।

কনি বলল, তারা তাদের মালিকানাটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

ক্লিফোর্ড বলল, তারা বরং খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলে। তুমি তোমার 'লেডি' উপাধিটাকে তেমন গুরুত্ব দাও না।

কনি বলল, এটা আমাকে আক্রমণ করা। আমি সত্যিই ওসব উপাধি চাই না।

ক্লিফোর্ড তার চেয়ারটা সহসা থামিয়ে কনির মুখপানে তাকাল। বলল, তাহলে দেখ, কে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে এখন? তাদের মালিকানার দায়-দায়িত্ব কেন তার ঘাড়ে নিতে চাইছে না?

কনি বলল, আমি মালিকানা বা ওসব উপাধি চাই না।

ক্লিফোর্ড বলল, ওটা এমনিই। তোমার ভাগ্যে এ মালিকানা আছে এবং অবশ্যই বজায় রেখে চলা উচিত সারা জীবন ধরে। কারা খনিশ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী সব জিনিসের ব্যবস্থা করেছে? কারা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, গান বাজনা প্রভৃতি সব কিছুর উপকরণ দান করেছে? একমাত্র র‍্যাগবি আর শিপলের মালিকরাই তা দিয়েছে এবং তা চিরদিন দিয়ে যাবে। এইখানেই তোমার দায়িত্বের কথা আসছে।

একথার অর্থ বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কনি।

কনি বলল, আমি অবশ্য কিছু দেব। কিন্তু একটা কথা আমি তার আগে বলতে চাই। শ্রমিকরা তোমাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে ফেলেছে। তার বিনিময়ে তোমরা কিছু টাকা দাও। তাদের শ্রম থেকে তোমরা প্রচুর লাভ করো। তোমরা তাদের জীবনের সব সুষমা ও মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছ। তার বিনিময়ে তাদের একটু আন্তরিক সহানুভূতিও জানাও না। তোমরা শুধু তাদের মনে শিল্পগত একটা সমস্যার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছ।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি কি করব? আমার কাছে ওদের আসতে বল।

কনি বলল, কেন তেভারশাল গাঁটাকে এমন কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর দেখায়? তাদের জীবন কেন এত হতাশায় ভরা?

ওরা তেভারশাল গাঁকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে। এখানে তারা তাদের স্বাধীনতারই পরিচয় দিয়েছে। তারা তাদের নিজের হাতে গড়া তথাকথিত সুন্দর গাঁয়ে সুন্দর জীবন যাপন করে। আমি তাদের জন্য তাদের জীবন যাপন করতে পারি না। সকলেই আপন আপন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

কনি বলল, তারা কিন্তু তোমার জন্যই কাজ করে। তোমার কয়লাখনিতেই তাদের জীবন কাটছে।

মোটেই না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। তাদের মধ্যে একজনকেও বাধ্য করা হয়নি আমার কাজ করার জন্য।

কনি বলল, তাদের জীবন শিল্পসর্বস্ব হয়ে উঠেছে একেবারে। তারা সব আশা হারিয়ে ফেলেছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। এটা শুধু কথার কথা মাত্র। তুমি ওদের মধ্যে একটা হতাশাখিন্ন লোককেও খুঁজে পাবে না।

কথাটা সত্যি তা কনিও জানে। কনির কালো-নীল চোখগুলো জ্বলছিল। এক প্রতিবাদী আবেগের উত্তাপে লাল হয়ে উঠেছিল তার গালগুলো। তার মধ্যে হতাশার কোন বিষাদ ছিল না। সে পথের দুপাশের ঘাস আর গাঁদা ফুলগুলোর পানে একবার তাকিয়ে ভাবল, কেন সে অকারণে ক্লিফোর্ডের প্রতি এক রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে দোষী ভাবছে সব ব্যাপারে। একথা ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল, কোন কারণ খুঁজে পেল না সে। অথচ সে ক্লিফোর্ডকে একথাটা অর্থাৎ রাগের কথাটা বলতে পারল না। সে তাকে বলতে পারল না তার দোষটা কোথায়। তবু কনি বলল, ওরা যে তোমায় ঘৃণা করে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, না, করে না। তোমার ভ্রান্তিটাকে ওদের উপর আরোপ করো না। ভুলে যেওনা, ওরা মানুষ নয় জন্তু। তুমি এটা বুঝতে পারছ, এর আগে কখনো বোঝনি। সাধারণ জনগণ চিরকালই এক থাকে এবং থাকবে। নীরোর ক্রীতদাসরা আর আজকের খনিশ্রমিক বা ফোর্ডের মোটর কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নীরোর খনিশ্রমিক আর ক্ষেতমজুরদের মধ্যেও কোন পার্থক্য ছিলনা। জনগণের প্রকৃতি সব যুগে এক ও অপরিবর্তিত রয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানের এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকশিক্ষা হচ্ছে সার্কাস খেলার প্রশিক্ষণের এক অর্থহীন বিকল্প ছাড়া আর কিছু না। এই শিক্ষার দ্বারা জনগণের মনকে বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে কথা বলার সময় ক্লিফোর্ড যখন এইভাবে আবেগে

উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তা দেখে ভয় পেয়ে যায় কনি। তার কথার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সত্য আছে ঠিক, কিন্তু সে সত্য সর্বধ্বংসী, সর্বঘাতী।

কনির মুখখানাকে নীরব আর সহসা ম্লান হয়ে যেতে দেখে চেয়ারটা আবার চালাতে শুরু করল ক্লিফোর্ড। আর কেউ কোন কথা বলল না। এইভাবে নীরবে গেটের কাছ পর্যন্ত যাবার পর সে থামল। কনি গেটটা খুলে দিল।

ক্লিফোর্ড বলল, জনগণ চিরকালই শাসিত হয়ে আসছে এবং চিরকালই তারা শাসিত হয়ে যাবে। এখন যেটা দরকার তা হলো তরবারির পরিবর্তে চাবুক। জনগণ নিজেদের নিজেকে শাসন করবে একথা বলা ভণ্ডামি আর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি তাদের শাসন করতে পার?

হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি। আমার মন বা ইচ্ছাশক্তি পঙ্গু হয়ে পড়েনি। আমি ত আর পা দিয়ে শাসন করব না। আমি ঠিক শাসন করে যেতে পারব যতদিন বাঁচব। তারপর তুমি আমাকে পুত্রসন্তান দান করবে। আমার পর সে শাসন করে যাবে।

কনি বলল, কিন্তু সে ত আর তোমার সন্তান হবে না। তার মধ্যে তোমাদের শাসকশ্রেণীর রক্ত থাকবে না। হয়ত থাকবে না।

কে তার পিতা, কার রক্ত তার গায়ে থাকবে তা আমি জানতে চাই না। তার পিতা যেই হোক সে স্বাস্থ্যবান আর সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এক লোক হলেই হলো। আমাকে যে কোন এক স্বাস্থ্যবান ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সন্তান দাও, আমি তাকে চ্যাটার্লি পরিবারের এক সুযোগ্য বংশধরে পরিণত করে তুলব। কে আমাদের জন্ম দিল সেটা বড় কথা নয়, ভাগ্য আমাদের কোথায় কোন পরিবেশে স্থাপন করল সেটাই হলো বড় কথা। যে কোন সন্তানকে শাসকশ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করো, সে ঠিক শাসক হয়েই গড়ে উঠবে। আবার কোন শাসকশ্রেণীর বা রাজা বা ডিউকের সন্তানকে সাধারণ মানুষের মাঝখানে রেখে লালন পালন করো সে অবশ্যই সাধারণ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবেশের কি অপরিহার্য ও ভয়ঙ্কর চাপ!

কনি বলল, তাহলে এক জাতি, এক রক্ত এসব কথার কোন মূল্য নেই। সাধারণ মানুষ কি এক জাতি নয়, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও কি কোন রক্ত নেই?

না বৎসে, ওসব কথা এক রোমান্টিক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিজাত সম্প্রদায় হলো নিয়তির এক অংশ আর জনগণ নিয়তির আর একটা অংশ। ব্যক্তিমানুষের কোন স্থান নেই। নিয়তির ক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে লালিত পালিত হয়। কারো আভিজাত্যের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী নয়। নিয়তির ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে সমগ্রভাবে যে অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকসমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তিমানুষ তারই অংশ।

তাহলে আমাদের মধ্যে সাধারণ মানবিক কোন যোগসূত্র নেই?

সেটা তুমি যেভাবে নাও। পেট ভরাবার জন্য আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয়। কিন্তু সৃজনধর্মী ও প্রশাসনগত কাজকর্মের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারা যায়। কাজকর্মগত যোগ্যতা আর বৈশিষ্ট্য দেখেই ব্যক্তিমানুষকে চেনা যায়।

কনি ক্লিফোর্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাবে না?

ক্লিফোর্ড আবার চেয়ারটা চালাতে লাগল। তার যা বলার তা বলা হয়ে গেছে। এবার এক শূন্যতাবোধ আর ঔদাসিন্যের মধ্যে ঢলে পড়ল। কনির এটা মোটেই ভাল লাগে না। বনের মাঝে যেতে যেতে কোন তর্ক করতে চায় না কনি।

ওদের সামনে দুদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের সারি। পথটা উপরে উঠে গেছে। পথের দুদিকে নানারকমের ফুল ফুটে আছে রং বেরঙের। কনি চেয়ারটার পিছু পিছু যাচ্ছিল। চেয়ারটার চাকাগুলোর পানে তাকিয়ে ছিল সে।

ক্লিফোর্ড এক সময় বলল, তুমি ঠিকই বল, ফুলগুলো সত্যিই সুন্দর। ইংল্যাণ্ডের বসন্তের মত এত সুন্দর বসন্ত আর কোথাও নেই।

কথাটা শুনে কনির মনে হলো ক্লিফোর্ড যেন বলতে চায় ইংল্যাণ্ডে বসন্তের এই সমারোহ পার্লামেন্টের ব্যবস্থাপনায় হয়। কেন আয়ারল্যাণ্ড বা ইহুদীদের দেশের বসন্ত সুন্দর হবে না? ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা যখন অবশেষে সেই গাছকাটা ফাঁকা জায়গায় পৌছল তখন এক ঝলক উদার আলো এসে পড়ল ওদের সামনে। নীল, নীলচে, বাদামী ফুলগুলো সূর্যের আলোয় চকচকে উজ্জ্বল হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গোদ্যানের সেই আদিম কুটিলতায় ভরা কিলতিলে শয়তানী সাপের আদিমাতা ঈভের কানে কানে নূতন কোন নিষিদ্ধ কথা বলতে চাইছে।

একটা চড়াই পার হয়ে ক্লিফোর্ডের চেয়ারটা একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌছল। সমস্ত বনভূমি জুড়ে গাছপালা ফুল ফলের মধ্যে একটা কমনীয় স্নিগ্ধতা বিরাজ করছিল। সমস্ত ম্লানিমা আর কাঠিন্য ঝেড়ে ফেলে সুন্দর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে সবকিছু। এমন কি বলিষ্ঠদেহী ওক গাছগুলোতেও নতুন বাদামী রঙের কচি পাতা গজিয়ে উঠেছে, ঠিক যেন আলোয় মেলে ধরা বাদুড়ের ডানা। কনি ভাবতে লাগল রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর কত নূতন হয়ে ওঠে পৃথিবী ; কিন্তু মানুষগুলো কেন অমনি নতুন হয়ে ওঠে না, কেন তাদের কোন ধরনের আমূল পরিবর্তন হয় না? মানুষগুলো চিরদিন তেমনি পুরনো রয়ে যায় একভাবে।

উপরে উঠে চেয়ারটাকে থামাল ক্লিফোর্ড। থামিয়ে নিচের দিকে তাকাল। দেখল অসংখ্য ব্লুবেল ফুল থেকে বিচ্ছুরিত তপ্ত এক নীলাভ দীপ্তি সমস্ত ঢালু পাহাড়ী পথটাকে ছেয়ে আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, এ রংটা সত্যিই খুব চমৎকার।

কনি অন্যমনস্কভাবে বলল, সত্যিই তাই।

ক্লিফোর্ড বলল, আমরা কি আরো এগিয়ে যাব?

কনি বলল, কিন্তু চেয়ারটা কি আর উপরে উঠবে?

চেষ্টা করব। ঝুঁকি না নিলে চেষ্টা না করলে কিছুই লাভ হবে না।

চেয়ারটা ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। নীল ছায়াস্নিগ্ধ ফুলে ঘেরা চওড়া উঁচু পথটা দিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে চলল গাড়িটা। টুইডের জামা আর পুরনো ধরনের কালো টুপী মাথায় দিয়ে প্রসন্ন মুখে শান্তভাবে বসেছিল ক্লিফোর্ড। তার চলমান চেয়ারটাকে সম্বোধন করে কনির বলতে ইচ্ছা করছিল, হে চক্রবিশিষ্ট অতিপ্রাকৃত অর্ণবপোত, মানবসভ্যতার কোন প্রত্যন্ত সীমায় শেষবারের মত উপনীত হতে চাও তুমি? হে ক্যাপ্টেন, বল, আমাদের যাত্রা কি শেষ হয়েছে?

অবশেষে তারা সেই কুঁড়েটার কাছে এসে পড়ল। কিন্তু ঘরের মধ্যে যাবার পথটা খুবই সংকীর্ণ, চেয়ারটা তাতে ঢুকবে না। তাই সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরল। কনি পিছন থেকে ছোট্ট একটা শীষ দেওয়ার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল শিকার রক্ষক মেলর্স। কনিকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে ঢালু পথ বেয়ে। কুকুরটা তার পিছু পিছু আসছে। কাছে এসে সে কনিকে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড কি আমার বাসায় যাচ্ছেন?

কনি বলল, না, ও যাবে ঝর্ণাটায়।

তাহলে আমি তাঁর সামনে আর যাব না। কিন্তু আজ রাত্রে আসবে। আমি পার্ক গেটের কাছে রাত দশটার সময় অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

কনি বলল, হ্যাঁ, আসব।

ক্লিফোর্ড হর্ন বাজিয়ে ডাকছিল। ওরা সে শব্দ শুনতে পেল। তা শুনে মুখটা বিকৃত করল মেলর্স। সে পিছন থেকে কনির মুখে উপরের দিকটায় হাত দিয়ে চাপ দিল। কনি তার পানে তাকিয়ে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ক্লিফোর্ডের ডাকে সাড়া দিতে লাগল। উপর থেকে তা দেখতে লাগল মেলর্স।

কনি দেখল ক্লিফোর্ড প্রায় ঝর্ণাটার ধারে গিয়ে পড়েছে। কনিকে দেখে সে বলল, যাক গাড়িটা ঠিকমত কাজ করে এসেছে।

ভূতের মত লম্বা লম্বা বার্ডক গাছের ধূসর ছাই রঙের পাতাগুলোর পানে তাকাল একবার কনি। লোকে বলে এইখানে ছিল রবিন হুডের আড্ডা। দেখল শুভ্র ফেনপুঞ্জমণ্ডিত ঝর্ণার জলধারাগুলো নিরন্তর কলহাস্যে সব সময় ফেটে পড়লেও জায়গাটা এক নীরব বিষাদেঢাকা।

ক্লিফোর্ড বলল, ঝর্ণার জল তুমি খাবে?

কনি বলল, তুমি খাবে?

কনি গাছের ডালে ঝোলানো একটা এনামেলের মগ নিয়ে তাতে জল ভরে

ক্লিফোর্ডকে দিল। ক্লিফোর্ড জলপান করার পর সে নিজে মগে জল ভরে নিজে খেল। পরে বলল, কী ঠাণ্ডা!

ক্লিফোর্ড বলল, তবু ভাল।

কনি বলল, তোমার ভাল লেগেছে?

কনি যেন কান পেতে কি শুনছিল। কোথায় যেন একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক ঠক শব্দ করছিল। তারপর গাছের ডালপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ শুনতে পেল। তারপর উপরে তাকিয়ে দেখল সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে।

কনি বলল, মেঘ।

ক্লিফোর্ড বলল, সাদা সাদা মেষশাবক যেন।

একটা বিশাল মেঘচ্ছায়া আচ্ছন্ন করে ফেলল জায়গাটাকে। একটা ছুঁচো ঝর্ণার ওপার থেকে সাঁতরে এপারের কূলে এসে উঠল। ক্লিফোর্ড বলল, দেখতে কি কুৎসিত দেখ, ওটাকে মেরে ফেলা উচিত।

কনি বলল, ওটাকে বক্তৃতামঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত যাজকের মত দেখাচ্ছে।

কনি কতকগুলো শুকনো গাছের ডাল আর ঘাস নিয়ে এসে বলল, এগুলোর গন্ধ থেকে গত শতাব্দীর সেই সব রোমান্টিক মেয়েদের কথা মনে পড়ছে যারা কিছুটা এধার ওধার করলেও মোটের উপর ঠিক পথেই চলত।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, বৃষ্টি হবে কি না ভাবছি।

বৃষ্টি? কেন? তুমি চাও নাকি?

এবার তারা ফেরার পথ ধরল। ঢালু পথ দিয়ে ক্লিফোর্ড সাবধানে তার চেয়ারটা চালাতে লাগল। পথটার শেষে কালো পাথরভরা একটা নিচু জায়গায় এসে আবার ডান দিকে মোড় ঘুরে আবার একটা ঢালু পথ ধরল। সে পথে অনেক ব্লুবেল ফুল ফুটে ছিল। তারপর আবার একটা চড়াই।

পথটা এবার খাড়াই। চেয়ারটাকে সম্বোধন করে ক্লিফোর্ড বলল, এবার বুড়ো মেয়ে, দেখি কি করো। চেয়ারটা যেন উঠতে চাইছিল না। যেন উঠতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

কনি বলল, একটা কাজ করো। হর্ণটা বাজাও। যদি শিকার রক্ষক মেলর্স থাকে তাহলে সে এসে ঠেলবে। আর আমিও তখন ঠেলব।

ক্লিফোর্ড চেয়ারটা থামিয়ে বলল, কিছুটা ওকে বিশ্রাম দেওয়া যাক। একটা পাথর এনে চাকাটায় ঠেকা দাও, যাতে গড়িয়ে না যায়।

কনি একটা পাথরের টুকরো এনে পিছনের চাকাদুটোয় ঠেকা দিল।

কিছু পরে ক্লিফোর্ড আবার চালাতে শুরু করল চেয়ারটা। চেয়ারটা কিন্তু রুগ্ন দুর্বল মানুষের মত অতি কষ্টে উঠছিল, এবং অনিচ্ছাসূচক শব্দ করছিল।

কনি বলল, আমি পিছন থেকে ঠেলব?

ক্লিফোর্ড রেগে বলল, না, ঠেলতে হবে না। যদি ঠেলতেই হয় তাহলে

এটার দরকার কি ? চাকার তলায় আবার একটা পাথর দাও।

কিছুক্ষণ থামার পর আবার যাত্রা শুরু করল ক্লিফোর্ড। কিন্তু আগে যতটা চলছিল তাও চলল না।

কনি বলল, হয় আমাকে ঠেলতে দাও অথবা হর্ণ বাজিয়ে ওকে ডাক।

ক্লিফোর্ড বলল, একটু থাম।

সে আবার একবার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের থেকে তাতে খারাপ ফল ফলল।

কনি বলল, যদি আমাকে ঠেলতে না দাও তাহলে হর্ণটা বাজাও।

জাহান্নামে যাক। একটু থাম।

কনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লিফোর্ড আবার মরীয়া হয়ে চেষ্টা করল।

কনি বলল, তুমি এতে শুধু উদ্যমের অপচয় ঘটাবে এবং যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে ফেলবে ক্লিফোর্ড।

ক্লিফোর্ড দারুণ রেগে গিয়ে বলল, আমি যদি একবার চেয়ারটা থেকে বার হয়ে দেখতে পেতাম যন্ত্রটা কোথায় খারাপ হলো।

এই বলে হঠাৎ হর্ণটা বাজিয়ে দিল ক্লিফোর্ড। বলল, অন্ততঃ মেলর্স এসে দেখুক কোথায় খারাপ হলো।

আকাশে তখন মেঘ জমছিল। সেই মেঘলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছিল।

মেলর্স অল্প সময়ের মধ্যেই এসে গেল। আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে। এসেই অভিবাদন জানাল ওদের।

ক্লিফোর্ড তাকে জিজ্ঞাসা করল, গাড়ির এঞ্জিন সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান আছে ?

মেলর্স বলল, আমি ঠিক জানি না। খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

ক্লিফোর্ড বলল, তাই ত মনে হয়।

মেলর্স তখন ঝুঁকে পড়ে এঞ্জিনটার পানে তাকাল। তারপর বলল, এই সব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে তেল আছে ত ?

ক্লিফোর্ড বলল, ভাল করে দেখ, কোন কিছু ভেঙ্গে গেছে কি না।

লোকটা বন্দুকটা আগেই একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এবার সে কোটটা গা থেকে খুলে পাশে ফেলে দিল। তার কুকুরটা পাহারাদারের মত তার কাছে বসে রইল। সে তার আঙুল দিয়ে তৈলাক্ত এঞ্জিনটা পরীক্ষা করতে লাগল নেড়েচেড়ে। তার রবিবারের কাচা ধবধবে জামাটার উপর তেলের দাগ লেগে যাওয়ায় মনে মনে রেগে গেল মেলর্স। সে দেখে শুনে বলল, কোন কিছু ভাঙ্গেনি।

এই বলে টুপীটা মাথার সামনে থেকে সরিয়ে কপালটায় হাতটা বুলিয়ে দিল।

ক্লিফোর্ড বলল, নিচেকার রডগুলো ঠিক আছে কি না দেখেছ ?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের এঞ্জিনটার তলায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। তারপর আঙুল দিয়ে এঞ্জিনটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কনি তা দেখে ভাবতে লাগল একটা মানুষ এই বিরাট পৃথিবীর মাটিতে শুয়ে পড়লে তাকে কত ক্ষীণ কত ছোট আর অসহায় দেখায়।

মেলর্স বলল, আমি যতদূর দেখছি সব ঠিক আছে।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

উঠে কোলিয়ারি শ্রমিকের মত বসে মেলর্স বলল, আমারও মনে হচ্ছে আমি কিছু করতে পারব না। কিছু ভেঙেছে নাকি তা বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লিফোর্ড আবার এঞ্জিনটা চালাবার চেষ্টা করল। গীয়ারে হাত দিল। কিন্তু তা নড়ল না।

মেলর্স বলল, একটু জোরে চাপ দিন।

ক্লিফোর্ড তার এই পরামর্শে রেগে গেল। তবু সে তার কথামতই জোরে চাপ দিল। এঞ্জিনটা একবার গর্জন করে আপাততঃ চলতে শুরু করল।

মেলর্স বলল, মনে হচ্ছে এবার চলবে।

কিন্তু একটু চলেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল চেয়ারটা।

চেয়ারটার পিছনে গিয়ে মেলর্স বলল, আমি একটু ঠেললে এটা চলবে।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে বলল, সরে যাও। ওটা আপনা থেকেই চলবে।

কনি বলল, কিন্তু ক্লিফোর্ড, তুমি দেখছ চেয়ারটার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়। কেন তুমি এমন গোঁড়ামি করছ?

ক্লিফোর্ড রাগে লাল হয়ে উঠল। সে আবার গীয়ার ধরে টান দিল। চেয়ারটা শব্দ করে কয়েক গজ এগিয়ে একদল ব্লুবেল ফুলের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেলর্স বলল, এ আর পারবে না। এর সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

ক্লিফোর্ড বলল, এর আগে এ এখানে এসেছে। ঠিকমত চলেছে।

মেলর্স বলল, এবার ও চলবে না।

ক্লিফোর্ড একথার কোন উত্তর করল না। সে আবার এঞ্জিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু যন্ত্রটা শুধু যেন এক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদে গর্জন করতে লাগল আর তার সেই যান্ত্রিক শব্দে সমস্ত বনভূমি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ক্লিফোর্ড আবার গীয়ার ধরে টান দিল।

মেলর্স বলল, আপনি ওটা ভেঙ্গে ফেলবেন একেবারে।

চেয়ারটা কাৎ হয়ে পথের ধারে একটা খালে পড়ে যাচ্ছিল।

কনি ছুটে এল। ক্লিফোর্ডের নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু মেলর্স চেয়ারটা খালে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলেছিল তার রডটা। আবার একবার চেষ্টা করে চেয়ারটা কিছুটা ঠিক করে তার উপর চেপে বসল। মেলর্স পিছন থেকে ঠেলতে লাগল।

ক্লিফোর্ড বলল, দেখছ, চেয়ারটা এবার ভালই কাজ করছে।

সে বিজয়গর্বে তার কাঁধের কাছটা তাকাতেই মেলর্স-এর মুখটা দেখতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ওকে ঠেলবে ?

তা না হলে চলবে না।

ছেড়ে দাও। আমি ত তোমায় ঠেলতে বলিনি।

তাহলে ওটা চলবে না।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে উঠল, ওকে একা চলতে দাও।

এ কথায় মেলর্স টানা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার কোট আর গাছে ঝুলিয়ে রাখা বন্দুকটা আনতে গেল। চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চেয়ারের মধ্যে বন্দী অবস্থায় বসে রইল ক্লিফোর্ড। এক তীব্র বিরক্তিতে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার। যতবারই চেষ্টা করল এঞ্জিনটা চালাবার জন্য, ততবারই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যেতে লাগল শুধু। চেয়ারটা কিছুতেই আর যাবে না। অবশেষে চেয়ারটার মধ্যে রাগে ও বিরক্তিতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ক্লিফোর্ড।

কনি পথের ধারে এক জায়গায় বসে রইল। দেখল কতকগুলো ব্লুবেল ফুল চেয়ারটার চাপে পিষ্ট হয়ে পড়ে আছে। একটু আগে বলা ক্লিফোর্ডের কতকগুলো কথা একে একে ছিন্নভিন্নভাবে মনে পড়ল কনির। ক্লিফোর্ড আসার সময় পথে বলেছিল, 'ইংলণ্ডের বসন্ত বড় চমৎকার।' আর একবার বলেছিল, 'শাসকশ্রেণীর বংশধর হিসাবে আমার কাজ আমাকে করে যেতে হবে।' আর একসময় বলেছিল, 'এখন আমাদের দরকার তরোয়াল ছেড়ে চাবুক ধরা।'

মেলর্স তার কোট আর বন্দুক নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তার কুকুর ফ্লসি তার পিছু পিছু যাচ্ছিল। হঠাৎ ক্লিফোর্ড আবার তাকে ডেকে এঞ্জিনটা দেখতে বলল। যদি কিছু করা যায়। কনির এঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। সে এক জায়গায় উদাসীনভাবে বসে রইল। মেলর্স আবার শুয়ে পড়ল চেয়ারটার তলায়। কনি ভাবল একেই বলে শাসকশ্রেণী আর শ্রমিক-শ্রেণী।

মেলর্স উঠে দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডকে শান্তভাবে বলল, এবার দেখুন।

ক্লিফোর্ড চেষ্টা করতেই চেয়ারটা একটু একটু করে চলতে লাগল। মেলর্স পিছন থেকে ঠেলতে লাগল। অর্ধেক চেয়ারটার এঞ্জিনের নিজস্ব শক্তি আর অর্ধেক মেলর্সএর শক্তিতে চলতে লাগল চেয়ারটা।

ক্লিফোর্ড তা দেখে আবার রেগে গেল। চিৎকার করে বলল, তুমি সরে যাবে কি না ?

সঙ্গে সঙ্গে মেলর্স হাতটা ছেড়ে দিল। ক্লিফোর্ড বলল, তুমি ঠেললে আমি কি করে বুঝব গাড়িটা চলছে কি না।

মেলর্স বন্দুকটা নিয়ে কোটটা পরতে লাগল।

চেয়ারটা ধীরে ধীরে পিছনে গড়াতে লাগল। কনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ক্লিফোর্ড, তোমার ব্রেক।

কনি আর মেলর্স চেয়ারটাকে ধরে ফেলল। চেয়ারটা দাঁড়িয়ে গেল। সবাই চুপ। ক্লিফোর্ড একসময় বলল, এটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমি সকলের দয়ার উপর নির্ভর করছি।

কেউ তার কথার কোন উত্তর দিল না। মেলর্স কাঁধের উপর তার বন্দুকটা ঝোলাচ্ছিল। একমাত্র এক অপার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ছাড়া আর কোন ভাব তার মুখের উপর ফুটে ছিল না। তার কুকুর ফ্লসি তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ারটার দিকে সংশয় আর অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়েছিল। কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে ক্লিফোর্ড তার স্বরটা নরম করে বলল, আমার মনে হয় ওকে ঠেলতে হবে।

মেলর্স কোন কথা বলল না। সে শূন্য দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যাতে মনে হলো সে কিছু শোনেনি। কনি তার দিকে উদ্বেগের সঙ্গে তাকাল। ক্লিফোর্ডও তার পানে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি কি এটাকে ঠেলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে মেলর্স? আমার ত মনে হয় আমি তোমাকে অন্যায় কিছু বলিনি।

মেলর্স বলল, না, অন্যায় কিছু বলেননি। আপনি কি চান আমি এটা ঠেলব?

যদি তুমি কিছু মনে না করো।

লোকটা এগিয়ে গেল চেয়ারটার দিকে। কিন্তু এবার মেলর্স তাকে ঠেলে চালাতে পারে না। ব্রেকের ভিতরটায় কি যেন জমে আছে। ক্লিফোর্ড আর একটা কথাও বলল না। মেলর্স চেয়ারটা পিছন থেকে তুলে ধরে পা দিয়ে চাকাগুলো ঠেলে দিল। ক্লিফোর্ড চেয়ারের একটা ধার ধরে ছিল। কিন্তু চেয়ারটা নড়ল না। বসে রইল এক জায়গায়। মেলর্স একাই জোরে ঠেলতে লাগল। ক্লিফোর্ডের ভার সহ্য করতে না পেরে হাঁপাচ্ছিল সে।

কনি বলল, না, ওভাবে ঠেলতে যেও না।

মেলর্স বলল, আপনি ঐদিকে গিয়ে চাকাটা একবার ধরুন।

কনি রেগে গিয়ে বলল, না, তুমি ওভাবে তুলতে যেও না। এতে তোমার দারুণ কষ্ট হবে।

কিন্তু মেলর্স কনির মুখপানে তাকিয়ে ইশারা করতেই কনি এসে চাকাটা ঠেলতে লাগল আর মেলর্স চেয়ারটা তুলে ধরল। এবার চলতে লাগল চেয়ারটা। ক্লিফোর্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ঈশ্বর দয়া করেছেন।

গাড়ির ব্রেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু গাড়িটা এবার ঠিক চলতে লাগল।

মেলর্স এক সময় চেয়ারের চাকায় একটা পাথর আটকে দিয়ে পথের ধারে একবার বসল। কনি দেখল তার জানুর উপর রাখা হাতগুলো কাঁপছে।

কনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি কোথাও আঘাত লেগেছে?

বিরক্তির সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, না না।

মৃত্যুশীতল এক স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল চারদিকে। ক্লিফোর্ড অনুতপ্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। এমন কি মেলর্সএর কুকুরটা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে মেঘ জমে উঠেছে।

অবশেষে তার রুমালটায় নাকটা ঝেড়ে সে বলল, নিউমোনিয়াতে আমার অনেকখানি শক্তি চলে গেছে।

কেউ কোন কথা বলল না। কনি শুধু ভাবতে লাগল ক্লিফোর্ড সমেত চেয়ারটা ধরে তুলতে কতখানি শক্তির দরকার হয়েছে। লোকটার সত্যিই দারুণ কষ্ট হয়েছে। তার দেহের হাড় সব ভেঙ্গে যায়নি এই খুব।

মেলর্স উঠে আবার কোটটা তুলে নিয়ে চেয়ারটা ধরে বলল, স্যার ক্লিফোর্ড, আপনি প্রস্তুত?

ক্লিফোর্ড বলল, আমি প্রস্তুত, তুমি প্রস্তুত হলেই হলো।

এবার একটু নত হয়ে তার দেহের সমস্ত ভার ও শক্তি দিয়ে ঠেলতে লাগল চেয়ারটাকে। কনি দেখল আগের থেকে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ক্লিফোর্ড ভারী লোক আর তার উপর পাহাড়ী পথটা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কনি মেলর্সএর কাছে গিয়ে বলল, আমিও ঠেলব।

কনি তার নারীমনের সমস্ত বিক্ষুব্ধ ক্রোধাবেগ ঢেলে দিয়ে চেয়ারটাকে ঠেলতে লাগল। চেয়ারটা আগের থেকে দ্রুত চলতে লাগল। ক্লিফোর্ড তা দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ক্লিফোর্ড বলল, তোমার ঠেলার কি দরকার আছে?

কনি বলল, একশোবার আছে। তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি? যখন যন্ত্রটা ভাল ছিল তখন যদি সেটাকে কাজ করতে দিতে? ইচ্ছা করে সেটাকে ভেঙ্গে দিলে।

কনি ঠেলতে ঠেলতে একটু ঢিলে দিল। কারণ কাজটা সত্যিই কঠিন। আশ্চর্যভাবে কঠিন।

চোখে মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে মেলর্স কনিকে বলল, আরো আস্তে ঠেল।

কনি তার পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল, তুমি ঠিক জান তোমার দেহে কোন আঘাত লাগেনি?

মেলর্স মাথা নাড়ল নীরবে। তার ছোট ছোট রোদখাওয়া তামাটে হাতগুলোর পানে তাকাল কনি। এই হাতগুলোই একদিন তাকে কত আদর

করেছে, এক উত্তপ্ত শৃঙ্গারের কাজে মেতে উঠেছে। তখন কিন্তু ভাল করে হাতগুলোকে দেখেনি সে। লোকটার মতই হাতগুলো কেমন যেন শান্ত, এক অন্তর্নিহিত স্তব্ধতায় মগ্ন অনড়। হাতগুলো মনে হলো তার থেকে যেন অনেক দূরে, এত দূরে আছে যে সে তা ধরতে পারবে না। আর সেই জন্যই হাতগুলোকে এই মুহূর্তে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল কনির। লোকটা যেন তার কাছ থেকেও অনেক দূরে আছে, তাকে কোনদিন সে ধরতে পারবে না বলেই তার সমগ্র অন্তরাত্মা সহসা এক অবুঝ উন্মত্ততায় লোকটার দিকে প্রধাবিত হতে লাগল। মেলর্স তার বাঁ হাত দিয়ে ঠেলছিল চেয়ারটাকে আর তার ডান হাতটা দিয়ে কনির সাদা ধবধবে কোমরটা জড়িয়ে ধরে ছিল আদরের ভঙ্গিতে। কনির স্পর্শে সহসা লোকটার দেহের সমস্ত শক্তি পিঠে ও পাছায় এসে যেন কেন্দ্রীভূত হলো। কনি একবার নত হয়ে মেলর্সের হাতটা চুম্বন করল। ক্লিফোর্ডের মুখটা ও ঘাড়টা তখন সামনের দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল।

পাহাড়টার উপরে উঠে ওরা একটু থামল। থেমে বিশ্রাম করতে লাগল। কনি খুশি হলো। মাঝে মাঝে মনে মনে একটা অদ্ভুত কথা ভাবল, স্বপ্ন দেখল যেন কনি। মনে হল এই দুই পুরুষের মধ্যে যদি কোনভাবে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদি তার স্বামী আর তার সন্তানের পিতা এক সৌহার্দ্যের বন্ধনে মিলিত হয় তাহলে খুব ভাল হয়। আজ কনি বুঝতে পারল তার এ চিন্তা এ স্বপ্ন কত অলীক কত অর্থহীন। এই দুই পুরুষের মধ্যে মিলন কোনদিনই সম্ভব নয়। জল আর আগুনের মতই পরস্পরবিরুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন এই দুই পুরুষ। ওরা যেন একে অন্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আজ কনি প্রথম বুঝতে পারল ঘৃণা কত অদ্ভুত সূক্ষ্ম জিনিস। এ ঘৃণা কত সূক্ষ্ম কত গভীর! বুঝতে পারল আজ প্রথম সে সচেতনভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করছে। মনে হচ্ছে তার সেই নিবিড় ও প্রাণবন্ত ঘৃণার দ্বারা সে তাকে জগৎ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। শুধু তাই নয়, আজ যে ও ওর সচেতন মনের ভিত্তির উপর আপন আত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করার কথাটা স্বীকার করতে পারছে, বলতে পারছে আমি তাকে ঘৃণা করছি, আমি তার সঙ্গে বাস করতে পারব না—এতে সে একটা মুক্তির আনন্দ আর প্রাণপ্রাচুর্যের আস্বাদ অনুভব করছে।

সমতল রাস্তার উপর মেলর্স একাই চেয়ারটা ঠেলতে পারছিল। ক্লিফোর্ড কনির সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল। এই সব কিছু সত্ত্বেও সে যে আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে এটা যেন সে দেখাতে চায়। প্রথমে ক্লিফোর্ড বলল ঈভা পিসির কথা যিনি এখন দিয়েপ্পেতে থাকেন। তারপর বলল স্যার ম্যালকমের কথা। স্যার ম্যালকম চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন কনি ক্লিফোর্ডের সঙ্গে একটা গাড়িতে করে যাবে না হিলদার সঙ্গে ট্রেনে ভেনিসে যাবে।

কনি বলল, আমি ট্রেনে যাব। ধুলোভরা দীর্ঘ পথ গাড়িতে করে আমি যেতে চাই না। অবশ্য হিলদা কি চায় সেটা দেখতে হবে।

ক্লিফোর্ড বলল, সে চাইবে তোমাকে সঙ্গে করে তার গাড়ি চালিয়ে যেতে।

কনি বলল, হয়ত তাই হবে।—এখন এখানে চেয়ারটা ঠেলার ব্যাপারে আমাকেও সাহায্য করতে হবে। চেয়ারটা কত ভারী সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

কনি চেয়ারের পিছনে গিয়ে মেলর্সের পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে লাগল। কে তাদের দেখছে না দেখছে তা সে গ্রাহ্য করল না।

ক্লিফোর্ড বলল, কেন ফিল্ডের জন্য আমায় অপেক্ষা করতে দিচ্ছ না? তার শক্তি আরো বেশী। এ কাজে সে আরো বেশী যোগ্য।

কনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এত কাছে যখন এসে গেছি।

মুখে যাই বলুক কনি ওরা দুজনেই চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রায়ই মাথার ঘাম মুছছিল। অবশেষে উঁচু জায়গাটায় এসে পৌঁছল। ওদের কষ্ট হচ্ছিল ঠিক, কিন্তু এই কাজের মধ্য দিয়ে ওরা দুজনে পরস্পরের কাছে আগের থেকে আরো বেশী করে যেন এসে পড়েছিল।

বাড়ির দরজার কাছে এসে ক্লিফোর্ড বলল, যথেষ্ট ধন্যবাদ মেলর্স। আমাকে চেয়ারের এঞ্জিনটা পাল্টাতে হবে। তুমি কি আমাদের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবে? এখন খাবার সময় হয়ে গেছে।

মেলর্স বলল, ধন্যবাদ স্যার ক্লিফোর্ড, আজ রবিবার, আমি আমার মার কাছে খেতে যাচ্ছিলাম।

তোমার যা খুশি।

মেলর্স কাঁধে কোটটা ঝুলিয়ে ওদের অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। কনি এক প্রচণ্ড রাগ বুকে চেপে উপরতলায় উঠে গেল।

লাঞ্চ খাবার সময় কনি তার মনের অনুভূতি চেপে রাখতে পারল না। সে বলল, কেন তুমি এমন জঘন্যভাবে অবিবেচক ক্লিফোর্ড?

কার সম্বন্ধে?

আমি শিকার রক্ষকের কথা বলছি। এই যদি তোমাদের শাসকশ্রেণীর আচরণবিধি হয় তাহলে আমি তোমাদের জন্য দুঃখিত।

কেন?

একটা লোক যে কিছুদিন আগে রোগ থেকে উঠেছে, যে খুব একটা সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারেনি! আমি যদি তোমার চাকর হতাম তাহলে তোমাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করতাম। অন্য লোক না আসা পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম।

আমি তা বিশ্বাস করি।

সে যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী হয়ে চেয়ারে বসে থাকত আর তোমার মত

সে যদি এই ধরনের ব্যবহার করত তোমার সঙ্গে তাহলে তুমি কি করতে?

হে আমার দয়াবতী, তুমি যেভাবে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বকে গুলিয়ে ফেলছ তা তোমার কিন্তু মোটেই ভাল রুচির পরিচয় নয়।

আর তোমার সাধারণ সহানুভূতির অভাব রুচিবোধের এক অকল্পনীয় অভাব। তুমি ও তোমাদের শাসকশ্রেণীর এটাই হলো স্বভাব।

এতে কি লাভ? আমার শিকার রক্ষকের জন্য এই অহেতুক আবেগের অপচয় আমি পছন্দ করি না। এটা আমি আমার দয়াবতী স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিলাম।

কনি বলল, সে যেন তোমার মত মানুষ নয়।

আমার শিকার রক্ষককে আমি সপ্তায় ছ পাউণ্ড করে মাইনে দিই এবং তাকে থাকার জন্য একটা বাড়ি দিয়েছি।

তাকে মাইনে দাও? কিসের জন্য?

তার কাজের জন্য।

আমি বলব এ টাকা তুমি রেখে দাও। দিতে হবে না।

সেও হয়ত কাজ ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু যে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ পেয়ে গেছে তা ছাড়তে চায় না।

কনি বলল, তুমি নাকি শাসন করো। যাও বড়াই করো না। তুমি শাসন করো না, শুধু টাকা চেন তুমি। শুধু ধনসম্পদ ভোগ করে যেতে চাও তুমি। তোমার শাসন মানে ত একটা গরীব লোককে অনাহারের ভয় দেখিয়ে সপ্তায় ছ পাউণ্ড দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া। ইহুদীর মত কুশীদজীবী ঘৃণ্য জীবের মত শুধু টাকা চেন তুমি।

তুমি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পার লেডি চ্যাটার্লি।

আমি বেশ বলতে পারি বনের মাঝে তুমিও বক্তৃতা কম দাওনি। তোমার সে বক্তৃতায় আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। তোমার থেকে দশগুণ মনুষ্যত্ব আছে আমার বাবার। জানলে ভদ্র মহাশয়।

ক্লিফোর্ড ঘণ্টা বাজিয়ে মিসেস বোল্টনকে ডাকল। সে রেগে ছিল।

ভয়ঙ্কর রাগ নিয়ে কনি তার নিজের ঘরে চলে গেল। মনে মনে বলতে লাগল টাকা দিয়ে লোক কেনে ও। আমাকে ও কেনেনি; সুতরাং ওর কাছে আমার থাকার কোন অর্থ হয় না। ভদ্রলোক না, একটা মরা মাছ। একটা সেলুলয়েডের আত্মা। তারা মানুষকে ভালভাবে গ্রহণ করতেই পারে না। একটা সেলুলয়েডের যতটুকু অনুভূতি থাকে তার বেশী অনুভূতি ওদের নেই।

রাতের মত তার মনস্থির করে ফেলল কনি। ক্লিফোর্ডের কথা ঝেড়ে ফেলল সব মন থেকে। কনি ভেবে দেখল সে ক্লিফোর্ডকে আসলে ঘৃণা করতে চায়নি। আসলে সে শুধু তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে চায়নি। সে শুধু চেয়েছিল ক্লিফোর্ড যেন তার জীবনের

কোন কিছু জানতে না পারে।

রাতের খাওয়ার সময় শান্তভাবে নিচে নেমে গেল কনি। একটা হলুদ রঙের জামা পরে ক্লিফোর্ড একটা ফরাসী বই পড়ছিল।

ক্লিফোর্ড জিজ্ঞাসা করল, তুমি প্রুস্ত পড়েছ?

আমি পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ক্লিফোর্ড বলল, সত্যিই ওঁর লেখা অসাধারণ।

তা হয়ত বটে, কিন্তু আমার ভাল লাগে না মোটেই। একটা কেতাদুরস্ত ভাব। ওঁর কোন অনুভূতি বলে জিনিস নেই। অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু আসলে অনুভূতি নেই। ওঁর আত্মপ্রচার আর বড়াই দেখে আমি বিরক্ত। আমি এই ধরনের মনোভাব পছন্দ করি না।

তবে কি তুমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেগানুভূতিকে পছন্দ করো?

তা হয়ত বটে। কিন্তু কোন লেখার মধ্যে আত্মপ্রচারের উগ্রতা না থাকলে তার থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

আমি কিন্তু প্রুস্তের সূক্ষ্মতা আর অভিজাত ধরনের নৈরাজ্য পছন্দ করি।

কিন্তু তা তোমাকে সত্যি সত্যিই নির্জীব করে তুলবে।

এটা আমার দয়াবতী স্ত্রীর কথা মনে হচ্ছে।

ওরা আবার তর্ক করতে লাগল। কনি এ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পারল না। ক্লিফোর্ড তার সামনে একটা নির্জীব কঙ্কালের মত বসেছিল। কিন্তু কনির মনে হলো, ক্লিফোর্ডের কঙ্কালের হাড়গুলো তাকে এক নিষ্ঠুর বাহুবেষ্টনী দিয়ে জড়িয়ে ধরছে এবং সেই চাপে তার বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্লিফোর্ডও মরীয়া হয়ে তর্কযুদ্ধে মেতে উঠল।

কনি তার শোবার ঘরে গিয়ে সকাল সকাল বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু সাড়ে নটা বাজতেই উঠে পড়ল। বাইরে গিয়ে দেখল বাড়ির মধ্যে কোথাও কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখল বাড়িব মধ্যে কোথাও কোন শব্দ নেই। ড্রেসিং গাউন পরে নিচের তলায় নেমে গিয়ে দেখল, ক্লিফোর্ড আর মিসেস বোল্টন তাস খেলছে। ওরা রাত দুপুর পর্যন্ত এইভাবে খেলে যাবে।

আবার নিজের ঘরে ফিরে এল কনি। পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন ছেড়ে টেনিস খেলার পোষাক আর হাল্কা কোট পরে তৈরি হয়ে নিল সে। এখন যাবার সময় অথবা সকালে ফেরার সময় কারো সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে বলবে একটু বেড়াতে গিয়েছিল বন দিয়ে। সকালে প্রাতরাশের আগেই ফিরে আসবে। একমাত্র বিপদের কথা হলো যদি রাত্রিবেলায় কেউ তার ঘরে যায়। কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

বেটস্ তখনো বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করেনি। সে রাত্রি দশটা বাজলে বাড়ির দরজা বন্ধ করে। আবার সকাল সাতটা বাজলে খোলে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কনি। আকাশে ছিল আধখানা

চাঁদ। তার স্বল্প আলোয় বনভূমির পথ চিনে এগিয়ে যেতে লাগল সে। বনান্ধকারের পটভূমিকায় এই স্বল্প চাঁদের আলোয় তার ধূসর কোটটা দেখে কেউ চিনতে পারবে না। পার্কটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে বেটসের কাছে এল। মেলর্সকে কথা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে পারার জন্য কোন পুলকিত রোমাঞ্চ জাগছিল না কনির মনে। বরং তার অন্তরে ছিল এক বিদ্রোহের জ্বালা; প্রতিবাদের এক আগ্নেয় আবেগ।

অধ্যায় ১৪

কনি পার্ক গেটের কাছে পৌছতেই গেটের খিল খোলার শব্দ শুনতে পেল। মেলর্স আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বনের অন্ধকারে। দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল তাকে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে মেলর্স প্রশ্ন করল, তুমি আগে থেকে এসে ভালই করেছ। সব ঠিক আছে ত?

সব ঠিক আছে।

কনি ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গেটটা বন্ধ করে দিল মেলর্স। টর্চের এক ঝলক আলোতে কনি দেখল পথের দুপাশের ফুলগাছগুলো বনভূমির নির্জন অন্ধকারে নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে মাঝখানে একটুখানি ব্যবধান রেখে নীরবে পথ চলতে লাগল।

কনি জিজ্ঞাসা করল, আজ সকালে চেয়ার ঠেলতে গিয়ে তোমার লাগেনি, তুমি ঠিক বলছ?

না, না, লাগেনি।

এর আগে যখন তোমার নিউমোনিয়া হয় তখন তোমার দেহের কি ক্ষতি হয়?

এমন কিছু না। শুধু হৃৎপিণ্ডটা একটু দুর্বল হয় আর ফুসফুসটা একটু শক্ত হয়ে ওঠে।

কনি বলল, তোমার দেহের দিক থেকে অত্যধিক চাপ দিয়ে কোন কাজ করা বা কোন কিছু চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নিশ্চয় তোমার পক্ষে।

হ্যাঁ, প্রায়ই তা করা চলবে না।

কনি এবার এক বিক্ষুব্ধ নীরবতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে লাগল। অবশেষে কনি বলল, তুমি ক্লিফোর্ডকে তখন ঘৃণা করছিলে?

তাকে ঘৃণা করব? না। তার মত অনেক লোক আমি দেখেছি যারা এইভাবে আমার মাথাটা এমন করে গুলিয়ে দেয় যে আমি তাদের ঘৃণা করার কোন শক্তিই খুঁজে পাই না। আমি ওদের মত লোকদের গ্রাহ্য করি না।

তাই কিছু মনে করিনি।

কাদের মত মানুষ ?

আমার থেকে তুমি বেশী ভাল করে তা জান। অভিজাত সমাজের এক ধরনের যুবক যারা মেয়ের মতন থাকে বলে বীচিহীন মানুষ।

বীচিহীন মানুষ মানে ?

কনি কথাটার মানে নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

মেলর্স বলল, যে লোকের মস্তিষ্ক নেই, হৃদয় নেই, একেবারে বোকা, যার কোন মনুষ্যত্ব নেই তাকেই আমরা বীচিহীন লোক বলি। ক্লিফোর্ড যেন পোষা জন্তুর মত।

কিছুক্ষণ ভেবে কনি বলিল, ক্লিফোর্ড কি পোষা জন্তুর মত ?

ওদের জাতের সবাই ওই রকম।

আর তুমি কি মনে করো তুমি পোষমানা জন্তুর মত নয় ?

হয়ত কিছুটা, কিন্তু পুরোটা নয়।

সহসা কনি দূরে একটা হলদে আলো দেখতে পেল। বলল, একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

মেলর্স বলল, আমি সব সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আলো জেলে আসি।

কনি এবার মেলর্সের পাশে গিয়ে পথ চলতে লাগল। কিন্তু তার গাটাকে ছুঁল না। সে তার সঙ্গে কোথায় কেন যাচ্ছে তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

মেলর্স ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। কনির মনে হলো সে যেন একটা কারাগারে ঢুকছে। উনোনের লাল আগুনে কেটলিতে জল ফুটছিল। টেবিলের উপর কয়েকটা কাপ ডিস সাজানো ছিল।

আগুনের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে বসল কনি। প্যানট্রি থেকে কিছু রুটি মাখন মাংস প্রভৃতি খাবার নিয়ে এল মেলর্স। কনি গা থেকে কোট খুলে রাখতেই মেলর্স সেটা দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখল। তারপর বলল, কোকো না কফি কি খাবে ?

কনি বলল, আমি কিছুই খাব না। তুমি খাও।

না, আমার কিছু খাবার ইচ্ছা নেই, আমি এখন কুকুরটাকে খাওয়াব।

একটা বাদামী পাত্রের মধ্যে কুকুরের খাবারটা ঢেলে দিল মেলর্স। কুকুরটাকে বলল, তোমার রাতের খাবার।

কিন্তু কুকুরটাকে যত্ন করে খেতে দিলেও কুকুরটা মেলর্সের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। খেল না। তা দেখে মেলর্স তাকে বলল, খাচ্ছ না কেন ? কি ত্রুটি হলো ? ঘরে একজন মেয়েলোক রয়েছে ? তা থাক নাও, খেয়ে নাও।

কুকুরটা তবু না খাওয়ায় তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল সে। তখন

কুকুরটা খেতে লাগল।

কনি বলল, তুমি কুকুর ভালবাস?

মেলর্স বলল, না, খুব একটা নয়। ওরা বড় পোষমানা আর পরিবর্তনশীল।

এই বলে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল মেলর্স। কনি আগুনের পাশ থেকে সরে এল। দেওয়ালের উপর এক নবদম্পতির ছবি ছিল। কনি সেই দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তোমার ছবি?

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, বিয়ের পর এ ছবিটা তোলা হয়। আমার তখন বয়স একুশ।

তুমি এ ছবিটা ভালবাস?

না, আমি পছন্দ করি না, কারণ ওই মেয়েটা আমার উপর চাপ দিয়ে বিয়েটা করায়।

মেলর্স আবার জুতো খোলায় মন দিল। কনি বলল, তুমি এটা যদি পছন্দ না করো তবে কেন এটা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছ? তোমার স্ত্রী বোধহয় এটা চায়?

মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে কনির দিকে তাকাল মেলর্স। বলল, আমার স্ত্রী যা নেবার সব নিয়ে গেছে সঙ্গে। শুধু এটাই ফেলে গেছে।

তবে কেন তুমি এটা রেখে দিয়েছ? নিছক আবেগের বশে বা ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে?

না, আমি ওটার দিকে কোনদিন তাকাই না। এমনি আছে।

তবে ওটা পুড়িয়ে ফেল না কেন?

বাদামী রঙের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বড় করা ছবিটার পানে তাকাল মেলর্স। ছবিটাতে আছে এক দাড়িকামানো চকচকে মুখওয়ালা এক তরুণ যুবক যার মুখখানা বেশ কচিকচি আর সাটিনের ব্লাউজপরা এক নির্ভীক উজ্জ্বল প্রকৃতির যুবতী।

মেলর্স বলল, কথাটা মন্দ নয়।

পা থেকে জুতোটা খুলে একজোড়া চটি পরল, মেলর্স। তারপর একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ফটোটা টেনে নামিয়ে এনে তারপর বলল, এটাকে এখন দেওয়ালের উপর ঝুলিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না।

একটা হাতুরী নিয়ে তা দিয়ে ঠুকে ফটোর ফ্রেমটা থেকে ছবির কাগজটা বার করে আনল। কনি সেটা দেখল। ও নিজেও দেখল। কনির মনে হলো মেয়েটাকে দেখতে এমন কিছু খারাপ নয়, বরং তার চেহারার মধ্যে একটা আবেদন আছে। এদিকে কাঠের ফ্রেমটা হাতুরি দিয়ে ভেঙ্গে ফ্রেমটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল আগুনে। পরে বলল, আগামীকাল বাকিগুলো আগুনে পোড়াব।

আবার তার জায়গায় এসে বসল মেলর্স। কনি বলল, তুমি তোমার স্ত্রীকে

ভালবাসতে ?

ভালবাসা ? তুমি স্যার ক্লিফোর্ডকে ভালবাস ?

সেকথায় না গিয়ে বা না দমে কনি বলল, কিন্তু তুমি ত তাকে গুরুত্ব দিতে।

মেলর্স বলল, গুরুত্ব !

কনি বলল, তুমি এখনো তাকে গুরুত্ব দাও।

চোখদুটো বিস্ফারিত করে মেলর্স বলল, না আমি এখন তার কথা ভাবি-ই না।

কিন্তু কেন ?

মেলর্স শুধু তার ঘাড় নাড়ল।

কনি বলল, কিন্তু তুমি বিবাহবিচ্ছেদ করো না কেন ? তা না হলে একদিন না একদিন সে আসবেই।

কনির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেলর্স। বলল, সে আমার এক মাইলের মধ্যে আসবে না। আমি তাকে যত ঘৃণা করি তার থেকে সে আমায় বেশী ঘৃণা করে।

তুমি দেখবে সে ঠিক ফিরে আসবে।

না, আর সে আসবে না। সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যাবে।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হবেই। আইনগতভাবে ত বিচ্ছেদ হয়নি তোমাদের ?

না, তা হয়নি।

তাহলে সে আসবে আর তোমাকে গ্রহণ করতে হবে তাকে।

কনির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল মেলর্স। তারপর বলল, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। আমি এখানে ফিরে এসে বোকামি করেছি। তুমি ঠিক বলেছ। আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব এবং মুক্ত হব। কিন্তু আমি আদালত, বিচারক ও রাজকর্মচারিদের মৃত্যুর মতই ঘৃণা করি। তবু আমাকে তা সহ্য করতেই হবে এবং বিবাহবিচ্ছেদ করবই।

কনি দেখল তার মুখের চোয়ালটা শক্ত হয়ে আছে। সে বলল, আমার মনে হয় আমি এখন এক কাপ চা খেতে পারি।

মুখের চোয়ালটা শক্ত করেই চা করতে গেল মেলর্স।

খাবার টেবিলে বসে কনি তাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে ? সে তোমার থেকে অনেক সাধারণ স্তরের। মিসেস বোল্টন আমাকে তার কথা সব বলেছে। তুমি কেন তাকে বিয়ে করেছিলে সে তা আজও বুঝতে পারেনি।

মেলর্স কনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে সব কথা বলব। আমার জীবনে প্রথম যখন এক মেয়ে আসে তখন আমার বয়স মাত্র

ষোল। সে ছিল এক স্কুলশিক্ষকের মেয়ে, সত্যিকারের সুশ্রী, সুন্দরী। তখন আমি ছিলাম সবেমাত্র শেফিল্ডের গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে আসা এক চটপটে ছেলে। কিছু ফরাসী আর জার্মান জানি। মেয়েটা ছিল রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন। সে চাইত আমি বড় হই, সে সাধারণত্বকে ঘৃণা করত। সে আমাকে কবিতা লেখা ও পড়ায় প্রেরণা দিত। সে আমাকে মানুষ করে তুলতে চাইল। আমি কবিতা পড়তাম, অনেক কিছু চিন্তা করতাম, কিন্তু সব সময় একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার অবস্থাটা তখন ছিল ঠিক একটা জ্বলন্ত বাড়ির মত। তখন আমি বাটার্লে অফিসের এক কেরাণী। রোগা-রোগা চেহারা, সাদা ফ্যাকাশে মুখ। তখন আমি অবসর সময়ে অনেক কিছু পড়তাম। পড়তে পড়তে নানারকমের অস্বচ্ছ অস্পষ্ট চিন্তা ধূমায়িত হয়ে উঠত আমার মনে। শুধু পড়তাম না, নানাবিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা করতাম। আমরা ছিলাম সেকালের সবচেয়ে সাহিত্যানুরাগী প্রেমিক প্রেমিকা। আমি তার আবেগে উত্তপ্ত ও বিচলিত হয়ে তার সঙ্গে আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠতাম। কিন্তু সে ছিল আগুন, আমি শুধু অগ্নি-অনুগামিনী ধোঁয়ার মত তাকে অনুসরণ করে যেতাম। সে আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কিন্তু ঘাসে ঢাকা সাপের মত তার সঙ্গে আমার এই দেহাতীত প্রেমসম্পর্কের অন্তরালে এক দুর্জয় কামপ্রবৃত্তি এক অবদমিত গর্জনে ফুলে ফুলে উঠত। কিন্তু তার মোটেই এ প্রবৃত্তি ছিল না। যেখানে থাকার কথা সেখানে এ প্রবৃত্তি ছিল না। আমি দিন দিন রোগা আর খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠতে লাগলাম। একবার আমি তাকে বললাম আমার কামনার কথা। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে কোন কামনা ছিল না। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু সে শুধু তার ভালবাসার কথা বলত, চুম্বন আর আদর করত। শুধু এই কারণে সে আমায় চাইত, কিন্তু তাকে আমার মোটেই ভাল লাগত না। আমি চাইতাম অন্য ধাতের মেয়ে। তাই আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি নিষ্ঠুর-ভাবে তাকে ত্যাগ করলাম। এরপর আর একটি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমার। সে ছিল এক শিক্ষিকা। সে ছিল আমার থেকে বয়সে বড়। সে আমাকে রোজ জড়িয়ে ধরত, আদর করত ; কিন্তু আমি যদি তাকে জোর করে চেপে ধরে যৌনক্রিয়ার কথা বলতাম তাহলে সে রেগে যেত, দাঁত কড়মড় করতে করতে আমাকে তীব্র ঘৃণার পরিচয় দিত। সুতরাং তার সঙ্গেও আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি চাইতাম এমন এক নারী যার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিল থাকবে।

তারপর এল বার্থা কাউটস। ওরা আমাদের বাড়ির কাছেই বাস করত। তাই আমি ওদের ছেলেবেলা থেকেই চিনতাম। বার্থা একটু বড় হয়েই বার্মিংহামে এক মহিলার বাড়িতে কাজ নিয়ে চলে যায়। পরে ও নাকি এক

হোটেলে কাজ নেয়। তারপর আমার বয়স যখন একুশ তখন ও ফিরে আসে। ওর দেহে তখন টগবগ করছে পূর্ণ যৌবনের প্রাচুর্য। সেই যৌবনপুষ্ট দেহ থেকে ফেটে বার হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক মদির আবেদন। ফোটা ফুলের মত এক অপূর্ব সৌন্দর্য ওর সারা অঙ্গে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি তখন বাটার্লে কোম্পানিতে কেরাণীর কাজ করতাম। তার সঙ্গে তেভারশালে কামারের কাজও করতাম। ঘোড়ার ক্ষুরে লোহা পরানোর কাজটা আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। আমার বাবা যখন এই কাজ করত তখন আমি ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। এ কাজ আমার ভাল লাগত কারণ অনেক রকমের ঘোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পেতাম। আমি কিন্তু তখনো বই পড়তাম। আর ঘোড়ার ক্ষুরে লোহা লাগাবার কাজও করতাম। আমাদের একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। তার নাম দিয়েছিলাম লর্ড ডাকফুট। আমার বাবা মৃত্যুকালে তিনশো পাউণ্ড আমাকে দিয়েছিল, তাই দিয়ে আমি বার্থাকে গ্রহণ করলাম। সে ছিল অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। আমি নিজেও সাধারণ হতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে বিয়ে করলাম। মেয়েটা খারাপ ছিল না। এর আগে যে সব মেয়েরা এসেছিল তারা কেউ আমাকে এমন করে চায়নি। তারা শুধু নিজেদের ভালবাসাটাকেই বড় করে দেখত। কিন্তু বার্থার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার অদ্ভুত মিল। সে চাইত আমি তার দেহটা ভোগ করি, তার সঙ্গে রমণ করি। কিন্তু এজন্য আমি তার খুব বশংবদ হয়ে থাকি এটা সে চাইত না। মাঝে মাঝে আমি সকালবেলায় তার বিছানায় প্রাতরাশ নিয়ে গিয়ে দিতাম তাকে। এর জন্য ভীষণ রেগে যেত সে। আমাকে ঘৃণা করত। তার আর একটা দোষ ছিল। আমি খেটেখুটে কাজ থেকে বাসায় ফিরলে সে আমার নিজের হাতে খেতে দিত না। আমি যদি এর জন্য কিছু বলতাম, তাহলে সে দারুণ রেগে যেত। হাতের কাছে যা পেত ছুঁড়ে দিত আমাকে লক্ষ্য করে। আমিও অবশ্য তখন হাতের কাছে যা পেতাম তাই ছুঁড়ে মারতাম। একদিন সে আমাকে একটা কাপ ছুঁড়ে মারে। আমি তখন তার ঘাড়টা ধরে এমনভাবে চাপ দিলাম যাতে জীবন বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। তার ব্যবহারটা ছিল বড় দুর্বিনীত। আমি যখন তাকে চাইতাম, আমি যখন তার দেহভোগের জন্য চেপে ধরতাম তখন সে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে সরিয়ে দিত। আবার যখন আমি যৌন ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতাম তখন সে আমাকে সাপের কুণ্ডলীর মত জড়িয়ে ধরত। তারপর আমি যখন সঙ্গম শুরু করতাম, আমার কাজ হয়ে গেলেও সে আমাকে ছাড়তে চাইত না। অনেকক্ষণ পর আমাকে পীড়িত ও ক্লান্ত করে যখন ছাড়ত তখন এক পুলকের আবেগে শীৎকার ধ্বনি করে উঠত। মুখে বলত, চমৎকার। কিন্তু সে আমার অস্বস্তির কথাটা একবারও ভেবে দেখত না। আমাদের সেই যৌনক্রিয়ায় আমি যে অংশ গ্রহণ করতাম তাতে সে যেন কোন তৃপ্তির

অনুভূতি লাভ করত না, সে যেন শুধু তার নিজের চেষ্টা ও তৎপরতা থেকে তার সব তৃপ্তি লাভ করত। মাঝে মাঝে সে এক অন্ধ উন্মত্ত আবেগে তার ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়ে আমাকে চেপে ধরত, আমার যেখানে সেখানে কামড়ে ধরত। সে ছিল এমনই উগ্রকামা যে এই সব বিকৃত উপায়ে সে তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। আমি আর তাকে সহ্য করতে পারলাম না। আমরা আলাদা ঘরে শুতে লাগলাম। কিন্তু তবু সে তার দরকার মত আমার ঘরে চলে আসত।

আমাদের সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে কোনরকমে চলতে লাগল। সে আমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত এবং আবার এই ঘৃণার সঙ্গেই সে গর্ভ ধারণ করেছিল। সন্তানের জন্মের পরেই আমি যুদ্ধে চলে যাই। যুদ্ধের পর যখন শুনি সে স্ট্যাকগেট অঞ্চলে অন্য একটা লোকের সঙ্গে জুটেছে তখন আমি এখানে ফিরে আসি।

কথাটা শেষ করল সে এইখানে। তার মুখখানা ম্লান হয়ে উঠল।

কনি জিজ্ঞাসা করল, ও লোকটা কেমন ?

মেলর্স বলল, ছেলেমানুষের মত বোকা। লোকটাকে সে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। ওরা দুজনেই মদ খায়।

কনি বলল, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মেয়েটা যদি ফিরে আসে।

হা ভগবান ! তা ত বটে। তার মানে আমাকে আবার দূরে পালিয়ে যেতে হবে।

এরপর দুজনেই নীরব হয়ে রইল। ঘরের ভিতর জ্বলতে থাকা আগুনে পুড়ে পুড়ে কাঠগুলো ছাই হয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে কনি বলল, তুমি যদি এমন মেয়ে পাও যে তোমাকে চায়, তাহলে তুমি খুশি হও।

এর আগে যে সব মেয়ে আমার জীবনে এসেছে তাদের কাছ থেকে যে সুখ পেয়েছি তার থেকে বেশী সুখ পাব। পদ্মগন্ধী সেই বিষকন্যা আর বাকি মেয়েরা ?

বাকি কারা ?

বাকির ত আর শেষ নেই। তবে আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি শুধু বলেছি। আমার যতদূর মনে হয় বেশীর ভাগ মেয়েই একজন পুরুষকে চায় না। কিন্তু যৌন ব্যাপারটা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পুরুষকে হাতে রাখার জন্য যেটুকু যৌনক্রিয়ার দরকার ওরা শুধু সেইটুকুই করতে চায়। পুরনো আমলের মেয়েরা সঙ্গমকালে চুপচাপ নিষ্ক্রিয়ভাবে শুয়ে থাকবে তোমার তলায়, শুয়ে থাকবে মরার মত। তুমি যা খুশি করো। তারা কিছু মনে করে না এ ব্যাপারে এবং মোটামুটি পুরুষদের মেনে নেয়। পুরুষরাও এটা মেনে নেয়। আসলে কিন্তু তারা এটা চায় না। আমি কিন্তু এটা ঘৃণা করি। কিন্তু যারা

ধূর্ত ধরনের মেয়ে তারা মুখে এই ঘৃণার কথাটা প্রকাশ করে না। তারা উপরে দেখাতে থাকে তারা উগ্রকামা এবং পুলকের রোমাঞ্চ জাগে তাদের দেহে। কিন্তু এসব তাদের ছলনার কথা। তারা সব কিন্তু ভালবাসে; কিন্তু যা সত্যি স্বাভাবিক তাকে ভালবাসে না। আমার স্ত্রীর মত এক ধরনের মেয়ে আছে যারা যৌন ব্যাপারে সমস্ত কর্মতৎপরতা নিজেরাই দেখাতে চায়; সব তৃপ্তিটুকু নিজেরাই পেতে চায়। আর এক ধরনের মেয়ে আছে যারা যৌন ক্রিয়াকালে মরার মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। আর এক ধরনের শয়তান প্রকৃতির রমণী আছে যারা রমণকালে পুরুষদের রমণক্রিয়া শুরু করার কিছু পরেই তারা বিপরীত রতিতে পুরুষদের উপরে চেপে পুরুষদের উপর অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সমকামী পুরুষদের মতই ওরা ভয়ঙ্কর।

কনি বলল, ওদের তুমি দেখতে পার না?

মেলর্স বলল, ওদের মত মেয়ের সঙ্গে সঙ্গমকালে মনে হয় আমি ওদের খুন করে ফেলি।

তুমি কি মনে করো এই ধরনের মেয়েরা সমকামী পুরুষদের থেকেও খারাপ?

হ্যাঁ আমি তাই মনে করি। কারণ এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গমকালে আমার মনে হয় আর কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করব না।

ভ্রূদুটোকে কুঞ্চিত করে গম্ভীর হয়ে উঠল মেলর্স।

আমি যখন তোমার সংস্পর্শে এলাম তখন তুমি দুঃখিত হয়েছিলে?

আমি একই সঙ্গে দুঃখিত ও আনন্দিত হই।

এখন তোমার মনের অবস্থা কি?

বাইরের দিক থেকে আমি দুঃখিত। কারণ এই সম্পর্ক থেকে ভবিষ্যতে যে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে তার কথা ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না আমি। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে এবং আমি তখন উল্লসিত না হয়ে পারি না। জীবনে সত্যিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম আমি। ভাবতাম পৃথিবীতে কোন ভাল মেয়ে নেই যার সঙ্গে কোন পুরুষ এক সহজ স্বাভাবিক প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

কনি বলল, এখন তুমি খুশি ত?

হ্যাঁ আমি খুশি। বিশেষ করে যখন আমি অন্য সব মেয়েদের কথা ভুলে যাই, যখন তাদের ভুলতে পারি না তখন টেবিলের তলায় লুকিয়ে মরি।

কনি বুঝতে না পেরে বলল, টেবিলের তলায় মানে?

মানে বুঝতে পারছ না? মানে সন্তান।

কনি বলল, এত বিভিন্ন নারীর সংসর্গে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

হ্যাঁ, তুমি দেখ, আমি কখনো নিজেকে বোকা বানাতে পারিনি যা অনেক পুরুষই করে। এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের বোকা বানিয়ে মিথ্যাকে মেনে

নেয়। কিছু না পেয়েও বলে সব পেয়েছে। কিন্তু আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে না পেয়ে বলতে পারিনি তা পেয়ে গেছি।

এখন কি সে বস্তু পেয়ে গেছ ?

মনে হয় পেয়ে গেছি।

তবে তোমাকে এমন ম্লান ও বিষণ্ণ দেখায় কেন ?

পুরনো স্মৃতির চাপ আর হয়ত নিজের প্রতি এক ভয়ের জন্য।

কনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আচ্ছা, নরনারীর এ সম্পর্কটার কি জীবনে এমন কোন প্রয়োজন আছে ?

আমার মতে আছে। নরনারীর সম্পর্ক যদি ঠিক হয়, যদি ঠিক পথে চলে তাহলে এ সম্পর্ক হচ্ছে জীবনের সর্বপ্রধান প্রাণবস্তু।

কিন্তু জীবনে যদি সে সম্পর্কের আস্বাদ কখনো না পেতে ?

তাহলে কোনরকমে তা ছাড়াই জীবনটা কাটাতে হত।

কনি কিছুটা ভেবে নিয়ে বলল, আচ্ছা, নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুমি ঠিক পথে, ন্যায় পথে চলে এসেছ ?

না, মোটেই না! আমি আমার স্ত্রীকে তার ইচ্ছামত চলতে দিয়েছিলাম। আমার দোষ হচ্ছে সেইখানে। আমি আমার ব্যক্তিত্বকে ও পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিনি তার উপর। ফলে সে অবাধে খারাপ হয়ে যায়। আর আমি কোন মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কনি তার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার রক্ত যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দেহের মধ্যে তখন তুমি তোমার দেহকে বিশ্বাস করো ?

না, আর সেইখানেই যত গোলমাল। সেই জন্যই আমার মনে এত অবিশ্বাস।

কনি বলল, থাক তোমার মনে অবিশ্বাস।

কুকুরটা মেঝের উপর পাতা মাদুরের উপর বসে অস্বস্তিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল। আগুনে পোড়া কাঠের ছাই বেড়ে যাচ্ছিল বলে আগুনটা স্তিমিত হয়ে আসছিল।

কনি বলল, তুমি আমি দুজনেই দুই ভগ্ন সৈনিক।

মেলর্স হেসে বলল, তুমিও ভগ্ন সৈনিক ? এইখানেই আমাদের মিল।

কনি বলল, হ্যাঁ, সত্যিই আমার ভয় হয়।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ।

সে উঠে কনির ও নিজের জুতোগুলো আগুনের পাশে রেখে শুকোতে দিল। সকালবেলায় ওগুলোকে রং মাখাবে। তারপর ওদের সেই বিয়ের ফটোর পোড়া কাঠ আর কাগজের বোর্ডের ছবিগুলো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মেলর্স বলল, এই ছাইগুলোও নোংরা। হঠাৎ উঠে তার কুকুরটা নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর মেলর্স ফিরে এলে কনি বলল, আমিও বাইরে যাব একবার।

ঘর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল কনি। মাথার উপর আকাশভরা তারা। ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। বনেতে তখন দারুণ ঠাণ্ডা। কনির পায়ের জুতোগুলো ভিজে ভিজে মনে হচ্ছিল। সকলের কাছ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল তার।

দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাসাটায় ফিরে এল কনি। এসে দেখল, আগুনের ধারে বসে আছে মেলর্স। আগুনটায় কিছু কাঠ ফেলে দিয়ে আবার কিছু কাঠ আনল। জ্বলন্ত কাঠের আগুনের আঁচে ওরা আরাম অনুভব করছিল। তাদের মুখ ও বুকগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

মেলর্স চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ তার কাছে সরে গিয়ে তার একটা হাত ধরল কনি। বলল, কিছু মনে করো না।

সামান্য একটুখানি ক্ষীণ হাসি হেসে মেলর্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কনি আরও কাছে গিয়ে মেলর্সের কোলের ভিতর ঢুকে পড়ল। বলল, তুমি ওদের কথা একেবারে ভুলে যাও।

জ্বলন্ত আগুনের আরামঘন মিষ্টি উত্তাপের সঙ্গে কনির নরম দেহের স্পর্শটা আরও ভাল লাগছিল মেলর্সের। সে কনিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল। আবার উত্তাল হয়ে উঠল তার দেহের রক্ত। সে রক্তের মধ্যে আবার ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার হঠাৎ ফিরে আসা জারজ শক্তি।

কনি বলল, যে সব মেয়ে তোমার জীবনে এসেছিল তারা হয়ত তোমায় ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। হয়ত তাদের দোষ নেই।

আমি তা জানি। আমি সব কিছু জেনেও মেরুদণ্ড ভাঙ্গা সাপের মত হয়েছিলাম।

কনি এবার তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল। ঠিক এই মুহূর্তেই সে সঙ্গম শুরু করতে চায়নি। তবু কোন এক অজ্ঞাত অব্যক্ত শক্তি ঠেলে দিতে লাগল সেই পথে, যৌনসংসর্গের এক অন্ধকার পঙ্কিলতার মাঝে।

কনি বলল, কিন্তু এখন ত তুমি আর মেরুদণ্ড ভাঙ্গা সাপ নও।

আমি জানি না আমি কি। আমার মনে হয় আমাদের সামনে দুর্দিন আসছে।

কনি তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, না না, ওকথা বলো না। কেন, কেন তুমি একথা বলছ?

এক বিষাদঘন শঙ্কার ছায়ায় মুখখানা কালো করে মেলর্স বলল, দুর্দিনের কালো মেঘ নেমে আসছে আমাদের সকলের উপর।

না না, ওকথা বলো না।

মেলর্স চুপ করে রইল। কনি সত্যি সত্যিই নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝেও হতাশা আর বিষাদের এক কৃষ্ণকুটিল শূন্যতা স্পষ্ট অনুভব করল। মেলর্সের দেহের স্পর্শেও তা অনুভব করল। এ শূন্যতার অর্থ বুঝতে পারল কনি।

এ শূন্যতা হলো এক ধরনের মৃত্যু, সকল কামনা সকল প্রেমের মৃত্যু। এ হতাশা হচ্ছে সেই অনীহার অদৃশ্য অন্ধকার গুহাদেশ যা সব পুরুষের মনের মধ্যেই থাকে এবং যার মধ্যে একদিন সব পুরুষের পুরুষত্বই সব তেজ ও তাপ হারিয়ে এক সীমাহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে।

কনি ভয়ে ভয়ে বলল, যৌন ব্যাপারে তুমি একেবারে নিস্পৃহ। তোমার কথা শুনে তাই মনে হয়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এর আগে যে সব যৌনসংসর্গ করেছ তাতে শুধু তুমি তোমার নিজের আনন্দ আর তৃপ্তিটাকেই বড় করে দেখেছ।

এক কুণ্ঠিত প্রতিবাদের সুর ছিল কনির কণ্ঠে।

মেলর্স বলল, ঠিক তা নয়। আমি নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ চেয়েছি ঠিক, কিন্তু তা আমি ঠিক পাইনি। কারণ কোন নারীর সঙ্গে সহবাস করে আমি ততখানি তৃপ্তি বা আনন্দ পাই সে আমার থেকে যতখানি সে তৃপ্তি বা আনন্দ পায়। আমার মনে তা কখনো ঘটেনি। সহবাসের আনন্দ নরনারীর যৌথ অনুভূতির ব্যাপার।

কনি বলল, কিন্তু তুমি ত কোন নারীর কথা বিশ্বাস করনি। তুমি আমার কথাও বিশ্বাস করো না।

কোন নারীকে বিশ্বাস করার অর্থ কি তা আমি জানি না।

এইটাই তোমার দোষ।

কনি তখনো মেলর্সের কোলের মধ্যে কুঁচকে ঢুকে ছিল। কিন্তু মেলর্সের মন সেখানে ছিল না। কনির কোন কথাই তার মনের চেতনাকে নিবিড় করে তুলতে পারছিল না তার দেহের মধ্যে।

কনি বলল, তুমি কিসে বিশ্বাস করো?

আমি তা জানি না।

কনি বলল, অন্য সব লোকের মত তুমি কিছুই জান না।

প্রথমে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মেলর্স বলল, হ্যাঁ, আমি সত্যিই একটা জিনিসে বিশ্বাস করি। আমি চাই আন্তরিকতার উত্তাপ। আমি এই আন্তরিকতার উত্তাপ নিয়ে কোন নারীর সঙ্গে সঙ্গম বা সহবাস করতে ভালবাসি আর সঙ্গে সঙ্গে চাই নারীরাও অনুরূপ আন্তরিকতার উত্তাপে আমাকে গ্রহণ করবে। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আন্তরিকতার উত্তাপহীন যে সঙ্গম তা হিমশীতল মৃত্যুর মতই অবাঞ্ছনীয়। তা নির্বুদ্ধিতারই সামিল।

কনি বলল, তুমি ত কখনো বিনা আন্তরিকতায় আমার সঙ্গে সঙ্গম করনি।

আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করতেই চাই না। আমার অন্তঃকরণ এখন ঠাণ্ডা আলুর মতই পড়ে আছে।

কনি তাকে চুম্বন করে বলল, এইবার আমাদের কাজ শুরু করো।

মেলর্স বলল, আমরা একটুখানি আন্তরিকতার কাঙাল। কিন্তু মেয়েরা এটা চায় না। এখন কি তুমিও চাও না। তুমি চাও এক বলিষ্ঠ পুরুষের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী রমণ; কিন্তু সে রমণ হবে আন্তরিকতাহীন। আমার প্রতি কোথায় তোমার ভালবাসা বা মমতা? বিড়াল যেমন কুকুরকে সন্দেহের চোখে দেখে তুমিও তেমনি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখ। আমার মনে হয় মমতা আন্তরিকতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিতে হলেও দুজনের পারস্পরিক সহযোগিতার দরকার হয়। তুমি সঙ্গম ভালবাস ঠিক, চাও এক চরম পুলকানুভূতির এক বিরল অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা শুধু তোমার আত্মসুখ চরিতার্থ করার জন্য। তোমার আত্মসুখ এবং নিজের প্রতি গুরুত্ববোধ যে কোন পুরুষের থেকে পঞ্চাশ গুণ বেশী।

কনি বলল, একথা আমিও তোমায় বলতে পারি। তোমার কাছেও তোমার আত্মসুখই বড় কথা।

মেলর্স উঠতে উঠতে বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের দূরে থাকা ভাল পরস্পরের। আন্তরিকতাহীন সঙ্গম করার থেকে মরা ভাল।

কনি তার কোল থেকে উঠে পড়তেই মেলর্স উঠে দাঁড়াল।

কনি বলল, তুমি কি মনে করো আমিও এই ধরনের সঙ্গম চাই?

মেলর্স বলল, আশা করি তুমি তা চাইবে না। তবু তুমি আমার বিছানাটাতে শোওগে। আমি এইখানেই শোব।

কনি দেখল মেলর্সের মুখখানা ম্লান। ভ্রূদুটো কুঞ্চিত। তাকে দেখে মনে হলো কুমেরুর মতই হিমশীতল আর সুদূরবর্তী।

কনি বলল, সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি যেতে পারছি না।

না, এখন পৌনে একটা বাজে। বিছানায় যাও।

কনি বলল, না, আমি কিছুতেই যাব না।

মেলর্স বলল, তাহলে আমি বাইরে বেরিয়ে যাব।

সে জুতো পরতে লাগল। কনি তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কনি বলল, থাম, থাম, আগে বল কি হয়েছে আমাদের মধ্যে?

মেলর্স কোন উত্তর করল না। জুতোয় ফিতে পরাচ্ছিল সে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কনি দাঁড়িয়েছিল। তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। সেই ঝাপসা চোখের অস্বচ্ছ অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে মেলর্সের দিকে তাকিয়েছিল সে। কনি বুঝতে পারল না কেন সে তাকিয়ে আছে, এ দৃষ্টির উৎস কোথায়। শুধু মনে হলো যেন এক অপরিজ্ঞাত শূন্যতার অন্তহীন গভীরতা হতে উৎসারিত হচ্ছে এ দৃষ্টি। সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির সীমাহীন কুয়াশায় সমস্ত জগৎ যেন ঢেকে গেছে। আর কিছুই দেখতে পায় না, আর কিছুই জানতে চায় না সে।

নীরবে চোখ তুলে কনিকে দেখল মেলর্স। দেখল বিস্ফারিত চোখের

কুয়াশাভরা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে কনি। আপন চিন্তার অর্থহীন শূন্যতার অতলে হারিয়ে গেছে সে। তার মধ্যে সে যেন আর নেই। সহসা একটা দমকা হাওয়ায় মাথাটা ঘুরে গেল মেলর্সের। একটা পায়ে জুতো পরা অবস্থাতেই সে কনিকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল। তার জামার তলায় হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার তলপেটের তলায় নরম উত্তপ্ত জায়গাটা বারবার স্পর্শ করতে লাগল। আদরের ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, আমার সোনা মেয়ে, আমি তোমায় ভালবাসি।

কনি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, থাম, আবেগে বিচলিত হয়ো না। আগে বল সত্যিই তুমি আমাকে চাও কি না, সত্যিই সঙ্গম চাও কি না।

সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল মেলর্সের দেহের সমস্ত চঞ্চলতা। সে স্থির হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, হ্যাঁ চাই। চল আমরা মিলিত হই।

কনি তার চোখে জল নিয়ে বলল, সত্যি বলছ ?

হ্যাঁ সত্যি বলছি।

তার নিচে শুয়ে থাকা কনির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে হাসল সে। সে হাসিতে কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে ছিল এক প্রচ্ছন্ন তিক্ততা।

এদিকে কনি তখন নীরবে কাঁদছিল। কনিকে জড়িয়ে ধরে মেলর্স শুয়ে ছিল তখনো। একটা কম্বল জড়িয়ে মেঝের উপর শুয়েছিল তারা। তাই তাদের দুজনের সমান কষ্ট হচ্ছিল। ওরা আর দেরি না করে বিছানায় চলে গেল তাড়াতাড়ি। রাত্রির হিম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। মেঝের উপর রমণকালে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দুজনেই। তাই ওরা বিছানায় গিয়ে দুজনে শুতেই ঘুমিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওরা বাকি রাতটুকু একভাবে গভীরভাবে ঘুমোল। ওদের ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সকালের রোদ উঠে গেছে। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

মেলর্স প্রথমে উঠে পড়ল। উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে তুলে আলোর পানে তাকাল। কান খাড়া করে ব্ল্যাকবার্ড আর থ্রাস পাখির গান শুনল। তখন সকাল সাড়ে পাঁচটা, তার ওঠার সময়। মেলর্স দেখল আজকের সকালটা বেশ উজ্জ্বল। গতরাতে গভীরভাবে ঘুমিয়েছে সে। জীবনে এমন দিন এর আগে আর কখনো আসেনি, যেন এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। তার শয্যা-সঙ্গিনী সেই নারী এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুমন্ত দেহটাকে বড় স্নিগ্ধ ও মনোরম দেখাচ্ছে। সে দেহের উপর হাতটা পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল কনির। ঘুম ভাঙ্গতেই এক পরম বিস্ময়ে চোখ তুলে মেলর্সের মুখপানে তাকাল কনি। তাকিয়ে হেসে ফেলল আপন অজানিতে।

কনি বলল, তুমি উঠে পড়েছ ?

কনির চোখপানে তাকিয়ে মেলর্সও হেসে ফেলল। কনিকে চুম্বন করল।

সহসা উঠে বসল কনি। বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, দেখ দেখি, কোথায় আমি আছি। কেমন আশ্চর্য লাগছে।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল কনি। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল একটা চেয়ার আর একটা ছোট সাদা বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই। এই বিছানাটাতেই শুয়ে আছে সে।

কনি আবার বলল, আমরা কোথায় শুয়ে আছি ভাবতেও কেমন লাগছে। মেলর্স আবার শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়ে দেখছিল কনিকে। পাতলা নাইট গাউনে ঢাকা কনির বুকটার উপর হাত বোলাচ্ছিল। তাদের দুজনকেই এক মধুর উত্তাপে ও আবেগে বড় সজীব ও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কনি সহসা বলে উঠল, আমি এটা সরিয়ে ফেলতে চাই।

এই বলে সে তার বুকের উপর থেকে কাপড়টা তুলে ফেলল। তার ঘাড় বুক পেট সব এক নগ্ন শুভ্রতায় প্রকটিত হয়ে উঠল। তার সোনারবরণ ঈষৎ শিথিল স্তন দুটো ঘণ্টার মত ঝুলছিল। সেগুলো হাত দিয়ে বোলাতে ভাল লাগছিল মেলর্সের।

কনি সহসা বলল, তুমিও তোমার পায়জামা খুলে ফেল।

কনির কথামত তার সমস্ত জামা ও পায়জামা খুলে একেবারে নগ্নদেহ হয়ে উঠল মেলর্স। দুধের মত সাদা তার নগ্ন দেহটাকে দেখতে কনির বড় ভাল লাগছিল। তার মনে পড়েছিল একদিন স্নানরত মেলর্সের দেহটাকে এমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার দেহসৌন্দর্য এক অনিবারণীয় তীক্ষ্ণতায় তার মর্মকে স্পর্শ করছিল যেন।

সহসা বিছানা থেকে উলঙ্গ অবস্থাতেই উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল মেলর্স। কনি তার নগ্ন পৃষ্ঠদেশটা দেখতে লাগল। পিঠটা সাদা এবং সুন্দর। পাছার কাছটা পুরুষদেহসুলভ এক কৃষ্ণাভ বর্ণে দীপ্ত। ঘাড়ের পিছনটাও বেশ শক্ত।

কনির মনে হলো, মেলর্সের দেহের ভিতরে ও বাইরে একই সঙ্গে এক পুরুষালি বলিষ্ঠতা ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে এক দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। মেলর্সের দিকে দুহাত বাড়িয়ে কনি বলল, তুমি সত্যিই সুন্দর, তুমি আমার কাছে চলে এস, অনেক কাছে এস।

কিন্তু তার লিঙ্গোত্থিত দেহের নগ্ন প্রকটতায় লজ্জা পাচ্ছিল মেলর্স। কনির দিকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছিল সে। তাই মেঝে থেকে তার শার্টটা তুলে কোমরের কাছে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

কনি বিছানার উপর বসে তেমনি হাত দুটো বাড়িয়ে বলল, না, ঢাকা দিও না। উলঙ্গ হয়েই এস, আমাকে দুচোখ ভরে দেখতে দাও।

কনির কথামত জামাটা ফেলে দিয়ে কনির সামনে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে নগ্ন

দেহে দাঁড়াল মেলর্স। পর্দাখোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক সোনার মত আলো এসে তার তলপেট আর বাদামী কেশগুচ্ছপরিবৃত পূর্ণোত্থিত কৃষ্ণাভ পুরুষাঙ্গের উপর পড়ল। একই সঙ্গে ভয় আর আনন্দের মিশ্রিত বিস্ময়ে চমকে উঠল কনি।

কনি বলল, কী আশ্চর্য দেখ। কেমন আশ্চর্যভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে দেখ। কত বড় কৃষ্ণবর্ণ আর আত্মপ্রত্যয়ের আতিশয্যে কত স্পর্ধিত।

তার দেহের নিচে তার উত্থিত পুরুষাঙ্গের পানে একবার তাকিয়ে হাসল মেলর্স। সে দেখল তার বুকের মাঝখানে যে চুল আছে তা কালো, তার মাথার চুলও কালো, কিন্তু তার তলপেটের নিচে যে চুল রয়েছে তার রংটা কেমন যেন সোনালী আর লালে মেশা। তাম্রবর্ণ মেঘসদৃশ সেই কেশগুচ্ছের মাঝে এক কৃষ্ণাভ বলিষ্ঠতায় উত্তুঙ্গ লিঙ্গটিকে বড় বেশী প্রকট দেখাচ্ছিল।

শান্ত নরম কণ্ঠে কনি বলল, দেখ দেখ কত উদ্ধত কত দর্পিত। এক অপরিসীম প্রভুত্ববোধে কেমন স্ফীত। এবার আমি বুঝতে পেরেছি পুরুষরা কেন এত অহঙ্কারী হয়। তবে ও কিন্তু সত্যিই সুন্দর। ও যেন আর এক সত্তা। এক মানুষের মাঝে আর এক মানুষ। ভয়ঙ্কর হলেও সুন্দর। এক অজানিত আশঙ্কায় ও আনন্দের উত্তেজনায় তার নিচের দিকের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল কনি।

মেলর্স তার পুরুষাঙ্গটাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, কী ছোকরা, তোমার খবর কি জন টমাস? তুমি কিন্তু আমার থেকে সাহসী, স্বল্পভাষী।

তোমাকে লেডি জেন চাইছে, সে তোমাকে ভালবাসে। তোমার মাথাটাকে সে আদর করে। কি চাও তুমি? বলে দাও লেডি জেনকে, বলে দাও তুমি তার যৌনাঙ্গটি চাও।

কনি বলল, ওকে তুমি বকো না।

এই বলে বিছানার উপর হাঁটু গেরে বসে মেলর্সের সামনের দিক থেকে তার পাছাটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। এমনভাবে যাতে তার উত্থিত লিঙ্গের মন্দমধুর কঠিনতাটা তার বুকের উপর ঝুলন্ত স্তনদুটোকে ঘা দিতে পারে, যাতে তার সেই লিঙ্গাগ্রভাগনিঃসৃত লালারসে তার স্তনযুগল সিক্ত হতে পারে।

মেলর্স ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

ওদের সঙ্গমের কাজ শেষ হয়ে গেলে ওদের দেহদুটো যখন স্থির হয়ে গেল একেবারে তখন কনি মেলর্সের নিম্নাঙ্গে হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গটির আর এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে লাগল।

কনি বলল, দেখ দেখ, এখন কত ছোট, কত নরম, যেন সকল জীবনের সকল প্রাণের এক স্ফুটনোন্মুখ ফুল।

মেলর্সের পুরুষাঙ্গটি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবার বলতে লাগল, দেখ দেখ, কত সুন্দর। ওকে যেন তুমি অপমান করো না। ও শুধু তোমার

নয়, ও আমারও। এখন ও কত সুন্দর কত নির্দোষ দেখ! যেন কিছুই জানে না।

মেলর্স হাসল। হেসে বলল, যে বস্তু আমাদের দ্বৈত প্রেমের দুরন্ত পশুটাকে ঠিকমত শাসনের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে সে বস্তুকে ধন্যবাদ, তা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়।

কনি বলল, নিশ্চয়। ও যখন এত ছোট আর নরম তখনো আমি বেশ অনুভব করছি আমার সমগ্র অন্তরাত্মাটা ওর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। কত সুন্দর! তোমার এ জায়গার চুলগুলো কত আলাদা।

মেলর্স বলল, ওটা হচ্ছে জন টমাসের চুল, আমার নয়।

কনি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেণ্ট টমাস, সেণ্ট টমাস। এই বলে মেলর্সের পুরুষাঙ্গটাকে আদরের সঙ্গে চুম্বন করল। ছোট নরম লিঙ্গটা তখন আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করেছে।

মেলর্স পা ছড়িয়ে শুয়ে বলল, ও সত্যিই আমার থেকে আলাদা। আমার মনের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। এক এক সময় আমি খুঁজে পাই না ওকে নিয়ে আমি কি করব। ওর যেন নিজস্ব এক ইচ্ছাশক্তি আছে। ওকে খুশি করা সত্যিই মুস্কিল। তবু ওকে আমি মারতেও কখনো পারব না।

কনি বলল, পুরুষরা ওকে যে ভয় করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও সত্যিই ভয়ঙ্কর।

মেলর্সের দেহটা আবার কেঁপে উঠল। সে কাঁপন জড়িয়ে পড়ল সব শিরা উপশিরায়। তার জৈব চেতনার সমস্ত প্রবাহ এক দুরন্ত আবেগে ছুটে গিয়ে একটি বিশেষ জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে লাগল।

মেলর্স দেখল তার পুরুষাঙ্গটি আবার উত্থিত ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তার ইচ্ছা না থাকলেও তার এই উদ্ধত উত্থানের কাছে সে অসহায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত করার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

তার সেই উদ্ধত মাথাটা দেখে সত্যিই বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেল কনি।

মেলর্স বলল, এই নাও, ওকে গ্রহণ করো। ও তোমার।

কনির দেহটা একবার কেঁপে উঠল। এক কম্পিত বিহ্বলতায় তলিয়ে যেতে লাগল কনি। তবু সেই উত্থিত উদ্ধত পুরুষাঙ্গটি তার সমস্ত মেদুর কঠিনতা নিয়ে তার যোনিদেশের গভীরে যখন প্রবেশ করল তখন এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় পুলকের এক তীক্ষ্ণ প্রবাহ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগল তার দেহ-মনের উপরে। সে প্রবাহের মধ্যে যে এক প্রাণবন্ত উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল তার আঘাতে কনির সমস্ত সত্তাটা গলে গেল মুহূর্তে। কনির মনে হলো সে যেন ভেসে যাচ্ছে। অন্ধ অজানা এক আনন্দের মহাসমুদ্রের প্রান্তসীমার দিকেও যেন দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে।

মেলর্স শুয়ে শুয়ে স্ট্যাকগেটের কয়লাখনি থেকে আসা আওয়াজ শুনতে

গেল। ও আওয়াজ ও শুনতে চায় না। শুনতে চায় না বলেই সে যেন তার গোটা মুখটা কনির নরম বুকের মধ্যে গুঁজে কানদুটোও ঢেকে রাখতে চাইল।

সে শব্দ কনিও যেন শুনতে চায় না। বাইরের জগতের কোন শব্দই শুনতে চায় না তারা। কোন দৃশ্য দেখতে চায় না। কনি নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল একভাবে। কোন এক অজানিত তরঙ্গের অভিঘাতে বারবার বিধৌত হয়ে বৃষ্টিস্নাত আকাশের মতই আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তার আত্মা।

মেলর্স এবার ধীরে ধীরে বলল, এবার তোমার ওঠা উচিত। তাই নয় কি?

কনি জিজ্ঞাসা করল, সময় এখন কত?

এখন সাতটা বাজে প্রায়।

তাহলে আমাকে উঠতেই হবে।

উঠতে বিরক্তিবোধ করছিল কনি। যে প্রয়োজনের নির্মম তাড়না, বাইরের জগতের যে অবাঞ্ছিত অনুশাসন তার এই বনান্তরালবর্তী নির্জন সহবাস আর সুখের জগৎ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার উপর রাগ হলো তার।

সহসা মেলর্স উঠে বসে বাইরে তাকাল। কনি উঠে বসল, তুমি আমাকে ভালবাস ত?

মেলর্স বলল, একথার উত্তর তুমি জান। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ?

কনি বলল, আমি চাই তুমি চিরদিন আমাকে রেখে দেবে তোমার কাছে। আমাকে এখান থেকে কোনদিন কোথাও যেতে দেবে না।

কেমন যেন এক তরল অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে উঠল মেলর্সের চোখদুটো। সে বলল, কখন? এখনি?

কনি বলল, এখনি তোমার অন্তরে আমাকে ভরে রেখে দাও। আমি শীঘ্রই তোমার কাছে চলে আসব তোমার সঙ্গে চিরদিনের মত বাস করার জন্য।

বিছানার উপর নগ্ন দেহে বসে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল মেলর্স।

কনি বলল, তুমি কি এটা চাও না?

অন্যমনস্কভাবে মেলর্স বলল, হ্যাঁ।

মেলর্স বলল, ওকথা আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করো না। পরে যখন খুশি জিজ্ঞাসা করো। এখন শুধু আমাকে তোমার এই সঙ্গসুখ উপভোগ করতে দাও প্রাণ ভরে। কোন নারী যখন প্রাণ খুলে অকুণ্ঠভাবে তার দেহ আমাদের ভোগ করতে দেয় তখন তাকে সত্যিই খুব ভাল লাগে। তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা দেহটাকেই বড় ভাল লাগছে আমার। এখন আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে রয়েছে শুধু তোমার কথা। এখন আমাকে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না। তার অন্য সময় করতে।

মেলর্স তখনো বিছানার উপর উলঙ্গ হয়ে বসেছিল। সে ধীরে ধীরে তার

একটা হাত শায়িতা কনির যোনিদেশ ও তার আশপাশের উদ্গত বাদামী রঙের চুলগুলোর উপর হাত বোলাতে লাগল। তার নগ্ন দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক জৈব চেতনা আর অনুভূতির তরঙ্গ খেলে গেলেও তার মুখখানা যেন বুদ্ধের মতই জমাট বেঁধে ছিল এক নিষ্কাম স্তব্ধতায়। কনির গায়ে হাত দিয়ে সেইভাবে বসে রইল মেলর্স।

আরো কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ে তার জামা আর পায়জামা খুঁজে পরতে লাগল মেলর্স। তাকিয়ে দেখল কনি তখনো নগ্ন দেহে শুয়ে আছে বিছানায়। কিন্তু আর সেখানে না দাঁড়িয়ে চলে গেল সে। কনি দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

কনি তখনো শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। লোকটার সাহচর্য আর বাহুবন্ধনের মায়া কাটিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া মুস্কিল তার পক্ষে। কিন্তু ওদিকে মেলর্স যেতে যেতে বলল, সাড়ে সাতটা বাজে।

কনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। একবার তাকিয়ে দেখল ঘরখানার মধ্যে বিশেষ কোন আসবাবপত্র নেই। কিন্তু মেঝেটা চমৎকারভাবে পরিষ্কার করে সাজানো গোছানো। কনি আরো দেখল জানালার কাছে একটা তাকে কিছু বই রয়েছে। কিছু বই তার কেনা আর কিছু বই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের। কনি উঁকি মেরে দেখল বইগুলো বিভিন্ন বিষয়ের। তার মধ্যে আছে বলশেভিক রাশিয়ার উপর লেখা বই। ভ্রমণকাহিনী, এ্যাটম ও ইলেকট্রনের উপর বিজ্ঞানবিষয়ক বই, আর আছে পৃথিবীর গঠন আর ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কিত বই। মোট কথা লোকটা বই পড়ে। পড়াশুনো করে।

জানালা দিয়ে সূর্যের এক ঝলক আলো এসে কনির নগ্ন দেহের উপর পড়ল। কনি জানালা দিয়ে বাইরে দেখল মেলর্সের কুকুর ফ্লসি ঘোরাফেরা করছে। এই সোনালী সকালটা কত চমৎকার। কত উজ্জ্বল। পাখিরা মনের সুখে গান গাইছে গাছে গাছে। চারদিকের বাতাসে ফোটা ফুলের গন্ধ। কনির বার বার মনে হতে লাগল সে যদি এখানে এক সবুজ শান্তি আর নির্জনতা দিয়ে ঘেরা এই বনভূমির মধ্যে একটা ঘর বেঁধে থাকতে পারত তার মনের মানুষের সঙ্গে। ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখল মেলর্স হাত মুখ ধুয়ে চা করার কাজে ব্যস্ত। কনিকে দেখে সে বলল, চা খাবে?

কনি বলল, না, আমাকে একটা চিরুণী দাও।

আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়িয়ে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হলো কনি।

তাকে এখন যেতে হবে সেই ভয়ঙ্কর জগতে, লোহার স্তূপ আর কয়লার ধোঁয়ায় ঘেরা যে জগৎ তার জন্য প্রতীক্ষা করছে এক নিষ্ঠুর প্রত্যাশায়।

সামনের বাগানটায় গিয়ে কিছুক্ষণ ফুল দেখল কনি। কত রকমের ফুল, কত রঙের বাহার, কত উজ্জ্বলতা।

কনি মেলর্সকে বলল, বাকি সমস্ত জগৎটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমি তোমার

সঙ্গে এখানে বাস করতে আসব। নতুন জীবন গড়ে তুলব।

মেলর্স বলল, সে জগৎ উড়ে যাবে না।

শিশিরভেজা বনপথ দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল তারা। এ জগৎ তাদের নিজস্ব জগৎ। এ পথের প্রতিটি অণু তাদের ভালবাসার আশ্বাসে গড়া।

র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে মন চাইছিল না কনির। তবু যেতে হবে। সে মেলর্সকে বলল, আমি খুব শীগগির চলে আসব তোমার কাছে। একসঙ্গে থাকব দুজনে।

কোন উত্তর না দিয়ে একটুখানি হাসল শুধু মেলর্স। তার মুখের ক্ষীণ হাসি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল মুখের মাঝে।

বাড়ি ফিরে দেখল কেউ কিছু জানতে পারেনি তার কথা। বাড়িতে পা দিয়েই সোজা নিজের ঘরে চলে গেল কনি।

অধ্যায় ১৫

সেদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে হিলদার একটা চিঠি পেল কনি। হিলদা লিখেছে, বাবা এই সপ্তায় লণ্ডনে যাচ্ছেন। আমি ১৭ই জুন বৃহস্পতিবার তোমার ওখানে যাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে যাতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি। র‍্যাগবিটা বড় বাজে জায়গা; ওখানে আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি আগের দিন রেটফোর্ডে কোলম্যানদের কাছে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার লাঞ্চের সময় তোমার কাছে যাব। আমরা বিকালে চা খাবার সময় রওনা হয়ে রাতটা প্রাণভারে কাটাব। র‍্যাগবিতে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটানোর কোন অর্থ হয় না। সে যদি তোমার যাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ না করে তাহলে আমাদের উপস্থিতিতে সে মোটেই আনন্দ পাবে না।

তাকে আবার দাবার ছকের উপর বসানো হচ্ছে।

কনির যাওয়াটা সত্যিই পছন্দ করছিল না ক্লিফোর্ড। কারণ তার ধারণা কনির অনুপস্থিতিতে কেমন যেন অসহায়বোধ করবে সে। কনি বাড়িতে থাকলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে সে আর তখন সব কাজ নিশ্চিন্ত মনে সহজে করে যেতে পারে। এখন সে প্রায়ই খাদে গিয়ে সবচেয়ে কম খরচে বেশী কয়লা তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। কয়লা তোলা আর তা বিক্রি করাই হলো তার কাজ। আজকাল আবার তার মাথায় নতুন নতুন চিন্তা আসছে শিল্পের উন্নতির জন্য। সে ভাবছে তার খনিতে উৎপন্ন কয়লা বিক্রি না করে সেই কয়লা দিয়ে অন্য এক শিল্প গড়ে তুলতে।

কনির মনে হয় এ হচ্ছে এক নেশা, এক উন্মত্ততা। এ কাজে একমাত্র

কাজ-পাগল লোকরাই সফল হতে পারে। কনির মনে হয় শিল্পের ব্যাপারে ক্লিফোর্ডের এই সব প্রেরণা আর কর্মতৎপরতা উন্মত্ততারই লক্ষণ।

এ ব্যাপারে সব কথা কনিকে বলত ক্লিফোর্ড এবং কনিও তা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে যেত এবং অবাধে সব কথা বলতে দিত ক্লিফোর্ডকে। নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বলত ক্লিফোর্ড। কিন্তু কিছুক্ষণ একটানা কথা বলার পর সহসা সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে ক্লিফোর্ডের আর তখন সে শূন্য মনে খনির পানে তাকিয়ে থাকে। তখন তার সব পরিকল্পনা মুখ থেকে মনের গভীরে চলে গিয়ে স্বপ্ন হয়ে ভাসতে থাকে যেন।

প্রতিটি রাতে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে সেই খেলাটা খেলে যায় ক্লিফোর্ড। খেলাটা এক ধরনের জুয়া। জুয়া খেলতে খেলতে কেমন যেন সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চেতনাশূন্য হয়ে পড়ে। এক অর্থহীন শূন্যতাসর্বস্ব উন্মত্ততা আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমস্ত মনোভূমিটাকে। কনি তার এই শোচনীয় অবস্থাটা দেখে সহ্য করতে পারে না। সে বিছানায় শুতে যাবার পরেও রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত মিসেস বোল্টনের সঙ্গে জুয়ো খেলে যায় ক্লিফোর্ড। এ বিষয়ে রোজ রাতে এক আশ্চর্য ধরনের আসক্তির পরিচয় দেয় সে। এ বিষয়ে মিসেস বোল্টনের উৎসাহও কম নয়। সে রোজ হেরে যায়। যতই হারতে থাকে ততই তার খেলার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

একদিন মিসেস বোল্টন বলে, আমি গত রাতে কুড়ি শিলিং হেরে গেছি।

কনি জিজ্ঞাসা করে, ক্লিফোর্ড তোমার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল?

মিসেস বোল্টন বলে, কেন চাইবেন না, ঋণ ত?

কনি প্রতিবাদ করেছিল। সে এ ব্যাপারে দুজনেরই উপর রেগে যায়। ফলে ক্লিফোর্ড বোল্টনের মাইনে বছরে একশো পাউণ্ড বাড়িয়ে দেয়। সেই টাকাতে মিসেস বোল্টন নিশ্চিন্তে জুয়ো খেলে যেতে পারে। তবে কনির প্রায়ই মনে হত ক্লিফোর্ডকে যেন ম্লান আর নির্জীব দেখাচ্ছে।

অবশেষে একদিন ক্লিফোর্ডকে বলল কনি, আমি সতের তারিখে চলে যাচ্ছি।

ক্লিফোর্ড বলল, সতেরই? কবে ফিরবে?

খুব বেশী দেরী হলে ২০শে জুলাই।

কনির পানে এবার অদ্ভুতভাবে তাকাল ক্লিফোর্ড। সে দৃষ্টির মধ্যে শিশু-সুলভ এক অস্পষ্টতার সঙ্গে বৃদ্ধসুলভ এক চাতুর্যের ভাব ছিল।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি নিশ্চয় আমাকে হতাশ করবে না?

তার মানে?

তুমি যখন এখান থেকে চলে যাবে তখন তুমি ফিরে আসবে একথা মনে করতে পারব ত?

আমি যে ফিরে আসব এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ঠিক আছে, আমি নিশ্চিত হলাম। ২০শে জুলাই।

তবু কনির দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকাল ক্লিফোর্ড।

তবু ক্লিফোর্ড সত্যি সত্যিই চাইছিল কনি থাক। সত্যিই সে এ বিষয়ে এক আশ্চর্য কামনাকে পোষণ করে। সে চায় কনি বেড়াতে যাক এবং সন্তান-সম্ভবা হয়ে আসুক। আবার সঙ্গে সঙ্গে কনির যাওয়ার কথা শুনে শঙ্কিতও হয়ে উঠছিল মনে মনে।

এদিকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের উত্তেজনায় সারা অঙ্গ কাঁপছে কনির। ক্লিফোর্ডকে ছেড়ে এই বাড়ির সীমানা ছেড়ে দূরে যাওয়ার এই প্রথম সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে যেন সে। সে এক অধীর আগ্রহে এক উষ্ণ উত্তেজনা বুকে নিয়ে সেই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে কনি।

একদিন কনি তার বাইরে যাবার কথাটা মেলর্সকে বলল।

কনি বলল, ফিরে আসার পর আমি ক্লিফোর্ডকে বলব, আমি আর তার কাছে থাকব না, তাকে ছেড়ে চলে যাব আমি। তখন তুমি আর আমি বাইরে চলে যাব। ওরা জানবে না আমার সন্তানের জনক তুমি। আমরা অন্য কোন দেশে চলে যাব। আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া। ঠিক ত?

নিজের পরিকল্পনাটার কথা ভেবে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এক গোপন পুলকের আবেগে।

মেলর্স বলল, তুমি কখনো কোন উপনিবেশে যাওনি ত?

না, তুমি গেছ?

আমি ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা আর মিশর গিয়েছি।

কেন, আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে পারি ত?

মেলর্স ধীরে ধীরে বলল, হ্যাঁ, পারি।

কনি বলল, তুমি কি তা চাও না?

আমি কোন বিষয়েই কোন গুরুত্ব দিই না। আমি কি করি তা নিজেই জানি না।

এতে তুমি সুখী নও? কেন নও? আমরা ত গরীব হয়ে যাব না? আমার বাৎসরিক আয় ছশো পাউণ্ড। আমি চিঠি লিখে সব জেনে নিয়েছি। এটা অবশ্য খুব একটা বড় সম্পদ নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাই যথেষ্ট। তাই নয় কি?

আমার কাছে এক বিরাট সম্পদ।

সত্যিই কী চমৎকার হবে!

কিন্তু আমাকে ও তোমাকে তার আগে বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে। কোন নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আগে তা করতেই হবে।

অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে।

আবার কনি কথাটা তুলল মেলর্সের কাছে। ওরা বনের মধ্যে সেই কুঁড়ে-ঘরটায় দুজনে ছিল। তখন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল।

কনি বলল, যখন তুমি লেফটন্যান্ট ও অফিসার ছিলে তখন তুমি সুখী হও নি? তখন তুমি ভদ্র জীবন যাপন করতে?

সুখী? হ্যাঁ, আমি আমার কর্ণেলকে ভালবাসতাম।

তুমি তাকে ভালবাসতে?

হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবাসতাম।

সে তোমাকে ভালবাসত?

হ্যাঁ, একদিক দিয়ে তিনি আমাকে ভালবাসতেন।

তাঁর সম্বন্ধে আমাকে সব কথা বল।

কি বলব তাঁর কথা? তিনি সাধারণ মানুষ থেকে উন্নতি করে বড় হন। তিনি সৈন্যদের ভালবাসতেন। বিয়ে করেননি জীবনে। তিনি আমার থেকে ছিলেন কুড়ি বছরের বড়। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বুদ্ধিমান এবং আবেগপ্রবণ। অফিসার হিসাবে তিনি ছিলেন কুশলী। আমি যতদিন তাঁর কাছে ছিলাম তাঁর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত চলতাম। আমি তাঁর উপরে সঁপে দিয়েছিলাম নিজের জীবনকে।

তিনি মারা গেলে নিশ্চয়ই তোমার খুব দুঃখ হয়?

আমি নিজেও মরার মত হয়ে পড়েছিলাম। যখন আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম তখন আমার মনে হলো আমার দেহমন আমার জীবনের অর্ধাংশ আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরে জানলাম সবারই এই রকম হয়। সকলকেই মরতে হবে।

কনি বসে বসে ভাবতে লাগল। বাইরে কোথায় বজ্রপাত হলো। ওদের মনে হচ্ছিল বন্যাপীড়িত কোন ছোট্ট একটা জাহাজের উপর চেপে আছে ওরা মাঝ-সমুদ্রে।

কনি বলল, জীবনের পিছনে কত কথা, কত ঘটনা রয়েছে।

তাই নাকি? আমারও তাই মনে হয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মরে গিয়েছি। এর আগে একবার কি দুবার মৃত্যু হয়েছে আমার। তবু আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি এখনো।

ঝড়ের শব্দ শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল কনি। পরে বলল, তোমার কর্ণেলের মৃত্যুর পরেও তুমি যখন অফিসার ছিলে তখন তুমি কেমন ছিলে?

মেলর্স হেসে বলল, না, ওরা অন্য এক ধরনের মানুষ। কর্ণেল বলত, ইংরেজ মধ্যবিত্তরা বড় অল্পতে খুশি। আসলে ওরা নিজেরা মেয়েদের মত, ভীরু প্রকৃতির। তবু ওরা দেখাতে চায় ওরা যা কিছু করছে, সে পথে যাচ্ছে তা ঠিক। আমার এইখানেই আপত্তি, এই জন্যই রাগ হয়।

ওর কথা শুনে হাসল কনি। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে।

কনি বলল, সেই জন্যই তিনি কি ইংরেজ মধ্যবিত্তদের ঘৃণা করতেন?

না, উনি শুধু অপছন্দ করতেন।

কনি বলল, শ্রমিক আর সাধারণ মানুষদেরও তাই মনে করতেন?

মেলর্স বলল, সব সব। মোটরগাড়ি, সিনেমা আর উড়োজাহাজ ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা আর বলবে না। এক একটা যুগ যাচ্ছে আর ওদের বংশধারা অবনতির এক এক ধাপ নীচে নেমে যাচ্ছে। ওরা সবাই এক ধরনের বলশেভিক হয়ে উঠেছে। ওরা মানবিক গুণগুলোকে ধ্বংস করে যান্ত্রিক বস্তু ও উপাদানগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছে। ওরা সবাই পাগলের মত টাকার পিছনে ছুটে চলছে। ওরা সবাই এক ধরনের। ওরা টাকা দিয়েই নারী পুরুষ সব কিনতে চায়।

মেলর্স তার সেই কুঁড়ে ঘরটায় বসেছিল। তার মুখে ছিল একটা তীব্র শ্লেষের ভাব। তার মুখটা কনির সামনে নিবদ্ধ থাকলেও তার কানটা পিছনের দিকে খাড়া হয়ে ছিল। বনভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের দিকে তাকিয়ে কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল।

কনি বলল, এর কি কোনদিন শেষ হবে না?

হ্যাঁ হবে। যে সব সত্যিকারের মানুষ অবশিষ্ট আছে আজও তারা যেদিন সমূলে বিনষ্ট হবে সেইদিন এর অবসান হবে। তার আগে নয়। তখন যত সব পাগলের দল, সাদা, কালো, হলদে, লাল এ যুগের সব মানুষ নিজেরা মারামারি করে মরবে।

কনি বলল, তুমি কি বলতে চাও ওরা একে অন্যকে মারবে?

হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একশো বছরের মধ্যে এই দ্বীপে দশ হাজার লোকও থাকবে না। এমন কি দশজনও না।

হ্যাঁ চমৎকারই বটে। একটা গোটা জাতের সব লোক ধ্বংস হয়ে যাবে আর তার জায়গায় অন্য কোন জাত গড়ে না ওঠা পর্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করতে থাকবে সারা দেশে একথা ভাবতেও কেমন লাগে। যদি এইভাবে সব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সরকার, শিল্পপতি, শ্রমিক সবাই পাগলের মত অন্তর্দৃষ্টি-গুলোকে ধ্বংস করে ফেলে তাহলে একটা গোটা জাতই ধ্বংস হয়ে যাবে, কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখ। বিষাক্ত সাপগুলো যেন নিজেদের গিলে খাবে। তখন এই র‍্যাগবিতে শুধু যত সব ভয়ঙ্কর বন্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে, আর তেভারশালের খনি বস্তীতে ভারবাহী ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াবে—কোথাও কোন মানুষ থাকবে না।

কনি হাসতে লাগল। তবে সে হাসিটা কেমন সকরুণ। বলল, তারা সবাই বলশেভিক বলে তুমি খুশি। তারা দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তুমি খুশি।

হ্যাঁ আমি খুশি। কারণ আমি চেষ্টা করেও ওদের এই অধঃপতন রোধ করতে পারতাম না।

কনি বলল, তবে তুমি কেন এত তিক্ততা অনুভব করছ ওদের কথায় ?

না, আমি ওদের নিয়ে মাথা ঘামাই না। যদি আমার মোরগ মুরগী সব ঠিক থাকে তাহলে কোন দিকে কান দিই না আমি।

কনি বলল, যদি তোমার সন্তান হয় ?

মাথাটা নিচু হয়ে গেল মেলর্সের। সে বলল, পৃথিবীতে সন্তানের জন্ম দেয়া অন্যায় কাজ বলে মনে করি।

কনি অনুনয়ের সুরে বলল, ওকথা বলো না। আমি এক সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি মনে হচ্ছে। বল, তুমি খুশি হবে।

মেলর্সের হাতের উপর হাতটা রেখেছিল কনি। মেলর্স বলল, আমার নিজের কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। তোমাকে শুধু খুশি করার জন্যই সন্তান চাইতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় সেই সন্তানের প্রতি এটা হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

কনি বেশ আঘাত পেল। বলল, একথা যদি মনে ভাব তাহলে তুমি মোটেই আমাকে চাও না।

মেলর্স চুপ করে রইল। তার মুখখানা রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। বাইরে শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল।

কনি বলল, এটা তোমার সত্যি কথা নয়।

তার মনে হলো সে ভেনিস যাচ্ছে বলেই রেগে গেছে মেলর্স। আর সেই জন্যই সে রেগে আছে তার উপর। তাই সে একথা বলছে। একথা মনে করে কিছুটা সান্ত্বনা পেল কনি।

এরপর সে মেলর্সের গায়ের জামাটা সরিয়ে তার পেটটা অনাবৃত করে দিল। তারপর সেই অনাবৃত পেটটার উপর তার গালটা ঘষতে লাগল। তার পাছাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

মেলর্সের পেটের মধ্যে মুখটা গুঁজে কনি বারবার এক কাতর আবেদনে বলতে লাগল, বল, বল তুমি সন্তান চাও।

অনেকক্ষণ পর এবার কথা বলল মেলর্স। কনির মনে হলো মেলর্সের দেহের মধ্যে তার চেতনার পরিবর্তন ঘটছে। এক গোপন অব্যক্ত আরাম উপভোগ করছে সে।

মেলর্স বলল, কেন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। যেন কখনো বলো না টাকা চাই। কখনো বলো না। টাকার পিছনে ছুটি না বলেই আমাদের এখন অভাব অভিযোগ অল্প। টাকার খুব একটা প্রয়োজন নেই। কিন্তু সন্তান হলে আমাদের অভাব আর চাহিদা বেড়ে যাবে।

কনি তখনো তার গালটা আলতোভাবে মেলর্সের পেটের উপর ঘষছিল। তার লিঙ্গসংলগ্ন অণ্ডকোষ দুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার নিজের কিছুটা উত্তেজনা সে প্রত্যক্ষ করলেও লিঙ্গটা উত্থিত বা শক্ত হলো না।

বাইরে তখন বৃষ্টির বেগটা বেড়েছে।

মেলর্স বলে চলল, আমরা যেন টাকার জন্য না বাঁচি। টাকা ছাড়া জীবনের অন্য একটা মানে যেন খুঁজে পাই। বর্তমানে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য আর মালিকদের জন্য টাকা রোজগারের জন্য জীবনপাত করে চলেছি। একে একে এটা বন্ধ করতে হবে। আমাদের শিল্পশ্রমিক হিসাবে জীবনযাপন বন্ধ করতে হবে। মালিকদের লাভের জন্য এই আত্মঘাতী শ্রম বন্ধ করতে হবে। কিছু টাকা অবশ্যই আমাদের রোজগার করতে হবে। সেটা আলাদা কথা। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

মেলর্স একবার থামল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার বলতে লাগল, আমি তাদের বলব দুটো উদাহরণ দিয়ে। বলব, দেখ জো-র দিকে তাকিয়ে। সে কত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। তাকে কত সুন্দর ও সজীব দেখাচ্ছে। আর দেখ জোবাকে। তার শ্রমক্লান্ত দেহটাকে কত কুৎসিত দেখাচ্ছে। বলব, দেখ, একবার নিজেদের দিকে তাকাও। বল, এত খেটে এই আত্মঘাতী শ্রমের দ্বারা তোমরা নিজেদের কি করেছ, কি উন্নতি করেছ? শুধু নিজেদের ক্ষতি করেছ। নিজেদের জীবনটাকে মাটি করেছ। এত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই। জামাকাপড় সরিয়ে ভাল করে তোমাদের দেহটার দিকে একবার তাকাও। তোমরাও সজীব সুন্দর হয়ে উঠতে পার, অথচ তোমাদের কুৎসিত দেখাচ্ছে কত। তোমরা অর্ধমৃত হয়ে পড়েছ। পুরুষরা যদি লাল জামা পরে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় চলাফেরা করে তাহলে মেয়েরাও দেখবে কেমন সুন্দর ও আনন্দোচ্ছল হয়ে ঘোরাফেরা করবে। কনির এই পুরনো তেভারশাল গাঁ ভেঙ্গে দিয়ে তার জায়গায় নতুন বড় বড় বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক নগরী। বেশী সন্তানের জন্ম দেওয়া চলবে না, কারণ জগতে লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে।

আমি তাদের কাছে কোন ধর্মকথা প্রচার করব না। শুধু বলব, নিজেদের দিকে তাকাও। শুধু টাকার পিছনে ছুটে বেড়িও না। গোটা তেভারশাল গাঁটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কারণ এ গাঁ যখন গড়ে ওঠে তখন এখানকার মানুষগুলো টাকার পিছনে ছুটত। বলব, তোমাদের মেয়েদের দিকে তাকাও একবার। ওরা তোমাদের দিকে তাকায় না, তোমাদের গ্রাহ্য করে না আর তোমরাও ওদের দিকে তাকাও না, ওদের গ্রাহ্য করো না। কারণ তোমরা অনবরত টাকার জন্য খেটে চলেছ, কারণ তোমাদের কোন দিকে তাকাবার সময় নেই। তোমরা এখন ভালভাবে কথাবার্তা বলতে বা বাঁচার মত বাঁচতে পার না। তোমাদের দেখে জীবন্ত মানুষ বলে মনেই হয় না। একবার নিজেদের দিকে তাকাও।

মেলর্স এবার চুপ করল। তার কথাগুলোর অর্ধেক শুনল কনি। সে

তখন মেলর্সের তলপেটের নিচে নিম্নাঙ্গের চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আসার সময় বনপথে যে সব 'ভুলো না আমায়' ফুলগুলো তুলে এনেছিল সেই ফুলগুলো মেলর্সের নিম্নাঙ্গের সেই চুলগুলোর উপর চাপিয়ে দিল।

কনি বলল, তোমার সারা দেহে চার রকমের চুল আছে। মাথায় বুকে, মোচে, আর এইখানে। কিন্তু লাল আর সোনালীতে মেশা এই চুলগুলো সব চেয়ে সুন্দর।

মেলর্স একবার তার নিম্নাঙ্গের দিকে তাকিয়ে ফুলগুলো দেখে বলল, ফুলগুলো কোথায় দিয়েছ। ফুল দেবার বেশ জায়গা বটে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভাবলে ?

কনি তার দিকে নীরবে তাকাল। পরে বলল, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে আমার ভয় লাগে।

ওদের ঘরের বাইরে পৃথিবীটা তখন স্তব্ধ ও হিমশীতল হয়ে উঠেছে একেবারে। কনি আবার বলল, যখন ভাবি আজকের জগৎটা আপন পাশবিক আচরণের দ্বারা নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে এনেছে তখনি আমার মনে হয় উপনিবেশগুলো বেশী দূরে নেই। চাঁদের রাজ্যও দূরে নেই। চাঁদে গেলেও সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীকে কত কুৎসিত দেখাবে। এই কয়েকশো বছর ধরে মানবজাতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। মানুষের সব মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের শ্রমিককীটে পরিণত করা হয়েছে। তারা আসল জীবন যাপন করছে না, করছে নকল জীবন যাপন। আমি যদি পারতাম পৃথিবী থেকে সব যন্ত্রপাতি তুলে ফেলে দিতাম। এই ভয়ঙ্কর শিল্পযুগের অবসান ঘটাতাম নিঃশেষে। কিন্তু যেহেতু আমি বা কেউ তা পারে না সেইহেতু আমি নিজেই ভালভাবে শান্তির সঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করব। যদি একজন মনের মত মানুষ পাই তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু তা পাব কি না জানি না।

মুহুর্মুহু বজ্রগর্জনটা কমলেও বৃষ্টি আবার জোর করে এল। আবার বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ঝড়টাও আবার শুরু হলো। কনি বুঝতে পারল এক নিবিড় হতাশা মেলর্সের মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে একেবারে। কনির কিন্তু বেশ খুশি খুশি লাগছিল। সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে বলে মেলর্সের মনটা ভাল নেই, তাই তার মনটা এক নিবিড় হতাশার মধ্যে ঢলে পড়েছে আর সেই হতাশার বশে এত কথা আপন মনে বলে গেল। এ জন্য কনির খুব ভাল লাগছিল। তার আসন্ন অভাব আর বিচ্ছেদ আপন অন্তরে অনুভব করে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে মেলর্স এজন্য একটা জয়ের গর্ব অনুভব করছিল সে।

একবার দরজাটা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল কনি। বাইরে তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কনির মনে হলো তার সামনে যেন বিরাট এক ইস্পাতের খড়্গ টাঙানো রয়েছে। সহসা কি মনে হলো মোজা জামা সব খুলে

ফেলল কনি। তারপর উলঙ্গ হয়ে উন্মাদের মত ঘর থেকে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল সে। তার ঈষৎ শিথিল স্তনগুলো জন্তুদের স্তনের মত এক অনাবৃত উদারতায় তার বুকের উপর ঝুলতে লাগল। বহুদিন আগে ড্রেথডেনে থাকা-কালে শেখা নাচের ভঙ্গিতে এক ছন্দায়িত পদক্ষেপে দু হাত বাড়িয়ে বনের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগল কনি বৃষ্টির মাঝে। বনের ধূসর অথচ সবুজাভ পটভূমিকায় হাতীর দাঁতের মত শুভ্রধবল তার গাত্রত্বকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বৃষ্টির রূপালি ধারাগুলো চকচক করছিল তার গায়ের উপর। মাঝে মাঝে একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাথাটা মাটির দিকে নুইয়ে দিচ্ছিল যখন তখন তার পাছা দুটো শুধু দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স।

এই সব দেখে হাসতে লাগল মেলর্স। হাসতে হাসতে সেও হঠাৎ জামা প্যাণ্ট সব খুলে ফেলল। তারপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মাঝে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর ফ্লসিও একটা লাফ দিয়ে তার সামনে নেমে পড়ল মুখে একটা শব্দ করে। কনির চুলগুলো বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ভিজে মাথার সঙ্গে লেপটে লেগে গিয়েছিল। তার গোল মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়ে মেলর্সকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নীল চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক দারুণ উত্তেজনায় ছুটতে লাগল সে। কুঁড়ের সামনের জায়গাটা ছেড়ে ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেল। চারদিকের গাছের ভিজে ডালপালাগুলো গায়ে লাগছিল তার। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটতে লাগল কনি। মেলর্সও ছুটছিল তার পিছু পিছু। কিন্তু সে এমন জোরে ছুটছিল যে তার গোল মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স।

অবশেষে এক চড়াইএর কাছে গিয়ে কনিকে ধরে ফেলল মেলর্স। সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত বাড়িয়ে কনির কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে সজোরে টেনে নিল নিজের বুকের উপর। তার নরম সুন্দর স্তনদুটো দুহাতে নিয়ে চাপ দিতে লাগল। কনির নারীদেহের নরম ভিজে মাংস স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগুনের মত গলিয়ে দিল মেলর্সকে। সে সঙ্গে সঙ্গে কনিকে পথের উপর ফেলে দিয়ে পশুর মত তার উপর উপগত হয়ে সঙ্গম করল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

মুখের উপর থেকে বৃষ্টির জল মুছে উঠে পড়ল মেলর্স। কনিকে বলল, চলে এস।

ওরা বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে ছুটতে সেই কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মেলর্স তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে যখন দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিল তখন তার পানে তাকিয়ে দেখছিল কনি। কনিও ছুটছিল, কিন্তু মেলর্সের মত অত জোরে নয়। সে মাঝে মাঝে পথের উপর থেমে কতকগুলো ফুল তুলে নিল।

কনি সেই কুঁড়ে ঘরটার মাঝে এসে দেখল মেলর্স এরই মধ্যে আগুন জেলে ফেলেছে ঘরের মধ্যে। কনির বুকটা চলার তালে তালে দুলছিল। তার মাথার চুল মাথার সঙ্গে লেপটে লেগে ছিল। তার বৃষ্টিভেজা মুখ গা চকচক

-করছিল। তাকে এক ভিন্ন প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল যেন।

মেলর্স একটা পুরনো চাদর বার করে কনির গাটা মুছিয়ে দিতে লাগল আর কনি ছোট শিশুর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে নিজের গাটা মুছল। কনিও তখন সেই চাদরের একটা অংশ নিয়ে তার মাথার চুলগুলো মুছতে লাগল।

মেলর্স বলল, একই তোয়ালেতে আমরা মুছছি। আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে।

কনি তার পানে তাকিয়ে বলল, না, এটা তোয়ালে নয়, এটা চাদর।

মেলর্স একটা কম্বল বার করল। দুজনেই সেই কম্বলটা গায়ে ঢাকা দিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে বসল। কনি আগুনের দিকে মুখ করে বসল। তার পাশে বসল মেলর্স।

হঠাৎ কনি কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে মাটির উনোনটার কাছে সরে গেল। তখনো ওদের দেহটা ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কনির নগ্ন দেহের বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থানের সন্ধিস্থানগুলো দেখতে লাগল মেলর্স। সে কনির পাছাটায় হাত বোলাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সে তার হাতটা কনির নরম গোপনাঙ্গের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিল।

কনির পাছাটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, অন্য সব মেয়ের থেকে তোমার পাছাটা বড় নরম বড় সুন্দর। ক্রমে পাছার গোলাকার তলদেশ দুটোয় হাতটা বোলাবার সময় কিসের যেন এক আগ্নেয় আকর্ষণ তার হাতটাকে টেনে নিল। মেলর্স তখন তার সেই হাতের আঙুলের অগ্রভাগটা কনির যোনিদেশের মধ্যবর্তী অংশটায় অনুপ্রবিষ্ট করে দিল। বলল, আমি এইরকম নারীই চাই। তুমিই হচ্ছ যথার্থ নারী। যে সব নারী দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে পুরুষকে শান্তি দিতে পারে না সেই সব নারীকে আমি দেখতে পারি না।

কনি আশ্চর্য হয়ে হেসে উঠল।

মেলর্স বলে চলল, তুমি হচ্ছ সত্যিকারের নারী। তোমার যোনিদেশ সত্যিকারের নারীর যোনিদেশের মত সুন্দর। নিজের রূপে নিজেই গর্বিত সে। ও কখনো লজ্জা পায় না; সমস্ত লজ্জাভয় হতে মুক্ত।

মেলর্স তার হাতটা কনির গোপনাঙ্গের উপর আরও জোরে চাপ দিতে লাগল। বলল, সত্যিই এটা আমার বড় ভাল লাগে। তোমার এই সুন্দর যোনিদেশের উপর হাত বোলাতে বোলাতে আমার মনে হয়, আমি আবার বাঁচব। নতুনভাবে জীবন শুরু করব, এই যন্ত্রসভ্যতার যতই বিস্তার হোক না কেন।

কনি এবার হঠাৎ ঘুরে মেলর্সের কোলের উপর উঠে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে চুম্বন করো।

কনি বুঝতে পারল তাদের আসন্ন বিচ্ছেদ এক বিষাদের ছায়া ফেলেছে

তাদের দুজনেরই মনে।

মেলর্সের বুকের উপর মুখ রেখে তার জানুর উপর বসল কনি। তার হাতীর দাঁতের মত চকচকে সাদা পাগুলো আড়াআড়িভাবে ঝোলানো ছিল। মাথাটা নিচু করে মেলর্স কনির দেহের গ্রন্থিগুলো একবার দেখে নিয়ে অবশেষে তার দুই শুভ্র উরুদেশের মাঝখানে নরম বাদামী চুলগুলোর পানে তাকিয়ে রইল। জলন্ত আগুনের আলোয় এই সব দেখতে পাচ্ছিল মেলর্স। সহসা সে পিছন ফিরে টেবিলের উপর থেকে কিছু বৃষ্টিভেজা ফুল তুলে নিল।

মেলর্স বলল, কোন ঘরের ভিতর ঢুকলে ফুল আর বেঁচে থাকে না। ফুলের কোন ঘর নেই। বাইরের আলো হাওয়াতেই ওরা ভাল থাকে।

কনি বলল, এমনকি একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যেও না।

কিন্তু 'ভুলো না আমায়' ফুল নিয়ে মেলর্স কনির যোনিদেশ আর তার চারপাশের চুলের উপর রেখে দিল। বলল, এই সব ফুলের এটাই হচ্ছে আসল জায়গা।

কনি তার যোনিদেশে বাদামী চুলের উপর দুধের মত সাদা ফুলগুলোর পানে একবার তাকাল। বলল, ভাল দেখতে লাগছে না?

মেলর্স উত্তর করল, জীবনের মতই সুন্দর।

সে একটা ফুল নিয়ে সেইখানে চুলের মাঝে গেঁথে দিল। তারপর বলল, এই একটা জায়গায় অন্ততঃ তুমি আমায় ভুলবে না।

কনি কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে মেলর্সের মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমি চলে যাচ্ছি, এতে তুমি কিছু মনে করছ?

মেলর্সের ঘন ভ্রূর নিচে চোখের দৃষ্টি দেখে তার মনের ভাব কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টিটা শূন্য মনে হচ্ছিল। অবশেষে সে বলল, তোমার যা ইচ্ছা যায় করতে পার।

পরিষ্কার সহজ ইংরিজিতে কথাটা বলল মেলর্স।

মেলর্সের দেহটা জড়িয়ে ধরে কনি বলল, কিন্তু তুমি না চাইলে আমি কিছুতেই যাব না।

এবার দুজনেই চুপ করে রইল। সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে মেলর্স কিছু কাঠ ফেলে দিল আগুনে। সেই আগুনের শিখায় তার নীরব ও উদাস মুখখানা আলোকিত করে তুলল। কিন্তু মেলর্স কোন কথা বলল না।

কনি বলল, আমি শুধু ভাবছিলাম ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে এটাই হবে সবচেয়ে ভাল পন্থা। আমি সন্তান চাই। তাছাড়া এই সন্তান আমাকে একটা সুযোগ দেবে।

কেন, তারা যাতে কিছু মিথ্যা কথা ভাবতে পারে তার একটা সুযোগ করে দেবে?

তুমি কি চাও তারা এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কথাটা জানতে পারুক?

ওরা কি ভাবুক বা জানুক তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কিন্তু আমি করি, আমি চাই না আমি যতদিন র‍্যাগবিতে থাকব ওরা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখুক। আমি এখান থেকে চলে গেলে ওরা যা ভাবে ভাবুক।

মেলর্স চুপ করে রইল।

কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড চায় তুমি তার কাছে আবার ফিরে এস।

হ্যাঁ, আমিও তাই চাই।

কথাটা বলে চুপ করে রইল কনি। দুজনেরই মুখে কথা নেই।

মেলর্স বলল, র‍্যাগবিতেই কি তুমি সন্তান প্রসব করবে?

তার গলাটা জড়িয়ে ধরে কনি বলল, তুমি যদি আমাকে কোথাও নিয়ে না যাও তাহলে আমি তাই করব।

আমি তোমায় কোথায় নিয়ে যাব?

যে কোন জায়গায়। র‍্যাগবি থেকে দূরে যে কোন জায়গায়।

কখন?

কেন, আমি ফিরে এলে।

মেলর্স বলল, তুমি যদি র‍্যাগবি থেকে চলে যেতেই চাও তাহলে আবার ফিরে আসবে কেন?

আমাকে ফিরে আসতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই। তার উপর আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই।

তোমার স্বামীর শিকার রক্ষকের কাছে?

কনি বলল, এতে কিছু যায় আসে বলে আমি মনে করি না।

কর না? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মেলর্স বলল, তুমি তাহলে কখন চিরদিনের মত চলে যেতে চাও এখান থেকে?

এখন তা আমি বলতে পারব না। আগে আমি ভেনিস থেকে ফিরে আসি। তারপর আমরা দুজনে মিলে সব ঠিক করব।

কেমনভাবে ঠিক করবে?

আমি ক্লিফোর্ডকে সব বলব। তাকে বলতে হবে।

তাকে বলবে?

মেলর্স চুপ করে রইল। কনি তার গলাটা তেমনি জড়িয়ে ধরে বলল, ব্যাপারটা আমার কাছে এমন কিছু কঠিন করে তুলো না।

কি কঠিন?

আমাকে প্রথমে ভেনিসে গিয়ে সব কিছু ঠিক করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাকে বাধা দিও না।

একফালি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে। সে বলল, আমি কোন বাধাই দিতে চাই না। আমি শুধু ভেবে দেখতে চাই ভবিষ্যতে তুমি কি

করবে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ঠিকমত নিজেকেই চিনতে পারনি। তুমি দূরে চলে যেতে চাও। আমি তোমাকে দোষ দিতে চাই না। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি আছে। তুমি র‍্যাগবির রাণী হয়ে থাকতে চাও। আমার ত আর র‍্যাগবি নেই। তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। তুমি ত জান তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না। তোমার সঙ্গে ঘর করতে আমার তাই তত আগ্রহ নেই। তোমার অধীনস্থ হয়ে থাকতে চাই না আমি। এটাকে ভেবে দেখতে হবে আমায়।

কনির মনে হলো মেলর্স তাকে শিক্ষা দিতে চাইছে।

কনি বলল, কিন্তু তুমি আমাকে চাও ত? চাও না?

আমাকে কি তুমি চাও?

তুমি জান আমি তোমাকে চাই। তার পরিচয় তুমি স্পষ্ট পেয়েছ।

মেলর্স বলল, আমাকে কখন ঠিক তুমি চাও?

তুমি জান আমি ভেনিস থেকে ফিরে এসে সব কিছু ঠিক করব। এখন আমি কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন আমাকে শান্ত ও সুস্থ হতে দাও।

ঠিক আছে, শান্ত ও সুস্থ হও।

কনি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো ত?

সম্পূর্ণরূপে।

কনির কিন্তু মনে হলো মেলর্সের কণ্ঠে কিছুটা উপহাসের সুর রয়েছে।

কনি বলল, আমাকে তাহলে খুলে বল ভেনিসে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে কি না।

শান্ত ও কিছুটা বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে মেলর্স বলল, হ্যাঁ, এতে তোমার যে ভাল হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

কনি বলল, জান ত, আগামী বৃহস্পতিবার?

হ্যাঁ জানি।

কনি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি ফিরে এলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারব।

নিশ্চয়।

দুজনের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতার জমাট ব্যবধান বিরাজ করতে লাগল।

মেলর্স বলল, আমার বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য উকীলের কাছে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠল কনি। বলল, গিয়েছিলে? কি বলল উকীল?

বলল, আরো অনেক আগে তা করা উচিত ছিল। এখন কিছুটা বেগ পেতে হবে। তবে আমি আগে সেনাবিভাগে কাজ করতাম বলে বিশেষ কষ্ট হবে না।

তোমার স্ত্রীকে জানাতে হবে ত?

তাকে ও যার কাছে সে আছে সেই লোকটাকে নোটিশ দেওয়া হবে, সেই লোকটা হবে সহ-বিবাদী।

কনি বলল, এসব ব্যাপারগুলো কেমন ঘৃণ্য আর জঘন্য দেখ।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমাকেও তাই করতে হবে।

মেলর্স বলল, বিবাহবিচ্ছেদের পরে আমাকে ছয় থেকে আট মাস আদর্শ সংযত জীবন যাপন করতে হবে। তবে তুমি ভেনিসে গেলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ আমার সামনে তখন কোন প্রলোভন থাকবে না।

কনি তার মুখটা মেলর্সের বুকে ঘষতে ঘষতে বলল, আমি প্রলোভন? তুমি আমাকে তাই ভাব বলে আমি খুশি। এ নিয়ে আর কিছু ভাবতে হবে না। তুমি ভাবলেই আমার ভয় লাগে। আমি চলে গেলে যত খুশি ভেবো। তখন আমরা দুজনেই ভাবতে পারব প্রচুর। আমি যাবার আগে আর এক রাত্রি তোমার বাসায় আসব। তোমার কাছে থাকব। আমি বৃহস্পতিবার রাত্রিতেই আসব।

কিন্তু ঐ রাত্রিতেই ত তোমার বোন আসবে। তোমার কাছে থাকবে।

হ্যাঁ, কিন্তু সে বলেছে রাত্রিশেষে সকালে রওনা হব। রাত্রিতে সে অন্য এক জায়গায় থাকবে আর আমি থাকব তোমার কাছে।

কিন্তু তোমার বোন তাহলে জানতে পারবে ত?

হ্যাঁ, আমি তাকে বলব। আমি আগেই কিছুটা তাকে এ বিষয়ে বলেছি। তাকে সব কিছু বলব। সে আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। সে সব বোঝে; বড় সহানুভূতিশীল।

মেলর্স কনির পরিকল্পনার কথাটা ভাবতে লাগল। বলল, তুমি তাহলে ঐ দিন সকালবেলায় র‍্যাগবি ছেড়ে চলে যাবে? মনে হচ্ছে যেন তুমি লণ্ডন যাচ্ছ। কোন পথে যাবে?

নটিংহাম আর গ্রান্থাম হয়ে।

মেলর্স বলল, কিন্তু আসার সময় তোমার বোন যেখানে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে সেখান থেকে তোমাকে এখানে হেঁটে অথবা গাড়িতে করে আসতে হবে। এতে ঝুঁকি আছে, আমার ভয় করছে।

কনি বলল, না, হিলদা আমাকে দিয়ে যাবে গাড়িতে করে।

লোকে যদি তোমাকে দেখে ফেলে।

আমি চোখে কালো চশমা পরব আর মাথায় একটা ওড়না দেব।

মেলর্স কিছুটা ভেবে বলল, ঠিক আছে। তুমি যা করছিলে তাই করো। আশ মিটিয়ে নিজেকে খুশি করো।

এতে তুমিও খুশি ত?

হ্যাঁ, আমি খুশি। লোহা তপ্ত হলে ঠিক সময়েই আমি ঘা মারি।

কনি বলল, জান আমি কি ভাবছিলাম। কথাটা হঠাৎ মাথায় এল আমার।

তুমি হচ্ছ জলন্ত পেস্‌টন্ এর নাইট।

আর তুমি? তুমি রেড হট মর্টারের লেডি?

হ্যাঁ, তুমি স্যার পেস্‌টন্ আর আমি লেডি মর্টার।

ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার নাইট। ছিলাম জন টমাস, হলাম স্যার জন। আর তুমি হলে লেডি জেন।

কনি দুটো পেয়ালা রঙের ফুল মেলর্সের লিঙ্গের উপর চুলের মাঝে আটকে দিল।

কনি বলল, চমৎকার মানিয়েছে স্যার জন।

তার সে দুটো ফুল মেলর্সের বুকের বাদামী চুলের মধ্যেও আটকে দিল। মেলর্সের বুকটাকে চুম্বন করে সে বলল, আমাকে তুমি ভুলবে না। এই 'ভুলো না আমায়' ফুল দিয়ে আমার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখলাম।

মেলর্স জোর হেসে উঠতেই ফুলগুলো ঝরে পড়ল তার বুক থেকে।

মেলর্স বলল, থাম।

হঠাৎ উঠে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেলর্স। দরজা খুলতেই চমকে উঠল ফ্লসি। কুকুরটা বাইরেই পাহারায় ছিল। মেলর্স বলল, আমি।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টিভেজা বনভূমির একটা সোঁদা গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছিল চারদিকের নিস্তব্ধতা। সন্ধ্যার ছটায় ঘন হয়ে উঠছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল মেলর্স। তার চলায়মান সাদা উলঙ্গ মূর্তিটাকে এক প্রেতাত্মা বলে মনে হলো তার।

মেলর্স না বলে কোথায় চলে গেলে মনটা মুষড়ে পড়ল কনির। সে উঠে দরজার কাছে কোমরে কম্বলটা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে বৃষ্টিস্নাত স্তব্ধ বনভূমির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু অল্প কিছু পরেই ফিরে এল মেলর্স। কনি দেখল তার হাতে অনেক ফুল। কনি তাকে দেখে যেন চিনতে পারছিল না। কাছে এসে সে কনির পানে তাকাল। কিন্তু কনি তার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল না।

মেলর্স তার হাতের একরাশ ফুল আর ওকপাতা কনির বুকে, নাভিকুণ্ডলিতে আর যোনিদেশের চুলে আটকে দিয়ে বলল, এইবার তোমাকে চমৎকার মানাচ্ছে। এইবার লেডি জেন বিবাহিত হলো স্যার জন টমাসের সঙ্গে।

তারপর সে নিজের দেহের ঐ সব জায়গার ফুলগুলো তুলে নিল।

কনি তার পানে আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

মেলর্স বলল, তুমি হলে জন টমাস মার্টিন লেডি জেন। তোমার আগেকার নাম কনস্টান্স চুলোয় যাক।

এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাতটা বাড়াল মেলর্স। সে হাঁচল। হাঁচতেই তার গা থেকে সব ফুল ঝরে গেল।

হতবুদ্ধির মত মেলর্স কনির পানে তাকাল। কনি বলল, তুমি কি বলতে

যাচ্ছিলে বল।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম বলত ?

সে কি বলতে চাইছিল তা সে ভুলে গেছে। আসলে সে বলতে চাইছিল কনির সারা ভবিষ্যৎ জীবনের অন্তহীন হতাশার কথা। একথা বিভিন্নভাবে আগে অনেকবার বলেছে সে, তবু একথা বলা তার আর শেষ হয় না। কনি যাই বলুক তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত হতে পারে না সে।

বৃষ্টির পর হলুদ সূর্যের এক ফালি রশ্মি পড়েছে গাছগুলোর উপর।

মেলর্স বলল, সূর্য আর সময়। সময়ের মত পাখা মেলে এত দ্রুত আর কোন জিনিস উড়তে পারে না।

মেলর্স তার জামাটা হাত বাড়িয়ে ধরল। তারপর কনিকে লক্ষ্য করে বলল, জন টমাসকে শুভরাত্রি বল।

এই বলে তার পুরুষাঙ্গটার দিকে একবার তাকাল মেলর্স। জন এখন জেনির বাহুবন্ধনের মধ্যে নিরাপদে আছে। আগুনের আঁচ এখনো লাগেনি তার গায়ে।

এবার ফ্লানেলের শার্টটা তার মাথায় গলাল মেলর্স। তার সঙ্গে বলল, পুরুষদের পক্ষে জামা পরা অর্থাৎ জামার মধ্যে মাথাটা এইভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার। এই জন্য আমি বুকখোলা আমেরিকান শার্ট পছন্দ করি। কনি দাঁড়িয়ে তার পানে তাকিয়ে রইল। জামার পর প্যান্ট পরল মেলর্স। তারপর কোমরের কাছে বোতামটা আঁটল।

মেলর্স কনির যোনিদেশের দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, একবার জেনের দিকে তাকাও। ফুলে ফুলে ঢাকা। বল জেনি, আগামী বছর কে তোমার উপর ফুলের অঞ্জলি দেবে, আমি না অন্য কেউ ? 'বিদায় হে ব্লুবেল ফুল' এ সেই যুদ্ধের দিনের প্রথম দিকের কথা। এই গানটা আমি ঘৃণা করি। এই বলে বসে মোজা পরতে লাগল মেলর্স। কনি তখনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বসে বসে কনির তলপেটের তলায় ঢালু জায়গাটায় হাত দিয়ে বলল, কী সুন্দর তুমি লেডি জেন, হয়ত ভেনিসে তুমি এমন আর একজনকে পাবে যে তোমার চুলের উপর দেবে যুঁই ফুলের অঞ্জলি। আর তোমার নাভিকুণ্ডলিতে দেবে ডালিম ফুল। হায় বেচারী লেডি জেন !

কনি প্রতিবাদের সুরে বলল, ওসব কথা আর বলো না। ওসব কথা বলা মানেই আমাকে আঘাত দেওয়া।

মেলর্স মাথাটা নিচু করে তাদের দেহাতী ভাষায় বলতে লাগল, হয়ত আমি তোমাকে আঘাত করছি। আঘাত করছি তোমাকে। আমি আর একথা বলব না। কিন্তু তুমি ভুলে যেওনা, তুমি এই সঙ্গে তোমার ইংল্যাণ্ডের বাড়িতে যাচ্ছ। কত সুন্দর সে জায়গা। যাই হোক, হে লেডি জেন, হে স্যার জন, তোমাদের জাগার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ফুলের গয়না পরে

আছ। হে যোনিদেশসংলগ্ন কেশগুচ্ছ, আমি তোমাদের পুষ্পালঙ্কারের দুঃসহ পীড়ন থেকে মুক্ত করব।

এই কথা বলে সে সেই সিক্ত কেশগুচ্ছকে চুম্বন করল। তারপর তার স্তনযুগল, নাভিদেশ ও আবার যোনিদেশের উপরিস্থিত কেশদামকে চুম্বন করল।

তারপর কনির যোনিদেশের উপর থেকে সব ফুলপাতা সরিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বলল, এবার তুমি মুক্ত হলে লেডি জেন। এবার তুমি পোষাক পরো। এবার লেডি জেন তার বাড়ি ফিরে বিলম্বিত ভোজসভায় যোগদান করবে।

কনি বুঝতে পারল না মেলর্সের এই সব দেহাতী ভাষায় বলা এত কথার উত্তরে কি সে বলবে। তাই কোন কথা না বলে সে পোষাক পরল নীরবে। তারপর সেই ঘৃণ্য অবাঞ্ছিত র‍্যাগবির বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

মেলর্স কিছুটা এগিয়ে দিল কনিকে। ওরা যখন চড়াইটার কাছে গিয়ে পৌছল তখন ব্যস্ত হয়ে মিসেস বোল্টন ওদের কাছে এল। বলল, ও ম্যাডাম, আমরা ত ভেবে অস্থির। ভাবছিলাম কিছু হলো নাকি।

কনি উত্তর করল, না, কিছু হয়নি।

মিসেস বোল্টন মেলর্সের দিকে তাকাল। ভালবাসার স্নিগ্ধ আশ্বাসে সজীব তার মুখখানাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সে মুখের মধ্যে ছিল কিছুটা হাসির সঙ্গে কিছুটা উপহাস মিশে। সব দুর্ঘটনাকে উপহাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেয় সে।

মেলর্স বলল, সান্ধ্য নমস্কার, মিসেস বোল্টন, আশা করি এবার তোমাদের ম্যাডাম ভালভাবেই যেতে পারবেন।

এই বলে সে ওদের অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

অধ্যায় ১৬

বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলো প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হলো কনি। ঝড়টা শুরু হবার আগেই সেদিন ক্লিফোর্ড চা খেতে চায়ের টেবিলে এসে হাজির হয়। এসে কনির খোঁজ করে। কোথায় কনি? কেউ জানে না কোথায় গেছে। তবে মিসেস বোল্টন শুধু আভাস দিল হয়ত বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে গেছে। বন দিয়ে বেড়াতে গেছে শুনেই ঘৃণায় নাকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ক্লিফোর্ডের। কিছুক্ষণের জন্য এক স্নায়বিক উত্তেজনায় অশান্ত হয়ে ওঠে সে। প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠতে লাগল আর প্রতিটি বজ্রগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেহটা কুঁকড়ে উঠতে লাগল তার।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল সে ভয়ে ভয়ে যেন এক মহাপ্লাবনে আজই ধ্বংস হয়ে যাবে সমগ্র পৃথিবী। ক্রমশই ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল সে।

মিসেস বোল্টন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। সে প্রায়ই বলছিল, উনি কুঁড়েটায় আশ্রয় নেবেন বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত।

আপনি কিছু ভাববেন না। উনি ভালই আছেন।

ক্লিফোর্ড তখন বলেছিল, এমন ভীষণ ঝড়ের মধ্যে তার বনে থাকাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তার বনে যাওয়াটাই আমার পছন্দ হয় না। দু ঘণ্টার উপর হলো সে গেছে। সে কখন বাড়ি থেকে বার হয়?

আপনি চা খেতে আসার অল্প কিছু আগে।

কিন্তু আমি তাকে পার্কে দেখিনি। কোথায় গেল সে? কি হলো তার?

কিছুই হয়নি। বৃষ্টি থেমে গেলেই তিনি ফিরে আসবেন। আপনি দেখবেন। একমাত্র বৃষ্টির জন্যই তিনি আটকে পড়েছেন।

কিন্তু বৃষ্টি থামলেও কনি এল না। বৃষ্টি থামার পরেও কত সময় কেটে গেল। মেঘমুক্ত আকাশে আবার সূর্য উঠে শেষবারের মত তার হলুদ রশ্মি ছড়িয়ে দিল। তবু তার কোন চিহ্ন নেই। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে। নৈশভোজনের প্রথম ঘণ্টা বেজে গেল।

অধৈর্য হয়ে ক্লিফোর্ড বলল, এটা কিন্তু ভাল না। আমি ফিল্ড আর বেটস্‌কে পাঠাচ্ছি তার খোঁজ করার জন্য।

মিসেস বোল্টন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না, তার দরকার হবে না। ও কাজ করবেন না। ওরা ভাববে আত্মহত্যা বা অন্য কোন গুরুতর একটা ব্যাপার। এ বিষয়ে কোন কথা ছড়াবেন না। তার চেয়ে আমি একবার কুঁড়েটাতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি। দেখি সেখানে আছে কি না। আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করবই।

অবশেষে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ক্লিফোর্ড তাকে যেতে দিল। মিসেস বোল্টন কিছুটা যেতেই কনিকে দেখতে পেল। মেলর্সকে ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে একা একা বাড়ির দিকে পা পা করে হাঁটতে লাগল কনি।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি আপনার খোঁজ করতে এলাম বলে কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। স্যার ক্লিফোর্ড এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন হয় বিদ্যুৎপিষ্ট অথবা গাছ চাপা পড়ে আপনি মারা গেছেন। তাই উনি ফিল্ড আর বেটস্‌কে পাঠাচ্ছিলেন। তখন আমি ভাবলাম চাকর বাকরদের মধ্যে এ ব্যাপারটা না ছড়িয়ে আমি বরং দেখে আসি।

কথাগুলো ব্যস্তভাবে বলে ফেলে কনির মুখপানে তাকাল মিসেস বোল্টন। দেখল এক মদির স্বপ্নালুতা আর রতিতৃপ্তির এক তরল তৈলাক্ত মসৃণতা সমস্ত মুখখানাতে ছেয়ে আছে তার। সঙ্গে সঙ্গে সে এই সব কথা বলার জন্য তার

প্রতি একটা অসন্তোষের ভাবও ফুটে উঠেছে।

কনি আপন মনে রাগের সঙ্গে বলতে লাগল, ক্লিফোর্ড বোকার মত কেন যে এত চেঁচামিচি হৈচৈ করল?

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি জানেন পুরুষরা সব ওই রকম। একটুতেই কেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি শান্ত হয়ে উঠবেন।

মনে মনে ভীষণভাবে রেগে উঠল কনি। তার মনে হলো মিসেস বোল্টন নিশ্চয় তার গোপন কথা সব জানে। নিশ্চয় সে সব জেনে ফেলেছে।

সহসা পথের উপর যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল কনি। শক্ত হয়ে বলল, আমার পিছনে লোক লাগিয়ে আমাকে অনুসরণ করা হবে, আমার উপর নজর রাখা হবে এটা সত্যিই ভয়ঙ্করভাবে এক অসহ্য ব্যাপার।

ও কথা বলবেন না ম্যাডাম। আমি না বললে উনি নিশ্চয় দুজন লোককে পাঠাতেন। তারা সোজা কুঁড়েটায় চলে যেত। আমি জানি না কোথায় কুঁড়েটা।

কথার মধ্যে যে ইংগিত ছিল তা বুঝতে পেরে রাগে মুখখানা কালো হয়ে উঠল কনির। কিন্তু ক্রোধের আবেগ সত্ত্বেও সে কোন মিথ্যা কথা বলল না। শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই এই মিথ্যা কথাটা সে বলল না। কনি মিসেস বোল্টনের মুখপানে তাকাল। মিসেস বোল্টন তখন লজ্জানত অবস্থায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু বিশেষ করে বোল্টনের নারীমনের মধ্যে এক গোপন সহানুভূতি খুঁজে পেল।

কনি বলল, ঠিক আছে। যা হয়েছে হতে দাও। আমি কিছু গ্রাহ্য করি না।

আপনার কোন দোষ নেই ম্যাডাম। আপনি কুঁড়েটায় ঝড়ের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন শুধু। এটা কিছুই না।

তারা দুজনে একসাথে বাড়ি ফিরল। প্রচণ্ড রাগে আগুন হয়ে কনি সোজা চলে গেল ক্লিফোর্ডের কাছে। ক্লিফোর্ড তখন চোখগুলো বড় বড় করে ম্লান মুখে বসে ছিল।

কনি জোর গলায় ফেটে পড়ল, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমার পিছনে চাকর পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।

ক্লিফোর্ডও রাগের সঙ্গে বলল, হা ভগবান! কোথায় গিয়েছিলে মেয়ে? তুমি এই ধরনের প্রকাণ্ড ঝড়ের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোথায় ছিলে? বনে গিয়ে ছাই পাস কি করো তুমি? বৃষ্টি থামার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। জান এখন ক টা বাজে? তুমি যে লোককে পাগল করে দেবে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কি করছিলে?

কনি মাথা থেকে টান দিয়ে টুপীটা খুলে মাথার চুলগুলোকে নাড়া দিয়ে

বলল, যদি আমি তোমাকে তা না বলি ?

কোন কথা বলল না ক্লিফোর্ড। শুধু মিটমিট করে কনির পানে তাকাল। ফ্যাকাশে চোখগুলো তার হলুদ হয়ে উঠল। কনির সঙ্গে এই ধরনের রাগা-রাগির ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছিল না তার।

সহসা এক স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করল কনি। তার মনে হলো সে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। গলার স্বরটা নরম করে কনি বলল, যে কেউ ভাববে আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা কেউ জানে না। আমি বৃষ্টির সময় কুঁড়েটাতে ছিলাম। দারুণ ঠাণ্ডায় আমি ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলেছিলাম। সেখানে বসে একটু আরাম করছিলাম এই পর্যন্ত।

কথাগুলো সহজভাবে বলল কনি। ভাবল ক্লিফোর্ডকে বেশী বিব্রত করে কি লাভ ? ক্লিফোর্ড সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল কনির পানে। সে বলল, একবার তোমার চুলের পানে তাকাও, তোমার চেহারাটার পানে তাকাও ত দেখি।

কনি শান্তভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি পোষাক পরেই বৃষ্টিতে কিছুটা ভিজেছিলাম।

ক্লিফোর্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কনির মুখের দিকে। বলল, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছ।

কেন ? এক পশলা বৃষ্টিতে একবার ভেজার জন্য ?

তাহলে কেমন করে সে বৃষ্টির জল শুকোলে তোমার পোষাক থেকে ?

কেন পুরনো একটা তোয়ালে আর আগুন।

হতবুদ্ধি ও অবাক হয়ে কনির পানে তাকাল ক্লিফোর্ড। তারপর বলল, কেউ এসেছিল মনে হচ্ছে।

কে আবার আসবে ?

কে ? যে কেউ আসতে পারে ? মেলর্স আসতে পারে। ও ত সন্ধ্যের সময় আসে।

হ্যাঁ, ও বৃষ্টি থেমে গেলে পরে আসে। পাখিদের খাওয়াতে এসেছিল। বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো বলছিল। মিসেস বোল্টন পাশের ঘরে থেকে সব কিছু শুনছিল। শুনে কনির তারিফ করছিল মনে মনে। সত্যিই কত সহজে ব্যাপারটা সামলে নিল তার ম্যাডাম।

ধরে নাও তুমি যখন সব পোষাক খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে ভিজছিলে তখন সে এসে পড়েছিল।

আমার মনে হয় সে ঝড়ের সময় জীবনের ভয়ে কুঁড়ে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ক্লিফোর্ড তবু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কনির দিকে। সে তার অবচেতন মনে কি ভাবছিল তা সে নিজেই জানত না। ব্যাপারটাতে সে এতদূর আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল যে সে তার চেতনার উপরিপৃষ্ঠে কোন একটা স্পষ্ট ধারণা খাড়া

করতে পারছিল না এ বিষয়ে। তার চেতন অবচেতন মিলে মনের গোটা শূন্য কাঠামোটার মাঝে অন্য কিছু না পেয়ে কনির কথাটাকেই মেনে নিল। কনির প্রশংসা করল। তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছিল না। কনির লজ্জারক্ত মুখখানাকে সত্যি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। রতিতৃপ্তির এক তৈলাক্ত মসৃণতা ফুটে উঠেছিল তার মুখে। তার উজ্জ্বল গাত্রত্বকে।

পরে ক্লিফোর্ড বলল, তবে তোমার যদি সর্দি না হয় তাহলে তোমাকে ভাগ্যবান বলব।

কনি উত্তর করল সঙ্গে সঙ্গে, আমার সর্দি করেনি।

কনি তখন ভাবছিল সেই লোকটার কথা, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে যে লোকটা সেই ঘরের মধ্যে তাকে বলেছিল, অন্য সব মেয়ের থেকে তোমার যোনিদেশটা সবচেয়ে সুন্দর। কনির মনে হচ্ছিল একথাটা সে ক্লিফোর্ডকে বলে, স্পষ্ট ভাষায় বলে। যাই হোক, সে নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে এক রোষসংক্ষুব্ধ রাণীর মত এক নীরব গাম্ভীর্যে তার উপরতলার ঘরের মধ্যে চলে গেল। পোষাকটা পাল্টাতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় কনিকে খুশি করার জন্য তার সঙ্গে খুব ভাল আর মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল ক্লিফোর্ড। একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক একখানা বই থেকে সে একটা অংশ পড়ে শোনাতে লাগল কনিকে। সম্প্রতি ধর্ম সম্পর্কে একটা বিকৃত বোধ গড়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে। এ যুগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন সে। আসলে সে নিজের ভবিষ্যতের জন্যই শঙ্কিত। আসলে সেই শঙ্কার বিষাদকৃষ্ণ ছায়াটা এযুগের ভবিষ্যতের উপর ফেলে দেখে মাত্র। সন্ধ্যার সময় কোন একটা বই নিয়ে কনির সঙ্গে কথা বলা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। এই আলোচনার মাধ্যমে কেমন যেন এক রাসায়নিক ক্রিয়া সঞ্চারিত হয় তাদের মনের মধ্যে।

একটা বইএর খোঁজ করতে করতে ক্লিফোর্ড বলল, এ বিষয়ে তুমি কি মনে করো? আরো কিছু বিবর্তনের পর দেখা যাবে আর তোমাকে বৃষ্টিতে ভিজে গা শীতল করতে হবে না। আসল কথাটা হলো এই, আজকের বিশ্বে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি। একদিকে দেখছি বিশ্বজীবনের পার্থিব ক্ষয় যত বেড়ে যাচ্ছে তার আত্মিক উন্নতি তত বেড়ে যাচ্ছে।

কনি সব কথা মন দিয়ে শুনল। সে আশা করছিল ক্লিফোর্ড আরো কিছু বলবে। কনি বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল ক্লিফোর্ডের দিকে। বলল, তার আত্মিক উন্নতি যদি হয় তাহলে আত্মা উপরে ওঠার সময় তার শূন্য জায়গায় কি রেখে যাচ্ছে?

ক্লিফোর্ড বলল, উন্নতি বলতে আমি এখানে অপচয়ের বিপরীতটাকে বোঝাতে চাইছি। আমি বলছি মানুষের কথা।

কনি বলল, কিন্তু তুমি অপচয় কোনটাকে বলছ? আমি ত দেখছি তুমি

আগের থেকে আরো মোটা হয়েছে। আমিও কিছু অপচয় করছি না। তুমি কি মনে করো পৃথিবীটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আগের থেকে? স্বর্গের আদি পিতা আদম আদি মাতা ঈভকে যে আপেল ফল দান করে, আজকের আপেলের থেকে তা কি বড় ছিল?

ক্লিফোর্ড বলল, জগতে পরিবর্তনটা এমন সূক্ষ্মভাবে হচ্ছে যে তা কারো চোখে পড়ছে না, এত ধীরে ধীরে হচ্ছে যে কাল গণনার হিসাবে তা ধরা পড়ছে না।

কনি মন দিয়ে শুনে বলল, এটা হচ্ছে বোঝার ভুল। আত্মার এক বিপুল অহঙ্কার। পৃথিবী পার্থিব সব দিকে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সব মানুষ পার্থিব দিক থেকে হার মানছে আর আত্মার দিক থেকে উন্নতি লাভ করছে এটা মনে করা অহঙ্কারের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। এ এক ধরনের বেয়াদপি।

ক্লিফোর্ড বলল, চুপ করে মন দিয়ে শোন। বড় বড় মনীষীদের কথায় বা কাজে বাধা দিও না। বর্তমান অবস্থা শুরু হয়েছে সুদূর অতীতে এবং সুদূর ভবিষ্যতে তা প্রসারিত। এই অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই অকল্পনীয়ভাবে সুদূর। এই পার্থিব অবস্থার ঊর্ধ্বে আছে কিছু নির্বিশেষ চিন্তা আর কল্পনা আর সৃষ্টিশীলতার জগৎ যা কিছুটা মানুষ আর কিছুটা সকল অবস্থার স্রষ্টা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ক্লিফোর্ডের কথা শেষ হলো। কনি চুপচাপ বসে সব কিছু শুনল। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না সে সব কথা, ঘৃণা জাগছিল।

কনি বলল, আজকের মানুষ আত্মার দিক থেকেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। আজকের জগতের এই শোচনীয় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঈশ্বরকে আবার জড়াতে চাইছ কেন? এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্লিফোর্ড বলল, এর মধ্যে অনেক কিছু মিশিয়ে আছে। তবে আজকের বিশ্ব যে পার্থিব দিক থেকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মিক দিক থেকে উন্নতি বা অগ্রগতি লাভ করছে একথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে।

কনি বলল, তুমি তাই মনে করো নাকি? তোমার আত্মাকে উপরে উঠতে দাও। যতক্ষণ আমি এই শক্ত মাটির উপর আমার দেহগত অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব ততক্ষণ তোমার আত্মার উপরে ওঠায় আমার কোন আপত্তি নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, তুমি কি তোমার দেহগত অস্তিত্বটাকে ভালবাস?

হ্যাঁ, ভালবাসি।

কনির মনে তখন একটা কথা বারবার অনুরণিত হয়ে উঠছিল, কত সুন্দর, কত সুন্দর নারীর এই যোনিদেশ।

ক্লিফোর্ড বলল, এ ভালবাসাটা কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার কারণ দেহটা মানুষের একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আমার মনে হয়, মেয়েরা

মনের স্বাস্থ্য বা অস্তিত্বের মধ্যে কোন পরম আনন্দ খুঁজে পায় না।

ক্লিফোর্ডের পানে তাকিয়ে কনি বলল, পরম আনন্দ? তোমাদের মনের স্বাস্থ্য থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাকে বলছ পরম আনন্দ? না, ধন্যবাদ। মন নয়, আমাকে শুধু আমার দেহ আর দেহের আনন্দ নিয়ে থাকতে দাও। এ দেহের প্রতিটি জীবকোষ যখন এক প্রাণচঞ্চলতায় মাতাল হয়ে ওঠে, এ দেহের সমস্ত জৈবিকতা যখন জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় ওতপ্রোতভাবে, তখন আমি আমার দেহের স্বাস্থ্যকে মনের স্বাস্থ্যের থেকে অনেক বড় বলে মনে করি। কিন্তু তোমাদের অনেকেরই মন জড়দেহের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তার বাইরে তাদের কোন পৃথক সত্তা নেই।

ক্লিফোর্ড বলল, দেহসর্বস্ব বা দেহভিত্তিক জীবনের কথা বলছ? সে জীবন একান্তভাবে পশুদের জীবন।

কনি বলল, তবু এ জীবন তোমাদের মৃতদেহের মত জড় মনগুলোর থেকে অনেক ভাল। মানুষের দেহ দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সত্যিকারের জীবনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানুষের এই দেহ প্রথম প্রাচীন গ্রীকদের প্রেরণা দেয়। পরে প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলের হাতে সে দেহের মৃত্যু ঘটে। যুক্তি-বুদ্ধির নীরস জালে জর্জরিত হয়ে সে দেহ তার প্রাণ হারায়। সে প্রাণের যেটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল তাকে যীশু একেবারে শেষ করেন। কিন্তু আজ আমার দীর্ঘকাল পর এ দেহ সত্যিকারের জীবনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। সমাধি-গহ্বর থেকে পুনরভ্যুত্থান ঘটছে তার। এই বিশাল সুন্দর বিশ্বের মাঝে এই নবজাগ্রত দেহের জীবন দেখবে কত সুন্দর দেখায়, দেখবে কত অফুরাণ প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর।

আমার মনে হয় প্রিয়তমা, তুমি সে জীবন না আসতেই বরণ করে নিয়েছ তাকে। অবশ্য তুমি এখন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছ এবং এখন দেহগত আনন্দ বা জীবনটাকে বড় করে দেখছ। কিন্তু আমার কথা শোন, দেহ নিয়ে এত উল্লসিত হবার কিছু নেই। জেনে রেখো, ঈশ্বর বলে সত্যিই যদি কোন বস্তু থেকে থাকে তাহলে তা অচিরে মানুষের জীবন থেকে সব দেহগত উপাদান অপসারিত করে মানুষের আত্মাকে আরো এক স্তর উঁচুতে অধিষ্ঠিত করতে চলেছেন।

কনি বলল, কিন্তু আমি তোমার কথা কেমন করে বিশ্বাস করব ক্লিফোর্ড, যখন আমি দেখছি তুমি যেটাকে জড়দেহ বলছ আমার সেই জড়দেহের মাঝে তোমার ঈশ্বর প্রত্যুষের প্রথম আলোকতরঙ্গের মত খেলা করছে? আমি যখন আমার মধ্যে তোমার কথার উল্টোটা অনুভব করছি তখন কেমন করে তোমার কথাকে মেনে নিই?

হ্যাঁ ঠিকই মানা উচিত। এই যে তুমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছ এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের উত্তেজনায় মাতাল হয়ে, এই যে তুমি ভেনিসে যেতে

চাইছ, তোমার মধ্যে সহসা এই বিপরীতমুখী পরিবর্তন কে জাগাল ?

কনি বলল, তুমি কি মনে করো এই আনন্দের উত্তেজনাটা খারাপ, একটা কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার ?

কিন্তু সে উত্তেজনা এমন অকুণ্ঠভাবে এমন সরলভাবে বাইরে প্রকাশ করাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

তাহলে আমি সেটা গোপন করে রাখব ?

মোটেই না। তোমার উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন বাইরে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, তুমি যাচ্ছ না কেন আমার সঙ্গে ?

ক্লিফোর্ড বলল, এ রকম উত্তেজনার অভিজ্ঞতা এর আগে অনেক লাভ করেছি আমরা। আমার মনে হয় বর্তমান এই পরিবেশকে সাময়িকভাবে বিদায় দেবার সময় এমনি এক উত্তেজনা জাগে। মুহূর্তের জন্য সব কিছুকে বিদায় দেবার মধ্যে এক আনন্দ আছে উত্তেজনা আছে। কারণ সব বিদায়ের অন্তরালে এক মিলন আছে আর মিলন মানেই এক নতুন বন্ধন।

কিন্তু আমি নতুন কোন বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য বাইরে যাচ্ছি না।

ক্লিফোর্ড বলল, এ বড়াই করো না, দেবতাদেরও কান আছে।

কনি বলল, না, বড়াই করছি না।

কিন্তু মুখে যাই বলুক, পুরনো যত সব বন্ধন সাময়িকভাবে ছিন্ন করে দূরে যেতে পারার এক আনন্দ সত্যিই একটা মিষ্টি উত্তেজনা জাগাচ্ছিল কনির মধ্যে। এ উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারছিল না সে।

সেদিন রাতে ক্লিফোর্ড ঘুমোতে পারল না। সারারাত জুয়ো খেলে কাটাল মিসেস বোল্টনের সঙ্গে। খেলা শেষ হলো তখন যখন মিসেস বোল্টন আর বসে থাকতে পারছিল না ঘুমের ঘোরে।

অবশেষে হিলদার আসার দিন এসে গেল। কনি মেলর্সকে জানিয়ে দিয়েছিল, যদি সব কিছু ঠিক থাকে, যদি তাদের রাত্রিবাসের পথে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে তার অভিজ্ঞানস্বরূপ সে তার ঘরের জানালায় একটা সবুজ শাল ঝুলিয়ে রাখবে আর যদি কোন অসুবিধা বা কোন বাধার উদ্ভব হয় তাহলে লাল শাল ঝোলাবে।

জিনিসপত্র ঠিকমত বেঁধে নিতে কনিকে সাহায্য করতে লাগল মিসেস বোল্টন। মিসেস বোল্টন বলল, এই বাইরে যাওয়াটা ম্যাডামের পক্ষে খুব ভাল হবে।

কনি বলল, আমারও তাই মনে হয়। ক্লিফোর্ডকে একা দেখাশোনা করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত ?

না না, কোন অসুবিধা হবে না। উনি যা যা চান আমি একাই তা সব করতে পারি। দেখছেন না, উনি আগের থেকে অনেক ভাল আছেন।

হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি ওঁকে নিয়ে আশ্চর্যভাবে চালাচ্ছ।

দেখবেন সব পুরুষরাই এক। তারা সকলেই শিশুর মত। ওদের একটু তোষামোদ করলেই ওরা গলে যাবে। ওদের কোনরকমে বুঝিয়ে দিতে হবে ওদের মতে আমরা চলছি। আপনিও কি তাই মনে করেন না?

কনি বলল, এ বিষয়ে আমার মোটেই কোন অভিজ্ঞতা নেই।

কনি এবার নীরবে কাজ করতে লাগল। কাজ করতে করতে মিসেস বোল্টনের দিকে তাকিয়ে কনি বলল, তোমার স্বামীকেও কি তুমি শিশুর মত ভুলিয়ে রাখতে?

মিসেস বোল্টন একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, তবে সে আমার মনের কথা বুঝত। ও সেইমত চলার চেষ্টা করত। তবে সে আমার মতের বাইরে যেত না।

তাহলে সে কখনই নিজের মতে চলতে পারত না।

না, তা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে তার চোখদুটো রাগের আগুনে লাল হয়ে উঠত। আমি তখন বুঝতাম আমাকে হার মানতে হবে। সে যেমন কখনো প্রভুত্ব করত না আমার উপর আমিও তেমনি কখনো প্রভুত্ব করতাম না তার উপর। যখন তার সঙ্গে পেরে উঠতাম না তখন তার কাছে হার মানতাম।

আর যদি হার না মেনে বিরোধিতা করে যেতে?

আমি কখন তা করেছি তা মনে পড়ছে না। যখন দেখতাম সে কোন অন্যায় করলেও দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে সে অন্যায়কে, তখন আমি আর বিরোধিতা করতাম না। কারণ আমি আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনটা কোনমতেই ছিন্ন করতে চাইতাম না। যদি আপনি কোন পুরুষকে সত্যি সত্যিই মনেপ্রাণে চান, যদি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে না চান তাহলে অনেক সময় সে অন্যায় করলেও জেনে শুনে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। অনেক সময় আমি কোন বিষয়ে অন্যায়কে আঁকড়ে ধরে থাকলেও সে আমার বিরোধিতা করত না। আমার সঙ্গে মানিয়ে চলত।

কনি বলল, তুমি রোগীদের সঙ্গেও বোধ হয় এইভাবে চল?

রোগীদের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। আমি জানি কোনটা রোগীদের পক্ষে ভাল হবে। তাই তাদের ভালর জন্যই আমি তাদের ভুলিয়ে কৌশলে তাদের সেই ভালর দিকে নিয়ে যাই। ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে খাটে না, সেটা আলাদা কথা। কেউ যদি একবার কাউকে প্রাণ দিয়ে সত্যি সত্যিই ভালবাসে তাহলে সে তার পরে আর পাঁচজনকেও ভালবাসতে পারবে।

মিসেস বোল্টনের এই কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে গেল কনি। ভয়ে ভয়ে বলল, আচ্ছা তুমি কি মনে করো কেউ শুধুমাত্র একবারই মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারে?

তার কোন মানে নেই। অনেক নারী জীবনে একবারও ভালবাসে না। আসলে তারা জানেই না প্রকৃত ভালবাসা কাকে বলে। পুরুষরাও ঠিক তাই। কিন্তু আমি যখন কোন নারীকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতে দেখি তখন স্তব্ধ হয়ে

তা দেখি।

কনি বলল, তুমি কি মনে করো পুরুষরা কোন বিষয়ে সত্যি সত্যিই রাগ করে?

হ্যাঁ, যদি আপনি তাদের অহঙ্কারে আঘাত দেন। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যায়। শুধু নারী-পুরুষের অহঙ্কারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

কথাটা শুনে ভাবতে লাগল কনি। সে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটার বিভিন্ন দিকগুলো ভেবে দেখতে লাগল। কিছুকালের জন্য হলেও সে তার ভালবাসার লোককে বিদায় দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। অথচ তা জেনে চুপ করে থাকলেও লোকটা কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

তবু তা পরস্পরকে সহ্য করতে হবে। কারণ মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব বহির্জগতের ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আসলে। যন্ত্রবৎ সেই ঘটনার অমোঘ দুশ্ছেদ্য জালের মধ্যে আটকে গেছে কনি। তার থেকে বেরিয়ে আসতে সে পারে না। আর তা চায়ও না।

হিলদা এল বৃহস্পতিবার সকালে। এল তার কথামত ঠিক সময়ে। দুজনের বসার মত তার ছোট গাড়িটা চালিয়ে এল সে। তার সঙ্গে ছিল শুধু একটা স্যুটকেস। হিলদাকে আগের মতই কেমন কুমারী কুমারী দেখাচ্ছিল। বিয়ের পরেও সে চিরদিন স্বাধীন ও কুমারী রয়ে যায় মনে প্রাণে। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তির স্বরূপটা অবশেষে জানতে পারায় তার স্বামী বেঁকে বসেছে। এবার সে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চলেছে। হিলদার অন্য কোন প্রণয়ী বা উপপতি না থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে সে সহায়তা করছে তার স্বামীকে। নিজের এই অবাধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হিলদা। তার দুটি শিশু সন্তানকে সে নিজের মনের মত করে মানুষ করে চলেছে। এতে সে সুখী।

কনি এখন শুধু হিলদার মত একটা স্যুটকেস নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার বাবার মারফৎ একটা বড় ট্রাঙ্ক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। তার বাবা আগেই ট্রেনযোগে রওনা হয়েছিল।

তার বাবা সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরেই আবার ইটালি যাত্রা করেছেন। সেখানে অতদূরে গাড়ি করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাই ট্রেনযোগে রওনা হয়েছেন তিনি।

হিলদা তার শান্ত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সহায়তায় ওদের যাওয়ার পার্থিব দিকটার সব কিছু ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর কনির সঙ্গে উপরতলায় বসে কথা বলতে লাগল।

কনি এক সময় ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু হিলদা, আমি আজকের রাতটার মত কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতে চাই। ঠিক এখানে নয়, কাছাকাছি

কোথাও।

হিলদা তার ধূসর রহস্যময় চোখের দৃষ্টি মেলে কনির পানে তাকাল। তাকে বাইরে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরটা তার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে চাইছিল। প্রায়ই এমনি হয়।

হিলদা শান্তভাবে প্রশ্ন করল, সে জায়গাটি কোথায়?

বলছি, তুমি জান, আমি একজনকে ভালবাসি।

হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু একটা বুঝতে পেরেছিলাম।

সে কাছেই থাকে। যাবার আগে এই শেষবারের মত এই রাত্রিটা আমি তার সঙ্গে কাটাতে চাই। আমি তাকে কথা দিয়েছি।

কনির কথার মধ্যে একটা জেদ ফুটে উঠল।

হিলদা প্রথমে তার মাথাটা নিচু করল। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, তুমি কি একবার আমাকে বলবে লোকটি কে?

লজ্জাজর্জরিত এক শিশুর মত জড়োসড়ো হয়ে উঠল কনি। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, আমাদের শিকার রক্ষক।

বিতৃষ্ণায় নাকটা কুঞ্চিত করে হিলদা ধমকে উঠল, কনি!

এই স্বভাবটা তার মার কাছ থেকে পেয়েছে হিলদা।

আমি জানি সব। তবু সে সত্যিই সুন্দর। তার বোধশক্তি আছে। তার মনটা বেশ নরম।

লোকটার গুণগান করে হিলদাকে তুষ্ট করতে চাইল সে।

এদিকে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল হিলদা। ভয়ঙ্করভাবে রেগে গিয়েছিল সে। কিন্তু বাইরে সে রাগ প্রকাশ করল না কিছুমাত্র। কারণ জানত কনি হয়েছে ঠিক তার বাবার মত। একরোখা। তাকে বাধা দিতে গেলে সে হয়ে উঠবে অদম্য।

এটা অবশ্য ঠিক যে হিলদা মোটেই পছন্দ করত না ক্লিফোর্ডকে। ক্লিফোর্ডের অহঙ্কারী বড় বড় ভাবটা মোটেই পছন্দ করত না সে। তার মনে হত ক্লিফোর্ড কনিকে নির্লজ্জভাবে বোকার মত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাটাচ্ছে। সে চেয়েছিল তার বোন বিবাহবিচ্ছেদ করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত স্কট পরিবারের মেয়ে হিসাবে কোন কারণে নিজেকে বা নিজেদের পারিবারিক মর্যাদাকে ছোট করার কাজটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখত সব সময়। সে আবার কনির মুখপানে চোখ তুলে বলল, পরে তোমাকে দুঃখ করতে হবে। অনুশোচনা করতে হবে।

না, তা করতে হবে না। কনি জোর দিয়ে বলল, সে একটা ব্যতিক্রম। সত্যিই সে ভালবাসার যোগ্য।

হিলদা আবার ভাবতে লাগল। বলল, যত তাড়াতাড়ি পার তাকে ছেড়ে দেবে। পরে তার জন্য তোমার লজ্জাবোধ করতে হবে।

না, মোটেই না। আমি তাকে ভালবাসি। আমি তার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চলেছি।

কনি!

যেন হাতুরীর আঘাত ছিল হিলদার কণ্ঠে। রাগে মুখখানা ম্লান হয়ে উঠেছিল তার।

যদি সম্ভব হয় আমি তার সন্তান লাভ করব। আমি তাতে গর্ববোধ করব।

হিলদা ভাবল এ বিষয়ে আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

হিলদা বলল, ক্লিফোর্ড কোন সন্দেহ করে না?

না, সন্দেহ করবে কেন?

হিলদা বলল, আমার ত মনে হয় সন্দেহ করার প্রচুর সুযোগ তুমি তাকে দিয়েছ।

মোটেই না।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ত বোকামি। কোথায় থাকে লোকটা?

ঐ বনটার অপর প্রান্তে তার বাসায়।

সে কি অবিবাহিত?

না, তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

বয়স কত?

তা জানি না। তবে আমার থেকে বড়।

কনি প্রতিটি কথায় ভীষণভাবে রেগে উঠছিল। এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে তার মা রাগের উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতেন। হিলদা তবু বাইরে তার রাগের কোন আবেগ বা উত্তেজনা প্রকাশ করল না। সে শুধু শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আজ রাত্রিতে তার কাছে যেতাম না।

কনি বলল, আমি না গিয়ে পারব না। তার কাছে না গেলে আমার ভেনিস যাওয়া হবে না।

অবশেষে এক কূটনীতির বশবর্তী হয়ে হিলদা মত দিল কনিকে। ঠিক হলো ওরা বাড়ি থেকে রওনা হয়ে ম্যানস্ফিল্ডে চলে গিয়ে সেখানে রাতের খাওয়া খাবে। তারপর সেখান থেকে কনিকে গাড়িতে করে দিয়ে যাবে বনের ধারে। পরদিন সকালে আবার তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

কনি পান্নার মত সবুজ রঙের একটা শাল জানালায় ঝুলিয়ে দিল।

রাগের মাথায় হিলদা কিছুটা নরম হলো ক্লিফোর্ডের প্রতি, যতই হোক, তার মন বলে একটা জিনিস আছে। অবশ্য তার যৌনশক্তি নেই। তার কোন রমণক্ষমতা নেই। কিন্তু সেটা না থাকায় তার বরং একরকম ভালই হয়েছে। এ বিষয়ে ঝগড়া হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এই যৌন ব্যাপারে

হিলদার আর কোন আগ্রহ নেই। যে যৌনক্রিয়ায় পুরুষরা শুধু চূড়ান্ত স্বার্থপরতা আর নোংরামির পরিচয় দেয় সে যৌনক্রিয়ায় সে কোনদিন কোন উৎসাহ দেখাবে না। এ বিষয়ে কনির বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই তাকে অপ্রিয় কিছু সহ্য করতে হয়নি।

দিকে ক্লিফোর্ড ভাবল, হিলদা কনির থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী। হিলদা আর যাই হোক কোন পুরুষকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে তার সঙ্গে এক সহায়তা ও সহানুভূতিমূলক মনোভাবের উপর ভিত্তি করে এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তার উপর নির্ভর করতে চায়; কিন্তু কনির উপর নির্ভর করা যায় না। ক্লিফোর্ড যদি রাজনীতি করত তাহলে কনি তার কোন কাজেই লাগত না। কনি এসব ব্যাপারে শিশুর মতই হিমশীতল।

সেদিন র‍্যাগবির হলঘরে চায়ের আসরটা একটু সকাল করে বসল। খোলা দরজা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝের উপর।

ক্লিফোর্ড বলল, বিদায় কনি, আবার ফিরে এসো আমার কাছে।

শান্তকণ্ঠে কনি উত্তর করল, বিদায় ক্লিফোর্ড। খুব বেশী দিন বাইরে থাকব না।

ক্লিফোর্ড বলল, বিদায় হিলদা, আশা করি তুমি কনির উপর নজর রাখবে।

হিলদা বলল, নজর মানে? আমি রীতিমত লক্ষ্য রাখব। ও খুব একটা দূরে যেতে পারবে না।

মনে রেখো তুমি কথা দিলে।

কনি মিসেস বোল্টনকে বলল, বিদায় মিসেস বোল্টন। আশা করি তুমি স্যার ক্লিফোর্ডকে যথাসাধ্য যত্ন করবে।

আমি যথাসাধ্য যত্ন করব ম্যাডাম।

কনি বলল, কোন খবর থাকলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবে। স্যার ক্লিফোর্ড কেমন থাকে জানাবে।

ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি তাই করব। আশা করি আপনার যাত্রা ও ভ্রমণ শুভ হোক। আপনি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ফিরে আসুন।

বিদায়ের সময় সবাই হাত নাড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। কনি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল দরজার সিঁড়ির উপরের ধাপটায় তার চলমান যান্ত্রিক চেয়ারটায় বসে আছে ক্লিফোর্ড। যতই হোক সে তার স্বামী। এই র‍্যাগবিই তার বাড়ি। এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিয়তির বিধানে।

মিসেস চেম্বার গেটটা খুলে দিতেই গাড়িটা বাড়ির সীমানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরল। বাইরে তখন কোলিয়ারির শ্রমিকরা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। বড় রাস্তাটা ছেড়ে ক্রসহিল রোড ধরল গাড়িটা। এই পথ ধরে ওরা যাবে ম্যাসফিল্ড। কনি একটা কালো চশমা পরল। ওরা রেললাইন পার হয়ে একটা ব্রিজের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কনি এক সময় বলে উঠল,

সামনের ঐ গলিপথটা দিয়ে বনের সেই বাসাটায় যেতে হবে।

হিলদা অধৈর্য হয়ে কনির পানে কড়াভাবে তাকিয়ে বলল, এটা ভয়ঙ্কর দুঃখের কথা যে তোমার জন্য আমরা সোজা গন্তব্যস্থলে যেতে পারছি না। আমরা নটার মধ্যেই পল মলে পৌছতে পারতাম।

কনি তার চশমার ভিতর থেকে তাকিয়ে বলল, তোমার জন্য আমি দুঃখিত।

আরো কিছুক্ষণ পর অবশেষে ওরা ম্যাসফিল্ডে পৌছল। এই ম্যাসফিল্ড একদিন বড় মনোরম ও রোমান্টিক জায়গা ছিল। আজ এটা শুধু একটা কোলিয়ারি শহর। একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল হিলদা। সেই হোটেলে একটা ঘর ভাড়া করল। পরিবেশটা মোটেই ভাল লাগছিল না হিলদার। ভিতরে ভিতরে সে এতদূর রেগে গিয়েছিল যে কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল না তার। অথচ কনির লোকটার ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করছিল।

হিলদা বলল, কি নামে ডাক তাকে? তুমি ত শুধু তার কথা হলে 'সে' বল।

আমি তাকে তার নাম ধরে ডাকি না, সেও আমাকে ডাকে না। তবে মাঝে মাঝে আমি তাকে জন টমাস আর সে আমাকে লেডি জেন বলে। তবে তার আসল নাম হলো অলিভার মেলর্স।

তুমি তাহলে কেমন করে লেডি চ্যাটার্লির পরিবর্তে মিসেস মেলর্স হতে চাও?

আমি তা-হতে সত্যিই ভালবাসি।

কনির ব্যাপারে বলার কিছু নেই। তবু হিলদা নিজেকে বোঝাল, লোকটা যদি যুদ্ধের সময় চার পাঁচ বছর ধরে লেফটন্যান্টগিরি করে থাকে, তাহলে তাকে অপদার্থ বলা চলে না এবং তার পরিচয়টা বাইরে দেবার মত। তাছাড়া লোকটার চরিত্র আছে। হিলদা একটু নরম হলো।

তবু হিলদা বলল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তোমার মোহভঙ্গ হবে এবং তাকে ছাড়তে বাধ্য হবে। শ্রমিকদের সঙ্গে বেশীদিন কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু তুমি নাকি সমাজবাদী? তুমি আবার শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ওকালতি করে থাক।

আমি কোন রাজনৈতিক সংকটের সময় ওদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি কিন্তু ওদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েই আমি দেখেছি ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চলা আমাদের মত লোকের পক্ষে কত কঠিন, কত অসম্ভব! শুধু ধনবৈষম্য নয়, আসল কথা দুপক্ষের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। কোন ছন্দ বা মিলই নেই।

হিলদা যারা রাজনীতি করে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বাস করেছে। তার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। তার কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়।

হোটেলে সন্ধ্যাটা একরকম করে কেটে গেল। কেটে গেল নীরস নিরানন্দ

ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও। কনি তার ব্যাগে গোটা কতক জিনিস নিয়ে নিল। তারপর চুলটা একবার আঁচড়ে নিল।

কনি বলল, আমার মনে হয় হিলদা, প্রেমের মধ্যে যে একটা বিস্ময় আছে সে বিস্ময় সে চমক মানুষ তখনি অনুভব করে যখন সে বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

কনির কথার মধ্যে একটা অহঙ্কারের সুর ছিল।

হিলদা বলল, প্রত্যেকটি মশাও সৃষ্টির সময় প্রেমের এই বিস্ময় ও চমক অনুভব করে।

তুমিও তাই মনে করো নাকি? সত্যিই এটা বড় চমৎকার।

সেদিন রাত্রিটা ছিল আধো আলো আধো অন্ধকারে ভরা। নীরস ও নিরানন্দভাবে দীর্ঘ সন্ধ্যাটা কাটাবার পর হিলদা গাড়ি ছেড়ে দিল। বলসোভার হয়ে অন্য একটা পথ ধরল গাড়িটা।

কনি চোখে কালো চশমা আর মাথায় অদ্ভুত একটা ছদ্মবেশী টুপী পরে চুপচাপ বসে ছিল। লোকটার সঙ্গে তার ভালবাসাবাসির ব্যাপারে যত বাধা দিতে লাগল হিলদা, ততই মনে মনে শক্ত হয়ে উঠল কনি, ততই দৃঢ়তার সঙ্গে লোকটার পক্ষ অবলম্বন করে যেতে লাগল সে।

গাড়িটা ক্রসহিলের কাছে আসতেই একটা ট্রেন চলে গেল। হিলদা ধারণা করেছিল রেলের ব্রীজটার ওপারে তার শেষ প্রান্তে বাঁ দিকে হবে সেই গলিটা যেখানে কনি নেমে বনে চলে যাবে। ও তাই গাড়ির গতিটা শ্লথ করে দিল। ব্রীজটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকাল। গলিটার মোড়ের কাছে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল।

নিচু গলায় বলল, আমরা ঠিক জায়গায় এসে গেছি।

হিলদা গাড়ির আলোটা নিবিয়ে দিল। গলির মোড়ে ঘাসগুলোর উপর আলোটা পড়েছিল।

লোকটার কণ্ঠ শোনা গেল, আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন।

হিলদা গাড়িটা একটু পিছিয়ে গলিটার মোড়ে একটা এলম গাছের তলায় কিছু সবুজ ঘাস মাড়িয়ে দাঁড়াল। কনি নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল গাছটার তলায়।

কনি লোকটাকে বলল, তুমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলে?

লোকটা উত্তর করল, খুব একটা বেশী সময় নয়।

ওরা আশা করেছিল হিলদাও গাড়ি থেকে নামবে। কিন্তু হিলদা গাড়িতে গুম হয়ে বসে রইল।

কনি বলল, আমার বোন হিলদা। তুমি আমার বোনের কাছে গিয়ে একবার কথা বলবে না? হিলদা, এ হচ্ছে মেলর্স।

মেলর্স তার মাথা হতে টুপীটা তুলল। কিন্তু হিলদার কাছে গেল না।

কনি হিলদাকে বলল, হিলদা, তুমি একবার বাসায় আসবে না? এখান থেকে বেশী দূর নয়।

হিলদা বলল, কিন্তু গাড়িটার কি হবে?

কত লোক গলির মোড়ে গাড়ি রাখে। তোমার কাছে ত চাবি আছে।

হিলদা চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল, গাড়িটা গলির ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে পারি?

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে পারেন।

হিলদা গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে গলির ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। তারপর গাড়িটায় চাবি দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তখন রাত্রি অন্ধকার হলেও স্বল্প আলোয় ছিল আলোকিত। পথ ঘাট মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। গলি পথটায় লোক চলাচল করে না বলে অব্যবহৃত পথটার দুধারে আগাছা গজিয়ে উঠেছে বড় বড়। বাতাসে ফুলের সুবাস ভেসে আসছিল। মেলর্স আগে আগে যাচ্ছিল, তারপর ছিল কনি, তারপর হিলদা। পথের উপর যে সব জায়গাগুলোতে অন্ধকার জটিল হয়ে উঠেছিল সেই জায়গায় টর্চ লাইট জ্বালছিল মেলর্স। ওক গাছের উপর একটা পেঁচা ডাকছিল। ওদের পাশে পাশে যাচ্ছিল ফ্লসি। কেউ কোন কথা বলছিল না। বলার কোন কিছু ছিল না।

অবশেষে কনি একটা হলদে আলো দেখতে পেল। মেলর্সের বাসা থেকে আসছিল আলোটা। কিছুটা ভয় পেয়ে গেল কনি।

মেলর্স নিজের হাতে দরজার তালা খুলে প্রথমে নিজে ঘরে ঢুকল। খালি ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। ঘরটার একধারে চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল।

টেবিলের উপর একটা সাদা কাপড় পাতা ছিল। তার উপর দুটো প্লেট আর দুটো গ্লাস ছিল। হিলদা মুখ ঘুরিয়ে খালি ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। ঘরটাকে একেবারে নীরস নিরানন্দ মনে হলো তার। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে লোকটার পানে তাকাল সে।

লোকটার চেহারাটা মোটামুটি লম্বা আর একটু রোগা-রোগা। দেখতে সুন্দর বলা চলে। লোকটা যেন তার চারধারে সব সময় এক নীরব নিরুচ্চার দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। কথা কম বলে লোকটা।

কনি বলল, তুমি বসো হিলদা।

মেলর্স বলল, বসুন। আমি আপনাকে চা দেব না বীয়ার?

কনি বলল, বীয়ার।

হিলদাও বলল, বীয়ার দেবে আমাকে দয়া করে।

হিলদার কণ্ঠে ও চোখে মুখে একটা লজ্জার ভাব ছিল। মেলর্স তার দিকে মিটমিট করে তাকাল।

মেলর্স ঘরের একধারে গিয়ে একটা আলমারী থেকে একটা নীল কাচের

জার থেকে এক গ্লাস বীয়ার আনল। আসার সময় তার মুখের ভাবটার কিছু পরিবর্তন হলো।

কনি বসল দরজার দিকে। হিলদা বসল মেলর্সের চেয়ারটায়। কনি হিলদাকে বলল, ওটা ওর চেয়ার।

হিলদা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে যেন সে আগুনের উপর বসে পড়েছিল।

মেলর্স তাড়াতাড়ি বলল, ব্যস্ত হবেন না। ব্যস্ত হবেন না মোটেই। স্থির হয়ে বসুন। আরাম করে বসুন।

হিলদাকে জার থেকে এক গ্লাস মদ ঢেলে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, আমার কাছে কোন সিগারেট নেই। আমি সিগারেট খাই না কি না। আশা করি আপনাদের কাছে সিগারেট আছে।

তারপর কনির দিকে তাকিয়ে বলল, কি খাবে তুমি ?

মেলর্স এমনভাবে কথা বলল, যেন সে কোন হোটেলের মালিক।

কনি বলল, ওখানে কি রয়েছে ?

মেলর্স বলল, আলুসিদ্ধ, মাখন, ছাড়ানো বাদাম—এতে হবে না কি ?

কনি বলল, হ্যাঁ। হিলদা খাবে ত ?

হিলদা মেলর্সের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, তুমি ইয়র্কশায়ারের ভাষায় কথা বল কেন ?

একফালি ক্ষীণ অস্পষ্ট হাসি হেসে মেলর্স বলল, এটা ইয়র্কশায়ারের ভাষা নয়, ভার্বির ভাষা।

হিলদা বলল, ভাবির ভাষাই বা বলো কেন ? তুমি ত প্রথমে সহজ স্বাভাবিক ইংরাজি ভাষায় কথা বলেছিলে।

জোর করে চেষ্টা না করলে আমার মুখ থেকে এই ভাষাই বেরিয়ে পড়ে। আপনাদের যদি একেবারে অসুবিধা না হয় তাহলে আমি এই ভাষাতেই কথা বলব।

হিলদা বলল, কথাগুলো কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়।

তা হতে পারে। আবার তেভারশালে আপনারা কথা বললে আপনাদের ভাষাও কৃত্রিম মনে হবে।

মেলর্স আবার তাকাল হিলদার দিকে। ইচ্ছা করে এক কৃত্রিম ব্যবধান রেখে চলল মাঝখানে।

এরপর খাবার আনতে লাগল মেলর্স। এদিকে দুই বোন নীরবে বসে রইল টেবিলের দুধারে। আর একটা প্লেট, ছুরি, কাঁটা চামচ প্রভৃতি সব নিয়ে এল মেলর্স। তারপর বলল, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কোটটা খুলে রাখব।

মেলর্স তার কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখে একটা ঘি রঙের ফ্লানেলের শার্ট পরে

টেবিলের ধারে বসে রইল।

মেলর্স বলল, আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনারা শুরু করে দিন।

মেলর্স রুটিটা কেটে দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল নীরবে। হিলদা কনির মতই তার দুবগাহী নীরব ব্যক্তিত্বের এক অপরিহার্য শক্তি অনুভব করতে লাগল বসে বসে। টেবিলের উপর রাখা লোকটার সেই রোগা-রোগা হাতগুলো লক্ষ্য করল সে। বুঝল, লোকটা সাধারণ শ্রমিক নয়। সে যেন শ্রমিকের অভিনয় করছে।

একটুখানি মাখন নিয়ে হিলদা বলল, তুমি যদি স্বাভাবিক ইংরাজি ভাষায় কথা বল তোমার আঞ্চলিক ভাষা ছেড়ে তাহলে সেটা আরো ভাল হবে।

মেলর্স হিলদার দিকে তাকিয়ে তার ইচ্ছার মধ্যে এক শয়তানী বুদ্ধির গন্ধ পেল। এরপর বলল, আপনি স্বাভাবিক কাকে বলছেন? আপনি যদি আপনার বোন ফিরে আসার আগেই আমাকে নরকে পাঠাবার কথা বলতেন আর তার উত্তরে আমি ঐ ধরনের কিছু অপ্রিয় শক্ত কথা বলতাম সেটা কি খুব স্বাভাবিক হত?

হিলদা বলল, মার্জিত ভদ্র আচরণ সব সময়ই স্বাভাবিক।

মেলর্স বলল, আপনি দ্বিতীয় সত্তার কথা বলছেন?

তারপর সে হেসে বলল, না, আমি ভদ্র আচরণ করতে পারব না।

এর উত্তর দিতে পারল না হিলদা। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ রেগে গেল সে। অন্ততঃ এটা তার বোঝা উচিত ছিল একথার মাধ্যমে হিলদা তাকে সম্মান দান করেছে। কিন্তু অভিনেতার মত এমন একটা প্রভুত্বমূলক ভাব দেখাল যাতে মনে হবে ওই হিলদাকে সম্মান দান করল তার কথার দ্বারা। কী অবিবেচনার কাজ! কনি সত্যিই কুপথে যাচ্ছে, লোকটার খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।

তিনজনে নীরবে খেয়ে যেতে লাগল। খাওয়ার টেবিলটা কিভাবে সাজিয়েছে তা ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল হিলদা। সে বেশ বুঝতে পারল তার থেকে লোকটা এসব দিকে অনেক সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। এ দিক দিয়ে হিলদার নিজের স্কটজাতিসুলভ একটা আলগা ভাব আছে। কিন্তু অন্য দিকে লোকটার মধ্যে আছে ইংরাজজাতিসুলভ এক আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রসাদের ভাব। লোকটাকে স্বমতে আনা একটা কঠিন কাজ।

আবার হিলদাকে স্বমতে আনাও তেমনি কঠিন কাজ মেলর্সের পক্ষে।

হিলদা কিছুটা শান্ত ও নরম গলায় বলল, তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে করো এই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে?

কিসের ঝুঁকি?

আমার বোনের সঙ্গে এই সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া।

মেলর্স কনির পানে তাকাল। বলল, এ সম্পর্ক ত তোমার হাতে পাতানো

মেয়ে। আমি ত তোমার উপর জোর করিনি।

কনি হিলদার পানে তাকাল। বলল, তুমি ঝগড়া করো না হিলদা।

হিলদা বলল, আমি তা চাই না। কিন্তু সব কিছু ভাল করে ভেবে স্থায়ী সম্পর্কের কথা ভাবতে হয়। এভাবে ছেলেখেলা করা উচিত নয়।

মেলর্স বলল, স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথা বলছেন ? তাহলে আমিও বলব আপনি নিজে কি এমন স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেছেন ? আমার মনে হয় আপনি ত বিবাহবিচ্ছেদ করতে চলেছেন। আপনি যা এ বিষয়ে লাভ করেছেন তা হলো এক অনমনীয় মনোভাব আর এক মিথ্যা জেদের অবিচ্ছিন্নতা। আপনি শীঘ্রই বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠবেন এই অবিচ্ছিন্নতায়। আপনার নিজের এই নারীমনের অবিচ্ছিন্ন অনমনীয়তা আর আপন ইচ্ছাশক্তির উগ্র স্বাতন্ত্রে আপনি নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন একদিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ ধরনের কোন মনোভাব গড়ে ওঠেনি আমার মধ্যে।

হিলদা বলল, আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলার কি অধিকার আছে তোমার ?

মেলর্স বলল, অধিকারের কথা বলছেন ? আমি তাহলে বলব, আপনার অবিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে দেখার কি অধিকার আছে আপনার ?

হিলদা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, শুনুন মশাই, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে ?

মেলর্স বলল, আছে। অবশ্য এ সম্পর্ক জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনার উপর। কিন্তু সে যাই হোক আপনি আমার স্ত্রীর বোন।

এখনো সে সম্পর্ক অনেক দূরে।

আমিও বলে দিচ্ছি এ সম্পর্ক এখনো অনেক দূরের ব্যাপার নয়। আমি নিজের মত করে এ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আপনার তথাকথিত স্থায়ী সম্পর্কের থেকে এমন কিছু তা খারাপ নয়। আপনার বোন যদি আমার কাছে একটুখানি ভালবাসা আর যৌনতৃপ্তির জন্য আসে তাহলে সে জেনেশুনেই আসে। সে জানে কি চায় কি পায়। সে এর আগে আমার বিছানায় যতবার শুয়েছে আপনি যার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক পাতিয়েছেন তার কাছে ততবার শোননি। আমি আমার নিয়তিকে ধন্যবাদ দিই। আপনার বোনের মত মেয়ের থেকে যে কোন পুরুষ যে আনন্দ লাভ করতে পারে আপনার মত মেয়ের থেকে কোন পুরুষ তা পেতে পারে না। এটা সত্যিই দুঃখের কথা। কারণ আপনি একটু চেষ্টা করলেই ভাল হতে পারতেন। ইচ্ছা করলেই আপনি একটা সুন্দর কাঁকড়া বিছার পরিবর্তে ভাল আপেল হতে পারতেন। আপনার মত মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষা আর নবজীবন লাভ দরকার।

মেলর্স বরাবর হিলদার দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখের ক্ষীণ একফালি

হাসির মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক আসক্তির ভাব ছিল।

হিলদা বলল, আর তোমাদের মত যে সব লোক নিজের কুৎসিত নোংরা কামনা বাসনাকে জাহির করে বেড়ায় তাদেরও শিক্ষা দীক্ষার দরকার।

শুনুন ম্যাডাম। সব মানুষ কখনো এক হতে পারে না। তবে আপনি যা পাবার যোগ্য তাই পেয়েছেন। আপনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনেরই যোগ্য।

হিলদা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার ঝোলানো কোটটা তুলে নিল হাতে। বলল, আমি পথ চিনে ঠিক যেতে পারব।

মেলর্স বলল, না আপনি পারবেন না।

ওরা তিনজনেই সেই সংকীর্ণ গলিপথটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে। হিলদা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাড়িটায় গিয়ে উঠল। অন্ধকারে গাছের আড়ালে কোথায় একটা পেঁচা ডেকে চলেছিল। হিলদা গাড়ির এঞ্জিনে স্টার্ট দিল। মেলর্স আর কনি দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

কনি মেলর্সকে বলল, তোমাদের দুজনের মধ্যে এত কথা কাটাকাটি বা তর্ক বিতর্কের কোন দরকার ছিল না।

মেলর্স বলল, একজনের মাংস অন্যের কাছে বিষ হতে পারে।

হিলদা গাড়ির আলোটা জ্বেলে বলল, সকালে যেন আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় কনি।

কনি বলল, না, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। শুভরাত্রি।

গাড়িটা সশব্দে চলে যেতেই আবার আগের মত স্তব্ধ হয়ে উঠল নৈশ বনভূমি।

কনি ভয়ে ভয়ে মেলর্সের হাতটা ধরে গলিপথে হাঁটতে লাগল। একসময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে কনি বলল, আমাকে চুম্বন করো।

মেলর্স বলল, দাঁড়াও, গলিটা পার হতে দাও।

মেলর্সের হাতটা বরাবর ধরে রইল কনি। নীরবে পথ চলতে চলতে কনির বড় আনন্দ হচ্ছিল। মেলর্স চুপ করে ছিল। কনি ভাবল তার বোন তাকে মেলর্সের কাছ থেকে দূরে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মেলর্সের সঙ্গে আজ রাতে মিলতে পারায় বড় আনন্দ হচ্ছিল কনির।

বাসায় পা দিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল কনি। এ ঘরে এবার তারা একা, সম্পূর্ণ একা।

কনি বলল, কিন্তু তুমি হিলদার প্রতি অতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলে কেন?

যথাসময়ে তাকে গালে একটি চড় দিতে হত।

কিন্তু কেন? সে ত চমৎকার মেয়ে।

মেলর্স কোন কথা বলল না। নীরবে তার কাজ করে যেতে লাগল। বাইরে তাকে দেখে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু কনির উপর তার কোন রাগ নেই। কনি তা বেশ বুঝতে পারল। তবে মেলর্সের এই রাগের জন্য তাকে আরো সুন্দর

দেখাচ্ছিল। তাকে বেশী আত্মস্থ আর উজ্জ্বল করে তুলেছিল। মেলর্সের সেই উজ্জ্বল ও স্তব্ধনিবিড় আত্মস্থতা দেখে আনন্দে কনির দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন গলে যেতে লাগল।

মেলর্স যেন কনিকে দেখেও দেখছিল না। এবার সে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। তারপর তার ভ্রূ ছুটো তুলে কনির পানে তাকাল। তার সেই ভ্রূ ছুটোর মধ্যে তখনো এক ক্রোধাবেগ নিবিড় হয়ে জমে ছিল।

মেলর্স বলল, চল বিছানায় যাবে না? এই বাতিটা নাও।

টেবিলে একটা বাতি জ্বলছিল। কনি সেটা পরম আনুগত্যের সঙ্গে তুলে নিল হাতে। তারপর শুতে গেল।

সে রাতের মত ইন্দ্রিয়াবেগের এমন উত্তাপ এমন প্রবলতা এর আগে কখনো দেখেনি কনি। কনি চমকে উঠল। এতটা হয়ত সে চায়নি। তবু আগের থেকে তীক্ষ্ণ ও প্রবল এক পুলকিত রোমাঞ্চের ফুলশরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার সারা অঙ্গ। প্রবল হলেও প্রতিটি মুহূর্তকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অথচ বাঞ্ছিত আবেগে বরণ করে নিচ্ছিল কনি। সে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেও কোনরূপ বাধা দিল না মেলর্সকে। এক নির্লজ্জ নিবিড়তায় নিষ্ঠুর মেলর্সের অপ্রধৃষ্য পুরুষাঙ্গের প্রতিটি অপ্রতিরোধ্য আঘাতে কনির অন্তঃশায়ী নারীসত্তার এক একটি গোপন স্তর যেন উন্মোচিত হয়ে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল কে যেন তার আত্মাটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। যে আগুনে শুধু আত্মার সকল চেতনা চিন্তা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় অথচ দেহের উপর কোন আঁচ লাগে না, সেই মধুস্রাবী অগ্নির স্পর্শশীতল লেহনে দেহটা তার যতই পুলকিত হয়ে উঠছিল আত্মাটা তার ততই পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কনির সব লজ্জাগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তার প্রতিটি গোপনাঙ্গে যে সব লজ্জা এতদিন গভীর হয়ে লুকিয়ে ছিল, যে সব লজ্জা এক আন্তরযন্ত্রীয় জটিলতায় সুপ্রাচীন সেই সব লজ্জাগুলোও সব পুড়ে যাচ্ছিল। কনিকে কোন কিছু করতে হলো না। তার পক্ষ থেকে কোন সক্রিয়তার প্রয়োজন ছিল না। এক প্রচণ্ড যৌন তৎপরতায় ফেটে পড়ে কনির শান্ত স্তব্ধ দেহটার উপর আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছিল মেলর্স। তার শৃঙ্গার ও সঙ্গমের শতমুখী পীড়নে নিপীড়িত হলেও ক্রীতদাসের মত এক বাধাহীন নিষ্ক্রিয়তায় নিস্পন্দ হয়ে ছিল তার সারা দেহটা। মেলর্সের প্রজ্জ্বলিত কামাগ্নির শিখাগুলো তখনো কনির বুক ও গর্ভদেশটাকে লেহন করে যাচ্ছিল, তার সর্বাঙ্গকে ঘিরে ছিল। যে আঘাত মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর, আবার মর্মস্পর্শিতায় মধুর সেই ভীষণসুন্দর আঘাতে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজন্ম ও নবজীবন লাভ করছিল কনি। সে হয়ে উঠছিল অন্য মানুষ, অন্য এক নারীমন।

এর আগে এ্যাডিলার্ডের কথাটা বুঝতে পারত না কনি। এ্যাডিলার্ড নাকি বলেছিল হেলয়সের সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার এক বছরের মধ্যেই প্রেমের

সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করে একে একে সে। সেই এক প্রেমাবেগ বিচিত্ররূপে হাজার হাজার বছর ধরে আত্মপ্রকাশ করে আসছে অসংখ্য নরনারীর মধ্যে। তবে ইন্দ্রিয়াবেগের আতিশয্য ও আগুন দিয়ে এই প্রেমসম্পর্ককে মার্জিত করার প্রয়োজন সব যুগেই দেখা দিয়েছে। যে মিথ্যা লজ্জা যে ভীরুতা নরনারীর দেহগুলোকে গলিয়ে দিয়ে পরিণত করেছে এক নিরবয়ব শুচিতার বিশুদ্ধ নির্যাসে সে লজ্জা সে ভীরুতাকে ইন্দ্রিয়াবেগের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে।

আজকের এই বসন্ত রাত্রিতে অনেক কিছু শিখল কনি। আগে আগে ভাবত কনি, নারীরা লজ্জায় মরে যেতে পারে ; সে কি ভয়ঙ্কর নিদারুণ লজ্জা! কিন্তু আজ লজ্জায় মরে যাওয়া ত দূরের কথা আজ সব লজ্জাই মরে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। যে লজ্জা, যে গভীর আন্তরযন্ত্রীয় লজ্জা, যে দেহগত ভয় তার অস্তিত্বের মর্মমূলে লুকিয়ে এতদিন আচ্ছন্ন করে ছিল তার নগ্ননির্জন স্বরূপটাকে, আজ মেলর্সের পুরুষাঙ্গের নিষ্করুণ তাড়নায় সে স্বরূপ লজ্জাভয়ের সব আচ্ছাদন ঝেড়ে ফেলে তার আপন প্রকৃতির অরণ্যে জেগে উঠেছে। আজ সে সম্পূর্ণরূপে নগ্ন ও নির্লজ্জ হতে পেরেছে। আজ তাই সমস্ত লজ্জা আর ভয় থেকে তার নারীমনের সমস্ত গোপনতা ও সমস্ত গভীরতাটুকুকে মুক্ত করতে পারার জন্য এক জয়ের গৌরব বোধ করল কনি। বুঝল আজ সার্থক হলো তার নারীজীবন। কোন এক দুরন্ত শিকারীর অব্যর্থ শরসন্ধানে তাড়িত বনকুরঙ্গীর মত তার নগ্ননির্মুক্ত আত্মা তার যথার্থ স্বরূপ তার লজ্জাভয়ের যত সব অরণ্য-জটিল আচ্ছাদন ঝেড়ে ফেলে তার আজন্মসঞ্চিত গোপনতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মিলিত হলো এক নগ্ননির্জন পুরুষের সঙ্গে। এই মিলনই যথার্থ মিলন। এ পুরুষ যেন তারই অন্য এক সত্তা। দুজনের নগ্নতা এক হয়ে দুজনকে করে তুলেছে এক অখণ্ড ও অভিন্ন।

অথচ সেই শিকারী পুরুষটা শয়তানের মত ভয়ঙ্কর। কী নির্মম তার শয়তানসুলভ আঘাত। সে আঘাত সহ্য করার শক্তি চাই। তা যে-সে পারবে না। অথচ এ আঘাত ছাড়া নারীর কোন গত্যন্তর নেই। আন্তরযন্ত্রীয় লজ্জার শতপাকে জড়িয়ে থাকা জটিল শাখা-প্রশাখায় আকীর্ণ দেহযন্ত্রের অরণ্যগভীরে আজন্ম ঘুমিয়ে থাকা নারীমনের রহস্যায়িত স্বরূপটিকে একমাত্র এই পুরুষাঘাতই জাগাতে পারে। এই পুরুষাঘাতের প্রচণ্ডতাই উদ্‌ঘাটিত করতে পারে সেই অরণ্যগভীরের রহস্যময় গোপনতা।

অথচ এক অহেতুক ভয়ে এ আঘাতকে একদিন ঘৃণা করেছে কনি। উপেক্ষার চোখে দেখেছে। কিন্তু আজ সে বুঝল, এ আঘাতকে সত্যি সত্যিই কামনা করে এসেছে। কামনা করে এসেছে তার নারীমনের নিভৃত গোপনে। আত্মহননেচ্ছু এক আশ্চর্য বনহরিণীর মত এক অমোঘ পুরুষাঙ্গের অব্যর্থ শরাঘাতকেই কামনা করে এসেছে সে। আজ সেই বহুবাঞ্ছিত আঘাতকে লাভ

করে ধন্য হলো কনি।

কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ প্রভৃতি লোকগুলো কি মিথ্যাবাদী। তারা মিথ্যা করে প্রচার করে এবং মানুষকে একথা ভাবতে শেখায় যে মানুষ চায় ভাবালুতা, তারা বলে মানুষের মনই সব ; অথচ সে নিবিড়ভাবে একান্তভাবে যা কামনা করে তা হলো এই পুরুষাঘাত, এই ভয়ঙ্কর দুর্বার ইন্দ্রিয়াবেগ। সে শুধু মনেপ্রাণে খুঁজে এসেছে এমনই একটি পুরুষকে যে সমস্ত লজ্জা ভয় হতে মুক্ত হয়ে কোন পাপপুণ্যের বিচার না করে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে এ আঘাত দান করতে পারে। এ আঘাত দান করার জন্য যদি কোন পুরুষ পরে লজ্জা পায় তাহলে তার থেকে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। ক্লিফোর্ড মাইকেলিস প্রভৃতি সব ছিল এই ধরনের ভীরু পুরুষ ; ওরা শুধু একবাক্যে মনের স্বাস্থ্য আর পরম আনন্দের কথা বলে বেড়াত। কিন্তু একজন সুস্থ সবল নারীর কাছে মনের এই পরম আনন্দের কি মূল্য আছে ? একজন সত্যিকারের পুরুষের কাছেই বা কি আছে ? তাদের আপন স্বরূপ হারিয়ে তারা কুকুরের মত দাসমনোভাবের পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। তাদের অন্তরাত্মাকে ও আসল স্বরূপকে ঠিকমত জাগাবার জন্যও এই প্রচণ্ড নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়াবেগের উত্তাপ দরকার। ইন্দ্রিয়াবেগের এই উদ্ধত নির্লজ্জতা আর নির্ভীকতাই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে দান করতে পারে এক আশ্চর্য বলিষ্ঠতা আর দৃঢ়তা।

কনি আরো ভাবতে লাগল, হা ভগবান! পুরুষগুলো সব কেমন অদ্ভুত এক একটা জীব। কুকুরের মতই তারা শুঁকে শুঁকে সঙ্গম করে। কিন্তু এমন পুরুষ সত্যিই খুব কম আছে যে কোন কিছুতেই ভীত বা লজ্জিত নয়। মেলর্সের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল কনি, দেখল সে ঘুমোচ্ছে। পশুর মতই সে গভীরভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কনি তার গায়ে গা দিয়ে ঘন হয়ে শুল।

মেলর্স ঘুম থেকে জেগে না ওঠা পর্যন্ত কনি উঠল না। জেগে উঠে কনি দেখল মেলর্স বিছানার উপর বসে আছে। বসে বসে তার নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কনির মনে হলো মেলর্সের সংকোচহীন দৃষ্টি তার এক নির্লজ্জ চেতনার চাদর দিয়ে তার নগ্ন দেহটাকে ঢেকে দিয়েছে। বড় ভাল লাগছিল কনির। তার এই মদালস, রতিক্লান্ত, অর্ধতন্দ্রাভিভূত ও ভারী ভারী দেহটা নিয়ে টান-টান ভাবে শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল তার।

কনি বলল, এখন ওঠার সময় হয়েছে ?

এখন সাড়ে ছটা বাজে।

কনিকে গলিটার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঠিক বেলা আটটার সময়। সব সময় একটা কাজের তাড়া থাকবেই। অবাধ অবিচ্ছিন্ন রতিসুখের কোন নীরব নিশ্চিন্ত অবকাশ নেই।

মেলর্স বলল, আমি তাহলে প্রাতরাশ তৈরি করে এখানে নিয়ে আসি ?

আসব ত ?

হ্যাঁ, এস।

ফ্লসি নিচেতে ডাকছিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখহাত মুছল মেলর্স। কনি নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কোন পুরুষের বুক যখন এমনি করে সাহস আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে থাকে তখন তাকে সত্যিই কত সুন্দর দেখায়।

কনি বলল, পর্দাটা একটু টেনে দেবে ?

সকালের সবুজ সজীব বনভূমির পটভূমিকায় মেলর্সকে বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কনি তার ঝুলন্ত স্তনগুলোকে হাতে ধরে জানালার ভিতর দিয়ে বনের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। মেলর্স তখন পোষাক পরছিল। কনি তখন শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মত ভাবছিল এই মিলন এই সাহচর্যই হলো প্রকৃত জীবন। সত্যিকারের সুখী জীবন।

কনির মনে হচ্ছিল মেলর্স যেন পোষাক পরছে না, তার নগ্নতাকে সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে।

কনি বলল, আমার অন্তর্বাসটা কি হারিয়ে গেছে ?

মেলর্স তা হাত বাড়িয়ে বিছানার তলা থেকে এনে দিল।

কনি বলল, ঠিক আছে, ওটা ছিঁড়ে গেছে। এখানেই থাকবে।

মেলর্স বলল, ভাল হবে তাহলে। আমি রাতের বেলায় দুটো পায়ের মাঝখানে ওটাকে চেপে ধরব। ওটা আমাকে সঙ্গ দান করবে।

কনি আবার স্বপ্নাবিষ্টের মত জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জানালা দিয়ে বাইরের বন থেকে সকালের স্নিগ্ধ বাতাস আসছিল। পাখি উড়ে যাচ্ছিল গাছের মাথার উপর দিয়ে। সকাল হয়ে যাওয়ায় খুশিতে ছোটাছুটি করছে ফ্লসি।

কনি শুনতে পেল মেলর্স আগুন ধরাচ্ছে, জল পাম্প করছে। কিছুক্ষণ পর একটা বড় ট্রেতে করে প্রাতরাশ আর চা এনে বিছানার উপর রাখল। কনি তা খেতে শুরু করতে কাপে চা ঢালতে লাগল মেলর্স। চা ঢেলে মেলর্স একটা চেয়ারে বসে তার খাবারের প্লেটটা হাঁটুর উপর রাখল।

কনি বলল, একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতে খুব ভাল লাগছে।

মেলর্স শুধু কনির যাবার সময়টার কথা ভাবতে লাগল। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। একটু পরেই চলে যেতে হবে কনিকে।

কনি বলল, হায়, আমি যদি একসঙ্গে তোমার কাছে চিরদিনের জন্য থাকতে পারতাম আর র‍্যাগবি যদি এখান থেকে অনেক লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে হত। তুমি হয়ত জান, আমি আসলে র‍্যাগবি থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি কিছুকালের জন্য।

মেলর্স সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

কনি বলল, তুমি তাহলে কথা দিচ্ছ আমরা একসঙ্গে থাকব। তুমি আর

আমি একসঙ্গে।

হ্যাঁ, সম্ভব হলে নিশ্চয় থাকব।

কনি মেলর্সের গায়ে হেলান দিয়ে তার হাতের চা কিছুটা ফেলে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা থাকব।

মেলর্স চাটা ঝেড়ে ফেলে বলল, হ্যাঁ থাকব।

আপাততঃ একসঙ্গে থাকতে পারছি না। তাই নয়কি?

মেলর্স হেসে বলল, না, আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে রওনা হতে হবে।

কনি বলল, আমাকে যেতে হবে?

সহসা হাত বাড়িয়ে চুপ করতে বলল মেলর্স। বাইরে ফ্লসি ঘেউ ঘেউ করে কার যেন আগমন ঘোষণা করছে।

মেলর্স নিজে ঘরের বাইরে গেল। তার বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে বাইরে গিয়ে দেখল সাইকেলে করে পিওন এসে তাকে ডাকছে। একটা রেজেষ্ট্রী চিঠি আছে।

মেলর্স সই করে নিল চিঠিটা। তার এক সহকর্মী কানাডা থেকে পাঠিয়েছে তাকে। মেলর্স বিরক্ত হয়ে বলল, রেজেষ্ট্রী করার কি আছে?

চিঠিটা নিয়ে আবার কনির কাছে ফিরে এল মেলর্স। কনিকে বলল, পিওন এসেছিল।

এত সকালে?

চিঠি থাকলে ও সকাল সাতটার মধ্যেই এসে দিয়ে যায়।

তোমার বন্ধু কি তোমাকে কোন সুখবর পাঠিয়েছে?

না। ও শুধু বৃটিশ কলাম্বিয়ার এক জায়গার কিছু ছবি আর সেই সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র পাঠিয়েছে।

তুমি কি সেখানে যেতে চাও?

যেতে পারলে ত ভালই হত।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আমিও তাই মনে করি। বড় সুন্দর জায়গা।

কিন্তু হঠাৎ পিওন আসায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মেলর্স। তার সমস্ত উদ্যম হঠাৎ মুষড়ে গিয়েছিল।

মেলর্স বলল, তোমাকে এবার তৈরি হতে হবে। সময় হয়ে গেছে।

সে উঠে পড়ল। বলল, আমি একটু ঘুরে আসি। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

মেলর্স তার বন্দুক আর ফ্লসিকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়ে গেল। কনি বিছানা থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিল। ইতিমধ্যে মেলর্স বাইরে থেকে এসে গেছে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মেলর্স তালা দিল দরজায়। মেলর্স এবার

গলিপথ দিয়ে ওদের গন্তব্যস্থলে না গিয়ে বনের ভিতর দিয়ে অন্য পথে গেল।

কনি একসময় বলল, গতরাত্রিটা কী চমৎকার কেটেছে।

বিষণ্ণ মনে মেলর্স বলল, এখন তার স্মৃতিটা নিয়ে শুধু আমাকে কাটাতে হবে।

ওরা নীরবে পথ চলতে লাগল। একসময় কনি বলল, আমরা কিন্তু একদিন একসঙ্গে দুজনে থাকব। বাকি জীবনটা কাটাব।

মেলর্স অন্য দিক থেকে মুখটা না ঘুরিয়েই বলল, হ্যাঁ, সময় হলে থাকব। আপাততঃ তুমি ভেনিস অথবা অন্য কোন জায়গায় চলে যাচ্ছ।

মেলর্স ডান দিকে একটা জায়গার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐখানে গাড়ি আসবে।

কনি মেলর্সের গলাটা জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি বলল, আমার জন্য তোমার ভালবাসা রেখে দেবে। গত রাতে আমার বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু তুমি আমাকে মনে রাখবে ত?

মেলর্স নীরবে চুম্বন করল কনিকে। বুকের উপর চেপে রেখে দিল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চুম্বন করল।

মেলর্স বলল, আমি আগে গিয়ে একটু দেখে আসি গাড়িটা এসে গেছে কিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল মেলর্স, এখনো গাড়ির দেখা নেই। মনে হয় কিছুটা দেরী আছে।

মেলর্সকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। বলল, ঐ শোন।

ওরা দুজনেই কান পেতে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল। গাড়িটা ব্রীজের উপর এসে গতিটা শ্লথ করে দিয়েছে। মেলর্স চলে গেল। বলল, তুমি যাও, আমি আর যাব না। কনি হতাশ হয়ে তার পিছু পিছু যেতে লাগল। মেলর্স একসময় কনিকে একটা চুম্বন করেই ছেড়ে দিল।

এদিকে হিলদা তখন গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। কনিকে কাঁটাগাছের কাছে গলিপথ থেকে একটু দূরে দেখতে পেয়ে বলল, এখানে কি করছিস? সে কোথায়?

কনি বলল, সে আসবে না।

চোখে জল নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল কনি। হিলদা তাকে কালো চশমা আর ওড়নাটা দিল। বলল, পরে নাও।

হিলদা গাড়ি ছেড়ে দিল। কনি মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকাল। মেলর্সের চিহ্ন নেই কোথাও। তার মনে হলো ওদের মিলনটা নিবিড় হয়ে উঠতে না উঠতেই তার মাঝে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল মৃত্যুর মতই বিচ্ছেদের এক কৃষ্ণ যবনিকা।

ক্রসহিল গাঁটাকে পাশ কাটিয়ে হিলদা বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কিছুদিনের মত তুমি দূরে থাকবে লোকটার কাছ থেকে।

অধ্যায় ১৭

ওরা লণ্ডনের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে লাঞ্চটা সেরে নিল। কনি বলল, জানিস হিলদা, প্রকৃত ভালবাসা আর প্রকৃত যৌনাবেগ কাকে বলে তা তুই কখনো বুঝতে পারিসনি। একই লোকের কাছ থেকে এই দুটো জিনিস পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

হিলদা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, দয়া করে তোমার অভিজ্ঞতার কথা আর বলো না। আমি সত্যিই এমন লোককে কখনো পাইনি যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে আমার। আমি তেমন মানুষ পাইনি। তাদের আত্মপ্রসাদধন্য মনগড়া ভালবাসা বা ইন্দ্রিয়াবেগ আমি চাইনি। আমি তাদের পোষা বিড়াল বা তথাকথিত ভালবাসার দাস হতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতা। আমি তা পাইনি এইটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কথাটা নিয়ে ভাবল কনি। পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতা। ঐকান্তিক আত্মমিলন। কনি ভাবতে লাগল আসলে নরনারীর ভালবাসাবাসির ক্ষেত্রে যেটা দরকার তা হলো পরস্পরের অকুণ্ঠ আত্মোদ্‌ঘাটন। এই আত্মোদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ প্রেম মানেই পারস্পরিক আত্মচেতনার বিনিময়। তার মানেই এটা একটা রোগ।

কনি তার বোনকে বলল, তোমার একটা দোষ হিলদা, যে কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তুমি নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠ।

হিলদা উত্তর করল, আমার মনে হয় আমি কখনো কারো ক্রীতদাসী হইনি, নিজেকে বিকিয়ে দিইনি।

কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তাই হয়েছ। তুমি হয়েছ তোমার উগ্র আত্ম-সচেতনতার বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের ক্রীতদাসী।

দুর্বিনীত কনির এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল হিলদা। কিছুক্ষণ পরে রেগে বলল, আত্মচেতনার দাস হই বা না হই, আমার সম্বন্ধে অপরের ধারণার দাস হইনি। আমার স্বামীর ভৃত্য হয়ে উঠিনি।

শান্ত কণ্ঠে বলল কনি, তুমি জান আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

কনি বরাবরই হিলদার কথা মেনে আসত। তার কথামত চলে আসত। কিন্তু আজ সে অন্তরে আঘাত পেলেও এবং অন্তরটা তার কাঁদতে থাকলেও হিলদার আধিপত্য থেকে একেবারে মুক্ত। সব নারীই কেমন যেন ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্করভাবে আত্মপরতান্ত্রিক।

তার বাবার কাছে গিয়ে খুশি হলো কনি। সে ছোট থেকে তার বাবার

প্রিয়পাত্রী ছিল। কনি আর হিলদা পল মলের একটা হোটেলে রইল আর ওদের বাবা স্যার ম্যালকম রইলেন একটা ক্লাবে। কিন্তু সন্ধ্যের সময় তিনি মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। মেয়েরাও তাদের বাবার সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসত।

বয়স হলেও স্যার ম্যালকম দেখতে ভালই ছিলেন। তাঁর চেহারার বাঁধুনিটা শক্ত ছিল। তবে তাঁর চারপাশে সমাজে সংসারে আধুনিকতার যে স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তাতে মনে মনে কিছুটা বিব্রত বোধ করতেন তিনি। তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর স্কটল্যাণ্ডে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স তাঁর থেকে কম এবং তাঁর থেকে বেশী সংগতিসম্পন্ন। কিন্তু তিনি যতদূর সম্ভব বড় বড় ছুটির দিনগুলো বাইরেই একা একা ঘুরে বেড়াতেন।

সেদিন ওরা একটা অপেরায় গিয়েছিল নাটক দেখতে। কনি বসেছিল তার বাবার পাশে। স্যার ম্যালকমের চেহারাটা বেশ মোটাসোটা। সবল সুগঠিত দেহ ; বেশ শক্ত জানু। একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষের যে ধরনের জানু ও পা হওয়া দরকার স্যার ম্যালকমের ছিল তাই। তাঁর সে জানু ও পা দেখে বেশ বোঝা যায় জীবনে অনেক ভোগ করেছেন তিনি। কনির মনে হলো তার বাবার সারা জীবনের অপ্রতিহত প্রমোদাভিলাষ, উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ আর অবাধ ইন্দ্রিয়পরতার সমস্ত অলিখিত ইতিহাস মূর্ত হয়ে আছে এই জানু আর পায়ের গঠনের মধ্যে। তার বাবা ছিলেন পুরুষের মত এক পুরুষ। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, বৃদ্ধ হয়ে আসছেন। এটা সত্যিই দুঃখের। কিন্তু কনি আবার এটাও বুঝেছে যে তার বাবার সে জানু আর পায়ের গঠনে ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। যে ভালবাসা মানুষের যৌনজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, যে ভালবাসার শক্তি এক মধুর অবিস্মরণীয়তায় বেঁচে থাকে সারাজীবন সে ভালবাসার শক্তি কোনদিন জাগেনি স্যার ম্যালকমের মধ্যে।

আজ হঠাৎ মানুষের মুখের থেকে এই পায়ের গুরুত্বের প্রতি সবচেয়ে বেশী মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল কনি। আজ মুখের সৌন্দর্যের কোন দাম নেই তার কাছে। সে সৌন্দর্য অসত্য এবং ম্লান হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যে। দোকানে বা বিভিন্ন জায়গায় কনি যত মানুষ দেখেছে তাদের মধ্যে অনেকের পা ও উরুদেশ সবল ও সুগঠিত, আবার অনেকের পা ও উরুদেশ কাঠির মত সরু সরু। কিন্তু তাদের তার বাবার মত ইন্দ্রিয়াবেগের বলিষ্ঠতা নেই। আসলে তারা সবাই সাধারণ মানুষ। যেন প্রাণহীন, অস্তিত্বহীন।

কিন্তু কনির মনে হলো নারীর পা বা জানু যাই হোক, তারা প্রাণহীন বা অস্তিত্বহীন দেখায় না পুরুষদের মত।

কনি কিন্তু লণ্ডনে এসে মোটেই খুশি হতে পারল না। এখানকার লোকগুলোকে দেখে কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হলো। তাদের দৃষ্টিগুলো শূন্যতায় ভরা ; কোন প্রাণচঞ্চলতা নেই তাদের মধ্যে। তাদের বাইরে দেখতে বেশ ব্যস্ত আর

সুদর্শন হলেও বেশ বোঝা যায় তাদের মনগুলো জীবন্ত সুখে ভরপুর নয়। কোন সৃষ্টিশীল আশার অভাবে মনগুলো তাদের যেন সব বন্ধ্যা। কনি কিন্তু সব সময় নারীসুলভ এক অন্ধ সুখের আকাঙ্খায় সততচঞ্চল। সব সময় সে শুধু এক বিরামহীন সুখের অবিচ্ছিন্ন আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে চায়।

প্যারিসে এসে সেখানকার মানুষদের মধ্যে কিছুটা ইন্দ্রিয়াবেগ দেখতে পেল। কিন্তু সে ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যে কোন ভালবাসার শক্তি না থাকায় কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাদের। কনির মনে হলো প্যারিস যেন এখন সবচেয়ে বিষণ্ণ নগরী। তাছাড়া সমস্ত শহরটা এক অপরিসীম যান্ত্রিকতা আর কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। শহরের লোকগুলোর ইন্দ্রিয়াবেগের মধ্যেও কৃত্রিমতা ঢুকে গেছে। কৃত্রিমতার সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্লান্তি। টাকার পিছনে ছুটে ছুটে ওরা সবাই ক্লান্ত। ক্লান্তিতে যেন মৃতপ্রায়। আবার ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে আছে ক্রোধ আর অহঙ্কার। কিন্তু ওরা আমেরিকা ও লণ্ডনবাসীদের মত নিজেদের ক্লান্তি কোন কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে ঢাকতে পারে না। উপর থেকে দেখে ওদের মনে হয় ফোটা ফুলের মত সজীব; কিন্তু আসলে ওরা ভীষণভাবে ক্লান্ত। ওদের মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান নেই। ভালবাসার অভাবে ওদের কৃত্রিম প্রাণমন দিনে দিনে নীরস হয়ে যাচ্ছে। আপন ক্লান্তি আর কৃত্রিমতার ভারে ওরা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওরা নয়. সমস্ত জগৎটাই জীর্ণ হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে ধ্বংসাত্মক। এ যেন এক ধরনের অরাজকতা। ক্লিফোর্ড আর তার রক্ষণশীল অরাজকতা। এ অরাজকতা বোধ হয় স্থায়ী হবে। ক্রমান্বয়ে এটা হয়ত পরিণত হবে এক মৌন ও ব্যাপকতম নৈরাশ্যবাদে।

এই জীর্ণ ক্লান্ত জগৎটার কথা ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল কনি। তবে মাঝে মাঝে কতকগুলো জায়গায় গিয়ে আনন্দ পেত সে। সেগুলো হলো বুলভার্ড, বয় আর লুক্সেমবার্গ। সেখানে গিয়ে কিছুটা আনন্দ পেত কনি। কিন্তু আমেরিকান আর ইংরেজদের ভিড়ে ভরে গেছে প্যারিস শহরটা। আমেরিকানরা অদ্ভুত পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়; আবার তার সঙ্গে কিছু বেরসিক ইংরেজও থাকে যাদের বিদেশে বড় বেমানান দেখায়।

এবার ওদের এগিয়ে যাবার পালা। একটার পর একটা করে নতুন নতুন জায়গায় থেকে ভালই লাগছিল কনির। তখন গ্রীষ্ম পড়ে গেছে। আবহাওয়াটা বেশ গরম থাকাতে হিলদা প্যারিস থেকে প্রথমে গেল সুইজারল্যাণ্ডে। পরে সেখান থেকে ব্রেনার ও দোদোকান্তে হয়ে ভেনিসে। এই যাত্রা ও ভ্রমণের ব্যাপারে সব কিছু দায়িত্ব হিলদার। সে বরাবর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হিলদা এতে খুশি। কনি নীরবে এই সব কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছিল। উপভোগ করেছিল। সেও ছিল এতেই খুশি।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সত্যিই বড় আনন্দদায়ক। তবু কনি শুধু আপন মনে মনে বলতে লাগল, কেন আমি এ আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না?

কেন আমি এই সব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি না? এটা ভাবতেও কেমন লাগে। আমি যেন সেই সেণ্ট বার্ণার্ডের মত যিনি লুসার্নের হ্রদে নৌকাভ্রমণ করাকালে হ্রদের সবুজ জল বা তীরবর্তী পাহাড়ের কোন কিছুই লক্ষ্য করেননি। আসল কথা প্রাকৃতিক কোন দৃশ্য আর আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু এ দৃশ্য দেখারই বা কি আছে? কেন আমি তা দেখব? আমি তা দেখতে চাই না।

না, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড বা ইতালিতে দেখার মত কিছুই পেল না কনি। সে শুধু এই সব চোখের দেখা দেখে এসেছে। আর এই সব দেখতে দেখতে তার শুধু মনে হয়েছে র‍্যাগবির থেকে এই সব দৃশ্য বেশী সত্য নয়। সে যদি এই সব জায়গায় আর কখনো না আসে, এই সব দৃশ্য আর কখনো না দেখে জীবনে, তাহলেও কিছু যাবে আসবে না তার। র‍্যাগবি যত ভয়ঙ্করই হোক এই সব কিছুর থেকে অনেক বেশী সত্য।

যদি মানুষদের কথা ধরা যায় তাহলে বলতে হয় সব জায়গারই সব মানুষ প্রায় একই ধরনের। খুঁটিয়ে দেখলে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে পার্থক্য খুবই সামান্য। তারা শুধু কিভাবে তোমার আমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে হয় তা বেশ জানে। আর যদি দেশভ্রমণকারী হয় তাহলে পথের দুপাশের পাথরগুলো পিষে তার থেকে রক্ত বার করার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ কি না নিষ্প্রাণ যত সব পাহাড় আর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো থেকে কোন প্রকারে যদি একটুখানি পুলকের রোমাঞ্চ পাওয়া যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আসলে চারপাশের বস্তুর মধ্যে কোন আনন্দ নেই; আসল আনন্দ আছে মানুষের মনে আর যত সব পথিক আর পরিব্রাজকের দল আপন আত্মার আনন্দই এক সংকল্পিত তৎপরতায় উপভোগ করে যায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

না, আমি তা করব না, পারব না। মনে মনে বলল কনি। তার থেকে আমি বরং র‍্যাগবিতেই ফিরে যাব। সেখানে আর যাই হোক, আমাকে আর কোন কিছু দেখতে বা কোন দিকে তাকাতে হবে না, এই ধরনের এক কৃত্রিম আনন্দের যান্ত্রিক উত্তেজনায় বোকার মত লাফাতে হবে না। নিজেকে নিজে উপভোগ করার এই মিথ্যা সমারোহ আত্ম অবমাননার-ই নামান্তর। মানব জীবনের এক চরম ব্যর্থতারই সামিল।

র‍্যাগবিতেই আবার ফিরে যেতে চাইল কনি। ফিরে যেতে চাইল পঙ্গু ক্লিফোর্ডের কাছে। ক্লিফোর্ড আর যাই হোক, এই সব প্রমোদাভিলাষী ভ্রমণ-কারীদের মত অতখানি নির্বোধ নয়।

কনি কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার সেই মনের মানুষের সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক রেখে চলেছিল। এ সম্পর্ক তার কোনক্রমেই ত্যাগ করা চলবে না। এ সম্পর্কের সূতোটা কোনরকমে একবার ছিন্ন হয়ে গেলেই সে হারিয়ে যাবে এই পৃথিবীতে। এই অমিতব্যয়ী অবিমৃষ্যকারী আনন্দশিকারীদের ভিড়ে হারিয়ে

যাবে সে। আধুনিক জীবনের এও যেন একটা রোগ।

মেস্তারের এক গ্যারেজে ওদের গাড়িটা রেখে স্টীমারে করে ভেনিস রওনা হলো ওরা। হ্রদের জলে ঢেউ দিচ্ছিল। গ্রীষ্মের শেষ বিকেলের রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল ঢেউ খেলানো জলে। জলের ওপারে ভেনিস শহরটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

ঘাটে গিয়ে এক খেয়াপারের লোককে ওরা ওদের গন্তব্যস্থলের ঠিকানাটা দিল। লোকটা দেখতে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু বেশ উৎসাহী। ঠিকানাটা হাতে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভিলা এসমারালদা। ওখানকার এক ভদ্রলোককে আমি প্রায়ই নৌকাভ্রমণে নিয়ে যেতাম। কিন্তু জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূর।

সবুজ গাছপালা আর ধোবাদের বস্তীর মধ্য দিয়ে খালটা চলে গেছে। হিলদা আর কনি সামনের দিকে বসেছিল নৌকোটার। ওদের পিছনে বসেছিল ওদের বাবা।

লোকটা দাঁড় টানতে টানতে সাদায় আর নীলে মেশানো রুমালটা দিয়ে মুখ মুছে বলল, মশাই কি ঐ ভিলাতে বেশী দিন থাকবেন?

হিলদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটালিতে বলল, দিন কুড়িক থাকব। আমরা দুজনেই বিবাহিত মহিলা।

লোকটা বলল, কুড়ি দিন?

একটু থেমে আবার বলল, তাহলে আপনাদের ত একটা নৌকো লাগবে। কুড়ি দিন থাকবেন। রোজ বা সপ্তায় একদিন দুদিন কখন কি লাগবে বলে দেবেন।

হিলদা আর কনি দুজনে ভাবতে লাগল। ভেনিসে থাকতে হলে একটা নিজস্ব নৌকো ভাড়া করে রেখে দেওয়া দরকার। যেমন স্থলপথে একটা গাড়ি দরকার। এখানে জলপথই বেশী।

হিলদারা বলল, ভিলাতে কি আছে?

ভিলাতে একটা মোটর লঞ্চ আর ডিঙ্গি নৌকো আছে। কিন্তু—এই 'কিন্তুর' মানে হলো সেই সব লঞ্চ বা নৌকো পাওয়া যাবে না।

তোমার পারিশ্রমিক কত?

রোজ তিরিশ শিলিং অথবা সপ্তায় দশ পাউণ্ড।

এটাই কি তোমার বাঁধা দর?

না মশায়, আমার বাঁধা রেটের থেকে কম বললাম।

দুই বোনে আবার ভেবে দেখতে লাগল ব্যাপারটা। তারপর বলল, আচ্ছা কাল সকালে এস ওখানে। তখন ঠিক করা যাবে। তোমার নাম কি?

তার নাম জিওভানি। লোকটা জানতে চাইছিল ওখানে গিয়ে কাদের ডাকবে। অর্থাৎ একটা পরিচয়পত্র চায়। হিলদার কাছে কোন তার নামের

কার্ড ছিল না। কনির কাছে একটা ছিল। লোকটা তা নিয়ে পড়তে লাগল, মিলোভি।

কনি বলল, মিলোভি কন্‌তানৎসা।

কথাটার পুনরাবৃত্তি করল লোকটা। তারপর কার্ডটা তার জামার মধ্যে রেখে দিল।

ভিলা এসমারালদা বাড়িটা সত্যিই অনেক দূর। জলের ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা বাড়িটা খুব একটা পুরনো নয়। ভিলাটা হলো বোগিয়ার কাছাকাছি। দূর থেকে বাড়ির ছাদটা দেখা যায়। বাড়ির নিচে চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট বাগান। বড় বড় কালো গুঁড়িওয়ালা গাছে ভর্তি বাগানটা।

ভিলাটার মালিকও স্কটল্যাণ্ডের লোক। মধ্যবয়সী মোটাসোটা চেহারার ভদ্রলোক যুদ্ধের আগে ইটালিতে অনেক সম্পত্তি করে যুদ্ধের সময় দেশপ্রেমে প্রচুর উৎসাহ দেখানোর জন্য নাইট উপাধি পায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীর চেহারাটা রোগা রোগা; কিন্তু চোখে মুখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব। ভদ্রমহিলার নিজস্ব কোন সুখশান্তি নেই। তাকে সব সময় প্রেমঘটিত ব্যাপারে অত্যুৎসাহী উচ্ছৃংখল স্বামীকে চোখে চোখে রাখার এক উদ্বেগের বোঝাকে বয়ে বেড়াতে হয়। কি করে কোন সৌভাগ্যবলে এই স্বামীরত্নকে সে লাভ করল? এতে কি সুখ সে পায়? ভদ্রমহিলার মতে পুরুষগুলো সব মানুষের পোষাকপরা এক একটা কুকুর; কখন কোন মেয়ে এসে তার গায়ে মাথায় হাত বোলাবে, কখন কোন মেয়ের পেটের উপর নিজের পেটটা চেপে জাজ নাচের আসরে নাচবে তার জন্য তারা লালায়িত হয়ে আছে সব সময়।

হিলদাও জাজ নৃত্য ভালবাসত। সেও তার নাচের অংশীদার কোন লোকের পেটে পেট চেপে নাচতে ভালবাসত এবং লোকটা যখন নাচতে নাচতে তার হাত ধরে মেঝের উপর তার গতিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করত তখন তার ভাল লাগত। কনির কিন্তু মনে কোন শান্তি ছিল না। কারণ সে হিলদার মত কোন জাজ নাচের আসরে কোন লোকের পেটে পেট দিয়ে নাচতে পারে না। নাচের আসরের নগ্নপ্রায় মেয়েপুরুষগুলোকে মোটেই ভাল লাগে না তার। স্যার আলেকজাণ্ডার আর লেডি কুপারকেও তার ভাল লাগত না। মাইকেলিস বা অন্য কেউ তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় এটাও সে চায় না।

কনির সবচেয়ে ভাল লাগে সমুদ্র থেকে বাঁধ দিয়ে ঘেরা এই লবণহ্রদের ওপারে গিয়ে কোন এক নির্জন মাঠে গিয়ে হিলদার সঙ্গে স্নান করতে। ওরা যখন নির্জন ঘাটটায় স্নান করে তখন ওদের গণ্ডোলা অর্থাৎ সেই খোয়াড়ী একটু দূরে বসে থাকে।

জিওভানি বিশেষ যত্নের সঙ্গে মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যায়। তাদের আদেশ পালন করে। এর আগেও সে বহু মেয়ের হুকুম তামিল করেছে। তারা চাইলে তাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে রাজী আছে। ও আশা

করেছিল হিলদাদের সঙ্গে কোন পুরুষসঙ্গী না থাকায় ওকে ওরা সঙ্গদানের কথা বলবে। কিছু ভাল উপহার দেবে যাবার সময়। তাছাড়া সে বিয়ে করতে চলেছে এবং সে কথা হিলদাদের জানিয়েছে কথায় কথায় এবং তারাও আগ্রহ সহকারে শুনেছে। তাই সে আশা করে ওরা যাবার সময় কোন কিছু ভাল উপহার দিয়ে যাবে।

আজ যখন হিলদারা লবণহ্রদের ওপারে স্নান করতে যাবার কথা বলে তখন জিওভানি ভাবে নিশ্চয় ওরা তাকে নিয়ে নির্জনে প্রেম করতে যাচ্ছে। তাই সে আর একটা গণ্ডোলাকে ডাকে। কারণ সে ভাবে দুজন মেয়ের জন্য দুজন যুবক দরকার। সে আরো ভেবেছিল বড় বোন হিলদা সব কিছুর ব্যবস্থা করলেও ছোট বোন তাকে সাময়িকভাবে প্রেমিক হিসাবে বেছে নেবে এবং বেশ কিছু টাকা দেবে।

জিওভানি যাকে এনেছিল তার নাম ড্যানিয়েল। তার নৌকোটা বড় এবং সে দেখতেও বেশ ভাল। তার দেহের গড়ন, মাথার চুল, ভাসা ভাসা নীল চোখ, মুখ সব সুন্দর। সে কথা কম বলে। একমনে এমনভাবে নৌকোর দাঁড় বায় যাতে মনে হবে নৌকোয় সে কেবল একা ; অন্য কোন আরোহী নেই। কোন মেয়ের প্রতি তার যেন কোন আগ্রহ নেই। তাকে দেখে কনির মনে হলো সে যেন ঠিক মেলর্সের মত, স্বাধীনচেতা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক পুরুষ যে মেয়েদের কাছে কোন ক্রমেই বিকিয়ে দেয় না নিজেকে। কনির মনে হলো জিওভানির যে স্ত্রী হবে তার জন্য কোন সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করে নেই। কিন্তু ড্যানিয়েলের স্ত্রী যে হবে সে সত্যিই ভাগ্যবতী।

স্নান করে বাড়ি ফিরেই কনি হয়ত ক্লিফোর্ডের একটা চিঠি পাবে। আজকাল ক্লিফোর্ড তাকে প্রায়ই চিঠি লেখে। কিন্তু সে চিঠির ভাষা বইএর লেখ্য ভাষা বলে তার মধ্যে কোন প্রাণ খুঁজে পায় না কনি। কনির সে সব চিঠি মোটেই ভাল লাগে না।

কনি যখন স্নান করতে আসে তখন তার খুব ভাল লাগে। স্নান করে ছায়াচ্ছন্ন তীরে শুয়ে থাকা আর জগতের সব কিছু ভুলে এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া, নৌকোতে করে হ্রদের জলে বেড়ানো—সব মিলিয়ে কনির খুব ভাল লাগছিল। সবচেয়ে তার ভাল লাগল যখন সে তার মধ্যে গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে উঠল। এই সংশয়াতীত নিশ্চয়তা তার ভেনিস-ভ্রমণের সকল আনন্দকে দান করল এক আশ্চর্য পূর্ণতা।

কনিরা যে ভিলাটায় থাকত তাতে আরো অনেকেই ছিল। ওরা ছাড়া সেখানে ছিল আর এক স্কটপরিবার—স্বামীস্ত্রী আর দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে। ইতালির এক বিধবা কাউন্টপত্নী, জর্জিয়ার এক রাজকুমার আর এক ইংরেজ যাজক। স্যার আলেকজাণ্ডার কুপারের কিছুদিন আগে একবার স্ট্রোক হয়। তার পর থেকে অনেকটা শান্ত হন।

দিনগুলো কনির মোটের উপর মন্দ কাটে না। স্যার ম্যালকম আর লেডি কুপার দুজনেই ছবি আঁকেন। লবণহ্রদ আর তার চারপাশের বনপ্রকৃতিই সে ছবির বিষয়বস্তু। দেড়টায় ওরা সবাই মিলে হোটেলে লাঞ্চ খায়। সন্ধ্যের সময় প্রায়ই জাজ বা ককটেল পার্টির আসর থাকে। মাঝে মাঝে মাইকেলিস এসে কনিকে বেড়াতে নিয়ে যায়। বলে, চল আইসক্রীম খেয়ে আসি।

সেদিন স্নান করে এসেই কনি একটা চিঠি পেল ক্লিফোর্ডের। ক্লিফোর্ড লিখেছে, আমাদের এখানেও এখন এক ঘটনায় দারুণ উত্তেজনা চলছে। শোনা যাচ্ছে আমাদের শিকার রক্ষক মেলর্সের পলাতকা স্ত্রী আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মেলর্সের কাছ থেকে কোন অভ্যর্থনা পায়নি। মেলর্স তাকে তাড়িয়ে ঘরে চাবি দিয়ে দেয়। কিন্তু ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তার বিছানায় শুয়ে আছে। মেলর্স তখন তেভারশালে তার মার বাড়িতে চলে যায়। এখনো তার স্ত্রী তার বাসাতেই আছে এবং সেটা তার বাড়ি বলে দাবি করছে।

অবশ্য মেলর্স আমার কাছে এসে কোন কথা বলেনি। এসব আমার বিশ্বস্তসূত্রে শোনা। মিসেস বোল্টনই এসব কথা শোনায় আমাকে। সেই সঙ্গে একথাও বলে যে আমাদের ম্যাডাম আর বন দিয়ে বেড়াতে যাবেন না যদি মেয়েটা মেলর্সের বাসা ছেড়ে না যায়। আমাকে যে ছবিটা পাঠিয়েছ তা আমার ভাল লেগেছে। ছবিটাতে আছে স্যার ম্যালকম সমুদ্রের বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, তার মাথার সাদা ধবধবে চুলগুলো উড়ছে আর সূর্যের আলোয় তার সুন্দর গোলাপী গাত্রত্বক চকচক করছে। আমি দোষ দিচ্ছি না স্যার ম্যালকমকে। মানুষের যত বয়স হয় ততই সে দেহসর্বস্ব হয়ে ওঠে, ততই সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। মানুষ একমাত্র যৌবনেই অমরত্বের আস্বাদ পেতে পারে।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কনি যখন তার প্রমোদভ্রমণের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করছিল সেই সময় এই খবরটা পেয়ে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে সে। সেই ঘৃণ্য মেয়েটা তাহলে আবার এসেছে। তার প্রতি কনির বিরক্তিটা ক্রোধে পরিণত হলো। কিন্তু মেলর্স তাকে কোন চিঠি দেয়নি। অবশ্য তাদের মধ্যে কথা হয়েছিল কনি বাইরে থাকাকালে তাদের কেউ কাউকে চিঠি লিখবে না। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার কথা তাকে জানানো উচিত মেলর্সের। কনি মেলর্সের কাছ থেকে সব কিছু শুনতে চায়। যতই হোক, মেলর্সের সন্তান সে আজ গর্ভে লালন করছে।

কিন্তু কি ঘৃণার কথা। এখন সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। নীচু সমাজের লোকগুলো সত্যিই কত নোংরা। তার থেকে এসব জায়গা কত ভাল। এই নীল নির্মল আকাশ আর উজ্জ্বল সূর্যালোক কত সুন্দর। এর তুলনায় মিডল্যাণ্ডের সেই পরিবেশ কত ঘৃণ্য, কত জঘন্য।

কনি তার গর্ভসঞ্চারের কথাটা কারো কাছে এমন কি হিলদাকেও বলল না। মেলর্সের ব্যাপারে আরো কিছু জানাবার জন্য মিসেস বোল্টনকে একটা চিঠি দিল।

এমন সময় ডানকান ফোর্বে নামে তাদের এক পুরনো শিল্পী বন্ধু ভিলাতে এল রোম থেকে। সে ওদের সঙ্গে নৌকোয় করে বেড়াতে যেতে লাগল।

একদিন মিসেস বোল্টনের একখানি দীর্ঘ চিঠি পেল কনি। মিসেস বোল্টন লিখেছে :

স্যার ক্লিফোর্ডকে দেখে আপনি খুবই খুশি হবেন ম্যাডাম। তাঁর চেহারাটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এবং প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে তিনি কাজকর্ম করছেন। অবশ্য আপনার ফিরে আসার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছেন। আমাদের প্রিয় ম্যাডাম না থাকার জন্য গোটা বাড়িটা নীরস নিরানন্দ ও শূন্য দেখাচ্ছে। আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিকে তাই আমরা বরণ করে নিতে চাই।

মেলর্স সম্বন্ধে স্যার ক্লিফোর্ড আপনাকে কি লিখেছেন তা জানি না। তবে এটা ঠিক যে তার স্ত্রী একদিন হঠাৎ ফিরে আসে তার কাছে। একদিন মেলর্স বন থেকে তার বাসায় এসে দেখে ঘরের বাইরে সিঁড়িতে তার স্ত্রী বসে রয়েছে। তার স্ত্রী বলে সে আবার তার কাছে ফিরে এসেছে, সে তার বৈধ স্ত্রী ; তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। সে আবার তার স্বামীর সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু মেলর্স সে কথা শুনল না। সে ঘরের তালা না খুলে সেখান থেকে চলে যায়। সে ভেবেছিল তার স্ত্রী চলে যাবে ঘরের দরজা খোলা না পেয়ে। কিন্তু রাত্রিবেলায় ফিরে এসে দেখে তার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর ঢুকে মেলর্স দেখে তার স্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছে। তার গায়ে কোন কম্বল নেই। মেলর্স তার স্ত্রীকে কিছু টাকা দিতে চায়। কিন্তু তার স্ত্রী বলে সে টাকা নেবে না, তাকে স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে নিতে হবে। এরপর তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয় অথবা সেখানে কি দৃশ্যের অবতারণা হয় তা আমি বলতে পারব না। মেলর্সের মা আমাকে এই সব কথা বলে। তাকে ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত দেখা যায়। মেলর্স তার মাকে বলে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার থেকে সে মরবে। তাই সে তার বাসা থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে তার মার কাছে তেভারশাল পাহাড়ে বাস করতে চলে যায়। এদিকে তার স্ত্রী বেগার্লিতে তার ভাইএর কাছে সব কথা বলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। পরদিন মেলর্স তার বন্ধু টম ফিলিপকে সঙ্গে করে তার বাসায় গিয়ে তার সব জিনিস তার মার বাসায় বয়ে নিয়ে আসে। ঘর খালি হয়ে যাওয়ায় তার স্ত্রী তখন বেগার্লিতে এক বুড়ী মহিলার কাছে বাস করতে থাকে। কারণ তার ভাইএর বউ তাকে তাদের ঘরে ঢুকতে দেয়নি। তবু এইখানেই ব্যাপারটার শেষ হয়নি। তার স্ত্রী তার মার বাড়িতে প্রায়ই তার খোঁজে যায়। সে নাকি কোন এক উকীলের কাছেও যায়। মেলর্সের কাছে খোরাকপোষাকের দাবি জানায়।

বলে সে তার বৈধ স্বামী।

সে-ই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ সে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে। তার শোবার ঘরে সেণ্ট আর একটা সিগারেটের কৌটো পেয়েছে। ওই অঞ্চলের পিওন নাকি বলেছে সে একদিন সকালে চিঠি বিলি করতে গিয়ে মেলর্সের বাসায় কার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে মেলর্সকে। আমি জানি মেলর্সের কোন দোষ নেই। কিন্তু তার স্ত্রী বাইরে এমনভাবে প্রচার করতে থাকে তার সম্বন্ধে যেন মেলর্স ভয়ঙ্কর রকমের এক দুশ্চরিত্র ও নারীলোলুপ লোক। তার স্ত্রী মেলর্সের থেকে বয়সে বড়। এখন তার গায়ে প্রচুর মেদ জমেছে। এই বয়সে মেয়েদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। তখন ওদের সমাজের অনেক মেয়ে পাগল হয়ে যায়।

চিঠিটা পড়ে একটা নোংরা আঘাত পেল কনি। সে ভাবল এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে একদিন ছিল। ঐ নোংরা জীবনের অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল সে। মেলর্সের উপর দারুণ রাগ হলো কনির। তার স্ত্রী বার্থার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলা উচিত ছিল। এই ধরনের বিয়ে করাটাই তার উচিত হয়নি। আসল কথা কি, নোংরামি আর নীচতার প্রতি একটা সহজাত স্বাভাবিক প্রবণতা ও আসক্তি আছে। ওখান থেকে আসার আগের দিন রাতে সঙ্গমকালে সারারাত ধরে ইতরসুলভ যে জঘন্য নোংরামির পরিচয় দেয় তা হয়ত তার স্ত্রী ঐ নোংরা মেয়েটা বার্থার কাছ থেকেই শেখা। এটা সত্যিই বিতৃষ্ণাজনক। মেলর্সের মত লোকের কবল থেকে নিজেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত করা যায় ততই ভাল। লোকটা সত্যিই অতি সাধারণ, অতি নীচ, নোংরা। তার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল।

সমস্ত ব্যাপারটার প্রতিই এক তীব্র ঘৃণা জেগে উঠল কনির। এখন তার সবচেয়ে ভয় করতে লাগল শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত অপমানজনক যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নীচতা আর নোংরামির প্রতি ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কনি যেন স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক মান সম্ভ্রমের প্রতি লালায়িত হয়ে উঠল সহসা। ক্লিফোর্ড ব্যাপারটা জানতে পারলে কত অপমানের জ্বালাই না সহ্য করতে হবে তাকে। ভাবতে ভাবতে আবেগের মাথায় মনে হলো কনির তার গর্ভস্থ সন্তানের হাত থেকেও মুক্তি পেতে চায় সে। মোট কথা, একদিনের সেই বহুবাঞ্ছিত ব্যাপারটা আজ একান্তভাবে ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত হয়ে উঠল সহসা তার কাছে।

সেণ্টের শিশি সম্বন্ধে তার কথা হচ্ছে এই যে এটা তার নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। তার বোকামির জন্যই মেলর্সের ড্রয়ারে তার সেই আতরের শিশিটা পাওয়া যায়। আসলে সে তার আতরের শিশি থেকে কিছু আতর

নিয়ে মেলর্সের জুতো জামায় দেয়। তারপর শিশিটা তার ড্রয়ারে রেখে দেয়। সে ভেবেছিল ঐ আতরের শিশিটা দেখলেই তাকে মনে পড়বে মেলর্সের। আসলে তার স্মৃতির সুবাস জড়িয়ে থাকবে তার ফেলে আসা আতরের শিশির সঙ্গে। তবে মেলর্সের ঘরে সিগারেটের যে টুকরো পাওয়া গেছে তা হলো হিলদার।

কনি তার নতুন শিল্পীবন্ধু ডানকান ফোর্বেকে বিশ্বাস করে মেলর্সের কথাটা বলল। অবশ্য সে একথা বলল না যে সে তাকে ভালবাসত। সে শুধু বলল, লোকটাকে সে কিছুটা পছন্দ করত। তারপর তার সমগ্র জীবনকাহিনীটা বলল।

সব কিছু শুনে ডানকান বলল, লোকটা তার জাতভাইদের ছেড়ে তার শ্রেণীর লোকদের ছেড়ে একটু স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনভাবে থাকতে চেয়েছিল। কোন দোষ করেনি। কিন্তু এই জন্যই ওর শ্রেণী ও সমাজের লোকেরাই ওকে টেনে নামিয়ে আনবে। দেখবে ওকে একদিন নামিয়ে আনবে।

কনির মনের মাঝে বইতে থাকা ঘৃণার স্রোতটা হঠাৎ বিপরীত মুখে বইতে থাকল। কি করেছে লোকটা ? কনির কি ক্ষতি সে করেছে ? সে শুধু কনিকে এক চরম যৌনানন্দ দান করেছে এবং তার বহুদিনের অবরুদ্ধ যৌনাবেগকে এক উত্তপ্ত মুক্তি দান করেছে। এই জন্যই কি ওরা তাকে তার আত্মমর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে আনবে ?

না না, কখনই তা হতে পারবে না। লোকটার এক নগ্ন প্রতিমূর্তি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। লোকটা যেন তার ধবধবে সাদা দেহগাত্র আর তামাটে রঙের হাত আর মুখ নিয়ে মাথাটা নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে তার উত্থিত পুরুষাঙ্গকে সম্বোধন করে কি সব বলছে। লোকটার কণ্ঠস্বর কনি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। লোকটা যেন সেদিনকার মত বলছে, এমন যোনিদেশ খুব কম মেয়েরই আছে। কনির মনে হলো লোকটার একটা হাত তার তলপেট, পাছা থেকে শুরু করে গোপনাঙ্গের সমস্ত প্রদেশ জুড়ে এক মেদুর মদিরতায় সঞ্চালিত হচ্ছে। সহসা এক দুরন্ত উত্তাপের ঢেউ তার দুই জানুর মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে তার গর্ভদেশের গভীর পর্যন্ত বয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে মনে মনে বলতে লাগল, না, আমি আর তার কাছে যাব না। ফিরে যাব না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলল, আমি তাকে ছাড়ব না, তার কাছে যা পেয়েছি আমি তা এই সব কিছু সত্ত্বেও ভুলব না। যে মধুর উত্তাপ আমার জীবন এতদিন পায়নি সে উত্তাপ একমাত্র সেই দেয় আমাকে।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কনি মিসেস বোল্টনকে একটা চিঠি লিখল। সেই সঙ্গে মেলর্সকে একটা চিঠি লিখে মিসেস বোল্টনকে সেটা তার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করল। কনি মেলর্সকে লিখল :

তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আমি তা সব শুনে বিশেষ

দুঃখিত হয়েছি। তবে কিছু মনে করো না। এটা তার সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। এ উত্তেজনা হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়। তবে আমি সত্যিই দুঃখিত এ ব্যাপারে। আশা করি এ নিয়ে তুমি খুব একটা চিন্তা করবে না। মেয়েটা মানসিক রোগগ্রস্ত। সে তোমাকে অকারণে আঘাত দিতে চায়। দিন দশেকের মধ্যেই আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিন কতক পরেই ক্লিফোর্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। সে লিখেছে, তুমি আগামী ষোল তারিখে ভেনিস ত্যাগ করছ শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু এই প্রমোদভ্রমণ যদি সত্যি সত্যিই সুখকর ও আনন্দদায়ক হয় তোমার পক্ষে তাহলে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমরা তোমার অভাব অনুভব করছি, সমস্ত র‍্যাগবি তোমাকে চাইছে এটা ঠিক, কিন্তু ওখানকার পর্যাপ্ত সূর্যালোকের সবটুকু আশ মিটিয়ে উপভোগ করা উচিত। যদি তুমি সত্যি সত্যিই আনন্দ পাও ওখানে তাহলে আরো কিছুদিন থেকে যাও, ওখানকার ভয়ঙ্কর শীত কাটাবার জন্য উপযুক্ত প্রাণশক্তি সঞ্চয় করো।

মিসেস বোল্টন আমাকে এক আশ্চর্য তৎপরতা ও মনোযোগের সঙ্গে দেখাশোনা করে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি মানুষ কী আশ্চর্য ও অদ্ভুত জীব। কখনো মনে হয় কোন কোন মানুষের আছে একশোটা পা আর কোন কোন মানুষের আছে ছটা পা। মানুষের কাছে যে সংগতি আর আত্মমর্যাদা আশা করা হয় আসলে তার কোন অর্থ নেই।

শিকার রক্ষকের ব্যাপারটা নিয়ে যে লোকনিন্দার গুঞ্জন উঠেছে তা ক্রমশই বরফের জলের মত গড়িয়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে। মিসেস বোল্টনের কাছ থেকে আমি সব কিছু শুনতে পাই। মিসেস বোল্টন আমাকে এক ধরনের মাছের কথা বলে যারা নিজেরা কোন কথা বলতে পারে না; কিন্তু নীরবে গুজব ছড়ায়। আর পাঁচজনের জীবনের ঘটনা থেকে বাঁচার উপজীব্য গ্রহণ করে চলে।

মিসেস বোল্টন এখন মেলর্সের কুৎসা রটনার কাজে প্রচুর ব্যস্ত। আমি যদি একবার তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করি, একবার যদি সে শুরু করে এ বিষয়ে কোন কথা বলতে থাকে তাহলে আর রক্ষা নেই, সে এ ঘটনার গভীরে নিয়ে যাবে আমাকে। তার যত কিছু ঘৃণা আর ক্রোধ হলো মেলর্সের স্ত্রীর উপর। ওর নাম নাকি বার্থা কাউটস। ওদের নোংরা জীবনকাহিনীর ক্লেদাক্ত আবর্তের গভীরে আমি যেন ডুবে যাই, তলিয়ে যাই। তারপর সে কাহিনী শেষ হয়ে গেলে আমি পৃথিবীপৃষ্ঠের আলো হাওয়ায় উঠে আসি, উজ্জ্বল দিবালোকের দিকে যখন তাকাই তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তখন বড় আশ্চর্য বোধ হয়।

এক সময় একটা কথা আমার কাছে খাঁটি সত্যি বলে মনে হয়। মনে হয়, আমরা যেটাকে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ বলি আসলে সেটা যেন এক মহাসমুদ্রের তলদেশ। আমাদের চারপাশের গাছপালা সব হলো জলজ আগাছা আর পৃথিবীর মানুষগুলো হচ্ছে মাছ। আমরা যাকে বাতাস বলি তার থেকে শ্বাস গ্রহণ করি আসলে সেটা হলো জল। এই অনন্ত গভীর জলরাশির বহু ঊর্ধ্বে আছে প্রকৃত বাতাস। নির্মল বাতাস।

মাঝে মাঝে আমাদের আত্মা এই জীবন সমুদ্রের অনন্তগভীর জলতল ভেদ করে আবেগের সঙ্গে ঊর্ধ্বে আলো হাওয়ায় উঠে গিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। এটাই আমাদের ভাগ্য। এই হচ্ছে বিধির বিধান—আমাদের এই জলজীবন যাপন করে যেতে হবে। জলান্তরালবর্তী এই পিচ্ছিল মৎসজীবনের কুটিল অরণ্য থেকে বহু ঊর্ধ্বে অনন্ত আলোহাওয়ার চির-উজ্জ্বল রাজ্যে উঠে যাওয়াই হলো প্রতিটি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পারাটাই হলো অমরত্ব অর্জন। মানবাত্মার এই আলোকোজ্জ্বল উৎক্রমণই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ।

আমি যখন এ ব্যাপারে মিসেস বোল্টনের মুখ থেকে ওদের নোংরা জীবনের যত সব কথা আর কাহিনী শুনি তখন তরল ও পিচ্ছিল মানবজীবনের এই মৎস-সুলভ স্বভাবের এক ক্লেদাক্ত গভীরে ডুবে যাই আমি। দেহগত ক্ষুধার নিরন্তর তাড়নায় প্রতিটি মানুষ মাছের মত শিকারের সন্ধানে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আলো হাওয়াহীন এই তরল গভীরতা আর গোপন অন্ধকার থেকে আলো হাওয়ার রাজ্যে, এই অতল অন্তহীন জল থেকে স্থলভাগে যাওয়াই সব মানুষের সাধনার শেষ লক্ষ্য। কিন্তু মিসেস বোল্টনের সাধনা হলো এই মৎস্য-সুলভ জলজীবনের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া। উপরে উঠতে চায় না, শুধু নিচে তলিয়ে যেতে নেমে যেতে চায় মিসেস বোল্টন।

আমার ভয় হচ্ছে আমাদের শিকার রক্ষককে হয়ত হারাতে হবে। ব্যাপারটা কমার পরিবর্তে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যত পারছে মেলর্সের বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোলিয়ারির অন্য সব মেয়েদের হাত করেছে মেলর্সের স্ত্রী। সারা গ্রাম এখন এই সব কুৎসিত কথাবার্তায় মুখর।

আমি শুনলাম মেলর্সের স্ত্রী বার্থা কাউটস নাকি একদিন মেলর্সের মার বাড়ি আক্রমণ ও অবরোধ করে। বাড়ির ভিতর ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। ওদের মেয়েটা স্কুল থেকে তখন আসছিল। মেয়েটাকে তার মা নিতে যায়। কিন্তু মেয়েটা তার মার হাত কামড়ে দেয়। তখন তার মা তার গালে এক চড় বসিয়ে দেয় এবং মেয়েটা পথের উপর ঘুরে পড়ে যায়। তখন তার ঠাকুরমা কোনরকমে তাকে উদ্ধার করে।

মেলর্সের স্ত্রী অর্থাৎ বার্থা কাউটস নামে মেয়েটি কুৎসার এক বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। ওদের দাম্পত্য জীবনের এমন সব গোপন খুঁটিনাটির কথা বাইরে বলে বেড়াচ্ছে যা একমাত্র বিবাহিত নরনারীই জানে এবং যা

সাধারণতঃ এক নিরুচ্চার গোপনতার সলাজ গভীরে সযত্নে সমাহিত থাকে। দশ বছর পর আজ ওদের দাম্পত্য জীবনের গোপন কথাগুলো বলে বেড়াচ্ছে। আমি এসব কথা লিনলে এবং ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছি। এসব কথাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু নেই। তবু যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন অদ্ভুত অস্বাভাবিক ধরনের আসন বা ভঙ্গির প্রতি সব মানুষেরই একটা কৌতূহল থাকে। কোন লোক যদি যৌনক্রিয়ার সময় তার স্ত্রীর উপর এই সব অদ্ভুত আসন বা ভঙ্গি প্রয়োগ করে তাহলে সেটা তার রুচির কথা। কিন্তু আমাদের শিকার রক্ষককে এতদিন দেখে আমি ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি যে ও এত সব কলাকৌশল জানে। যাই হোক, এটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে বাইরের কারো নাক গলাবার কোন অধিকার নেই।

আমার মত এ সব কথা সবাই শুনেছে। আজ দশ বারো বছর আগে সমাজে সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা শালীনতাবোধ ছিল। তখনকার দিনে এ রকম কোন ব্যাপার ঘটলে লোকে জোর করে ব্যাপারটার মধ্যে ছেদ টেনে দিত। জোর করে চেপে দিত সব। কিন্তু গাঁয়ের প্রতি ছেলে বুড়ো সকলেই এটা প্রকাশ্যে আলোচনা করছে। সকলেই মজা দেখে যাচ্ছে। আজকাল মনে হয় তেভারশাল গাঁয়ের প্রতিটি কুমারী মেয়েই এক একটা জোয়ান অফ আর্ক। কিন্তু মেলর্সকে দেখে মনে হয় ভয়ঙ্কর এক নরঘাতক।

কাজকর্মের ব্যাপারে মেলর্সের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকে দেখা করতে হয়েছিল। বনের সীমানা থেকে তার স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এমত অবস্থায় কিভাবে সে তার কাজকর্ম করে যাবে তা আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্য সে আগের মতই কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাকে যে যাই বলুক সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, এই ধরনের একটা ভাব। তবু আমি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন এমনই একটা কুকুর যার লেজের সঙ্গে একটা খালি টিন বাঁধা আছে। ও অবশ্য সম্পূর্ণ মুক্ত এমনি একটা ভাব দেখায়। মেলর্স তেভারশাল গাঁয়ের ভিতর কোন কারণে একবার গেলেই ওর পিছনে যত সব গাঁয়ের ছেলেদের লেলিয়ে দেয় বার্থা। ওর অবস্থা এখন স্পেনের কাহিনীকাব্যের নায়ক ডন রোভারিগোর মত।

আমি একদিন মেলর্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার কাজকর্ম ঠিকমত করতে পারবে কি না। সে তার উত্তরে বলল সে কোনদিন তার কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে বলে মনে হয় না। আমি তখন বললাম তোমার বাসায় যখন তখন একটা মেয়ে আসবে এটা ঠিক নয়। সে তখন বলল, সে কোনক্রমেই মেয়েটাকে আটকাতে পারে না। আমি তখন তার বিরুদ্ধে যে সব কুৎসিত রটানো হয়েছে তার একটা আভাস বা ইংগিত দিলাম। ও তখন বলল, গাঁয়ের লোকেরা পরের নিন্দে শুনতে যেমন ভালবাসে পরের ভাল তেমন শুনতে বা সহ্য করতে পারে না।

তার কথাবলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। অবশ্য সে যা বলল তা সত্য।

কিন্তু সে যাই বলুক, তার বিরুদ্ধে প্রচারিত ব্যাপক লোকনিন্দার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। গাঁয়ের যাজক ও সব বিশিষ্ট লোকদের অভিমত এই যে মেলর্সের উচিত এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

আমি একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তার বাসায় মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করত একথা ঠিক কি না। সে তখন আমাকে প্রশ্ন করল এ কথায় আপনার কি দরকার স্যার ক্লিফোর্ড ?

সে আরো বলল, লোকে যদি বদনাম দেব মনে করে তাহলে আমার মেয়ে-কুকুর ফ্লসির নামেও বদনাম রটাতে পারে।

তার বেয়াদবি সত্যিই অসহ্য আমার পক্ষে।

আমি তাকে বললাম অন্য কোথাও একটা কাজ খুঁজে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে কি না। সে তখন বলল, আপনি যদি আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে চান ত সহজেই সেটা পারেন।

অর্থাৎ চাকরি থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করল না মেলর্স। আমি তাকে বললাম, আমার ভূসম্পত্তির সীমানার মধ্যে কোন অপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দিতে চাই না আমি।

ঠিক হলো, সে পরের সপ্তার শেষের দিকে চলে যাবে এখান থেকে ওর চাকরি ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জো চেম্বারস নামে এক যুবককে ওর পদে বহাল করার ব্যাপারে রাজী হলো ও। আমি বললাম, ওকে আমি একমাসের মাইনে বাড়তি দেব। ও বলল, রেখে দিন, পরে ক্ষেত্রবিশেষে ও টাকার সদ্ব্যবহার করবেন।

আমি এ কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, সে কোন বাড়তি কাজ করেনি ; সুতরাং বাড়তি মাইনের টাকা সে নিতে পারবে না।

যাই হোক, ব্যাপারটার এইখানেই নিস্পত্তি হলো। মেয়েটা এখান থেকে চলে গেছে। সে তেভারশাল গাঁয়ে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। শোনা গেছে মেয়েটা নাকি জেলকে খুব ভয় করে। মেলর্স আগামী সপ্তার শনিবার চলে যাবে। সুতরাং আমাদের জায়গাটা আবার শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে কনি, প্রিয়তম আমার, যদি তোমার ভাল লাগে এবং যদি তুমি আগস্টের প্রথম পর্যন্ত ভেনিস অথবা সুইজারল্যাণ্ডে কাটাতে পার তাহলে খুব ভাল হয়। আমি তাহলে খুব খুশি হব। তাহলে তোমাকে এখানে এসে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার যত সব নোংরা কলগুঞ্জন আর শুনতে হবে না। সে কলগুঞ্জন এ মাসের শেষের দিকেই স্তব্ধ হয়ে যাবে একেবারে।

তাহলে তুমি বুঝতে পারছ, আমরা হচ্ছি সব গভীর জলের জলজ জন্তু। আমাদের মধ্যে এক একটা জন্তু মাঝে মাঝে যখন কাদা ঘেঁটে বেড়ায় তখন সকলের মাঝে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আমাদের তখন দার্শনিকের মত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে ব্যাপারটা উপেক্ষার চোখে দেখা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

ক্লিফোর্ডের চিঠিখানার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন রাগ ছিল আর ছিল সহানুভূতির এক শোচনীয় অভাব। কনি এর অর্থ ভাল করে বুঝতে পারল মেলর্সের কাছ থেকে আসা এক চিঠিতে। মেলর্স লিখেছে:

থলে থেকে অন্য বিড়ালদের সঙ্গে বিড়াল পালিয়ে গেছে। তুমি হয়ত শুনেছ আমার স্ত্রী বার্থা আমার কাছে ফিরে এসেছিল। কিন্তু কোন ভালবাসা আমার কাছে পায়নি। সে আমার বাসাতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখান থেকে সন্দেহের কিছু উপকরণ পায়। সে পায় একটা সেন্টের শিশি। সে আমার শোবার ঘরে আমাদের বিয়ের ছবি পোড়ানোর প্রমাণ পায়। এতে রেগে গিয়ে দারুণ হৈ চৈ করে বেড়ায়। ফটোর ভাঙ্গা কাঁচ দেখতে পায়। একদিন হঠাৎ সে কুঁড়েটাতে চলে যায়। ঘরটার মধ্যে সে তোমার একখানা বই পায়। তাতে তোমার নাম সই করা ছিল। প্রথম পাতাতেই লেখা ছিল কনস্‌ট্যান্স স্টাউয়ার্ট রীড। এর পর সে বলে বেড়াতে থাকে আমার প্রেমিকা লেডি চ্যাটার্লি ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে গাঁয়ের রেকটর আর স্যার ক্লিফোর্ডের কানে কথাটা যায়। তাঁরা তখন আইনসম্মত ব্যবস্থা নেন বার্থার বিরুদ্ধে। বার্থা পুলিশের ভয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্যার ক্লিফোর্ড এর পর ডেকে পাঠান আমাকে। আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি নানারকমের কথা বলতে থাকেন। তাঁর কথা শুনে বোঝা যায় তিনি আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। শেষে তিনি বললেন, আমার মনিবপত্নীর নামও জড়িয়ে পড়েছে এই কুৎসিত ঘটনার সঙ্গে একথা আমি জানি কিনা। আমি বললাম, আমার ঘরে একটা ক্যালেণ্ডারে রাণী মেরীর ছবি আছে। তাহলে কি বলতে হবে রাণী মেরী আমার অঙ্কশায়িনী হয়েছেন? আমার বক্রোক্তির অর্থ উনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি নাকি আমার প্যাণ্টের বোতাম খুলে সব সময় বেড়াচ্ছি। আমি তখন তাঁকে শুনিয়ে দিলাম তার বোতাম খোলার মত কিছু নেই। এজন্য তিনি আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। আমি এখান থেকে চিরদিনের মত তাই আগামী শনিবার চলে যাচ্ছি। আর কখনো এ মুখে আসব না আমি।

আমি আপাততঃ লণ্ডন যাচ্ছি। আমার বাড়িওয়ালী হলেন মিসেস ইঙ্গার। ঠিকানা ১৭ কোনবার্গ স্কোয়ার। তিনি আমায় একটা ঘর দেবেন তাঁর বাড়িতে অথবা যোগাড় করে দেবেন অন্য কোথাও।

তোমার পাপকর্ম একদিন প্রকাশিত হবেই। বিশেষ করে তুমি যদি

আমায় বিয়ে করো। মনে রেখো তার নাম বার্থা।

এত কথা লিখলেও মেলর্স কিন্তু কনির সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি। এতে রাগ হলো কনির। সে কিছু সান্ত্বনা বা আশ্বাসের কথা লিখতে পারত। তা না করে সে আমায় মুক্তি দিয়েছে আমি যাতে আমার ইচ্ছামত র‍্যাগবিতে ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে যেতে পারি। এতে রাগ হলো কনির। এত উদারতা ও বীরত্ব দেখাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কনি চায় সে ক্লিফোর্ডের মুখের উপর বলতে পারত, হ্যাঁ আমি তাকে ভালবাসি। সে আমার প্রেমিকা এবং এতে আমি গর্বিত। কিন্তু তার সাহস এতদূর এগোতে পারেনি।

তাহলে তার নামও তেভারশালের বস্তীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ভুলে যাবে সব।

কনি খুব রেগে গেল। এক জটিল ক্রোধজালে মনটা তার এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল যে কোন কাজ করতে ইচ্ছা হলো না। বিকল হয়ে উঠল তার সমস্ত দেহমন। কি করবে কি বলবে কিছুই খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল হতবুদ্ধি হয়ে। তবে ডানকান ফোর্বেকে নিয়ে ভেনিসের লবণহ্রদে গিয়ে স্নান করল। গল্প করে ও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা কাটিয়ে দিল। ডানকান আজ হতে দশ বছর আগে একবার ভালবেসেছিল তাকে। দুজনের মধ্যে তখন ভালবাসা হয়। পরে ছাড়াছাড়ি হয়। দীর্ঘ দশ বছর দেখা নেই। পরে আবার দেখা। আবার ভালবাসা শুরু করল ডানকান। কিন্তু কনি বলল সে পুরুষদের কাছ থেকে একটা জিনিসই চায়। তা হলো তাদের কাছ থেকে দূরে একা একা থাকতে। ডানকানও কোনরকম জোর করল না। এমন আলতো হালকাভাবে কনিকে ভালবেসে যেতে লাগল সে যাতে কোনরূপ বিব্রতবোধ না করে কনি।

একদিন ডানকান কনিকে বলল, জান সব মানুষ কত বড় উদাসীন। কেউ কারো কোন খবর রাখে না। তোমরা ড্যানিয়েলকে দেখছ। দেখতে কত সুন্দর ও। কিন্তু তোমরা কেউ জান না ও বিবাহিত এবং ওর ছেলে পরিবার আছে।

কনি বলল, ওকে শুধিয়ে দেখ।

ডানকান তাকে জিজ্ঞাসা করলে ড্যানিয়েল বলল, সে বিবাহিত। বাড়িতে তার স্ত্রী আর দুটি পুত্রসন্তান আছে। একটির বয়স নয় আর একটির বয়স সাত। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই।

কনি বলল, যারা একা একা থাকতে ভালবাসে, যারা আত্মস্থ তারাই মানুষকে ভালবাসতে পারে, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারে। বেশীর ভাগ লোকই জিওভানির মত নরনারীর কাছে কাছে থাকতে ভালবাসে। কনি মনে মনে ডানকানকেও জিওভানির দলে টানল।

অধ্যায় ১৮

কনিকে মনস্থির করে ফেলতেই হলো অবশেষে। সব ঠিক করে ফেলল কনি। আর দিন ছয় পরে সে ভেনিস ছেড়ে চলে যাবে। ও যেদিন ভেনিস ছাড়বে সেইদিন অর্থাৎ শনিবার মেলর্সও র‍্যাগবি ছেড়ে চলে যাবে। এর পর সোমবার লণ্ডনে পৌছবে সে। তারপর মেলর্সের সঙ্গে তার দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবে। মেলর্সকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল সে যেন হার্টল্যাণ্ড হোটেলে এ চিঠির উত্তর পাঠায় এবং সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় তার সঙ্গে দেখা করে।

এসব কথা লিখে চিঠি দিলেও মনের ভিতরের রাগটা তখনো যায়নি কনির। সে হিলদাকে বিশ্বাস করে কোন কথা বলল না। তার সঙ্গে কনি ভাল করে কথা না বলায় হিলদা এখন অন্য এক ওলন্দাজ মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করছে। মেয়েতে মেয়েতে এই ধরনের মেলামেশা পছন্দ করে না কনি। কিন্তু হিলদা ভালবাসে এই সব।

স্যার ম্যালকম কনির সঙ্গে যেতে চাইলেন। ডানকান যাবে হিলদার সঙ্গে। ডানকান ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে আসন সংরক্ষণ করল। কনির তা ইচ্ছা ছিল না। তবু এতে তাড়াতাড়ি প্যারিস যাওয়া যাবে।

স্যার ম্যালকম কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবার সময় একটা অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি বাইরেই ভাল থাকেন। প্রথম স্ত্রীর আমল থেকেই তিনি তাঁর এই স্বভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে এক শিকারের আয়োজন করা হয়েছে। তাই শিকারে তাঁর কৃতিত্ব দেখানোর জন্য তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে।

সেদিন কনি তার রোদেপোড়া সুন্দর মুখখানা নিয়ে নীরবে বসে ছিল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে কোন হুঁস ছিল না তার।

কনির মনমরা ভাব দেখে তার বাবা বললেন, র‍্যাগবিতে ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বোধহয় কিছুটা ?

তার বাবার চোখে চোখ রেখে তার বাবাকে চমকে দিয়ে কনি হঠাৎ বলে উঠল, আমি র‍্যাগবিতে ফিরে যাব কিনা তারই ঠিক নেই।

তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে এই ধরনের এক বিপন্ন ভাব দেখা দিল স্যার ম্যালকমের মুখের উপর।

স্যার ম্যালকম বললেন, তুমি কি বলতে চাও প্যারিসে কিছুদিন থেকে যাবে ?

না, আমি বলতে চাই আমি আর কখনই র‍্যাগবিতে ফিরে যাব না।

স্যার ম্যালকম সব সময় নিজের ব্যক্তিজীবন নিয়ে জর্জরিত। তাই তিনি

নতুন করে কনির কোন সমস্যা ঘাড়ে নিতে চাইছিলেন না। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত কেন নিলে ?

আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি।

এই প্রথম একথা এক জীবন্ত মানুষের সামনে উচ্চারণ করল কনি। একথা ঘোষণা যেন তার জীবনের এক বিচ্ছেদকে সূচিত করছে।

তার বাবা বললেন, কেমন করে বুঝলে ?

কনি মৃদু হেসে বলল, কেমন করে আবার বুঝব ?

তবে ক্লিফোর্ডের ঔরসজাত সন্তান নয় নিশ্চয়।

না, অন্য লোকের।

তার বাবাকে বিব্রত করে মনে মনে আনন্দ পাচ্ছিল কনি।

স্যার ম্যালকম বললেন, লোকটার পরিচয় জানতে পারি কি ?

না, তুমি তাকে চিনবে না। কখনো দেখনি তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

তোমার পরিকল্পনা কি তাহলে ? কি করতে চাও তুমি ?

তা জানি না। সেইটাই হলো সমস্যা।

ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না তুমি ?

কনি বলল, ক্লিফোর্ড এ সন্তানকে গ্রহণ করবে। সে আমাকে এর আগে বলেছিল আমি যদি সুবিবেচনা সহকারে কারো সন্তান গ্রহণ করি তাহলে সে কিছু মনে করবে না।

এমন অবস্থায় সে মানুষের মতই কথা বলেছে। আমার মনে হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ত কোন সমস্যাই নেই।

কনি বলল, কোন দিক থেকে কোন সমস্যা নেই ?

কনি তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মতই তার বাবার চোখদুটো নীল ; কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক ভাসা ভাসা অস্বস্তি।

সে দৃষ্টির অস্বস্তি কখনো কোন দুরন্ত বালকের মত চঞ্চল, আবার কখনো অতৃপ্ত স্বার্থের এক অবদমিত ক্রোধাবেগে বিক্ষুব্ধ। • কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা শান্ত মনে হচ্ছিল।

স্যার ম্যালকম বললেন, তুমি ক্লিফোর্ড ও চ্যাটার্লি পরিবারকে এক উত্তরাধিকারী উপহার দিতে পার। উপহার দিতে পার এক ছোট্ট ব্যারণ।

স্যার ম্যালকম একটুখানি হাসলেন। তাঁর সে হাসিতে কিছুটা ছিল এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসিকতার ভাব।

কনি জবাব দিল, আমি তা চাই বলে মনে হয় না।

ক্লিফোর্ডের প্রতি এক টান অনুভব করে স্যার ম্যালকম বললেন, কেন নয় ? এ বিষয়ে আমার আসল কথাটা হলো এই যে জগৎ চিরকাল এগিয়ে চলবে। র‍্যাগবিও দাঁড়িয়ে থাকবে। বাইরের দিক থেকে এই জগৎ সংসার একেবারে

স্থির। তার সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়। বাইরের সব কিছুই স্থির থাকে ; পরিবর্তন হয় শুধু আমাদের আবেগ আর অনুভূতির। তুমি এ বছর একজনকে পছন্দ করতে পার, আবার পরের বছর আর একজনকে। কিন্তু র‍্যাগবি ঠিক অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। র‍্যাগবি তোমাকে যতখানি চাইবে তুমিও র‍্যাগবিকে ততখানি চাইবে। তারপর বাইরে তুমি আনন্দ করে বেড়াতে পার। কিন্তু তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে কোন লাভই হবে না তোমার। অবশ্য ইচ্ছা করলেই তুমি সব ছিন্ন করে দিতে পার। তোমার নিজস্ব আয় আছে যাতে তোমার সারাজীবন ভালভাবেই চলে যাবে। কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে র‍্যাগবিকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। দেখবে তাতে আনন্দ আছে।

কথাগুলো বলে স্যার ম্যালকম আবার হাসলেন। কনি কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্যার ম্যালকম বললেন, অবশেষে তাহলে তুমি এক প্রকৃত মানুষ খুঁজে পেয়েছ।

কনি বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। সেইখানেই সমস্যা। এ রকম লোক বেশী পাওয়া যায় না। চিন্তান্বিতভাবে স্যার ম্যালকম বললেন, না, সত্যিই তা নেই। তবে সে সত্যিই ভাগ্যবান তোমার দিক থেকে দেখতে গেলে। নিশ্চয় সে তোমাকে কোন কষ্ট দেবে না।

না, মোটেই না। সে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই চলতে দেয়।

ভাল, ভাল, খুব ভাল। যে মানুষের মত মানুষ হবে সে অবশ্যই তা করবে।

একথা শুনে খুশি হলেন স্যার ম্যালকম। কনি তাঁর বেশী প্রিয়। তার মধ্যে নারীসত্তার যে ধাতু তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর একান্ত মনোমত ; হিলদা হয়েছে অনেকটা তার মার মত। ক্লিফোর্ডের তা কখনই পছন্দ হত না। সুতরাং খুশি হলেন স্যার ম্যালকম। তাঁর প্রিয় কন্যার সন্তানসম্ভাবনায় সুখী হলেন তিনি বিশেষভাবে।

কনিকে নিয়ে তিনি মোটরে করে হার্টল্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে উঠলেন। কনি সেখানে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলে স্যার ম্যালকম তাঁর ক্লাবে চলে গেলেন সন্ধ্যের সময়। কনি তাঁর সঙ্গে গেল না।

মেলর্সের একখানা চিঠি পেল কনি। সে লিখেছে, আমি তোমার হোটেলে যাব না। তবে ঠিক সাতটায় এ্যাডাম স্ট্রীটের গোল্ডেন ককে অপেক্ষা করব।

কালো রঙের একটা প্যান্ট পরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল মেলর্স। তাকে বেশ লম্বা আর রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। কনি দেখল, মেলর্সকে ঠিক তাদের সমাজের লোকদের মত অতটা মার্জিত না দেখালেও তার একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব আছে যেটাকে তাদের সমাজের লোকদের থেকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।

মেলর্স বলল, তাহলে তুমি এসেছ। তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে!

হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তা দেখাচ্ছে না।

কনি উদ্বেগের সঙ্গে মেলর্সের মুখপানে তাকাল। তার মুখখানা আগের থেকে কত রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। তার মুখের হাড় চোয়াল বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল এক মিষ্টি হাসি যা দেখে আশ্বস্ত হলো কনি। নিজের চেহারাটাকে লোভনীয় করে তোলার জন্য আর কোন চেষ্টা করতে হবে না তাকে। মেলর্সের দেহটাকে যতই দেখতে লাগল কনি ততই মনের ভিতর একটা আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগল। নারীমনের সহজ স্বাভাবিক সুখপিপাসা তৃপ্ত হওয়ায় মনে মনে বলে উঠল কনি, 'ও যতক্ষণ আমার কাছে থাকে আমি বেশ সুখে থাকি।' তার মনে হলো সুন্দরী সমুদ্র-বর্তিনী ভেনিসের পর্যাপ্ত সূর্যালোক তার সারা অন্তর জুড়ে ঢেউ খেলে যাওয়া এই তৃপ্তি আর আনন্দকে এতখানি প্রসারতা দান করতে পারেনি।

একটা টেবিলের দুদিকে দুজনে বসেছিল। কনি জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি খুব খারাপ লাগছিল?

মেলর্সকে সত্যিই রোগা দেখাচ্ছিল। তার হাতদুটো আলগাভাবে ছড়ানো ছিল দুপাশে ঠিক ঘুমন্ত লোকের মত। হাতদুটো টেনে নিয়ে চুম্বন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কনির। কিন্তু সাহস পেল না তা করতে।

মেলর্স বলল, সাধারণ লোক সব সময়ই ভয়ঙ্কর।

তোমার মনে কি খুব কষ্ট হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল এবং একথা মনে পড়লেই চিরকাল কষ্ট হবে আমার।

কনি বলল, তোমার অবস্থাটা কি লেজে টিনবাঁধা কুকুরেব মত হয়েছিল? ক্লিফোর্ড তোমাকে ত তাই বলেছিল?

মেলর্স বিরক্তির সঙ্গে কনির পানে তাকাল। কনির একথাটা নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার অহংবোধে আঘাত লাগে।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই হয়েছিল।

মোটেই কোন অপমান সইতে পারে না মেলর্স। কোন অপমানের আঘাত পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাগে আগুন হয়ে ওঠে। এক তিক্ততার জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকল। তারপর কনি বলল, তুমি আমার অভাবটা অনুভব করেছিলে?

তুমি তখন ওখানে না থাকায় আমি খুশিই হয়েছিলাম।

আবার চুপ হয়ে গেল দুজনে। কনি বলল, তোমার আমার এই সম্পর্কের কথাটা কি লোকে বিশ্বাস করে?

আমার ত তা মনে হয় না।

ক্লিফোর্ড তা বিশ্বাস করে?

আমি জানি না। ক্লিফোর্ড এ বিষয়ে ভাল করে চিন্তাভাবনা না করেই আমাকে ছাড়িয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয়। সে দেখতে চায় এ বিষয়ে আমি শেষ পর্যন্ত কত দূর গড়াই।

আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি।

সহসা মেলর্সের মুখ থেকে সব আলো মুছে গেল নিঃশেষে। সব অন্ধকার হয়ে উঠল সহসা। আর তার সেই অন্ধকার মুখখানা নিয়ে এমনভাবে তাকাল কনির দিকে যে কনি তার চোখের দৃষ্টির কোন অর্থ খুঁজে পেল না।

কনি মেলর্সের হাতদুটোর খোঁজ করতে করতে অনুনয়ের স্বরে বলল, বল তুমি খুশি হয়েছ?

কনি দেখল প্রকৃত আনন্দের একটা তরল আবেগ ফুটে উঠল মেলর্সের মুখের উপর। কিন্তু সে আবেগের অভিব্যক্তি কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন। এক দুর্বোধ্য জাল দিয়ে ঢাকা। কনি কিছুতেই তা ভেদ করতে পারছিল না।

মেলর্স বলল, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছি।

কনি আবার বলল, কিন্তু তুমি কি খুশি নও? বল

আমি ভবিষ্যৎকে কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

কনি বলল, কিন্তু তোমাকে কোন দায়িত্বের কথা ভাবতে হবে না। ক্লিফোর্ড সে সন্তানকে গ্রহণ করবে নিজের সন্তান বলে।

মেলর্সের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল একেবারে। সে কোন কথা বলল না।

কনি বলল, আমি কি ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এক ক্ষুদ্র সামন্ত সন্তান দান করব?

তেমনি ম্লান মুখে কনির পানে তাকাল মেলর্স। তার সেই ম্লান মুখের উপর ফুটে ওঠা একটুকরো ক্ষীণ হাসিটাকে কুৎসিত দেখাচ্ছিল। মেলর্স বলল, তুমি কিন্তু সেখানে গিয়ে এ সন্তানের পিতা কে তা কিছু বলবে না।

আমি সেকথা তাকে বললেও এ সন্তান সে গ্রহণ করবে।

মেলর্স নীরবে কি ভাবতে লাগল। শেষে বলব, হ্যাঁ, গ্রহণ করবে।

আবার নীরবতার এক জমাট ব্যবধান বিরাজ করতে লাগল দুজনের মাঝখানে।

কনি বলল, কিন্তু আমি র‍্যাগবিতে থাকতে যাব না নিশ্চয়।

তাহলে কি করতে চাও তুমি? মেলর্স বলল।

কনি সহজভাবে বলল, আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন একটা আগুনের শিখা মেলর্সের পেটের ভিতর ঢুকে গেল। তার মাথাটা ঢলে পড়ল। কনির পানে বারবার তাকাতে লাগল মেলর্স।

মেলর্স বলল, তোমার এতে ইচ্ছা থাকলেও আমার ত কোন সংস্থান নেই।

কনি বলল, তোমার যা আছে তা অনেক লোকের নেই।

মেলর্স বলল, হ্যাঁ, একদিক দিয়ে। আমি তা জানি।

কিছুক্ষণ ভেবে মেলর্স আবার বলতে লাগল, লোকে বলে আমি নাকি মেয়েদের মত। কারণ আমি গুলি করে পাখি মারতে পারি না, কারণ আমি টাকা রোজগার করতে পারি না। আমি অবশ্য যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি সেখানকার লোকদের ভালবাসতাম, তারাও আমাকে ভালবাসত। আমি কিন্তু আজকালকার সমাজের লোকদের মোটেই দেখতে পারি না। এই শ্রেণীবৈষম্য, টাকা রোজগারের এই ব্যাপারটাকে একেবারে বোকামি বলে মনে হয়। এই হলো জগতের রীতি। কিন্তু আমি মেয়েদের কি দেব? আমার ত কিছুই নেই দেবার মত।

কনি বলল, কিন্তু দেবার কথা কেন ভাবছ? এটা ত দর-কষাকষির কথা নয়। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি—এটাই যথেষ্ট।

মেলর্স বলল, না না জীবন মানেই গতি। বাঁচা মানেই এগিয়ে চলা। আমি তা পারি না বলেই পুরনো টিকিটের মতই আমি অচল। স্থতরাং আমি কোন নারীকে আমার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। যতদিন না আমি কোথাও না কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি, যতদিন না আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠি ততদিন কোন নারীকে আমি গ্রহণ করতে পারি না। নিজের জীবনকে কোন দিকে অর্থময় করে না তুলতে পারলে কোন পুরুষ কোন নারীকে কিছুই দিতে পারে না। নারী যদি সত্যিকারের নারী হয় তাহলে তাকে নিয়ে মনে প্রাণে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা যায় না। পুরুষরা যেমন নারীদের রক্ষিতা রাখে তেমনি আমি তোমার কাছে রক্ষিতার মত থাকতে পারি না।

কনি বলল, কেন নয়?

কেন আবার, আমি তা পারব না এবং তুমিও অল্পকাল পরে ঘৃণা করবে।

কনি বলল, মনে হয় তুমি ঠিক আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।

মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে মেলর্স বলল, তোমার টাকা, তোমার পদ-মর্যাদা; স্থতরাং সব সিদ্ধান্ত তুমিই গ্রহণ করবে। আমি শুধু তোমার কাছে শোব।

এছাড়া আর কি হতে বা করতে চাও তুমি?

তুমি অবশ্য তা বলতে পার। কিন্তু আমি কিছু একটা হতে চাই। আমার অস্তিত্বের যা হোক একটা মানে বুঝে নিতে চাই যদিও আমি বেশ জানি অস্তিত্বের এই অর্থ কেউ বুঝতে চায় না।

আমার সঙ্গে বাস করলে তোমার অস্তিত্বের মানে কি কমে যাবে?

একটু থেমে মেলর্স বলল, হতে পারে।

কনিও ভাবতে লাগল। তারপর বলল, তোমার অস্তিত্বের মানেটা কি শুনি?

আমি তোমাকে আগেও বলেছি, সে মানে অদৃশ্য। আসল কথা আমি এই জগৎ আর তার অগ্রগতি, মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে মোটেই বিশ্বাস করি

না। অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি না। মানবজাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে সবকিছুর মধ্যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন আনতে হবে।

কিন্তু সেই ভবিষ্যতের রূপটা কি হবে?

ঈশ্বর তা জানেন। আমার মনের মধ্যে এক প্রবল রাগের সঙ্গে মেশানো একটা অনুভূতি শুধু আঁকপাঁক করে বুঝতে পারি। কিন্তু সেটা কি তা বুঝতে পারি না।

কনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তা বলব? তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা অন্য সব পুরুষের মধ্যে নেই। আমার মতে এইটাই এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমি তা বলব?

বল, কি তা।

তা হলো তোমার আসক্তির নিবিড়তার একটা সাহস। তুমি যেভাবে যত সাহসের সঙ্গে ও স্বাভাবিকভাবে হাত দাও তা সত্যিই বিরল।

মেলর্সের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, তাই নাকি?

তারপর সে আবার বসে ভাবতে লাগল। কিছু পরে বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। যাকে বলে পরস্পরের সঙ্গে গায়ে গায়ে মাখামাখি। এর মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠবে। আসক্তি ও মমতা গড়ে উঠবে। যৌন ব্যাপারটা হলো দেহগত স্পর্শের নিবিড়তা। এই নিবিড়তাই আমাদের জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু এই নিবিড়তা আমাদের আজকাল নেই বলেই আমরা যেন অর্ধচেতন ও অর্ধমৃত হয়ে আছি। আমাদের ইংরাজ জাতির এই গুণটা বেশী থাকা দরকার।

কনি তার দিকে তাকাল। বলল, তবে কেন আমাকে ভয় পাও তুমি?

ভয় পাই টাকা, পদমর্যাদা আর তোমাদের সমাজকে।

কনি বলল, কিন্তু আমার মধ্যে কি কোন মমতা বা ভালবাসা নেই?

কালো কালো চোখগুলো তুলে মেলর্স বলল, হ্যাঁ আছে বটে, কিন্তু আমারই মত আসে আর যায়। সব সময় স্থির থাকে না।

কনি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, কিন্তু তুমি আমার সে মমতায় বিশ্বাস কর না?

কনি দেখল মেলর্সের মুখে আর সেই প্রেমাসক্তির ভাবটা নেই। সে বলল, হয়ত করি।

তারা দুজনেই চুপ করল। কনি বলল, আমি চাই তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, আমাকে চুম্বন করে বল আমাদের সন্তান আসায় তুমি খুশি।

কনিকে দেখতে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে মেলর্সের পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব শিউরে উঠল। সে বলল, চল আমরা আমার ঘরে যাই। যদিও এখানে কুৎসার ভয় আছে।

কনি দেখল মেলর্সের মুখে আবার সেই আগেকার প্রেমাসক্তির ভাবটা ফুটে উঠেছে। সে আবার জগতের সব কথা ভুলে গেছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে

কোবার্গ স্কোয়ারে চলে গেল। সেখানে একটা বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় মেলর্স একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে সে নিজের হাতে রান্না করে খেত। ঘরটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কনি প্রথমে তার পোষাকটা খুলে ফেলল। তারপর মেলর্সকেও খুলতে বলল। প্রথম মাতৃত্বের আবির্ভাবে বেশ নরম ও নধর হয়ে উঠেছে কনির দেহটা। বেশ একটা পূর্ণতা লাভ করেছে।

মেলর্স বলল, আমি চাই তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি চলে যাও।

কনি বলল, না, না ও কথা বলো না। আমাকে তুমি চিরদিন ভালবেসে যাবে। আমাকে তুমি তোমার কাছে রেখে দেবে। আমাকে কোথাও যেতে দেবে না।

কনি মেলর্সের নগ্ন ও শক্ত দেহটার গা ঘেঁষে ঘন হয়ে উঠল। তার মনে হলো, সারা পৃথিবীর মধ্যে এইটাই হলো তার আসল ঘর। মেলর্সের বুকটাই হলো তার জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

কনিকে দু হাত দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে বলল মেলর্স, হ্যাঁ, আমি তোমাকে রেখে দেব। আমার কাছে রেখে দেব।

কনি আবাব সেই কথাটা বলল, বল সন্তান আসায় তুমি খুশি। আমার পেটটার উপর চুম্বন করো।

কিন্তু মেলর্সের পক্ষে এ কাজটা সত্যিই কঠিন। সে বলল, কোন সন্তানকে আমি পৃথিবীতে আনতে চাই না, কারণ তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।

কিন্তু তুমি আমার মধ্যে সন্তান উৎপাদন করেছ। তার প্রতি তোমার মমতা দেখাও। এই মমতা বা স্নেহই হবে তার ভবিষ্যৎ। চুম্বন করো।

মেলর্স কেঁপে উঠল। কনির কথাটাই সত্যি। কনি ঠিকই বলেছে, ওর প্রতি একটু মমতা দেখাও, এই মমতাই ওর ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবে।—মুহূর্ত মধ্যে কনির প্রতি এক গভীর প্রেমাসক্তি অনুভব করল মেলর্স। সঙ্গে সঙ্গে কনির পেটটাকে চুম্বন করল। তার স্তনযুগল থেকে শুরু করে তলপেট পর্যন্ত সব চুম্বন করে গেল।

কনির মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, আমাকে ভালবাস, আমাকে ভালবাস তুমি। মেলর্স অনুভব করল তার জঠরাভ্যন্তর থেকে একটা মমতা আর আসক্তির স্রোত বেরিয়ে এসে কনির জঠরাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

কনির সঙ্গে সঙ্গমকালে মেলর্স বুঝতে পারল এ সঙ্গমের প্রয়োজন ছিল। তার আত্মমর্যাদাবোধ বা ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে এই দেহগত স্পর্শের এই নিবিড়তম অভিজ্ঞতার দরকার ছিল। মেলর্সের হঠাৎ মনে হলো, তার টাকা নেই, পদমর্যাদা নেই, বিষয়সম্পত্তি কিছু নেই, কিন্তু তা না থাক, তার মমতা আছে ভালবাসা আছে আর আছে প্রবল আত্মাভিমান।

কনি যদি কখনো তাকে কোন ক্ষেত্রে অপমান করে তার আত্মাভিমানে আঘাত দেয় তাহলে সেও সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে তার সব মমতা ভালবাসা প্রত্যাহার করে নেবে। এইভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক দেহগত স্পর্শ আর ভালবাসার প্রতীক হিসাবে কনির সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে বজায় রেখে যাবে। এ বিষয়ে কনি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার সহধর্মিণী। এইভাবে সে আধুনিক জগৎ আর যন্ত্রসভ্যতাজনিত যত সব বাঁদরামি আর অর্থহীন অর্থলোলুপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। আর কনি তাকে তার পিছনে থেকে তার সহায়তা করে যাবে। হে ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, এতদিনে আমি মনের মত এমন এক নারী পেয়েছি যে আমাকে ভালবাসে, যে আমাকে বোঝে। মেলর্সের মনে হলো তার নিম্নাঙ্গ হতে স্খলিত বীর্য কনির গর্ভদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র অন্তরাত্মাও যেন অনুপ্রবিষ্ট হলো তার মধ্যে। এ সঙ্গম যেন এক সাধারণ প্রজননক্রিয়া নয়, এ সঙ্গম হলো তার থেকে অনেক বড় সৃষ্টিশীল দুটি প্রাণপ্রবাহের মিলন।

কনিও এবার আরো দৃঢ়ভাবে সংকল্প করে বলল, তাদের মধ্যে যেন কোন ছাড়াছাড়ি না হয়। এখন শুধু কিভাবে কোথায় বাস করবে এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলো কি হবে সেটা শুধু ঠিক করতে হবে।

কনি একবার তাকে প্রশ্ন করল, তুমি বার্থা কাউটস্‌কে ঘৃণা করো?

তার কথা তুমি আমার কাছে বলো না।

কনি বলল, হ্যাঁ, বলতে হবে বৈকি। কারণ একদিন তুমি তাকে পছন্দ করতে। তাকে ভালবাসতে। আজ আমার সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছ তেমনি একদিন তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছিলে। সুতরাং আমাকে বলতে হবে তোমায় একদিন এত ভালবাসার পর আজ কেন তাকে এত ঘৃণা করতে হচ্ছে। কেন এমন হলো?

আমি ঠিক জানি না। সে সব সময় আমার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছার ধ্বজা উড়িয়ে চলত। তার ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা আর তার অপব্যবহারের ফলেই সে স্বৈরিণী হয়ে ওঠে।

কনি বলল, কিন্তু সে তোমার থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। সে কি তোমাকে এখনো ভালবাসে?

মোটেই না। সে যদি আমার কাছ থেকে এখনো মুক্ত হতে না চায় তাহলে বুঝতে হবে সে আমার উপর রাগে উন্মাদ হয়ে আছে এবং যে কোনভাবে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসতেও পারে।

না না, সে আমাকে কোন মুহূর্তে ভালবাসত না। ভালবাসা দিতে না দিতে সে ফিরিয়ে নিত। সে আমাকে ঘৃণা করত। তার গভীরতম বাসনা ছিল আমাকে ঘৃণা করা, আমাকে কষ্ট দেওয়া। তার সে ভয়ঙ্কর বাসনা প্রথম

থেকেই ভুল পথে চলেছিল।

কিন্তু এমনও হতে পারে তোমার ভালবাসা চেয়েছিল ; কিন্তু তোমার ভালবাসা না পেয়ে সেই ভালবাসায় তোমাকে বাধ্য করতে চায়।

ওঃ, সে কি ভয়ঙ্কর কাজ।

কিন্তু তুমি ত সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসতে না। এ বিষয়ে তুমি তার প্রতি অন্যায় করেছ।

কেমন করে আমি অন্যায় করলাম? আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সে-ই নিজেকে ছিনিয়ে নেয় আমার সে ভালবাসা থেকে। তার কথা আর বলো না। সত্যিই সে অভিশপ্ত মেয়ে। শেষবার যখন সে আমার কাছে আসে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে যেন গুলি করে মেরে ফেলি। কোন নারীর ভ্রান্ত উন্মত্ত ইচ্ছাশক্তি যখন আপন উগ্রতায় সব কিছুকে তুচ্ছতায় ভাসিয়ে বা উড়িয়ে দিতে চায় তখন সে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তখন তাকে গুলি করে হত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু পুরুষরাও যখন ঐ ধরনের ইচ্ছাশক্তির উগ্রতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে তাহলে তাদেরও কি হত্যা করতে হবে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু তার থেকে আমাকে আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি করতে হবে। তা না হলে সে আবার আসতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদ করতেই হবে। সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমরা যেন একসঙ্গে রাস্তায় ঘোরাফেরা না করি। সে যদি সত্যি সত্যিই কোনদিন তোমার আমার মাঝে এসে পড়ে তাহলে আমি তা সহ্য করতে পারব না।

কনি এ বিষয়ে ভাবতে লাগল।

কনি বলল, তাহলে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না?

ছ মাস বা আরো কিছু কালের জন্য। আমার মনে হয় আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ সেপ্টেম্বরেই হয়ে যাবে। তাহলে মার্চ মাস পর্যন্ত আলাদা থাকতে হবে।

কিন্তু আমাদের সন্তানের জন্ম হবে খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারিতে।

মেলর্স চুপ করে রইল। তারপর বলল, ক্লিফোর্ড আর বার্থা যদি মরে যেত তাহলে সব জ্বালা চুকে যেত।

কিন্তু তাদের প্রতি এটা তোমার মমতার চিহ্ন নয়।

তাদের প্রতি মমতা? তাদের প্রতি সবচেয়ে মমতা বা ভালবাসার কাজ হলো তাদের মৃত্যুদান করা। তাদের আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। তারা শুধু জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। একমাত্র মৃত্যুই তাদের ও আমাদের শান্তি দিতে পারে।

কনি বলল, কিন্তু তুমি এ কাজ করবে না আশা করি।

হ্যাঁ করব। এ কাজ আমি এক পশু হত্যা করার মতই করে ফেলব। কোন কুণ্ঠাবোধ করব না। আমি ওদের গুলি করে মারব।

আমার মনে হয় এ কাজে তুমি হয়ত সাহস পাও না।

ভালভাবেই সাহস পাই।

কনিকে এখন অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। মেলর্স এখন বার্থার কাছ থেকে চিরদিনের মত মুক্ত হতে চায়। কনির মনে হলো সে ঠিকই করছে। বার্থার শেষ আক্রমণের ঘটনাটা বড়ই দুঃখজনক। মেলর্সকে মুক্ত হতেই হবে তার হাত থেকে। তার মানে কনিকে একা থাকতে হবে আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত। এই অবসরে সেও ক্লিফোর্ডের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটা সেরে নিতে পারবে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? মেলর্সের নাম করলে তার বিবাহবিচ্ছেদ কোন কালেই হবে না। কি ঘৃণ্য ব্যাপার! তার থেকে যদি পৃথিবীর দূর প্রান্তে কোন জারগায় চলে যাওয়া যায়?

কিন্তু তাও বোধ হয় সম্ভব নয়। আজকাল চেয়ারিং ক্রস থেকে পৃথিবীর যে কোন দূর প্রান্ত পাঁচ মিনিটের পথ নয়। যতক্ষণ বেতার থাকবে পৃথিবীতে দূর বলে কোন কিছু থাকবে না। আজকাল ডাহোমির রাজা বা তিব্বতের লামা লাণ্ডস বা নিউ ইয়র্কের কথা শোনে।

থাম, থাম, ধৈর্য ধরো। এখন সারা জগৎ জুড়ে আছে যন্ত্রের জাল পাতা। সেই জাল থেকে মানুষ সহজে মুক্তি পেতে পারে না।

কনি এবার তার বাবাকে বিশ্বাস করে কথাটা খুলে বলল। সে বলল, বুঝলে বাবা, আমার সেই লোকটি হলো ক্লিফোর্ডের শিকার রক্ষক। কিন্তু সে একদিন ভারতে নিযুক্ত এক সামরিক অফিসার ছিল। ফ্লোরেন্স নামে একজন কর্ণেলের দয়াতেই সে অফিসার হয়।

স্যার ম্যালকম কিন্তু ফ্লোরেন্স নামে সেই কর্ণেলের দয়াদাক্ষিণ্যের মধ্যে কোন অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পেলেন না। ব্যাপারটা কেমন দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালি মনে হলো তাঁর। তিনি বরং দেখলেন, বিনয়ের অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন আত্ম-প্রচার এবং সেখানে আত্ম অহঙ্কারই বেশী।

স্যার ম্যালকম বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই শিকার রক্ষকের জন্ম হয় কোথায়?

সে হচ্ছে তেভারশাল গাঁয়ের এক খনিশ্রমিকের সন্তান। তবে তাকে এখন যে কোন উঁচু সমাজে নিয়ে যাওয়া যায়।

নাইট স্যার ম্যালকম আরো রেগে গেলেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি এক সোনার খনি আর লোকটা সেই খনি থেকে সোনা তুলে এনেছে।

কনি বলল, না বাবা, তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। একজন সত্যিকারের মানুষ। সে নত না হওয়ার জন্য ক্লিফোর্ড তাকে সব সময় ঘৃণা করত।

কিন্তু ক্লিফোর্ড একদিন নিশ্চয় ভাল চোখে দেখত তাকে।

আসলে স্যার ম্যালকমের ভয়টা ছিল কুৎসা আর লোকনিন্দার জন্য। তাঁর মেয়ে শিকার রক্ষককে যদি গোপনে ভালবাসত, যদি সেটা জানাজানি না হত তাহলে তাতে তার কোন আপত্তি থাকত না। তাদের এই অবৈধ প্রেমঘটিত

ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে এক কুৎসার ঝড় ওঠে অথবা লোকনিন্দার ঢেউ উঠে তাঁদের সামাজিক মর্যাদাকে আঘাত হানবে—তাঁর আপত্তি এইখানে।

স্যার ম্যালকম বললেন, লোকটা যাই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না, বা তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখ এ ব্যাপারে যে কথা উঠবে, লোকনিন্দার যে কলগুঞ্জন উঠবে, তা তোমার সংমার কানে উঠবে। সে কিভাবে ব্যাপারটা নেবে কে জানে।

কনি বলল, আমি তা জানি। সমাজে যারা বাস করে তাদের পক্ষে এই লোকনিন্দা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেও তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। এই সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তার থেকে আমি আমার সন্তানের পিতা হিসাবে অন্য লোকের নাম করতে পারি। মেলর্সের নাম একেবারে না করলেই হলো।

অন্য লোক ? কে সে ?

ডানকান ফোর্বের নাম। সে বরাবর আমার বন্ধু। সে একজন নামকরা শিল্পী এবং আমাকে ভালবাসে।

হা ভগবান ! বেচারা ডানকান। এতে তার কি লাভ হবে ?

তা জানি না। তবে এতে তার কোন আপত্তি হবে না।

তা হয়ত হতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তার সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার ঘটেছিল ?

না। এ সব ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই। ও শুধু আমাকে ভালবেসেই খুশি। ওকে স্পর্শ করতে দেয় না।

হা ভগবান ! কী অদ্ভুত লোক !

সে চায় আমি তার শিল্পের মডেল হই। আমি অবশ্য তা কখনো চাইনি।

ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। কিন্তু সব বিষয়েই সে বড় লাজুক।

তা হোক। তবু তার নাম আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তোমাদের বলার কিছু থাকবে না।

হায় কনি ! যত সব জঘন্য চক্রান্ত করতে হবে।

আমি জানি এসব ঘৃণ্য কাজ। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল।

শুধু চক্রান্ত আর চক্রান্ত। বেশীদিন বাঁচাটাই পাপ।

আচ্ছা বাবা, তোমাদের আমলে এ ধরনের কোন চক্রান্ত করনি ? তবে কেন এত কথা বলছ ?

কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র।

সব সময় সবাই নিজের কথাটাকে স্বতন্ত্র ভাবে।

হিলদা এসে নতুন সমস্যার কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠল। সামান্য একটা শিকার রক্ষকের সঙ্গে তার বোনের নামটা জড়িয়ে পড়ুক এটা সে চায় না।

কনি বলল, আমরা তাহলে বৃটিশ কলম্বিয়া বা কোন উপনিবেশে চলে যেতে পারি ত। তাহলে কোন নিন্দার ঝড় উঠবে না।

কিন্তু কোন পরিত্রাণ নেই। কথা যা ওঠার উঠবে, নিন্দা যা রটার তা রটবেই। হিলদার মত কনি এই লোকটাকে বিদেশে গিয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু তাতে সব সমস্যার সমাধান হবে। স্যার ম্যালকম অবশ্য তা মনে করেন না।

বাবা, তুমি তাকে একবার দেখবে?

বেচারা ম্যালকমের কিন্তু এ বিষয়ে মোটেই কোন আগ্রহ নেই। বেচারা মেলর্সেরও তেমন কোন আগ্রহ নেই। তবু দুজনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। স্যার ম্যালকমের ক্লাবের একটা ঘরে দুজনে বসল। একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল অস্বস্তির সঙ্গে।

ওদের লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্যার ম্যালকম বেশী করে হুইস্কি খেলেন। মেলর্সও অনেকটা খেল। তারপর যখন কফি দেওয়া হলো এবং পরিবেশনকারী চলে গেল তখন ম্যালকম একটা সিগারেট ধরিয়ে আন্তরিকতার স্বরে বললেন, তাহলে ছোকরা, আমার মেয়ের কি হবে?

একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মেলর্সের মুখে। বলল, কি হবে স্যার?

তার গর্ভে তোমার এক সন্তান এসেছে।

মেলর্স হেসে বলল, হ্যাঁ, সে সম্মান আমি লাভ করেছি।

স্যার ম্যালকম জোর হেসে বললেন, সম্মান! তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন চলছিল?

ভালই।

ভাল হবেই আমি জোর করে বলতে পারি। আমার মেয়ে। আমার রক্ত আছে তার গায়ে। তার মা থাকা সত্ত্বেও আমি কোন ভাল মেয়ে কাছে পেলেই তার সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হয়েছি। তুমি শুকনো খড়ের গাদার মত তার দেহটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। তুমি একজন শিকার রক্ষক না? শোন। বিশেষ মন দিয়ে শোন, আমরা কি করতে চলেছি এ বিষয়ে।

স্যার ম্যালকমের যতটা নেশা ধরেছিল মেলর্সের তা ধরেনি। মেলর্স খুবই কম কথা বলছিল।

তুমি একজন শিকার রক্ষক। এও এক ধরনের শিকার। ভাল শিকার ধরার মতই ভাল মেয়ে খুঁজে পাওয়াও কঠিন কাজ। তোমার বয়স কত?

উনচল্লিশ।

তোমাকে যতদূর মনে হচ্ছে এখনো কুড়ি বছর তোমার যৌবন থাকবে দেহে। তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। তুমি ঠিক ক্লিফোর্ডের মত নও। ক্লিফোর্ডকে দেখতে শিকারী কুকুরের মত তেজী হলেও তার লিভারটা পচা ফুলের মত নরম। আমরা তোমার উপর বিশ্বাস রাখি। এবার কাজের কথাটা শোন। সারা জগৎটা বুড়ী মেয়েতে ভরে গেছে। সত্যিকারের মেয়ে কোথায়?

স্যার ম্যালকমের কাজের কথা মানে যত সব রসের কথা। তিনি আবার বললেন, শোন ছোকরা, আমি তোমার জন্য যে কোন উপকার করতে পারি।

আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। তোমাকে আমি পছন্দ করি। তুমি জান আমার মেয়ের কিছু টাকা আছে। খুব একটা বেশী না হলেও খাওয়া পরার কোন অভাব হবে না। তার উপর আমিও কিছু দিতে পারি। আমি সত্তর বছর ধরে কত বুড়ী মেয়ের স্কার্ট তুলে দেখেছি। কিন্তু একটাও মেয়ের মত মেয়ে পাইনি। সেদিক দিয়ে তুমি কত ভাগ্যবান।

আপনার কথায় আমি খুশি। লোকে আমাকে পিছন থেকে বাঁদর বলে।

বুড়ী মেয়েগুলো তোমাকে বাঁদর বলবে না ত কি বলবে?

ওরা বেশ আন্তরিকতার মধ্য দিয়েই বিদায় নিল। মেলর্স বেশ খুশি মনেই চলে গেল।

পরের দিন কনি আর হিলদার সঙ্গে কোন এক অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় লাঞ্চ খেল মেলর্স।

হিলদা বলল, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে এক কুৎসিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

মেলর্স বলল, আমার ত বেশ মজা লাগছিল।

হিলদা বলল, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ধৈর্য ও যোগ্যতা অর্জন না করেই সন্তান উৎপাদন করতে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি।

মেলর্স বলল, ঈশ্বর ফুঁ দিয়ে সামান্য স্ফুলিঙ্গটাকে এত বড় করে দেবেন তা ভাবতে পারিনি।

হিলদা বলল, এতে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। অবশ্য তোমাদের দুজনের চলার মত টাকা কনির আছে। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা অসহ্য।

মেলর্স বলল, তাহলে আপনাদের অতি অল্পই ত্যাগ করতে হবে এ ব্যাপারে।

হিলদা বলল, কিন্তু তুমি যদি আমাদের শ্রেণীভুক্ত হতে তাহলে কিছু বলার ছিল না।

অথবা আমি যদি খাঁচার পশু হতাম তাহলে আরো ভাল হত।

এরপর সবাই চুপ করে রইল।

হিলদা বলল, সবচেয়ে ভাল হয় কনি যদি তার সন্তানের পিতা হিসাবে অন্য কারো নাম করে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম এ ব্যাপারে আমরা সত্য কথা বলব।

কিন্তু আমি বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবছি।

মেলর্স হিলদার মুখপানে চেয়ে রইল। কনি তার কাছে ডানকানের নামটা করেনি।

মেলর্স বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

হিলদা বলল, আমাদের একজন বন্ধু আছে যার নাম পিতা হিসাবে করা যেতে পারে আর তাতে সে রাজী হতে পারে।

আপনি একজন অন্য পুরুষের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ অবশ্যই তাই।

কিন্তু অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ত তার কোন সম্পর্ক নেই।

কনির মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাল মেলর্স !

কনি তাড়াতাড়ি বলল, না না, শুধু কেবল বন্ধুত্ব, কোন প্রেমের ব্যাপার নয়।

কিন্তু কেন সে এই কলঙ্কের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিতে যাবে যদি সে তার প্রতিদানে কিছু না পায় ?

হিলদা বলল, কিছু এমন লোক আছে যারা বড় উদার, যারা মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই চায় না।

কিন্তু কে সে লোক ?

আমাদেরই এক বন্ধু। স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি। ছোট থেকে আমরা দেখে আসছি। একজন শিল্পী।

মেলর্স সঙ্গে সঙ্গে বলল, ডানকান ফোর্বে।

কনি একবার তার কাছে ডালকানের নাম করেছিল। মেলর্স বলল, কিন্তু এই দোষ কেমন করে কোন যুক্তিতে চাপাবেন তার উপর ?

কেন, ধরে নাও কোন হোটেলে তারা একসঙ্গে কিছুদিন ছিল।

মেলর্স বলল, আমার মনে হচ্ছে সামান্য একটা কারণে বৃথা হৈ চৈ করা হচ্ছে।

হিলদা বলল, এ ছাড়া আর কি করতে পার তুমি ? তোমার নাম করা হলে তোমার বিবাহবিচ্ছেদ কোনমতেই হবে না। ফলে তোমার স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাবে না তুমি।

হতাশভাবে মেলর্স বলল, তা অবশ্য ঠিক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেলর্স বলল, আমরা দূরে কোথাও চলে যেতে পারতাম।

কিন্তু কনি তা পারে না, কারণ ক্লিফোর্ড দেশে বিদেশে এক সুপরিচিত নাম।

আবার সেই হতাশাজনিত এক গভীর নীরবতা।

হিলদা বলল, তোমরা যদি দুজনে সুখে শান্তিতে বাস করতে চাও তাহলে বিয়ে করতে হবে। আবার বিয়ে করতে হলে বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে আগে। এখন দুজনকেই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু করে দিয়ে পৃথকভাবে থাকতে হবে।

মেলর্স বলল, তাহলে আপনি আমাদের এখন কি করতে বলেন ?

এখন প্রথমে ডানকানকে বলে দেখতে হবে সে এতে রাজী হয় কি না। তারপর তোমরা দুজনেই বিবাহবিচ্ছেদের কাজে এগিয়ে যাবে। এ কাজে সফল না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

মনে হচ্ছে পাগলা গারদের মধ্যে থাকতে হবে।

তা হতে পারে। কিন্তু তা না হলে জগতের সব লোক তোমাদের পাগল বলবে।

তার থেকে আর কি খারাপ ভাবতে পারে ?

অপরাধী। আমার তাই মনে হয়।

ঠিক আছে, আমি মুক্ত শানিত তরবারির উপর আরো কয়েকবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

একটু চুপ করে থেকে মেলর্স আবার বলল, ঠিক আছে, আমি যে কোন ব্যবস্থাতেই রাজী। সারা দুনিয়াটাই পাগলা হয়ে গেছে। তাকে বাঁধবার বা মারবার কেউ নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের পরস্পরকে রক্ষা করা উচিত।

কনির পানে সে একই সঙ্গে অপমান, ক্রোধ, ক্লান্তি আর দুঃখের সঙ্গে তাকাল।

অবশেষে মেলর্স কনিকে বলল, হে আমার সুন্দরী, পাগলা দুনিয়াটা তোমার সুন্দর পাছাটায় নুনের রাশ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কনি বলল, আমরা বাধা দিলে তা পারবে না।

অবশেষে ডানকানকে একদিন কথাটা বলা হলো। ডানকানও একদিন মেলর্সকে দেখতে চাইল। সুতরাং আবার একদিন তাদের চারজনের একটা সাক্ষাৎকাব হলো। ডানকান একটু বেঁটে ধরনের। তার বুকটা বেশ চওড়া। লম্বা লম্বা চুল। তার মুখে চোখে কেল্টসুলভ অহমিকার ভাব। তার শিল্পকলা অতি আধুনিক। রং আর রূপ নিয়ে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছে। কিন্তু তার মাঝেই তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মেলর্সের কিন্তু তা দেখে মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু মুখে তার সামনে তা বলতে পারল না। কারণ শিল্পটা ডানকানের কাছে এক ধর্মবিশ্বাসের মত। যেখানে কোন আঘাত ও সহ্য করবে না।

সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল ডানকানের বাড়িতে। তার স্টুডিওটা ওদের দেখাল ডানকান। ডানকানের ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ ছিল মেলর্সের উপর। কারণ সে তার ছবির গুণাগুণ সম্পর্কে মেলর্সের মতামত চায়। কনি আর হিলদার মতামত সে আগেই জেনেছে।

অবশেষে মেলর্স তার মত ব্যক্ত করল। বলল, এসব শিল্পকর্ম দেখে একটা হত্যার কাজ বলে মনে হচ্ছে।

হিলদা বলল, কিসের হত্যা ? কে কাকে হত্যা করছে ?

মেলর্স বলল, আত্মার নাড়ীভূড়িতে জড়িয়ে থাকা সব মায়া মমতাকে হত্যা করা হয়েছে।

শিল্পীর মুখে একটা ঘৃণার ঢেউ খেলে গেল। সে মেলর্সের কণ্ঠে স্পষ্ট এক ঘৃণাকে ফুটে উঠতে শুনল। সে মেলর্সের মুখ থেকে মায়া মমতার কথাটা

শুনেও রেগে উঠল।

তার লম্বা রোগা-রোগা চেহারাটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেলর্স। তার মুখে ঘৃণা আর অসন্তোষের ভাব। ডানকানের মনে হলো তার দৃষ্টিগুলোর উপর যেন এক ভীমরুল উড়ে বেড়াচ্ছে।

ডানকান বলল, আমার মনে হয় নিবুদ্ধিতা, যতসব ভাবপ্রবণ নির্বুদ্ধিতাকে হত্যা করা হয়েছে।

আপনি কি তাই মনে করেন? আমার ত মনে হয় আপনার এই টিউব আর করোগেটের ছবিগুলোর কাজই এক নির্বুদ্ধিতা আর ভাবালুতায় ভরা। এক স্নায়বিক আত্মাভিমানের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছু নয়।

রাগ আর ঘৃণার ঢেউ খেলে গেল শিল্পী ডানকানের মুখখানায়। হলুদ হয়ে গেল সে মুখ। সে বলল, আমরা এবার খাবার ঘরে যেতে পারি।

ওরা সকলেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলল। কফি পরিবেশনের পর ডানকান বলল, পিতা হিসাবে আমার নাম দেওয়ায় কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একটা শর্তে। কনিকে আমার ছবির মডেল হতে হবে। আমি এর আগে অনেকদিন বলেছি একথা। কিন্তু ও শোনেনি।

মেলর্স বলল, আপনি তাহলে শর্তাধীনে এ উপকারটা করছেন।

ডানকান তার কণ্ঠে যতদূর সম্ভব মেলর্সের প্রতি ঘৃণা ঢেলে বলল, হ্যাঁ, শর্তাধীনেই করছি।

মেলর্স বলল, আমাকে সুদ্ধ মডেল করুন না কেন। আমি শিকার রক্ষকের কাজ করার আগে কামারের কাজ করতাম। আপনার শিল্পকলার জালে তাহলে ভালকান আর ভেনাস একই সঙ্গে ধরা থাকবে।

ডানকান বলল, ধন্যবাদ! ভালকানের চেহারা মোটেই মডেল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

কেন, তাকে টিউবের মধ্যে ভরে দিলেও নয়?

ডানকান রাগের বশবর্তী হয়ে কোন উত্তর দিল না।

সেদিনকার ভোজসভাটা একটা ভয়ঙ্কর নিরানন্দ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। মেলর্সের উপস্থিতিটা এক তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করে গেল ডানকান।

ওরা ডানকানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে কনি মেলর্সকে বলল, তুমি ওকে বুঝতে পারলে না; ও কিন্তু সত্যিই ভাল। ওর সত্যিই দয়া আছে।

মেলর্স বলল, ওর মেজাজটা গরম করোগেটের পাতের মত। ও আজ মোটেই ভাল ব্যবহার করেনি। তুমি কি ওর ছবির মডেল হবে?

কনি বলল, আমি তাতে কিছু মনে করি না। ও আমাকে ছোঁবে না। যদি তোমার আমার একসঙ্গে জীবনযাপনের পথ পরিষ্কার করা হয় তাহলে আমি এ ব্যাপারে কিছুই মনে করব না।

মেলর্স বলল, উনি শুধু তোমাকে ক্যানভাসের উপর ধরে রাখবেন।

কনি বলল, শুধু আমার দেহ সম্বন্ধে ওর অনুভূতিগুলো বিচিত্রভাবে ফুটিয়ে তুলবে। ও যদি তা করে আমার তাতে আপত্তি নেই। আমার গা ওকে ছুঁতে দেব না। ও যদি কখনো আমার দেহের দিকে পেঁচার মত তাকিয়ে থাকে ত থাকবে। সে আমাকে মডেল করে যত খুশি টিউব বা করোগেট বানাতে পারে। এটা তারই শিল্পীজীবনের কবরখানা হবে। তোমার কথা শুনে রেগে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে ওর শিল্প সম্বন্ধে তোমার কথাটাই সত্যি।

অধ্যায় ১৯

প্রিয় ক্লিফোর্ড, আমার মনে হয় তুমি যা আগে ভেবেছিলে তাই ঘটল পরিশেষে। আমি সত্যি সত্যিই একজনকে ভালবেসে ফেলেছি এবং আশা করি তুমি বিবাহবিচ্ছেদ করে আমাকে মুক্তি দেবে। বর্তমানে আমি ডানকানের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে রয়েছি। আমি তোমাকে লিখেছিলাম ভেনিসে ও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি তোমার জন্য ভীষণভাবে দুঃখিত; তবে তুমি যেন শান্তভাবে এটা গ্রহণ করো: আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আমার থেকে ভাল একজনকে গ্রহণ করবে। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই; আর আমি র‍্যাগবিতে ফিরে যেতেও পারছি না। আমি এজন্য ভীষণ দুঃখিত। আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী নই; আমি বড় অধৈর্য এবং স্বার্থপর। আর আমি তোমার কাছে গিয়ে একসঙ্গে বাস করতে পারছি না। একথা যতই ভাবছি ততই দুঃখ পাচ্ছি। তুমি যদি এ নিয়ে বেশী ভাবনাচিন্তা না করো তাহলে দেখবে কোন দুঃখই পাবে না। আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোন আসক্তিই নেই। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার থেকে তোমার নিজের মুক্তি রচনা করে নাও।

চিঠিখানা পেয়ে মনে মনে খুব একটা আশ্চর্য হলো না ক্লিফোর্ড। কারণ এর আগে থেকেই অনেকদিন ধরে সে ধরে নিয়েছিল কনি তাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বাইরে একথা সে স্বীকার করতে চাইত না। তাই বাইরের দিক থেকে একটা জোর আঘাত পেল ক্লিফোর্ড। কনির শান্ত ভাব দেখে তার উপর অনেকখানি আস্থা রেখেছিল।

এই রকমই হয়। অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির এক কৃত্রিম প্রবলতায় আমাদের স্বীকৃত চেতনার উপরিতল থেকে আমাদের অন্তরদৃষ্টিজনিত জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। আর এই বিচ্ছিন্নতা থেকে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ফলে যখন আঘাতটা সত্যি সত্যিই আসে তখন সে আঘাত দশগুণ মনে হয়।

বিক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত শিশুর মত আচরণ করতে লাগল ক্লিফোর্ড আঘাতটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

চিঠিখানা পড়ার পর তার বিছানার উপর এমন ভয়ঙ্করভাবে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল যে তা দেখে ভয় পেয়ে গেল মিসেস বোল্টন।

মিসেস বোল্টন ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, কি হয়েছে স্যার ক্লিফোর্ড? কি ব্যাপার?

কিন্তু কোন উত্তর নেই। উত্তর না পেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল মিসেস বোল্টন। তার ভয় হলো ক্লিফোর্ডের রক্তের চাপ হয়ত খুব বেড়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি তার চোখমুখ পরীক্ষা করে তার হাতের নাড়ী টিপে দেখল।

মিসেস বোল্টন বলল, কোথাও যন্ত্রণা হচ্ছে? কোথায় ব্যথা লাগছে আমাকে বলুন।

এবারও কোন উত্তর দিল না ক্লিফোর্ড।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি তাহলে শেফিল্ডে ডাক্তার ব্যারিংটন ও ডাক্তার লেকিকে টেলিফোন করব?

মিসেস বোল্টন সত্যি সত্যিই ফোন করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল ঘরের দরজার দিকে। কিন্তু এমন সময় ক্লিফোর্ড বলে উঠল, না।

মিসেস বোল্টন যেতে যেতে হঠাৎ থেমে ক্লিফোর্ডের দিকে তাকাল। দেখল, তার মুখখানা হলুদ হয়ে গেছে। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য। তার সমস্ত মুখখানা এক বিহ্বল হতবুদ্ধি মানুষের মত।

মিসেস বোল্টন বলল, আপনি কি বলতে চান কোন ডাক্তার ডাকব না?

ক্লিফোর্ড ভূতুড়ে গলায় উত্তর দিল, না, আমি ডাক্তার চাই না।

কিন্তু স্যার ক্লিফোর্ড, আপনি অসুস্থ। আমি কোন দায়িত্ব নিতে পারি না। আমি এখন ডাক্তার না ডাকলে আমাকে পরে দোষী হতে হবে।

কিছুক্ষণ থামার পর ক্লিফোর্ড আবার তেমনি ভূতুড়ে গলায় উত্তর করল, আমি অসুস্থ নই। আমার স্ত্রী আর ফিরে আসছে না।

মিসেস বোল্টনের মনে হলো যেন কোন প্রাণহীন প্রতিমূর্তি কথা বলল।

ক্লিফোর্ডের বিছানার কাছে সরে গিয়ে বলল, আপনি বলছেন আমাদের ম্যাডাম আর ফিরে আসছেন না? একথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। আমাদের ম্যাডাম ঠিক ফিরে আসবেন। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

এ কথায় সেই প্রাণহীন প্রতিমূর্তির কোন পরিবর্তন হলো না। সে শুধু একখানা চিঠি মিসেস বোল্টনের দিকে বাড়িয়ে বলল, এটা পড়।

কিন্তু এটা যদি আপনাকে লেখা ম্যাডামের চিঠি হয় তাহলে ম্যাডাম অবশ্যই এটা চাইবেন না যে এ চিঠি আমি আপনাকে পড়ে শোনাই। আপনি এ চিঠির মর্মার্থ আমাকে মুখে বলুন।

কিন্তু ক্লিফোর্ড আবার বলল, চিঠিটা পড়।

মিসেস বোল্টন বলল, আমি শুধু আপনার আদেশ পালন করার জন্যই

এ চিঠি পড়ছি।

চিঠি পড়ে মিসেস বোল্টন বলল, আমি ম্যাডামের ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। তিনি কথা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন।

মিসেস বোল্টন দেখল ক্লিফোর্ডের মুখের উপর এক শূন্য কালো ছায়া গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠেছে। সে সৈন্যদের সেবা করতে গিয়ে অনেক দেখেছে, এটা হচ্ছে হিস্টিরিয়া রোগ। পুরুষদেরও হয়।

ক্লিফোর্ডের উপর কিছুটা রাগও হলো মিসেস বোল্টনের। ক্লিফোর্ডের মত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন লোকের এটা অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল, তার স্ত্রীর অন্য কাউকে ভালবাসে এবং একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে নিজে এটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে। ক্লিফোর্ডও মনে মনে এটা বেশ বুঝত; মুখে সে শুধু এটা স্বীকার করত না। বাইরে এটা স্বীকার করে সে যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করত তাহলে সেটা মানুষের কাজ হত। কিন্তু তা না করে সে জেনে শুনে উপরে না জানার ভাণ করত। আসলে একটা আস্ত শয়তান যখন তার লেজ নেড়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন সে সেই শয়তানকেই দেবদূত ভেবে ভুল করে এসেছে। সেদিনের সেই ক্রমাগত মিথ্যাচরণটি আজ এক প্রবল আঘাত হেনে তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এমন এক রোগের যা উন্মাদ রোগেরই অন্যতম লক্ষণ। মিসেস বোল্টন ভেবে অবশেষে বুঝতে পারল ক্লিফোর্ড নিজের সম্বন্ধে খুব ভাবত, নিজের অবিনশ্বর আত্মার গৌরবগান করত বলেই আজ এই আঘাতটা পেল। তার প্রবল আত্মাভিমান প্রবলতর এক প্রতিকূল ঘটনার আঘাত খেয়ে ছিন্নভিন্ন এক অসংলগ্নতা নিয়ে এল তার মনের মধ্যে।

হিস্টিরিয়া বড় বিপজ্জনক রোগ। যেহেতু সে একজন নার্স। তাকে এখন দেখতে হবে, ভাল করে তুলতে হবে। কিন্তু এখন তাকে এমন কোন কথা বলা চলবে না যাতে তার প্রতিহত ও লাঞ্ছিত পৌরুষচেতনা আবার জেগে উঠতে পারে। তাতে তার মনের কাঠামোটা আরো স্খলিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।

এখন তার একমাত্র উচিত কাজ হবে মনের অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করা। তার অবস্থা এখন টেনিসনের কবিতার সেই প্রস্তরীভূতপ্রাণা শোকাহত মহিলার মত যাকে অবশ্যই কাঁদতে হবে। না কাঁদলে মরে যাবে।

তাই মিসেস বোল্টন প্রথমে কাঁদতে লাগল। হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে জোরে ফুঁপিয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারিনি যে ম্যাডাম এমন করবেন। তার অতীত জীবনের বিস্মৃতপ্রায় যতসব পুরনো দুঃখের কথা ভেবে এক কৃত্রিম আবেগে গলে গিয়ে কাঁদতে লাগল মিসেস বোল্টন। তার কান্নাটা সত্যিই স্বাভাবিক কান্নার মত শোনাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই এই কান্নার কোন একটা কারণ ঘটেছে।

ক্লিফোর্ড এখন শুধু কনির বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা ভাবছিল। কনি তাকে কিভাবে কতখানি ঠকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বোল্টনের কান্না দেখে, তার কৃত্রিম শোকের ছোঁয়া পেয়ে তার চোখেও জল এল। ক্রমে চোখ থেকে সে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। সে কিন্তু অন্য কারো জন্য কাঁদছিল না, কাঁদছিল নিজের জন্য, নিজের আহত আত্মাভিমানের জন্য। অজস্র দিন ধরে যে আত্মাভিমান এক অপ্রতিহত প্রবলতায় অলক্ষ্যে উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে, আজ সহসা এক ঘটনার আঘাতে সেই উত্তুঙ্গ আত্মাভিমান শোচনীয়ভাবে ভূপাতিত হওয়ার জন্য না কেঁদে পারছিল না ক্লিফোর্ড।

এদিকে মিসেস বোল্টন যখন দেখল ক্লিফোর্ড এবার কাঁদছে তখন সে তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছে চুপ করল। তারপর তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এত উতলা হবেন না স্যার ক্লিফোর্ড।

এক কৃত্রিম আবেগের বিলাসিতায় গলে গিয়ে মিসেস বোল্টন আবার বলল, আপনি কাঁদলে শরীর খারাপ হবে। এতে শুধু আপনার শরীরের ক্ষতি হবে।

ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক ফোঁপানির চাপে সারা দেহটা একবার কেঁপে উঠল ক্লিফোর্ডের। তার দু গালের উপর অশ্রুর ধারা আগের থেকে আরো জোরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার বাহুর উপর সান্ত্বনার ভঙ্গিতে নিজের হাত রাখল মিসেস বোল্টন। আবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার চোখ থেকে। ক্লিফোর্ডের দেহটা আবার জোরে কেঁপে উঠতেই তার হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল সে। না না, আর উতলা হবেন না, দুঃখ করবেন না।

মিসেস বোল্টনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল সান্ত্বনা দিতে গিয়ে। এবার সে ক্লিফোর্ডের চওড়া কাঁধ দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে আনল আর ক্লিফোর্ডও মিসেস বোল্টনের বুকের মধ্যে মুখটা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তবে কান্নার তালে তালে তাঁর কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল, ক্লিফোর্ডের নরম লম্বা চুলগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে বারবার বলতে লাগল, কিছু মনে করবেন না। কাঁদবেন না।

ক্লিফোর্ডও তখন দুহাত দিয়ে মিসেস বোল্টনকে জড়িয়ে ধরে তার দিকে টেনে আনল। চোখের জলে তার সাদা পোষাক ভিজিয়ে দিল। এতদিনে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করল মিসেস বোল্টনের কাছে।

মিসেস বোল্টন এবার ক্লিফোর্ডের মুখে চুম্বন করে তাকে বুকের উপর চেপে ধরে শিশুর মত আদর করতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হায় স্যার ক্লিফোর্ড, হায় মহান চ্যাটার্লি পরিবার, তোমাদের পর্বতপ্রমাণ উত্তুঙ্গ মাথা অবশেষে নত হল। তোমাদের উঁচু আসন থেকে তাহলে নেমে এলে।

এরপর শিশুর মত শান্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল ক্লিফোর্ড আর মিসেস বোল্টনও ক্লান্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত সে নিজেও হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপারটা একই সঙ্গে কত হাস্যাস্পদ ও ভয়ঙ্কর। কী

লজ্জার কথা! কত সাংঘাতিক অধঃপতন।

এরপর থেকে মিসেস বোল্টনের সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার করতে লাগল ক্লিফোর্ড। সে তার হাত ধরত, তার বুকের উপর তার মাথাটা রাখত এবং যখন মিসেস বোল্টন তাকে চুম্বন করত তখন বলত, হ্যাঁ, আমাকে চুম্বন করো। মিসেস বোল্টন যখন তার গাটা টিপে দিত তখনও ক্লিফোর্ড বলত আমাকে চুম্বন করো। মিসেস বোল্টন তখন তার দেহের যে কোন জায়গায় আলতো-ভাবে একটা চুম্বন করত।

শিশুর মত অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকত ক্লিফোর্ড। মিসেস বোল্টনের দিকে এমন গভীরভাবে তাকিয়ে থাকত যাতে মনে হবে সে ম্যাডোনা, উপাসনা করছে পরম ভক্তিভরে। তারপর হঠাৎ এক নোংরা ছেলেমানুষির ভঙ্গিতে মিসেস বোল্টনের বুকের উপর হাত দিয়ে চাপ দিত এবং আবেগের সঙ্গে তা চুম্বন করত।

একই সঙ্গে এক লজ্জা আর পুলকের শিহরণ অনুভব করত মিসেস বোল্টন। একই সঙ্গে ভালবাসা আর ঘৃণা জাগত তার মধ্যে। তবু সে কখনো ক্লিফোর্ডের অগ্রসরমান বিকৃত কামাবেগকে কোনভাবে প্রতিহত করত না বা ভর্ৎসনা করে দূরে ঠেলত না। এইভাবে নিবিড় হতে নিবিড়তর এক দেহসংসর্গের মধ্যে সে পড়ল জড়িয়ে। এ দেহসংসর্গের অর্থ হলো শুধু এক বিকৃত বিপথগামী কামচেতনার উচ্ছ্বাস। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে ক্লিফোর্ডের এই দেহগত সম্পর্কের নিবিড়তা যেন শুধু একটা দেহগত ব্যাপার নয়! এটা ধর্মগত এক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বাহ্য প্রতীক। ওরা যখন পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় তখন ওদের দেখে মনে হয় ক্লিফোর্ড যেন ম্যাডোনার কোলে শিশু আর মিসেস বোল্টন যেন অসীম শক্তিসম্পন্না সেই দেবীমাতা যিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক ইচ্ছাশক্তিবলে এই বিরাট শিশুটিকে একান্তভাবে তার দেহমনের অধীনস্থ করে রেখেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে, এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ থেকে ক্লিফোর্ড যখন এক বিরাট বিকৃতমনা শিশুতে পরিণত হল তখন তার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি সবই প্রখর হয়ে উঠল আগের থেকে। ব্যবসায়ী হিসাবে তার কূটবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আরো। তার দেবীমাতার কাছে এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ এবং তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিম্নাঙ্গের যৌন নিষ্ক্রিয়তা হয়ত পার্থিব সকল ব্যাপারে দান করেছিল তাকে এক অমানবিক শক্তি আর উদ্যম। মিসেস বোল্টনের সঙ্গে তার এই দেহসংসর্গের এই বিকৃত আবেগ এতদিনে ক্লিফোর্ডকে দান করল যেন এমন এক দ্বিতীয় সত্তা যা দেহ ও পার্থিব সকল ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন, কূটনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় হিমশীতল এবং ইন্দ্রিয়তৎপরতায় অত্যুৎসাহী।

এ ব্যাপারে মিসেস বোল্টনেরই যেন জয় হলো। স্ফীত হয়ে উঠল তার অহংবোধ। আজকাল প্রায়ই আপন মনে বলে মিসেস বোল্টন, কেমন সে ধরা দিয়েছে। এসব আমার কৌশলেই সম্ভব হয়েছে। ও কিন্তু লেডি

চ্যাটার্লির সঙ্গে এসব করতে পারত না। দেহসংসর্গের ব্যাপারে চ্যাটার্লি তাকে কখনই এতখানি স্বাধীনতা দিত না। কারণ সে ছিল দারুণ স্বার্থপর মেয়ে।

কিন্তু কনির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে এক অদ্ভুত মনের পরিচয় দিল ক্লিফোর্ড। সে আবার কনিকে দেখার জন্য জেদ ধরল। এত কিছু সত্ত্বেও সে আবার কনিকে র‍্যাগবিতে নিয়ে আসার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। এ বিষয়ে সে বদ্ধপরিকর। কনিও শেষে আসবে বলে কথা দিয়েছে।

মিসেস বোল্টন তার নারীমনের অন্তঃস্থলে ক্লিফোর্ডকে ঘৃণা করত। সেখানে ক্লিফোর্ডকে তার মনে হত যেন অক্ষম অব্যবহার্য একটা পশু। অবশ্য সে তার নারীদেহের অটুট স্বাস্থ্য দিয়ে ক্লিফোর্ডের বিকৃত কামাবেগকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করার চেষ্টা করত। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তরের নিভৃতে ক্লিফোর্ডের প্রতি অপরিসীম এক বর্বর ঘৃণাও পোষণ করত। মনে হত ক্লিফোর্ডের থেকে রাস্তার একটা ভবঘুরেও ভাল।

কনি সম্বন্ধে ক্লিফোর্ডের সব কথা শুনে মিসেস বোল্টন বলল, এর কি কোন দরকার আছে? ও যখন যেতে চাইছে, একেবারে ওকে চলে যেতে দিতে পার না? তার থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে পার না?

না, সে বলেছে সে ফিরে আসছে এবং তাকে আসতে হবে।

মিসেস বোল্টন আর বাধা দিল না। ক্লিফোর্ড একটা চিঠিতে কনিকে লিখল, তোমার চিঠিখানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা বলার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি একটু চেষ্টা করে কল্পনা করলেই তা বুঝতে পারবে। অবশ্য আমার জন্য এই কষ্টটুকু করার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। তোমার চিঠির উত্তরে আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি। সেটা হলো এই যে, আমি তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই। তারপর যা হোক একটা কিছু করা যাবে। কিন্তু কিছু করার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব, কথা বলব আমি। তুমি ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিলে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তোমার সে কথা। আমি তোমার সেই প্রতিশ্রুতিটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কথা বিশ্বাস করব না, কোন কথা বুঝব না। এখানে তোমার সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার ফিরে আসার ব্যাপারটাতে কোন অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। তারপর আমাদের কথাবার্তা হওয়ার পর যদি তুমি পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাক তাহলে আমরা তখন একটা চুক্তির মধ্যে আসব।

কনি চিঠিখানা মেলর্সকে দেখাল।

চিঠিখানা কনির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মেলর্স বলল, ও তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে।

কনি প্রথমে চুপ করে রইল। একটা জিনিস দেখে কনি বড় আশ্চর্য হলো।

সে দেখল ক্লিফোর্ডের কাছে ফিরে যেতে তার ভয় করছে। মনে হচ্ছে ক্লিফোর্ড যেন একটা শয়তান বা বিপজ্জনক লোক।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর অবশেষে র‍্যাগবিতে যাওয়ারই ঠিক করল কনি। হিলদা তার সঙ্গে যাচ্ছে। একথা জানিয়ে ক্লিফোর্ডকে চিঠি দিল কনি। তার উত্তরে ক্লিফোর্ড লিখল, আমি তোমার বোনকে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করতে দেব না। অবশ্য তা বলে তাঁকে যে বাড়ি ঢুকতে দেব না তা নয়। আমার প্রতি তোমার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করার ব্যাপারে তিনিই যে তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং তোমাকে সমস্ত মদত যুগিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। সুতরাং তাঁকে দেখে আনন্দিত হব আমি এটা কখনই আশা করতে পার না তুমি।

কনি আর হিলদা দুজনেই একসঙ্গে একদিন র‍্যাগবি গেল। বাড়িতে তখন ক্লিফোর্ড ছিল না। ওরা পৌছলে মিসেস বোল্টন অভ্যর্থনা জানাল। বলল, হে ম্যাডাম, আপনার এই প্রত্যাবর্তন কিন্তু খুব একটা সুখের হলো না।

কনি বলল, তাই নাকি ?

কনির মনে হলো মিসেস বোল্টন সব কথা জানে। কিন্তু আর কজন চাকর এসব কথা শুনেছে বা সন্দেহ করতে শুরু করেছে তা সে জানে না।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কনির মনে হলো এ বাড়ির প্রতিটি ইটকে সে তার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ঘৃণা করে। এই বিরাট বাড়িটা যেন এক ভয়ঙ্কর বস্তু হিসাবে তাকে গ্রাস করতে আসছে। এখন সে যেন এ বাড়ির কর্ত্রী নয়, এক বলির পশু।

হিলদাকে চুপি চুপি বলল কনি, আমি বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না।

কনি সহজভাবে তার শোবার ঘরে ঢুকতে পারল না। কিছুই হয়নি একথা সে ভাবতে পারল না। এবাড়ির মধ্যে একটা মুহূর্তও কাটাতে ঘৃণাবোধ হচ্ছিল তার।

রাতের খাওয়ার আগে ক্লিফোর্ডের সঙ্গে তার দেখা হলো না। ক্লিফোর্ড ফিটফাট পোষাক আর কালো নেকটাই পরেছিল। তাকে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছিল। খাওয়ার সময় খুব ভদ্রভাবে আচরণ করল সে। বেশ মোলায়েম বোধ হচ্ছিল তার কথাগুলো। তার সে কথাগুলোর বেশীর ভাগ ছিল অর্থহীন। যেন উন্মাদের কথা।

কনি একসময় ক্লিফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করল, ঝি চাকরেরা আমার এ সব কথা কতদূর জানে ?

তোমার অভিপ্রায়ের কথা ? কিছুই না।

কিন্তু মিসেস বোল্টন জানে।

ক্লিফোর্ড বলল, মিসেস বোল্টনকে ত ঠিক চাকর বলা যায় না।

ও, আমি ত জানি না।

এইভাবে কফি খাওয়া পর্যন্ত মন-কষাকষি চলল। কফি খাওয়ার পর হিলদা বলল, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

হিলদা চলে যাওয়ার পর কনি আর ক্লিফোর্ড দুজনে সামনাসামনি নীরবে বসে রইল। কনি একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলো। ক্লিফোর্ড খুব একটা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েনি তার জন্য। শক্ত কথা বলে কনি যথাসম্ভব ক্লিফোর্ডের মেজাজটাকে উগ্র রাখার চেষ্টা করছিল। কনি চুপ করে তার হাতগুলোর পানে তাকিয়ে রইল।

ক্লিফোর্ড বলল, আমি আশা করি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে।

কনি বলল, আমি তা পারছি না।

তুমি না পারলে কে পারবে?

আমার মনে হয় কেউ পারবে না।

ক্লিফোর্ড কনির দিকে তাকিয়ে রইল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে এক শীতল রাগের আগুন যেন জমাট বেঁধে ছিল। কনি যেন তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

তার অখণ্ড ব্যক্তিত্বকে খণ্ড বিখণ্ড ও তার দৈনন্দিন অস্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করার এমন দুঃসাহস কোথা থেকে পেল কনি?

ক্লিফোর্ড বলল, কেন তুমি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইছ?

ভালবাসা!

ডানকান ফোর্বের প্রতি ভালবাসা? তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন সে ভালবাসা কোথায় ছিল? তুমি কি বলতে চাও তাকে তুমি এখন তোমার জীবনে সব কিছুর থেকে ভালবাস?

কনি বলল, সব মানুষেরই জীবনে পরিবর্তন আসে।

নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্তনের কারণটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ডানকানের প্রতি তোমার ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু বিবাহবিচ্ছেদের কাজটা সেরে ফেলবে। আমার অনুভূতি নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু কেন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ করতে যাব?

কারণ আমি এখানে আর থাকতে চাই না। আর তুমিও আমাকে সত্যি সত্যিই চাও না।

মাপ করবে; আমার কোন পরিবর্তন হয়নি। যেদিন থেকে তুমি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী হয়ে আস সেদিন থেকেই আমি চেয়ে আসছি তুমি আমার বাড়ির মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। দরকার হলে তোমার ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি সব ঝেড়ে ফেলে দেবে। আমিও তা অনেক দিয়েছি। আমাদের এই দাম্পত্য সম্পর্ককে ছিঁড়ে দেওয়ার অর্থ হবে আমার মৃত্যুর সামিল। তুমি যদি কোন খেয়ালখুশিবশতঃ আমার দৈনন্দিন জীবনের

চারদিকে জমে থাকা যত সব স্বপ্নের কুয়াশাগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দাও তাহলে র‍্যাগবিতে আমি আর থাকতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে কাটিয়ে কনি বলল, কিন্তু কোন উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে। আমার সন্তান হবে।

ক্লিফোর্ড কথাটা শুনে ভাবতে লাগল নীরবে। পরে জিজ্ঞাসা করল, একমাত্র সন্তানের জন্যই কি তোমাকে যেতে হবে?

কনি মাথা নাড়ল।

কিন্তু কেন? ডানকান কি তার সন্তানের প্রতি এতখানি আগ্রহ পোষণ করে?

কনি বলল, তোমার থেকে বেশী আগ্রহ।

কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে চাই এবং তাকে যেতে দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। যদি আমার বাড়িতে তার সন্তান হয় তাহলে সে সন্তানকেও আমি বরণ করে নেব যদি অবশ্য আমাদের দাম্পত্য জীবনের উপযুক্ত মর্যাদা ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়। তুমি কি বলতে চাও তোমার উপর আমার থেকে ডানকানের জোর বেশী আছে? আমি তা মনে করি না।

আবার দুজনেই চুপ।

কনি বলল, কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারছ না আমাকে যেতেই হবে। যাকে আমি ভালবাসি তার সঙ্গে আমাকে বাস করতে হবে।

না, আমি তা মনে করি না। আমি তোমার ভালবাসা আর তোমার সেই ভালবাসার মানুষকে কোন মূল্যই দিতে চাই না। এ সবে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

কিন্তু আমি করি।

তাই নাকি? হে আমার প্রিয়তমা ম্যাডাম, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী, ডানকানের প্রতি তোমার ভালবাসার ব্যাপারে তুমি খুবই সচেতন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো তুমি, ঠিক এই মুহূর্তেও তুমি আমাকেই বেশী ভালবাস। সুতরাং আমি কেন এই সব বাজে বোকামিতে বিশ্বাস করব?

কনি ভাবল ক্লিফোর্ড ঠিক কথাই বলছে। সুতরাং আর তার চুপ করে থাকা চলে না। আসল কথাটা এবার বলা দরকার।

কনি এবার ক্লিফোর্ডের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ডানকানকে আমি ভালবাসি না। তার জন্য যাচ্ছি না। তোমার সম্ভাব্য রাগটাকে এড়াবার জন্যই তার নাম করেছিলাম।

আমার রাগ এড়াবার জন্য?

হ্যাঁ, আমি যাকে ভালবাসি এবং যার নাম করলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে সে হলো মেলর্স, আগে আমাদের এখানে যে শিকার রক্ষকের কাজ করত।

ক্লিফোর্ড যদি পারত তাহলে সে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠত

চেয়ার থেকে। তা না পারলেও কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা হলুদ হয়ে গেল তার। তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠল রাগে।

অবশেষে খাড়া হয়ে বসল ক্লিফোর্ড। ভয়ঙ্করভাবে বলল, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছ ত?

কনি বলল, হ্যাঁ, সত্যি বলছি তা তুমি জান।

কখন তুমি তার সঙ্গে এই প্রেমসম্পর্ক গড়ে তোল?

গত বসন্তের সময়।

পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত এক নিষ্ফল আক্রোশে স্তব্ধ হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড।

তাহলে তার বাসায় শোবার ঘরে তখন তুমিই ছিলে?

এই কথাই সব সময় মুখে কিছু না বললেও মনে করত সে।

কনি বলল, হ্যাঁ।

এবার ক্রুদ্ধ পশুর মতই' কনির পানে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তাহলে ত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

কনি ক্ষীণভাবে অস্ফুট স্বরে বলল, কেন?

ক্লিফোর্ড সেকথা না শুনে আপন মনে গর্জন করতে করতে বলল, একটা পাজী হতভাগা বদমাস লোক, তার সঙ্গে তুমি এখানে থেকে প্রেম করে গেছ। সে ছিল আমার এক সামান্য চাকর। হা ভগবান! নারীদের এই পৈশাচিক নীচতার কি কোন শেষ নেই?

রাগে অন্ধ ও আত্মহারা হয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। কনি জানত সে তা হবে। ক্লিফোর্ড বলল, তুমি বলছ সেই শয়তানটার সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ করেছ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কতদিন হলো এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছ তুমি?

জুন মাস থেকে।

ক্লিফোর্ড নির্বাক হয়ে বসে রইল। তার চোখের শূন্য দৃষ্টিটা শিশুর মত মনে হচ্ছিল।

ক্লিফোর্ড বলল, এই সব সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়।

কোন সন্তান?

কোন কথা না বলে ভয়ঙ্করভাবে কনির পানে তাকিয়ে রইল ক্লিফোর্ড। আসল কথা সে মেলর্সের মত লোকের অস্তিত্বকেই কোনপ্রকারে সহ্য করতে পারছে না। তার নামের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে থাক এটা সে চায় না।

ক্লিফোর্ড অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও? তার মানে তার ঘৃণ্য নামটা বহন করতে চাও?

হ্যাঁ, আমি তাই চাই।

আবার হতবাক হয়ে গেল ক্লিফোর্ড। তারপর বলে চলল, হ্যাঁ, আমি তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম তা সব সত্যি। তুমি এক স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্না

নারী নও। তুমি হচ্ছ অর্ধোন্মাদ বিকৃতমনা সেই মেয়েদের অন্যতম যারা সব নীতিবোধ হারিয়ে ব্যভিচারের ধ্বজা উড়িয়ে যায়।

ক্লিফোর্ডের মনে হলো, একা সেই হলো ন্যায় ও নীতির মূর্ত প্রতীক আর কনি ও মেলর্স সব দুর্নীতির ক্লেদাক্ত জীব।

কনি ফাঁক পেয়ে বলল, তুমি কি মনে করো না আমাকে ত্যাগ করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট কারণ?

ক্লিফোর্ড বলল, না, তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। কিন্তু আমি তোমাকে আইনগতভাবে ত্যাগ করব না।

কেন করবে না?

এক অর্থহীন অক্ষম গোঁড়ামিতে অনড় হয়ে বসে রইল ক্লিফোর্ড।

কনি বলল, তাহলে কি সন্তানটাকে তোমার বৈধ সন্তান বলে মেনে নেবে? তোমার উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নেবে?

আমি সন্তানের ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করি না।

কিন্তু এ সন্তান যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে তোমার উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে।

আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

কিন্তু তোমাকে গ্রাহ্য করতেই হবে। কারণ আমি যদি পারি এ সন্তান যাতে তোমার বৈধ সন্তান বলে গণ্য না হয় তার জন্য চেষ্টা করব। এ সন্তান যদি মেলর্সের নামে চিহ্নিত না হয় তাহলে আমি এ সন্তান অবৈধ বলে ঘোষণা করব। তুমি কি তাই চাও?

ক্লিফোর্ড তেমনি অনড় হয়ে বসে রইল।

কনি আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না? কেন, তুমি ত কারণ হিসাবে ডানকানের নামটা ব্যবহার করতে পার। তার কোন আপত্তি নেই।

না আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।

এই সংকল্পটাকে যেন তার মাথায় পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে।

কিন্তু কেন? আমি এটা চাই বলে?

আমি নিজের মত ও ইচ্ছানুসারে চলি। কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয়।

ক্লিফোর্ডকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা। তাই উপরে চলে গেল কনি। হিলদাকে গিয়ে সব বলল।

হিলদা বলল, ঠিক আছে। চল, কালই আমরা চলে যাই। ওর চৈতন্য হোক।

অর্ধেক রাত জেগে তার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিল কনি। সকাল হতেই ক্লিফোর্ডকে কিছু না বলে তার বাক্সটা স্টেশনে পাঠিয়ে দিল। সে ঠিক করল, একমাত্র শুধু বার হবার সময় বিদায় জানাবে।

কনি মিসেস বোল্টনকে বলল কথাটা। বলল, বিদায় মিসেস বোল্টন, তুমি জান কেন আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আশা করি তোমার উপর বিশ্বাস রাখি, তুমি কাউকে বলবে না এসব কথা।

এ বিষয়ে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ম্যাডাম। আমাদের অবশ্য এখানে আপনাকে ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি সুখী হবেন আপনার মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে।

মনের মানুষ আর কেউ নয়, মেলর্স। স্যার ক্লিফোর্ড জানে। কিন্তু অন্য কাউকে একথা বলো না। ক্লিফোর্ড যদি কোনদিন বিধিমত আমাকে ত্যাগ করতে চায় ত আমাকে জানিও। আমি যাকে ভালবাসি তাকে বিধিমতে বিয়ে করতে চাই।

নিশ্চয় তা পারবেন ম্যাডাম। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি আপনাদের দুজনের প্রতিই বিশ্বস্ত। আমি জানি আপনি আপনার দিক হতে ঠিকই করেছেন।

ধন্যবাদ। আমার কথাটা মনে রেখো।

এইভাবে কনি র‍্যাগবি ছেড়ে হিলদার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেল। মেলর্সও ওদের দেশে গিয়ে একটা খামারবাড়িতে চাকরি নিল। ঠিক হলো, ছমাস ধরে মেলর্স কাজ করে খাবে। পরে কনি কিছু টাকা দিয়ে ওদের একটা নিজস্ব খামার কিনে তাতে দুজনেই দেখাশোনা করবে। দুজনেই একটা কাজ আর আয়ের একটা উৎস পাবে।

অবশ্য তারা এখন এক সঙ্গে থাকতে পাবে না। ওদের সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রেঞ্জ ফার্ম

১৯শে সেপ্টেম্বর।

আমি অনেক চেষ্টা করে এই কাজটা যোগাড় করেছি। পেয়েছি, তার কারণ আমি কোম্পানির এঞ্জিনীয়ার রিচার্ডকে চিনতাম। ও আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করত। এই খামারটা ব্যক্তিগত কোন লোকের নয়, এটা হচ্ছে বাটলার এ্যাণ্ড স্মিথাম কোলিয়ারি কোম্পানির অধীনস্থ এক খামার। এই খামারে যা খড়বিচালি হয় তা কোলিয়ারির ঘোড়াগুলো খায়। এখানে অনেক গরু ও শুয়োরও পালন করা হয়। আমি আমার শ্রমের বেতন হিসাবে সপ্তায় তিরিশ শিলিং করে পাই। এ খামারের অধ্যক্ষ বোলে নানা রকম কাজ দেয় করতে। ফলে পরবর্তী ঈস্টারের আগে আমি অনেক কিছু শিখে নিতে পারব। আমি বার্থা সম্বন্ধে কোন কথা আর শুনিনি। সে এখন কোথায় কি করছে আমার কোন খোঁজ কেন করেনি তার কিছুই জানি না। এইভাবে আগামী মার্চ পর্যন্ত কাটাতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তুমিও স্যার

ক্লিফোর্ডের কথা ভেবো না। সে তোমার থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করবেই।

একটা পুরনো কটেজে সুন্দর একটা বাসা পেয়েছি। কটেজটা একজন এঞ্জিন ড্রাইভারের। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, মুখে দাড়ি আছে। ভদ্রমহিলার নজরটা উঁচু দিকে। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে। দুঃখের বিষয় ছেলেটি যুদ্ধে মারা যায়। মেয়েটি স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি অবসর সময়ে তাকে তার পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করি। আমি এই পরিবারে একজন আত্মীয় হয়ে গেছি। ওরা খুব ভাল লোক, আমার প্রতি খুবই সদয়। আমি তোমার থেকে বেশই সুখে আছি।

আমি চাষের কাজকর্ম ভালবাসি। এতে প্রেরণা পাবার মত আদর্শের অবশ্য কিছু নেই। তা না থাক। আমি গরু ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে থাকতে অভ্যস্ত। আমি যখন কোন গাই গরুর দুধ দোহাই তখন আমার ভালই লাগে। ওদের ছটা ভাল জাতের গরু আছে। ওট ফসল উঠে গেছে। আমার ভালই লেগেছে। তবে বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হয়েছে। আমি অবশ্য এখানকার সব লোকের সঙ্গে মিশি না। কিন্তু ওদের মন্দ লাগে না। ওদের সঙ্গে আমি মিলিয়ে নিয়েছি নিজেকে।

তেভারশালের মত এ জায়গাটাও খনি অঞ্চল। এখানকার খনিগুলো আরো ভাল; কিন্তু এখন খনিগুলো ভাল চলছে না। কাজে মন্দা যাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে ওয়েলিংটনে বসে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলি। তারা অনেক অভিযোগ করে; কিন্তু তারা আসলে কোন পরিবর্তন চায় না। লোকে বলে নটস্ ডার্বি খনির লোকেরা ভালই আছে। আমি কিন্তু এই ভালর কোন চিহ্ন দেখলাম না। লোকগুলোকে আমার ভাল লাগলেও তাদের অবস্থায় আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। তারা প্রায়ই খনি জাতীয়করণের কথা বলে। কিন্তু অন্যান্য খনি জাতীয়করণ না করে শুধু কয়লাখনি জাতীয়করণ করলে তাতে কোন ফল হয় না। ঐসব খনির মালিকরা ক্লিফোর্ডের মত কয়লাগুলোকে অন্যভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবে। কিন্তু এই সব জল্পনা কল্পনায় আমার কোন আস্থা নেই। মোট কথা, এই সব খনিশ্রমিকদের জীবন দুঃখ আর অভিশাপে ভরা। ওদের মত আমিও একথা মনে করি,'বিশ্বাস করি। যুবকরা মাঝে মাঝে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার কথা বলে। কিন্তু তাতে ওদের কোন গভীর বিশ্বাস নেই। যে কোন ব্যবস্থাই হোক, কয়লা উৎপাদনের থেকে কয়লা বিক্রি করার সমস্যাটা বেশী।

এই শিল্পাঞ্চলের লোকদের খাওয়া পরার সমস্যার কোন শেষ নেই। আজকাল পুরুষদের থেকে মেয়েরা বেশী বিক্ষুব্ধ। যুবকদের বিক্ষোভ টাকার জন্য। ফ‌ূর্তি করার মত টাকা নেই। লোকগুলোর চলাফেরার মধ্যে এক নিবিড় হতাশার ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তাদের প্রতিটি গতিভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ওরা যেন আশাহীন আলোহীন এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে

এগিয়ে চলেছে। এই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা। খনিগুলো সপ্তায় মাত্র আড়াই দিন চলে। সুতরাং পঁচিশ থেকে তিরিশ শিলিংএ এক সপ্তা চালাতে হয় শ্রমিকদের। ফলে বাড়ির মেয়েদের সবচেয়ে কষ্টভোগ করতে হয়। তারা পাগলের মত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার উন্নতির কোন আশা নেই।

যদি তুমি তাদের বল সত্যিকারের জীবনযাপনের সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন যোগ নেই তাহলে সেকথা বুঝতে পারবে না তারা। সেকথা বলায় কোন ফল হবে না। ওরা যদি ঠিকমত লেখাপড়া শিখত তাহলে ঐ পঁচিশ তিরিশ শিলিংএই ওরা ভালভাবে সংসার চালাতে পারত। তারা যদি কম দামী ঘোর লাল পায়জামা পরত, তারা যদি অবসর সময়ে নাচ গান করত তাহলে অনেক খরচ কম হত। তাদের অনেক সুন্দর দেখাত। তারা যদি মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারত, মেয়েদের সামনে অকুণ্ঠভাবে উলঙ্গ হতে পারত, মেয়েদের সঙ্গে নাচ গানের মধ্য দিয়ে মেয়েদের আনন্দ দান করতে পারত এবং মেয়েদের থেকে নিজেরাও আনন্দ পেত। তারা যদি তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলোকে কারুকার্যখচিত করতে পারত এবং সূচীশিল্পের দ্বারা তাদের নামকে অলঙ্কৃত করতে পারত তাহলে তাদের টাকার চাহিদা অনেক কমে যেত। আজ দেশের শিল্পগত সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হলো মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগানো এবং সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে শেখানো। সাধারণ মানুষকে চিন্তাশীল হতে হবে না। তারা হবে একমুখী, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। তারা শুধু একটি দেবতার উপাসনা করবে, সে দেবতা হলো প্যান। তারা হবে সবাই পেগান। তাদের মধ্যে দু চার জন ইচ্ছা করলে অন্য কোন মহত্তর দেবতার ভজনা করতে পারে।

কিন্তু এখানকার কোলিয়ারির লোকরা পেগান নয় মোটেই। তারা হচ্ছে নীরস নিরানন্দ জীবনের লোক, নারীদের কাছে নির্জীব; জীবনে বেঁচে থেকেও মৃত প্রাণহীন। যুবকরা মাঝে মাঝে মোটর বাইকে করে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যায়, জাজ নাচের আসরে যোগদান করে। তবু তারা মৃত। টাকা থাকাও খারাপ, না থাকাও খারাপ। টাকা মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তোলে, টাকা না থাকলে মানুষকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়।

তোমার হয়ত এই সব কথা মোটেই ভাল লাগছে না; হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠছ মনে মনে। কিন্তু আমার কথা বলার মত কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি এখন। তোমার সম্বন্ধে আমি এখন আর কিছুই ভাবতে চাই না। ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এটা ঠিক যে এখন আমি যা কিছু করছি, যে জীবন যাপন করছি তা শুধু তোমার জন্য, তোমায় আমায় একসঙ্গে বসবাস করার জন্য। আমি কিন্তু বাতাসে শয়তানের গন্ধ পাচ্ছি। আজকের সমাজজীবনের এই পঙ্কিলতা, অর্থলোলুপতার এই বিষ হয়ত একদিন আমাদের জীবনকেও গ্রাস করবে। জীবনের প্রতি এই ব্যাপক ঘৃণায় অন্তহীন

গরলে আমরাও হয়ত একদিন নীল হয়ে উঠব। আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমাদের মত যারা টাকা ছাড়াই বাঁচতে চাইছে, জীবনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে চাইছে তাদের গলা টিপে মারার জন্য দুটো কালো হাত বাতাসে ভাসছে। মনে হয় এক বিরাট দুর্দিন আসছে। যদি এইভাবে দিন চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে শিল্প শ্রমিকদের ধ্বংস আর মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সময় যত খারাপই আসুক, দুর্দিন যত ঘনিয়েই উঠুক না, এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণচঞ্চলতাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারে না, কেউ নারীপ্রেমের উচ্ছ্বাসকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে পারে না। সুতরাং ওরা যাই করুক, যাই চাক, তোমার প্রতি আমার কামনাকে গলা টিপে হত্যা করতে পারবে না, তোমার প্রতি আমার সকাম অনুরাগের সকল বর্ণচ্ছটাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে পারবে না। পরের বছর আমরা মিলিত হবই। মাঝে মাঝে আমার ভয় করলেও আমাদের এই মিলনে আমি বিশ্বাস করি। আমরা ভবিষ্যৎকে কেউ চোখে দেখতে পাই না। আমরা যদি অন্তহীন সীমাহীন ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে আমাদের ওই জীবনকে প্রসারিত করে না দেখি, আমাদের মধ্যে এক বৃহত্তর ও মহত্তর শক্তিকে বিশ্বাস না করি তাহলে আমরা কখনই বাঁচার মত বাঁচতে পারব না। তোমার আমার মধ্যে এই সম্পর্কের নিবিড়তা ক্ষুন্ন হবে না কোনদিন। তোমার স্মৃতির উত্তাপ আজও আমাকে সঙ্গ দান করে আমার কত নির্জন মুহূর্তে। উত্তপ্ত করে তোলে আমার দেহকে।

আমি তোমার কথা বেশী ভাবি না। ভাবলে বড় কষ্ট হয়। কষ্ট হয় তোমাকে ছেড়ে থাকতে। ধৈর্য, ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ আমার বয়স চল্লিশ। চল্লিশটি শীত আমি কাটিয়েছি। কিন্তু চল্লিশটি শীতের হিমশীতল জড়তার পর আজ অর্থাৎ এবারকার শীতে কিছুটা শান্তি পাব তোমার কথা ভেবে। যদিও তুমি স্কটল্যাণ্ডে আছ আর আমি আছি সুদূর মিডল্যাণ্ডের এক খামারে তথাপি, যদিও আমি এই মুহূর্তে তোমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারি না, তথাপি এক আত্মিক ভাবসম্মিলনের রহস্যে বিশ্বাস করি আমি। আমাদের সেই সঙ্গমের কথা আজ খুব বেশী করে মনে পড়ে। সেই সঙ্গমের এক অনাস্বাদিতপূর্ব যে নিবিড়তা আমাদের আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় স্বচ্ছন্দে সেই নিবিড়তার স্মৃতি আজ শান্তি দেয় আমার আত্মাকে, তৃপ্তি দেয় আমার দেহকে।

এখন আমি সত্যিই ভাল হয়ে গেছি। সঙ্গম বা দেহতৃপ্তিজনিত এক নিবিড়তম প্রশান্তিতে স্তব্ধ হয়ে আছে আজ আমার সকল যৌনক্ষুধার জারজ চঞ্চলতা। এখন আমি ভাল হতে চাই। ভাল হতে ভাল লাগে আমার। মনে হচ্ছে সেদিনের সেই সব উদ্ধত কামনার অগ্নিশিখাগুলো সহসা জমাট বেঁধে গেছে তুষারশীতল এক স্তব্ধতায়। তারপর যখন সত্যি সত্যিই বসন্ত আসবে, যখন

আমাদের মিলন ঘটবে, তখন এই তুষারশীতল অগ্নিশিখাগুলো আবার হলুদ হয়ে জ্বলে উঠবে। তখন আমার আত্মার মধ্যে এই শীতল জলের শান্ত নদীটার বুক দিয়ে বয়ে যাবে আমার জলন্ত কামনার অত্যুষ্ণ স্রোত। কিন্তু এখন নয়। এখন আমাকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে। সংযত থাকতে হবে। আর তাছাড়া তা পারবই বা না কেন? যারা ডন ডুপলের মত রমণক্ষমতাহীন, যারা কোন নারীকে দান করতে পারে না সঙ্গমের অগাধ তৃপ্তির এক শান্ত তরল স্তব্ধতা, তারা কোনদিন শান্ত ও সংযত থাকতে পারে না। অতৃপ্তিজনিত চঞ্চলতার শেষ হয় না তাদের কখনো।

আজ এত কথা বলতে হলো কারণ তোমাকে আজ স্পর্শ করতে পারছি না। অবশ্য আজ যদি তোমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে শুতে পেতাম তাহলেও এমনি শান্ত ও সংযত থাকতাম। দেহমিলনকালে যেমন একদিন চূড়ান্ত অসংযমের পরিচয় দিয়েছি তেমনি আবার সংযমের পরিচয়ও দিতে পারি।

আজ আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই পৃথক থাকতে হবে। দূরে থাকতে হবে। কিছু মনে করো না। দুঃখের কিছু নেই। স্মৃতির এক কৃত্রিম শীতল উত্তাপই যথেষ্ট।

কিছুমাত্র ভয় করো না। ক্লিফোর্ড তোমার কিছুই করতে পারবে না। একদিন সে তোমাকে ত্যাগ করবেই। ত্যাগ করবে এক ঘৃণ্য জীব হিসাবে। আর যদি নাই করে তাহলে আমরাই তার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করে নেব। তবে মনে হয় তার আর দরকার হবে না।

আজ এ চিঠি আমি শেষ করতে পারছি না। অন্তহীন কথার স্রোত বেরিয়ে আসছে তোমাকে লক্ষ্য করে। তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

কিন্তু দেখা হলে অর্থাৎ তোমার আমার মিলন ঘটলে আরো অনেক কথা হবে। এখন এখানেই থাক। অল্পদিনের মধ্যে যাতে আমাদের একবার দেখা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমার জন টমাস কিছুটা নতমুখে বিদায় জানাচ্ছে লেডি জেনকে। তবে অন্তরে তার আশার অন্ত নেই।

ক্রয়ত্জার সোনাতা

The Kreutzer Sonata

লিও তলস্তয়

"···কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোককে কামনার দৃষ্টিতে দেখে, সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।" ম্যাথু। ৫ ; ২৮

"শিষ্যরা তাঁকে বলল, আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের যদি এই সম্পর্ক হয়, তাহলে বিয়ে না করাই ভাল। কিন্তু তিনি তাদের বললেন, যাদের সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়া অপর সকলে এই বাণী গ্রহণ করতে পারে না। কারণ কিছু নপুংসক আছে যারা সেরূপ হয়েই মাতৃগর্ভ হতে জন্মেছে ; আর কিছু নপুংসক আছে যাদের নপুংসক বানানো হয়েছে ; আর কিছু নপুংসক আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেদের নপুংসক করেছে। এই বাণী যে গ্রহণ করতে পারে সে গ্রহণ করুক।"

ম্যাথু। ১৯ ; ১০, ১১, ১২।

এক

প্রথম বসন্তকাল। প্রায় দু'দিন ধরে আমরা পথ চলেছি। অল্প দূরের যাত্রীরা গাড়িতে উঠছে আর নামছে, কিন্তু আমার মত তিনজন যাত্রী ট্রেন ছাড়ার শুরু থেকেই গাড়িতে আছে। তাদের মধ্যে একজন মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক ; দেখতে বিশ্রী, পরনে পুরুষালি কোট ও টুপি, মুখে সিগারেট ; অপরজন তারই পরিচিত, বয়স প্রায় চল্লিশ, বেশী কথা বলে ; সঙ্গে একটা নতুন পরিষ্কার বিছানা, তৃতীয় ভদ্রলোকটি নিজেকে একটু দূরে রেখেই চলেছে। তার উচ্চতা মাঝারি, চালচলনে ছটফটে, বুড়ো না হলেও কোঁকড়া চুলে অকালে পাক ধরেছে, চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, অতি দ্রুত একটা থেকে অন্য একটা জিনিসের উপর চোখ ফেলছে। মাথায় অস্ত্রাখান টুপি, আর পরনে অস্ত্রাখান কলারওয়ালা একটা পুরনো কোট ; দেখলেই বোঝা যায় বেশ দামী দর্জি দিয়ে তৈরি। কোটটা খুলতেই একটা রুশ জ্যাকেট ও কাজ-

করা কলারওয়ালা একটা কৃশ ব্লাউজ চোখে পড়ল। ভদ্রলোকটির একটা বৈশিষ্ট্য হল, মাঝে মাঝেই সে এমন শব্দ করছে যা অনেকটা গলা খাঁকারি দেওয়ার মত, অথবা চাপা হাসির মত।

সারাটা পথ এই ভদ্রলোক বেশ চেষ্টা করেই অন্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা বা মেলামেশা করা থেকে বিরত থেকেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কাটা কাটা জবাব দিয়েছে, আর সময়টা কাটিয়েছে বই পড়ে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে, ধূমপান করে, অথবা খাদ্যের জন্য পুরনো থলেটা হাতড়ে এবং চা বা খাবার খেয়ে।

লোকটি নিঃসঙ্গতায় কষ্ট পাচ্ছে মনে করে বার কয়েক তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখনই আমাদের চোখে চোখ পড়েছে (আর সেটা মাঝে মাঝেই ঘটেছে, কারণ আমরা মুখোমুখিই বসেছিলাম) তখনই সে মুখ ফিরিয়ে হয় একটা বই তুলে নিয়েছে, নয়তো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটা বড স্টেশনে গাড়িটা অনেকক্ষণ থেমে থাকায় এই স্নায়ুবিকল ভদ্রলোকটি বাইরে গিয়ে গরম জল এনে নিজের জন্য চা বানাল। নতুন বিস্তারাওয়ালা লোকটি (পরে জেনেছিলাম সে একজন উকিল) এবং তার সিগারেট খাওয়া, পুরুষালি কোট-পরা বান্ধবীটি স্টেশনেব রেস্তোরাঁতে চা খেতে নেমে গেল।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকটির অনুপস্থিতিকালে কিছু নতুন যাত্রী গাড়িতে উঠল ; তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি সম্ভবত বণিক ; লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো, মুখে বলি-রেখা, পরনে লোমের লাইনিং দেওয়া কোট, আর মস্ত বড় মুখাবরণ সমেত একটা সুতীর টুপি। যেখানে উকিল আর স্ত্রীলোকটি বসেছিল তার ঠিক উল্টো দিকে বণিকটি এসে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র উঠে-আসা দোকান কর্মচারির মত দেখতে একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল।

আমি তাদের উল্টো দিকে কোণাকুনি জায়গায় বসেছিলাম ; ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল বলেই যখন লোকজন যাওয়া-আসা করছিল না তখন তাদের কিছু কিছু কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। বণিকটি জানাল, মাত্র একটি স্টেশন পরে সে তার দেশের বাড়িতে যাচ্ছে ; তারপরই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও দর-দামের আলোচনা শুরু করল এবং কথাপ্রসঙ্গে মস্কোর বাজার ও নিঝনি-নভ্‌গরদ মেলার কথাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল। তার পরিচিত দুজন ধনী ব্যবসায়ী মেলায় যে সব কেলেংকারী কাণ্ড করেছে, দোকান-কর্মচারিটি তারই বর্ণনা দিতে লাগল, কিন্তু বুড়ো লোকটি তাকে বাধা দিয়ে কুনাভিনো-তে সে স্বয়ং যে সব কেলেংকারী কাণ্ড করেছে তাই বলতে শুরু করল।

তার ভাব দেখে মনে হল এ সব কাণ্ডকারখানার জন্য সে গর্ববোধ করে ; মুখের উপর একটা খুসি-খুসি ভাব টেনে এনে কি ভাবে সে ও তার একজন পরিচিত লোক মাতাল অবস্থায় একটা কুকাজ করেছিল চুপি চুপি তাও বলতে

লাগল : দোকান-কর্মচারিটি এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে সমস্ত গাড়িখানাই গম-গম করে উঠল, আর বুড়ো লোকটিও দুটো লম্বা হলদে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

ভাল কিছু শোনবার আশা নেই বুঝতে পেরে ট্রেনটা না ছাড়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। দরজাতেই উকিল ও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হল ; তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছে।

মিশুক উকিলটি আমাকে বলল, "পায়চারি করবার সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে দ্বিতীয় ঘণ্টাটা বাজবে।"

সত্যি সত্যি আমি ট্রেনের শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠল। ফিরে এসে দেখলাম উকিল ও স্ত্রীলোকটি আগের মতই সোৎসাহে কথা বলে চলেছে। বুড়ো বণিকটি একটু দূরে চুপচাপ বসে আছে ; একদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই দাঁতে দাঁত ঘসে তার আপত্তি প্রকাশ করছে।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম উকিলটি হেসে বলছে, "সে শুধু তার স্বামীকে জানিয়ে দিল যে তার সঙ্গে সে আর বসবাস করবে না, কারণ—"

বাকিটা আর শুনতে পেলাম না। আমার পিছনে কিছু যাত্রী এল, তারপর কণ্ডাক্টর, তারপর একজন মজুর দৌড়ে চলে গেল, এবং কিছু সময় পর্যন্ত এত গোলমাল ও হৈ-চৈ হতে লাগল যে আমি কোন কথাই শুনতে পেলাম না।

অবস্থা শান্ত হয়ে এলে উকিলের গলা আবার যখন আমার কানে এল তখন তার একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ থেকে একটি সাধারণ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। উকিলটি বলছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা ইওরোপে সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং রাশিয়াতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার কথাই সকলে শুনছে দেখে সে বৃদ্ধ লোকটির দিকে মুখ ফেরাল।

স্মিত হাসির সঙ্গে বলল, "আগেকার দিনে এ রকমটা ছিল না, তাই নয় কি ?"

বুড়ো লোকটি সবে জবাব দিতে যাবে এমন সময় ট্রেনটা চলতে শুরু করল, আর সেও টুপিটা খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং রুদ্ধশ্বাসে প্রার্থনা করতে লাগল। উকিলটি ভদ্রতার সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। প্রার্থনা শেষ করে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বুড়ো লোকটি সোজা তার টুপিটা মাথায় দিল, আটো করে নীচে নামিয়ে দিল, এবং আসনে বসে কথা বলতে শুরু করল।

বলল, "আগেকার দিনেও এ রকম ঘটনা ঘটত, তবে সেগুলো সংখ্যায় ছিল অল্প। কিন্তু আজকালকার দিনে এটাই তো প্রত্যাশিত। লোকরা অনেক লেখাপড়া শিখছে যে।"

ট্রেনটা একটা জোড়ের উপর দিয়ে সশব্দে চলার জন্য কথাগুলি ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না, তাই আলোচনাটা ভাল লাগায় আমি বক্তাদের আরও কাছে

গিয়ে বসলাম।

আমার পার্শ্ববর্তী স্নায়ু-বিকল ভদ্রলোকটিরও বোধ হয় আলোচনাটি ভাল লাগছিল। কারণ আসন ছেড়ে না এলেও সে কথাগুলি শোনবার জন্য গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ম্লান হাসি হেসে স্ত্রীলোকটি বলল, "লেখাপড়া শেখা কি অন্যায়? আপনি কি মনে করেন, আগেকার দিনে যে পাত্র-পাত্রীরা বিয়ের আগে পরস্পরকে চোখের দেখাটি পর্যন্ত না দেখে বিয়ে করে বসত সেটাই ভাল ছিল? পরস্পরকে ভালবাসে কি না, অথবা কোনদিন ভালবাসতে পারবে কি না সেটা না জেনেই হাতের কাছে যাকে পেত তাকেই তারা বিয়ে করে বসত, এবং পরে সারাটা জীবন যন্ত্রণা ভোগ করত। আপনি কি মনে করেন, সেটা ভাল ছিল?" স্পষ্টই বোঝা গেল, বৃদ্ধ লোকটির পরিবর্তে সে আমাকে এবং উকিলটিকেই প্রশ্নগুলি করল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বণিকটি পুনরায় বলল, "আজকাল তারা অনেক লেখাপড়া শিখছে।"

উকিলটি ঈষৎ হেসে প্রশ্ন করল, "লেখাপড়া এবং অসুখী বিয়ের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন?"

বণিকটি জবাব দেবার আগেই স্ত্রীলোকটি বাধা দিয়ে বলল, "না, না। সে সব দিনকাল চিরদিনের মত চলে গেছে।"

উকিলটি বলল, "থাম, ওর মতামতটা বলতে দাও।"

বুড়ো লোকটি সপ্রতিভভাবে বলল, "লেখাপড়ার সঙ্গে অনেক বোকামিরও আমদানি হয়।"

"যারা পরস্পরকে ভালবাসে না তাদের তারা বিয়ে দিয়ে দেয়, আর তারপরে তাদের অসুখী দেখে অবাক হয়ে যায়," আমার এবং উকিলটির দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি দ্রুত কথা বলে উঠল; এমন কি যে দোকান-কর্মচারিটি উঠে গিয়ে সিটে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের কথা শুনছিল, স্ত্রীলোকটি তার দিকেও তাকিয়েই কথাগুলি বলল। "জন্তু-জানোয়াররাই প্রভুর ইচ্ছামত সঙ্গী-সাথী পেয়ে থাকে; মানুষেরই থাকে রুচি ও ভাল-লাগার প্রশ্ন, "বুড়ো লোকটিকে আঘাত করবার জন্যই সে কথাগুলি বলল।

বুড়ো লোকটি বলল, "দেখ মেয়ে, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। জানোয়াররা পশু; মানুষকেই আইন মেনে চলতে হয়।"

নিজের নতুন ধারণাকে প্রকাশ করবার ব্যস্ততায় স্ত্রীলোকটি বলল, "একটি পুরুষ যাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে তাকে আপনি কেমন করে ঘর করতে বলেন?"

বুড়ো লোকটি বেশ জোর দিয়েই বলল, "আগেকার দিনে এই সব পার্থক্য ছিল না। এসব ধারণা নতুন মাথা চাড়া দিয়েছে। আগে কোন মেয়ে বলত

না, 'আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।' আজকাল চাষীরাও এই স্টাইল ধরেছে। সে মেয়েটিও বলে, 'রইল তোমার শার্ট আর ব্রীচেস; আমি ভানিয়া-র সঙ্গে চললাম—তার চুলটা বেশী কোঁকড়ানো।' তাহলেই বোঝ। মেয়েদের মনে ভয় থাকা দরকার।"

দোকান-কর্মচারিটি উকিলের দিক থেকে আমার দিকে, এবং সেখান থেকে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল; তার ঠোঁটে চাপা হাসি; যেন বণিকের কথায় সায় দেবে না হাসবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, "কিসের ভয়?"

"কিসের? স্বামীকে ভয়; তাই তো চাই।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "দেখ গো ভালমানুষ, সে সব দিনকাল চলে গেছে।"

"না গো ভাল মেয়ে, সে সব দিনকাল কোনকালে চলে যাবে না। পুরুষের বুকের পাঁজড় থেকে ঈভকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, শেষদিন পর্যন্ত তাই সে থাকবে।" স্থির সংকল্পে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এমন কঠিন গলায় বুড়ো লোকটি কথা বলল যে দোকান-কর্মচারিটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিল তারই জয় হয়েছে। আর তাই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

স্ত্রীলোকটিও হার মানবার পাত্রী নয়; সে বলে উঠল, "তোমরা পুরুষরাই শুধু একথা ভাব। সব স্বাধীনতা তোমরা ভোগ করছ, আর আমাদের রাখতে চাও জেলখানায় বন্দী করে। তোমরা নিজেরা যা খুসি তাই করতে পার।"

বুড়ো লোকটি সেই একই ভারী গলায় বলল, "কেউ আমাদের সে অধিকার দান করে নি; আর মেয়েদের তো সাবধানতা রক্ষা করেই চলতে হয়।"

মনে হল, শ্রোতারা তার কথাই মেনে নিচ্ছে; স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারল যে তার অবস্থা কাহিল, তবু সে হাল ছাড়ল না।

"কিন্তু তোমরা একথা তো নিশ্চয় স্বীকার করবে যে স্ত্রীলোকও মানুষ, মানুষের মত তারও হৃদয়-বৃত্তি আছে। নিজের স্বামীকে যদি ভাল না বাসে, তাহলে সে কি করবে?"

ভুরু ও ঠোঁট নামিয়ে কঠিন গলায় বণিক জবাব দিল, "তাকে ভালবাসবে না? তাকে ভালবাসতে শিখতে হবে!"

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে খুসি হয়ে দোকান-কর্মচারিটি সরবে তাকে সমর্থন জানাল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "না, তা সে করবে না। সে যদি স্বামীকে ভালবাসতে না পারে তাহলে তার উপর জোর খাটানো চলবে না।"

"কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে কি হবে?" উকিল প্রশ্ন করল।

বৃদ্ধ বলল, "তা হতে দেওয়া চলবে না। সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

"কিন্তু যদি হয় তাহলে? যতই হোক, সে রকমটাও তো ঘটে।"

বৃদ্ধ বলল, "হয়তো কোন কোন লোকের মধ্যে এ রকমটা ঘটে, কিন্তু আমাদের মত লোকের মধ্যে ঘটে না।"

কেউ কোন কথা বলল না। দোকান-কর্মচারিটি পা সরিয়ে আরও কাছে এগিয়ে গেল; সেও আলোচনার বাইরে থাকতে চায় না; তাই একটু হেসে কথা বলতে শুরু করল।

"একবার আমার মনিবের পরিবারে একটা কেলেংকারি হয়েছিল। দোষ যে কার তা বোঝা শক্ত। ছেলের বৌটার চরিত্র খারাপ ছিল। সে ফাঁকি-বাজী শুরু করল। ছেলেটি ভদ্র। বৌটা প্রথমে হিসাবনবীশের সঙ্গে জমে গেল। ছেলেটি ভালভাবে বোঝাল। কোন ফল হল না। মেয়েটা যাচ্ছেতাই। সে টাকা চুরি করতে শুরু করল। ছেলেটি উত্তম-মধ্যম দিল। ফল আরও খারাপ হল। সে একজন অদীক্ষিতের সঙ্গে—যদি কিছু না মনে করেন তো বলি, একজন ইহুদীর সঙ্গে জমে গেল। ছেলেটি আর কি করবে? বৌকে ত্যাগ করল। আজও পর্যন্ত অবিবাহিতের মতই থাকে, আর বৌটা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।"

বৃদ্ধ বলল, "ছেলেটাই বোকা। প্রথম থেকেই যদি বৌকে কড়া শাসনে রাখত, লাগাম ছেড়ে না দিত, তাহলে আজও বৌ তার সঙ্গেই থাকত। গোড়ায় লাগাম ছেড়ে দেওয়াই ভুল। 'মাঠে ঘোড়াকে আর বাড়িতে বৌকে কখনও বিশ্বাস করো না।"

ঠিক সেই সময় কণ্ডাক্টর এল পরের স্টেশনের টিকিট সংগ্রহ করতে। বুড়ো লোকটি তাকে নিজের টিকিটটা দিল।

"হাঁা, সুন্দরীদের গোড়া থেকেই বাগে আনতে হয়, নইলে সব সর্বনাশ।"

"আর তোমরা বিবাহিতরা এইমাত্র কুনাভিনো-র মেলায় যে সব কাণ্ড-কারখানার বিবরণ দিলে তার বেলায়?" আমি কথাগুলি না বলে পারলাম না।

"ওটা আলাদা ব্যাপার।" এইটুকু বলেই বণিক চুপ করে গেল।

হুইস্‌ল্ বাজতেই বুড়ো লোকটি উঠে আসনের নীচ থেকে বস্তাটা টেনে বের করল, গ্রেটকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর টুপীটা তুলে বেরিয়ে গেল।

দুই

সে চলে যেতেই কয়েকটি কণ্ঠ একযোগে কথা বলে উঠল।

"লোকটা সেকেলে," দোকান-কর্মচারিটি বলল।

"একটি পিতৃতান্ত্রিক শাসক। নারী ও বিবাহ সম্পর্কে কী সব সেকেলে আদিম ধারণা!" স্ত্রীলোকটি বলল।

"হুম, বিয়ের ব্যাপারে আমরা ইওরোপীয়দের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছি", উকিল বলল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "এই সব লোকরা আসল কথাটাই বুঝতে পারে না যে, ভালবাসাহীন বিয়ে একটা বিয়েই নয়, ভালবাসাই বিয়েকে পবিত্র করে, আর ভালবাসার দ্বারা যে বিয়ে পবিত্র হয় সেটাই আসল বিয়ে।"

দোকান-কর্মচারিটি হাসিমুখে কথাগুলি শুনল; ভবিষ্যতে সুযোগ মত ব্যবহার করবার জন্য এই ভাল ভাল কথাগুলিকে সে মুখস্থ করতে চেষ্টা করল।

স্ত্রীলোকটির কথার মাঝখানে চাপা হাসি অথবা কান্নার মত একটা শব্দ আমার কানে এল। মুখ ফিরিয়ে আমার পাশের সেই পাকা চুল, চকচকে চোখ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেলাম। আমরা এতক্ষণ খেয়াল করি নি যে, আমাদের কথা শোনবার আগ্রহে সে আরও কাছে সরে এসেছে। সে আসনের পিছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। গালের মাংসপেশীগুলি কুঁচকে উঠেছে।

সে আমতা-আমতা করে বলল, "সে ভালবাসাটা কি জিনিস···সেই ভালবাসা···সেই ভালবাসা যা বিয়েকে পবিত্র করে?"

তার উত্তেজনা লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি শান্ত গম্ভীর স্বরে বলল, "প্রকৃত ভালবাসা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন সেই ভালবাসা জন্মে তখনই বিয়েটা সম্ভব হয়।"

"তা ঠিক, কিন্তু কেমন করে বুঝব প্রকৃত ভালবাসা কি?" সচেতন হাসির সঙ্গে চকচকে চোখ ভদ্রলোকটি ইতস্তত গলায় বলল।

এ আলোচনা শেষ করবার ব্যগ্রতায় স্ত্রীলোকটি বলল, "প্রকৃত ভালবাসা যে কি তা সকলেই জানে।"

"আমি জানি না, ভদ্রলোকটি বলল। "আপনার মনের কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার।"

"খুবই সহজ কথা," বলেই স্ত্রীলোকটি থেমে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "ভালবাসা? অন্য সকলকে ছেড়ে একজনকে ভাল লাগাই ভালবাসা।"

"কতদিনের জন্য ভাল লাগা? এক মাস? দু দিন? আধ ঘণ্টা?" পাকা চুল ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলল।

"আরে থামুন, আপনি হয় তো সম্পূর্ণ আলাদা কোন কিছু ভাবছেন।"

"না, আমি ঐ একই জিনিস ভাবছি।"

উকিল বুঝিয়ে বলল, "উনি বলতে চান, বিবাহের আবির্ভাব হওয়া উচিত প্রথমত অনুরাগ—ইচ্ছা করলে ভালবাসাও বলতে পারেন—থেকে, আর একমাত্র যখন সেটা থাকে তখনই বিবাহকে বলা যেতে পারে···মানে···একটা পবিত্র কিছু। আপনি তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন?" স্ত্রীলোকটির দিকে ঘুরে সে বলল।

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়ল।

"আর তারপরে···উকিলটি কথা বলতে শুরু করতেই ভদ্রলোকটি তাকে থামিয়ে দিল। তার চোখ দুটি এবার কয়লার মত জ্বলছে; তার উত্তেজনা এতখানি বেড়েছে যে সে নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারল না।

"আমিও ঠিক ওই কথাই বলছি—অন্য সকলকে ফেলে একটি নর বা নারীকে ভাল লাগা; কিন্তু আমি জানতে চাই,—কতদিনের জন্য?"

"কতদিনের জন্য? দীর্ঘ দিন, অনেক সময় সারা জীবনের জন্য," কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল।

"কিন্তু সে তো শুধু উপন্যাসেই ঘটে, জীবনে কখনও ঘটে না। জীবনে এক জন লোককে এই ভাললাগা খুব অল্প ক্ষেত্রেই বছরের পর বছর ধরে টিকে থাকে, প্রায়শই সেটা টেকে কয়েক মাস, কখনও কয়েক সপ্তাহ, দিন, বা ঘণ্টা মাত্র।" ভদ্রলোকটি বুঝতে পারছে যে তার এই কথা শুনে সকলেই আহত হচ্ছে আর তাতেই সে খুসি হয়ে উঠেছে।

"আপনি কী বলছেন! মোটেই তা নয়। কিন্তু শুনুন—" আমরা তিনজন একবাক্যে প্রতিবাদ জানালাম। এমন কি দোকান-কর্মচারিটি পর্যন্ত সশব্দে তার অসম্মতি জানাল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি," পাকা চুল ভদ্রলোক এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে আমাদের সকলের গলাই ডুবে গেল। "যা আছে বলে মনে করা হয় আপনারা বলছেন তার কথা, আর আমি বলছি তার কথা যা সত্যি সত্যি আছে। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখলেই প্রত্যেকটি পুরুষের যে অভিজ্ঞতা হয় তাকেই আপনারা বলছেন ভালবাসা।"

"কিন্তু আপনি যা বলছেন সে তো সাংঘাতিক! যাই বলুন, মানুষের মনে এমন অনুভূতি আছে যাকে বলে ভালবাসা, আর সেটা সারা জীবন টিকে থাকে, শুধু কয়েকটি মাস বা বছর নয়।"

"না, না, সে রকম কিছু নেই! সারা জীবন ধরে একটি পুরুষের কোন একটি নারীকে ভাল লাগে এ সম্ভাবনা যদি স্বীকার করেও নি, তবু সেই নারীর ভাল লাগে অন্য কাউকে এই সম্ভাবনাই আরও অনেক বেশী। এই হচ্ছে আসল কথা, আর চিরদিন এটাই সত্য," একটি সিগারেট বের করে আগুন ধরাতে ধরাতে সে কথাগুলি বলল।

উকিল বলল, "কিন্তু এ অনুভূতি তো পারস্পরিক হওয়াও সম্ভব।"

"না, সম্ভব নয়," অপর জন পাল্টা কথা বলল। "একটা গাড়িতে যখন মটর-দানা বোঝাই করা হয় তখন পূর্ব-নির্বাচিত দুটি মটর-দানা ঠিক পর পর পড়বে সেটা যেমন সম্ভব নয়, এটাও তাই। তাছাড়া, নর-নারীর ব্যাপারে সম্ভাবনার সূত্রের চাইতেও বেশী কাজ করে ক্লান্তি। সারা জীবন ধরে একটি পুরুষ বা নারীকে ভালবাসা—আরে, সে তো একটিমাত্র মোমবাতি সারা

জীবন ধরে জ্বলবে এটা আশা করারই সামিল," সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে সে বলল।

"কিন্তু আপনি তো বলছেন শুধু দৈহিক ভালবাসার কথা। ভাবের ঐক্য অথবা আধ্যাত্মিক মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত ভালবাসা কি আপনি স্বীকার করেন না?" স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করল।

"আধ্যাত্মিক মিলন। ভাবের ঐক্য!" লোকটির কণ্ঠে প্রতিধ্বনি বাজল; আবার সেই একই শব্দ আমি শুনতে পেলাম। "তাহলে তো এক সঙ্গে ঘুমোবার কোন কারণই থাকে না (আমার স্থূলতা ক্ষমা করবেন)। ভাবের ঐক্যের বশে মানুষ একসঙ্গে ঘুমুতে গেছে, এমন কথা কে কবে শুনেছে?" একটা অস্বাভাবিক হাসি হেসে সে কথাগুলি বলল।

উকিল বলল, "আরে থামুন। বাস্তব ঘটনা আপনার বক্তব্যের বিরোধী। আমরা দেখছি, পৃথিবীতে দাম্পত্য সম্পর্ক আছে, সব মানুষই, অন্তত অধিকাংশ মানুষই এই ভাবে জীবনযাপন করে, এবং অনেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত বিবাহিত জীবন কাটায়।"

পাকা চুল ভদ্রলোকটি আবার হেসে উঠল।

"প্রথমে আপনি বললেন, বিবাহ ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আমি যখন দৈহিক ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন ভালবাসার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলাম, তখন আপনি বিবাহের অস্তিত্বকে দিয়ে ভালবাসার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চাইলেন। আজকালকার দিনে বিয়েটা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।"

উকিল বলে উঠল, "না, না, আমি প্রতিবাদ করছি। আমি শুধু বলেছি, বিবাহ আছে, এবং চিরকাল আছে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আছে? বিবাহ আছে এবং চিরকাল আছে সেই সব মানুষের মধ্যে যারা মনে করে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন, আর সেই পবিত্রতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু কর্তব্য যার জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। সেই সব মানুষের মধ্যে বিবাহ আছে, কিন্তু আমাদের সমাজের লোকদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে মানুষ যখন বিয়ে করে তখন তার মধ্যে তারা সহবাস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, আর তার ফলে তাদের কাছে বিয়েটা হয় নির্যাতন আর না হয় প্রতারণা। এই দুই পাপের মধ্যে প্রতারণাই অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ। স্বামী-স্ত্রী এই ভেবে পরস্পরকে ঠকায় যে তারা এক-বিবাহের জীবন যাপন করছে। কারণ আসলে তারা যাপন করে বহু-বিবাহের জীবন। এটা অন্যায়, কিন্তু সহনীয়। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী যখন সারা জীবন একসঙ্গে বাস করবার দায়িত্বকে গ্রহণ করে এবং প্রথম মাসের পর থেকেই পরস্পরকে ঘৃণা করে, বিচ্ছেদের জন্য লালায়িত হয়, অথচ তখনও একসঙ্গেই বাস করতে থাকে, তখন তাদের জীবনে দেখা দেয় সেই

অবর্ণনীয় দুঃখ যার ফলে মানুষ মদ খেতে শুরু করে, আত্মহত্যা করে, নিজেদের এবং পরস্পরকে খুন করে এবং বিষ খাওয়ায়," ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সঙ্গে সে কথাগুলি বলতে লাগল; পাছে আর কেউ কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে তার বাকভঙ্গি দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল। সে যখন থামল তখন চারদিকে এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

এই উত্তেজিত, অশোভন আলোচনার ইতি টানবার আশায় উকিল বলল, "তা তো বটেই; নিঃসন্দেহে বিবাহিত জীবনেও অনেক সংকট-মুহূর্ত আছে।"

আপাত শান্তভাবে নরম গলায় ভদ্রলোক বলল, "দেখছি আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

"না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি—"

"সৌভাগ্যের ব্যাপার মোটেই নয়। আমি পজ্‌দ্‌নিশেভ। যে সংকট-মুহূর্তের কথা আপনি বলেছেন তাকেও আমি পার হয়ে এসেছি এবং পার হতে গিয়েই আমার স্ত্রীকে খুন করেছি," আমাদের প্রত্যেকের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে কথাগুলি বলল।

বলবার মত কিছু না পেয়ে আমরা সকলেই চুপ করে বসে রইলাম।

আর একবার সেই রকম অদ্ভুত শব্দ করে সে বলল, "সে কথা থাক। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি···মানে···আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না।"

"এগিয়ে আসুন, আমি বলছি···", উকিল বলল; "আমি বলছি," কথা দুটির দ্বারা সে যে কি বলতে চাইল তা সে নিজেই জানে না।

তার কথায় কান না দিয়ে পজ্‌দ্‌নিশেভ দ্রুত ঘুরে গিয়ে বসে পড়ল। উকিল ও স্ত্রীলোকটি নীচু গলায় কথা বলতে লাগল। আমি বসেছিলাম পজ্‌দ্‌নিশেভ-এর ঠিক পাশে। আমিও কিছু বললাম না। কামরাটা এত অন্ধকার যে পড়া যায় না; কাজেই আমি চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইলাম। এইভাবে নিঃশব্দে আমরা পরের স্টেশনটাতে পৌছে গেলাম।

কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল; সেখানে পৌছে উকিল স্ত্রীলোকটি অন্য গাড়িতে চলে গেল। দোকান-কর্মচারিটি বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পজ্‌দ্‌নিশেভ এন্তার সিগারেট খেতে লাগল, আর আগের স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়ালে যে চা-টা তৈরি করেছিল তাই খেতে লাগল।

আমি চোখ মেলে তার দিকে তাকাতেই সে হঠাৎ বিরক্ত গলায় আমাকে বলে উঠল, "আমি কে সেটা জানবার পরে আপনি হয় তো আমার সঙ্গে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছেন? তা যদি হয়, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।"

"আরে, মোটেই তা নয়।"

"তাহলে তো আপনিও নিশ্চয় একটু খাবেন? কিন্তু এটা খুবই কড়া",

আমার জন্য খানিকটা চা ঢালতে ঢালতেই সে বলল।

"কথা আর কথা… তাও মিথ্যা ছাড়া কথা নেই," সে বলল।

"কিসের কথা বলছেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ঐ একই ব্যাপার: তাদের ভালবাসার কথা, আর আসলে সেটা কি জিনিস তাই। আপনি কি খুব ক্লান্ত?"

"মোটেই না।"

"তাহলে ওই একই ভালবাসার জন্য আমি যা করেছি সেটা কেন করলাম তা আপনাকে বলতে চাই।"

"যদি আপনার খুব কষ্ট না হয়।"

"কিছু না বললেই আমার বেশী কষ্ট হয়। চা-টা খান। না কি ওটা খুবই কড়া?"

চা-টা সত্যি বীয়ারের মত, কিন্তু আমি এক গ্লাস খেলাম। ঠিক সেই সময় কণ্ডাক্টর পাশ দিয়ে চলে গেল। আমার সঙ্গী জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল এবং সে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে গল্পটা শুরু করল।

তিন

"আচ্ছা, তাহলে বলছি। আপনি কি সত্যি চান যে আমি বলি?"

আমি আমার সম্মতি জানালাম। সে এক মিনিট অপেক্ষা করল, হাত দিয়ে মুখটা ঘষল, তারপর শুরু করল।

"যদি বলতেই হয় একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতেই হবে; আমাকে বলতেই হবে কেন আমি বিয়ে করলাম, আর বিয়ের আগেই বা আমি কেমন ছিলাম।

বিয়ের আগে আমি অন্য যে কোন লোকের মতই দিন কাটাচ্ছিলাম—যে কোন লোক মানে আমাদের সমাজের যে কোন লোক। আমি একজন জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মাস্টার্স ডিগ্রি আমার আছে। বিয়ের আগে আমি অন্য যে কোন লোকের মতই দিন কাটাচ্ছিলাম…তার অর্থ আমিও একটি লম্পটের জীবন যাপন করছিলাম এবং আমাদের সমাজের প্রত্যেকের মতই আমিও নিশ্চিত জানতাম যে সে জীবন যাপন করে আমি ঠিক কাজই করছি। নিজেকে আমি বেশ ভাল ভদ্রলোক বলেই মনে করতাম। আমি কাউকে ফুসলাই নি, আমার কোন রকম বিকৃত রুচি ছিল না, আর আমার বয়সের অন্য অনেকের মত এটাকেই জীবনের প্রধান কাজ করে তুলি নি; স্বাস্থ্যের খাতিরেই রুচি ও মর্যাদামাফিক আমি কামনা চরিতার্থ করতাম। যে সব স্ত্রীলোক সন্তানের জন্ম দিয়ে অথবা গভীর অনুরাগের সৃষ্টি করে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে তাদের আমি এড়িয়ে চলতাম। আসলে

হয়তো সন্তান এসেছিল বা গভীর অনুরাগ জন্মেছিল, কিন্তু আমি সে সব ব্যাপারে চোখ বুজে থাকতাম। আর এ কাজকে যে আমি শুধু নীতির থেকে বড় বলে মনে করতাম তাই নয়, এ নিয়ে আমি বেশ গর্ববোধ করতাম।"

সে থামল; কোন নতুন চিন্তা এলেই যে ধরনের একটা শব্দ করতে সে অভ্যস্ত পুনরায় সেই রকম শব্দ করল।

সে চেঁচিয়ে বলল, "আর এইটেই হচ্ছে সব চাইতে খারাপ। দৈহিক কাজের মধ্যে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায় না; যে নারীর সঙ্গে তোমার দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছে তার সম্পর্কে সব রকম নৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করাই চরিত্র-হীনতা—প্রকৃত চরিত্রহীনতা। আর আমি যে এই নৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পেরেছিলাম তাকেই মনে করতাম আমার বিজয়-মুকুট। একদা একটি নারী আমার প্রেমে পড়ে আমাকে দেহদান করবার পরে তাকে তার প্রাপ্য অর্থ দিতে ভুলে যাওয়ায় আমি যে বিবেক-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম তা আজও মনে পড়ে। তাকে তার প্রাপ্য টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে তার প্রতি আমার সব রকম নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তবে আমার মনের প্রশান্তি ফিরে এসেছিল। আপনিও আমার সঙ্গে একমত এরকম ভাব দেখিয়ে মাথা নাড়বেন না, "সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি ভাল করেই জানি। আপনি, আপনারা সবাই—সবাই এক, অবশ্য আপনি যদি কোন বিরল ব্যতিক্রম হয়ে থাকেন সে আলাদা কথা। বড় জোর আপনি আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন। কিন্তু তাতে কি? আমাকে ক্ষমা করুন", সে বলল। "আমার কোন উপায় ছিল না, ব্যাপারটা এতই ভয়ংকর, ভয়ংকর, ভয়ংকর।"

"কি এত ভয়ংকর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"নারী এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে ভুলের যে অতলান্ত অন্ধকারে আমরা বাস করি। না, এ বিষয় নিয়ে আমি শান্তভাবে কথা বলতে পারি না, কারণ এই ভদ্রলোক যাকে 'সংকট মুহূর্ত' বললেন সেটা আমার জীবনেও ঘটেছে; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা সেই ঘটনার পর থেকেই আমার চোখ খুলে গেছে, সব কিছুকেই আমি নতুন আলোতে দেখতে পেয়েছি। সব কিছুই বদলে গেছে—ভিতর হয়েছে বাহির, আর বাহির হয়েছে ভিতর!"

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটুর উপর কনুই রেখে তার উপর ঝুঁকে সে আবার কথা শুরু করল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু রেলগাড়ির ঘট-ঘটাং শব্দকে ছাপিয়ে তার আন্তরিক সুন্দর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসছিল।

চার

"হ্যাঁ, যে কষ্ট আমি ভোগ করেছি তারপরেই এবং তার ফলেই আমি বুঝতে পেরেছি এ পাপের মূল কোথায়, বুঝতে পেরেছি কি হওয়া উচিত, এবং সব

ব্যাপারটার ভয়াবহতাটাকে যথাযথভাবে দেখতে পেয়েছি।

"এবার আমাকে বলতে অনুমতি করুন, কবে এবং কেমন করে সেই অবস্থাটার সূত্রপাত হল যা আমাকে ঠেলে দিল সেই সংকট মুহূর্তের মধ্যে। আমার ষোল বছর বয়সে ব্যাপারটার শুরু। তখন আমি জিম্‌নাসিয়াম-এর একটি ছাত্র, আর আমার দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। তখনও আমি নারী-সঙ্গবর্জিত, কিন্তু আমাদের সমাজের অন্য সব দুর্ভাগা সন্তানদের মতই নিষ্পাপ নই। দুটি বছর ধরে অন্য সব ছেলেদের দুর্নীতির প্রভাব তখন আমার উপর পড়েছে। ইতিমধ্যেই মেয়েরা আমাকে জ্বালাতে শুরু করেছে—কোন বিশেষ মেয়ে নয়, মেয়ে জাতটাই তখন মিষ্টি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকতে শুরু করেছে—প্রতিটি মেয়ে আর মেয়ে জাতটার আব্রুহীনতা। নির্জন মুহূর্তগুলিও আমি পবিত্রভাবে কাটাতে পারতাম না। আমার মত শতকরা নিরানব্বইটি ছেলে যে কষ্ট ভোগ করে আমিও সেই কষ্ট ভোগ করতাম। আমি আতংকিত হতাম। কষ্ট পেতাম, প্রার্থনা করতাম, শেষ পযন্ত পরাজিত হতাম। বাস্তবে ও কল্পনায় পাপ করলেও তখনও আমি চরম পদক্ষেপ করি নি। নিজের সর্বনাশ করলেও অন্য কারও উপর তখন হাত রাখি নি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় আমার দাদার জনৈক বন্ধু, একটি ছাত্র, বেশ হাসিখুসি, সেই সব 'ভাল ছেলেদের' একজন যারা অন্যকে মদ খেতে ও তাস খেলতে শেখায়, আসলে যারা প্রথম শ্রেণীর শয়তান—দাদার সেই বন্ধু মদের আসরের শেষে প্রস্তাব করল, চল আমরা 'সেখানে' যাই। আমরা গেলাম। আমার দাদাও তখন পর্যন্ত নারীসঙ্গবর্জিতই ছিল, কিন্তু সেই একই রাতে তারও পতন ঘটল। পনেরো বছরের ছেলে আমিও নিজেকে কলঙ্কিত করলাম, কি করছি না বুঝেই একটি স্ত্রীলোককে কলঙ্কিত করবার কাজে অংশীদার হলাম। আমি যা করলাম সেটা যে অন্যায় সে কথা আমার বড়দের কাছ থেকে কখনও শুনি নি। আজও তা কেউ শোনে না। একথা সত্য যে, 'দশ আজ্ঞায়' এটাকে অন্যায় বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তো 'দশ আজ্ঞা'-কে শিখি শুধু একটি উদ্দেশ্যে,—বাইবেল-এর পরীক্ষায় পুরোহিতের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি, আর সে ব্যাপারেও এ জ্ঞানটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কাজেই যে সব গুরুজনদের মতামতকে আমি মূল্য দিতাম তাদের কেউ কোনদিন আমাকে বলে দেয় নি যে, আমি যা করছি সেটা অন্যায়। বরং আমার শ্রদ্ধেয় লোকদের বলতে শুনেছি যে কাজটা ঠিক। শুনেছি যে কাজটা করবার পরে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা থাকবে না। এ কথা শুনেছি এবং পড়েছি। বড়দের বলতে শুনেছি, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ; সঙ্গীসাথীদের বলতে শুনেছি, এটাই ঠিক কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই এ কাজের মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখিনি। রোগ-সংক্রমণের বিপদ? সে তো জানা কথাই। সহৃদয় সরকারই এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। স্কুলের ছেলেরা যাতে নিরাপদে

তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারে সেজন্য পতিতালয়গুলির উপর সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা সরকারই করেছে। সেটা দেখবার জন্য সরকার থেকে বেতন-ভুক চিকিৎসক রাখা হয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। যেহেতু সরকার ধরে নিয়েছে যে যৌন-সম্ভোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল সেই হেতু শোভন ও সুস্থ যৌন-সম্ভোগের ব্যবস্থা তাকে করতেই হয়েছে। অনেক মায়েদের কথা আমি জানি যারা তাদের ছেলেদের জন্য এই ব্যবস্থা করে থাকে। বিজ্ঞানই যুবকদের পতিতালয়ে পাঠায়।"

"বিজ্ঞান?" আমি বললাম।

"চিকিৎসকরা কি বিজ্ঞানী নয়? বিজ্ঞানের পুরোহিত। তাদের স্বাস্থ্যের জন্যই ব্যভিচারের প্রয়োজন একথা বলে কারা আমাদের যুবকদের ব্যভিচারী করে তোলে? তারা। আর তারপরেই তারা মুখ গোমড়া করে উপদংশ রোগের চিকিৎসায় লেগে যায়।"

"সে কি! তাদের কি উপদংশ সারানো উচিত নয়?"

"উপদংশ সারাবার জন্য যত প্রচেষ্টা করা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি ব্যভিচার দমনের কাজে করা হত তাহলে অনেক কাল আগেই উপদংশ উধাও হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয় যৌন-মিলনকে উৎসাহ দিতে, তাকে নিরাপদ করতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করবার কাজে নয়। কিন্তু আসল কথা তা নয়। কথা হল, কেবল আমাদের সমাজের নয়, চাষী সমাজসহ সব সমাজের দশ ভাগের ন' ভাগ (বেশীও হতে পারে) ছেলের মতই আমি যে পাপ করেছি তার কারণ এ নয় যে কোন একটি বিশেষ নারীর আকর্ষণ আমি জয় করতে পারি নি। কোন স্ত্রীলোক আমাকে ভুলের পথে নামায় নি। আমি পাপ করেছি সেই সমাজের জন্য যে সমাজে আমি বাস করি; আমি পাপ করেছি কারণ আমার চারপাশের কিছু লোক আমার পাপকেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে মনে করে, এবং অন্যরাও মনে করে যে একজন যুবকের পক্ষে এ ধরনের সুখ-সম্ভোগই স্বাভাবিক, এবং এটা শুধু যে ক্ষমার্হ তাই নয়, এটা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি নিজেও এটাকে পাপ বলে মনে করি নি; আমি একাজ করেছি কিছুটা সুখের জন্য আর কিছুটা (আমাকে সেই রকমই বলা হয়েছে) একটা বিশেষ বয়সের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে; এর আগে যে ভাবে ধূমপান করতে বা মদ খেতে শিখেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই কামনা চরিতার্থ করতে শুরু করলাম। তবু এই প্রথম পতনকে ঘিরে একটা চমকপ্রদ ব্যতিক্রমের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। মনে পড়ে, সেই সময়, এমন কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই, একটা প্রচণ্ড দুঃখ আমাকে ঘিরে ধরেছিল, আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল—সে কান্না আমার হারানো নিষ্পাপের জন্য, নারীর সঙ্গে যে সম্পর্কটা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তার জন্য। সেই দিনটি থেকে সে সম্পর্ক আর কখনও পবিত্রতার সম্পর্ক হতে পারবে না। আমি একটা লম্পট হয়ে গেলাম।

আর লম্পট হওয়া মানেই একটা মাতাল, ধূমপায়ী বা নেশাখোরের মত দৈহিক অবস্থায় উপনীত হওয়া। একজন মাতাল, ধূমপায়ী অথবা নেশাখোর যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, তেমনি যে লোক সুখভোগের জন্য কয়েকটি নারীকে গ্রহণ করেছে সেও স্বাভাবিক মানুষ নয়। সে চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেছে, সে লম্পট হয়ে গেছে। আর একজন মাতাল বা নেশাখোরকে যেমন মুখ ও আচরণ দেখেই চেনা যায়, ঠিক তেমনি চেনা যায় একজন লম্পটকে। একজন লম্পট পাপকে প্রতিরোধ করতে পারে, তার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, কিন্তু আর কোনদিন নারীর সঙ্গে পবিত্র, উজ্জ্বল, সরল সম্পর্ক—ভাই-বোনের সম্পর্কের কথা ভাবতেও পারে না। একজন লম্পট যে চোখে একটি যুবতীর দিকে তাকায় তা দেখেই তাকে তৎক্ষণাৎ চেনা যায়। আর আমিও লম্পট হয়ে গেলাম, আজও তাই আছি, আর সেই থেকেই আমার সর্বনাশের সূত্রপাত।"

পাঁচ

"এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল; সেই সময় ঐ একই অভিজ্ঞতার আরও নতুন নতুন দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। হা ঈশ্বর! আমার সেই সব পাশবিকতার কথা মনে করতেও আমার আতংক হচ্ছে! মনে পড়ছে, আমার তথাকথিত নির্দোষিতার জন্য বন্ধুরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। গিল্‌টি করা যুবকের দল! পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ! অভিজাতগণ! মনে পড়ছে এই সব ভদ্রলোক আর আমি স্বয়ং সকলেই ত্রিশ বছর বয়সের ব্যভিচারী, সকলেই স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অত্যন্ত ভয়ংকর শত শত অপরাধে অপরাধী। মনে পড়ছে, আমরা সব ত্রিশ বছর বয়সের ব্যভিচারীর দল সেজেগুজে, পরিষ্কার করে দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ে আতর ছিটিয়ে, ফ্রককোট আর ইউনিফর্ম পরে বসবার ঘরে আর বলনাচের আসরে ঘুর ঘুর করে বেড়াতাম —কী সুন্দর!—যেন সব পবিত্রতার প্রতিমূর্তি!

"মুহূর্তের জন্য ভাবুন তো, কি হওয়া উচিত, আর কি হয়ে থাকে। এই ধরনের কোন ভদ্রলোক যখন আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তার জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ জানি বলেই আমার উচিত তার কাছে গিয়ে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে শান্তভাবে বলা, 'শোন হে বাপু, তুমি কি ধরনের জীবন যাপন কর, কোথায় কার সঙ্গে রাত কাটাও সে সব আমি জানি। এটা তোমার উপযুক্ত ঠাঁই নয়। এখানে সব পবিত্র, নির্দোষ মেয়েরা থাকে। চলে যাও।' ঠিক এই রকমটাই হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরকমের কোন ভদ্রলোক এসে যখন আমার মেয়ে বা বোনের সঙ্গে নাচতে শুরু করে, তার কোমর জড়িয়ে ধরে তখন সে ভদ্রলোক যদি বিত্তবান হয়, যদি তার বড় বড় আত্মীয়-বন্ধু থাকে, তাহলেই আমরা আহ্লাদে আটখানা হই। রিলবুসে-তে রাত কাটিয়ে

এসেও সে আমার মেয়েকে তার উপস্থিতি দিয়ে কৃতার্থ করতে পারে! সে কলঙ্কিতই হোক, আর রোগগ্রস্তই হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। আজকাল তো রোগ-নিরাময়ের নানারকম ব্যবস্থার কথাও তাদের জানা। আরে, বিখ্যাত পরিবারের এমন অনেক মেয়ের কথা আমি জানি যাদের বাবা-মা উপদংশ-রোগগ্রস্তদের সঙ্গে সানন্দে তাদের বিয়ে দিয়েছে! কী নীচ! কী ঘৃণ্য! একদিন নিশ্চয় আসবে যখন এই নীচতা ও প্রবঞ্চনার মুখোশ খুলে যাবে।"

বেশ কয়েকবার সেই অদ্ভুত শব্দটা করতে করতে সে চা খেতে লাগল। চা-টা ভয়াবহ রকমের কড়া, আর মিশিয়ে নেবার মত জলও সেখানে ছিল না। যে দু'গ্লাস আমি খেয়েছি তার ফলই বেশ টের পাচ্ছি। সে নিজেও বেশ বুঝতে পারছে, কারণ সেও ক্রমেই বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই সুস্পষ্ট ও সুরেলা হয়ে উঠছে। সে বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে, টুপিটা একবার খুলছে আবার পরছে। যে আলো-ছায়ার মধ্যে আমরা বসে ছিলাম তাতেই দেখতে পেলাম তার মুখের ভাব-ভঙ্গী বার বার পরিবর্তিত হচ্ছে।

"আর এইভাবে ত্রিশটা বছর কেটে গেল; কিন্তু তার মধ্যে মুহূর্তের জন্যও বিয়ে করার ইচ্ছা এবং একটি পবিত্র উন্নত পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা পরিত্যাগ করলাম না; বরং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একটি উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। নিজে অবৈধ সঙ্গমের পাঁকে গড়াগড়ি খেতে খেতেই এমন একটি মেয়েকে খুঁজতে লাগলাম যে চারিত্রিক পবিত্রতার গুণে আমার স্ত্রী হবার যোগ্য হবে। তাদের অনেককে ফিরিয়ে দিলাম, কারণ তারা আমার পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত এমন একজনকে পেলাম যাকে আমার উপযুক্ত বলে মনে হল। পেন্‌জা-র এক জমিদারের দুই কন্যার সে অন্যতমা। ভদ্রলোক এক সময় খুবই বিত্তশালী থাকলেও তার টাকা-পয়সা প্রায় সবই খুইয়েছেন।

"একদিন রাতে সারাদিন নৌ-বিহার সেরে চাঁদের আলোয় আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, এবং একটা আটো পশমি জামা পরা তার সুগঠিত দেহ ও কোঁকড়া চুলের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পাশেই বসে ছিলাম, তখনই সহসা আমার মনে হল এই সেই মেয়ে। সেই সন্ধ্যায়ই আমার মনে হল আমার সব ভাবনা ও অনুভূতিকে সে উচ্চস্তরের বস্তু বলে বুঝতে পেরেছে। আসলে সেই জামা ও কোঁকড়া চুলে তাকে এতই মানিয়েছিল, আর সারাটা দিন তার এত কাছাকাছি ছিলাম যে আমি তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইলাম।"

"সুন্দর মাত্রই ভাল—এই ভ্রান্ত ধারণা যে কত পরিপূর্ণ হতে পারে সেটাই বিস্ময়কর। একটি সুন্দরী নারী হয় তো অত্যন্ত বাজে কথা বলল, অথচ তার

কথা শুনে আপনি ভাবছেন যে সে খুবই সুন্দর কথাবার্তা বলছে। সে যখন নীচ কথা বলছে আর নীচ কাজ করছে তখনও সে সব আপনার কাছে মনোরম লাগছে। আর ঘটনাক্রমে সে যদি বাজে ও নীচ কথার বদলে সত্যি ভাল ভাল কথা বলে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার মনে হবে যে সে সততা ও জ্ঞানের রাণীস্বরূপা।

"উচ্ছ্বসিত মনে বাড়ি ফিরলাম; মনে স্থির বিশ্বাস, সে নৈতিক পূর্ণতার প্রতীক, আর তাই আমার স্ত্রী হবার যোগ্য। পরদিনই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম।"

"কিন্তু এ সবই যে কতদূর মিথ্যা সেটা লক্ষ্য করুন। প্রতি এক হাজার বিবাহিত লোকের মধ্যে (দুর্ভাগ্যবশত শুধু আমাদের সমাজেরই নয়, নীচু শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও) এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে এর আগেই অন্তত দশ বার বিয়ে করে নি, এবং হয়তো ডন জুয়ান-এর মত একশ' বা এক হাজার বার বিয়ে করে নি। একথা সত্য, আমি শুনেছি এবং দেখেছি যে আজকাল এমন সব পবিত্র হৃদয় মানুষ আছে যারা জানে ও অনুভব করে যে এটা একটা মহৎ ও গুরুগম্ভীর কাজ, কোন তুচ্ছ কাজ নয়। ঈশ্বর তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! কিন্তু আমার কালে প্রতি দশ হাজারে সে রকম একজনও ছিল না। এ কথা সকলেই জানে, অথচ না জানার ভাণ করে। সমস্ত উপন্যাসেই নায়কের হৃদয়াবেগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়, যে সব ফুল ও জলাশয়ের পাশে সে ঘুরে বেড়ায় তার বর্ণনা দেওয়া হয়, কিন্তু কোন সুন্দরী যুবতীর প্রতি সুন্দর নায়কের মহৎ প্রেমের বর্ণনা দেবার সময় সেই সব উপন্যাসে একবারও বলা হয় না এর আগে সে কি ভাবে দিন কাটিয়েছে—বলা হয় না পতিতালয়, বাড়ির দাসী, রাঁধুনি ও অপরের স্ত্রীদের কোন কথা। আর যদি কখনও সে ধরনের অশোভন উপন্যাস লেখাও হয় তাহলে সে উপন্যাস পড়া এবং সে সব বিষয় জানা যাদের সব চাইতে বেশী দরকার সেই সব নিষ্পাপ তরুণীদের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হয় না। প্রথম দিকে গুরুজনরা তরুণীদের বিশ্বাস করাতে চায় যে আমাদের শহর ও গ্রামের অর্ধেক জীবন জুড়েই যে লাম্পট্যের রাজত্ব সেটা সত্য নয়, ক্রমে এই মিথ্যা ধারণায় তারা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের মত তারাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা একটি উচ্চমানের নৈতিক জগতের উচ্চ নৈতিক ধারণার ধ্বজাধারী মানুষ। আর বেচারী তরুণীরা একান্তভাবে তাই বিশ্বাস করে। আমার দুর্ভাগিনী স্ত্রীও ছিল এমনি একটি তরুণী। মনে পড়ছে, তার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তার পরেই আমি তাকে আমার দিন-পঞ্জীখানা দিয়েছিলাম; সেটা পড়ে সে আমার অতীতটা জানতে পারবে, অন্ততঃ আমি যেটা তাকে একান্তভাবেই জানাতে চেয়েছিলাম—আমার সর্বশেষ প্রেমের ঘটনা—সেটা অন্তত সে জানতে পারবে। অন্যরা তো ব্যাপারটা তাকে বলেই দিত; তাই নিজে থেকে তাকে জানানোই

আমি ভাল মনে করেছিলাম। মনে পড়ছে, সব জেনে, সব বুঝে তার সে কী আতংক, হতাশা আর বিমূঢ়তা। মনে হল, সে বুঝি সেই মুহূর্তেই সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে। হায়রে, তাই যদি সে করত!"

সে আবার সেই শব্দটা করল, কথা থামিয়ে দিল। এক চুমুক চা খেল।

ছয়

"কিন্তু না! ভালই হয়েছিল, ভালই হয়েছিল!" সে চেঁচিয়ে বলল। "আমার ন্যায্য পাওনাই পেয়েছি। কিন্তু এ গল্পে সেটা অবান্তর। আমি বলতে চেয়েছি এই সব দুর্ভাগিনী মেয়েরাই ফাঁকিতে পড়ে। তাদের মায়েরা সবই জানে, বিশেষ করে সেই মায়েরা যারা নিজেদের স্বামীদের কাছ থেকেই সব কিছু জানতে পারে। তারা এমন ভাণ করে যেন পুরুষের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু ব্যবহার করে ঠিক তার উল্টো। কোন্ টোপ ফেলে নিজেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য পুরুষদের গাঁথতে হবে তাও তারা জানে।

"আমরা পুরুষরাই কিছু জানি না; জানি না কারণ জানতে চাই না; মেয়েরা ভাল করেই জানে, অত্যন্ত প্রশংসিত কাব্যময় তথাকথিত ভালবাসার জন্ম হয় নৈতিক গুণাবলী থেকে নয়, দৈহিক সান্নিধ্য, চুলের পারিপাট্য ও ফ্রকের রং ও কাটছাট থেকে। একটি ভদ্রলোককে মাত করতে ইচ্ছুক কোন অভিজ্ঞ প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কোন্ পথটা বেছে নেবে; তার উপস্থিতিতেই নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা, এমন কি ব্যভিচারের অভিযোগ, না একটা কুৎসিত, বেখাপ্পা পোষাকে তার সামনে হাজির হওয়া। সে নির্ঘাৎ প্রথমটাই বেছে নেবে। সে জানে, আমরা পুরুষরা যখন মহৎ ভাবের কথা বলি তখন মিথ্যা বলি, আসলে আমরা চাই দেহ, আর তাই তার পাপকে ক্ষমা করলেও কদাপি তার কুৎসিত, বে-মাপ রুচিহীন পোষাককে ক্ষমা করব না। কোন ছলাকলাময়ী সচেতন ভাবেই এটা জানে, আর একটি নির্দোষ যুবতী এটা জানে প্রবৃত্তিবশে, ঠিক যেভাবে জানে একটি পশু।

"এর থেকেই বোঝা যাবে ঐ সব ঘৃণ্য পোষাক, ঐ খোলা ঘাড় ও বাহু, এবং প্রায়-খোলা বুকের অর্থ। মেয়েরা, বিশেষ করে যে সব মেয়ে পুরুষদের কাছ থেকে তাদের জ্ঞান আহরণ করে, ভালভাবেই জানে যে মহৎ প্রেমের কথা শুধু কথাই, পুরুষ আসলে চায় দেহ আর যা কিছু সেই দেহকে আকর্ষণীয় করে তোলে, এবং তাই তারা পুরুষকে উপহার দেয়। সে অভ্যাস আমাদের প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, সেই আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে না দেখে উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের জীবনকে যদি আমরা এই সত্যের আলোয় দেখতে পারতাম, তাহলে দেখতাম যে সেই সমাজটাই একটা আসল পতিতালয়। আপনি মানেন না?

দেখুন, আমি প্রমাণ করে দেব," আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে বলে চলল। "আপনি বলতে চান, আমাদের সমাজের মেয়েরা পতিতালয়ের মেয়েদের চাইতে ভিন্ন স্বার্থের দ্বারা চালিত, কিন্তু আমি বলছি আপনার সে ধারণা ভুল, আর সেটা আমি প্রমাণ করে দেব। মানুষের জীবনে যদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তাদের আন্তর জীবন যদি আলাদা হয়, তাহলে তাদের জীবনের বহিরঙ্গও আলাদা হবে। কিন্তু যে দুর্ভাগিনীদের আমরা ঘৃণা করি, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারপর তাকান আমাদের উচ্চতম সমাজের যুবতীদের দিকে; সেই একই প্রসাধন, একই ফ্যাশন, একই গন্ধদ্রব্য, একই খোলা বাহু, ঘাড় ও বুক, দেহের পশ্চাৎভাগের সেই একই পোষাক-বাহুল্য, বহুমূল্য রত্নাদি ও দামী ঝকঝকে অলংকারের প্রতি সেই একই আসক্তি, সেই একই প্রমোদ-উপকরণ—নাচ, গান ও বাজনা। পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে একজনরা যা করে, অন্যরাও ঠিক তাই করে থাকে। কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যদি একটা অতি সূক্ষ্ম ভেদ-রেখা টানতে হয় তাহলে এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, স্বল্প-মেয়াদী পতিতাদের সাধারণতই ঘৃণা করা হয়, আর দীর্ঘ-মেয়াদী পতিতাদের প্রতি দেখানো হয় সম্ভ্রম।"

সাত

"আর পোষাক, কোঁকড়া চুল ও পশ্চাতের সজ্জা-বাহুল্যের নাগপাশে আমিও আবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাকে ধরা ছিল খুবই সহজ, কারণ কাঁকুড়ের বীজ-তলার মত এমন একটি বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলাম যেখানে যুবকদের মধ্যে প্রেম-ভাবের আবির্ভাবকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে যে উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি, আর তার সঙ্গে যে পরিমাণ দৈহিক আলস্য উপভোগ করি, সে তো কামনাকে জাগিয়ে তোলারই নামান্তর মাত্র। আপনি অবাক হন আর নাই হন, আসল ব্যাপার তাই। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমিও এটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজ আমি সব বুঝেছি, আর বুঝেছি বলেই যখন দেখি যে অন্যরা তা বোঝে না এবং এখানকার ঐ স্ত্রীলোকটির মতই বাহবা পাবার মত সব কথাবার্তা বলে, তখন আমি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ি।

"এই বসন্তকালে আমার বাড়ির কাছেই কিছু চাষী রেলওয়েতে কাজ করছিল। একটি যুবক চাষীর স্বাভাবিক খাদ্য হল রুটি, কৃবাস ও পেঁয়াজ: তার ফলেই সে সজীব, হাসিখুসি ও কর্মক্ষম থাকে। সে যখন রেলওয়েতে কাজ করে তখন তার দৈনিক খাদ্য-তালিকায় থাকে পরিজ আর এক পাউণ্ড মাংস। তাই খেয়ে সে দৈনিক ষোল ঘণ্টা ধরে ত্রিশ পুড (রুশ ওজন) ভারী একটা চাকা ঘোড়ায়। তাই এ খাদ্য তার উপযোগী। আর আমাদের বেলায়

কি হয়? আমরা খাই দু পাউণ্ড মাংস, ক্যালরি-সমৃদ্ধ নানা খাদ্য ও পানীয়। সে খাওয়াকে কি ভাবে কাজে লাগাই? অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে। সবটা যদি সত্যি কাজে লাগান হয় তো ঠিক আছে, কারণ প্রকৃতিই সব ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু সম্ভোগের পথটা যদি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, আমার বেলায় যেমন মাঝে মাঝে দেওয়া হত। তাহলে এমন একটা কামের উত্তেজনা দেখা দেয় যেটা আমাদের কৃত্রিম জীবনের আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে একটা অতি-সংস্কৃত প্রেমের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, এমন কি কখনও কখনও বিমূর্ত প্রেমের রূপেও দেখা দেয়। আর অন্য সকলের মত আমিও প্রেমে পড়লাম। প্রেমের সব লক্ষণই আমার মধ্যে প্রকাশ পেল: আবেগ, অনুরাগ, কাব্য…। আসলে কিন্তু আমার এই প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল একদিকে তার মা ও দর্জির দ্বারা। আর অন্যদিকে অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েও যে অতিরিক্ত খাদ্য আমি খেতাম তার দ্বারা। এক দিকে যদি না থাকত নৌ-বিহার, তার কটি-রেখা ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য না থাকত কোন দর্জি, যদি আমার ভাবী স্ত্রী একটা বেখাপ্পা ড্রেসিং-গাউন পরে বাড়িই বসে থাকত, আর অন্যদিকে যদি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আমি ঠিক আমার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকুই গ্রহণ করতাম, যদি আমার সামনে আবেগের বহিঃপ্রকাশের পথটা খোলা থাকত (সেই সময় সেটা বন্ধই ছিল), তাহলে আমিও প্রেমে পড়তাম না, আর তার জেরও আমাকে টানতে হত না।”

আট

কিন্তু ঘটনা-চক্রে এ সবই একত্র মিলে গেল; আমার শারীরিক অবস্থা, তার প্রসাধন, আর নৌ-বিহার। আগে আরও বিশ বার তারা একসঙ্গে বাজে নি, কিন্তু এবার বাজল। ফাঁদে পড়ার মত ব্যাপার। ঠাট্টা নয়। আমাদের কালে ফাঁদ পাতার মত বিয়েটা আগেই ঠিক করা হত। আসলে কি ঘটত? একটি মেয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটি যদি কদাকার না হয়, আর বিবাহেচ্ছু ছেলে যদি থাকে, তাহলে কাজটা বেশ সহজ, সরলই বটে। আগেকার দিনে এইভাবেই কাজটা হত। একটি মেয়ের বয়স হলেই বাবা-মা তার জন্য একটি বর খুঁজে দিত। এই ব্যবস্থাই তখন ছিল, এবং এখনও অনেকের মধ্যেই এটাই প্রচলন—চীনা, ভারতীয়, মুসলমান ও আমাদের চাষীদের বেলায় তাই হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা অন্তত নিরানব্বই জনের বেলায় এই ভাবেই কাজটা হয়ে থাকে। কিন্তু শতকরা একজন—আমাদের মত ব্যভিচারীরা—ঠিক করল যে এ ব্যবস্থাটা ভুল; তারা

একটা নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবল। সে নতুন ব্যবস্থাটা কি? সেটা এই রকম মেয়েরা বসে থাকবে, আর ছেলেরা কোন মেলায় যেমনটি হয়ে থাকে তাদের সামনে আসা-যাওয়া করে মেয়েকে পছন্দ করবে। মেয়েরা সেখানে বসে থাকবে আর উচ্চকণ্ঠে বলবার সাহস না থাকায় মনে মনে বলবে, 'এই, আমাকে নাও! আমাকে! ওকে নয়, আমাকে! দেখ আমার ঘাড় এবং···মানে···অন্য সবকিছু কত সুন্দর!' আর আমরা পুরুষরা পায়চারি করতে করতে তাদের দেখি, আর আমাদের সুবিধার জন্য এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খুবই খুসি হই। আমরা হাঁ করে দেখি, আর সতর্ক না হলেই—বাস!—ধরা পড়ে গেলাম!"

"কিন্তু আর কিভাবে এটা হতে পারে?" আমি প্রশ্ন করলাম। "আপনি কি চান যে মেয়েরাই বিয়ের প্রস্তাব করবে?"

"আর কি ভাবে হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে নারী-পুরুষের সাম্য আছে, তাহলে সত্যিকারের সাম্যই হোক। আর যদি বাবা-মার দ্বারা বিয়ের ব্যবস্থাটা অপমানকর হয়, তাহলে এটা তো হাজারগুণ বেশী অপমানকর। প্রথম ক্ষেত্রে ভাল-মন্দর সম্ভাবনাটা সমান-সমান, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নারী হয় বাজারের পণ্য। ক্রীতদাসী, অথবা ফাঁদের একটা টোপ মাত্র। কিন্তু আপনি যদি সেই মেয়েকে (অথবা তার মাকে) বলেন যে তার একমাত্র কাজ একটি স্বামী পাকড়াও করা—হায় ঈশ্বর; তাহলে সে কী আপত্তি! অথচ আসলে সেই কাজটিই তো সে করছে; তার পক্ষে আর কিছু তো করবারও নেই। একটি তরুণ, নিষ্পাপ প্রাণী এই কাজ করছে দেখলেও খারাপ লাগে। তাও যদি সব ব্যাপারটাই খোলাখুলি করা হত, কিন্তু না, সবই করা হয় তলে তলে। 'আহা, The Origin of the Species! কী চমৎকার! আমার লিজা ছবি আঁকতে পাগল! তুমিও প্রদর্শনীতে যেতে চাও? খুব ভাল! আর স্লেজ-বিহার, নাটক, ঐক্যতান বাদন? অপূর্ব! আমার লিজা তো গানের নামে পাগল! তুমিও কেন তার সঙ্গে একমত হও না? আর নৌ-বিহার!···' অথচ সর্বক্ষণ তার একমাত্র চিন্তা হল; 'আমাকে নাও, আমাকে অথবা আমার লিজাকে! না, আমাকে! একবার দেখই না!' উঃ! মিথ্যাচার! ভয়াবহ!" আর এই কথা বলতে বলতে সবটুকু না শেষ করে সে গ্লাসগুলি সরিয়ে রাখতে লাগল।

নয়

থলেতে চা ও চিনি ভরতে ভরতে সে আবার শুরু করল, "আপনি হয় তো জানেন যে এ সকলেরই মূল কারণ নারীর আধিপত্য—এই পৃথিবীর বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্টের সেটাই তো উৎস।"

আমি বললাম, "নারীর আধিপত্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আইন তো পুরুষকেই সব সুবিধা দিয়েছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই," সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল। "ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছি; অপমানের একেবারে শেষ ধাপে ঠেলে দেওয়া সত্ত্বেও নারীর আধিপত্যের অসাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যাও এতেই পাওয়া যাবে। একটি অপরটির ক্ষতিপূরণ করে, ঠিক যেভাবে ইহুদিরা যে উৎপীড়ন সহ্য করে তার ক্ষতিপূরণ তারা পায় টাকার বিনিময়ে অর্জিত ক্ষমতার মধ্যে। ইহুদিরা বলে, 'তাহলে আমরা টাকার বাট্টাদার ছাড়া আর কিছু হই তা তোমরা চাও না তো? ঠিক আছে, টাকার বাট্টাদার হিসাবেই আমরা তোমাদের উপর ক্ষমতার ছড়ি ঘুরাব।' তেমনি মেয়েরাও বলে, 'আহা, আমাদের তোমরা ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জীব বলেই তো মনে কর? খুব ভাল কথা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জীব হিসাবেই তোমাদের আমরা ক্রীতদাস করে রাখব।' নারীর যে ভোটের অধিকার নেই, বা সে যে বিচারক হতে পারে না, সেটা তার অধিকারচ্যুতির ব্যাপার নয়—এ সব কাজ করতে পারা কোন অধিকারই নয়। তার অধিকারচ্যুতির প্রকৃত ব্যাপার হল যৌন জীবনে সে মানুষের সমান নয়, নিজের ইচ্ছামত কোন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার বা না করবার অধিকার তার নেই, পুরুষ তাকে বেছে নেওয়ার পরিবর্তে পুরুষকে বেছে নেবার অধিকার তার নেই।

"আপনি বলবেন এটা অবৈধ। খুব ভাল। তাহলে তো পুরুষেরও সে অধিকার থাকা উচিৎ নয়। বর্তমানে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে নারী তা থেকে বঞ্চিত। আর তাই এই অধিকার হারানোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে কাজে লাগায়, আর তার ফলে তাকে এতদূর পদানত করে ফেলে যে পুরুষের পছন্দ করাটা তার নামমাত্র অধিকারে পর্যবসিত হয়। আসল পছন্দটা করে স্বয়ং নারী। উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই উপায়টা একবার হাতে পাবার পরে সেই সুযোগে সে সমগ্র পুরুষ জাতির উপরেই প্রচণ্ড ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে।"

"তার এই প্রচণ্ড ক্ষমতাটা কোথা থেকে আসে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোথা থেকে আসে? সব কিছু থেকে, সব জায়গা থেকে। যে কোন বড় শহরের দোকানগুলোতে যান। সেখানে যে সব জিনিস দেখতে পাবেন তার জন্য লক্ষ লক্ষ—গণনার অতীত—হাত পরিশ্রম করছে; অথচ দেখুন! এক সব দোকানের দশ ভাগের নয় ভাগ দোকানেও কি পুরুষের ব্যবহারের কোন জিনিস পাবেন? জীবনের যত কিছু বিলাস-সামগ্রী সবই স্ত্রীলোকের প্রয়োজন মেটায়, তারাই ব্যবহার করে। কারখানাগুলোতে যান। তাদের অধিকাংশতেই তৈরি হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় গহনাপত্র, গাড়ি, আসবাব, মেয়েদের সব টুকিটাকি জিনিস। নারীর খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ

বংশ বংশ ধরে ক্রীতদাসের মত এই সব কারখানার নিষ্ঠুর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছে। নারীরা রাণীর মত মানবজাতির নয়-দশমাংশকে তাদের ক্রীতদাসের মত পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছে। আর এ সবের একমাত্র কারণ তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে, পুরুষের সম-অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আর তাই আমাদের ইন্দ্রিয়াসক্তির স্থযোগ নিয়ে তারাও আমাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে—আমাদের ফাঁদে ফেলেছে। হ্যাঁ, ঐ একই কারণে সব কিছু ঘটেছে। পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর নারীর প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে তার সামনে পুরুষ তার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। নারীর সঙ্গ লাভ করামাত্রই পুরুষ যেন নেশার বশে অবশ হয়ে পড়ে। আগে আগে কোন নারীকে নাচের পোষাকে সুসজ্জিত দেখলেই আমি কেমন কুঁকড়ে যেতাম, অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু এখন আমি আতংকিত হয়ে উঠি, কারণ নারীর মধ্যে আমি দেখি ভয়ংকরীকে, নিয়মের অপহ্নবকে ; মনে মনে আমি কারও সাহায্য চাই, পুলিশকে ডাকতে চাই, আমি চাই যে এই বিপদকে সরিয়ে নিয়ে হাজতে বন্ধ করে রাখা হোক।

"হাসছেন ?" আমার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। "এতে হাসবার কিছু নেই। আমি নিশ্চিত জানি, সে দিন আসবে, হয়তো শীঘ্রই আসবে, যখন সব মানুষ এটা বুঝতে পারবে এবং এই ভেবে বিস্মিত হবে যে একদা এমন সমাজ ছিল, যেখানে পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে উত্তেজিত করবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে নারীদেহকে অলংকারে সজ্জিত করবার মত শান্তি-বিঘ্নকারী ব্যবস্থাকেও চলতে দেওয়া হত। আরে, এটা তো যে পথে মানুষ হাঁটে সেই পথের উপর ফাঁদ পেতে রাখার মতই ব্যাপার। তার চাইতেও খারাপ! এটা কি করে হয় যে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষের কামনাকে উত্তেজিত করবার জন্য মেয়েদের বেশ্যাসুলভ সূক্ষ্ম পোষাকে সাজানোটা নিষিদ্ধ নয় ? এটা তো আরও হাজার গুণ বেশী বিপজ্জনক !"

দশ

"আর এইভাবে, আগেই বলেছি, আমি ধরা পড়লাম। তাদের ভাষায়, আমি 'প্রেমে পড়লাম।' শুধু যে তাকেই পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হল তাই নয়, প্রাক-বিবাহ দিনগুলিতে নিজেকেও তাই মনে হতে লাগল। আসলে এমন কদাচারি মানুষ কোথাও নেই যে কোন না কোন বিষয়ে তার চাইতেও খারাপ একটি লোককে খুঁজে পায় না ; কাজেই নিজে গর্ববোধ করবার ও আত্মতুষ্ট থাকবার একটা যুক্তি সে পেয়ে যায়। আমারও সেই অবস্থা হল : আমি টাকার জন্য বিয়ে করছি না ; আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করেছে হয় টাকার জন্য, নয় তো বড় বড় আত্মীয়-স্বজন লাভের জন্য ; কিন্তু

কোন রকম লোভ আমাকে বিয়ের দিকে টানে নি; আমি ধনী, আর সে ছিল গরীব। এই হল একটা দিক। আর একটা দিক হল, অনেকেই বিয়ে করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিয়ের পরেও তারা আগেকার অভ্যাসমতই বহু নারী-সঙ্গের ভিতর দিয়েই জীবন কাটাবে, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম যে বিয়ের পরে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ জীবন যাপন করব, আর তার ফলে নিজের সম্পর্কে আমি বর্ণনাতীত গর্ববোধ করতে লাগলাম। সত্যি একটা ঘৃণ্য শুয়োরের বাচ্চা হয়েও নিজেকে আমি একজন সন্ত বলে কল্পনা করেছিলাম।

"আমার পূর্ব-রাগ বেশী দিন স্থায়ী হল না। সেদিনের কথা মনে হলেই লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠি। আমরা ধরে নেই যে এই সময়টা আধ্যাত্মিক প্রেমের কাল, দেহজ ভালবাসার কাল নয়; কিন্তু এটা যদি আধ্যাত্মিক প্রেম হয়, আধ্যাত্মিক মিলন হয়, তাহলে আমাদের কথা, আমাদের আলোচনা, আমাদের সংলাপেও তো এই আধ্যাত্মিক মিলন প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হত না। যখনই আমরা একাকি থাকতাম তখনই কথা বলাই দুঃসাধ্য হত, অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে হত। কি যে বলব তা ভাবতেই অনেক সময় কেটে যেত। সেটা বলেই আবার চুপ করে যেতাম, এবং আবার কি বলা যায় সেটা ভাবতে চেষ্টা করতাম। বলবার মত কোন কথাই থাকত না। আমাদের ভবিষ্যৎ মিলিত জীবনযাত্রা, তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে যা কিছু বলা যেতে পারত সব তো আগেই বলা হয়ে গেছে। আর কি বলবার আছে? আমরা যদি জানোয়ার হতাম তাহলে জানতাম যে আমরা কথা বলি এটা কেউ আশা করে না; কিন্তু আমরা তো মানুষ, তাই আমরা কথা বলব এটাই প্রত্যাশিত, অথচ বলবার মত কোন কথা নেই, কারণ যে জিনিস তখন আমাদের মনে জাগত সেটা কোন আলোচনার যোগ্য বিষয়বস্তু নয়। আর এ সবের উপরে সেই বিরক্তিকর প্রথা—চকোলেট, পেট-ভর্তি মিষ্টি আর বিবাহসংক্রান্ত যতসব বাজে উদ্যোগ-আয়োজন—বাড়ি ঠিক করা, শোবার ঘর, বিছানাপত্র, ড্রেসিং-গাউন, জামা-কাপড়, পোষাকের ঘর। বুঝতেই তো পারছেন, ঐ বৃদ্ধ লোকটি যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে গেলেন তদনুযায়ী যৌতুক, খাট-পালংক, পালকের বিছানা—বিবাহ-রহস্যকে ঘিরে তো এই সবই থাকে। কিন্তু আজকাল যখন দশজন বিবাহেচ্ছুর একজনও এই রহস্যে বিশ্বাস করে না, এমন কি সে যে কাজ করতে যাচ্ছে, তার যে কোন দায়িত্ব আছে তাও মনে করে না, যখন প্রতি একশ' জনে একজনও এমন লোক পাওয়া যায় না যে এই বিয়ের আগেই আরও বিয়ে করেছে, এবং প্রতি পঞ্চাশ জনে একজনও পাওয়া যাবে না যে প্রথম সুযোগেই তার স্ত্রীকে ঠকাতে চেষ্টা করবে না, যখন অধিকাংশ লোকই বিয়ের সময়কার গীর্জার অনুষ্ঠানকে একটি স্ত্রীলোকের মালিকানা অর্জনের শর্ত মাত্র বলে মনে করে—এ সব কথা যখন আপনি ভাবেন তখনই এই সব প্রস্তুতির

ভয়াবহ অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মনে হয়, এগুলিই আসল কথা। মনে হয়, এ তো এক ধরনের কেনা-বেচা; একটি নির্দোষ মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয় একটি লম্পট পুরুষের কাছে, আর সেই বিক্রয়-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয় নানা উপযুক্ত অনুষ্ঠান।"

এগার

"এই ভাবেই সকলেরই বিয়ে হয়, আর আমিও এইভাবে বিয়ে করে বহু-গীত মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে বের হলাম। নামটাই কী অসভ্য!" তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে কথাটা উচ্চারণ করল। "প্যারিসে একবার আমি নানা ধরনের বীভৎস জীবের একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম একটি দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক ও আধা-মৎস একটা কুকুর। পরে জেনেছিলাম, দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোকটি আসলে একটি পুরুষ, তাকে মেয়েদের পোষাক পরানো হয়েছে, আর কুকুরটাকে একটা সিল মাছের চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে বাথ-টবে সাঁতার কাটানো হয়েছে। দেখবার মত বিশেষ কিছুই সেখানে ছিল না, কিন্তু আমি যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন ঘোষক আমাকে দেখিয়ে জনতাকে বলতে লাগল, 'এই যে, এই ভদ্রলোককেই জিজ্ঞেস করুন, সত্যি দেখবার মত জিনিস কি না! টিকিট সংগ্রহ করুন! টিকিট সংগ্রহ করুন! মাত্র এক ফ্রাঁ!' প্রদর্শনীটা যে মোটেই দেখার মত নয় সেটা বলতে আমার লজ্জা করল। আর ঘোষকটিও সেটা ঠিকই জানত। আমার তো মনে হয়, মধুচন্দ্রিমার বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদেরও ঐ অবস্থাই হয়, অন্যের মোহভঙ্গ করতে তারা লজ্জাবোধ করে। আমিও অপরের মোহভঙ্গ করি নি, কিন্তু আজ আর সত্য গোপন করার কোন কারণ দেখছি না। এমন কি সত্যকথা বলাই আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমার মধুচন্দ্রিমা হয়েছিল হতবুদ্ধিকর, লজ্জাজনক, ঘৃণ্য, করুণ, এবং সর্বোপরি—একঘেয়েমিতে ভরা। বর্ণনাতীত একঘেয়েমি। প্রথম যখন ধূমপান করতে শিখেছিলাম অনেকটা সেই রকম; মুখে লালা উঠত, ফেলে দিতে ইচ্ছা করত, কিন্তু লালাটা গিলে ফেলে এমন ভাণ করতাম যেন খুব মজা পেয়েছি। ধূমপানের মজাটা আসে পরে, অবশ্য যদি আসে; এ ব্যাপারটাও সেই রকম: এই পাপ থেকে কোন সুখ পেতে হলে দম্পতিকে ভালভাবে সেটা শিখতে হবে।"

"আপনি বলছেন পাপ?" আমি বললাম। "কিন্তু আপনি তো মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক একটা কাজের কথাই বলছেন।"

সে বলল, "স্বাভাবিক? না, আমি বলতে বাধ্য যে আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত—এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ছোট ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করুন। নিষ্পাপ তরুণীদের জিজ্ঞাসা করুন। খুব অল্প বয়সে আমার

বোনের বিয়ে হয়েছিল তার দ্বিগুণ বয়সী একটি লম্পট পুরুষের সঙ্গে। আজও মনে পড়ে, বিয়ের রাতে সে যখন ম্লান মুখে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলেছিল, সে চায় না, কোন কিছুর জন্যই না, কোন কিছুর জন্যই না, তখন আমরা কতদূর বিস্মিত হয়েছিলাম! স্বামীটি তার কাছে কি চেয়েছিল সেটা বোঝাবার মত ভাষাও সে খুঁজে পায় নি!

"আর আপনি এটাকে বলছেন স্বাভাবিক! অনেক স্বাভাবিক জিনিস আছে। এমন জিনিস আছে যা প্রথম থেকেই সুখকর, আনন্দদায়ক ও লজ্জা-বিহীন। কিন্তু এটা তা নয়। এটা তো ঘৃণ্য, লজ্জাকর, বেদনাদায়ক। না, এটা স্বাভাবিক নয়। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটি নিষ্পাপ বালিকা সব সময়ই এটাকে ঘৃণা করে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তাহলে মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে কেমন করে?"

"মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে কেমন করে?" এই স্বাভাবিক ও লজ্জাজনক প্রশ্নটাই যেন সে প্রত্যাশা করছিল এমনিভাবে বিদ্রূপের সঙ্গে সে আমার কথাগুলিই প্রতিধ্বনি করল। ইংরেজ লর্ড মহোদয়গণ যাতে আকণ্ঠ খেতে পারেন সেজন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করা চলতে পারে; অবাঞ্ছিত ফলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মজা লুটবার জন্যও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করা চলতে পারে; কিন্তু যেই নৈতিকতার নামে কেউ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করতে মুখ খুলল—আঃ, অমনি কী সোরগোলই না পড়ে যায়! এক ডজন বা দু'ডজন মানুষ যদি স্থির করে যে শুয়োরের জীবন তো অনেক হয়েছে, আর নয়, তাহলেই মানব জাতির অস্তিত্ব কেমন করে অক্ষুণ্ণ থাকবে? কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। ঐ আলোটায় আমার কষ্ট হয়। ওটাকে ঢাকা দিলে কি আপনি আপত্তি করবেন?" বাতিটা দেখিয়ে সে বলল।

আমি বললাম যে আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তখন সে বেঞ্চির উপর উঠে পর্দাটা টেনে দিয়ে আলোটা ঢেকে দিল।

আমি বললাম, "তথাপি প্রত্যেকেই যদি আপনার ধারণা মত চলে তাহলে তো মানব জাতির বিলুপ্তি ঘটবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে কোন জবাব দিল না।

পুনরায় আমার বিপরীত দিককার একটা আসনে বসে পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটুর উপর কনুই রাখবার জন্য ঝুঁকে পড়ে সে বলল, "মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনি এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন?"

"তাও জিজ্ঞাসা করছেন? নইলে যে আপনি ও আমিও থাকতাম না।"

"আমাদের থাকতেই বা হবে কেন?"

"বাঁচবার জন্য।"

"আমরা বাঁচবই বা কেন? জীবনের যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, জীবনই

যদি জীবনের শেষ কথা হয়, তাহলে তো বেঁচে থাকবার কোন অর্থই থাকে না। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে শোপেনহাওয়ার এবং হার্টম্যান এবং বৌদ্ধরা তো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু জীবনের যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তো সেই লক্ষ্যে পৌছনো মাত্রই জীবনের অবসান ঘটা উচিত। এই তো একমাত্র সিদ্ধান্ত," বেশ উত্তেজিতভাবে সে কথাগুলি বলতে লাগল। "এই তো একমাত্র সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য করুন: যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয় কল্যাণ, দয়া, ভালবাসা; যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয় দৈববাণীর সেই উক্তি যে সব মানুষকে প্রেমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তরবারি ফেলে লাঙলের ফলা হাতে তুলে নিতে হবে, ইত্যাদি, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌছতে আমাদের কে বাধা দিচ্ছে? বাধা দিচ্ছে আমাদের কামনা। আর সব কামনার মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, সব চাইতে দুরন্ত ও অনড় হল যৌন, দেহজ ভালবাসা; সুতরাং কামনাকে যদি বশীভূত করা যায়, বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এই দেহজ কামনাকে যদি পরাভূত করা যায়, তাহলে সে দৈববাণী পূর্ণ হবে, মানব জাতি একসূত্রে আবদ্ধ হবে, মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হবে, এবং তখন যার জন্য বেঁচে থাকা তেমন কিছুই আর থাকবে না। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে; কিন্তু সেটা শুয়োর বা খরগোসের মত যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব সন্তানের জন্ম দেওয়ার আদর্শ নয়, অথবা যৌন-সম্ভোগ থেকে যথাসম্ভব সুস্থ ও সুন্দর আনন্দ লাভের যে আদর্শ বাঁদর বা প্যারিসিয়রা অনুসরণ করে থাকে সে আদর্শও নয়। সে আদর্শ হল সংযম ও পবিত্রতার ভিতর দিয়ে অর্জিত কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শ লাভের জন্য মানুষ এতদিন চেষ্টা করেছে, এবং সর্বদাই চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ফল হয়েছে দেখুন।

"ফল তো এই হয়েছে: মনে হয় দেহজ ভালবাসা নিরাপত্তার একটি উপায়। এ যুগের মানুষ মানব জাতির লক্ষ্যে পৌছতে পারে নি, আর পারে নি তার কামনার জন্য, এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হচ্ছে যৌন কামনা। যৌন কামনা থেকে নতুন যুগ জন্মলাভ করে, সেই নতুন যুগের সামনে লক্ষ্যে পৌছবার সুযোগ আসে; কিন্তু নতুন যুগের মানুষও সে লক্ষ্যে পৌছতে পারে না; কাজেই পরবর্তী যুগের কাছে সে সুযোগ দেখা দেয়, তারপর পরবর্তী যুগ, তারও পরবর্তী যুগ, এমনি করে চলতে থাকে যতদিন লক্ষ্য অর্জিত না হয়, যত দিন দৈববাণী পূর্ণ না হয়, যতদিন সমগ্র মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ না হয়। এর অন্যথা কেমন করে হবে? কল্পনা করা যাক, একটা বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্ত ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সৃষ্টি করলেন হয় যৌন প্রবৃত্তিবিহীন মরণশীল করে, অথবা অমর করে। যদি তিনি মানুষকে যৌন প্রবৃত্তিবিহীন মরণশীল জীব করে সৃষ্টি করেন, তাহলে ফল কি দাঁড়াবে? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনে লক্ষ্যে না পৌছেই তারা মারা যাবে, এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঈশ্বরকে নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। যদি তিনি তাদের অমর করে সৃষ্টি করেন তাহলে

হয়তো এটা সম্ভব (যদিও একই লোকের পক্ষে নিজেদের ভুল সংশোধন করাটা নতুন নতুন লোকের পক্ষে পূর্ববর্তীদের ভুল সংশোধন করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার চাইতে বেশী শক্ত)—আমি বলছি, হয়তো এটা সম্ভব যে কয়েক হাজার বছর পরে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। কিন্তু তখন ঐ অমর মানুষরা কি করবে? তাদের নিয়ে কি করা হবে? না, অবস্থা যা আছে তাই ভাল। কিন্তু আমার এই সব কথায় হয় তো আপনার আপত্তি আছে? আপনি হয়তো বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী? ফল কিন্তু একই। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচবার জন্য জীব-জগতের সর্বোচ্চ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে এক ঝাঁক মৌমাছির মত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; সীমাহীন প্রজননের দিকে তাদের ঝোঁকা চলবে না। মৌমাছিদের মতই মানুষকেও যৌনতাহীন ব্যক্তি গড়ে তুলতে হবে, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সমাজের মত যৌন-প্রবৃত্তির কাছে মাথা না নুইয়ে তাদের চারিত্রিক শুদ্ধতার দিকে পা বাড়াতে হবে।" এই পর্যন্ত বলে সে একটু থামল। "মানব জাতির বিলুপ্তি? কিন্তু মতামত যাই হোক, তার অনিবার্যতায় কি কারও সন্দেহ থাকতে পারে? সে তো মৃত্যুর মতই নিশ্চিত। সব পবিত্র বাণীতেই পৃথিবীর ধ্বংসের পূর্বাভাষ রয়েছে, আর সব বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও সেই একই কথা। তাহলে নীতি-শিক্ষাও যদি সেই একই পরিণামের নির্দেশ দেয় তাহলে সেটা কি খুবই বিস্ময়কর হবে?"

এর পরে সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আরও চা খেল, সিগারেটটা শেষ করল, থলে থেকে নতুন সিগারেট বের করে পুরনো দাগ-লাগা সিগারেট-কেসটায় ভরল।

আমি বললাম, "আপনার কথাগুলো আমি বুঝতে পেরেছি। 'শেকার'রাও এই কথাই বলে।"

সে বলল, "তারা ঠিকই বলে। যে কোন রূপেই দেখা দিক না, যৌন-কামনা মাত্রই পাপ, ভয়াবহ পাপ; তাকে প্রতিহত করতে হবে, আমাদের মত তাকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না। যে পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকায় সেই তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়—বাইবেল-এর এই বাণী শুধু অপরের স্ত্রীর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং প্রধানতঃ আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।"

বারো

"আমাদের জগতে সব কিছুই উল্টো। অবিবাহিত অবস্থায় একটি লোক যদি সংযম অভ্যাস করে, সেও বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই সে-সংযমকে আর প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। আসলে বিয়ের পরে এই যে প্রমোদ-ভ্রমণ, এই যে বাবা-মার সম্মতিক্রমেই যুবক-যুবতীরা নির্জন বাসে চলে যায়,—এটা তো

লাম্পট্যের অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু নৈতিক নিয়মকে লংঘন করলে তার শাস্তি হবেই। আমাদের ছুটিটাকে মধুচন্দ্রিমা যাপনে রূপান্তরিত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আমি সফল হতে পারলাম না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লজ্জাজনক, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লাগল। কিন্তু শীঘ্রই ব্যাপারটা কষ্টকর হয়ে উঠল। বড় বেশী তাড়াতাড়ি। তৃতীয় বা হয়তো চতুর্থ দিনেই দেখলাম আমার স্ত্রী বেশ মন-মরা হয়ে পড়েছে; এর কারণ জিজ্ঞাসা করে আমি তাকে আদর করতে শুরু করলাম; ভাবলাম সেটাই সে চাইছে; কিন্তু সে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল। কেন? তা সে আমাকে বলতে পারল না। কিন্তু সে খুব অসুখী, তার অবস্থা শোচনীয়। হয়তো তার স্নায়ুর চাপই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা কতদূর ঘৃণ্য, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলতে পারল না। আমি চাপ দেওয়াতে সে কোন রকমে মায়ের অভাবের কথা বলল। বুঝলাম, সেটা আসল কথা নয়। মা সম্পর্কে সে যা বলল সে কথাকে উপেক্ষা করে আমি তার সঙ্গে খুনশুটি শুরু করে দিলাম। সে যে সত্যি দুঃখিত হয়েছে এবং ওজুহাত হিসাবেই মায়ের কথা বলেছে সেটা আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস না করার জন্য এবং তার মাকে উপেক্ষা করার জন্য সে আমার উপর চটে গেল। সে জানাল, আমি যে তাকে ভালবাসি না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। এই খামখেয়ালিপনার জন্য তাকে দোষারোপ করতেই হঠাৎ তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল; দুঃখের বদলে সেখানে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল এবং অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় সে আমার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করতে লাগল। তার দিকে তাকালাম। সারা মুখে তীব্র নিস্পৃহতা ও বিরোধিতা—এমন কি আমার প্রাপ্ত ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে। মনে পড়ছে, আমি কতদূর মর্মাহত হয়েছিলাম। ভাবলাম, 'এ আবার কি? ভালবাসার বদলে, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের বদলে—এই। অসম্ভব! সে আর তাতে নেই।' তাকে শোধরাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নিস্পৃহতার এমন একটা তীব্র প্রতিরোধের দেয়াল সে আমার সামনে তুলে ধরল যে নিজের অজান্তেই আমিও খুব রেগে গেলাম এবং দুজন দুজনকে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে ফেললাম। সেই প্রথম ঝগড়া আমার উপর একটা ভয়ংকর প্রভাব বিস্তার করল। আমি এটাকে ঝগড়াই বললাম, কিন্তু আসলে এটা ঝগড়া নয়; আমাদের দুজনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল এটা তারই প্রকাশ। কামনা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভালবাসা উবে গিয়েছিল। এবার আমরা সত্যিকারের সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালাম; সে সম্পর্ক পরস্পরের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ সুখের প্রত্যাশী দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ও সম্পূর্ণ স্বার্থপর মানুষের সম্পর্ক।

"যা ঘটেছিল তাকে আমি বললাম ঝগড়া, কিন্তু এটা ঝগড়া নয়; যৌন কামনার নিবৃত্তির ফলে আমাদের সত্যিকারের সম্পর্কটাই তখন উদঘাটিত

হয়েছিল। এই উদাসীন বিরোধিতার ভাবটাই যে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সেটা আমি বুঝতে পারি নি; বুঝতে পারি নি কারণ অচিরেই ইন্দ্রিয়াবেগের একটা নতুন ঢেউ, ভালবাসার একটা নতুন ঢেউ এসে এই বিরোধিতার মনোভাবকে চোখের সামনে থেকে আড়াল করে দিয়েছিল।

"ভাবলাম, ঝগড়া হয়েছিল মিটে গেল; এমন কাজ আমরা আর কখনও করব না। কিন্তু মধুচন্দ্রিমা যাপনের সেই প্রথম মাসেই দেখতে দেখতে এমন একটি অতিতৃপ্তির স্তরে গিয়ে আমরা পৌঁছলাম যে পরস্পরকে আমাদের আর কোন দরকারই রইল না, আর তার ফলেই দেখা দিল আর একটা ঝগড়া। প্রথমটা অপেক্ষা দ্বিতীয় ঝগড়াটা আমার কাছে আরও বেদনাদায়ক মনে হল। ভাবলাম, 'তাহলে তো প্রথম ঝগড়াটা মোটেই আকস্মিক ছিল না। সেটাই তো ছিল প্রত্যাশিত এবং বার বারই তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।' দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে আমি বিশেষভাবে আহত হয়েছিলাম কারণ সেটা ঘটেছিল একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে—টাকাপয়সার ব্যাপারে, অথচ সে বিষয়ে আমি কোনদিনই মিতব্যয়ী নই এবং আমার স্ত্রীর খরচপত্র নিয়ে নিশ্চয় কোন রকম আপত্তিও করতাম না। মনে পড়ে, আমার কোন কথার সে এমন বাঁকা অর্থ করে যার মানে দাঁড়ায় যে, টাকার জোরে আমি তার উপর অধিকার অর্জন করেছি এবং আমার টাকা-পয়সা খরচ করবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে, অথবা এই ধরনেরই কোন নীচ, অর্থহীন মন্তব্য যেটা আমাদের উভয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত। রেগে গিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে বোকামির অভিযোগ করলাম, সেও পাল্টা জবাব দিল, আর আবার ঝগড়া বেধে গেল। তার কথায়, চোখ-মুখের ভাবে আমি আবার দেখতে পেলাম সেই উদাসীন, নিষ্ঠুর বিরোধিতা যা দেখে প্রথমবারে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। মনে পড়ে, দাদার সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, এমন কি বাবার সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু এখানে যে বিষাক্ত বিদ্বেষের প্রকাশ দেখলাম, তা আগে কখনও দেখি নি।

"যা হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভালবাসার টানে, অর্থাৎ যৌন আকর্ষণের টানে এই পারস্পরিক ঘৃণার উপর আবারও যবনিকা নেমে এল; আবারও এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে এ দুটি ঝগড়াই ভুলের ফসল, এবং তাকে সংশোধন করা যাবে। কিন্তু তার পরেও ঘটল তৃতীয় এবং চতুর্থ ঝগড়া; তখন আমি চিরদিনের মত বুঝতে পারলাম যে এগুলো আকস্মিক ঘটনা নয়, এগুলিকে তখনও পরিহার করা যেত না আর ভবিষ্যতেও পরিহার করা যাবে না; তাই ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম। আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল যখন ভাবলাম যে, কেবলমাত্র আমার বিয়ের বেলায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে, অন্য সব বিয়েই সফল পরিণতিতে পৌঁছে যায়। জানতাম না যে সকলেরই এই একই নিয়তি; ঠিক আমার মতই সকলেই ভাবে যে তার দুর্ভাগ্য একটি ব্যতিক্রম মাত্র এবং এই সত্যকে স্বীকার না করে শুধু

অপরের কাছ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও এই লজ্জাজনক ব্যতিক্রম দুর্ভাগ্যকে লুকিয়ে রাখে।

"আমাদের বিরোধ শুরু হয়েছিল বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, আর সেটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, গভীরতর ও প্রতিকারহীন হতে লাগল। প্রথম সপ্তাহ থেকেই মনে মনে বুঝতে পারলাম, আমি ধরা পড়েছি, আমি যা আশা করেছিলাম এ তা নয়, আর বিয়ে ব্যাপারটা পরম সুখের পরিবর্তে এক চরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু অন্য সকলের মতই আমি এ সত্যকে স্বীকার করতে চাইতাম না (শেষ ফলাফলের জন্য না হলে কোনদিন স্বীকার করতামও না) এবং শুধু অন্যের কাছ থেকে নয় নিজের কাছ থেকেও এ সত্যকে লুকিয়ে রাখলাম। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে এখন অবাক হয়ে যাই যে এত দীর্ঘদিন ধরে আমি আসল সত্যটা দেখতেই পাই নি। এমনি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের ঝগড়া হত যে কিছুদিন পরেই আমরা সেটা ভুলেই যেতাম—এতেই তো সব জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। যে নিয়ত সংঘাতের মধ্যে আমাদের দিন কাটতে লাগল সেটাকে সমর্থন করবার মত কোন ভারী যুক্তি আবিষ্কার করবার সুযোগও আমাদের দেওয়া হত না। কিন্তু তার চাইতেও মর্মঘাতী ছিল আমাদের পুনর্মিলনের বাজে অজুহাতগুলি। কখনও কিছু কথা, কিছু কৈফিয়ৎ, এমন কি চোখের জল পর্যন্ত; আবার কখনও বা—সে স্মৃতি কী ঘৃণার্হ!—পরস্পরের প্রতি নির্মম সব উক্তি করবার পরেই আমরা পরস্পরের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করতাম, হাসতাম, চুমো খেতাম, আলিঙ্গনাবদ্ধ হতাম। উঃ- কী নীচ! এ সব কিছুর পাপকে কেমন করে আমি তখন না দেখে পারলাম?"

তের

দুজন যাত্রী এসে গাড়ির কোণে আসন নিল। তারা ঠিকঠাক হয়ে না বসা পর্যন্ত সে কথা বলা বন্ধ করল; তারপর আবার শুরু করল; কিন্তু এতে তার চিন্তার সূত্র মুহূর্তের জন্যও হারাল না।

সে শুরু করল, "এ প্রসঙ্গে সব চাইতে ঘৃণার কথা এই যে ভালবাসাকে মনে করা হয় একটা আদর্শ, একটা মহৎ কিছু অথবা আসলে সেটা এতই নীচ ও পাশবিক যে তা নিয়ে চিন্তা করা বা আলোচনা করাটাও নীচ ও লজ্জাজনক। ব্যাপারটা যখন নীচ ও লজ্জাজনক তখন সেই ভাবেই তো তাকে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তার পরিবর্তে যা নীচ ও লজ্জাজনক তাকেই মানুষ সুন্দর ও মহৎ বলে ভাণ করে। আমায় ভালবাসার প্রথম লক্ষণ কি ছিল? পাশবিক কাজের বাড়াবাড়িতেও আমি তিলমাত্র লজ্জাবোধ করতাম না, বরং বাড়াবাড়ি করবার ক্ষমতা আছে বলে গর্ববোধ করতাম এবং সে কাজের সময় তার আত্মিক, এমন

কি তার শারীরিক কল্যাণের প্রতিও তিলমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করতাম না। কেন যে আমরা পরস্পরের প্রতি বিরূপ হতাম তা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু কারণটা খুবই পরিষ্কার: এই বিরূপতা পাশবিক সত্তার কাছে পরাভূত হবার বিরুদ্ধে আমাদের মানবিক সত্তার একটা প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

'পরস্পরের প্রতি আমাদের ঘৃণায় আমি অবাক হতাম। কিন্তু এছাড়া আর কিছু তো প্রত্যাশিত ছিল না। একই অপরাধের—সে অপরাধকে প্ররোচিত করা ও জিইয়ে রাখার ব্যাপারের দুই অংশীদারের মধ্যে এটা পারস্পরিক ঘৃণামাত্র। কারণ সে বেচারি প্রথম মাসেই গর্ভবতী হবার পরেও যখন আমাদের জান্তব সম্পর্ক সমানে চলতে লাগল, তখন সেটা কি সত্যি সত্যি অপরাধ নয়? আপনি কি মনে করেন যে এ কাহিনীর পক্ষে এ সব কথা অবান্তর? তাহলে আপনি ভুল করছেন। কেমন করে আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেছি এ-সবই সেই গল্পের অংশ। বিচারের সময় তারা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, কি ভাবে আমি তাকে খুন করেছি এবং কি দিয়ে খুন করেছি। বোকার দল! তারা ভেবেছিল ৫ই অক্টোবর তারিখে একখানি ছুরি দিয়ে আমি তাকে খুন করেছিলাম। তখন আমি তাকে খুন করি নি। খুন করেছি আরও অনেক আগে। আর ঠিক সেই ভাবেই খুন করেছি যে ভাবে করছে অন্য সকলে—সব্বাই, সব্বাই!"

"আপনি কি বলতে চান?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেটাই তো আশ্চর্যের বিষয়—এই সহজ, সরল সত্যটাকে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ডাক্তারদের উচিত এ সত্যকে জানা ও প্রচার করা, কিন্তু তারাও চুপ করে থাকে। নারী-পুরুষদেরও জন্তুদের মতই সৃষ্টি করা হয়: দৈহিক ভালবাসার ফলে গর্ভসঞ্চার হয়, সন্তান-সন্ততিদের খাওয়াতে হয়, তখনকার শরীরের অবস্থায় দৈহিক ভালবাসা প্রসূতি ও সন্তান দুজনের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সমান-সমান। তার অর্থ কি? আমি তো মনে করি বিষয়টি খুব পরিষ্কার। এর থেকে যে সিদ্ধান্ত জন্তুরা করে থাকে সেটা করতে খুব বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না—সে সিদ্ধান্ত হল যৌন-সংযম। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কেউ নেয় না। রক্তের মধ্যে লিউকোসাইট্‌স্ ভেসে বেড়াবার মত অনেক অদরকারী জিনিস আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা খুব পটু, কিন্তু এটা আবিষ্কার করবার মত কুশলতা তাদের নেই। অন্তত আমি তাদের এ বিষয়ে কোন কথা বলতে শুনি নি।

"সুতরাং স্ত্রীলোকদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা আছে; একটি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অথবা ধীরে ধীরে তার নারীত্বের অর্থাৎ মাতৃত্বের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে নিজেকে বিকৃত করা, যাতে তার স্বামী ইচ্ছামত তাকে ভোগ করতে পারে; অপরটিকে কোন পথই বলা যায় না—সেটা হল প্রকৃতির বিধানকে সরাসরি লংঘন করা, আর আমাদের তথাকথিত ন্যায়বান পরিবারের লোকেরা

সেটাই করে থাকে। তার অর্থ হল, একটি নারী তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে একই সঙ্গে আসন্ন মা, শুশ্রূষাকারিণী মা ও তার স্বামীর সঙ্গিনীর কাজ করবে; অথচ সেটা এমন একটা গুরুদায়িত্ব যা কোন একটি জন্তু কখনও মেনে নেবে না। আর কোন নারীর সে শক্তি থাকে না। ওই কারণেই আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকরা বিকলস্নায়ু ও মূর্ছারোগগ্রস্ত হয়, এবং চাষীঘরের স্ত্রীলোকরা হয় 'ক্লিকুশি' (Klikushi=মূর্ছারোগগ্রস্ত চাষী স্ত্রীলোক)। খেয়াল করে দেখবেন, তরুণীরা, নিষ্পাপ তরুণীরা কখনও 'ক্লিকুশি' হয় না,—হয় শুধু সেই স্ত্রীলোকরা যে স্ত্রীলোকদের স্বামী থাকে। আমাদের লোকদের সম্পর্কে সেটাই সত্য। ইওরোপীয়দের সম্পর্কেও। প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করে মূর্ছারোগীতে পরিণত হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের দ্বারাই সব হাসপাতালগুলি পরিপূর্ণ। কিন্তু যে সব স্ত্রীলোক 'ক্লিকুশি' এবং চারকট-এর রোগী তারা তো পুরোপুরি পাগল; যে সব স্ত্রীলোক এখনও সে স্তরে পৌছে নি তারাই তো পৃথিবীকে ভরে রেখেছে।

"একটি স্ত্রীলোক কর্তৃক গর্ভস্থ সন্তানকে প্রসব করা ও তাকে লালন-পালন করা কী এক ভীতিপ্রদ কাজ! আমাদের যে বংশধররা মানব জাতির ধারাকে বহন করবে তাদের তো সেই সৃষ্টি করে। আর এই পবিত্র কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে কিসে? সে কথা ভাবতেও আতংক হয়! অথচ তারাই নারীর মুক্তি, নারীর অধিকারেব কথা বলে! এ যেন একদল নরখাদক বলির আগে শিকারকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করতে করতেই তাদের ভরসা দিচ্ছে যে তাদের অধিকার ও মুক্তির কথা নিয়েও তারা মাথা ঘামাচ্ছে।"

এই ধারণাটা আমার কাছে নতুন ও মর্মঘাতী বলে মনে হল।

বললাম, "কিন্তু কি করা যাবে? আপনি যা বললেন তা যদি সত্য হয় তাহলে তো একটি পুরুষকে দু'বছরে মাত্র একবার তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হয়; কিন্তু মানুষ—"

"ও ছাড়া বাঁচতে পারে না", সে বলে উঠল। "আবারও বিজ্ঞানের শ্রদ্ধেয় পুরোহিতরা সকলকে এই কথাই বুঝিয়েছে। এই সব পণ্ডিতজনেরা যে নারীকে পুরুষের পক্ষে এতই অপরিহার্য বলে মনে করেন তাদের কাজগুলি সম্পন্ন করতে যদি সেই পণ্ডিতদের বাধ্য করা হত তাহলে তাঁরা কি বলতেন আমার শুনতে ইচ্ছা করে। একটি লোককে যদি বোঝান হয় যে ভদ্‌কা, তামাক ও আফিম তার পক্ষে অপরিহার্য তাহলেই সেগুলি তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। মনে হয় ঈশ্বর বুঝি সব কিছুই ভুল সৃষ্টি করেছেন, কারণ তিনি জানতেন না কি অপরিহার্য, আর সেই সব পণ্ডিতদের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করেন নি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, সব জিনিস ঠিক খাপ খায় না। মানুষ স্থির করেছে, কামনা চরিতার্থ না করে তারা বাঁচতে পারে না, অথচ তাদের কামনা পূরণের পথে বাধার সৃষ্টি করে এসে দাঁড়াল সন্তানের জন্ম ও লালন-পালন। কি করা হবে? পণ্ডিতদের কাছে আবেদন করুন। তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর

তাই তারা করেন। আঃ, এই সব ডাক্তার ও তাদের মিথ্যার মুখোশ যে কবে খোলা হবে? সে দিন তো এসেছে। জন্তুরাও জানে যে তাদের বংশরক্ষার জন্যই সন্তানের জন্ম, তাই এ সংক্রান্ত নিয়মগুলি তারা মেনে চলে। শুধু মানুষই সে সব জানে না, জানতে চায়ও না। সে শুধু চায় যতদূর সম্ভব নিজের সুখভোগ করতে। আর সে কে? মানুষ; এই বিশ্বের রাজা। ভাবুন তো—জন্তুরা যৌন-সংসর্গ করে শুধুমাত্র যখন সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব, অথচ বিশ্বের এই নোংরা রাজা শুধু মাত্র সুখভোগের জন্য যখনই সম্ভব তখনই যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। তার চাইতেও বড় কথা, সে কাজকে সে ভালবাসার মত একটি মহৎ ভাবের সঙ্গে একাত্ম করতে চেষ্টা করে। আর এই ভালবাসার নামে—অর্থাৎ এই নীচতার নামে—মানবজাতির অর্ধেককে সে বলি দেয়। মানবজাতিকে কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে পরিচালিত করবার কাজে যে নারী জাতিকে তার সাহায্যকারিণী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, নিজের সুখ-ভোগের জন্য তাকেই সে করে তুলেছে তার শত্রু। আমাকে এই কথাটা বলুন: মানবজাতির অগ্রগতিকে কে বাধা দিচ্ছে? নারী। কিন্তু সে যা হয়েছে তা হল কেন? শুধু এই কারণে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে সে বার বার কথাটা বলল। তারপর ধূমপান করতে লাগল।

চৌদ্দ

সেই একই স্বরে সে বলতে লাগল, "অতএব এমনি পশুর মত জীবনই আমি কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু সে জীবনের সব চাইতে খারাপ দিকটা এই যে, এ ধরনের জীবন যাপন করেও আমি কল্পনা করতাম যে, যেহেতু আমি অন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হই নি এবং আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছি, সুতরাং আমি একজন নীতিবান মানুষ, নির্দোষ মানুষ, আর আমাদের মধ্যে যদি ঝগড়া হয়ে থাকে সেজন্য আমার স্ত্রী, বরং তার চরিত্রই দায়ী।

"কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সে তো অন্য স্ত্রীলোকদের থেকে, অন্ততঃ তাদের অধিকাংশের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। আমাদের সমাজে মেয়েদের যে স্থান তার দাবী অনুযায়ীই তো সে বড় হয়েছে; সুবিধাভোগী সমাজের মেয়েরা যেভাবে বড় হয়ে থাকে, যেভাবে বড় হওয়া তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, সেও তো সেই ভাবেই বড় হয়েছে। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার অনেক কথাই আমরা শুনে থাকি। ফাঁকা বুলি। যতদিন পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি আমাদের বর্তমান মনোভাব (যে মনোভাবেব ভাণ করি সেটা নয়) অপরিবর্তিত থাকবে ততদিন মেয়েদের ঠিক এই শিক্ষাই পাওয়া উচিত।

"নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব অনুসারেই মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলবে। পুরুষ নারীকে কি চোখে দেখে তা আমরা সকলেই জানি। কবিরা গেয়ে

থাকেন—Wein, Weiber and Gesang (সুরা, সুন্দরী ও সঙ্গীত)। প্রেমের কবিতা ও ভেনাস-এর নগ্ন মূর্তির আবির্ভাব থেকে শুরু করে যত কাব্য, যত চিত্র ও ভাস্কর্য দেখবেন—সর্বত্রই স্ত্রীলোককে দেখা হয় ভোগের বস্তু হিসাবে, কি রাজসভায় বলনাচের আসরে, কি ত্রুব্নায়া স্কোয়ারে অথবা গ্রাচেভ্কা স্ট্রীট-এ। আরও লক্ষ্য করুন শয়তানের চালাকি: এটা যদি সুখ ও সম্ভোগ ছাড়া আর কিছু না হয় তাহলে এটাকে আমরা ঠিক সেইভাবেই সুখ ও সম্ভোগ হিসাবেই গ্রহণ করব। নারী তো একটি মিষ্টি গ্রাস, আর কিছু না। কিন্তু না, নাইটরাই সর্বপ্রথম নারীকে বড় বলে পূজা করেছিল (তাকে পূজা করেছিল বটে, তবু ভোগের বস্তু হিসাবেই দেখেছিল)। আজকালও পুরুষরা নারীদের শ্রদ্ধা করে। অনেকে তাদের জন্য চেয়ার এগিয়ে দেয়, তাদের রুমাল কুড়িয়ে দেয়, আর একদল শাসনকায ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত যে কোন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদের অধিকারকে স্বীকার করে। তারা মুখে যাই বলুক, কিন্তু নারীর প্রতি তাদের মনোভাব একই আছে। নারী ভোগের নিমিত্ত। তার দেহ সুখলাভের উপাদান। নারীও তা জানে। এ তো এক ধরনের ক্রীতদাস-প্রথা।

"ক্রীতদাস-প্রথা তো এমন একটা অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয় যেখানে অপরের বাধ্যতামূলক শ্রমের ফসল ভোগ করে অন্য কিছু লোক। অন্যের বাধ্যতামূলক শ্রমের ফসল কেটে নেওয়াটাকে পাপ বা লজ্জাজনক মনে করে মানুষ যখন সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে একমাত্র তখনই ক্রীতদাস-প্রথার অবসান হতে পারে। আসলে মানুষ দাস বিক্রিটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে ক্রীতদাস-প্রথার বাইরের চেহারাটাকে বদলে দিয়েছে মাত্র; অথচ তারা মনে করে (নিজেদের নিশ্চিতরূপে বোঝায়) যে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটেছে; কিন্তু তারা চেয়েও দেখে না, দেখতে চায় না যে ক্রীতদাস-প্রথা সমানেই চলেছে, কারণ মানুষ এখনও অন্যের পরিশ্রমের ফসল কাটতে ইচ্ছুক, আর সেটাকে তারা সঠিক ও ন্যায্য কাজ বলেই মনে করে। যতদিন এ কাজ সঠিক বিবেচিত হবে ততদিন এমন কিছু লোক থাকবেই যারা অন্যের চাইতে বেশী শক্তিমান ও বুদ্ধিমান হবার দরুন ক্রীতদাস-প্রথাকে ফিরিয়ে আনবেই।

নারীর মুক্তির ব্যাপারেও সেই একই কথা। যেহেতু পুরুষ মনে করে যে নারীকে ভোগের জন্য ব্যবহার করাই উচিত এবং বাঞ্ছনীয় তাই নারী ক্রীতদাসী। তারপরে পুরুষ চায় তাকে মুক্তি দিতে—তারা তাকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দান করে, কিন্তু তখনও তাকে ভোগের সামগ্রী বলেই মনে করে, শিশুকাল থেকে সেই শিক্ষাই তাকে দেয়, জনমতের সাহায্যেও তাই শেখায়। আর নারীও সেই একই নীচ, চরিত্রহীনা ক্রীতদাসীই থেকে যায়, এবং পুরুষও থাকে সেই একই ভ্রষ্ট-চরিত্র ক্রীতদাস-মালিক।

"তারা কলেজে ও আদালতে মেয়েদের মুক্তি দেয়, অথচ তাকে মনে করে ভোগের বস্তু। নিজেকে এইভাবে দেখবার শিক্ষা সে যতদিন পাবে (আমরা

তো সেই শিক্ষাই দেই) ততদিন সে একটি নীচু স্তরের জীব হয়েই থাকবে। হয় কাপুরুষ ডাক্তারদের সহায়তায় সে গর্ভ রোধ করবে, তার মানে একটি বেশ্যা হয়ে উঠবে, আর নেমে যাবে জানোয়ারের স্তরেও নয়, একেবারে (প্রাণহীন) বস্তুর স্তরে ; অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হবে—দুঃখী, মৃগী-রোগগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন আত্মিক বিকাশের অনুপযুক্ত।

"এ ব্যাপারে স্কুল, কলেজ কিছুই করতে পারে না। একমাত্র নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিজের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটলেই এ ব্যবস্থা বদলাতে পারে। নারী যখন নিজের কুমারী অবস্থাকে আজকের মত লজ্জা ও নিন্দার জিনিস বলে মনে না করে সেটাকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলে ভাবতে শিখবে একমাত্র তখনি এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

"সে যে গণিতের কিছু কিছু জানে বা বেহালা বাজাতে পারে তাতে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। একটি পুরুষকে বাগে আনতে পারলে তবেই সে সুখী হবে, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা পূর্ণ হবে। কাজেই পুরুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখাই হল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অতীতে তাই হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। অবিবাহিত বালিকা ও বিবাহিত স্ত্রীলোক উভয়ের বেলায়ই এ কথা প্রযোজ্য। অবিবাহিত মেয়েরা এ কাজ করবে একজনকে বেছে নেবার সুবিধার জন্য, আর বিবাহিতারা করবে স্বামীদের উপর প্রভুত্ব খাটাবার জন্য।

"শুধু সন্তানের জন্মকালই তাকে এ চেষ্টা থেকে বিরত রাখে, অন্তত সাময়িক-ভাবে স্থগিত রাখে ; কারণ সে যদি রাক্ষসী না হয় তাহলে তার শিশুকে লালন-পালন করে। কিন্তু সেখানেও ডাক্তাররা এসে নাক গলায়।

'আমার স্ত্রী তার সন্তানদের লালন-পালন করতে চাইত এবং প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি সন্তানকে লালন-পালন করেও ছিল ; কিন্তু প্রথম সন্তান জন্মের পরে তার শরীরটা ভাল ছিল না। ডাক্তাররা এসে লজ্জাজনকভাবে ওর সব জামা-কাপড় খুলে সারা শরীর টিপে-টিপে দেখল (সে কাজের জন্যও তাদের আমার ধন্যবাদ দেওয়ার কথা, দর্শনী দেবার কথা)—সেই মাননীয় ডাক্তাররা রায় দিল যে প্রথম সন্তানটিকে পালন-পোষণ করাও তার উচিত নয়, আর এইভাবে পুরুষকে ভোলানোর হাত থেকে রেহাই পাবার একটিমাত্র উপায় থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হল। শিশুর জন্য একটি স্তন্যদায়ী নার্সকে আনা হল ; তার অর্থ একটি অপরিচিত স্ত্রীলোকের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে তার নিজের সন্তানের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনে আমাদের সন্তানকে তার হাতে তুলে দেওয়া হল, আর সেজন্য তার মাথায় পরানো হল কড়া ইস্ত্রি-দেওয়া ফিতে-লাগানো টুপি। কিন্তু এ সব তো অপ্রাসঙ্গিক কথা। আসল কথা হল, আমার স্ত্রী যখন আতুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সন্তানকে পালনের দায় থেকে মুক্তি পেল, তখনই তার ভিতরকার সুপ্ত ছলাকলার ঝোঁকটা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেল। আর তার সেই ছলাকলার ঝোঁক যত বাড়তে লাগল সেই

অনুপাতেই আমি ঈর্ষায় জ্বলতে লাগলাম ; বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনটি থেকেই সে ঈর্ষা আমাকে মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয় নি ; আমি যে রকম নীতিবিগর্হিতভাবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতাম যে কোন স্বামীই তার স্ত্রীর সঙ্গে সেইভাবে বসবাস করবে তাকেই অনিবার্যভাবে এই ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে হবেই।"

পনের

"সারা বিবাহিত জীবনে এক মিনিটের জন্যও ঈর্ষার যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পাই নি। কিন্তু কোন কোন সময়ে যন্ত্রণাটা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠত। সেই রকম একটি সময় এসেছিল যখন আমাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পরে তাকে লালন-পালন করতে ডাক্তাররা আমার স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন। সেই সময় আমি বিশেষভাবে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিলাম ; তার প্রথম কারণ, যথেষ্ট কারণ ছাড়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থাটা পাল্টে দেওয়ার ফলে প্রত্যেক মায়েরাই যে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে আমার স্ত্রীকেও সেই উৎকণ্ঠায় ভুগতে হয়েছিল ; আর দ্বিতীয় কারণ, আমার স্ত্রী যেভাবে অত্যন্ত সহজে মায়ের কর্তব্যকে ঝেড়ে ফেলে দিল তা দেখে সঙ্গত কারণেই (যদিও অজ্ঞাতসারে) আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে সে হয় তো সেই একই সহজভাবে তার দাম্পত্য কর্তব্যকেও ঝেড়ে ফেলে দেবে, বিশেষ করে সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং মাননীয় ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও নিজের সন্তানদের লালন-পালন করায় কোন খারাপ ফল হয় নি।"

"দেখছি ডাক্তারদের প্রতি কোন রকম প্রীতির অপব্যবহার আপনি করেন না," আমি মন্তব্য করলাম। আমি লক্ষ্য করছিলাম, যতবার সে ডাক্তারদের কথা বলছিল ততবারই তার চোখে একটা বিদ্বেষের ঝিলিক খেলে যাচ্ছিল।

"তাদের প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতির কথা এটা নয়। আমার জীবনটাকে ওরা ছারখার করে দিয়েছে, যেমন ছারখার করে দিয়েছে আরও হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জীবনকে, আর কারণকে কার্য থেকে আলাদা করে দেখতে আমি পারি না। উকিলদের মত তারাও যে রোগীদের কাছ থেকে টাকা চুষে নিতে চায় সেটা আমি বুঝতে পারি, এবং আনন্দের সঙ্গে আমার অর্ধেক উপার্জন তাদের দিয়ে দিতাম (প্রকৃত অবস্থাটা যারা বুঝতে পারে তাদের সকলেই তাই করত), অবশ্য যদি বুঝতাম যে সেটা দিলেই আমার পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে তাদের বিরত করা যাবে। কোন হিসাব আমি রাখি নি, কিন্তু ডজন ডজন দৃষ্টান্তের কথা (এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে) আমি জানি যেখানে ডাক্তাররা হয় গর্ভস্থ সন্তানকে মেরে ফেলেছে এবং বলেছে যে প্রসূতি সন্তান-ধারণে অক্ষম (যদিও পরবর্তীকালে সে ভালভাবেই সন্তান প্রসব করেছে), অথবা নানারকম অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রসূতিকেই মেরে ফেলেছে।

এ সব মৃত্যুকে কেউ খুন বলে না, যে রকম মধ্যযুগে 'ইনকুইজিশন'-এর হত্যা-কাণ্ডকেও খুন বলা হত না, কারণ বলা হত যে সেগুলো করা হত মানব কল্যাণের জন্য। ডাক্তাররা যত অপরাধ করে তা সংখ্যাতীত। কিন্তু বিশেষ করে স্ত্রীলোকের মাধ্যমে যে জড়বাদকে তারা পৃথিবীতে আমদানি করে তার দুর্নীতির তুলনায় এ সব অপরাধ অতি তুচ্ছ। আসল কথা, তারা মানুষকে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের, দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে।

"আজকাল কেউ বলতে পারে না, 'তোমার চাল-চলন ভাল নয়, ওটা শোধরাতে হবে।' এ কথা কেউ নিজেকে বা অপরকে বলতে পারে না। তোমার চাল-চলন যদি খারাপ হয়ে থাকে তার কারণ তোমার স্নায়বিক অবস্থার গোলমাল বা ঐ ধরনের একটা কিছু, আর তাই তোমাকে যেতে হবে ডাক্তারদের কাছে, আর তারাও পঁয়ত্রিশ কোপেক দামের ওষুধের ব্যবস্থা দেবে এবং তোমাকে সেটা খেতে হবে। তাতেও যদি অবস্থা খারাপ হতে থাকে, তাহলে আরও ডাক্তারের কাছে যাও, আরও ওষুধ খাও। চমৎকার ব্যবস্থা!

"কিন্তু সেটা কথা নয়। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে, সে বেশ ভালভাবেই তার ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করেছে এবং তার গর্ভাবস্থা ও শিশুকে পালনের সময়টাই শুধু ঈর্ষার যন্ত্রণা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি। তা যদি না হত, তাহলে ঘটনাক্রমে একদিন যা ঘটেছিল সেটা আরও অনেক আগেই ঘটত। ছেলেমেয়েরাই আমাদের দুজনকে রক্ষা করেছে। আট বছরে তার পাঁচটি সন্তান হয়েছিল। আর সে পাঁচটিকেই সে নিজের হাতে লালন-পালন করেছে।

"এখন তারা কোথায়, আপনার ছেলেমেয়েরা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার ছেলেমেয়েরা?" সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সে কথাগুলি আবৃত্তি করল।

"ক্ষমা করবেন; তাদের কথা মনে হলে হয় তো আপনি কষ্ট পান?"

"না, সে কিছু নয়। আমার স্ত্রীর ভাই ও তার বৌ এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের আমার কাছে থাকতে দেয় নি। আমার সব সম্পত্তি তাদের দিতে চেয়েছিলাম, তবু তারা ছেলেমেয়েদের আমার কাছে থাকতে দেয় নি। আমাকে তারা পাগল মনে করে। ওদের দেখতেই তো গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু তারা কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের আমার কাছে থাকতে দেবে না। দেখুন, বাপ-মায়ের মত যাতে না হয় সেইভাবেই ওদের মানুষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা অন্য রকম হতে পারে না। ঠিক আছে, কি আর করা যাবে? তারা আমার কাছে ওদের ফিরিয়ে দেবে না, আমাকে বিশ্বাস করবে না,—এটাই তো স্বাভাবিক। ওদের মানুষ করে তুলবার মত শক্তি আমার আছে কিনা সে বিষয়েও তো আমি নিশ্চিত নই। আমার তো ভয় হয়, তা আমি পারতাম না। আমি তো একটা ধ্বংস-স্তূপ, একটা ভগ্নস্তূপ। কিন্তু একটা জিনিস আমার আছে। জ্ঞান। হ্যাঁ, আমি যা জানি অন্যের তা জানতে অনেক সময় লাগবে।

"আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে ; অন্য সকলের মতই তারাও বড় হয়ে বর্বর হবে। আমি ওদের দেখেছি—তিনবার। ওদের জন্য আমার করবার কিছু নেই। এখন দক্ষিণ দেশে যাচ্ছি। সেখানে আমার একটা ছোট বাড়ি ও বাগান আছে।

"হ্যাঁ, আমি যা জেনেছি তা জানতে অন্য লোকের অনেক সময় লাগবে। সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে কতটা লোহা ও অন্য ধাতু আছে সেটা জানতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু যে সব জিনিসের ভিতর দিয়ে আমাদের পশুত্ব প্রকাশ পায় তাকে জানা—সে বড় কঠিন, খুব কঠিন···

"আপনি আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

ষোল

"আপনি আমার ছেলেমেয়েদের কথা বললেন। আবার দেখুন, ছেলেমেয়েদের বেলায়ও কী মিথ্যা মনোভাব নেওয়া হয়ে থাকে! ছেলেমেয়েরা আনন্দময়! ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ! মিথ্যা কথা। এক সময় হয় তো তাই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। ছেলেমেয়েরা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ মা-ই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অসতর্ক মুহূর্তে অনেক সময় সে কথা বলেও ফেলে। অভিজাত মহলের যে কোন মা-কে জিজ্ঞাসা করুন, সেই আপনাকে বলবে যে পাছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা মারা যায় সেই ভয়ে সে সন্তান চায় না ; আর সন্তান হলেও সে তাকে লালন-পালন করতে চায় না, পাছে তার প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশত দুঃখ পেতে হয়। একটি শিশুর লাবণ্যকে ঘিরে যে আনন্দ—তার ছোট ছোট হাত, পা, শরীর—এ সব কিছু নিয়ে একটি শিশু যে আনন্দ দিতে পারে সেটা শুধু যে তার অসুস্থতা বা মৃত্যুর যন্ত্রণার চাইতে কম তাই নয়, তার অসুস্থতা বা মৃত্যুর ভয়ের চাইতেও কম। ছেলেমেয়ে থাকার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিচার করলে অসুবিধার পাল্লাই ভারী হয় ; আর তাই ছেলেমেয়ে না থাকাই ভাল। এ কথা স্ত্রীলোকরা বেশ সাহসের সঙ্গে খোলাখুলিই বলে থাকে ; তারা মনে করে যে সন্তানের প্রতি মমতাবশতই তাদের মনে এ ভাব জাগে, আর এ ভাবের জন্য তারা গর্ববোধ করে। তারা বুঝতে পারে না যে এই ধরনের চিন্তা তাদের মমতাকেই অস্বীকার করে, তাদের স্বার্থপরতাকেই প্রকাশ করে। একটি শিশুর কাছ থেকে তারা যতটা আনন্দ পায়, দুঃখ পায় তার চাইতে বেশী, আর তাই তারা সন্তান চায় না। ভালবাসার ধনের জন্য তারা স্বার্থত্যাগ করে না, বরং নিজেদের স্বার্থের জন্য যে ভালবাসার বস্তু হতে পারে তাকেই ত্যাগ করে।

"স্পষ্টতই এটা ভালবাসা নয়, স্বার্থপরতা। কিন্তু এই স্বার্থপরতার জন্য বড়লোক মায়েদের দোষ দেওয়া কঠিন—অভিজাত সমাজে সন্তানদের স্বাস্থ্যের

জন্য একটি মহিলাকে যে মূল্য দিতে হয় (আবার ডাক্তারদের ধন্যবাদ) সে কথা মনে হলে প্রতিবাদের একটি শব্দও কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। প্রথম জীবনে যখন তিন-চারটি সন্তান আমার স্ত্রীর জীবনের প্রতিটি মিনিট, তার শক্তির প্রতিটি আউন্সকে অধিকার করে থাকত, তার তখনকার জীবন ও মানসিক অবস্থার কথা মনে হলে আজও আমি শিউরে উঠি। আমাকে দেবার মত কোন সময়ই তার ছিল না। সর্বদাই একটা বিপদের আশংকার মধ্যে দিন কাটত—এই বিপদ কেটে গেল, আবার বিপদ দেখা দিল, আবার সেটাকে দূর করবার বেপরোয়া প্রচেষ্টা, আবার উদ্ধার—যেন একটা ডুবন্ত জাহাজে বাস করছিলাম। কখনও কখনও মনে হত, ইচ্ছা করেই এই পরিবেশটা সৃষ্টি করা হয়েছে, আমার উপর তার জয়কে নিশ্চিত করবার জন্যই আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভাল-মন্দ নিয়ে এতখানি উদ্বেগের ভাণ করে ; নিজের সপক্ষে সব সমস্যার সমাধান করে নেবার এটা একটা সহজ, লোভনীয় পথ। অনেক সময়ই ভাবতাম, আমার স্ত্রী যা কিছু বলে, যা কিছু করে সবই ভণ্ডামি। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। সত্যি সে ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত হত ; ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও রোগ শোক নিয়ে সে সর্বদাই উদ্বেগে কাটাত। অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ছিল, আমার পক্ষেও। আর যন্ত্রণা না সয়ে তার উপায় ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাবনা, তাদের খাওয়া, তাদের আরাম, বিপদে তাদের রক্ষা করা—এই সব জৈবিক চিন্তা ভাবনা অন্য সব স্ত্রীলোকের মতই তার মধ্যেও যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে আরও এমন কিছু ছিল যা জন্তুদের মধ্যে থাকে না—যুক্তি ও কল্পনা। ভবিষ্যতে বাচ্চার কি হতে পারে তা নিয়ে একটা মুরগির কোন উদ্বেগ থাকে না, তার কত রকমের রোগ হতে পারে তাও সে জানে না, আর রোগ ও মৃত্যুকে রোধ করবার যত রকম ওষুধ আছে বলে মানুষ কল্পনা করে তার খোঁজও সে রাখে না। কাজেই একটা মুরগির কাছে তার বাচ্চা কোন যন্ত্রণা নয়। বাচ্চার জন্য যা অবশ্য করা দরকার, সে শুধু তাই করে, আর সেটা আনন্দের সঙ্গেই করে ; কাজেই তার কাছে বাচ্চারা আনন্দের খোরাক। বাচ্চা অসুস্থ হলে ঠিক কি করতে হবে তা সে জানে ঃ সে তাকে খাওয়ায় আর 'তা' দেয়। সে কাজ করবার সময় সে জানে যে সে দরকারী কাজটাই করছে। বাচ্চাটা মরে গেলেও সে শুধায় না কেন মরল বা কোথায় গেল ; কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে, তারপর সব ভুলে গিয়ে আগেকার মতই বাঁচতে থাকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যহীন নারীদের বেলায়, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বেলায় সেটাই যথেষ্ট নয়। ছোটদের রোগ ও তার নিরাময়ের কথা যদি নাও বলি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন-পালন সংক্রান্ত নানাবিধ অসংখ্য বিচিত্র বিধি-বিধানের কথা সে শুনেছে ও পড়েছে। তাদের খাওয়াতে হবে এটা আর ওটা ; না, এটা আর ওটা নয়, ওটা আর এটা। কি ভাবে তাদের খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, নাওয়াতে হবে, শোয়াতে হবে,

বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে ও হাওয়া খাওয়াতে হবে সে সব বিষয়ে আমরা, বিশেষ করে আমার স্ত্রী প্রতি সপ্তাহেই নতুন কিছু আবিষ্কার করতাম। যেন শুধু গতকাল থেকেই ছেলেমেয়েরা জন্মাতে শুরু করেছে। কোন সন্তানের অসুখ যদি হল অমনি ধরে নেওয়া হল যে তার কারণ তাকে যথাসময়ে ঠিকমত খাওয়ানো হয় নি, বা ঠিক মত নাওয়ানো হয় নি; এক কথায়, অসুখের জন্য আমার স্ত্রীই দোষী, কারণ তার যা করা উচিত ছিল তা সে করে নি।

"ছেলেমেয়েরা যখন সুস্থ থাকত তখনই অবস্থা শোচনীয়, আর তারা অসুস্থ হলে তো সে এক নরক। ধরেই নেওয়া হয় যে রোগ সারানো যায়, বিজ্ঞানের একটা শাখা তা নিয়ে আলোচনা করে এবং এক শ্রেণীর লোক আছে—ডাক্তাররা—যারা কি করে রোগ সারাতে হয় তা জানে। সকলে জানে না, কিন্তু সেরা ডাক্তাররা জানে। এখন ধরুন একটি শিশু অসুস্থ হল, অমনি আমাদের সেই সেরা ডাক্তারটিকে খুঁজে বের করতে হবে যে রোগ সারাতে জানে, আর তাহলেই শিশুটি বাঁচবে; কিন্তু যদি আমরা সেই বিশেষ ডাক্তারটিকে খুঁজে না পাই, বা সে যেখানে থাকে আমরা সেখানকার লোক না হই, তাহলেই শিশুটি গেল। শুধু আমার স্ত্রীই যে এসব বিশ্বাস করত তা নয়, আমাদের দলের সব স্ত্রীলোকই বিশ্বাস করত; তাই প্রত্যেকের কাছেই আমার স্ত্রীকে একই কথা শুনতে হত, 'আগে থেকে আইভান জাখারিচ-কে ডাকে নি বলেই ইয়েকাতেরিণা সেমিয়োনভ্না দুটো বাচ্চাকে হারাল।' 'আইভান জাখারিচ মারিয়া আইভানভ্নার বড় মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।' 'ডাক্তারের পরামর্শে পেত্রভ্-রা নানান হোটেলে ঘুরেছিল বলেই ছেলেমেয়েগুলো বেঁচে গেল; নইলে সবগুলি মারা যেত।' 'অমুকের সন্তান ছিল খুবই দুর্বল; ডাক্তারের পরামর্শে তারা দক্ষিণে চলে যাওয়াতেই ছেলেটা বেঁচে গেছে।' আমার স্ত্রী তার ছেলেমেয়েদের ভালর জন্য যে কোন জন্তুর মতই সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। এ অবস্থায় তার ছেলেমেয়েদের কোন ব্যাপারে আইভান জাখারিচ কি বলে তড়িঘড়ি সেটা জানার উপরেই যখন তার ছেলেমেয়েদের জীবন নির্ভর করছে, তখন সেজন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও শংকিত না হয়ে কি সে পারে? কিন্তু আইভান জাখারিচ যে কি বলবে তা কেউ জানে না; সে নিজেও জানে না; কারণ এটা সে ভাল করেই জানে যে সে কিছুই জানে না বা কিছু করতেও পারে না; একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে লোকে যাতে তার উপর বিশ্বাস না হারায় সেজন্য কিছু আকস্মিক প্রভাবমাত্র সে তাদের উপর বিস্তার করতে পারত। আমার স্ত্রী যদি পুরোপুরি একটা জন্তু হত, তাহলে এই সব যন্ত্রণা তাকে ভুগতে হত না; সে যদি পুরোপুরি মানুষ হত তাহলেও সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মতই ভাবতে ও বলতে পারত: 'ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বরই নিয়েছেন; ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হয় না।' সে ভাবতে পারত যে, তার ছেলে-মেয়েসহ সব মানুষের জীবন ও মৃত্যুই ঈশ্বরের ক্ষমতার অধীন, মানুষের নয়;

আর সে-ক্ষেত্রে সে তার ছেলেমেয়েদের রোগ মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম একথা সে ভাবতই না, এবং সে চেষ্টাও করত না। কিন্তু সে তো ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখত : অত্যন্ত দুর্বল আর অত্যন্ত নরম কয়েকটি জীবের ভার তার উপর দেওয়া হয়েছে ; অসংখ্য রোগের তারা শিকার হতে পারে ; এই সব জীবদের জন্য তার একটা আবেগময় জান্তব ভালবাসা আছে, তাদের সব দায়িত্ব তার, অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার উপায়গুলি জনাকয়েক পণ্ডিত ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; সেই সব পণ্ডিতদের পরামর্শ ও সেবা পাওয়া যায় শুধু অনেক অর্থের বিনিময়ে ; তাও আবার সব সময় পাওয়া যায় না।

"ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার স্ত্রীর জীবন, ফলে আমার জীবনও ছিল আনন্দের বদলে যন্ত্রণাময়। অন্য রকম হবে কেমন করে ? সে তো সর্বদাই উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকত। কোন ঈর্ষার ঘটনা বা সাধারণ ঝগড়া-ঝাটির পরে হয়তো একটু শান্তি ফিরে এল, আশা হল এবার একটু আরাম করতে পারব, একটু পড়াশুনা করতে পারব। চিন্তা করতে পারব, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে মন দিতে না দিতেই খবর এসে যেত যে ভাসিয়া বমি করেছে, অথবা মাশা-র মলে রক্তের দাগ দেখা গেছে, বা আন্দ্রেই-এর গায়ে গুটি বেরিয়েছে—বাস্, সব আশা চুরমার হয়ে গেল। কোথায় যেতে হবে ? কোন্ ডাক্তারকে আনতে হবে ? শিশুটিকে কি করে আলাদা রাখা যাবে ? আর তারপরে—ওষুধ, থার্মোমিটার, ড্যুশ ডাক্তার···। একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা এসে জুটত। স্বাভাবিক, সুপরিচালিত পারিবারিক জীবন বলে কিছুই ছিল না। তার বদলে ছিল, আগেই তো বলেছি, বাস্তব ও কাল্পনিক বিপদের হাত থেকে নিজেদের উদ্ধার করবার একটা অবিরাম প্রচেষ্টা। অধিকাংশ পরিবারেই এই অবস্থা। কিন্তু আমার পরিবারে এটা ছিল বিশেষভাবে সত্য, কারণ আমার স্ত্রী ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ আর ছেলেমেয়েদের প্রতি অনুরক্ত।

"কাজেই সন্তান আসার ফলে আমাদের জীবনে কোন উন্নতি দেখা দিল না। বরং তাকে বিষাক্ত করে তুলল। উপরন্তু তারা মতের অমিলের নতুন কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল : আর যত তারা বড় হয়ে উঠতে লাগল ততই তাদের কেন্দ্র করে ঝগড়া-ঝাটিও বাড়তে লাগল। শুধু যে তাদের নিয়ে মনের অমিল হত তাই নয়, তারা যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে উঠল। ছেলেমেয়েদের নিয়েই আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম। দু'জনেরই কিছু পেয়ারের ছেলেমেয়ে ছিল, আর তাকেই আমরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমি সাধারণত আঘাত হানতাম বড় ছেলে ভাসিয়া-কে লক্ষ্য করে, তার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লিজা। তারা যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, যত তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটল, ততই তারা মিত্রপক্ষ হবার উপযুক্ত হয়ে উঠল, আর আমরাও প্রত্যেকেই তাদের দলে টানতে চেষ্টা করতাম। এতে বেচারিরা ভীষণ কষ্ট পেত, কিন্তু আমাদের অবিরাম সংগ্রাম

নিয়ে আমরা এতই ব্যস্ত থাকতাম যে ওদের কথা ভাববারই সময় হত না। মেয়েটি ছিল আমার দলে, আর আমাদের বড় ছেলেটি (সে দেখতে আমার স্ত্রীর মত এবং তার আদরের ছেলে) ছিল তার মায়ের দলে। প্রায়ই দেখতাম সে আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।"

সতের

"এইভাবে আমাদের দিন কাটিতে লাগল। আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই শত্রুর মত হয়ে উঠল। শেষের দিকে মতভেদ থেকে শত্রুতা ঘটে, শত্রুতা থেকেই মতভেদ দেখা দিত। সে কিছু বলবার আগেই আমি দ্বিমত পোষণ করতাম, আর সেও তাই করত।

"চতুর্থ বছরে আমরা উভয় পক্ষই স্বাধীনভাবে স্থির করলাম যে আমরা পরস্পরকে বুঝতেও পারব না, আমাদের মধ্যে মতের মিলও হবে না। কোন রকম বোঝাপড়ার চেষ্টাই ছেড়ে দিলাম। অতি সাধারণ সব বিষয়ে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে, প্রত্যেকেই অবিচলিত মত আঁকড়ে থাকতাম। আজ যখন সে সব কথা মনে হয় তখন বুঝতে পারি যে সব মতামত আমি তখন আঁকড়ে ধরতাম সেগুলি আমার খুব প্রিয় ছিল না এবং আমি সেগুলো ছেড়ে দিতেও পারতাম; কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রীর মতামত ছিল ভিন্ন, সুতরাং আমার মতটা ছেড়ে দেওয়ার অর্থই ছিল তার কাছে পরাজয় স্বীকার করা। সেটা আমি কিছুতেই করতাম না। সেও করত না। হয় তো সে ভাবত যে সেই ঠিক, আর আমি ভাবতাম যে আমি ঠিক। দুজন একলা থাকলে হয় চুপচাপ থাকতাম, আর না হয় তো এমন সব কথাবার্তা হত যা একেবারেই জন্তু-জানোয়ারের স্তরে: 'এখন কটা বাজে?' 'শোবার সময় হয়েছে।' 'আজ ডিনারে খাবার কি আছে?' 'কোথায় আমরা যাব?' 'খবরের কাগজে সংবাদ কি আছে?' 'ডাক্তার ডাকতে হবে; মাশা-র গলায় ঘা হয়েছে।' আলোচনার এই সব অসম্ভব রকমের সংকীর্ণ বিষয়-বস্তু থেকে এক চুল সরে গেলেই আমাদের বিরক্তির একশেষ হত। আমরা রেগে যেতাম; কফি, টেবিল-ঢাকনা, গাড়ি, তাসের একটা চাল—দুজনের কারও কাছেই যার এতটুকু গুরুত্ব নেই তাই নিয়েই গালাগালি শুরু হয়ে যেত। আমার দিক থেকে বলতে পারি, সময় সময় ওর প্রতি আমার ঘৃণা অবিশ্বাস্য রকমের তীব্রতায় পৌঁছে যেত। অনেক সময় তাকে চা ঢালতে, পা দোলাতে, মুখে একটা চামচে তুলতে, অথবা চায়ে চুমুক দিতে দেখলেই সে যে ভাবে ঐ কাজগুলি করত সেজন্য তাকে আমি এত ঘৃণা করতাম যেন সেগুলি এক মহা পাপের কাজ। সে সময় আমি খেয়াল করি নি যে, তথাকথিত ভালবাসার পালার ঠিক পরেই নিয়মিত ও অনিবার্যভাবে শুরু হত আমার ঘৃণার পালা। ভালবাসার পালার পরেই ঘৃণার পালা; দুর্বল ভালবাসার

পালার পরেই সংক্ষিপ্ত ঘৃণার পালা; তীব্র ভালবাসার পরেই দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণার পালা। তখন আমরা বুঝতে পারি নি যে এই ভালবাসা ও ঘৃণা একই জৈবিক অনুভূতির তুটো স্বতন্ত্র দিক।

"প্রকৃত অবস্থাটা যদি আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে জীবনটা তুঃস্বপ্ন হয়ে উঠত; কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নি, কোন জিনিসের আসল চেহারা আমাদের চোখে পড়ে নি। একজন মানুষের জীবনযাত্রা যতই ভুল হোক সেটাকে সে নিজের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে, নিজের অবস্থার শোচনীয়তাকে ঢেকে রাখতে পারে; এখানেই একাধারে মানুষের মুক্তি ও শান্তি। আমরাও তাই করেছি। ঘর সাজানো, নিজের ও ছেলেমেয়েদের সাজগোজের ব্যবস্থা করা, পড়াশুনা করা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা—সংসারের এই সব ছোটখাট আজেবাজে কাজ নিয়ে সে অন্য সব কিছু ভুলে থাকত। আমারও অন্য নেশা ছিল—কাজের নেশা, শিকারের নেশা, তাসের নেশা। তুজনই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। তুজনই ভাবতাম, যত বেশী ব্যস্ত থাকতে পারব, ততই অন্যের প্রতি খারাপ ব্যবহারের অধিকার পাব। ওকে উদ্দেশ্য করে আমি মনে মনে বলতাম, 'ও রকম মুখ করা তোমাকেই সাজে, হৈ-চৈ করে সারাটা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছ।' সে কিন্তু মনে মনের বদলে বেশ উঁচু গলায়ই বলত, 'তুমিই বা কোন্ ভালটা করেছ, বাচ্চাটাকে নিয়ে আমিও তো সারা রাত জেগে কাটিয়েছি।'

"এই ভাবেই আমাদের জীবন কাটতে লাগল; একটা কুয়াসা যেন প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখত। আর পরবর্তীকালে যা ঘটল সেটা যদি না ঘটত তাহলে আমিও হয়তো বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভাবতে পারতাম যে আমার জীবনটা ভালই ছিল—খুব ভাল না হলেও যথেষ্ট ভাল—যে ধরনেব জীবন সকলেই কাটিয়ে থাকে; তুঃখ-তুর্দশা ও মিথ্যাচারের কোন্ অতল গহ্বরে যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম তা কোনদিনই বুঝতে পারতাম না।

"আমরা ছিলাম যেন তুটি চরম শত্রু; একটিমাত্র শিকল দিয়ে একত্রে খোঁটায় বাঁধা; পরস্পরের জীবনকে বিষময় করে তুলেছি, অথচ সেটা স্বীকার করি নি। তখনও জানতাম না যে শতকরা নিরানব্বইটি স্বামী-স্ত্রীই এইভাবেই বেঁচে থাকে, আর এটাই অনিবার্য। সে সময়ে কি নিজের ব্যাপারে কি অন্যের ব্যাপারে, এই কথাটা আমার জানা ছিল না।"

"ঠিক পথেই চলি আর ভুল পথেই চলি, জীবনে কী বিচিত্র যোগাযোগই না ঘটে! বাবা-মার পক্ষে জীবন যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখনই হয় তো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য শহরে যাওয়ার দরকার দেখা দেয়। এই দরকার আমাদের সামনেও দেখা দিল।"

সে চুপ করল। তু'বার চাপা ফোঁপানির মত শব্দটা করল। একটা

স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি।

"ক'টা বাজে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ঘড়ি দেখলাম। দুটো বাজে।

"আপনার ক্লান্তি লাগছে না?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত।"

"আমার দম আটকে আসছে। একটু হাঁটব। একটু জল খাব।"

টলতে টলতে পা ফেলে করিডর ধরে সে চলে গেল। একা বসে বসে তার কথাগুলিই ভাবতে লাগলাম। নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে অন্যদিকের দরজা দিয়ে সে কখন ফিরে এসেছে তা খেয়ালই করি নি।

আঠার

সে শুরু করল, "আমি শান্তভাবে কথা বলতে পারি না। এ সব কথা ভেবে অনেক সময় কাটিয়েছি, অনেক কিছুকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি; আমার কথা অন্যকে শোনাতে চাই।

"হ্যাঁ, আমরা শহরে বাস করতে লাগলাম। অসুখী লোকদের পক্ষে শহরে বাস করাই সহজ। অনেক আগেই মরে ধুলোয় মিশে গেছি এটা না বুঝেও শহরে একশ' বছর বেঁচে থাকা যায়। 'নিজেকে জানো'-র কোন অবকাশ সেখানে নেই। সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। ব্যবসার কাজকর্ম, সামাজিক দাবী, স্বাস্থ্য, চারুকলা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের লেখাপড়া। আজ অমুক-অমুককে আপ্যায়িত কর; কাল অমুক-অমুকের সঙ্গে দেখা কর। এটা দেখ, ওটা শোন। শহরে সব সময়ই একজন, বা দুজন, বা তিনজন এমন বিখ্যাত লোক থাকবেই যাদের উপেক্ষা করা যায় না। এটা, ওটি, বা আরেকটির চিকিৎসা করাতে হবে; মাস্টারমশাই আছে, গৃহশিক্ষক আছে, শিক্ষয়িত্রী আছে; মোটের উপর জীবনটা কিন্তু একটা পিপের মতই ফাঁকা।"

"এইভাবে চলতে লাগল; একত্রে থাকার যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হল। প্রথম মাসটা তো নতুন শহরে, নতুন ফ্ল্যাটে গুছিয়ে বসা এবং শহর থেকে গ্রামে যাওয়া আর গ্রাম থেকে শহরে আসার আকর্ষণীয় কাজেই কেটে গেল।"

"একটা শীত চলে গেল; পরের শীতে এমন একটা কিছু ঘটল যেটা দেখতে অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনা হলেও তার ফলেই পরবর্তীকালের সেই ঘটনাটা ঘটেছিল। আমার স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, আর ঐ রাস্কেলগুলো জানিয়ে দিয়েছিল যে তার সন্তান হওয়া উচিত নয় এবং কি ভাবে সন্তানের জন্ম রোধ করা যায় তাও তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। এটা আমার কাছে খুব আপত্তিকর বলে মনে হল। বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও ছেলেমানুষের মত জেদ ধরল, আর আমিও মেনে নিলাম। আমাদের পাশবিকতার শেষ

অজুহাত—সন্তান—তাও আর রইল না ; জীবন আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

"চাষী ও শ্রমিকদের সন্তানের প্রয়োজন আছে ; তাদের খাওয়ানো যত শক্তই হোক, সন্তানের প্রয়োজন তাদের আছেই, আর তাই তাদের দাম্পত্য জীবনেরও একটা যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বিনা প্রয়োজনেই সন্তান লাভ করি, তাদের জন্য বাড়তি ঝঞ্ঝাট ও বাড়তি ব্যয় বহন করি ; তারা সম্পত্তির অবাঞ্ছিত ভাগীদার, তারা বোঝাস্বরূপ। কাজেই আমাদের পাশবিকতার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজে পাই না। হয় সন্তানের জন্ম থেকে রেহাই পাবার জন্য কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করি, আর না হয় তো তাদের মনে করি যথেষ্ট সতর্কতার অভাবের ফলস্বরূপ দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তি, আর সেটাই সব চাইতে বিরক্তিকর। কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমরা এতই নীচে নেমে গেছি যে যুক্তির প্রয়োজনীয়তাটাও স্বীকার করি না। আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েও এতটুকু বিবেকের যন্ত্রণা সহ্য করে না।

"আর বিবেকের বালাই-ই যখন নেই তখন বিবেকের যন্ত্রণাই বা আসবে কোথা থেকে ? অবশ্য জনমত বা ফৌজদারি দণ্ডবিধিকে যদি এক ধরনের বিবেক বলা হয় সে কথা আলাদা। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে তার কোনটাকেই লংঘন করা হয় না ; জনমত এতে বাধা দিতে পারে না, কারণ সকলেই এ কাজ করে, এমন কি মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না এবং আইভান জাখারিচ-ও। (সে কি ? তোমরা কি চাও যে আমরা একগাদা ভিখারিকে জন্ম দেই অথবা সমাজে চলাফেরা করার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি ?) আর ফৌজদারি দণ্ডবিধি ? এখানে তো ভয়ের কিছুই নেই। কেবল ইতর মেয়েমানুষ আর সৈনিকদের প্রেয়সীরাই তাদের বাচ্চাকে পুকুরে ও কুয়োয় ফেলে দেয় ; ওদের তো কারাগারে ঢোকাতেই হবে, কিন্তু আমরা তো সব কিছুই যথাসময়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবেই করে থাকি।

"এইভাবে আরও দুটি বছর কাটালাম। রাস্কেলদের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর হল। আমার স্ত্রী ফুলের মত ফুটে উঠল, শেষ বসন্তের ফুলের মত হয়ে উঠল আরও মজবুত, আরও সুন্দরী। সেটা বুঝতে পেরে সে নিজের দিকে আরও বেশী করে নজর দিতে লাগল। তার রূপে লোককে টানবার, তাকে বিচলিত করবার মত কিছু ছিল। তার তখন ভরন্ত যৌবন, বয়স ত্রিশ, ছেলেপুলে হয় না, দেহ হৃষ্টপুষ্ট, মেজাজ চড়া। তাকে দেখলেই মন উচাটন হয়। যেখানেই যায় পুরুষের নজর টানে। সে যেন একটা হৃষ্টপুষ্ট, সুসজ্জিত ছেড়ে-দেওয়া ঘোড়া যার গলায় হঠাৎ রাশ পরানো হয়েছে। আমাদের মহিলাদের শতকরা নিরানব্বই জনের যেমন কোন রাশ থাকে না, তেমনি তারও কোন রাশ ছিল. না। সেটা বুঝতে পেরে আমার ভয় হল।"

উনিশ

উত্তেজিতভাবে উঠে গিয়ে সে জানালার ধারে একটা আসনে বসল।

যেতে যেতে বলল, "মাপ করবেন।" প্রথম মিনিট তিনেক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আমার পাশে এসে বসে পড়ল। মুখটা বদলে গেছে, চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠেছে, হাসির মত একটা কিছুতে ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলতে লাগল, "একটু ক্লান্ত লাগছে, তবু বলব। এখনও অনেক সময় হাতে আছে, এখনও আলো ফুটতে শুরু করে নি। সত্যি, বাচ্চা হওয়া বন্ধ হবার পর থেকেই আমার স্ত্রী বেশ সুন্দর ও মোটাসোটা হয়ে উঠল, আর তার সেই রোগটাও—ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবিরাম দুর্ভোগ—কমে গেল। একেবারে সেরে গেল তা নয়, কিন্তু নেশার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ চারপাশের জগৎটাকে আনন্দে ভরা দেখার মত সেও যেন যে-জগৎটাকে ভুলে গিয়েছিল, যে-জগৎটাকে সে ভালবাসতে পারে নি, বুঝতে পারে নি, তাকে যেন নতুন করে দেখতে পেল। 'একে আমি চলে যেতে দেব না। সময় চলে যাচ্ছে, সে আর কখনও ফিরবে না।' মনে হল, সে ঠিক এই রকমটাই ভেবেছে, বা অনুভব করেছে, কারণ অন্য কিছু সে ভাবতে বা অনুভব করতে পারে না; সে তো এই বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছে যে জীবনে একটিমাত্র কাম্যবস্তু আছে—ভালবাসা। তার বিয়ে হয়েছে, এবং যদিও সে ভালবাসা থেকে কিছু না কিছু সে পেয়েছে, তবু সে যা আশা করেছিল, যা দেবার প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সে পায় নি, বরং ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত রকমের যন্ত্রণা ছাড়াও বিয়ের ফলে সে পেয়েছে হতাশা ও দুঃখ। এই যন্ত্রণা তাকে ক্ষয় করে দিয়েছে। কিন্তু এখন, হিতৈষী ডাক্তারদের ধন্যবাদ, সে জেনেছে যে সন্তান হবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে খুসি হয়ে উঠল, এই নতুন অনুভূতি তার ভাল লাগল, জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য সে নবযৌবনবতী হল—সেটি ভালবাসা। কিন্তু একটি নোংরা, ঈর্ষাতুর, ঘৃণিত স্বামীর সঙ্গে ভালবাসা নয়। নতুন, পবিত্র এক আলাদা রকমের ভালবাসার স্বপ্ন সে দেখতে লাগল। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম। আর যেন কারও প্রতীক্ষায় আছে এইভাবে সে চারদিকে নজর রাখতে লাগল। সবই দেখলাম, আতংকিত হলাম। দিনের পর দিন তার অভ্যাসমত অন্যের মারফতে সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলত—অর্থাৎ কথা বলত অন্যের সঙ্গে, কিন্তু কথাগুলি শোনাত আমাকে—তখন সে বেশ সাহসের সঙ্গে আধা তামাসার ভঙ্গীতে বলত ছেলেমেয়ের প্রতি মায়ের আকর্ষণ একটা ফাঁকি, যতদিন যৌবন থাকে, জীবনকে উপভোগ করবার শক্তি থাকে, ততদিন ছেলেমেয়ের জন্য জীবনকে বলি দেবার কোন অর্থ হয় না। কাজেই তার ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর দেওয়া কমে গেল, যেটুকু দিত তাতেও আগেকার সেই বেপরোয়া তীব্রতা থাকত

না; নিজের ও নিজের চেহারার পিছনেই সে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিত। পিয়ানো বাজনায় আবার হাত দিল। আর এই ভাবেই সব কিছুর সূত্রপাত হল।"

তার ক্লান্ত চোখ দুটি আবার জানালার দিকে ফিরে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল; মনে হল যেন জোর করেই কথা বলতে শুরু করল।

"আর তারপরেই সেই লোকটি এল।"

একটু থেমে দু'তিনবার সেই অদ্ভুত শব্দটা করল। বুঝতে পারলাম, সে লোকটির নাম বলতে, তার কথা স্মরণ করতে, তার কথা বলতে লোকটির কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে জোর করেই বলতে লাগল; কণ্ঠস্বরে দৃঢ়সংকল্প ফুটে উঠল; জোর করেই সব বাধা দূরে সরিয়ে দিল।

"মনে হল, লোকটি অতিশয় নীচ। আমার জীবনে তার যে ভূমিকা সে জন্য নয়, লোকটি আসলেই নীচ। তার এই নীচতাই প্রমাণ করে আমার স্ত্রী কতখানি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল। সে না হয়ে যদি আর কেউ হত—তাহলেও এই ঘটত!" আবার সে থামল। "লোকটা ছিল বাজিয়ে, বেহালা বাজাত; পেশাদার বেহালাদার নয়—আধা বাজিয়ে, আধা বাবু মানুষ। তার বাবা ছিলেন একজন জমিদার, আমার বাবার প্রতিবেশী। তার বাবা সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দিয়ে ছেলেদের—তিনটি ছেলে—পাঠিয়ে দিল কাজ করতে, কিন্তু ছোট ছেলেটিকে পাঠাল প্যারিসে তার ধর্ম-মায়ের কাছে। তার গান-বাজনার দিকে ঝোঁক থাকায় তাকে একটা বাজনার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। বেহালা-বাজিয়ে হিসাবে শিক্ষা শেষ করে সে কনসার্ট বাজাতে লাগল। মানুষ হিসাবে সে ছিল"—স্পষ্টতই তার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে আবার শুরু করল। "সেখানে সে কি ধরনের জীবন যাপন করত আমি বলতে পারি না; আমি শুধু জানি, সেই বছরই সে রাশিয়ায় ফিরে এসে আমার বাড়িতে এল।

"ভিজে, বাদামের মত চোখ, হাসি-হাসি লাল ঠোঁট, মোমে-মাজা গোঁফ, আধুনিক কায়দার কেশসজ্জা, দেখতে অশ্লীল গোছের ভাল, যাকে মেয়েরা বলে 'মন্দ নয়,' শরীরটা দুর্বল কিন্তু দেখতে খারাপ নয়, পেছনটা মোটাসোটা, যেমনটি মেয়েদের থাকে, বা হটেনটট-দের (দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জাতি) থাকে। শুনেছি হটেনটট-রাও গান-বাজনা পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই আপনজন হয়ে উঠতে পারে, আবার স্পর্শকাতর হওয়ায় সামান্য বাধা পেলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চাল-চলনে মর্যাদার আভাষ, বিশেষ প্যারিসীয় ধরনের বোতাম-আঁটা জুতো পরে, ঝকঝকে নেক-টাই, আরও এমন সব জিনিস যা বিদেশীরা প্যারিসে এলেই রপ্ত করে নেয় এবং অভিনবত্ব ও মৌলিকতার গুণে যা মেয়েদের মনোহরণ করে থাকে। ভাব-ভঙ্গীতে একটা কৃত্রিমতার আভাষ, কথা বলত এমন ঠারে-ঠুরে যেন সে কি বলতে চায় তা সকলেই জানে এবং নিজেরাই বাকিটা বুঝে নিতে পারে।

"সব কিছুর মূলে ঐ লোকটি আর তার বাজনা। বিচারের সময় বোঝানো হয়েছিল যে ঈর্ষার জন্যই সব কিছু ঘটেছিল। মোটেই তা নয়, মানে ঠিক যে ওটা নয় তাও নয়, কিন্তু তবু—ঠিক ওটা নয়। বিচারে স্থির হল, স্বামী হিসাবে আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আমার সম্মান রক্ষার জন্যই আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। কাজেই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিচারের সময় প্রকৃত অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু তারা ভাবল যে আমি আমার স্ত্রীর সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছি।

"সেই বাজনাদারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক যাই হোক, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, আমার স্ত্রীরও না। একমাত্র যেটা ভাববার মত জিনিস তার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি—আমার পশু-ভাব। সব কিছু ঘটেছিল কারণ আমাদের মধ্যে ছিল একটা ভয়ংকর ফাঁক; আমাদের পারস্পরিক ঘৃণার চাপ এত বেশী ছিল যে সামান্যতম উস্কানিতেই তা একেবারে ফেটে পড়ত। আমাদের ঝগড়াঝাটি ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সেটা আরও ভয়ংকর এই কারণে যে সেই সব ঝগড়াঝাটির ফাঁকে ফাঁকেই চলত আমাদের তীব্র জান্তব কামনার পর্ব।

"সে লোকটির আগমন যদি না ঘটত, তাহলে অন্য কেউ আসত। এর মূল কারণ যদি ঈর্ষা না হয়, তাহলে নিশ্চয় অন্য কিছু। আমার বক্তব্য হল, যারাই আমার মত জীবন যাপন করে তারাই হয় সম্পূর্ণ ভ্রষ্টচরিত্র হবে, নয় তো তাদের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে, অথবা নিজেদের বা স্ত্রীদের খুন করবে, যেমন আমি করেছি। যদি কেউ এর হাত থেকে রেহাই পায় তাহলে সে একটি বিরল ব্যতিক্রম। কাজটা শেষ করবার আগে অনেকবার আমি আত্মহত্যার মুখোমুখি হয়েছি, আর আমার স্ত্রীও বিষ খাবার চেষ্টা করেছে।"

কুড়ি

"হ্যাঁ, শেষ পরিণতির আগে অবস্থাটা এই রকমই দাঁড়িয়েছিল। এমন একটা যুদ্ধ-বিরতির পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম যেটা আমাদের দুজনেরই মেনে চলা উচিত ছিল। কিন্তু একদিন আমি বললাম যে, প্রদর্শনীতে একটা কুকুর একটা পদক পেয়েছে।

আমার স্ত্রী বলল, 'পদক নয়, প্রশংসাপত্র।'

"তর্কাতর্কি শুরু হল। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয় এসে পড়ল। ভৎসনাও শুরু হল: 'আহা, সেকথা সকলেই জানে; সর্বদা তো ওই হয়। তুমি বলেছিলে…'

'ও রকম কোন কথা আমি বলি নি।'

'তার মানে, আমি মিথ্যাবাদী!'

"বুঝতে পারলাম, এমন একটা ভয়ংকর ঝগড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে

আমরা পৌঁছে গেছি যে আমার ইচ্ছা হল তাকে বা নিজেকে খুন করে ফেলি। আমি ঠিক বুঝেছিলাম, আমরা ততদূর পৌঁছে গেছি, আর তখনি আমি সেটাকে জ্বলন্ত আগুনের মত ভয় পেলাম। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রীরও সেই একই অবস্থা, বা আরও খারাপ অবস্থা; ইচ্ছা করেই সে আমার বক্তব্যকে বিকৃত করল, তার ভুল অর্থ করল। তার প্রতিটি কথায় যেন বিষ মাখানো; আমার দুর্বলতম স্থানগুলি বেছে নিয়ে সে সেখানেই আঘাত করতে লাগল। চলল তো চললই। আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'রসনা সংযত কর!' অথবা ঐ রকমই অন্য কোন কথা। সে লাফ দিয়ে উঠে বাচ্চাদের ঘরের দিকে ছুটে গেল। আমার বক্তব্য শেষ করবার জন্য ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। তার হাতট চেপে ধরলাম। আঘাত লাগার ভাণ করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাছারা! তোমাদের বাবা আমাকে মারছে!'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'মিথ্যা কথা বলো না।'

সেও পাল্টা চীৎকার করে বলল, 'এই তো প্রথম নয়।'

"ছেলেমেয়েরা তার কাছে ছুটে গেল। সে তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করল।

'ভনিতা ছাড়ো', আমি বললাম।

'তোমার কাছে তো সবই ভাণ; একটা মানুষকে খুন করেও তুমি বলতে পার যে সে খুন হওয়ার ভাণ করছে। এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি—তাই তুমি চাও!'

'তুমি মর তাই আমি দেখতে চাই', আমি আর্তকণ্ঠে বললাম।

"নিজের কথায় আমি নিজেই যে কতখানি আতংকিত হয়েছিলাম সেটা আজও মনে পড়ে। কখনও ভাবতেও পারি নি যে ও রকম কঠোর, ভয়ংকর কথা আমি বলতে পারি; কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাচ্চাদের কান্নাকাটির মধ্যেই আমি দৌড়ে পড়ার ঘরে চলে গেলাম, সেখানে বসে বসে ধূমপান করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম, সে হল-এ ঢুকে জামাকাপড় পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায় যাচ্ছে। কোন জবাব দিল না। 'গোল্লায় যাক', নিজের মনেই বললাম, তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করতে লাগলাম।

"তার উপর প্রতিশোধ নেবার, তার হাত থেকে রেহাই পাবার, সব কিছু মিটমাট করে যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে চলবার হাজার ফন্দি মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। শুয়ে শুয়ে ভাবছি, আর ধূমপান করছি তো করছি, করছি তো করছি। ভাবলাম, তার কাছ থেকে দূরে চলে যাই, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি, আমেরিকা যাত্রা করি। এমন কি তাকে ছেড়ে জীবন চালাবার কথাও কল্পনা করতে লাগলাম। কী চমৎকারই না হবে, সম্পূর্ণ আলাদা রকমের আর একটি চমৎকার নারীর সঙ্গে আমার জীবনকে কেমনভাবে যুক্ত করে দেব।

তার মৃত্যু ঘটিয়ে অথবা তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাব। কিভাবে এটা করা যায় তাই ভাবতে লাগলাম।

"বাড়িতে জীবনযাত্রা যে রকম চলছিল সেই রকমই চলতে লাগল। শিক্ষয়িত্রী এসে জানতে চাইল, কর্ত্রী কোথায় গেছেন এবং কখন ফিরবেন। পরিচারক এসে জিজ্ঞাসা করল, চা দেবে কি না। খাবার ঘরে গেলাম। ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে লিজার সবকিছু বুঝবার মত বয়স হয়েছে, নিস্পৃহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল। চুপচাপ বসে চা খেলাম। সে ফিরল না। সন্ধ্যা উত্রে গেল, তখনও ফিরল না। আমার মনে দুটো অনুভূতির লড়াই শুরু হল; সে যখন জানে যে ফিরে আসতে হবেই তখন এই ভাবে দূরে থেকে আমাকে ও ছেলেমেয়েদের জ্বালাবার জন্য তার উপর রাগ হতে লাগল; আবার ভয়ও হল যে সে আর ফিরবে না, আত্মঘাতী হবে। তাকে খুঁজতেই হয়তো যেতাম, কিন্তু কোথায় যাব? তার বোনের বাড়ি? সেখানে গিয়ে তার খোঁজ করাটাই তো হবে বোকামি, আর সেটাই তো সে চাইছে। চুলোয় যাক। কাউকে কষ্ট দেবার যখন এতই ঝোঁক, তখন নিজেই কষ্ট পাক। নইলে পরের ঝগড়াটা তো আরও শোচনীয় হবে। কিন্তু সে যদি বোনের বাড়ি না গিয়ে থাকে, যদি তার আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা হয়, বা এর মধ্যেই যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকে, তাহলে?

"এগারোটা বাজল, বারোটা···। শোবার ঘরেই গেলাম না—একা একা শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করা তো বোকামি। পড়ার ঘরেও শুয়ে থাকতে পারলাম না। একটা কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইলাম, কিছু লেখা বা পড়া, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। পড়ার ঘরে একা বসে রইলাম—ক্রুদ্ধ, চিন্তায় জর্জরিত সামান্যতম শব্দের জন্য উৎকণ্ঠিত।

"তিনটে বাজল, চারটে বাজল—সে এল না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল। সে আসে নি।

"বাড়িতে কাজকর্ম যথারীতি চলছে, কিন্তু সকলেই বিচলিত, যেন সব দোষ আমার এমনিভাবে সকলেই আমার দিকে সপ্রশ্ন ও তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর আমার মধ্যে চলেছে সেই একই সংঘাত—আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তার উপর রাগ আর তার জন্য উদ্বেগ।

"বেলা এগারোটা নাগাদ তার বোন এল দূত হয়ে। সে যথারীতি শুরু করল: 'তার অবস্থা সাংঘাতিক। কি হয়েছে?'

'কেন, কিছুই হয় নি।' আরও বললাম, 'ওর প্রকৃতিই ওই রকম; আমি কিছুই করি নি।'

'কিন্তু এ অবস্থা তো চলতে পারে না,' তার বোন বলল।

আমি বললাম, 'সেটা তার দেখবার কথা, আমার নয়। আমি আগ-বাড়িয়ে কিছু করতে পারব না। যদি আলাদা হতে হয়, তো আলাদাই হব।'

"আমার শ্যালিকা অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাকে জোর গলায় বলেছিলাম যে আমি আগ-বাড়িয়ে কিছু করব না, কিন্তু সে চলে গেলে বাইরে এসে ছেলেমেয়েদের ভীত, করুণ মুখগুলি দেখে সে মত পাল্টাতেও রাজী হলাম। নিজে থেকে কিছু করতে পারলে তখন আমি খুসিই হতাম, কিন্তু কি করে কি করব বুঝতে পারলাম না। আবার ঘরময় পায়চারি করতে করতে ধূমপান করতে লাগলাম। প্রাতরাশে ভদ্‌কা ও মদ খেলাম; নিজের অজ্ঞাতেই যা চাইছিলাম ক্রমে ক্রমে সেই অবস্থাই ফিরে পেলাম: যে পথ ধরেছি তার নীচতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা ভুলে গেলাম।

"তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরল। আমাকে দেখে কিছুই বলল না। সে অনুতপ্ত হয়েছে মনে করে আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তার গালাগালিতে রেগে গিয়েই কথাগুলি আমি বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেই একই কঠিন বিকৃত মুখে সে বলল, কৈফিয়ৎ শুনতে সে আসে নি, এসেছে ছেলেমেয়েদের নিতে; আমাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়। আমি বলতে চাইলাম যে সেটা আমার দোষ নয়, সেই আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। মুহূর্তের জন্য সে কঠোর দৃষ্টিতে দৃপ্ত ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল: 'আর কোন কথা নয়, একদিন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

"আমি বললাম, নাটুকেপনা আমার সহ্য হয় না। এতে সে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে তার ঘরের দিকে চলে গেল। দরজায় চাবি ঘুরাবার শব্দ শুনলাম—দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ধাক্কা দিলাম, কোন সাড়া নেই; রেগে চলে এলাম। আধ ঘণ্টা পরে লিজা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এল।

'কি হয়েছে? কোন কিছু ঘটেছে কি?'

'মামণির ঘর থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।'

"আমরা সে ঘরে গেলাম। প্রাণপণে দরজা ধরে টানলাম। তালায় আটকাল না, দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেল। বিছানার কাছে ছুটে গেলাম। স্কার্ট ও বুট পরা অবস্থায়ই অদ্ভুত ভঙ্গীতে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। বিছানার পাশের টেবিলে আফিমের একটা খালি শিশি পড়ে আছে। তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। আবার চোখের জল, এবং শেষ পর্যন্ত মিলন। কিন্তু সত্যিকারের মিলন নয়; পুরনো তিক্ততা দুজনের মনেই রয়ে গেল; বরং তার সঙ্গে যুক্ত হল এই ঝগড়ার দুর্ভোগের জন্য আক্রোশ, আর সে জন্য দুজনই দুজনের উপর দোষারোপ করতে লাগলাম। কিন্তু সে আক্রোশ তো চিরদিন পুষে রাখা যায় না, তাই জীবন আবার তার পুরনো খাতেই বয়ে চলল। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার, দিনে একবার করে এ ধরনের এবং এর চাইতেও বাজে ঝগড়া চলতেই লাগল। বারে বারে একই ব্যাপার। একবার বিদেশে চলে যাবার জন্য পাশপোর্টের দরখাস্ত করলাম (ঝগড়াটা তখন দুদিন ধরে চলছিল) কিন্তু তারপরেই কিছুটা বোঝাপড়া হল, কিছুটা মিল হল, আর আমারও যাওয়া হল না।"

সেই লোকটি যখন দর্শন দিল তখন এই ছিল পরিস্থিতি। মস্কোতে পৌছেই সে (তার নাম ক্রুখাচেভ্স্কি) আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সকালে সে এল। আমি তাকে অভ্যর্থনা করলাম। এক সময়ে আমাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কথাবার্তার সময় সে চেষ্টা করল সেই ঘনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনতে কিন্তু গোড়াতেই বুঝিয়ে দিলাম যে আমি সেটা চাই না, আর সেও তদনুসারেই নিজেকে মানিয়ে নিল। দেখামাত্রই তাকে আমার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটা অদ্ভুত সর্বনাশা শক্তির তাড়নায় আমি তাকে প্রতিহত করতে পারলাম না, দূরে সরিয়ে দিতে পারলাম না; বরং তাকে উৎসাহই জোগালাম। তাকে যদি নিস্পৃহভাবে অভ্যর্থনা করতাম, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিয়েই যদি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতাম, তাহলে আমার পক্ষে কী ভালই না হত! কিন্তু না, তার সঙ্গে বাজনার কথা বললাম; কে যেন আমাকে বলেছিল যে সে বেহালা ছেড়ে দিয়েছে—সে কথাও বললাম। কথাটা অস্বীকার করে সে বলল যে সে বরং আগেকার চাইতে বেশী করে বাজাচ্ছে। সে মনে করিয়ে দিল যে এক সময় আমিও বাজাতাম। আমি বললাম, এখন আর আমি বাজাই না। তবে আমার স্ত্রী খুব ভাল বাজায়।

"আরও আশ্চর্যের ব্যাপার: তার এই আগমনের ফলাফল আগে থেকে জানতে পারলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে রকম হতে পারত, প্রথম দিন থেকেই, প্রথম ঘণ্টা থেকেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সেই রকম রূপই নিল। আমাদের মধ্যে একটা স্নায়ুর চাপ দেখা দিল; আমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভাব আমি লক্ষ্য করতাম এবং তার বিশেষ অর্থ খুঁজে বার করতাম।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলোচনাটা সঙ্গে সঙ্গে বাজনার দিকে মোড় নিল, আর সেও এসে তার সঙ্গে বাজাবার প্রস্তাব করল। আমার স্ত্রী সেজেছিল সুন্দরী মনমোহিনী সাজে (আজকাল তাই সে করত), তাকে দেখে মাথা ঘুরে যাবারই কথা। মনে হল, প্রথম থেকেই আমার স্ত্রীর লোকটিকে ভাল লাগল। পিয়ানো ও বেহালার সঙ্গত করবার সম্ভাবনায় সে উল্লসিত হয়ে উঠল, কারণ এই দ্বৈত বাজনাটা সে বিশেষভাবে ভালবাসত এবং একসঙ্গে বাজাবার জন্য প্রায়ই সে থিয়েটার থেকে একজন বেহালাদার ভাড়া করে আনত। তার খুসির ভাবটা মুখেই ফুটে উঠত। আমার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই সে আমার মনের অবস্থাটা বুঝে ফেলল: সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলে গেল, আর শুরু হল পরস্পরকে ঠকাবার লুকোচুরি খেলা। খুসির ভাণ করে আমি উদার হাসি হাসলাম। সব লম্পটরা স্ত্রীলোকদের দিকে যেভাবে তাকায় সেই লোকটিও আমার স্ত্রীর দিকে সেইভাবেই তাকাতে লাগল, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন আমাদের আলোচনায় তার কত আগ্রহ, অথচ সে সব ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই ছিল না। আমার স্ত্রী নির্বিকার

থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার ঈর্ষাকাতর স্বামীর নকল হাসি (সে-হাসি সে ভাল করেই চেনে) এবং আমাদের অতিথির কামনাভরা দৃষ্টি দেখে সে বিচলিত না হয়ে পারল না। লোকটিকে প্রথম দেখামাত্রই আমার স্ত্রীর চোখে একটা বিশেষ উজ্জ্বলতা আমার চোখে পড়ল, এবং আমার ঈর্ষার জন্যই তাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল যে তাদের দুজনেরই হাসি, দৃষ্টিপাত ও মুখের ভাব পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে লাগল। আমার স্ত্রী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—লোকটিও লজ্জায় লাল হল; লোকটি হাসল—আমার স্ত্রীও হাসল। সঙ্গীত, প্যারিস ও নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা কথাবার্তা বলল। তারপর সে যাবার জন্য উঠল এবং টুপিটাকে কম্পিত হাঁটুর উপর রেখে আমরা কি করি সেটা দেখবার জন্য আমার স্ত্রীর দিকে ও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। সেই মুহূর্তটা বিশেষভাবে আমার স্মৃতির উপর দাগ কেটে আছে কারণ সেই মুহূর্তে আমি তাকে আবার আসবার জন্য আমন্ত্রণ না জানাতে পারতাম, আর তাহলে তো কিছুই ঘটত না। কিন্তু আমি তার দিকে তাকালাম, তারপর আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম এবং মনে মনে তাকে বললাম, 'ভেব না যে আমি ভয় পেয়েছি'; তারপরই কোন সন্ধ্যায় বেহালাটা নিয়ে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। আমার স্ত্রী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, লাল হয়ে উঠল এবং যেন ভয় পেয়েই আপত্তি জানিয়ে বলল যে সে এত খারাপ বাজায় যে অতিথিটির সঙ্গে বাজানই চলে না। তার এই আপত্তিতে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম এবং বার বার লোকটিকে আসতে অনুরোধ করলাম। মনে পড়ে, সে যখন ঝুঁকে ঝুঁকে পা ফেলে পাখির মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর থেকে চলে গেল তখন তার মাথার পিছন দিকে তাকিয়ে কালো চুলের নীচেকার সাদা ঘাড়টাকে উঠতে-নামতে দেখে আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাব জেগেছিল। নিজের কাছে এ সত্য স্বীকার না করে আমি পারলাম না যে ঐ লোকটার পাশে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, 'তার সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা সেটা তো আমার উপরেই নির্ভর করে।' কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না করার অর্থই তো তাকে আমি ভয় করি। না, আমি তাকে ভয় করি না। সেটাকে খুবই অপমানজনক বলে মনে হল। আর তাই সেই হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী সব শুনতে পাবে জেনেই লোকটিকে জোর করে বললাম, সে দিনই সন্ধ্যায় তাকে বেহালাটা নিয়ে আসতে হবে। সেও কথা দিয়ে চলে গেল।

"সেদিন সন্ধ্যায় বেহালা নিয়ে সে এল, দুজনে বাজাল। কিন্তু তেমন জমল না; ঠিকমত বাজানো হল না; সঙ্গীত আমার খুব প্রিয়; যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করলাম—লোকটির জন্য একটা 'স্ট্যাণ্ড' এনে দিলাম, স্বরলিপির পাতা উল্টে দিলাম। কিছু কিছু জিনিস তারা বাজাল, কথাহীন কিছু গান আর মোজার্ট-এর একটা সুর। যন্ত্র থেকে সুন্দর সুর বের করে লোকটি চমৎকার

বাজাল। এমন একটি সুন্দর রুচির পরিচয়ও সে রাখল যেটা তার চরিত্রের সঙ্গে মোটেই মেলে না।

"স্বভাবতই লোকটির বাজনা আমার স্ত্রীর বাজনার চাইতে অনেক বেশী ভাল ; সে এক দিকে যেমন আমার স্ত্রীকে সাহায্য করল, আবার তেমনি তাকে সশ্রদ্ধ প্রশংসাও জানাল। তার ব্যবহারও আশ্চর্য রকমের ভাল। আমার স্ত্রীর শুধু বাজাতেই আগ্রহ, তার আচরণও সহজ ও অকপট। আমিও বাজনাতে আগ্রহের ভাণ করলাম বটে কিন্তু সারাটা সন্ধ্যা ঈর্ষায় জ্বলে মরলাম।

"যে মুহূর্তে তাদের চোখাচোখি হল তখনই আমি দেখলাম, সামাজিক মর্যাদার সমস্ত আইন-কানুনকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাদের দুজনকার ভিতরের পশুটা মাথা তুলে যেন প্রশ্ন করছে, 'হবে কি ?' আর জবাব দিচ্ছে, 'নিশ্চয় হবে।' বুঝলাম মস্কোর মেয়ে আমার স্ত্রী যে এতদূর মনোরমা হবে তা সে আশা করে নি, তাই তাকে দেখে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমার স্ত্রীকে যে সে ভাবেই সে বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও তার কোন সন্দেহ হয় নি। একমাত্র সমস্যা এই অসহ্য স্বামীটাকে কি করে বাগে আনা যায়। আমি স্বয়ং শুদ্ধচরিত্র হলে এটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বিয়ের আগে অন্য সকলের মত আমি নিজেও মেয়েদের এই চোখেই দেখতাম, কাজেই খোলা বইয়ের মতই তার মনের কথা আমি পড়তে পারলাম। আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল যখন সন্দেহাতীত-ভাবে বুঝতে পারলাম যে যৌন-সম্ভোগের কিছু ক্ষণিক মুহূর্ত ছাড়া আমার প্রতি আমার স্ত্রীর একমাত্র মনোভাব তখন বিরক্তিকর, আর এই লোকটি তার নীরবতা ও সুন্দর চেহারার জন্য, বিশেষত তার অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার জন্য একসঙ্গে বাজাবার ফলে তাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে তার জন্য, এবং সংবেদনশীল মনের উপর সঙ্গীতের (বিশেষ করে বেহালা বাজনা) প্রভাবের জন্য —এই লোকটিকে যে আমার স্ত্রীর পছন্দ হবে তাই নয়, নির্দ্বিধায় সে আমার স্ত্রীকে জয় করবে, চমকে দেবে, কড়ে আঙুলে জড়াবে, তাকে নিয়ে যা খুসি তাই করবে। এ কথা না ভেবে আমি পারলাম না, আর ফলে বর্ণনাতীত কষ্ট পেলাম। আর তা সত্ত্বেও, অথবা হয় তো সেই জন্যই, একটা শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে, এমন কি তাকে সমাদর করতে আমাকে বাধ্য করল। আমার স্ত্রীর জন্য, আমি যে লোকটিকে ভয় করি না সেটা তাকে দেখাবার জন্যই আমি এ কাজ করেছিলাম, না কি আমার জন্য, আমাকে ঠকাবার জন্যই করেছিলাম। তা বলতে পারি না, কিন্তু একেবারে গোড়া থেকেই তার সঙ্গে সহজ, সরল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই-খানেই তাকে খুন করবার ইচ্ছাকে আমি দমন করেছিলাম তার প্রতি সদয় হয়ে। খাবারের সময় তাকে দামী মদ দিলাম, তার বাজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম, তার সঙ্গে কথা বলার সময় মিষ্টি করে হাসলাম, পরের রবিবারে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে এবং আবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাতে আমন্ত্রণ করলাম।

আরও বললাম, তার বাজনা শুনবার জন্য আমাদের কয়েকজন সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধুকেও আমন্ত্রণ করব। সেখানেই সে সন্ধ্যাটা শেষ হল।"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে পজ্‌দ্‌নিশেভ নড়েচড়ে বসল ; অদ্ভুত শব্দটা করল। বেশ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করে সে আবার শুরু করল। "কি আশ্চর্য প্রভাবই না সেই লোকটা আমার উপর বিস্তার করেছিল। তিন চার দিন পরে একটা প্রদর্শনী থেকে ফিরে হল-এ ঢুকতেই অকস্মাৎ আমার হৃদপিণ্ডটা পাথরের মত ভারী হয়ে গেল ; কেন যে হল তখন বলতে পারি নি। এ রকম হল তার কারণ বারান্দা দিয়ে যাবার সময় এমন কিছু দেখেছিলাম যাতে লোকটির কথা মনে পড়ে গেল। পড়ার ঘরে ঢোকার পরে তবে খেয়াল হল সেটা কি, এবং সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য আবার বারান্দায় ফিরে গেলাম। না, আমার ভুল হয় নি ; তারই কেতাদুরস্ত কোটটা সেখানে ঝুলছে। (কেন করছি না বুঝেই তার প্রত্যেকটি জিনিসের উপর আমি নজর রাখতাম) খোঁজ করলাম। হ্যাঁ, সে এসেছে। বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে গেলাম। মেয়ে লিজা তার বইয়ের উপর উপুড় হয়ে আছে, ছোট্টটিকে কোলে নিয়ে আয়া টেবিলের পাশে বসে একটা ঢাকনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অভ্যর্থনা-কক্ষে যাবার দরজাটা বন্ধ, কিন্তু arpeggio (স্বরের সমতাল গৎ) এবং তাদের দুজনের গলা আমার কানে এল। কান পাতলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। স্পষ্টতই তাদের কণ্ঠস্বর, হয়তো বা তাদের চুম্বনের শব্দকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই পিয়ানোটা বাজানো হচ্ছে। হায় ঈশ্বর, তখন আমার এ কী হল! সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে যে পশুটা বাসা বেঁধেছিল সে কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। আমার হৃদপিণ্ড সংকুচিত হয়ে গেল, থেমে গেল, আর তার পরেই হাতুড়ির ঘা পড়ল। নিজের প্রতি বড়ই করুণা হল (ক্রোধে উন্মত্ত হলে মানুষের এই রকমই হয়)। মনে মনে বললাম, 'ছেলেমেয়েদের সামনে! আয়ার সামনে!' নিশ্চয় আমাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ; লিজা যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল তা দেখেই সেটা বুঝতে পারলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'এখন আমি কি করি? ভিতরে যাব? সাহস হয় না। আমি যে কি করে বসব তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।' কিন্তু সেখান থেকে চলে যেতেও পারলাম না। আয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমার মনের কথা সে বুঝতে পেরেছে। 'ভিতরে যাবই,' মনে মনে বলেই দ্রুত দরজাটা খুলে ফেললাম। বড় পিয়ানোটার পাশে বসে লোকটি সাদা আঙুলের টোকায় arpeggio বাজাচ্ছে। আমার স্ত্রী পিয়ানোর বাঁকটায় দাঁড়িয়ে স্বরলিপিতে চোখ বুলোচ্ছে। সেই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল। হয় তো সে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন ভয় পায় নি, অথবা হয়তো সত্যসত্যই ভয় পায় নি। মোট কথা, সে চমকেও ওঠে নি, কেঁপেও ওঠে নি ; শুধু একটু

রাঙা হয়ে উঠেছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে নয়।

"আপনি আসায় কী যে খুসি হয়েছি ; রবিবারে কি যে বাজাব আমরা তো বুঝতেই পারছি না," এমন সুরে সে কথাগুলি বলল, যা আমরা দুজন একলা থাকলে সে কখনও বলত না। ওই লোকটাও নিজের সম্পর্কে 'আমরা' কথাটা ব্যবহার করায় আমার মোটেই ভাল লাগল না। কোন কথা না বলেই লোকটিকে অভ্যর্থনা করলাম। সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল, এমন একটি হাসি হাসল যেটা আমার কাছে নিছক ঠাট্টা বলে মনে হল। হাসতে হাসতেই সে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, রবিবারের বাজনার স্বরলিপি নিয়ে সে এসেছে কিন্তু কি যে বাজাবে সে বিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না—একটা কোন শক্ত শাস্ত্রীয় সুর (বেহালা ও পিয়ানোর জন্য বীঠোভেন-এর কোন 'সোনাতা' না কোন ছোটখাট সুর। এমন সহজ সরলভাবে সে কথাটা বলল যে আমি কোন রকম আপত্তি করতে পারলাম না, অথচ আমি নিশ্চিত জানতাম যে সে যা কিছু বলেছে সব মিথ্যা, তারা দুজনে আমাকে ঠকাবার একটা গোপন মতলব এঁটেছে।

"আমাদের ঐতিহ্যসম্মতভাবে নারী ও পুরুষ যখন দৈহিক সান্নিধ্যে আসে তখনই দেখা দেয় ঈর্ষান্বিতদের পক্ষে (আমাদের মত সমাজে সকলেই তো ঈর্ষান্বিত) চরম যন্ত্রণার কাল। নাচের আসরে দৈহিক সান্নিধ্য, ডাক্তার ও তার রোগিনীর দৈহিক সান্নিধ্য, চারুকলা, চিত্রশিল্প ও বিশেষ করে গান-বাজনার ক্ষেত্রে দৈহিক সান্নিধ্য—এ সব ব্যাপারে কেউ যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে তাহলেই তো তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা শুরু হয়ে যায়। এই তো দুটি মানুষ শ্রেষ্ঠ শিল্প সঙ্গীতের চর্চায় মগ্ন ; সে চর্চার জন্য দৈহিক সান্নিধ্য একান্ত দরকার, আর এ দৈহিক সান্নিধ্যের মধ্যে নিন্দারও কিছু নেই ; কেবলমাত্র অতিমাত্রায় নির্বোধ ও ঈর্ষাকাতর স্বামীরাই এতে আপত্তি খুঁজে পেতে পারে। অথচ একথা সকলেই জানে যে এই সব চর্চা, বিশেষ করে সঙ্গীতের চর্চার ফলেই আমাদের মত মানুষদের মধ্যে ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়ে থাকে।

"মনে হল আমার বিরক্তির ভাবটা ওরা বুঝতে পেরেছে ; কিছুক্ষণ আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। একটা সম্পূর্ণ ভরা বোতল উল্টে ধরলে তার ভিতর থেকে যেমন কিছুই বেরতে পারে না আমার অবস্থাও সেই রকম। ইচ্ছা হল ওকে ধমকে দেই, বাড়ি থেকে বের করে দেই, কিন্তু তবু বুঝলাম যে, আমাকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। তাই করলাম। সব কিছু অনুমোদন করার ভাণ করলাম, অথচ যেহেতু আমার আসল মনোভাবটা ঠিক উল্টো তাই আমার ব্যবহার অতিমাত্রায় সদয় হয়ে উঠল, আর তার ফলে লোকটার উপস্থিতি আমার কাছে আরও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল; তবু আমাকে বলতে হল যে তার বিচারের উপর আমার পুরো ভরসা আছে, আর আমার স্ত্রীকেও ব্যাপারটা তার হাতে ছেড়ে দিতেই পরামর্শ দিলাম। আমার আকস্মিক

প্রবেশ ও বিরক্তিকর নীরবতার দরুন যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা দূর না হওয়া পর্যন্তই সে আমাদের বাড়িতে কাটাল, এবং ঠিক তার পরেই যেন এরই মধ্যে পরের দিন কি বাজানো হবে সেটা স্থির হয়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে বিদায় নিল।

"তাকে বিদায় জানাবার সময় আমি তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলাম (একজনের বাড়ির সুখ ও শান্তিকে ধ্বংস করতেই যে এসেছে তাকে বিদায় দিতে ও রকম তো করতেই হবে!)। বিশেষ সমাদরে তার নরম সাদা হাতটা চেপে ধরলাম।"

বাইশ

"সারাদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। বলতে পারলাম না। সে সামনে এলেই আমার মধ্যে ঘৃণা এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে আমার ভয় হল কখন কি করে বসি। খাবার সময় বাচ্চাদের সামনেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কখন যাচ্ছি (পরের সপ্তাহে আমার একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেবার কথা)। বললাম। সে জানতে চাইল, কোন কিছু গোছগাছ করে দিতে হবে কিনা। কোন জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ টেবিলেই বসে রইলাম, তারপর কোন কথা না বলেই পড়ার ঘরে চলে গেলাম। ইদানীং সে আর পড়ার ঘরে আমার কাছে আসে না, বিশেষ করে এরকম সময়ে। শুয়ে শুয়ে রাগটাকে মনের মধ্যে পুষতে লাগলাম। হঠাৎ তার পায়ের শব্দ কানে এল। মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই ভয়ংকর, বীভৎস চিন্তাটা—'উরিয়া'র (বাইবেল-এর একটি চরিত্র) স্ত্রীর মত কি আমার কাছে এই অসময়ে আসছে তার পাপকে ঢাকতে! তার পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে আমি মনে মনে ভাবলাম, 'সে কি সত্যি আমার কাছে কিছু বলতে আসছে? তা যদি হয় তাহলে আমি ঠিক ধরেছি।' তার প্রতি অকথ্য ঘৃণায় আমার মন ভরে উঠল। পায়ের শব্দ আরও, আরও কাছে এল। ও পায়ের শব্দ কি দরজা পেরিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে ঢুকবে? না, দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল; সেখানে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী—দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, দুটি ভীরু চোখে মিনতিভরা দৃষ্টি; সে চেষ্টা করল সে দৃষ্টি লুকিয়ে রাখতে কিন্তু সেটা আমার চোখ এড়াল না, সে দৃষ্টির অর্থ আমি জানি। অনেকক্ষণ শ্বাসরোধ করে থাকায় আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। তার দিকে চোখ রেখেই একটা সিগারেট ধরালাম।

"সোফায় আমার খুব কাছে বসে আমার দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম আর তুমি সিগারেট ধরালে, এটা কি ভাল হল?'

"যাতে তার ছোঁয়া না লাগে সেজন্য আমি সরে গেলাম।

"সে বলল, 'বুঝতে পারছি, রবিবারে আমি যে বাজাব সেজন্য তুমি রাগ করেছ।'

"আমি বললাম, 'মোটেই না।'

'হুঃ, আমি যেন বুঝি না।'

'যদি বুঝতে তাহলে তো আমি খুসি হতাম। আমার কথা যদি বল, আমি তো দেখছি তুমি একটা কুত্তির মত ব্যবহার করছ…।'

'তুমি যদি গাড়োয়ানদের মত গালাগালি শুরু কর তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।'

'তাই যাও। শুধু মনে রেখ, পরিবারের মর্যাদা তোমার কাছে কিছু না হলেও আমার কাছে অনেকখানি—তোমার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই—তুমি গোল্লায় যাও—আমার ভাবনা যত পরিবারের মর্যাদাকে নিয়ে।'

'কী? কী বললে?'

'চলে যাও! ঈশ্বরের দোহাই, চলে যাও।'

'না বোঝার ভাণ করে (অথবা হয়তো সত্যি সে বুঝল না) আহত, ক্রুদ্ধ হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বেরিয়ে না গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'সত্যি তুমি অসম্ভব হয়ে উঠেছ। কোন দেবদূতও তোমার সঙ্গে বাস করতে পারবে না।' আমার সব চাইতে দুর্বল জায়গায় আঘাত করবার জন্যই আমার বোনের ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা সে স্মরণ করিয়ে দিল (একবার রাগের মাথায় তাকে আমি অনেক কটু কথা বলেছিলাম; সে স্মৃতি আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক; আমার স্ত্রী তা জানে, আর সেই জন্যই এই মুহূর্তে সে কথার উল্লেখ করল)। সে বলল, 'সেই থেকে তোমার কোন কিছুতেই আমি অবাক হই না।'

"নিজের মনে ভাবলাম, 'তুমি আমাকে অপমান করবে, বিদ্রূপ করবে, দুর্নাম করবে, আর তার পরে বলবে যে আমি দোষী।' হঠাৎ এত তীব্র ঘৃণা আমার মধ্যে জাগল যে রকমটা আগে কখনও হয় নি; জীবনে এই প্রথম ঘৃণাকে বাইরে প্রকাশ করবার ইচ্ছা জাগল মনে। লাফ দিয়ে তার দিকে ধেয়ে গেলাম; কিন্তু মনে পড়ে, লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি করতে যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারলাম, আর নিজেকে প্রশ্ন করলাম, মনের তীব্রতাকে এভাবে প্রকাশ করা ঠিক কি না, আবার নিজেই জবাব দিলাম, হ্যাঁ ঠিক, কারণ এই ভাবেই তাকে ভয় দেখানো যাবে। কাজেই ঘৃণাকে মনের মধ্যে চেপে না রেখে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম, আর সেই ঘৃণা যখন আমার ভিতরটাকে তোলপাড় করে তুলল তখন আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

"ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চলে যাও, নইলে খুন করে ফেলব।' ইচ্ছা করেই কথার মধ্যে সবটা ঘৃণা উজাড় করে দিলাম। তখন আমাকে নিশ্চয় ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, কারণ ভয়ে সে নড়তেও পারছিল না।

"সে বলল, 'ভাসিয়া, তোমার কি হয়েছে?'

'বেরিয়ে যাও!' আরও জোর গলায় আমি গর্জে উঠলাম। 'তুমিই আমাকে রাগে অন্ধ করে তুলেছ। যদি কিছু করে বসি আমাকে দোষ দিও না।'

"ক্রোধের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে খুসিতে ডগমগ হয়ে উঠলাম। মনের তিক্ততাকে বোঝাবার জন্য একটা অসাধারণ কিছু করবার ইচ্ছা হল। তীব্র বাসনা হল তাকে আঘাত করি, খুন করে ফেলি; কিন্তু আমি জানতাম সে কাজ আমি করতে পারি না, আর তাই রাগ দেখাবার জন্য একটা কাগজ-চাপা তুলে নিয়ে তার পাশ দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'বেরিয়ে যাও।' আমার নিশানা ভালই ছিল, তাই কাগজ-চাপাটা তার গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে গেল, তবে যাবার আগে দরজার কাছে দাঁড়াল। সে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যেখান থেকে আমাকে দেখা যায় (সে সব কিছু যাতে দেখতে পায় আমি ইচ্ছা করেই সেই ভাবে কাজটা করেছিলাম) ; তাই আমি লেখার টেবিলে যা কিছু ছিল—মোমবাতিদান, দোয়াত—সব তুলে তুলে মেঝেতে আছড়ে ফেলতে লাগলাম।

"চীৎকার করে বললাম, 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও! যদি কিছু করে বসি তখন আমাকে দায়ী করো না!'

"সে চলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমিও শান্ত হলাম।

"এক ঘণ্টা পরে আয়া এসে খবর দিল, আমার স্ত্রীর মৃগীরোগ হয়েছে। তার কাছে গেলাম। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, হাসছে, কোন কথা বলছে না, সারা শরীর এঁকে-বেঁকে উঠছে। সত্যি সে তখন অসুস্থ।

"সকালে সে অনেকটা সেরে উঠল; যাকে ভালবাসা বলে তার প্রভাবে আবার আমাদের মধ্যে মিটমাট হল। মিটমাটের পর যখন তার কাছে স্বীকার করলাম যে ত্রুখাচেভ্‌স্কিকে আমি ঈর্ষা করি, তখন সে মোটেই ঘাবড়াল না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেসে উঠে বলল, 'ওরকম একটা মানুষের প্রতি সে অনুরক্ত হতে পারে এটা ভাবাই তো হাস্যকর।'

'কোন ভদ্র স্ত্রীলোক কি ও রকম একটা মানুষের প্রতি অনুরক্ত হতে পারে? গান-বাজনার আনন্দ ছাড়া আর কোন টান আমার নেই। তুমি যদি চাও, আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করব না; এমন কি যদিও রবিবারের জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে তবু রবিবারেও নয়। তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে আমি অসুস্থ, বাস, তাহলেই সব চুকে যাবে। আমার দুঃখ শুধু এইখানে যে কোন পুরুষ ভাবতে পারে যে আমার সর্বনাশ করবার ক্ষমতা তার আছে। একথা স্বীকার করতেও আমার গর্বে বাধে।'

"সে কিন্তু মিথ্যা বলে নি; যা বলেছে তা সে বিশ্বাস করে। সে আশা করেছিল এই সব কথা দিয়ে সে তাকে ঘৃণা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু সে ব্যর্থ হল। সব কিছুই যে তার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে

সেই অভিশপ্ত গান-বাজনা। এ বিষয়ে আর কোন কথা হল না। রবিবারে অতিথিরা এল এবং আমার স্ত্রী ও সেই লোকটি তাদের বাজনা শোনাল।

তেইশ

"আমার মনে হয় আমি যে একজন অহংকারী লোক সে কথা বলাই বাহুল্য; আমাদের সমাজে অহংকার ছাড়া আর কি নিয়েই বা বেঁচে থাকা যায়? কাজেই সে বাজনার সন্ধ্যা ও তার খাবারের আয়োজন যাতে আমাদের উপযুক্ত হয় সেই ব্যবস্থার দিকেই আমি নজর দিলাম। নিজেই খাবার কিনে আনলাম, অতিথিদের আমন্ত্রণ করে এলাম।

'ছটা নাগাদ সকলে এল; সান্ধ্য পোষাকে সেজে সেও এল; জামার হীরের বোতামে কুরুচির পরিচয়। সব সময়ই তার একটা হামবড়াই ভাব, কেউ কথা বললে একটু হেসে যেন তাকে কৃতার্থ করে, যেন যে যাই বলুক বা করুক সবই তার আগে থেকেই জানা। তার শিক্ষা-দীক্ষার অভাবের প্রতিটি লক্ষণ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, কারণ তাতে এই ভেবে আমি সান্ত্বনা পেলাম যে, আমার স্ত্রী নিজের মুখে যে কথা বলেছিল অর্থাৎ এই লোকটি তার আসক্তির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সে কথার প্রমাণ এতেই আমি পেয়েছিলাম। তখন আমি ঈর্ষাকাতর হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। প্রথমত, ঈর্ষার দরুণ কষ্ট পেয়ে পেয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই তখন আমার বিশ্রামের দরকার; দ্বিতীয়ত, আমার স্ত্রীর কথায় তখন আমি বিশ্বাস করতেই চাইছিলাম এবং বিশ্বাস করেও ছিলাম। কিন্তু আমার মনে ঈর্ষা না থাকলেও খাবার সময়টা এবং গান-বাজনার আগের সময়টা তাদের কাছে আমি স্বস্তিতে কাটাতে পারছিলাম না; সারাক্ষণ তাদের গতিবিধি ও দৃষ্টি বিনিময়ের দিকেই আমার নজর ছিল।

"খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা যেমন হয়ে থাকে সেই রকমই হয়েছিল—আড়ষ্ট ও একঘেয়ে। একটু আগেভাগেই বাজনা শুরু হয়ে গেল। সে সন্ধ্যার প্রতিটি বিবরণ আমার মনে আঁকা আছে! মনে পড়ে, সে বেহালাটা নিয়ে এল, বাক্সটা খুলল, কোন মেয়ের হাতের কাজ-করা ঢাকনাটা সরিয়ে বাদ্যযন্ত্রটা বের করল, তাতে সুর বাঁধল। মনে পড়ে, নিজের সলজ্জ ভাবটা (প্রধানত বাজনার জন্যই লজ্জার ভাবটা এসেছিল) চাপা দেবার জন্য আমার স্ত্রী কি রকম উদাসীনতার ভাব দেখাচ্ছিল, মুখের উপর কপট ভাব ফুটিয়ে বাজনা নিয়ে বসেছিল। তারপর শুরু হল মধ্যম স্বর তোলা, তারগুলি বাঁধা, ঠিক মত স্বরলিপি অনুসরণ করা। মনে পড়ে, তাদের দৃষ্টি-বিনিময়, সমবেত অতিথিদের দিকে তাকানো, দুজনে চুপিচুপি কথা, তারপর বাজনা শুরু। প্রথম গৎটা বাজাল আমার স্ত্রী। মনে পড়ে, লোকটির মুখে কী গম্ভীর সুন্দর ভাব ফুটে উঠেছিল তখন। কান পেতে শুনতে শুনতে সতর্ক আঙুলে সেও বেহালায় ছড় টানল পিয়ানোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে। তারা বাজনা শুরু করল।"

সে থামল। পর পর বার কয়েক সেই অদ্ভুত শব্দটা করল। কথা বলতে গেলেই তার গলা ধরে আসছিল। তাই সে অপেক্ষা করল। তারপর :

"তারা বীঠোভেন-এর 'ক্রয়ত্জার সোনাতা' বাজাল। 'সেই প্রথম প্রেস্টো'টি আপনার মনে আছে? আছে?' সে চেঁচিয়ে উঠল। উঃ! কী ভয়ংকর জিনিস সেই সোনাতা। সেটা কি? আমি জানি না। সঙ্গীত জিনিসটাই বা ঠিক কি? লোকের কি কাজে আসে? আর কেনই বা কাজে লাগে? লোকে বলে, সঙ্গীত মানুষের আত্মাকে উন্নত করে। বাজে কথা। মিথ্যা কথা। সঙ্গীতের একটা প্রভাব নিশ্চয় আছে, ভয়ংকর প্রভাব (আমার নিজের কথাই শুধু বলতে পারি), কিন্তু সে প্রভাব মানুষের আত্মাকে উন্নত করে না। উন্নতও করে না, নীচেও নামায় না; শুধু উত্তেজিত করে। কি করে যে বোঝাব? সঙ্গীত আমাকে, আমার প্রকৃত অবস্থাকে ভুলিয়ে দেয়; এমন একটা অবস্থায় আমাকে নিয়ে যায় যেটা আমার নিজের অবস্থা নয়। সঙ্গীতের প্রভাবে আমি কল্পনা করি যে, এমন জিনিস আমি অনুভব করি যা সত্যি আমি অনুভব করি না, এমন জিনিস বুঝি যা সত্যি আমি বুঝি না, এমন কাজ করতে পারি যা করতে সত্যি আমি অক্ষম। ব্যাপারটা আমি এইভাবে বোঝাতে পারি যে, আমার উপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া হাই তোলার মত, হাসির মত : ঘুম না পেলেও অন্যকে হাই তুলতে দেখে আমিও হাই তুলি; হাসবার কিছু নেই, তবু অন্যের হাসি শুনে আমি হেসে উঠি।

"রচয়িতা স্বরলিপি লিখবার সময় যে আত্মিক অবস্থার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল সঙ্গীত আমাকেও শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায়। আমার আত্মা তার আত্মার সঙ্গে মিশে যায়, আর তার সঙ্গেই আমি এক ভাব থেকে ভাবান্তরে চলে যাই, কিন্তু কেন যে ঐ সব ভাবের ভিতর দিয়ে আমি যাব তা বলতে পারি না। অপর পক্ষে রচয়িতা—যেমন ধরুন ক্রয়ত্জার সোনাতা-র রচয়িতা বীঠোভেন) কিন্তু জানত কেন তার মনে ঐ ভাবটি দেখা দিয়েছিল। ঐ ভাবের বশেই সে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজও করেছিল, কাজেই তার কাছে ঐ ভাবের একটা অর্থ ছিল, কিন্তু আমার কাছে সে ভাবের কোন অর্থই থাকতে পারে না। সঙ্গীত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মানুষকে উত্তেজিত করে। ঠিক মত বলতে গেলে, সামরিক বাজনা বাজালেই সৈন্যরা মার্চ করতে শুরু করে, কাজেই সে বাজনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; নাচের বাজনা বাজালে আমি নাচি, সেখানেও বাজনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ধর্ম-সঙ্গীতের বেলায়ও এ কথা সত্যি; সেটা বাজানো হলেই আমি ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিই। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে সঙ্গীত শুধুই উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তার বহিঃপ্রকাশের কোন পথ বাত্লে দেয় না। সেই জন্যই সঙ্গীতের প্রভাব এত ভয়াবহ, অনেক সময় এতদূর ভয়ংকর। চীন দেশে সঙ্গীত রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত। আর সেটাই হওয়া উচিত। যে কোন লোক অপর একটি লোককে সম্মোহিত করবে (এমন কি আরও অনেক লোককে) এবং

তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাবে, এটা কি চলতে দেওয়া উচিত ? সব চাইতে খারাপ হল, অনেক সময়ই সেই যাদুকরের কোন নীতির বালাই থাকে না।

"যার তার হাতে পড়লে এটা বড় ভয়ংকর অস্ত্র হয়ে ওঠে। ক্রয়েত্‌জার সোনাতা-র কথাই ধরুন না—তার প্রথম গৎটা। বসবার ঘরে গলা-খোলা জামা পরা মেয়েদের সামনে কি কারও 'প্রেস্টো'-টা বাজানো উচিত ?—সেটা বাজানো হবে, হাততালি পড়বে, আর তারপরেই চলবে আইসক্রিম খাওয়া এবং নানান গল্প-গুজব ? একমাত্র একটি নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ পরিবেশে এই সঙ্গীতের পরিপোষক কোন নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই এ ধরনের সঙ্গীত বাজানো উচিত। বাজানোর ফলে যে সব কাজের মনোভাব সৃষ্টি হবে তা তো করা চাই। অন্যথায় স্থান ও কালের পক্ষে অনুপযোগী যে সব ভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে তারা সহজ প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবে। অন্তত আমার বেলায় এই সঙ্গীতের ফল হয়েছে সর্বনাশা। এর ফলে এমন সব অনুভূতি ও উদ্দীপনা আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে যাদের সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। সে সঙ্গীত যেন আমাকে বলল, 'এই হল আসল কথা ; তুমি যে ভাবে আছ, যে ভাবে ভেবেছ সেটা মোটেই ঠিক নয়, এটাই ঠিক।' সে নতুন পথটা যে কি তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু সেই নতুনত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। আমার স্ত্রীকে এবং সেই লোকটিকেও যেন সম্পূর্ণ নতুন আলোয় দেখতে পেলাম।

"প্রেস্টো-র পরে তারা সাধারণ হলেও বেশ মিষ্টি 'আন্দান্তে' (ধীর লয়ের বাজনা) সুরটা বাজাল, তার নীচু স্তরের বিস্তার ও কাঁচা উপসংহারটাও বাদ দিল না। অতিথিদের অনুরোধে আরও কয়েকটি সুর বাজালো,—আর্নস্ট-এর (বিখ্যাত অষ্ট্রীয় বেহালা-বাদক) একটি শোক-গাথা এবং অন্য কিছু সুর। সব-গুলিই বেশ ভাল, কিন্তু প্রথম বাজনার প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। এ-গুলোতে তার দশ ভাগের একভাগও পড়ল না। প্রথমটা শুনে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি সেগুলি শুনেছিলাম। তার পর সারাটা সন্ধ্যা বেশ হাসিখুসি ও হাল্কা মনে ছিলাম। আগে কখনও আমার স্ত্রীকে সেদিনের মত দেখি নি। চোখের দীপ্তি, বাজাবার সময় গম্ভীর ও অর্থ-পূর্ণ মুখের ভাব, শেষ করবার পরে তার অসহায়তা এবং স্বর্গীয় অথচ সকরুণ ম্লান হাসি। সব কিছুই দেখলাম ; সে সবের একটিমাত্র অর্থই আমি খুঁজে পেলাম ; আমার মতই তার কাছেও খুলে গেছে স্মৃতির অতল থেকে বেরিয়ে আসা নতুন আর অপরিচিত সব অনুভূতি।

"সন্ধ্যাটা ভালভাবেই কাটল ; সকলেই বাড়ি চলে গেল।

"দুদিনের মধ্যেই আমি সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যাচ্ছি এ কথা জেনে ত্রুখাচেভ্‌স্কি বিদায় নেবার সময় জানাল যে, সেদিন সন্ধ্যায় যে আনন্দ সে পেয়েছে পরের বার আমাদের শহরে যখন সে আসবে তখন আবার সেই আনন্দ লাভের আশা সে রাখে। আমি ধরে নিলাম, আমার অবর্তমানে যে আমার

বাড়িতে তার পক্ষে আসা অসম্ভব এটাই সে ভেবে নিয়েছে। এতে আমি বেশ খুসিই হলাম।

"এই প্রথম সত্যিকারের খুসির সঙ্গে তার করমর্দন করলাম এবং আনন্দ দানের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। যেন অনেক দিনের মত চলে যাচ্ছে সেই ভাবেই সে আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও বিদায় নিল। আমার মনে হল, তাদের আচরণে স্বাভাবিক ও ভব্যতাবহির্ভূত কিছু ছিল না। সবই চমৎকার। সে সন্ধ্যাটার জন্য আমার স্ত্রী ও আমি দুজনই খুব খুসি।"

চব্বিশ

"দুদিন পরেই খোলা মনে ও বহাল তবিয়তে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামে চলে গেলাম।"

"গ্রামে গেলে তো কাজের অন্ত থাকে না ; তার নিজস্ব জীবনযাত্রা নিয়ে সে এক আলাদা জগৎ। প্রথম দু'দিনই একটানা দশ ঘণ্টা ধরে সম্মেলনে যোগ দিলাম। তার পরদিন ওরা আমার স্ত্রীর একটা চিঠি এনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম। চিঠিতে ছেলেমেয়েদের কথা, তার কাকার কথা, দাসীর কথা, কি কি জিনিস কিনেছে সে সব কথা লেখার পর যেন একটা তুচ্ছ কথা লিখছে এই ভাবেই হঠাৎ জানিয়েছে যে, ক্রুখাচেভ্স্কি যে স্বরগুলি তাকে দেবে বলে কথা দিয়েছিল সেগুলি নিয়ে একদিন এসেছিল, আর সেগুলি বাজাতেও চেয়েছিল, কিন্তু সে রাজী হয় নি। সে আমার স্ত্রীকে কোন স্বরলিপি দিতে চেয়েছিল বলে তো আমার মনে পড়ল না। আমার ধারণা হয়েছিল সে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, কাজেই এ খবরে আমি বিস্মিত ও দুঃখিত বোধ করলাম। কিন্তু আমি তখন এত ব্যস্ত ছিলাম যে সে কথা নিয়ে আর ভাববার সময় পেলাম না। সন্ধ্যায় আমার ঘরে ফিরে চিঠিটা আবার পড়লাম। তখন আমার মনে হল, আমার অনুপস্থিতিতে ক্রুখাচেভ্স্কির বাড়িতে আসার অপ্রীতিকর সংবাদ ছাড়াও চিঠিটার পুরো সুরটাই যেন কেমন বেখাপ্পা। ঈর্ষার উন্মাদ জন্তুটা তার গুহার মধ্যে গর্জে উঠল, ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি জোর করে তাকে আটকে রাখলাম ; তার পশু-শক্তিকে আমি ভয় পেলাম। মনে মনে বললাম, 'ঈর্ষা কী নীচ মনোবৃত্তি ! সে আমাকে যা যা লিখেছে তার চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারত !'

"বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং পরদিনের কাজকর্মের কথা ভাবতে লাগলাম। সাধারণত অপরিচিত বিছানায় ঘুমুতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু সে রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠলাম। মনের মধ্যে তখন আমার স্ত্রীর চিন্তা, তার প্রতি আমার কামনার চিন্তা, আর ক্রুখাচেভ্স্কির চিন্তা ; নিশ্চিত মনে হল, আমার

স্ত্রীর কাছে সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। ক্রোধে, ত্রাসে আমি তখন কঠিন হয়ে গেছি। কিন্তু তখনই নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, 'এ সবই বাজে চিন্তা। এ রকম ভাববার কোন কারণই নেই; তাদের তুজনের মধ্যে কখনও কিছু ছিল না, আজও নেই। এ রকম ভয়ংকর কিছু অনুমান করে কেন তুমি তাকে ও নিজেকে ছোট করছ? একজন স্বল্পখ্যাত ভাড়াটে বেহালাদার, আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, একটি পরিবারের মা, তোমার নিজের স্ত্রী। কী অসঙ্গতি!' এই হল একদিককার যুক্তি, কিন্তু অন্য যুক্তিও ছিল: 'ও ছাড়া আর কি থাকতে পারে? যার জন্য আমি তাকে বিয়ে করেছি, যার জন্য আমি তার সঙ্গে বাস করি, সেই সহজ, সাধারণ জিনিস ছাড়া আর কি থাকতে পারে? তার কাছে আমি ঐ একটি জিনিসই চাই, আর ঐ বাজনাদারসহ অন্য সব পুরুষই তার কাছে ঐ একটি জিনিসই চায়। সে অবিবাহিত, তার স্বাস্থ্য ভাল (মনে পড়ল, চপের একটা হাড় সে কি ভাবে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল, আর কি ভাবে তার লাল ঠোঁট দিয়ে লোভীর মত এক গ্লাস মদ চুমুক দিয়ে শেষ করেছিল)— চিকণ, সুঠাম, যখন যে সুবিধা পাওয়া যাবে তার সুযোগ গ্রহণ করাই তার জীবনের একমাত্র নীতি। আর সে ও আমার স্ত্রী সেই সঙ্গীতের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে কামনাকে বাড়িয়ে তুলবার পক্ষে যার মত সূক্ষ্ম উপায় আর কিছু নেই। তাকে সংযত করবার কি আছে? কিছুই নেই। উপরন্তু, সব কিছুই তাকে সেই দিকেই ঠেলে দিয়েছে। আমার স্ত্রী? সে কে? একটি রহস্য—চিরদিনই সে রহস্যময়ী। আমি তাকে চিনি না। তার পশু-প্রকৃতিটাকেই আমি চিনি। আর সংযম কাকে বলে তা তো একটা পশু জানে না—তার জানবার কথাও নয়।

"তখনই আমার মনে পড়ে গেল আর একটি সন্ধ্যায় তাদের মুখের সেই দৃষ্টির কথা: সেদিন ক্রয়ত্জার সোনাতা-র পরে আর একটি আবেগ-ভরা ছোট সুর তারা বাজিয়েছিল; সেটা কার সুর আমি ভুলে গেছি; তবে সে সুরে ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনার তীব্র উত্তেজনা। সেই দৃষ্টি মনে পড়তে আমি বলে উঠলাম, 'তার পরেও আমি দূরে চলে এলাম কেমন করে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে তাদের মধ্যে যা ঘটবার তা সেই সন্ধ্যায়ই ঘটেছিল? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, সেদিন সন্ধ্যায় কোন প্রাচীর তাদের আলাদা করে রাখে নি, তারা তুজনই, বিশেষ করে আমার স্ত্রী, তাদের মধ্যে যা ঘটেছে তার জন্য লজ্জাবোধ করেছিল?' মনে পড়ল, আমাকে দেখে কী অস্পষ্ট, করুণ, মধুর হাসি সে হেসেছিল, আর আমি যখন পিয়ানোর কাছে গেলাম তখন কীভাবে তার ঘর্মাক্ত, রাঙা মুখটা সে মুছেছিল। তখনও তারা কেউ কারও চোখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে নি; শুধু রাতে খাবার সময় যখন সে আমার স্ত্রীর জন্য এক গ্লাস সোডার জল ঢেলে দিয়েছিল তখনই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা মৃদু মৃদু হেসেছিল। সে দৃষ্টি, সেই চকিত হাসির কথা মনে হতেই আমি আঁতকে উঠলাম। একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে,' আবার অন্য

কণ্ঠস্বর বলল ভিন্ন কথা। সে বলল, 'তোমাকে কিসে যেন পেয়েছে। যা সত্য হতে পারে না তাই নিয়ে ভেবে তুমি মরছ।' অন্ধকারে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। দেশলাই জ্বালালাম। হলদে দেয়াল-কাগজে মোড়া ছোট ঘরটার মধ্যে আমার ভয় করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। সমাধানের অতীত কোন সমস্যা যখন আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে তখনই আমি এ কাজ করে থাকি। সমস্যাটা যে সমাধানের অতীত সেই বোধটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য আমি একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলাম।

'সে রাতে আর ঘুম হল না। পাঁচটার সময় স্থির করলাম, এ চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না; কাজেই অবিলম্বে বাড়ি ফিরে যাব। উঠে পড়লাম। যে লোকটি আমার কাজে নিযুক্ত ছিল তাকে জাগিয়ে তুলে ঘোড়া আনতে বললাম। একটা চিরকুট লিখে সহকর্মীদের জানিয়ে দিলাম, অপ্রত্যাশিতভাবে একটা জরুরী কাজের জন্য মস্কো থেকে ডাক এসেছে; কাজেই তারা যেন আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করেন।

"আটটার সময় একটা চার-চাকার গাড়িতে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।"

পঁচিশ

কণ্ডাক্টর এল। আমাদের মোমবাতিটা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখে সেটা নিভিয়ে দিল, কিন্তু নতুন কোন মোমবাতি সেখানে বসাল না। বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। পজ্‌দ্‌নিশেভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিন্তু কণ্ডাক্টর যতক্ষণ গাড়িতে ছিল ততক্ষণ কোন কথাই বলল না। সে চলে গেল; ছায়াচ্ছন্ন কামরাটার মধ্যে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে জানালার খট-খট শব্দ আর দোকান-কর্মচারিটির নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তখন সে আবার গল্প বলতে শুরু করল। ভোরের আবছা আলোয় আমি তাকে মোটেই দেখতে পাচ্ছিলাম না; শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম তার কণ্ঠস্বর—তার মধ্যে উত্তেজনা ও যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল।

"আমাকে পঁয়ত্রিশ ভার্স্ট ঘোড়ায় এবং আট ঘণ্টা ট্রেনে চেপে যেতে হয়েছিল। গাড়িতে চেপে যেতে বেশ ভালই লাগছিল। কুয়াসা-ঢাকা হেমন্তের সকালে সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে, ভিজে রাস্তার উপর চাকার দাগ আঁকা পড়ছে—সে সকাল যে কেমন তা তো আপনি জানেন। রাস্তা ভাল, উজ্জ্বল আলো, বাতাসে উত্তেজনা। একা একা গাড়ি চেপে যেতে অপূর্ব লাগছিল। সকাল হতেই পথ চলতে চলতে আমি যেন অনেক ভাল বোধ করতে লাগলাম। ঘোড়া, মাঠঘাট, লোকজন—এ সব দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম কোথায় চলেছি। এ সময় মনে হল, বুঝি বেড়াতেই বেড়িয়েছি, আর যে জন্য এই পথযাত্রা সেটা নেহাৎই কাল্পনিক। ভুলে যেতেই যেন বিশেষ করে ভাল

লাগছিল। যখনই মনে পড়েছে কোথায় চলেছি তখনই নিজেকে বলেছি, 'কিছু ভেব না, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।' যাত্রার মাঝপথে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে বিলম্ব ঘটে গেল আর আমার মনোযোগও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল: আমার গাড়িটা ভেঙে গেল; সেটাকে মেরামত করতে হবে। এই আকস্মিক ঘটনার ফল হল মারাত্মক; আমি এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরতে পারলাম না; পরের ট্রেনে চাপতে হল; আর তার ফলে পূর্ব ব্যবস্থা মত পাঁচটার বদলে মস্কো পৌঁছলাম রাত বারোটায়।

"গাড়িতে চাপা, মেরামত করা, হিসাবপত্র করা, পথের পাশের একটা সরাইখানায় খাওয়া-দাওয়া, একটা কুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলা—এ সব নিয়েই মশ্‌গুল ছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ সব ঠিক হয়ে গেলে আবার যাত্রা করলাম। দিনের আলোর চাইতেও গোধূলির আলোতে পথ চলতে আরও মনোরম লাগছিল। আকাশে নতুন চাঁদ, সামান্য বরফ পড়ছে, চমৎকার রাস্তা, ভাল ঘোড়া, আমুদে কোচয়ান—এ সব নিয়ে খুসিতে মনটা এতই ভরে উঠেছিল যে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে সে কথা ভাবতেই ভুলে গিয়েছিলাম; অথবা এও হতে পারে যে আমি জানতাম আমার কপালে কি আছে, আর তাই জীবনের আনন্দকে শেষ বারের মত ভোগ করবার জন্যই মনটাকে খুসিতে ভরে তুলেছিলাম।

"কিন্তু এই আত্ম-তুষ্টি, মনের ভাবকে চেপে রাখবার এই ক্ষমতা ঘোড়ার গাড়ির যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। রেলগাড়িতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা হল। যতদিন বেঁচে থাকব রেলপথের সেই আট ঘণ্টার যন্ত্রণার কথা ততদিন মনে থাকবে। রেলগাড়িতে ঢুকেই যেন মনে হল—প্রায় বাড়িতে এসে গেছি, হয়তো সেটাই এর কারণ; অথবা এও হতে পারে যে রেল-ভ্রমণ স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। কারণ যাই হোক, ট্রেনে উঠে বসবার পর মুহূর্ত থেকেই নিজের কল্পনাকে আর বশে রাখতে পারলাম না; কল্পনায় একটার পর একটা ছবি ফুটে ওঠে আর আমার ঈর্ষাও বাড়তে থাকে; প্রতিটি নতুন ছবি আগের ছবির চাইতে অশ্লীল; আর সব ছবিতেই আমার অনুপস্থিতিতে সে কি করছে, কি ভাবে আমাকে প্রতারিত করছে সেই একই দৃশ্য ফুটে উঠছে। ক্রোধে ও ক্ষোভে আমি জ্বলতে লাগলাম; এই সব দৃশ্যের চিন্তা আমার মনকে পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে তুলল। সে সব দৃশ্যকে তাড়াতে পারলাম না, আমার চোখও সরিয়ে নিতে পারলাম না, সেগুলোকে মুছে ফেলতেও পারলাম না। সেই সব কাল্পনিক ছবির কথা যত ভাবতে লাগলাম, ততই তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস বাড়তে লাগল। ছবিগুলি এতই স্পষ্ট হয়ে মনের সামনে ভাসতে লাগল যে সেই স্পষ্টতাই তাদের বাস্তবতার প্রমাণ বলে মনে হতে লাগল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দানব যেন ভয়ংকর সব গল্প বানিয়ে আমার কানে কানে বলতে লাগল। অনেক বছর

আগে ক্রখাচেভ্‌স্কির ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তাও মনে পড়ে গেল। সেই আলোচনার বিষয়বস্তুকে এই বাজনাদার ও আমার স্ত্রীর উপর আরোপ করে সেই স্মৃতির কষাঘাতে আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তুললাম।

"অনেক বছর আগেকার ঘটনা, কিন্তু তখনও আমার পরিষ্কার মনে ছিল। ক্রখাচেভ্‌স্কি পতিতালয়ে যায় কি না আমার এই প্রশ্নের জবাবে তার ভাই বলেছিল, সব সময়ই যখন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সে হাতের কাছে পায় তখন কোন ভদ্রলোক কি এমন জায়গায় যেতে চায় যেখানে রোগ-সংক্রমণ ঘটতে পারে, এবং যে সব জায়গা সাধারণতই জঘন্য ও নোংরা। আর কী আশ্চর্য! সেই ভাই আমার স্ত্রীকে পেয়েছে। 'একথা সত্যি যে আমার স্ত্রী এখন আর সে রকম তাজা নেই, বাঁদিকে একটা দাঁত পড়ে গেছে, একটু মোটাও হয়েছে। কিন্তু তা আর কি করা যাবে; যা পাওয়া যাবে তাই তো নিতে হবে।' মনে মনেই বলতে লাগলাম। 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে তার রক্ষিতা বানিয়ে লোকটা তাকে করুণাই করছে। কিন্তু, তার কাছ থেকে সংক্রমণের ভয়টা তো নেই।' 'আরে, এ সব কি বলছ? এ যে অচিন্ত্যনীয়!' সভয়ে নিজেকে বললাম। 'না, না, এরকম কিছু ঘটে নি। এ কথা ভাববার মত তিলমাত্র কারণ তোমার নেই। সে কি নিজেই তোমাকে বলে নি যে এ রকম একটা লোকের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হওয়া তোমাকে সাজে না? হ্যাঁ, তা বলেছে; কিন্তু সে তখন মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে।' মনে মনেই চীৎকার করে উঠলাম।

পজ্‌দ্‌নিশেভ লাফিয়ে উঠে দু'এক পাক ঘুরে আবার এসে বসল।

"রেল গাড়িতে চড়তে আমি ভয় পাই, ভয়ংকর ভয় পাই; রেল গাড়ি দেখলেই আমার ভয় করে। হ্যাঁ, সত্যি ভয় করে", সে বলতে লাগল। "মনে মনে বললাম, 'আমি অন্য কথা ভাবব—যেমন যে সরাইখানায় খেয়ে এলাম তার কথা।' অমনি মনের মধ্যে দেখতে পেলাম সে দাড়িওয়ালা বুড়ো কুলিটাকে আর তার ছোট নাতিটাকে; আমার ভাসিয়ার বয়সী ছেলেটি। 'আমার ভাসিয়া! একদিন হয় তো সে দেখে ফেলবে, বাজনাদারটা তার মাকে চুমো খাচ্ছে। তখন ছেলেটা কত কষ্ট পাবে। কিন্তু তার মার তো কিছুই হবে না। সে তো প্রেমে পড়েছে!...' আবার সেই একই চিন্তা। 'না, না, স্থানীয় হাসপাতাল পর্যবেক্ষণে যাবার কথা ভাবব। গতকাল রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। ডাক্তারের গোঁফজোড়া ছিল ক্রখাচেভ্‌স্কির মত। কী আস্পর্ধা তার—আমার স্ত্রীরও—যে আমাকে ঠকাবার জন্য বলে দিল, সে চলে যাচ্ছে!' আবার সেই একই চিন্তা ঘুরে ফিরে এল। যা কিছু ভাবি শেষ পর্যন্ত তার কথাই এসে পড়ে। ভয়ংকর কষ্ট হতে লাগল। আমার অজ্ঞতা, আমার সন্দেহ, আমার অস্থিরমতি, বুঝতে পারছি না তাকে ভালবাসব না ঘৃণা করব—এ সবই আমার কষ্টের কারণ। যন্ত্রণা এতই বেড়ে গেল যে

মনে পড়ছে এক সময় একথাও ভেবেছিলাম যে, কামরা থেকে নেমে গিয়ে রেল পথের উপর শুয়ে পড়ে সব শেষ করে দেব। তখন অন্তত এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার কষ্ট থেকে বাঁচতে পারব। কিন্তু নিজের প্রতি করুণা আর স্ত্রীর প্রতি তীব্র ঘৃণাই আমাকে সে পথ থেকে সরিয়ে আনল। লোকটির প্রতি ঘৃণার সঙ্গে মিশে ছিল নিজের হেরে যাওয়া আর তার জিতে যাওয়ার চেতনা। কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি ছিল শুধুই ঘৃণা, তীব্র ঘৃণা। 'আত্মহত্যা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না; তাকেও কষ্ট পেতে হবে; তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কী কষ্ট আমি পেয়েছি', নিজের মনেই বললাম। এই সব চিন্তা এড়াবার জন্ম প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেন থেকে নামতে লাগলাম। একটি স্টেশনের রেস্তোরাঁতে দেখলাম কিছু লোক মদ খাচ্ছে; আমিও ভদ্কার অর্ডার দিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ইহুদিও পান করছিল। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল, আর আমিও কামরায় একা থাকার বদলে তার সঙ্গে তার তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা ধোঁয়াটে কামরায় গিয়ে উঠলাম। কামরার মেঝেভর্তি সূর্য-মুখী ফলের খোসা ছড়ানো। তার পাশে গিয়ে বসলাম, আর সেও অনর্গল নানা কথা বলতে লাগল। তার কথা কানে গেলেও আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কারণ নিজের চিন্তায়ই আমি ডুবে ছিলাম। সেটা লক্ষ্য করে সে আরও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে বলল। উঠে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম। মনে মনে বললাম, 'এ চিন্তার শেষ করতে হবে। যা ভাবছি সেটা ঠিক কিনা, আমার কষ্টের সত্যি কোন কারণ আছে কিনা—এ সবই আমাকে জানতে হবে।' শান্তভাবে সব কথা ভাবতে বসলাম, কিন্তু ভালভাবে চিন্তা করার বদলে আবার সেই একই দশা হল। সুস্থ চিন্তার বদলে—শুধু ছবি আর কল্পনা। মনে মনে বললাম, 'অতীতে আরও কতবার তো এমন কষ্ট আমি পেয়েছি! কিন্তু প্রত্যেকবারই তো দেখেছি সব বাজে। হয়তো এবারও দেখব—নিশ্চয় দেখব—সে শান্তিতে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে; জেগে উঠে আমাকে দেখে কত খুসি হবে, তার কথা শুনে আর চাউনি দেখে বুঝতে পারব যে কিছুই হয় নি, এ সবই উদ্ভট কল্পনা। আঃ, কী আনন্দই না হবে!' 'না; অনেকবারই এ রকম হয়েছে বটে, কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্য রকম হবে, অপর কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল; আবার সেই একই চিন্তা শুরু হল। হ্যাঁ, সেই তো আমার শাস্তি। কোন যুবকের কাম-বাসনাকে দূর করতে তাকে আমি সিফিলিস-রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাব না, আমার অন্তরাত্মাকে শুধু তাদের সামনে মেলে ধরব, তাহলেই তারা দেখতে পাবে দানবরা কী ভাবে আমার আত্মাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। সব চাইতে দুঃখের কথা হল, তার দেহের উপর সন্দেহাতীত পরিপূর্ণ মালিকানা আমি দাবী করতাম, যেন সেটা আমারই দেহ; আবার সেই সঙ্গে এটাও বুঝতাম যে তার দেহটা আমার নয়, সে যে ভাবে খুসি তার দেহটাকে চালাতে পারে এবং সে এমন ভাবেই সেটাকে

চালাতে চায় যেটা আমার অভিপ্রেত নয়। আর সেখানে তাদের দুজনের কারোকেই আমার কিছু করবার নেই। 'গানের প্রহরী ভাংকার মত ফাঁসির মঞ্চে যেতে যেতেও সে লোকটিও আমার স্ত্রীর চুম্বনের গানই গাইতে থাকবে। মৃত্যুতেও সে আমাকে এক হাত নেবে। আমার স্ত্রী যদি এ পাপ এখনও না করে থাকে। এটা করতে তো চেয়েছে, আমি জানি তা সে চেয়েছে, আর সেটাই তো আরও খারাপ; সে যদি এ পাপ কাজ করত, আর আমি সেটা জানতাম, যদি আমার মনে কোন সন্দেহ না থাকত, সেও তো ছিল ভাল। আমি যা চাই তা বলতেও পারতাম না। আমি তো চাই—যা না চেয়ে তার উপায় নেই তা যেন সে না চায়। সমস্ত ব্যাপারটাই তো চূড়ান্ত পাগলামি।"

ছাব্বিশ

"পরের স্টেশনে কণ্ডাক্টর যখন টিকিট নিতে এল তখন আমি থলেটা তুলে নিয়ে কামবার প্ল্যাটফর্মে চলে গেলাম; প্রায় পৌঁছে গেছি, যবনিকা পতনের সময় হয়েছে, এই চিন্তায়ই আমার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। শীত করতে লাগল; এমন কাঁপতে লাগলাম যে দাঁতে-দাঁতে শব্দ হতে লাগল। যন্ত্রের মত যাত্রীদের অনুসরণ করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। চলতে চলতেই দেখলাম, রাস্তায় লোকজন চলছে, কুলিরা চলাফেরা করছে, রাস্তার বাতিগুলো আমার সামনে-পিছনে ছায়া ফেলছে। আমার মাথায় কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। আধ ভার্স্ট যাবার পরে পায়ে ঠাণ্ডা লাগাতে মনে পড়ল ট্রেনের মধ্যে মোজা খুলে থলেতে ভরে রেখেছিলাম। থলেটা কোথায়? এখানে? আমার ঝুড়িটা গেল কোথায়? মনে পড়ল, আমার মালপত্রের কথা ভুলেই গিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে মালের রসিদটা পেলাম; তাই ফিরে না গিয়ে এগিয়েই চললাম।

"যতই চেষ্টা করি, তখনকার অবস্থাটা কিছুতেই মনে করতে পারি না। তখন কি ভাবছিলাম? কি চেয়েছিলাম? একটা ভয়ংকর কিছু, প্রচণ্ড গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই আশংকা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না। সেই প্রচণ্ড গুরুতর কিছু যে ঘটল সেটা আমার ইচ্ছায় ঘটল কি আশংকার জন্য ঘটল তা জানি না। অথবা হয় তো তখন আমার মনটা ফাঁকাই ছিল, আর সেই গুরু-গম্ভীর চিন্তাগুলি আমার পরবর্তীকালের কল্পনামাত্র।

'ফটকে পৌঁছে গেলাম। প্রায় একটা বাজে। বাড়ির সামনে কয়েকটা ছ্যাকরা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; জানালায় আলো দেখে বোঝা গেল গাড়িতে যাত্রী এসেছে (আলোকিত জানালাগুলি আমাদের ফ্ল্যাটের—বসবার ঘর ও অভ্যর্থনা ঘরের জানালা)। এত রাতে আমাদের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে কেন সে চিন্তা না করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজালাম; তখনও সেই

প্রচণ্ড ঘটনার আশংকাটা মনের মধ্যে রয়েছে। পরিচারক ইয়েগর পরিশ্রমী, বোকা-সোকা লোক ; সে দরজা খুলে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল, বারান্দায় অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে তার কোটটাও ঝোলানো রয়েছে। আমার বিস্মিত হবারই কথা, কিন্তু হলাম না ; যেন এটা আশা করছিলাম। নিজের মনে বললাম, 'তাহলে আমিই ঠিক।' ইয়েগর-এর কাছে যখন জানতে চাইলাম ভিতরে কে আছে, সে বলল ক্রুখাচেভ্স্কি। জানতে চাইলাম, আর কেউ আছে কি না।

'কেউ নেই স্যার', সে জবাব দিল।

'কেউ নেই, আঃ।' নিজের মনেই আমি বলেছিলাম।

'আর ছেলেমেয়েরা ?'

'ঈশ্বরের কৃপায় তারা ভাল আছে। অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়েছে।'

"আমার দম আটকে আসতে লাগল ; ঠোঁটের কাঁপুনি কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না। 'তাহলে এবারের ব্যাপারটা অন্য রকম! অন্য সময় দুর্ভাগ্যের আশংকা করেছি, কিন্তু পাই নি ; শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেছে। এবারে সব ঠিক নেই। দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছে। এই তো সে···'

"আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম ; একটা দানব যেন আমার কানে কানে বলল, 'সেকি, তুমি শুধু কাঁদবে, আর আবেগে ভাসবে, আর ওদিকে তারা চুপচাপ সরে যাবে, তাদের অপরাধের কোন প্রমাণই থাকবে না ? তুমি কি চিরকাল শুধু সন্দেহ করবে আর যন্ত্রণা পাবে ? সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্ম-প্রীতি মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল নতুন অনুভূতি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার সে নতুন অনুভূতি ছিল আনন্দের ; শেষ পর্যন্ত আমার সব দুঃখের অবসান হতে চলেছে, এবার তাকে শাস্তি দিতে পারব, তার হাত থেকে মুক্তি পাব, আমার ক্রোধকে প্রকাশ করতে পারব—এই আনন্দ। আমি তখন পশুতে পরিণত হয়েছি—একটা হিংস্র, ধূর্ত পশু।

"পরিচারকটি বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছিল ; তাকে বললাম, 'দাঁড়াও। এই রসিদটা নিয়ে যাও, স্টেশন থেকে আমার মালপত্রগুলো নিয়ে এস। দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

"কোট আনতে সে তার ঘরে গেল। সে তাদের জানিয়ে দিতে পারে এই আশংকায় আমিও তার সঙ্গে গেলাম। তার কোট পরা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলাম। বসবার ঘরের ও-পাশেই অভ্যর্থনা-ঘর ; সেদিক থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ও কাঁটা-চামচের ঠুং-ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। তারা খাচ্ছে, তাই দরজার ঘণ্টা শুনতে পায় নি। ভাবলাম, 'তারা এখন বেরিয়ে না এলেই হয়।' অস্ত্রাখান-কলার-আঁটা কোটটা গায়ে চড়িয়ে ইয়েগর বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে তালা লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি একা, এবার কাজের সময় উপস্থিত ; একটা ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসল। কি কাজ করব ভেবে দেখি নি। শুধু বুঝেছি, সব শেষ হয়ে গেছে, তার নির্দোষিতার আর কোন

প্রশ্নই থাকতে পারে না, তাকে শাস্তি দেবার সময় এসেছে, সময় এসেছে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দেবার।

"এর আগে আমি কেবলই ইতস্তত করেছি, মনকে বুঝিয়েছি, 'হয়তো এ সত্য নয়, হয়তো আমারই ভুল।' কিন্তু এখন আর সে মনোভাব নেই। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আমার অনুপস্থিতিতে সেই লোকটার সঙ্গে একা! এতো সব বিচার-বিবেচনাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া। হয়তো তার চাইতেও শোচনীয়; নির্দোষিতার প্রমাণ হিসাবেই হয়তো ইচ্ছা করে এই দুঃসাহসিকতা, এই বেপরোয়াভাবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সবই পরিষ্কার। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু একটিমাত্র ভয়: এখনও তারা পালিয়ে যেতে পারে, সব প্রমাণ মুছে ফেলে শাস্তি দেবার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবার কোন নতুন কৌশলের কথা ভাবতে পারে। আর তাই তাড়াতাড়ি তাদের ধরে ফেলবার জন্য পা টিপে টিপে অভ্যর্থনা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে গেলাম হল ও নার্সারির ভিতর দিয়ে।

"ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে। ধাই-র শরীরটা নড়ে উঠল, বুঝি জেগে উঠবে। সব কিছু জানাজানি হয়ে গেলে সে কি ভাববে, সে কথা কল্পনা করে নিজের প্রতি এতখানি করুণা হল যে আমি চোখের জল রুখতে পারলাম না। পাছে ছেলেমেয়েরা জেগে ওঠে এই ভয়ে পা টিপে টিপে হল পেরিয়ে পড়ার ঘরে চলে গেলাম। সোফায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগলাম।

"আমি একটি সৎ লোক, বাপ-মায়ের সন্তান; সারা জীবন একটি সুখী পরিবারের স্বপ্ন দেখেছি; স্বামী হিসাবে কখনও স্ত্রীকে প্রতারণা করি নি; আর সে পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও একটা বাজনাদারের সঙ্গে প্রেম করছে। কারণ তার ঠোঁট দুখানি রাঙা! সে তো মানুষ নয়, একটা কুক্কুরী, ঘৃণিত কুক্কুরী! পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা—তার নিজের ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে; চিরদিন সে তাদের ভালবাসার ভাণ করেছে। আর আমাকে লিখেছে ঐ চিঠি! নির্লজ্জের মত লোকটার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে! কিন্তু আমি আর কতটুকু জানি? হয়তো আগাগোড়াই তাই করেছে। হয়তো পরিচারকদের সন্তানকে পেটে ধরে তাদের আমার সন্তান বলে চালিয়েছে। যদি আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরতাম, তাহলেই তো পরিপাটি করে চুল বেঁধে, কোমর দুলিয়ে, সুন্দর শরীরটা নাচিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াত, আর 'আর ঈর্ষার পশুটা আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আমাকে কুরে কুরে খেত।' ধাই কি ভাববে? ইয়েগর কি মনে করবে? আর ছোট্ট লিজা! সে তো কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে। কী নির্লজ্জ ব্যাপার! কী মিথ্যাচার! এ পশুর কামনা তো আমি চিনি।'

"উঠতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বুকের ভিতরে এমন ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল যে দাঁড়াতে পারছিলাম না। বুঝি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। সেই আমাকে মেরে ফেলবে। ঠিক তাই তো সে চায়। আমি

কি তাকে খুন করব ? না, না, তাহলে তো সোজা হয়ে গেল। এত সহজে তাকে ছেড়ে দেব না। কিন্তু আমি তো এখানে বসে আছি, আর তারা খাচ্ছে হাসছে, আর —হ্যাঁ, তাকে কাছে টেনে নিতে লোকটার কোন সংকোচ নেই, যদিও এখন সে ততটা তাজা নেই, তবু সে তো মনোরমা বটেই ; তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা মূল্যবান স্বাস্থ্যকে সে নষ্ট হতে দেয় নি। আগের সপ্তাহে তার সঙ্গে একটা ঝগড়া হলে তাকে আমি পড়ার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, জিনিসপত্র তছনছ করেছিলাম। সে কথা মনে হতেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'তখনই কেন তাকে খুন করি নি ?' তখনকার মনের অবস্থাটা স্পষ্ট মনে পড়ল ; এখনও সব কিছু ভেঙে তছনছ করবার সেই একই ইচ্ছা মনে জাগল। মনে পড়ে, কাজের কী প্রচণ্ড প্রেরণা তখন অনুভব করেছিলাম—কাজ ছাড়া আর সব কিছু মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমার অবস্থা তখন সেই জন্তু বা মানুষের মত যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিপদের আশংকায় সজাগ হয়ে উঠেছে ; এ রকম অবস্থায় সে কাজ করে সঠিকভাবে ধীরেসুস্থে, একটি মিনিট নষ্ট না করে, সব কিছুকে একটিমাত্র লক্ষ্যের অধীনে এনে।"

সাতাশ

"প্রথমেই পায়ের জুতো খুলে মোজা পায়ে সোফার ঠিক উপরে দেয়ালে ঝোলানো অস্ত্রগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং একটা ফুট-কাটা ছোরা নামিয়ে আনলাম ; ছোরাটা খুব ধারালো, আর আগে কখনও ব্যবহার করা হয় নি। খাপ থেকে ছোরাটা টেনে বার করলাম। খাপটা সোফার পিছনে পড়ে গেল। তখন কোটটা খুলে ফেলে সোজা পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম।

"হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়েই হঠাৎ দরজাটা সপাটে খুলে ফেললাম। তাদের মুখের ভাবটা এখনও মনে আছে। মনে থাকার কারণ তাদের মুখ দেখে আমি একটা সানন্দনির্যাতনের যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম। সে মুখে লেখা ছিল আতংক। আমিও ঠিক তাই চেয়েছিলাম। আমাকে দেখার প্রথম মুহূর্তে তাদের দুজনের মুখে যে ত্রাস ও হতাশা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে। মনে হল, লোকটি তখন টেবিলে বসে ছিল ; আমাকে দেখেই বা শব্দ শুনেই সে লাফ দিয়ে উঠে বুক-কেসটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে ত্রাসের নিঃসন্দেহ প্রকাশ ; আমার স্ত্রীর মুখেও ত্রাসই ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সে ত্রাসের সঙ্গে আরও কিছু মিশে ছিল। যদি শুধু ত্রাস হত, তাহলে হয়তো যা ঘটেছিল তা ঘটত না। আমার স্ত্রীর মুখে আরও ছিল। অন্তত সেই মুহূর্তে আমার তাই মনে হয়েছিল। একটা হতাশার ভাব, তাদের ভালবাসার খেলায় ও তাদের সুখের ব্যাঘাত ঘটায় একটা বিরক্তির ভাব। কিন্তু তাদের দুজনেরই মুখের সেই ভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী।

সেই মুহূর্তের সুখটুকু ছাড়া সে বুঝি আর কিছুই চায় না। মুহূর্তের মধ্যেই লোকটির দৃষ্টিতে ত্রাসের বদলে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা: 'এই মানুষটির কাছে মিথ্যা বলা সম্ভব কি না? সম্ভব হলে আমাকে এখনই শুরু করতে হবে। সম্ভব না হলে একটা কিছু ঘটবেই। কিন্তু সেটা কি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে আমার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর চোখে হতাশা ও বিরক্তির বদলে ফুটে উঠল লোকটির জন্য গভীর উৎকণ্ঠা।

"ছোরাটাকে পিছনে রেখে এক মুহূর্ত দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক তখনই সে হেসে উঠল, এবং প্রায় কৌতুকের সুরে বলে ফেলল:

'আমরা একটুখানি গান-বাজনা করছিলাম…'

"তার সুরের নকল করে আমার স্ত্রীও বলল, 'এটা খুবই অপ্রত্যাশিত…'

"তাদের কাউকেই কথা শেষ করবার সুযোগ দেওয়া হল না। গত সপ্তাহের মতই একটা প্রচণ্ড ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসল। আবার সেই সব কিছু ভেঙে তছনছ করবার ইচ্ছা। একটা বদ্ধ উন্মত্ততা আমাকে গ্রাস করল; সেই উন্মত্ততার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।"

"কথা শেষ করবার সুযোগ তারা কেউই পেল না। লোকটি যে ঘটনার আশংকা করছিল তাই ঘটল, সে ঘটনা তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের কথাকে স্তব্ধ করে দিল। স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম; তার বুকের ঠিক নীচে বাঁদিকটায় ছোরাটা আমূল বসিয়ে দেবার কাজে পাছে লোকটা বাধা দেয় তাই ছোরাটা তখনও লুকিয়েই রেখেছিলাম। প্রথম থেকেই আঘাত করবার ওই স্থানটা আমি বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা আমার উদ্দেশ্য ধরতে পেরে আমার হাতটা চেপে ধরল। এটা যে সে করতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি।"

'ভেবে দেখুন, আপনি কি করছেন! বাঁচান।' লোকটি চেঁচিয়ে উঠল।

"হাতটা টেনে নিয়ে তার দিকে রুখে দাঁড়ালাম। চোখাচোখি হল। তার সারা মুখ, এমন কি ঠোঁট দুটো পর্যন্ত, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে; তার চোখে একটা অদ্ভুত আভা ফুটে উঠেছে; বড় পিয়ানোটার আড়ালে লুকিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। সে যে এ রকম একটা কাজ করবে তাও আমি ভাবি নি। হয়তো তার পিছু নিতাম, কিন্তু কে যেন আমার বাঁ হাতটা ধরে ফেলল। আমার স্ত্রী। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। সে আরও চেপে ধরল; আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। এই অপ্রত্যাশিত বাধা, হাতের উপর তার চাপ, তার বিরক্তিকর স্পর্শ—সবই আমার ক্রোধে ইন্ধন যোগাল। আমি বুঝি পাগল হয়ে গেলাম; বুঝলাম, আমাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে, আর সেটা বুঝতে পেরে ভালই লাগল। সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম, আর ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমার কনুইয়ের আঘাত লাগল তার মুখে। চীৎকার করে সে আমার হাত ছেড়ে দিল। তখন লোকটাকে তাড়া করতে

চাইলাম, কিন্তু তখনই মনে হল, সোজা পায়ে স্ত্রীর প্রেমিকের পিছনে ধাওয়া করাটা একান্তই অস্বাভাবিক। আমি অস্বাভাবিক হতে চাই না। হতে চাই ভয়ংকর। তখন আমাকে পাগলামিতে পেয়েছে; তবু তাদের উপর আমার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমি সব সময়ই সচেতন ছিলাম, আর সেই প্রতিক্রিয়াই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।"

"তার দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। সোফায় বসে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে; যে চোখটায় আমি আঘাত দিয়েছি সে চোখটাকে এক হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে আমার প্রতি ভয় ও ঘৃণা; আমি তার শত্রু। ফাঁদের মুখ তুলে দিলে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের যে অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা তার। অন্তত আমি তো তার মুখে ভয় ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেখি নি। আর একজনের প্রতি ভালবাসাই তার মনে আমার প্রতি এই ভয় ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু সে যদি তখনও চুপ করে থাকত, তাহলে হয়তো আমি নিজেকে সংযত করতাম, হয়তো যা করেছিলাম তা করতাম না। কিন্তু হঠাৎ সে কথা বলতে বলতে আমার হাতটা চেপে ধরল।"

"ভেবে দেখ তুমি কি করছ! এ সব কি? তোমাকে কি সে পেয়েছে? আমাদের কিছুই হয় নি, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না! আমি শপথ করে বলছি!"

"তখনও হয়তো ইতস্তত করতাম, কিন্তু এই কথাগুলি আমার কাছে ঠিক বিপরীত অর্থ নিয়ে হাজির হল: তাদের দুজনের মধ্যে সত্যি কিছু আছে; আর তাই তার একটা মনের মত জবাবও আমাকে দিতেই হবে। আমার মনের অবস্থাটাও তখন একেবারে তুঙ্গে উঠে গেছে। উন্মত্ততারও তো একটা নিজস্ব নিয়ম আছে।"

"মিথ্যা কথা বল না, নোংরা মেয়েমানুষ!" চীৎকার করে বাঁ হাতে তাকে চেপে ধরলাম। সে ফসকে গেল। ছোরাটা ফেলে না দিয়ে বাঁ হাতেই তার গলাটা চেপে ধরলাম; চিৎ করে ফেলে দিয়ে টুঁটি চেপে ধরলাম। তার গলাটা কী শক্ত! গলাটা ছাড়াবার জন্য সে আমার হাতটা চেপে ধরল। সেই সুযোগের জন্যই যেন আমি অপেক্ষা করেছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি এক করে তার বাঁদিকের পাঁজরার নীচে ছোরাটা বসিয়ে দিলাম।

"লোকে বলে যে রাগের মাথায় তারা কি করে তা বুঝতে পারে না, সেটা বাজে কথা, মিথ্যা কথা। আমি তো সব বুঝতে পারছিলাম, একমুহূর্তের জন্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। মনের মধ্যে রাগ যত জমতে লাগল, বুদ্ধির দীপ্তিও ততই বাড়তে লাগল; আমি যা করলাম তার কোনটাই বুঝতে আমার অসুবিধা হবার কথা নয়। সময়ের প্রতিটি ভগ্নাংশে আমি কি করেছি তা বুঝতে পারছিলাম। পরমুহূর্তে কি করব সেটা আগে থেকেই জানতে পেরে-ছিলাম তা বলছি না। কিন্তু ঠিক কাজ করার মুহূর্তে আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম; হয় তো বা সামান্য আগেই বুঝতে পারছিলাম। আমি জানতাম

যে পাঁজরের নীচেই আঘাত করছি, আর ছোরাটা ঠিক সেখানেই ঢুকে যাবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম আমি যা করছি তা ভয়ংকর, তেমন কাজ আগে কখনও করি নি, আর তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। কিন্তু সে বোধ মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠত বিদ্যুৎ চমকের মত; বোধটা হত কাজটি শেষ হবার ঠিক পরমুহূর্তে। অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সমস্ত কাজটাকে অনুভব করতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে, জামায় বা ঐ রকম কিছুতে মুহূর্তের জন্য বাধা পড়েছিল, আর তারপরেই ফলাটা নরম কিছুর মধ্যে ঢুকে গেল। দুই হাত দিয়ে সে ছোরাটা চেপে ধরল, তার হাত কেটে গেল, কিন্তু ছোরাটা থামল না। পরবর্তীকালে জেলে থাকতে মনের নৈতিক পরিবর্তন ঘটবার পরে এই মুহূর্তটার কথা অনেক ভেবেছি; বার বার মনে করেছি আর তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। মনে পড়ে, কাজটা করবার এক সেকেণ্ড, একটি সংক্ষিপ্ত সেকেণ্ডের জন্য আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যে আমি একটি নারীকে খুন করছি, খুন তাকে আগেই করেছি, একটি অসহায় নারী, আমার স্ত্রী। সেই উপলব্ধির ভীষণতা আজও মনে পড়ে; অস্পষ্টভাবে আরও মনে পড়ে যে সেই উপলব্ধির জন্যই ছোরাটা ঢুকিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলেছিলাম, হয়তো যা করে ফেলেছি তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। এক সেকেণ্ডের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম কি ঘটে; সবিস্ময়ে ভাবছিলাম যা ঘটে গেছে তার অন্যথা হতে পারে কিনা। আমার স্ত্রী লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলল:

'আয়া! ও আমাকে খুন করে ফেলেছে!'

"সেই শব্দে জেগে উঠে আয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম; যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ওর জামার নীচ দিয়ে তখন গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। একমাত্র তখনই বুঝতে পারলাম যে যা করে ফেলেছি তাকে আর ফেরানো যাবে না; সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, এ কাজকে ফেরানো উচিতও নয়; এই তো আমি চেয়েছিলাম. এটাই তো ঘটা উচিত। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। এবার সে লুটিয়ে পড়ল; আয়া তার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'হা ঈশ্বর!' তখনই ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তার দিকে বা আমার দিকে ফিরেও তাকালাম না। নিজেকে বললাম, 'আমি উত্তেজিত হব না; কি করছি সেটা শান্তভাবে চিন্তা করব।' আয়া কাঁদতে কাঁদতে দাসীকে ডাকল। হল পেরিয়ে গিয়ে দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। আমি জানতাম আমাকে কি করতে হবে, তবু নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'এখন আমাকে কি করতে হবে?' পড়ার ঘরে ঢুকে সোজা দেয়ালের কাছে গেলাম, একটা রিভলবার নামিয়ে নিলাম, সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম—গুলি ভরাই ছিল—এবং সেটাকে লেখার ডেস্কের উপর রাখলাম। তারপর সোফার পিছন থেকে ছোরার খাপটা তুলে নিলাম।

"অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কোন চিন্তা নেই। কিছু মনেও পড়ছে না। পাশের ঘরের গোলমাল কানে আসছে। কে যেন গাড়িতে এসে বাড়িতে ঢুকল। আর একজন কে এল। আমার মালপত্র নিয়ে ইয়েগর ঘরে ঢুকল। যেন মালপত্রগুলোর এখন কোন দরকার আছে!

বললাম, "কি হয়েছে জান? দরোয়ানকে বল, পুলিশকে খবর দিতে।"

কোন কথা না বলে সে চলে গেল। আমি উঠলাম, দরজায় তালা দিলাম, সিগারেট ও দেশলাই বের করে ধূমপান করতে লাগলাম। একটা সিগারেট শেষ করবার আগেই ঘুম পেয়ে গেল। দুটি ঘণ্টা ঘুমলাম। মনে পড়ে, স্বপ্ন দেখেছিলাম তার আর আমার মধ্যে ভাব হয়েছে; ঝগড়া হয়েছিল, মিটে গেছে; মনকষাকষি হয়েছিল, কিন্তু আবার ভাব হয়েছে। দরজায় ঠক-ঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগেই মনে হল পুলিশ। আমি হয়তো ওকে খুন করে ফেলেছি। কিন্তু হয়তো আমার স্ত্রীই এসেছে, কিছুই হয় নি। দরজায় আবার শব্দ হল। জবাব দিলাম না; ব্যাপারটা সত্যি ঘটেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ ঘটেছে। তার জামায় আটকে যাবার পরে ছোরাটা যে ঢুকে গিয়েছিল সেটা মনে পড়ল। আমার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই ঘটেছে। এবার আমার পালা।' কিন্তু সে কথা বলবার সময়ও আমি জানতাম যে, আমি নিজেকে খুন করব না। উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা তুলে নিলাম। আর কী আশ্চর্য: সেই দিনই ট্রেনের মধ্যে যেমন হয়েছিল তেমনি আরও কতবার যে আমি আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছি সে সব মনে পড়ে গেল। তখন মনে হত ব্যাপারটা তো খুবই সহজ—এতে তার যে কত বড় শাস্তি হবে সেটা জানতাম বলেই সহজ। করা তো দূরের কথা, এমন কি আমি আত্মহত্যার কথা ভাবতেও পারি না। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "কেন করব?" কোন জবাব পেলাম না। দরজায় আবার টোকা পড়ল। "আগে দেখি কে শব্দ করছে। এটা তো পরেও করা যাবে।" রিভলবারটা রেখে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলাম। দরজার কাছে গিয়ে হুড়কোটা নামিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রীর বোন, একটি বোকা, দয়াবতী বিধবা।

"ভাসিয়া! এ সব কী ব্যাপার?" বলতে বলতেই তার চোখের জল ঝরতে লাগল।

কড়া গলায় বললাম, "তুমি কি চাও?" বুঝলাম এ রকম কঠোর হওয়া যেমন বোকামি তেমনি অপ্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।

"ভাসিয়া! ও যে মরতে বসেছে! আইভান ফিওদরোভিচ তাই বললেন।" আইভান ফিওদরোভিচ ডাক্তার, আমার স্ত্রীর ডাক্তার, তার পরামর্শদাতা।

"তাহলে তিনিও হাজির হয়েছেন।" আমি বললাম। আবার আমার রাগ চড়ে গেল। "বেশ তো, তাতে কি হয়েছে?"

"ভাসিয়া, ওর কাছে যাও! ইস্! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!" সে বিলাপ করতে লাগল।

নিজে নিজেই বললাম, "তার কাছে যাব?" জবাবও দিলাম, যাবই তো, অবশ্য যাব; যেতেই তো হবে; আমার মতই কেউ যখন তার স্ত্রীকে খুন করে তখন তো তাকে স্ত্রীর কাছে যেতেই হয়। 'তাই যদি হয়ে থাকে, আমাকেও যেতে হবে। অপর কাজটি যদি করতেই হয়, তার জন্য তো প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।" নিজেকে গুলি করার কথা মনে রেখেই এ-কথা ভাবলাম। সেখানে অনেক কথা হবে, মুখভঙ্গী হবে, কিন্তু সে সব আমাকে স্পর্শ করবে না।" নিজে নিজেই বললাম।

"দাঁড়াও," শ্যালিকাকে বললাম। "মোজা পায়ে গেলে বড়ই বোকা-বোকা দেখাবে। অন্তত চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নি।"

আঠাশ

"শুনতে আশ্চয মনে হলেও ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য সব পরিচিত ঘর-দরজার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে আশা জাগল যে হয়তো কিছুই হয় নি। কিন্তু আয়োডোফর্ম ও কার্বলিক এসিড-এর তীব্র গন্ধ নাকে আসতেই একটা ধাক্কা খেলাম। হ্যাঁ, ঘটেছে। ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় লিজাকে দেখতে পেলাম। ভয়ার্ত চোখে সে আমার দিকে তাকাল। আমি যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম। সেখান থেকে পাঁচটি ছেলেমেয়েই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা খুলে দিয়ে দাসী বেরিয়ে গেল। প্রথমেই চোখে পড়ল মুক্তো-সাদা পোষাকটা রক্ত-মাখা অবস্থায় চেয়ারের উপর পড়ে আছে। হাঁটু তুলে আমাদের জোড়াখাটে সে শুয়ে আছে; আমার দিকটাতেই শুয়েছে, কারণ তার দিকটা দেয়াল ঘেঁসে। একগাদা বালিশের স্তূপের উপর উঁচু হয়ে সে শুয়ে আছে, পরনের জ্যাকেটটা বাঁধা হয়নি। ক্ষতের উপরে কি যেন চাপা দেওয়া রয়েছে। বাতাসে আয়োডোফর্মের তীব্র গন্ধ। ওর গালটা ছড়ে গিয়ে ফুলে উঠেছে, নাক ও চোখের অবস্থাও তাই— আমাকে বাধা দিতে গিয়ে আমার কনুইর ধাক্কা লেগেই এ রকম হয়েছে। কোথায় গেল তার রূপ। বরং আমার কাছে তো বিরক্তিকরই মনে হল।

আয়া বলল, "যান, ওঁর কাছে যান।"

ভাবলাম, "হয় তো ও ক্ষমা চাইবে। আমি কি ক্ষমা করব? হ্যাঁ, ও মরতে চলেছে। কাজেই ক্ষমা করতে পারি।" আমি উদার হতে চাইলাম। সোজা তার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনেক কষ্টে সে চোখ মেলল। একটা চোখ ফুলে উঠেছে। অনেক কষ্টে থেমে থেমে বলল:

'তুমি যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছ……আমাকে খুন করেছ।' আর

সেই শারীরিক যন্ত্রণা, সেই মৃত্যুর চেতনার মধ্যেও চিরদিনের সেই তীব্র জান্তব ঘৃণা ঝলক দিয়ে উঠল : 'না···ছেলেমেয়েদের·· তোমাকে দেব না···তাদের নিয়ে যাবে···ও (তার বোনকে দেখাল।'

"আমি যেটাকে আসল জিনিস ভেবেছিলাম—তার দোষ, তার প্রতারণা—সেটাকে উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করল না।"

'আশা করি তোমার এই কীর্তি দেখে তোমার ভালই লাগছে,' এই কথা বলে দরজার দিকে তাকিয়েই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দরজার কাছে তার বোন ও ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। 'দেখ, তুমি কি করেছ।'

"ছেলেমেয়েদের দেখলাম; তারপর আবার তার ছড়ে-যাওয়া ফুলে-ওঠা মুখের দিকে তাকালাম; বুঝি এই প্রথম নিজেকে ভুলে গেলাম; ভুলে গেলাম আমার অধিকার, আমার অহংকার; এই প্রথম তাকে দেখলাম একটি মানুষ হিসাবে। আর আমার সব ঈর্ষা, সব আহত অহংকারকে এতই তুচ্ছ মনে হতে লাগল, আর যা করে ফেলেছি সেটাকে এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল যে, তার পাশে নতজানু হয়ে বসে তার হাতের উপর মুখ রেখে বুঝি বা বলতে চেয়েছিলাম, 'আমাকে ক্ষমা কর!' কিন্তু বলতে পারলাম না।"

"সে চুপ করে রইল; চোখ বুজল; আর একটি কথা বলারও শক্তি তার ছিল না। তারপর তার বিকৃত মুখটা কাঁপতে লাগল, সংকুচিত হয়ে উঠল। ধীরে সে আমাকে সরিয়ে দিল।"

'এ কাজ কেন করলে? কেন?'

'আমাকে ক্ষমা কর,' আমি বললাম।

'তোমাকে ক্ষমা করব? বাজে কথা। শুধু যদি না মরি!' সে চেঁচিয়ে বলল; নিজেকে একটু তুলে বিকারের রোগীর মত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছ! আমি তোমাকে ঘৃণা করি! ওঃ! ওঃ!' যেন বিকারের ঘোরে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমাকে মেরে ফেল! মেরে ফেল! আমি ভয় পাই না! কিন্তু সবাইকে, সবাইকে! ওকেও! ও যে চলে গেল! চলে গেল!'

'সে বিকার আর কাটল না। কাউকে চিনতে পারত না। সেদিন দুপুরেই সে মারা গেল। তার অনেক আগেই বেলা আটটা নাগাদ আমাকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেল, আর সেখান থেকে জেলে। সেখানে এগারোটি মাস আমাকে বিচারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হল। সেই সময় নিজের কথা, আমার অতীতের কথা ভেবে ভেবে সব কিছু বুঝতে পারলাম। তৃতীয় দিনেই আমি বুঝতে শুরু করলাম। তৃতীয় দিনে তারা আমাকে আবার সেখানে নিয়ে গেল···"

সে আরও কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কান্না চেপে রাখতে না পেরে থেমে গেল। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে আবার শুরু করল:

"তাকে শবাধারে শায়িত দেখার পরেই সব বুঝতে শুরু করলাম। "দম বন্ধ করে সে দ্রুত বলতে লাগল। "তার মৃত্যুশীতল মুখখানি দেখেই বুঝলাম আমি কি করেছি। বুঝলাম, আমি—আমিই তাকে খুন করেছি; একদিন সে ছিল জীবন্ত, উষ্ণ, সচল, আর আমার জন্যই আজ সে নিশ্চল, শীতল, মোমের মত; আর কখনও এর অন্যথা হবে না—কখনও, কোথাও, কেউ এর অন্যথা করতে পারবে না। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যে গেছে একমাত্র সেই এটা বুঝতে পারবে। ওঃ, ওঃ, ওঃ!" বার কয়েক আর্তনাদ করে সে চুপ করল।

অনেকক্ষণ আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। চাপা কান্নার আবেগে তার শরীরটা কাঁপতে লাগল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন···"

পাশ ফিরে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। সকাল আটটার সময় আমরা গন্তব্য স্টেশনে পৌছে গেলাম। বিদায় নেবার জন্য তার কাছে এগিয়ে গেলাম। সে ঘুমিয়ে আছে, কি ঘুমের ভাণ করে আছে বুঝতে পারলাম না। তবে একটু নড়াচড়া ছিল না। তার হাতটা স্পর্শ করলাম। সে কম্বলটা সরিয়ে রাখল; দেখলাম সে ঘুমোয় নি।

হাত বাড়িয়ে বললাম, 'বিদায়।'

ম্লান হাসি হেসে সেও হাতটা বাড়িয়ে দিল। সে হাসিটি এতই করুণ যে আমার চোখে জল এসে গেল।

যে কথাগুলি দিয়ে তার গল্পটা শেষ করেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করে সে বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন।"

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

লাল ও কালো
Scarlet And Black
স্তাঁদাল

প্রথম খণ্ড

১ : একটি ছোট্ট শহর

হাজারটাকে রাখ একসাথে
মন্দটাকে বাদে,
পিঞ্জরে আনন্দ কমে না কো তাতে।
—হবস্

ছোট্ট শহর ভেরিয়ার···সারা ফ্রাঞ্চ-কমেতের অন্যতম সুন্দর শহর। ছুঁচলো ছাদওয়ালা লাল টালি-ছাওয়া সাদা সাদা বাড়ীগুলো পাহাড়ের ধার বরাবর সাজানো। প্রতিটি বাঁকে বাদাম-গাছগুলোর ঝোপ একগুঁয়ের মতন আকাশমুখী। উপত্যকার বুকে প্রবাহিত দৌব নদী, আরও শ' খানেক ফুট নীচে শতাব্দী আগে স্পেনীয়দের বানানো দুর্গ, এখন ওটা পরিত্যক্ত, ধ্বংসোন্মুখ। শহরের অনেক উঁচুতে উত্তর দিকে প্রহরীর মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুরা পর্বতের শাখা ভেরা পাহাড়ের শিখরগুলো···অক্টোবর মাস পড়ার সাথে সাথে শিখরে শিখরে বরফ জমতে থাকে।

বেগবতী এক জলধারা পর্বতের সানুদেশ থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দৌবের বুকে। ওখানেই গড়ে উঠেছে অনেকগুলো কর্মব্যস্ত করাত কারখানা। এই শিল্প এ অঞ্চলে কেবল প্রয়োজনীয় তাই নয়, এ শিল্প এ অঞ্চলের মানুষগুলোকেও কাজ দিয়েছে···ফলে বেশ স্বস্তিদায়ক রোজগার-পাতি করার সুযোগ লাভ করে সরল গ্রামবাসীদের চেয়ে নাগরিকদের মতন ভিন্নধরনের জীবন-ধারণের স্বাদ তারা পেয়েছে। শহরের লোকদের সম্পদ্ অবশ্য করাত কারখানা-গুলো থেকে উপার্জিত হয় না, উপার্জিত হয় স্থূলহাউস নামে খ্যাত একধরনের ছাপা কাপড় থেকে। সেই নেপোলিয়নের পতনের সময় থেকে এই উন্নতির উৎস সুরু হয়েছে এবং তারই জন্যে ভেরিয়ার শহরের লোকজনেরা তাদের প্রতিটি বাড়ীর সামনেকার অংশ নতুন করে বানিয়ে নিতে পেরেছে।

ভেরিয়ার শহরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই ভয়ঙ্কর আর সাংঘাতিক কলের আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবে। জলস্রোতে চালিত একখানা চাকার সাথে কুড়িটা বিশাল হাতুড়ি আটকানো চাকার ঘূর্ণনের সাথে সাথে হাতুড়িগুলো পড়ে

আর ওঠে। হুড়িগুলো কাঁপতে থাকে…একটানা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোহার পেরেক তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে—রোজ এই ধরনের পেরেক তৈরী হয়। ফরাসী দেশ ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা-ভেদকারী এই পার্বত্যভূমির বুকে কোনও ভ্রমণকারী এলে দারুণ বিস্মিত হবে দেখে যে, ছোট ছোট লোহার টুকরোগুলোর উপর এই সব বিশাল হাতুড়িগুলো দিয়ে কঠিন কাজ করছে সুন্দরী, তাজা মন এবং গোলাপের মতন রাঙা গাল যুবতীরা।

যদি শহরে-আগত কোনও বিদেশী হাই স্ট্রীটের এই বিশাল, কানে-তালা-ধরানো কারখানার মালিক কে জানতে চায়, তাহলে কেউ না কেউ নিশ্চিত এই জেলার ভাষায় টেনে টেনে বলবে—'কেন! কারখানার মালিক মহামান্য মেয়র!' ওই যে রাস্তাটা দৌবের ধার থেকে পর্বতের চড়াইয়ে উঠে গেছে ওটা বরাবর কিছুক্ষণ হাঁটলেই এক দীর্ঘকায় পুরুষের উপর কারো না কারো নজর পড়বেই, তিনি রাশভারি এক ব্যক্তিত্ব…মনে হবে ব্যবসার কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছেন।

তিনি হাঁটেন আর সবাই দ্রুত মাথার টুপি খুলে তাঁকে অভিবাদন জানায়। তাঁর মাথার চুলে পাক ধরেছে, পোশাক ধূসর, পরনের কোটের ভাঁজের উপর কারুকার্য করা। চওড়া কপাল, ঈগলের ঠোঁটের মতন বাঁকা নাক এবং সারা দেহ সুন্দর সুঠাম। এমন একটা বিশেষ ভঙ্গিমা তাঁর মুখে যা' না কি ছোটখাট অফিসারের মুখেই কেবল নজরে পড়ে…তবু এসব সত্ত্বেও তাঁর মুখের একটা আকর্ষণ আছে যা' সাধারণত আটচল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরুষের মুখে বিরল।

তবু সেই একই কথা, বিশালতর বিশ্বের প্যারীর মতন শহরের আগন্তুকরা এখানে প্রথম নজরেই দেখবেন এবং তাঁদের মনে বিতৃষ্ণা উদ্রেক করবে এই পুরুষটির আত্মম্ভরি ভাব, সীমিত একাকীত্ব এবং কর্মপ্রেরণার অভাব এবং পরিণামে বুঝতে পারবেন যে, এধরনের পুরুষের কর্মপ্রেরণা কেন্দ্রীভূত হয়েছে অপরের কাছে তাঁর পাওনা আদায় করানোর আর অপরের কাছে তাঁর দেনা আগামী দিনের জন্য মুলতবি রাখার কাজকে ঘিরে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভেরিয়ার শহরের মেয়র এ ধরনেরই একজন পুরুষ… তিনি ধীর এবং মর্যাদাসম্পন্নভাবে রাস্তা বরাবর হেঁটে গিয়ে পুরসভার অট্টালিকায় প্রবেশ করেন। দর্শক যদি আরও কিছুদূর হেঁটে যান তাহলে রাস্তার চড়াইয়ে আরও গজ পঞ্চাশ দূরে একখানা সুন্দর বাড়ী দেখতে পাবেন এবং লোহার রেলিঙের ধারে পৌঁছলে ভিতরে আকর্ষণীয় এক সুবিশাল উদ্যানের দৃশ্য চোখে পড়বে। উদ্যান পেরিয়ে দূরে দিগন্ত-রেখায় বুরগানডিয়ান পাহাড়-শ্রেণীর রেখা যেন দৃষ্টিকে প্রীত করার জন্যই প্রলম্বিত। দৃষ্টি-সীমার এই বিশাল ব্যাপ্তি দর্শক-মনকে ভুলিয়ে দেবে যে, অর্থ উপার্জনের স্বার্থ এখানকার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছে এবং নিজের মধ্যে সে একসময় ক্রম-বর্ধমান কঠিনতা অনুভব করবে।

এই সুন্দর বাড়ীখানার নির্মাণকার্য প্রায়-সমাপ্ত…পাথর কাটার দাগ এখনও

স্পষ্ট। দর্শককে বলা হয়ে থাকে যে, এ বাড়ীর মালিক মঁসিয়ে দ্য রেনলের পেরেক তৈরীর ব্যবসার মুনাফা থেকে এ বাড়ী তৈরী হয়েছে। জনরব যে, তাঁর পরিবার স্পেনীয় বংশোদ্ভূত…চতুর্দশ লুই এ অঞ্চল জয় করার বহু আগে থেকেই এই প্রাচীন বংশ-ধারা ফ্রাঁস-কমেৎ অঞ্চলে বসবাস করতে সুরু করেছিল।

যে বছর ভেরিয়ার শহরের মেয়র নির্বাচিত হন সেই আঠার শ' পনের সালে ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ার জন্যে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই মনোরম উদ্যানের সীমানা-প্রাচীর স্তরে স্তরে দৌব নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত…এবং বাড়ীর মতনই স্তরে স্তরে বেষ্ঠিত এই উদ্যান লোহার ব্যবসায়ে তাঁর উন্নতির পুরস্কার।

ফরাসী দেশের কোনও শিল্পনগরে এধরনের উদ্যান-শোভিত অট্টালিকার দৃশ্য আশা করা যায় না। যেমনটা নুরেমবার্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লিপজিগ এবং জার্মানীর অন্যান্য শিল্প শহরের শহরতলিতে দেখা যায়। ফ্রাঞ্চ-কমেতে যে লোক পাথরের পর পাথর গাঁথার জন্য সম্পদ উজাড় করে যত বড় প্রাচীর বানায় প্রতিবেশীরা তাকে তত বেশী শ্রদ্ধা করে।

মঁসিয়ে দ্য রেনলের এই বিশাল প্রাচীরবেষ্ঠিত উদ্যানের প্রশংসা করে লোকে কারণ উদ্যানের জমিখানা কেনা হয়েছে প্রায় সম-পরিমাণ ওজনের সোনা দিয়ে। ওই যেখানটায় চতুর্থ-স্তরের প্রাচীরটা এখন বানানো হচ্ছে ওখানটায় আগে ছিল একটা করাত কারখানা। নতুন কারখানাটা এখন আরও পাঁচ শ' গজ উৎরাইয়ে দৌবের তীরে একটা পরিষ্কার জায়গায় তৈরী করা হয়েছে…এমন জায়গায় ওটা যে, শহরে ঢোকার মুখেই লোকের নজরে পড়ে। কারখানার মালিকের নামটাও নজরে না পড়ে থাকবে না—ছাদ থেকে ঝোলান কাঠের তক্তার বড় বড় অক্ষরে লেখা নামটা—সোরেল।

আত্মমর্যাদা থাকা সত্বেও মেয়রকে বার বার ওই অবাধ্য চাষী সোরেলের কাছে যেতে হয়েছে; অন্য জায়গায় কারখানাটা সরিয়ে নিয়ে যেতে স্বীকৃত হওয়ার জন্যে সোরেলকে তিনি লুই আমলের মোটা অঙ্কের সোনার মুদ্রা দিয়েছেন। যে জল-ধারা কারখানা চালায় তার মালিকানা এই শহরের, কিন্তু মঁসিয়ে রেনল প্যারী শহরে তাঁর প্রভাবশালী বন্ধুদের ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন কেননা তাদের সাহায্যে তিনি নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং এই অনুগ্রহ পেয়েছেন নির্বাচনের পর।

এক একর জমির জন্যে মেয়র সোরেলকে দিয়েছেন চার একর জমি। দৌব নদীর তীরের দিকে পাঁচশ' গজ উৎরাইয়ে কারখানার এই নতুন জমি করাত কারখানার ব্যবসাদারদের কাছে অনেক বেশী সুবিধাজনক কিন্তু সোরেল ধনী হওয়ার পর বুদ্ধিতে খুব ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে, তাই বাড়তি জমির জন্য উদগ্রভাবে লালায়িত প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিনিময় জমি ছাঁড়াও ছ' হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্য আদায় করে নিয়েছে।

এটা ঠিক, এই হস্তান্তর জেলার জমির চড়া মূল্যমান প্রকাশ করছে। তারপর বছর চারেক আগে এক রবিবার সকালে মেয়রের পোশাক পরিহিত মঁসিয়ে দ্য রেনল গীর্জা থেকে ফেরবার পথে দূরে ছেলেদের সাথে সোরেলকে দেখতে পেলেন এবং ওর দিকে তাকাতেই দেখলেন যে সে প্রতিবেশীকে দেখে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের এই তিক্ত হাসির ব্যাখ্যা মেয়রের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে বুঝলেন যে, হস্তান্তরে আরও মুনাফা তিনি করতে পারতেন।

ভেরিয়ার শহরের জনচিত্তের শ্রদ্ধা লাভের জন্য প্রাচীর তৈরীর কাজে জুরা পাহাড়ের পথে প্যারী অভিমুখী ইতালীর পাথর-মিস্ত্রিদের নক্সা না গ্রহণ করারই রীতি প্রচলিত। চিরকাল প্রাচীর নির্মাণকারকদের এই নতুন প্রথা গ্রহণের প্রবণতা স্বীকৃত প্রথা-বিরোধী কিন্তু বিজ্ঞ এবং মিতব্যয়ী লোকদের চোখে প্রশংসা পাওয়ার আশা একেবারেই নির্মূল অথচ এরাই ফ্রাঞ্চ-কমেতের মানুষের প্রাপ্য খ্যাতির নির্ধারক।

সত্যি কথা বলতে কি, সেই একই যোগ্য লোকেরা এখানে তাদের বিরক্তি-জনক ও স্বেচ্ছাচারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। এবং সেই জন্যই যারা বিশাল গণতান্ত্রিক জনগণের শহর নামে খ্যাত প্যারীতে বাস করছেন তাঁদের কাছে এই শহরের জীবনধারা অসমর্থনীয়। জনমতের অত্যাচার…এবং কি ধরনের মত! …ফরাসী দেশের এই প্রত্যন্ত অংশে বিরাজ করছে এমন মত যার প্রতিটি বিন্দু মার্কিন কোন ছোট্ট শহরের অনুন্নত অঞ্চলের মতনই বোকামি-সর্বস্ব।

২ : একজন মেয়র

> **খ্যাতি! কেন মশাই, ওটা কি কিছু না?**
> **এমন বস্তু বোকারা যার প্রশংসা করে,**
> **ছেলেমেয়েরা যা' দেখে অবাক হয়, ধনীরা**
> **হিংসে করে আর নিন্দে করে পণ্ডিতরা।**
>
> **—বারনেভ**

ভাগ্যক্রমে শাসক হিসাবে মঁসিয়ে দ্য রেনলের খ্যাতির জন্য এধরনের বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত ব্যায়ামাগার, যা' দোব নদী থেকে শ' খানেক ফুট উচে পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত, তার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এবং এখান থেকেই ফরাসী-দেশের সবচেয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রতি বছর বসন্তে গড়িয়ে-যাওয়া বৃষ্টির জলে পথের অবস্থা হয় লাঙল দেওয়া ক্ষেতের মতন এবং গভীর খাদ সৃষ্টি হয়। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল একদম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা, যা' প্রত্যেককেই ভোগ করতে হচ্ছিল তার হাত থেকে রক্ষার সুখকর প্রয়োজনে ও এক শাশ্বত সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছায় মঁসিয়ে দ্য রেনল কুড়ি ফুট উঁচু এবং দু'শ ফুট লম্বা এক প্রাচীর বানিয়ে দিলেন।

এই প্রাচীরের আলসে তৈরীর জন্যই মঁসিয়ে দ্য রেনল বার তিনেক প্যারী

শহরে ঘুরে এলেন—স্বরাষ্ট্র সচিব ব্যায়ামাগারের উন্নতির জন্য কোনরকম পরিকল্পনাই ভয়ানকভাবে বাধা দিচ্ছিলেন···কিন্তু এখন এই আলসে মাটি থেকে চার ফুট উঁচু করে বানানো হয়েছে। মাথায় বসানো হয়েছে গ্রানিট পাথরের খণ্ড···যেন অতীত ও বর্তমান সব মন্ত্রির হুমকির বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে নির্মিত হয়েছে।

এই আনন্দদায়ক ধূসর রঙ, আকাশ-মুখী এবং বুক-উঁচু প্রাচীরের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি কতদিন প্যারী শহরের নাচ-ঘর আর উৎসবের কথা চিন্তা করেছি ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি দৌব উপত্যকার দিকে। পশ্চিম-দিকের ঢালে আরও পাঁচ-ছ'টা উপত্যকা পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত···এবং প্রত্যেক উপত্যকায় অসংখ্য ছোট ছোট জলধারা ঝরণা থেকে ঝরণায় মিশে অবশেষে নদীতে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে রোদের তাপ খুব প্রচণ্ড···কিন্তু মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে মালভূমির মতন উঁচু জায়গার গাছ-গাছড়া পথিকের মাথা এবং স্বপ্ন রক্ষা করতে পারে।

মেয়রের হুকুমে রক্ষাকারী প্রাচীরের ভিতরে প্রচুর মাটি ফেলে যে গাছগুলো লাগান হয়েছিল সেগুলো খুব দ্রুত বর্ধিত ও পত্রবহুল হয়েছে এবং শহর সমিতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মঁসিয়ে দ্য রেনল তাঁর ব্যায়ামাগারকে ছ'ফুট বেশী প্রসারিত করেছেন। (যদিও তিনি কট্টর দক্ষিণপন্থী আর উদারনীতিক আমি···তা সত্ত্বেও এর জন্য আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এর জন্যই তাঁর বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে, কেননা ভেরিয়ার শহরের অনাথ-আশ্রমের সফল কর্ম-পরিচালক মঁসিয়ে ভালেনদ বলেন যে, সেন্ট জারমেইন এন-লে'র বিখ্যাত টেরেসের সাথে এটা তুলনীয়।)

আমি অবশ্য 'কোরস্ দ্য লা ফিদেলিতে'র নির্মাণ কাজের মধ্যে একটা গলদ দেখতে পাচ্ছি···মেয়র প্রাচীরের পনের বিশ জায়গায় নাম লেখা কাষ্ঠ-খণ্ড লাগিয়েছেন এবং এর জন্য তাঁকে বাড়তি সাজানোর প্রয়োজন হয়েছে···তবে একটা দোষ দেখছি যে, স্থানীয় কর্তারা এখানে নিষ্ঠুরভাবে গাছগুলোকে কেটেছেন না হয় ছেঁটেছেন। ওই মহান লেখাগুলো দৃশ্যমান করে তোলার জন্যে তাঁরা আর কিছু ভাবতে পারেন নি, ইংলণ্ডে অবশ্য তরকারির ক্ষেতের মতন এই গাছগুলোকে দেখবার জন্য ছোট এবং গোল-মাথা করা হয়। কিন্তু এই অত্যাচারী মেয়রের ইচ্ছার ত প্রতিবাদ করা যায় না, তাই কমিউনের সম্পত্তি এই গাছগুলো বছরে দু'বার নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলা হয়। স্থানীয় উদারনীতিকরা জোর দিয়ে বলেন, অবশ্য এসব তাদের অতিরঞ্জিত কথা যে, যখন মঁসিয়ে মাসলন এই কাটা এবং ছাঁটা ডালপালা থেকে মুনাফা লুটছেন তখন থেকেই শহর-সমিতির মালিরা আরও বেশী বেশী গাছগুলোকে কাটছে এবং ছাঁটছে। কয়েক বছর আগে বেসানকন শহর থেকে এই ছোকরা কেরাণীকে পাঠান হয়েছিল ফাদার শেলান এবং জেলার অন্য পাদরিদের উপর নজর রাখার জন্যে।

সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত শল্য-চিকিৎসক, যিনি ইতালি অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি এলেন ভেরিয়ার শহরে বসবাস করতে। মেয়রের অভিমত যে, লোকটা জ্যাকোবিন মতবাদী এবং বোনাপার্টের অনুরাগী…এমনি-ভাবে মাঝে মাঝে গাছগুলোর অঙ্গচ্ছেদের জন্য সেই লোকটা একবার নিজেই মেয়রের কাছে অনুযোগ করার সাহস দেখিয়েছিল।

সরকারী সম্মানপ্রাপ্ত একজন শল্য-চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের আত্মম্ভরি দেখাবার জন্য মঁসিয়ে দ্য রেনল শান্ত গলায় বলেছিলেন—গাছের ছায়া আমি পছন্দ করি এবং গাছগুলোকে ছাঁটাচ্ছি ছায়ার জন্যই। ভাবতে পারি না এ ছাডা গাছের আর কি প্রয়োজন আছে এবং বিশেষভাবে এই গাছগুলো যখন আখরোট গাছের মতন অর্থ উপার্জনে সহায়ক নয়।

অর্থ উপার্জন…এটাই হচ্ছে ভেরিয়ার শহরের যাদুমন্ত্র যা' সব কিছুকে নির্ধারণ করে। শহরের তিনভাগ বাসিন্দার এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। এই যে ছোট্ট শহরটাকে তোমার সুন্দর মনে হচ্ছে এখানে অর্থ উপার্জন কথাটাই চরম কারণ। শান্ত, গভীর উপত্যকার মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশে ঘেরা এই ছোট্ট শহরে পদার্পণ করেই একজন বিদেশী কল্পনা করবে যে এখানকার অধিবাসীরা সৌন্দর্যরসিক। তারা বার বার শহরের সৌন্দর্য এবং পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে। কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে এর জন্য তারা উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছে…কিন্তু এর কারণ সৌন্দর্য দর্শকদের আকর্ষণ করে, তাদের অর্থে সরাইখানার মালিক ধনী হয় এবং তার বদলে তারা বিদেশী জিনিসপত্রের জন্য শুল্ক দেয়, শহরের কর বাড়ে।

শরৎকালের এক সুন্দর সকালে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে মঁসিয়ে দ্য রেনল এই রাস্তা বরাবর বেড়াচ্ছিলেন। গম্ভীর মুখ স্বামীর কথা শুনতে শুনতে তিনি (শ্রীমতী রেনল) উদ্বিগ্নভাবে তিনটি ছেলের ছুটোছুটি নিরীক্ষণ করছিলেন। প্রায় বছর এগারো বয়সের বড় ছেলেটা আলসের ধারে ছুটছিল ; মনে হল ও বোধ হয় আলসের মাথায় চড়তে চায়। প্রতিবার সে উঠতে চেষ্টা করছে আর অমনি একটি শান্ত কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে ডাকছে—এ্যাডলফি। এবং প্রতিবার ছেলেটি তার প্রচেষ্টার উচ্চাশা পরিত্যাগ করছে। মাদাম দ্য রেনলের বয়স তিরিশ হল কিন্তু এখনও তিনি যথেষ্ট সুন্দরী।

'প্যারী শহর থেকে এই সুন্দর ভদ্রলোক তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন। শাতো-তে আমিও বন্ধুহীন নই…।' মঁসিয়ে দ্য রেনল রাগতভাবে বললেন। তাঁর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

যদিও এই প্রাদেশিক বুলিতে আমি শ' দু'য়েক পৃষ্ঠা লিখবার প্রস্তাব করতে পারি কিন্তু কোন অমানবিক বিষয় নিয়ে এমন কাঁচা বুলিতে কিছু লিখবার কথা বলব না।

প্যারীর এই ভদ্রলোক, যাকে মেয়র এমন ঘৃণ্য ভাবছেন তিনি মঁসিয়ে এ্যাপার্ট ছাড়া আর কেউ নন। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে এসেছেন,

জেলখানা এবং অনাথ-আশ্রম পরিদর্শন করেছেন। জেলার বড় বড় জমিদার এবং মেয়রের স্বেচ্ছা পরিচালিত হাসপাতালও দেখেছেন।

মাদাম দ্য রেনল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'প্যারীর এই ভদ্রলোক তোমার কি ক্ষতি করবেন? তুমি যখন ন্যায়বান এবং তোমার কাছে গচ্ছিত দরিদ্র-ভাণ্ডারের অর্থও তুমি বিবেচনার সাথে খরচ করো।'

'উনি এখানে এসেছেন কারো ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে। এবং তারপর সব উদার মতাবলম্বী সংবাদপত্রে তিনি এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন।'

'কিন্তু তুমি ত ওসব কাগজ পড় না।'

'আমি না পড়লেও আরও অনেকে আছে যারা ওই সব বিপ্লবাত্মক কথা আমাকে এসে শোনাবে। এসব ব্যাপার বড় মেজাজ বিগড়ে দেয় এবং সৎ কাজ সম্পাদনে বাধা দেয়। যা'হোক আমার কথা হচ্ছে, এ ধরনের বদলোককে আমি কখনও ক্ষমা করব না।'

৩ : দরিদ্র সেবা

একজন সৎ অনভিপ্রেত ধর্মযাজক ঈশ্বরের প্রতিভূ।

—ক্লুরি

তোমাকে বলে রাখছি, ভেরিয়ার শহরের গীর্জার ধর্মযাজক একজন আশি বছরের বৃদ্ধ, কিন্তু পাহাড়ী আবহাওয়াকে ধন্যবাদ, তিনি এখনও আগের মতন সুস্থ ও সবল-মন রয়েছেন। শহরের জেলখানা, হাসপাতাল এমন কি অনাথ আশ্রমটা দিনে বা রাতে যে-কোন সময়ে পরিদর্শন করার অধিকার তাঁর আছে। এই কৌতূহল-ভরা ছোট্ট শহরে পৌছবার সময়টা মঁসিয়ে এ্যাপার্ট বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করেছিলেন। তিনি সকাল ছ'টার সময় ভেরিয়ার শহরে পৌছলেন এবং সোজা ওই বদলোকটার বাড়ী চলে গেলেন।

এই প্রদেশের সবসেরা ধনী জমিদার এবং রাজ্যসভার সভ্য মারকুইস্ দ্য লা সোলের তাঁর কাছে লেখা চিঠিখানা পড়তে পড়তে ফাদার শেলান চিন্তান্বিত হলেন।

অবশেষে দম নিয়ে যেন নিজের মনেই তিনি বললেন—'বুড়ো হয়েছি আর এখানকার লোকরাও আমাকে ভালবাসে···ওরা এটা সাহস করবে না।' তিনি তাঁর দর্শকের দিকে তাকালেন, তাঁর দু'চোখে ধর্মীয় জ্যোতির স্পর্শ, একটু বিপজ্জনক কাজ হলেও সুন্দর কাজ করার আনন্দের প্রকাশ-চিহ্ন।

তিনি বললেন—'আমার সঙ্গে চলুন মহাশয়। কিন্তু বারণ করে দিচ্ছি, যাই দেখুন জেলারের উপস্থিতিতে কোন মন্তব্য করবেন না এবং বিশেষ করে অনাথ আশ্রমের পরিচারকদের সামনে সাবধান হবেন।'

মঁসিয়ে এ্যাপার্ট বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন দয়ালু ও হৃদয়বান ব্যক্তির সাথে কাজ করছেন। তিনি বৃদ্ধ বদ লোকটির সঙ্গে গেলেন, পরিদর্শন করলেন

জেলখানা, হাসপাতাল এবং অনাথ-আশ্রম। অনেক প্রশ্ন করলেন। বহু কৌতূহলোদ্দীপক জবাব শুনেও কোন রকম অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধ মন্তব্য করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন।

এই পরিদর্শন চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে। ধর্মযাজক মঁসিয়ে এ্যাপার্টকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু মঁসিয়ে এ্যাপার্ট বললেন, তাঁকে অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে। তিনি তাঁর সাহসী সঙ্গীকে আর বিরক্ত করতে চান না। বেলা তিনটের কাছাকাছি সময়ে দু'জনে আবার অনাথ-আশ্রম দেখার কাজ সম্পূর্ণ করতে গেলেন এবং জেলখানায় ফিরলেন। ওখানে ঢোকবার মুখে দৈত্য-সদৃশ, ছ'ফুটের উপর লম্বা এবং ধনুক-পা জেলারের সাথে দেখা হল, লোকটার নীচু মুখে গোপন ভয়ের ছাপ।

ধর্মযাজককে দেখামাত্র সে বলে উঠল—'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যে ভদ্রলোককে দেখছি উনি কি মঁসিয়ে এ্যাপার্ট ?'

জবাব দিলেন ধর্মযাজক—'তাতে আপনার কি ?'

তখন জেলার ব্যাখ্যা করল—'শুনুন স্যার! গতকাল আমি কড়া হুকুম-নামা পেয়েছি। একজন পুলিশ সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে এই হুকুম-নামা এনেছে। বলা হয়েছে যে, মঁসিয়ে এ্যাপার্টকে আমি যেন জেলখানায় ঢুকতে না দিই।'

'মঁসিয়ে নইরুদ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার সঙ্গী এই ভ্রমণকারীর নাম মঁসিয়ে এ্যাপার্ট। এবং আপনি ত জানেন দিনে রাতে যে কোন সময়ে যে কোন লোককে সঙ্গে নিয়ে এই জেলখানা পরিদর্শনের অধিকার আমার আছে, জানেন না ?'

'জানি মাননীয় মহাশয়। কিন্তু আমার বউ আর ছেলেপিলে আছে, কেউ অভিযোগ করলে আমার চাকরি যাবে। আর এই চাকরিটা ছাড়া আমার আর কোনও অবলম্বন নেই।' বলল জেলার এবং বলবার সময় লাঠির ভয়ে অনিচ্ছায় হুকুম মানতে বাধ্য বুল ডগের মতন তার মাথাটা ঝুলে পড়ল।

বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর কণ্ঠে দয়ালু ধর্মযাজক বললেন—'আমার চাকরিটা গেলে আমিও দুঃখিত হব।'

জেলার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'কিন্তু কত তফাৎ! সম্মানীয় মহাশয়, সবাই জানে, আপনার ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ আটশ' টাকা বা আরও বেশী। আর রোদ-ঝরা উপত্যকায় আছে একখণ্ড জমি··· ।'

এটাই হচ্ছে ঘটনা। কূট মন্তব্যে এবং অতিরঞ্জিতভাবে বিশ জনে এই ঘটনার বর্ণনা করছে। এবং দু'দিন ধরে এ ছোট্ট শহরের প্রতিটি ঘৃণ্য পরিবেশ আলোড়িত হচ্ছে এটাই আলোচনা করে। মঁসিয়ে দ্য রেনল এখন তাঁর স্ত্রীর সাথে যে আলোচনা করছিলেন সেটার বিষয়ও এটাই।

পরদিন সকাল বেলায় অনাথ-আশ্রমের পরিচালক মঁসিয়ে ভালেনদকে সঙ্গে করে মঁসিয়ে দ্য রেনল হাজির হলেন ধর্মযাজকের বাড়ী তাঁর গভীর অসন্তোষ

জানাবার জন্য।

তাঁকে রক্ষা করার মতন কোনও পৃষ্ঠপোষক নেই ফাদার শেলনের। ওদের বক্তব্যের নির্গলিতার্থ বুঝতে পারলেন।

বললেন—'ভদ্রমহোদয়গণ, এ অঞ্চলের আশি বছর বয়সী তৃতীয় ধর্মযাজক যাঁকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখানে ছাপ্পান্ন বছর ধরে বাস করছি। গোটা শহরের তামাম অধিবাসীকে আমি খৃস্ট-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছি। এবং প্রায় প্রতিদিন আমি এমন যুবক-যুবতীর বিবাহ দিচ্ছি বহু বছর আগে যাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমার বিবাহ দিয়েছিলাম। সারা ভেরিয়ার শহর আমার পরিবার-ভুক্ত। কিন্তু এই বিদেশী ভদ্রলোকের সাথে দেখা হতেই মনে হয়েছে যে ভদ্রলোক একজন উদার-নীতিক···আর এখন ত এদেরই চারধারে ছড়াছড়ি। অথচ ইনি আমাদের দরিদ্র ও বন্দীদের কি-ই বা ক্ষতি করতে পারবেন?'

এ কথায় মেয়র ধমকালেন। অনাথ-আশ্রমের পরিচালকের ধমকানিও আরও প্রচণ্ড হল। অবশ্য বৃদ্ধ যাজক কম্পিতকণ্ঠে বললেন—'আচ্ছা, তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ, ইচ্ছে হলে আমাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কোথাও না গিয়ে আমি এ জেলাতেই থাকব। প্রত্যেকেই জানে, আমি একখণ্ড জমির উত্তরাধিকার পেয়েছি এবং ওই জমি থেকে আমার আটশ' টাকা আয় হয়। ওই আয়ে আমি জীবন ধারণ করতে পারব। কর্মজীবনে আমি অসদ উপায়ে মুনাফা করি নি।' তিনি কিছু যেন ইঙ্গিত করে বললেন—'এবং তাই কেউ আমার জীবিকা কেড়ে নেওয়ার কথা বললে ভয় পাই নে।'

মঁসিয়ে গু রেনলের সাথে তাঁর স্ত্রীর স্বাভাবিকভাবে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী যখন আবার ভয়ে ভয়ে আওড়ালেন—'প্যারীর এই ভদ্রলোক আমাদের বন্দীদের কি অপকার করবেন?'—মঁসিয়ের মেজাজ দারুণ বিগড়ে গেল, ঠিক তখনই তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন। তাঁদের মেজ ছেলেটি টেরেসের আলসের উপরে উঠেছে এবং আলসের মাথার উপর দিয়ে তখন ছুটতে সুরু করেছে, ওদিকের আঙ্গুর ক্ষেতের উপর আলসেটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু। পাছে তাঁর স্বামী ছেলেটিকে ধমক দিলে ছেলেটি নীচে পড়ে যায় তাই' মাদাম তাকে কিছু বলতে ভয় পেলেন। একটু পরে ছেলেটি হাসতে হাসতে এদিকে ফিরে তাকাল মায়ের দিকে, নিজের সাহসিক কাজে ছেলেটি খুব গর্ব অনুভব করছিল মনে মনে এবং মা-কে ভয়ে বিবর্ণ দেখে সে ব্যায়ামাগারের দিকে লাফিয়ে পড়ে মায়ের কাছে ছুটে এল। এর জন্য ছেলেটি খুব ধমক খেল।

এই ছোট্ট ঘটনাটা কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল।

মঁসিয়ে গু রেনল বললেন—'করাতী সোরেলের ছেলেকে আমার বাড়ীতে আনব বলে মনে মনে ঠিক করেছি। সে আমার ছেলেদের দেখাশোনা করবে। ওরা আমাদের পক্ষে ভার হয়ে উঠছে। আর ছোকরা একজন ধর্মযাজক বা লাটিন ভাষাটা খুব ভাল জানে। গীর্জার ধর্মযাজকের অভিমত ছোকরা খুব সৎ ও দৃঢ়

চরিত্রের। আমার ছেলেদের সে পড়াতে পারবে। সে আমার বাড়ীতে থাকবে খাবে এবং তিন শ' ফ্রাঙ্ক করে পাবে।'

মেয়র আবার বলতে লাগলেন—'ছোকরার নৈতিক-চরিত্র সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ ছিল। সেনাবাহিনীর সেই বুড়ো শল্য-চিকিৎসক এখানে এসে সোরেল পরিবারের সঙ্গে ছিল কেননা সে বুঝি তাদের আত্মীয়। এই ছোকরা ওই শল্য-চিকিৎসকের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যতদূর জানি, ওই লোকটা ছিল উদার-নীতিক দলের একজন গোয়েন্দা। অবশ্য সে বলত যে আমাদের এখানকার পাহাড়ী হাওয়ায় তার হাঁপানি সারবে। অবশ্য এর কোনও প্রমাণ নেই। বোনাপার্টের ইতালি অভিযানে সে যোগ দিয়েছিল এবং লোকে বলে সে সাম্রাজ্য স্থাপনের বিরুদ্ধে একবার ভোট দিয়েছিল। এই উদারনীতিক সোরেল ছোকরাকে লাটিন-ভাষা পড়িয়েছে। এ বাড়ীতে যেসব বইপত্র এনেছিল ছোকরাকে দিয়ে গেছে। ধর্মযাজক না বললে কখ্‌খনো একটা ছুতোরের ছেলেকে আমি আমার বাড়ীতে স্থান দিতাম না, সে স্বপ্নও দেখতাম না। যে ঘটনায় আমাদের বন্ধুত্ব টুটে গেছে সেই ঘটনা ঘটার আগের দিন শুনেছি যে, ছোকরা তিন বছর ধরে ধর্মযাজকের কাছে ধর্ম-তত্ত্ব পড়ছে। কাজেই সে উদারনীতিক হতে পারবে না এবং সে লাটিন জানে।

মঁসিয়ে দ্য রেনল বিচক্ষণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন—'এই ব্যবস্থাটা আমার খুব মনে ধরেছে। ওই ভালেনদ লোকটা গাড়ীর জন্যে দুটো সুন্দর নরম্যান ঘোড়া কিনেছে এবং তার খুব গুমোর বেড়েছে। কিন্তু ওর ছেলেদের জন্যে কোনও গৃহশিক্ষক নেই।'

'সে আমাদের কাছ থেকেও একে ভাগিয়ে নিতে পারে।'

এই মাত্র যে সুন্দর ধারণার কথাটা তাঁর স্ত্রী বললেন তার জন্যে হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মঁসিয়ে দ্য রেনল বললেন—'তাহলে তুমি আমার মতলব সমর্থন করছ? বেশ, তাহলে এটাই ঠিক হল।'

তাঁর স্ত্রী বললেন—'প্রিয়, কত তাড়াতাড়ি তুমি তোমার মনস্থির করতে পার!'

'তার কারণ আমি একজন চরিত্রবান পুরুষ এবং ধর্মযাজকও আমার সম্পর্কে তাই জানত। কিন্তু আমাদের গোপন খবর প্রকাশ না হয়ে পড়ে যেন। এখানে উদারনীতিকরা গিস-গিস করছে। ওই কাপড়-কলের মালিকরা, আমি নিশ্চিত, ওরা আমাকে হিংসে করে। ঠিক আছে। ওদের দেখিয়ে খুশি হব যে, মঁসিয়ে দ্য রেনলের ছেলেরা একজন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বেড়াতে চলেছে। এতে লোকজনেরা প্রভাবিত হবে। আমার ঠাকুরদা বলতেন কেমনভাবে ছোটবেলায় তাঁর একজন গৃহশিক্ষক ছিল। এর জন্যে আমার তিন শ' ফ্রাঙ্ক খরচ হবে কিন্তু সমাজে পদমর্যাদা বাড়াবার জন্যে এ খরচ অপরিহার্য।'

এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে মাদাম দ্য রেনল খুব অবাক হলেন। তাঁর দীর্ঘ,

সুষম দেহবল্লরী। এই পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা বলে যে, তিনি ছিলেন এ জেলার শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। প্যারীর ভদ্রলোকের চোখে তাঁর ব্যবহার ও যৌবনোচিত হাবভাবে নিশ্চয় স্বাভাবিক সারল্য ধরা পড়েছিল। তাঁর নির্দোষ, কৌতূহলী এবং দেহ-লাবণ্য সম্বন্ধে ভয়ানক অচেতন-ভাব হয়ত ভদ্রলোকের মনে কোমল, ইন্দ্রিয়জ আনন্দের উদ্রেক করেছিল কিন্তু যদি মাদাম দ্য রেনল তাঁর সাফল্যের কথা বুঝতে পারতেন তাহলে নিশ্চয় অপ্রতিভ হতেন এই হৃদয়ে ছিনালি বা স্নেহের কোনও স্থান নেই। সাম্প্রতিক জনরব এই যে, মঁসিয়ে ভালেনদ এই সুন্দরীর কাছে প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। এই কাহিনী তাঁর খ্যাতি বর্ধিত করছে একজন সুবিদিত একনিষ্ঠ নারী হিসাবে। কেননা মঁসিয়ে ভালেনদ একজন দীর্ঘ ও পেশীবহুল সুগঠিত-দেহ যুবক। উজ্জ্বল দেহবর্ণ। ঘোর জমকালো দাড়ি। এ অঞ্চলের অন্যতম অশিষ্ট, সাহসী ও হুল্লোড়-প্রকৃতির অথচ অতীব সুন্দর পুরুষ হিসাবে পরিগণিত।

বাস্তবে, মাদাম দ্য রেনল হচ্ছেন লাজুক এবং আবেগপ্রবণ যুবতী…তাই মঁসিয়ে ভালেনদের সোচ্চার, চঞ্চল এবং ব্যস্তভাব তাঁকে বিরক্ত করে তুলেছিল। ভেরিয়ার-বাসীরা যেসব আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত সে-সবের প্রতি তাঁর অনীহার ফলে তিনি 'নিজ বংশগৌরবে গর্বিতা' এই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ সব তাঁর কাছে অজ্ঞাত এবং অতি সামান্য লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে, কম কথা বলে তাই তিনি দারুণ খুশি। আমরা গোপন করতে চাই না, তাঁর পারচিতা বিবাহিতারা বলেন যে, তিনি বোবা এবং নির্বোধ স্ত্রীলোক তাই স্বামীর কাছে কোনও জিনিসের জন্য আবদার করেন না। ফলে প্যারী বা বেসানকন থেকে ফ্যাসন-দুরস্ত কোনও বস্তু কেনার সুযোগ হাতছাড়া করছেন। যদি তাঁকে শান্তিতে তাঁর মনোরম উদ্যানে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর অনুযোগ করার কোন কারণ থাকবে না।

বাস্তবিকই মাদাম দ্য রেনলের সরল, শিশুসুলভ স্বভাব। তিনি কখনও তাঁর স্বামীর কাজের বিচার করতে সাহস করেন না এবং তাঁর স্বামী তাঁর কাছে ক্লান্তিকর এমন কথাও বলেন না। কখনও তাঁর চিন্তা ভাষায় প্রকাশ না করলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাঁদের মতন আনন্দদায়ক সম্পর্ক আর নজরে পড়ে না। ছেলেদের সম্পর্কে পরিকল্পনার বিষয়ে যখন তাঁর স্বামী মঁসিয়ে দ্য রেনল তাঁর সাথে আলোচনা করেন তখন তিনি তাঁর সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেন। তাঁর স্বামী স্থির করেছেন, বড় ছেলেটি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে, মেজ ছেলে হবে বিচারক এবং ছোটটি হবে ধর্মযাজক। সংক্ষেপে, তাঁর পরিচিত অন্যান্য পুরুষদের চেয়ে মঁসিয়ে দ্য রেনল অনেক কম ক্লান্তিকর।

স্ত্রী-মনের আবেগ প্রবণতা সম্বন্ধে বিবেচনা-প্রসূত ধারণা করার তাঁর বহু কারণ আছে। তাঁর কাকা এমন কতকগুলো চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলতেন যার ফলে ভেরিয়ার শহরের মেয়র বুদ্ধিমান ও উচ্চ বংশজাত বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বিপ্লবের আগে ডিউক অব্ অরলিয়াঙ্গের সেনাদলে বুড়ো ক্যাপ্টেন দ্য রেনল পদাতিক সেনাদের অফিসার ছিলেন। এবং পরে প্যারীতে ফিরে রাজকীয় প্রাসাদের অতিথি-ভবনে উঠেছিলেন। সেখানে মাদাম দ্য মনতেসন, মাদাম দ্য জেনলিস এবং আবিষ্কারক মঁসিয়ে ভুক্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। মঁসিয়ে ভুক্রে আবার ছিলেন ডিউকের পরিবারভুক্ত। মঁসিয়ে দ্য রেনল তাঁর বর্ণনায় এদের কথা প্রায়ই বলতেন এবং তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন এমন খুঁটিনাটি সব কথা যা' ক্রমে ক্রমে ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। তবে অরলিয়ান্স বাড়ীর কাহিনী খুব জমকালো মজলিসে বলবার জন্যে পৃথক করে রেখেছিলেন। অর্থ সম্পর্কে আলোচনা না হলে তিনি সব সময় খুব ভদ্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই আজও লোকে তাঁকে ভেরিয়ার শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অভিজাত বলে উল্লেখ করে থাকে এবং তাদের এ ধারণা কারণ-ছাড়া নয়।

৪ : পিতা এবং পুত্র

যদি জিনিস এমন হয় এবং তা' কি আমার দোষ?
—মেকিয়াভেলি

পরের দিন সকাল ছ'টার সময় পাহাড়ের উৎরাই দিয়ে সোরেলের করাত কার-খানায় যেতে যেতে ভেরিয়ারের মেয়র মনে মনে বললেন, আমার স্ত্রীর কাঁধে বেশ একটা বুদ্ধি-ভরা মাথা আছে দেখছি। আমার সঠিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য অনেক কথা তার কাছে বললেও এ কথাটা আমার মনে উদয় হয় নি যে, লাটিন ভাষায় জ্ঞানী বলে লোকে যাকে জানে সেই ধর্মযাজক সোরেল ছোকরাকে আমি যদি না রাখি তবে অনাথ-আশ্রমের চঞ্চল ব্যস্তবাগীশ পরিচালকটির মাথায় এ মতলব গজাবে এবং সে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে। কি চতুর-তার সঙ্গে সে তখন তার ছেলেদের গৃহশিক্ষক সম্পর্কে বলবে।...কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ওকে যদি একবার গৃহশিক্ষক করতে পারি তাহলে সে কি আর ধর্মযাজকের পোশাক পরবে?

মঁসিয়ে দ্য রেনল এই প্রশ্নে নিমগ্ন-মন ছিলেন। সেই সময় দূরে ছ'ফুট লম্বা একজন কৃষককে দেখতে পেলেন। মনে হল লোকটা সকাল থেকে দোবের তীরে পথের উপর রাখা একটা কাঠের গুঁড়ির মাপজোক করছে। মেয়রকে সেদিকে আসতে দেখে কৃষকটি একটুও খুশি হল না। কেননা কাঠের গুঁড়িটা চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে এবং ওটাকে এভাবে এখানে ফেলে রাখা বেআইনী কাজ।

মঁসিয়ে দ্য রেনল তার ছেলেকে নিয়োগ করার অসাধারণ প্রস্তাব করতেই বৃদ্ধ সোরেল দারুণ বিস্মিত হল এবং গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করল। তবু সে দারুণ বিরক্তি এবং অনীহার সাথে প্রস্তাবটা শুনল এবং এই পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীরা খুব চতুরতার সঙ্গে তাদের মনের খল-ভাব গোপন রাখতে পারদর্শী।

স্পেনীয়দের রাজত্বকালে যারা ক্রীতদাস ছিল তাদের মুখমণ্ডলে এমন একটা ভাবের ছাপ রয়েছে যা' তাদেরকে মিশরীয় কৃষকদের চারিত্রিক বিশেষত্ব দান করেছে।

জবাব হিসাবে সোরেল প্রথমেই যা' আওড়াল তা' তার মুখস্থ-করা শ্রদ্ধার বাণী-সমন্বিত দীর্ঘ ভাষণ ছাড়া আর কিছু নয়। সারাক্ষণ সোরেল শূন্য কতকগুলো বাক্যাংশ বার বার আওড়াচ্ছিল এবং আনাড়ির মতন দাঁত বার করে হাসছিল। যার ফলে তার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক ধূর্তমি ও বদমায়েশি ভাবটা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। বুড়ো কৃষকের সক্রিয় মন কেবলই আবিষ্কার করতে চাইছিল কেন একজন গুরুত্বপূর্ণ পদের মানুষ তার অকেজো ছেলেটাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছে। সে নিজে জুলিয়ানের উপর দারুণ বিরক্ত, অথচ তাকে পাওয়ার জন্যই মঁসিয়ে দ্য রেনল থাকা-খাওয়া এমন কি পোশাক ছাড়াও বছরে তিন শ' ফ্রাঙ্ক দিতে চাইছেন…এ ত অভাবিত বেতন। সোরেল খুবই ধূর্ত, তাই সহসা শেষের চুক্তির প্রস্তাব করতেই মঁসিয়ে দ্য রেনল সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন।

এই চুক্তির দাবী শুনে মেয়র খুব প্রভাবিত হলেন। এটা সুস্পষ্ট যে, সোরেল আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে নি, হয় ত সে আর কারো কাছ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব পেয়েছে…মনে মনে ভাবলেন মেয়র। যদি মঁসিয়ে ভালেনদ না হয় ত আর কে হবে? বৃথাই মঁসিয়ে দ্য রেনল ব্যাপারটার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে চাইলেন, কিন্তু ধূর্ত বৃদ্ধ কৃষক জেদ ধরে বসে রইল। কাজেই শেষে তিনি চাইলেন, সে তার ছেলের মত নিক…যেন এই প্রদেশে ধনী পিতা হলেও কপর্দকশূন্য ছেলের মত নেওয়ার একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে।

জল-চালিত করাত-কারখানায় নদীর কিনারায় একটা বিশাল ছাউনি বানানো হয়, ছাদের মতন কাঠের কাঠামোটাকে ধরে রাখে চারধারে বসানো বড় বড় চারটে কাঠের থাম। ছাউনির মাঝ বরাবর মাটি থেকে ন'দশ ফুট উঁচুতে একখানা বড় করাত বসানো থাকে…সেটি উপরে-নীচে উঠা-নামা করে এবং খুব সরল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাঠের গুঁড়ি করাতের নীচে এগিয়ে আসে। জলস্রোতের চাপে যে চাকাখানা ঘোরে তারই সাহায্যে দু'ধরনের কাজ-করার জন্য যন্ত্রটা সচল হয়… একটা অংশ করাতখানার উচ্চগতি ও নিম্নগতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং আর একটা অংশের চাপে ছেদিত হওয়ার জন্য গুঁড়িটা ধীরে ধীরে করাতের নীচে এগিয়ে আসে এবং তক্তায় ভাগ হয়।

করাত-কারখানায় হাজির হয়েই খন্‌খনে গলায় জুলিয়ানকে ডাকল সোরেল, কিন্তু জবাব পেল না। শুধু তার বিশালদেহী বড় ছেলেদের দেখল…তারা করাতের নীচে আনবার আগে বড় বড় কুড়ুল চালিয়ে পাইন গাছের গুঁড়িগুলোকে খণ্ড খণ্ড করছে। ঠিক কালো দাগ দেওয়া জায়গাটায় মনযোগ দিয়ে কুড়ুলের

আঘাত হানছে, কাঠের চকলা ছিটকে পড়ছে প্রতি আঘাতের সাথে…তারা বাপের ডাক শুনতেই পেল না। সোরেল ছাউনির দিকে পা চালাল, করাতের পাশে জুলিয়ানের বসে থাকার কথা কিন্তু ছাউনির মধ্যে ঢুকে বৃথাই সোরেল তাকে সেখানে খোঁজ করল। সে তাকে দেখল পাঁচ-ছ'ফুট উঁচুতে ছাদের কাছে একটা কাঠের থামের উপর। কলের স্বাভাবিক গতির উপর নজর না রেখে সে বই পড়ায় ব্যস্ত। সোরেলের কাছে এর চেয়ে প্রতিবাদের বড় বিষয় আর নেই। বড় ভাইদের মতন তার দেহ সুগঠিত এবং বলশালী নয় তাই সে গুরু পরিশ্রমের কাজ করতে অক্ষম। এর জন্য রোগা-দেহ জুলিয়ানকে সে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু পড়াশুনা করার জন্য এই পাগলামি তার কাছে ঘৃণ্য। সে নিজে পড়তে জানে না।

সে দু'তিনবার জুলিয়ানের নাম ধরে ডাকল…কিন্তু সব বৃথা হল। সচল করাতের আওয়াজের চেয়েও পিতার ভয়ঙ্কর কণ্ঠের ডাক ছেলেটির বইয়ের দিকে মনোসংযোগকে ভাঙতে পারল না। অবশেষে বয়স হওয়া সত্ত্বেও, করাতে চেরাই হওয়ার জন্য সাজিয়ে রাখা গুঁড়ির উপর দ্রুত লাফিয়ে উঠল, সেখান থেকে ছাদের ভার-রাখা আড়াআড়ি বিমের উপর উঠল। এক প্রচণ্ড ঘুঁষিতে জুলিয়ানের হাতের বইখানা ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। প্রথমটার মতনই আর একটা ঘুঁষি ছুঁড়ল তার মাথা নিশানা করে এবং তার আঘাতে ছেলেটা দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। বার-পনের ফুট উঁচু থেকে ছেলেটা পড়ে যাচ্ছিল একেবারে সচল কলের লিভারের মধ্যে, পড়লে নিমেষের মধ্যে তার দেহটা থেঁৎলে খণ্ড খণ্ড হয়ে যেত…কিন্তু ঠিক সময়ে তার বাবা বাঁ হাতে তার পতনোন্মুখ দেহটা ধরে খাড়া করে রাখল।

'কুঁড়ের বাদশা কোথাকার! সব সময় ওই বাজে বইগুলো বসে বসে পড়ছিস; তোকে কলের ওপর নজর রাখতে বলে গেছি, পড়বি আর বই? সন্ধ্যেবেলা ধর্মযাজকের বাড়ী গিয়ে যখন সময় নষ্ট করিস তখন বই পড়তে ইচ্ছে হয় ত পড়বি।'

যদিও ঘুঁসির আঘাতে পাথর হয়ে গেছে, রক্ত ঝরে পড়ছে, তবু করাতের পাশে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল জুলিয়ান। তার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল, দৈহিক যন্ত্রণার জন্য যতটা নয় তার বেশী আঘাত লাগল প্রিয় বইখানা খোয়া যাওয়ার জন্য।

'নেমে আয় অসভ্য শয়তান। তোর সাথে কথা আছে।' এবারও কলের একটানা শব্দের জন্য বাবার হুকুম জুলিয়ানের কানে গেল না। তার বাবা নীচে দাঁড়িয়েছিল। আর কলের উপরে উঠবার কষ্ট করল না সোরেল দ্বিতীয়বার। আখরোট পাড়বার লম্বা লাঠিখানা নিয়ে এল এবং নীচ থেকে সজোরে তার কাঁধে আঘাত করল।

তখনও মাটিতে পা রাখে নি জুলিয়ান, তার বাবা তাকে মারতে মারতে

সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল সোজা বাড়ীর দিকে। ছেলেটা মনে মনে ভাবতে লাগল ঈশ্বর জানেন বাবা আমার সাথে এমন ব্যবহার করছে কেন! যাওয়ার সময় নদীতে যেখানে তার বইখানা পড়ে গেছে সেখানটা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দেখল। 'সেন্ট হেলেনের স্মৃতিকথা'—এ খানা তার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ।

তার মুখমণ্ডল রক্তিম, দৃষ্টি আনত। হ্রস্ব-দেহী ছেলে, প্রায় আঠার-উনিশ বছর বয়স, অনিয়মিত কিন্তু সুন্দর ছাঁদের দেহ এবং বক্র নাসিকা। তার বড় বড় কালো দুটো চোখ, শান্ত অবস্থায় চিন্তামগ্ন এবং আত্মিক-শক্তির আগুনে উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু এখন তার দু'চোখে ভয়ানক বন্য ঘৃণার ছোঁওয়া। তার ঘোর পিঙ্গলবর্ণের চুলগুলো কপালের উপর ঝুলে পড়েছে। এবং রাগের মুহূর্তে তাকে খানিকটা বিরক্তিজনক এবং ক্রুদ্ধ করে তোলে। অসংখ্য ধরনের মানবিক মুখমণ্ডলসমূহের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বময় মুখ সচরাচর নজরে পড়ে না। তার সুসজ্জিত, পাতলা দেহে শক্তির চেয়ে ক্ষিপ্রতার চিহ্ন বেশী বর্তমান। খুব শৈশব অবস্থায় তার মুখের চিন্তাগ্রস্ত এবং ভয়ানক পাণ্ডুবর্ণ ভাব দেখে তার বাবা ভেবেছিল, সে বেশীদিন বাঁচবে না এবং বাঁচলেও পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকবে। বাড়ীর প্রত্যেকের কাছে সে ভর্ৎসনার বস্তু। তাই বাবা আর দাদাদের সে ঘৃণা করত। প্রতি রবিবার পাবলিক পার্কের খেলাধূলার আসরে সে হেরে যেত।

অল্প কিছুদিন আগে, বছর খানেকেরও কম সময় হবে, তার সুন্দর মুখ দেখে কয়েকজন যুবতী তার সাথে বন্ধুর মতন কথা বলেছিল। দুর্বল শিশু হওয়ার জন্য সকলের দ্বারা ঘৃণিত হয়ে জুলিয়ান সেই সেনাবাহিনীর শল্য-চিকিৎসককে পূজা করতো, কেননা সেই ভদ্রলোক একদিন গাছগুলো কাটার জন্য মেয়রের কাছে সাহস করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এই শল্য-চিকিৎসক বুড়ো সোরেলকে টাকা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ছেলেটাকে ডেকে আনতেন এবং সে সময় তাকে লাটিন এবং ইতিহাস পড়াতেন আর না হয় সতের শ' ছিয়ানব্বই সালের ইতালি অভিযানের ইতিহাস তাকে শোনাতেন। যখন মারা যান তখন জুলিয়ানকে দিয়ে যান সেনাদলে পাওয়া পদকখানা, বকেয়া আধা মজুরি আর খান তিরিশ-চল্লিশ বই, এবং তারই একখানা মূল্যবান সম্পদ মেয়রের প্রভাবে পরিবর্তিত নদীর ধারার মধ্যে উল্টে পড়ে তলিয়ে গেছে।

জুলিয়ান বাড়াতে ঢোকবার আগেই বাবার শক্তিশালী হাতের চাপ অনুভব করল নিজের কাঁধে, তাকে থামিয়ে দিল। বাবার হাতের ঘুঁষির আশঙ্কায় তার দেহ কাঁপতে লাগল।

'মিথ্যে না বলে আমার কথার জবাব দে!' বুড়ো কৃষকের কর্কশ কণ্ঠস্বর জুলিয়ানের কানে ঢুকল। শিশু যেমন তার পুতুল-সেনাকে ঘুরিয়ে রাখে, তেমনি-ভাবে তার বাবা তার দেহ টেনে ঘোরাল। জুলিয়ানের বড় বড়, অশ্রুভরা, কালো চোখের দৃষ্টির সঙ্গে বুড়ো ছুতোরের ছোট ছোট ধূসর চোখের দৃষ্টি মিলল…

যেন ওই দৃষ্টি একেবারে সোজা তার অন্তরাত্মা ভেদ করার চেষ্টা করছে।

৫ : চুক্তির আগে আলোচনা

বিলম্বে প্রত্যেক বস্তু ঠিক হয়।
—ঈনিউস

'মিথ্যে না বলে এবার আমার কথার জবাব দে! যদি পারিস ত দে, হতভাগা বইয়ের পোকা। বল, মাদাম দ্য রেনলকে কি করে জানলি? কখন তার সাথে কথা বললি?'

জুলিয়ান জবাব দিল—'আমি কখনো তাঁর সাথে কথা বলি নি। গীর্জায় ছাড়া তাঁকে কখনও দেখি নি।'

'কিন্তু তুই তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিস, দেখিস নি নির্লজ্জ বদমাশ?'

বাপের হাতের আরও ঘুঁষির আঘাত এড়াবার জন্যে জুলিয়ান একটু ভণ্ডামি করেই যেন বলল (অবশ্য এই ভণ্ডামির অভিমত তার বাপের)—'কখ্খনো না! তুমি ত জান গীর্জায় গিয়ে আমি ঈশ্বরকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না।'

'যা হোক এর পিছনে আর কিছু আছে' বলল শঠ, বুড়ো চাষী। তারপর কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে লাগল—'কিন্তু তোর মুখ থেকে ত কোন কথাই শুনতে পাব না, বদমাশ ভণ্ড কোথাকার! এবার তোর হাত থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি, এবং তোকে ছাড়াই আমার করাত-কারখানা ভালই চলবে। ওই ধর্মযাজক আর না হয় অন্য কাউকে ধরে নিজের জন্যে সুন্দর একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিস। যা, গিয়ে নিজের বিছানাপত্র গুছিয়ে নে। তোকে এখনি মঁসিয়ে দ্য রেনলের বাড়ী দিয়ে আসব; তাঁর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হয়ে সেখানে থাকবি।'

'তার জন্যে কি পাব আমি?'

'তোর খাওয়া-থাকা-পোশাক আর তিন শ' ফ্রাঙ্ক মজুরি।'

'চাকর হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।'

'বুদ্ধু কোথাকার! তোকে কে চাকর বানাবার কথা বলছে? তুই কি ভাবিস যে, আমি চাইব কেউ আমার ছেলেকে চাকর বানাক?'

'কিন্তু কে আমাকে খাওয়াবে?'

এই প্রশ্ন শুনে বুড়ো সোরেল হতবাক হয়ে গেল। ভেবে দেখল, এখন কিছু বলতে গেলে সে মূর্খের মতন কথা বলবে, জুলিয়ানের উপর তার দারুণ রাগ হল, অপমান করল, একটা অপদার্থের মুখ ভরাতে হচ্ছে বলে গালাগালি দিল এবং অবশেষে অন্য ছেলেদের সাথে পরামর্শ করার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই জুলিয়ান দেখল, ওরা সবাই নিজের নিজের কুড়ুলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কোন একটা বিষয়ে আলোচনা করছে। অল্পক্ষণ ওদের নিরীক্ষণ করে এবং ওরা কি বলাবলি করছে তা' আন্দাজ করতে না পেরে জুলিয়ান সরে গেল এবং যাতে হঠাৎ আবার আক্রান্ত না হয় তাই কলের আড়ালে গিয়ে

দাঁড়াল। তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করতে চলেছে যে অকল্পনীয় সংবাদ তাই নিয়ে সে এখন ভাবতে চায়, কিন্তু বিবেচকের মতন এখন কাজ করতে সে অক্ষম। মঁসিয়ে ভ রেনলের সুন্দর বাড়ীতে সে কি দেখবে সেই ছবি কল্পনা করতে তার মন পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট।

মনে মনে বলল, চাকরদের সাথে চাকরের মতন বসে খাওয়ার চেয়ে সে বরং এ সব ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমার বাবা জোর করে আমাকে এ কাজে পাঠাতে চাইছে। আমি বরং আত্মহত্যা করব। পাঁচ ফ্রাঙ্ক আট সউ জমিয়েছি। আজ রাতেই বাড়ী থেকে পালাব। যে সব গলিতে পুলিশের সামনে পড়ার ভয় নেই সে-সব গলি দিয়ে হাঁটলে হু'দিনের মধ্যেই আমি বেসানকন শহরে পৌছে যাব। ওখানে সেনাদলে নাম লেখাব অথবা দরকার বুঝলে সীমানা পার হয়ে সুইজারল্যাণ্ড চলে যাব। কিন্তু তাহলে সব কাজের সেরা ধর্মযাজকের পেশা গ্রহণের সমস্ত আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনার ইতি ঘটবে।

চাকরদের সাথে বসে খাওয়ার ভীতিপ্রদ আশঙ্কা জুলিয়ানের মনের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। এ সংসারে নিজের রাস্তা করে নেওয়ার জন্যে এর চেয়েও কঠোর কাজ করতে সে প্রস্তুত। রুশোর 'কনফেসান' পড়ে এই বিদ্বেষ তার মনে আহরিত হয়েছে এবং সমাজের গঠন-প্রকৃতির কল্পনা করতে সাহায্য করেছে এই গ্রন্থ। তাছাড়া এই গ্রন্থের সাথে গ্রাণ্ড আরমির প্রচারপত্র এবং 'সেণ্ট হেলেনের স্মৃতিকথা' পাঠ করে সে গঠন করেছে তার নৈতিক চরিত্র। এই তিনখানা গ্রন্থ রক্ষা করতে গিয়ে তাকে যদি নিহত হতে হয় তাতেও সে রাজী। আর কোন কিছুতে তার বিশ্বাস নেই। একবার সেনাবাহিনীর সেই বুড়ো শল্য-চিকিৎসক মন্তব্য করেছিলেন যে, বিশ্বের আরও অনেক গ্রন্থ তিনি পড়েছেন। সেগুলো সব মিথ্যের দলিল···নিজেদের উন্নতির জন্য সব জুয়াচোররা লিখেছে।

এই উত্তেজনাপ্রবণ মেজাজের সাথে মিশেছিল ভোঁতা-বুদ্ধির রেশ··· জুলিয়ান এই অদ্ভুত মিশ্রিত চরিত্রের কথা প্রায়ই স্মরণ করে। বুড়ো ধর্মযাজক চেলানের অনুগ্রহ লাভের জন্য লাটিন ভাষায় লেখা 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেছে কারণ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, তার ভবিষ্যৎ এই ধর্মযাজকের উপর নির্ভরশীল। পোপ সম্পর্কে মঁসিয়ে ভ মেইসত্রির সমস্ত গ্রন্থের কথা জানে এবং বিশ্বাস করে উভয়েই সমান ক্ষুদ্র।

যেন মৌখিক চুক্তি মতন সেদিনটা সোরেল এবং তার ছেলে পরস্পরের সাথে কথা বলার দায় এড়িয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে জুলিয়ান গেল ধর্মযাজকের বাড়ীতে ধর্মতত্ত্বের পাঠ নিতে। তার বাবার কাছে যে অদ্ভুত প্রস্তাব করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করাটা তার কাছে সমীচিন বলে মনে হল না। মনে মনে বলল, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। আমি অবশ্যই এমন একটা ভাব দেখাব যেন এটা আমি ভুলে গেছি।

পরের দিন খুব ভোরে মঁসিয়ে ভ রেনল ডেকে পাঠালেন বুড়ো সোরেলকে।

তাঁকে আরও ঘণ্টা খানেক বা দু'য়েক অপেক্ষা করিয়ে সোরেল অবশেষে গিয়ে হাজির হল, দরজার কাছ থেকেই হাজারো ওজোর আওড়াল, অনেকবার নানা অসুবিধায় কথা বলে আনত মস্তকে অভিবাদন জানাল। নানা ধরনের বাদ-প্রতিবাদের শেষে সোরেল এটুকু বুঝতে পারল যে, তার ছেলে বাড়ীর কর্তা আর গিন্নীর সাথে বসেই খাওয়া-দাওয়া করবে এবং অন্যদিন বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত থাকলে আলাদা ঘরে ছেলেদের সঙ্গে খাবে। মেয়রের অকৃত্রিম উৎসাহ সম্পর্কে যতই সে সুনিশ্চিত হচ্ছিল ততই নানা ধরনের অসুবিধার কথা তুলে ধরার একটা প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দিচ্ছিল এবং পরিপূর্ণ অবাক ও অবিশ্বাসের জন্য সোরেল জানতে চাইল যে, তার ছেলে শোবে কোন ঘরে এবং শেষে ঘরখানা দেখতে গেল। একখানা বিশাল ঘর সুন্দরভাবে আসবাব-পত্রে সাজানো; এবং চাকররা ছেলে তিনটির বিছানাও এ ঘরে নিয়ে আসছে।

এই দৃশ্য দেখে বুড়ো চাষীর মনে আলোর ঝিলিক চমকে উঠল। তখ্খনি তার ছেলেকে কি পোশাক দেওয়া হবে তা' সোরেল দেখতে চাইল। মঁসিয়ে দ্য রেনল দেরাজ খুলে এক শ' ফ্রাঙ্কের একখানা নোট বার করলেন :

'এই টাকা নিয়ে পোশাক-বিক্রেতা মঁসিয়ে দুরাণ্ডের কাছে তোমার ছেলের জন্যে একটা কালো রঙের স্যুট্ করিয়ে নাও।'

সহসা নিজের হীন অনুগত ভাব ভুলে গিয়ে বুড়ো চাষী বলে উঠল—'ছেলেকে যদি কোনদিন আপনার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই তাহলেও কি পোশাকটা তারই থাকবে ?'

'নিশ্চয় !'

এবার সোরেল টেনে টেনে বলল—'ও আচ্ছা! ওকে আপনি যে বেতন দেবেন সেটা ছাড়া আর কিছুই আমাদের কাছে গররাজী হওয়ার বিষয় রইল না।'

মঁসিয়ে দ্য রেনল রুষ্টভাবে বললেন—'কি ! গতকাল ত ও ব্যাপারে আমরা রাজী হয়েছি। আমি ত তাকে তিনশ' ফ্রাঙ্ক দেব বলেছি। আমার ধারণা, এ অনেক টাকা। বোধ হয় খুব বেশী।'

'ওটা আপনি দিতে চেয়েছেন, আমি তা অস্বীকার করছি না।' আরও শান্তভাবে বলল সোরেল। ফ্রাঞ্চ-কমেতের চাষীদের বুদ্ধির ধার সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তারাই এ কথা শুনে অবাক হবে, মঁসিয়ে দ্য রেনলের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করে সে বলল—'অন্য জায়গায় আমরা এর চেয়ে বেশী পেতে পারি।'

এ কথা শুনে মেয়রের মুখ হতাশায় ভরে গেল। যা'হোক, তিনি ধাতস্থ হলেন। এবং দু'ঘণ্টা ধরে খুব পারদর্শিতার সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। বিনা মতলবে একটা কথাও বললেন না। চাষীর বুদ্ধির সাথে একজন ধনীর বুদ্ধির লড়াই চলল, অবশ্য এই ধনী ব্যক্তির জীবিকা এর উপর নির্ভরশীল নয়। জুলিয়ানের নতুন-জীবন পরিচালনার জন্য যা' কিছু প্রয়োজন তার সবগুলোই

অবশেষে নির্ধারিত হল। শুধু যে তার বেতন চারশ' ফ্রাঙ্ক ধার্য হল তাই নয় প্রতি মাসে সেই অর্থ আগাম মিটিয়ে দেওয়ারও চুক্তি হল।

মঁসিয়ে গু রেনল—'বেশ। প্রতি মাসে আমি তাকে পঁয়ত্রিশ ফ্রাঙ্ক করে দেব।'

প্রলোভিত করার জন্য নরম সুরে চাষীটি বলল—'মহামান্য মেয়র একজন সদাশয় ব্যক্তি, তিনি তাকে জোড় অঙ্কের অর্থ দিতে পারেন। তিনি মাসে ছত্রিশ ফ্রাঙ্ক দেবেন।'

মঁসিয়ে রেনল—'ঠিক আছে। কিন্তু এখানেই শেষ। আর নয়।'

এবার দারুণ রাগে তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন হল।

বুড়ো চাষী বুঝল ব্যাপারটা নিয়ে আর দর-কষাকষি করা এবার বন্ধ করা প্রয়োজন। তারপর মঁসিয়ে গু রেনল তার সুবিধার জন্য আরও কিছু বললেন। কোন কারণেই প্রথম মাসের বেতন ছত্রিশ ফ্রাঙ্ক তিনি বুড়ো সোরেলের হাতে দেবেন না, যদিও টাকাটা হাতে পাওয়ার জন্যে সোরেল উদগ্রীব হয়ে ছিল। সহসা মঁসিয়ে গু রেনলের মনে হল, চুক্তির আগে আলোচনার বিষয়বস্তু তিনি যা কিছু এ ব্যাপারে বলেছেন তা' তাঁর স্ত্রীর কাছে বলা প্রয়োজন।

তারপর রুষ্টস্বরে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'তোমায় যে একশ' ফ্রাঙ্ক দিয়েছি ওটা আমাকে ফেরৎ দাও। মঁসিয়ে দুরাণ্ডের কাছে আমার কিছু অর্থ পাওনা আছে। তোমার ছেলেকে আমি নিজে নিয়ে গিয়ে কালো রঙের একসেট পোশাক বানিয়ে দেব।'

এই ভয়ঙ্কর কাজের ফলে সোরেল সুবিবেচকের মতন আবার সম্মানজনকভাবে ব্যবহার করতে সুরু করল। এই প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শনের পালা ঘণ্টাখানেক ধরে চলল। অবশেষে যখন সে বুঝতে পারল যে, নতুন করে সে কিছু আর লাভ করতে পারবে না, তখন অভিবাদন জানিয়ে বলল—'আমার ছেলেকে আপনার পল্লীনিবাসে পাঠিয়ে দেব।' মেয়রের অধীনে যারা বাস করে তারা মেয়রকে খুশি করবার প্রয়োজন হলে তাঁর বাড়ীকে পল্লীনিবাস বলে।

কারখানায় ফিরে সোরেল বৃথাই ছেলেকে খুঁজতে লাগল। কি হল সন্দেহ জাগল। মাঝ রাতে জুলিয়ান বাড়ী ছেড়েছিল। তার বইগুলো আর সম্মান-পদকখানা কোনও নিরাপদ জায়গায় তার রাখবার ইচ্ছে হল। তাই সেগুলো নিয়ে সে এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর তরুণ ছেলের কাছে গিয়েছিল। ছেলেটির নাম ফৌকি এবং সে তার বন্ধু। ভেরিয়ার শহরমুখী পাহাড়ের ঢালে তাদের বাড়ী।

সে ফিরে আসতেই তার বাবা চেঁচিয়ে বলল—'অলস বদমাশ কোথাকার! এই যে এতকাল ধরে তোর পিছনে পয়সা ঢেলেছি তা' কোনদিন ফেরৎ দেওয়ার মতন ক্ষমতা তোকে ঈশ্বর দেবেন কি না জানি না! তোর এই জঘন্য কম্বল-টম্বল নিয়ে মেয়রের বাড়ি যা' চলে।'

মার খেতে হল না দেখে অবাক হয়ে জুলিয়ান তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। তারপর বাপের চোখের আড়াল হয়েই হাঁটার গতিবেগ কমিয়ে দিল। বিচার

করে দেখল যে, এখন যদি সে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যায় তবে তা' হবে ভণ্ডামি।

'ভণ্ডামি' কথাটা শুনে কি তুমি অবাক হচ্ছ? এ ভয়ঙ্কর কথাটার সাথে মোকাবিলা করার জন্যে এই চাষী ছেলেটিকে জীবনে বহু পথ যেতে হবে।

সিকসথ্ রেজিমেণ্টের কয়েকজন অশ্বারোহী সেনা ইতালি থেকে ফিরছিল, তাদের দেখে এই ছোকরা শৈশবেই ভেবেছিল বড় হয়ে সৈনিকের পেশা গ্রহণ করবে···সৈনিকদের পরনে ছিল সাদা আঙরাখা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, তার উপর লম্বা কালো ঘোড়ার চুলের চূড়া। সে দেখেছিল, তারা তার বাবার বাড়ীর জানালার লোহার শিকে ঘোড়াগুলোর লাগাম বাঁধছে। পরে সে আরকোলা শহরের লোদি সেতুর লড়াইয়ের কাহিনী শুনে মোহিত হয়ে গিয়েছিল, এ কাহিনী তাঁকে বলেছিলেন সেনাবাহিনীর সেই বুড়ো শল্য-চিকিৎসক··· বলবার সময় পদকটা দেখে বুড়োর হু'চোখ জ্বলে উঠেছিল।

জুলিয়ানের যখন বছর চোদ্দ বয়স তখন এই ছোট্ট শহরের পক্ষে জমকালো এক গীর্জা বানাতে শুরু করল শহরের লোকেরা। গীর্জার চারটে শ্বেত-পাথরের স্তম্ভ এবং বিশেষ করে এগুলো তাকে করেছিল বিস্মিত। তাছাড়া জেস্যুইটদের গুপ্তচর বলে প্রচারিত বেসানকন থেকে প্রেরিত তরুণ পাদরি আর 'জাস্টিস অফ দি পীসের' মধ্যে এ ব্যাপারটা নিয়ে যে মারাত্মক শক্রতা সুরু হয়েছিল সে-কথা সারা জেলায় খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'জাস্টিস অফ দি পীস' প্রায় তাঁর পদ হারাতে বসেছিলেন অথবা অন্ততঃ সেটাই ছিল সাধারণ মানুষদের ধারণা। লোকেরা বলাবলি করত যে, এই পাদরি প্রায় প্রত্যেক পনের দিন অন্তর বেসানকনে মহামান্য বিশপের সাথে দেখা করতে কি যেত যদি না সে অসম্মত হওয়ার সাহস দেখাত?

এসব যখন ঘটছিল তখন একটা বিশাল পরিবারের পিতা 'জাস্টিস অফ দি পীস' কতকগুলো শাস্তির হুকুম দিয়েছিল বাধ্য হয়ে যেগুলো স্পষ্টতই ছিল অন্যায়। শহরের যে সব অধিবাসী 'কনসটিটিউশন্যাল্' গ্রন্থখানি পড়েছিল তাদেরকেই এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। পাদরির দলের লোকেরা দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এটা সত্য যে, এই জরিমানার পরিমাণ ছিল তিন-চার ফ্রাঙ্ক। জুলিয়ানের ধর্মপিতা একজন পেরেক তৈরীর মজুরকেও এই জরিমানা দিতে হল। লোকটা রেগেমেগে বলল—'ভাগ্য কেমন বদলেছে! একবার ভাব ত, বিশ বছর ধরে এই 'জাস্টিস অফ দি পীস'-কে আমরা একজন সৎ লোক বলে মনে করে এসেছি!' ইতিমধ্যে জুলিয়ানের বন্ধু সেই সেনাবাহিনীর শল্য-চিকিৎসকও মারা গেছেন।

সহসা জুলিয়ান নেপোলিয়নের সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করল। সে পাদরি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং পাদরি তাকে লাটিন ভাষায় লেখা যে বাইবেলখানা ধার দিয়েছিলেন সেখানা নিয়ে তাকে সব সময় বাবার করাত-কারখানায় বসে মুখস্থ করতে দেখা গেল। এই সৎ বৃদ্ধটি পড়াশুনায় তার উন্নতি দেখে প্রতিদিন

সন্ধ্যাবেলায় তাকে ধর্মতত্ত্ব পড়াতে সুরু করলেন। এবং তাঁর সঙ্গ লাভ করায় জুলিয়ানের মনে ধর্মীয় আবেগ ছাড়া আর কোন আবেগের স্থান রইল না। কেই বা কল্পনা করেছে যে, তার এই এত বিবর্ণ আর মেয়েলি মুখে এত অনড় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার স্থান রয়েছে যা' সফলতা আহরণে অক্ষম হওয়ার চেয়ে হাজারবার মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে প্রস্তুত ?

জুলিয়ামের পক্ষে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে এই ভেরিয়ার শহর থেকে পলায়ন। তার জন্ম-শহরের উপর সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল, এখানে যা' কিছুই সে দেখে তাতেই তার রক্ত জমাট বেঁধে যায়। একেবারে শৈশবকাল থেকে সে পরম উদ্দীপনাময় মুহূর্তের স্বাদ লাভ করেছে। তারপর এটাই তার স্বপ্নে পরিণত হয়েছে যে, সে একদিন প্যারীর সুন্দরীদের সাথে পরিচিত হবে এবং কোন বিশেষ কৌশল বা অন্য কিছুর দ্বারা সে তাদের মন জয় করবে। তাদের একজন কেনই বা তাকে ভালবাসবে না যেমনভাবে দরিদ্র থাকার সময়ে বোনাপার্টকে প্রখ্যাত মহিলা 'মাদাম দ্য বোহারানাই' ভালবেসে-ছিলেন ? গত কয়েক বছর ধরে বোধ হয় একটা ঘণ্টাও সে অতিক্রম করতে পারে না এ কথা মনে মনে না ভেবে যে, অপরিচিত কপর্দকহীন এক লেফটন্যাণ্ট বোনাপার্ট তরবারির জোরে এই পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর দুঃখের দিনে এবং অতি সামান্য সুখের ক্ষণেও এই চিন্তা তাকে সান্ত্বনা দান করত।

গীর্জার অট্টালিকা নির্মাণ ও ম্যাজিস্ট্রেটের শাস্তি প্রদান তার জীবন-আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলল। শেষে তার মাথায় একটা মতলব ঢুকল এবং এই মতলবটা কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে পাগলা করে তুলল এবং অবশেষে এই মতলব তার মনে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হল যা' ভীষণ আবেগ-প্রবণ মন বিশ্বাস করে যে এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সে চিন্তা করে দেখল যে, লোকেরা যখন বোনাপার্টের কথা বলাবলি করছিল তখন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে সারা ফরাসীদেশ বাস করছিল। সামরিক শক্তি-ই ছিল গুরুতর প্রয়োজন...এবং সে সময় এটাই ছিল ফ্যাসান। আজকাল আমরা দেখছি যে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সী একজন পাদরি এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক বৃত্তি পায়...বলতে গেলে এটা হচ্ছে নেপোলিয়নের সবচেয়ে বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষের বেতনের তিনগুণ অর্থ। সমর্থন করবার মতন জনবল নিশ্চয় পাদরিদের পিছনে রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাস্টিস অফ দি পীসের কথা ভেবে দেখ যে, এমন সুন্দর, আজও পর্যন্ত সম্মানীয় এবং এত বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোক বছর ত্রিশ বয়সী একজন পাদরির বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে এমন অসম্মানজনক কাজ করে বসলেন। আমি নিশ্চয় একজন পাদরি হব।

ধর্মতত্ত্ব পাঠে তখন জুলিয়ান বছর দু'য়েক কাটিয়েছে, ঈশ্বরভক্তিকে সে সবে আবিষ্কার করতে পেরেছে, সে-সময় একদিন তার অন্তরের আগুন, যা' তাকে

ভিতরে ভিতরে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, সেই আগুনের বিস্ফোরণ ঘটল। মঁসিয়ে চেলানের বাড়ীতে সৎ পাদরিদের ভোজ-উৎসব হচ্ছিল, তিনি তাঁর সহকর্মী পাদরিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। মঁসিয়ে চেলান তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিদ্যার প্রতিভা হিসাবে। তখন নেপোলিয়নের অপরিমিত প্রশংসা করার জন্য তার মাথার ভিতরটা কিলবিল করে উঠেছিল। যেন দেবদারু গাছের গুঁড়ি সরাতে গিয়ে তার ডান হাতের হাড় সরে গেছে এমনিভাবে হাতখানা বুকের উপর ঝুলিয়ে নিয়েছিল জুলিয়ান এবং দু'মাস ধরে এমনিভাবে রেখেছিল। এমনিভাবে দৈহিক শাস্তি ভোগ করার পর জুলিয়ান নিজেকে ক্ষমা করতে পারল। এই হচ্ছে আঠার বছরের তরুণটির স্বভাব। দেহ তার এতই শীর্ণ যে তাকে দেখলে মনে হয় সতের বছরের ছেলে···এই মুহূর্তে বগলে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে সে ভেরিয়ার শহরের জমকালো গীর্জায় ঢুকছে।

গীর্জাটা অন্ধকার ও পরিত্যক্ত দেখল। তখন গীর্জায় উৎসবের দিন···প্রতিটি জানালা গাঢ় লাল কাপড়ের পর্দায় ঢাকা, রোদ ঢুকছে পর্দা ভেদ করে। আলোর ঝলমলে রূপ বড় মনোরম এবং যথেষ্ট ধর্মগুণসম্পন্ন। জুলিয়ানের দেহ সহসা কম্পিত হল। গীর্জায় সে একাই এসেছে, এগিয়ে গিয়ে সে পাদরিদের সবসেরা আসনে বসল···ওটার ওপর মঁসিয়ে দ্য রেনলের কুলমর্যাদার নকশা অঙ্কিত।

জুলিয়ান সহসা আসনের পায়ার কাছে একখণ্ড ছেঁড়া কাগজ দেখতে পেল; ছাপানো কাগজের টুকরোটা এমনভাবে রয়েছে যেন ওটা পড়ার জন্য। এক নজরে দেখল কাগজে লেখা···মৃত্যুদণ্ডের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং লুই জেনরেলের অন্তিম মুহূর্তগুলো, মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল বেসানকনে···।

কাগজের টুকরোটা ছেঁড়া। পরের পৃষ্ঠায় একটি সারির প্রথম শব্দগুলো··· প্রথম পদক্ষেপ···।

এখানে কে রাখল কাগজখানা? ভাবল জুলিয়ান। হতভাগা! সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল···আমারই মতন তারও নাম শেষ হয়েছে···এবং সে কাগজখানাকে দুমড়ে ফেলে দিল।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে জুলিয়ানের মনে হল পবিত্র জলাধারের পাশে সে খানিকটা রক্ত পড়ে থাকতে দেখল। খানিকটা পবিত্র জল চলকে পড়েছিল, জানালার লাল পর্দা চুঁইয়ে-আসা রোদের প্রতিফলনে জল লাল দেখাচ্ছে।

মনের মধ্যে গোপন ভয় অনুভব করে জুলিয়ান লজ্জায় মরে গেল। মনে মনে বলল···আমি কি তবে কাপুরুষ? অস্ত্র ধারণ কর!

বৃদ্ধ শল্য-চিকিৎসক যুদ্ধের কাহিনী বলার সময় এই শব্দগুলো এত বেশী আওড়াতেন যে, জুলিয়ানের কাছে এই শব্দগুলো এখন বীরত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে। সে লাফিয়ে উঠল এবং মঁসিয়ে দ্য রেনলের বাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল। তার মনের মধ্যে দুরন্ত সুন্দর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লজ্জা তার মনকে আচ্ছন্ন করল,

মাত্র বিশ ফুট দূরে বাড়ীখানা দেখে সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। মরচেপড়া লোহার গেটটা হু'হাট করে খোলা। ওটা যেন তার কাছে দারুণভাবে জমকালো। তথাপি ভিতরে যাওয়া তার অবশ্যই প্রয়োজন।

এ বাড়ীতে পৌছবার পর একমাত্র জুলিয়ানই বিচলিত নয়। মাদাম ত্ব রেনল এই অপরিচিতের কথা চিন্তা করে অতিমাত্রায় লজ্জা অনুভব করে বিহ্বল হলেন, কর্মের ধর্ম অনুযায়ী তাকে সব সময় তাঁর এবং তাঁর ছেলেদের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে থাকতে হবে। তাঁর শয়ন-ঘরে ছেলেদের নিয়ে শয়ন করতে তিনি অভ্যস্ত। সেদিন সকালে জলভরা চোখে তিনি দেখলেন যে, গৃহশিক্ষকের ঘরে ছেলেদের ছোট ছোট বিছানাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বৃথাই স্বামীর কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র স্ট্যানিসলাস জেভিয়ারের বিছানাটা তাঁর ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য।

মাদাম ত্ব রেনলের মধ্যে নারীসুলভ ইন্দ্রিয় অনুভূতি একটু বেশীমাত্রায় রয়েছে। তাঁর মানসনেত্রের সামনে এক অনভিপ্রেত, স্থূল ও রুক্ষমূর্তির ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠল। সে নিজে লাটিন জানে তাই ছেলেরা জঙ্গলি-ভাষা ব্যবহার করলে তাদের সরল ও সম্পূর্ণভাবে ধমক দেবে এবং ছেলেদের বেত মারবে।

৬ : একঘেয়েমি

আমি জানি না আমি কি,
জানি না করছিই বা কি।
—মোজার্ট

বসবার ঘর থেকে বাগানে যাওয়ার একটা 'ফ্রেঞ্চ উইনডো' খুলে মাদাম ত্ব রেনল কমনীয় ভঙ্গিতে এবং সজীব মনে বাগানে আসছিলেন এবং এই ভঙ্গিতে চলা-ফেরা করাই তাঁর স্বভাব...তখন কোনও পুরুষ-চোখ তাঁর উপর নিপতিত ছিল না...ঠিক তখনই দেখলেন একজন তরুণ কৃষক, প্রায় শিশু, সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল...তরুণের মুখে পাণ্ডুর রঙ এবং সাম্প্রতিক কান্নার দাগ বর্তমান। পরনে সাদা শার্ট এবং বগলের নীচে পরিচ্ছন্ন, নিভাঁজ, বেগুনী রঙের জ্যাকেট।

এই তরুণ কৃষকের গায়ের রঙ এত ফরসা এবং মুখখানায় এমন কমনীয় শান্তশ্রী যে, মাদাম রেনল প্রথম দর্শনেই ভাবলেন যে, হয়ত কোনও তরুণী ছদ্মবেশে মেয়রের কাছে এসেছে কোন অনুগ্রহ লাভের আশায়। আর পদক্ষেপে অক্ষম হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবং স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে দরজার ঘণ্টায় হাত ছোঁয়াবার সাহস নেই...এই দেখে হতভাগ্য তরুণের জন্য মাদামের মন অনুকম্পায় ভরে গেল। মাদাম ত্ব রেনল তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে গৃহশিক্ষকের আগমন উপলক্ষে সঞ্জাত তিক্ত দুঃখের ভাব উবে গেল। জুলিয়ানের মুখ দরজার দিকে ফেরান তাই সে তাঁর আগমন দেখতে পায় নি।

তার কানের কাছে একটা শান্ত স্বর শুনে সে চমকে গেল 'বাছা, কেন এখন এসেছ?'

জুলিয়ান দ্রুত ঘুরে মাদাম দ্য রেনলের কমনীয় মুখভাব দেখে অবাক হল এবং লজ্জার কিছু অংশ তার মন থেকে উবে গেল, এবং অচিরে তাঁর দেহসৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হল এবং এমন কি এখানে আসার কারণও গেল ভুলে। মাদাম দ্য রেনলকে আবার জিজ্ঞাসা করতে হল।

দু'চোখে জলের চিহ্ন অনেক চেষ্টা করেও মুছতে পারে নি এবং সেজন্যে দারুণ লজ্জিত হল জুলিয়ান। বলল—'এখানে গৃহশিক্ষক হতে এসেছি মাদাম।'

মাদাম দ্য রেনলের মুখ দিয়ে কথা সরল না। তারা খুব কাছাকাছি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সুসজ্জিতা শান্ত-বাচনভঙ্গি এবং সুন্দরী রূপসী মহিলার সাথে এর আগে কখনও জুলিয়ানের সাক্ষাৎ হয় নি। তিনি তার সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বললেন। ওর বড় বড় দু'চোখের জলের ফোঁটা গালের উপর স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখখানা এখন রক্তিম···মাদাম দ্য রেনল ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। বালিকাসুলভ দায়িত্বহীন হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল ভরে গেল। নিজের সুখের পরিমাণ আন্দাজ করতে না পেরেই যেন তিনি হেসে উঠলেন মনে মনে। কি! এই কি সেই গৃহশিক্ষক যার সম্পর্কে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, জঘন্য, অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত একজন পাদরি যে তাঁর ছেলেদের ধমক দেওয়ার জন্য ও বেত মারার জন্য আসছে!

অবশেষে তিনি বললেন—'কি মহাশয়, আপনি লাটিন জানেন?'

'মহাশয়' কথাটা শুনে জুলিয়ান এত বিস্মিত হয়ে পড়ল যে, সে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব রইল।

লাজুক মুখে বলল—'হাঁ, মাদাম!'

মাদাম দ্য রেনল এত আনন্দ অনুভব করলেন যে, তিনি সাহস করে জুলিয়ানকে বললেন—'এই হতভাগ্য ছেলেদের আপনি ধমক দেবেন না, দেবেন কি?'

অবাক হয়ে জুলিয়ান জবাব দিল—'আমি ধমকাব! কেন!'

ক্ষণেক নীরব থেকে আবেগে ভরপুর গলায় তিনি বললেন—'আপনি ওদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, করবেন না, মহাশয়? আমার কাছে শপথ করতে পারেন না!'

দ্বিতীয়বার আন্তরিকভাবে তাকে 'মহাশয়' বলে সম্ভাষণ করতে এবং সম্ভাষণ করলেন এমন একজন সুবেশা মহিলা···এটা জুলিয়ানের কাছে একেবারেই আশাতীত। তার তরুণমনের কল্পনায় স্পেনীয়দের যে সব দুর্গপ্রাসাদের কথা রঙীন হয়ে উঠেছে সেখানকার কোনও সত্যিকারের মহিলা সুন্দর সুবেশ পুরুষ ছাড়া আর কাউকে এমন সম্ভাষণ করে না। সে মনে মনে বলল। আর মাদাম দ্য রেনল দেখলেন এবং পরিপূর্ণভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন···জুলিয়ানের সুন্দর

ফরসা রঙ, তার ডাগর ডাগর কালো এক জোড়া চোখ, স্বভাবিকভাবে কোঁকড়া মাথা ভরা চুল—যেন এই মাত্র সে কোন ফোয়ারায় স্নান করে সতেজ হয়ে এসেছে। ছেলেদের পক্ষে এই গৃহশিক্ষকের প্রতিকূল ব্যবহার কল্পনা করে তার মনে যে বালিকাসুলভ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এখন তা' অমূলক দেখে এবং এই গৃহশিক্ষকের সাথে তার ভাগ্য বিজড়িত হয়েছে বুঝতে পেরে সে গভীর আনন্দ অনুভব করল। তার আশঙ্কা এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের মধ্যে এই যে গরমিল তা' মাদাম দ্য রেনলের শান্তিকামী স্বভাবের উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। অবশেষে বিস্ময়ের ভাব কাটল, তিনি দেখলেন যে, নিজের বাড়ীর দোরগোড়ায় তিনি দাঁড়িয়ে এবং কেবলমাত্র জামা গায়ে দিয়ে তাঁর খুব কাছে রয়েছে এক অপরিচিত তরুণ।

ঈষৎ লাজুকমুখে তিনি তাকে বললেন—'আমরা ভিতরে যাব, মহাশয় ?'

পরিপূর্ণ আনন্দের আবেগে মাদাম দ্য রেনল সারা জীবনে কখনও এমন গভীর-ভাবে বিচলিত হন নি। এমন করুণাঘন দৃশ্য কখনও শান্তিবিঘ্নকারী ভয়কে বিদূরিত করতে সফল হয় নি। তার সুন্দর ছেলেরা যাদের প্রতি সে সস্নেহ যত্ন নেয়, তারা একটা নোঙরা এবং অনভিপ্রেত পাদরির হাতে পড়বে না।

দরদালানে ঢোকবার মুখেই সে জুলিয়ানের দিকে ফিরে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে তাকে অনুসরণ করছিল জুলিয়ান। এমন সুন্দর বাড়ী দেখে তার দু'চোখে বিস্ময়-চিহ্ন, মাদাম দ্য রেনলেন দৃষ্টির লাবণ্য আরও বর্ধিত হল। ওই দুটো চোখ ভুলতে পারলেন না মাদাম; তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল যে, এমন গৃহ-শিক্ষকের কালো-রঙের পোশাক পরা প্রয়োজন।

'মহাশয়, এটা কি সত্য যে, আপনি লাটিন ভাল জানেন ?' তিনি বলে উঠলেন। এমন সুখানুভূতি তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাই একটা আশঙ্কা দেখা দিতে তিনি সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তাঁর কথায় তার অহমিকায় আঘাত লাগল, পনের মিনিট ধরে তার নীরব মনের পাথর ভেঙে গেল।

উদাসীন হওয়ার চেষ্টা করে সে জবাব দিল—'হাঁ মাদাম। মহামান্য পাদরির মতন আমিও লাটিন জানি। তিনি খুব সৎ তাই মাঝে মাঝে স্বীকার করেন যে, আমি তাঁর চেয়েও ভাল জানি।'

সহসা মাদাম দ্য রেনলের মনে হল যে, জুলিয়ান খুব বদমেজাজী। সে তাঁর কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাদাম তার কাছে এগিয়ে গেলেন। ফিস ফিস করে বললেন—'তারা যদি পড়া নাও করতে পারে তবুও প্রথম কয়েক দিন আমার ছেলেদের আপনি বেত মারবেন না, মারবেন কি ?'

এমন রূপসী মহিলার কণ্ঠ থেকে এমন শান্ত এবং সানুনয় অনুরোধ বেরিয়ে আসছে শুনে জুলিয়ান লাটিন ভাষায় নিজের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেই মুহূর্তে ভুলে গেল। মাদাম দ্য রেনলের মুখ একেবারে তার মুখের সামনে। নারীদেহের

গ্রীষ্ম পোশাকের সুমিষ্ট সুবাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে···তার মতন সামান্য চাষীর জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। তার সারা দেহ শরমে হল রক্তিম, দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং দ্বিধাগ্রস্তকণ্ঠে তাঁকে বলল—'ভয় পাবেন না মাদাম। আপনার সব ইচ্ছা আমি মেনে চলব।'

যখন সন্তানদের জন্য তাঁর মনের উদ্বিগ্নভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হল, মাদাম দ্য রেনল কেবলমাত্র তখনই জুলিয়ানের অসাধারণ শান্ত-দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হলেন। তার লজ্জাবনত ব্যবহার এবং নারী-সুলভ দৈহিক কমনীয় আচরণ তাঁর মতন অতিমাত্রায় লাজুক নারীর কাছেও হাস্যকর বলে প্রতিভাত হল না। যে বীর্যবান কর্মশক্তি পুরুষ-দেহের সৌন্দর্যের জন্য প্রয়োজন বলে সাধারণভাবে বিবেচিত হয় তা কেবল তাঁর মনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত।

'আপনার কত বয়স, মহাশয় ?' তিনি জুলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'খুব শীঘ্রই উনিশ হবে।'

পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হলেন মাদাম দ্য রেনল। বললেন—'আমার বড় ছেলের বয়স এগার। সে আপনার সঙ্গী হতে পারবে। আপনি তার সঙ্গে গল্প করতে পারবেন। একবার তার বাবা তাকে বেত মেরেছিলেন, অবশ্য খুব মৃদু প্রহার, তবু তার জন্যে আমার ছেলে পুরো এক সপ্তাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।'

জুলিয়ান ভাবল, আমার সাথে ওদের কত পার্থক্য! গতকালই আমার বাবা আমাকে মারধোর করেছে। ধনীরা কত ভাগ্যবান!

গৃহশিক্ষকের মনের পটে যে সুন্দর ছায়ারা আনাগোনা করছে মাদাম রেনল তা' যেন ইতিমধ্যে আন্দাজ করতে পারছেন। তাঁর ধারণা হল বিষণ্ণতার বেগবান আবেগ লাজুকতায় পরিণত হচ্ছে, তাকে সাহস দেওয়ার জন্য তাই তিনি ব্যগ্র হলেন।

'কি নাম আপনার, মহাশয় ?' এমন সুমিষ্ট আর কমনীয় কণ্ঠে তিনি কেন শুধালেন তার কারণের হদিস খুঁজে পেলেন না মাদাম।

'মাদাম, আমার নাম জুলিয়ান সোরেল। জীবনে এই প্রথম এক অপরিচিত বাড়ীর মধ্যে আমি প্রবেশ করলাম, তাই আমার পা কাঁপছিল। আপনার আশ্রয় আমার একান্ত প্রয়োজন, প্রথম কয়েকদিন আমার কাজের জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। কখনও আমি স্কুলে পড়ি নি—খুব গরীব আমি। মঁসিয়ে চেলান এবং আমার আত্মীয়-ভাই সেনাবাহিনীর শল্য-চিকিৎসক ছাড়া আর কারো সাথে আমি কখনও কথা বলি নি। তিনি আমার সম্পর্কে আপনাকে বলতে পারবেন। আমার দাদারা আমাকে অনবরত মারধোর করত···তারা আমার সম্বন্ধে নিন্দা করলে বিশ্বাস করবেন না।'

মাদাম দ্য রেনলের মনোভাব বুঝতে এই দীর্ঘ বক্তৃতা-ঢঙে কথাগুলো বলল জুলিয়ান এবং নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেল। বিশেষভাবে যাকে ভাল লাগে তার মধ্যেকার গুণগুলো সম্বন্ধে যদি পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকে এবং সেটা যদি

তার স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয় তবে প্রকৃত লাবণ্যের এটাই হয় ফলশ্রুতি। নারী-সৌন্দর্যের একজন বিচক্ষণ বিচারক জুলিয়ান তাই সেই মুহূর্তে তার ধারণা হল যে, তাঁর বয়স কুড়ির বেশী নয়। এবং তখনি তাঁর হস্ত চুম্বনের এক দারুণ ইচ্ছা জাগল তার মনে; কিন্তু তার মনে ভয়ের এক দ্রুত শিহরণ স্পন্দিত হল। এক মুহূর্ত পরেই সে মনে মনে আওড়াল; আত্মসেবার জন্য একাজ করা তার পক্ষে কাপুরুষোচিত হলেও এই রূপসী মহিলা করাত-কারখানা থেকে তার মতন একজন নগণ্য মজুরকে ধরে আনার জন্য যে লজ্জা অনুভব করছেন তার কিছুটা হয় ত অপনোদন হত। বিগত ছ'মাস ধরে প্রতি রবিবার অসংখ্য যুবতী যে তাকে সুশ্রী, সুদর্শন বালক বলে তা শুনে জুলিয়ান বোধ হয় মনে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে।

সারাক্ষণ ধরে এই বিতর্ক তার মনের মধ্যে ঘুরছিল, কিভাবে তাঁর ছেলেদের সাথে আচরণ করতে হবে আসতে আসতে মাদাম দ্য রেনল তা তাকে বলছিলেন। নিজের মনের উপর এই ভয়ানক অস্বাভাবিকতা আরোপ করার ফলে জুলিয়ানের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'মাদাম, কখনও আমি আপনার ছেলেদের মারধোর করব না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।'

এই কথা আওড়াবার সময় সে সাহস করে মাদাম দ্য রেনলের হাত ধরে তার ঠোঁটের কাছে তুলল। এই ব্যবহারে তিনি অবাক হলেন এবং দ্বিতীয়বার চিন্তায় তাঁর সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। আবহাওয়া বড় গরম। অঙ্গাবরণ শালের নীচে তাঁর হাত-দু'খানা তাই নগ্ন এবং জুলিয়ানের ঠোঁটের কাছে তুলে আনার ফলে হাতের ঢাকা পুরোপুরি সরে গেল। দু'এক সেকেণ্ড পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাগ প্রকাশ না করার জন্য তিনি নিজেকে দোষারোপ করলেন।

কোন একজনকে কথা বলতে শুনে মঁসিয়ে দ্য রেনল তাঁর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শহরের টাউন-হলে কোনও বিবাহ সভায় যেভাবে পিতৃসুলভ এবং মহান গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহার করেন তেমনিভাবে জুলিয়ানকে বললেন—'ছেলেদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটবার আগে তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

তিনি জুলিয়ানকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও সঙ্গে নিলেন, যদিও তাঁর স্ত্রী চলে যেতে ব্যগ্র ছিলেন। দরজা বন্ধ করে মঁসিয়ে গম্ভীরভাবে একখানা চেয়ারে বসলেন।

'পাদরি বলেছেন, তুমি খুব স্থিরচিত্ত এবং চরিত্রবান। এখানে সবাই তোমার সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করবে। আমি নিজেও তোমার ব্যবহারে খুশি। এর পর তুমি নিজেই যাতে ব্যবসা করতে পার তার ব্যবস্থা করে দেব। আর তুম তোমার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা মেলামেশা করো তা' আমি চাই না। তাদের জীবন-ধারণ প্রণালীর সাথে আমার ছেলেদের মিল হবে না। তোমার প্রথম মাসের বেতন এই ছত্রিশ ফ্রাঙ্ক, কিন্তু আমার কাছে শপথ করো যে, এর এক কপর্দ্দকও তুমি তোমার বাবার হাতে দেবে না।'

সেই বৃদ্ধের সাথে মঁসিয়ে ছ রেনলের সাক্ষাৎকার তখনও তাঁর মনে পীড়া দিচ্ছিল। এ ব্যাপারে তিনি আরও বেশী কঠিন হয়ে উঠেছেন।

'এখানে সকলে তোমাকে 'স্যার' বলে যাতে সম্বোধন করে সেই হুকুম আমি দিয়েছি। একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভদ্র-ব্যবহার পাওয়ার সুযোগ তুমি অনুভব করবে। এখন, স্যার, কেবলমাত্র জামা-পরা অবস্থায় ছেলেদের সাথে তোমার দেখা হওয়া উপযুক্ত কাজ হবে না। আচ্ছা, চাকর-বাকরদের কারো সাথে কি এর দেখা হয়েছে?' মঁসিয়ে ছ রেনল স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

খুব চিন্তিত মনে মাদাম জবাব দিলেন—'না গো।'

বিস্মিত যুবককে নিজের একটা পোশাকি কোট দিয়ে বললেন—'ভালই হয়েছে। এটা পরে নাও। আমরা এখন পোশাক-ব্যবসায়ী মঁসিয়ে ডুরাণ্ডের কাছে যাব।'

এক ঘণ্টা পরে নতুন গৃহশিক্ষককে আপাদমস্তক কালো পোশাকে সুসজ্জিত করে নিয়ে মঁসিয়ে ছ রেনল বাড়ী ফিরলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী ঠিক সেই একই অবস্থায় একই জায়গায় বসে আছেন। জুলিয়ানের উপস্থিতিতে তাঁর চিত্ত আবার সুস্থির হল, তাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করার পর তার সম্বন্ধে তাঁর মনের ভয় দূর হল। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ভাববার অবকাশ জুলিয়ানের নেই। এটার কারণ ভাগ্য এবং মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তার বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব। এই মুহূর্তে সে শিশু-সুলভ মনের অধিকারী। ঘণ্টা তিনেক আগে সে গীর্জায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আর এখন সে এখানে—মনে হচ্ছে যেন কত বছর পার হয়ে গেছে। সে লক্ষ্য করল, মাদাম উদাসীনভাবে তাকে এড়িয়ে চলছেন, এবং তার মনে হল, সহসা তাঁর হস্ত-চুম্বনের জন্য হয়ত তিনি রুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের পোশাক পরতে অভ্যস্ত তার থেকে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরে তার মনে গর্বের ভাব জন্মেছে, আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সেই আনন্দের অনভূতিকে সে গোপন করতে ব্যগ্র কারণ তার মনে হচ্ছে তার চলনে একটা অশিষ্ট ভাব ফুটে উঠছে। মাদাম ছ রেনল অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

মঁসিয়ে ছ রেনল তাকে সাবধান করে দিলেন—'আমার ছেলেদের এবং চাকর-বাকরদের শ্রদ্ধা যদি লাভ করতে চাও তবে আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ করবে।'

জুলিয়ান জবাব দিল—'স্যার, এই পোশাকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমাদের মতন গরীব কৃষকরা জ্যাকেট ছাড়া আর কিছুই পরে না। আজ ছুটির দিন, আমি নিজের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি।'

মঁসিয়ে ছ রেনল তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাদের এই অর্জিত দ্রব্যটি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?'

সহজাত আবেগ, আবার এ সম্বন্ধে চেতনার অভাবের জন্যও বটে মাদাম তাঁর মনের ভাব তাঁর স্বামীর কাছে অপ্রকাশিত রাখলেন।

তিনি বললেন—'দেখ, এই চাষী ছেলেটির জন্য তুমি যতটা খুশি আমি ততটা

নই। তোমার সদয় ব্যবহারে ও লাই পেয়ে মাথায় উঠবে, এবং মাসখানেকের মধ্যেই তুমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে।'

'ঠিক আছে, তখন আমরা তাকে ছাড়িয়ে দেব। আমার এর জন্য মাত্র একশ' ফ্রাঙ্ক খরচ হবে। কিন্তু ততদিনে ভেরিয়ার শহরের লোকেরা দেখবে যে, মঁসিয়ে ছ্য রেনলের ছেলেরা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করে। জুলিয়ান যদি মজুরের পোশাক পরে থাকত তবে আমি এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম না। যখন তাকে ছাড়িয়ে দেব তখন পোশাকওয়ালার কাছে যে কালো পোশাকটা ওর জন্যে তৈরী করতে দিয়েছি সেটা ওকে দেব না, রেখে দেব। শুধু এই রেডিমেড পোশাকটা পরে ও চলে যাবে।'

জুলিয়ান যে এক ঘণ্টা নিজের ঘরে কাটাল মাদাম ছ্য রেনলের কাছে তা' যেন মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত মনে হল। ছেলেরা তাদের নতুন গৃহশিক্ষকের আগমন-বার্তা শুনেছিল, তারা মাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলল। অবশেষে জুলিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল···একেবারে যেন ভিন্ন মানুষ। একথা বলা ভুল হবে যে তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল; তার মধ্যে যেন গাম্ভীর্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছেলেদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল এবং সে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে সুরু করল যে, মঁসিয়ে ছ্য রেনল বিস্মিত হলেন।

কথার শেষে জুলিয়ান বলল—'ভদ্র-যুবকগণ, আমি তোমাদের লাটিন ভাষা শেখাতে এসেছি। পাঠ বলতে কি বোঝায় তা' তোমরা জান। এই দেখ একখানা পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ।' সে কালো মলাটে মোড়া ছোট আকারের একখানা বাইবেল হাতে নিয়ে দেখাল—'আমাদের প্রভু যীশু খৃস্টের জীবনী এই গ্রন্থে গ্রথিত এবং এই অংশের নাম নিউ টেস্টামেণ্ট। আমি মাঝে মাঝে এই গ্রন্থ থেকে তোমাদের আবৃত্তি করে শোনাতে বলব, এখন আমি আবৃত্তি করছি, শোন।'

বড় ছেলে এ্যাডলফি বইখানা হাতে নিল।

জুলিয়ান বলতে লাগল—'ইচ্ছা মতন যে কোন পাতা খুলে কোন অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দটা আমাকে বল। এই পবিত্র গ্রন্থ প্রতিটি মানুষের চরিত্র গঠন করছে। আমি এই গ্রন্থ থেকে যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ আবৃত্তি করব।'

এ্যাডলফি গ্রন্থের একখানা পৃষ্ঠা খুলে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, অমনি খুব সহজভাবে জুলিয়ান সমগ্র পাতার লেখাগুলো আবৃত্তি করল যেন সে ফরাসী ভাষা পড়ছে। মঁসিয়ে ছ্য রেনল বিজয়ীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাদের বাবা-মাকে বিস্মিত দেখে ছেলেরা অবাক দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। একজন চাকর এসে দাঁড়াল বসবার ঘরের দোরগোড়ায়···জুলিয়ান তখনও আবৃত্তি করছে। প্রথমে চাকরটা কাঠের পুতুলের মতন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অদৃশ্য হল। অচিরে মাদাম ছ্য রেনলের ঝি এবং পাচিকা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে এ্যাডলফি গ্রন্থের আটখানা বিভিন্ন পৃষ্ঠা উল্টেছে, এবং জুলিয়ান সেই একই রকম সহজভাবে আবৃত্তি করছিল।

পাচিকা একজন সৎ-স্বভাবের ধর্মপরায়ণা যুবতী। সে বলল—'ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন! আহা! কি সুন্দর ক্ষুদে পাদরি!'

মঁসিয়ে গু রেনলের আত্মসম্মানে সামান্য আঘাত লাগল। গৃহশিক্ষককে পরীক্ষা করার কোনও রকম ইচ্ছাই তাঁর মনে দেখা দিল না, তিনি তাঁর মগজ হাতড়ে একটা লাটিন শব্দগুচ্ছ মনে করতে চেষ্টা করছিলেন এবং অবশেষে হোরেসের একটা কবিতা তাঁর মনে পড়ল। জুলিয়ান বাইবেল ছাড়া আর কোনও লাটিন গ্রন্থ পড়ে নি। সে ভুরু কুঁচকে জবাব দিল—'পবিত্র গীর্জার কাছে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, ওরকম অপবিত্র কবির লেখা আমার পাঠ করা বারণ।'

হোরেসের কাব্যগ্রন্থ থেকে মঁসিয়ে গু রেনল আরও কিছুটা অংশ আবৃত্তি করলেন। ছেলেদের কাছে তিনি হোরেসের জীবনী বললেন, কিন্তু হতবাক ছেলেরা তাঁর কথা যেন শুনতেই পেল না। তারা শুধু জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে ছিল।

চাকর-বাকররা তখন দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাই জুলিয়ান ভাবল যে, আরও কিছুটা অংশ আবৃত্তি করতে সে বাধ্য। তাই সে ছোট ছেলেকে বলল—'মাস্টার স্ট্যানিস্লাস জেভিয়ার, এবার তুমি আমাকে পবিত্র গ্রন্থ থেকে একটা অংশ নির্বাচন করে দাও, আবৃত্তি করব।'

ক্ষুদে স্ট্যানিস্লাস মনে মনে দারুণ গর্বে ফুলে উঠল। কম-বেশী সঠিকভাবে একটা অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করল এবং জুলিয়ান সমগ্র পৃষ্ঠাখানা আবৃত্তি করল। যেন মঁসিয়ে গু রেনলের জয়গৌরব সম্পূর্ণ করার জন্যই সেই সুন্দর নরম্যান ঘোড়াদের মালিক মঁসিয়ে ভালেনদ এবং জেলার সহকারী শাসক মঁসিয়ে চারকট গু মগিরন এসে হাজির হলেন···জুলিয়ান তখনও আবৃত্তি করছিলেন। এই ঘটনায় জুলিয়ান 'স্যার' নামে অভিহিত হওয়ার অধিকার অর্জন করল এবং এমনকি চাকররাও তার প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ভেরিয়ার শহরের অনেকেই মঁসিয়ে গু রেনলের সম্পদ দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে এসে ভিড় করল। জুলিয়ান বিষণ্ণভাবে 'প্রশ্নের জবাব দিয়ে সকলের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল। অল্পদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি চারধারে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে মঁসিয়ে গু রেনলের ভয় হল যে, কেউ হয়ত তাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তাই জুলিয়ানের কাছে তিনি দু'বছরের জন্য শর্তের প্রস্তাব করলেন।

জুলিয়ান নিস্পৃহকণ্ঠে বলল—'না স্যার! আপনি যদি আমাকে ছাড়াতে চান ত আমাকে চলে যেতে হবে। যেভাবেই হোক আমাকে আপনি যে চুক্তির দ্বারা বাঁধতে চাইছেন তা' সম-শর্ত নয়, এমন চুক্তি আমি করতে চাই না।'

জুলিয়ান সব কিছুই এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করল যে, তার এবাড়ীতে আসার মাসখানেক পর থেকেই মঁসিয়ে গু রেনল নিজেই তাকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন।

এবং যেহেতু পাদরির সঙ্গে মঁসিয়ে ছা রেনল ও মঁসিয়ে ভালেনদের মনোমালিন্য হয়েছিল, তাই জুলিয়ানের মাথায় আগে থেকেই নেপোলিয়নের প্রতি অনুরাগের যে-ঝোঁক ছিল তা' কেউ দূর করে দিল না। সে নিজেই শুধু মাঝে মাঝে আতঙ্কের সাথে নেপোলিয়ানের কথা উল্লেখ করত।

৭ : ঐচ্ছিক আসক্তি

> আঘাত না করে অন্তর স্পর্শ
> করতে তারা জানে না।
> —আধুনিক লেখক

ছেলেরা তাকে পূজো করত ; তার দিক দিয়ে তাদেরকে সে ভালবাসে না··· তার মন অন্যত্র বাঁধা। কোনভাবেই কোন কিছু করে ফচকে ছোঁড়ারা তার মনের একাগ্রতা ভাঙতে পারে নি। নিস্পৃহ সুবিবেচক, আবেগহীন এবং কারো চেয়ে কম প্রিয় নয়···তার আগমনে এ বাড়ীর একঘেয়েমিভাব বিদূরিত হয়েছে, এবং সে হয়ে উঠেছে একজন ভারি খাসা গৃহশিক্ষক। মাঝে মাঝে যে সব বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং সে মিশতে বাধ্য হয় তাদের উপর তার মনে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা জমা হয়ে আছে···যদিও সে টেবিলের একদম শেষ প্রান্তে উপবেশন করে এবং সত্যিই এটা তার মনের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা ব্যাখ্যা করছে। কতকগুলো অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজ উৎসব হলে তার চারধারের বস্তুগুলোর সম্পর্কে তার মনের বিদ্বেষ সে সংযত করতে পারে না। একবার সেণ্ট লুইয়ের স্মরণে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তখন মঁসিয়ে ভালেনদ ছিলেন সবার আগে, শ্রদ্ধায় তিনি যেন বিগলিত হয়ে পড়েছিলেন। জুলিয়ান ছেলেরা কি করছে দেখবার ওজোর তুলে বাগানে পালিয়ে এল।

মনে মনে সে ব্যাখ্যা খোঁজে কেমন করে অমন নিষ্ঠার সঙ্গে ওরা তাঁর প্রশংসা-সঙ্গীত গাইছে। তোমার ধারণা হবে বুঝি এটাই ওদের চরিত্রের একমাত্র অনুরাগ। দরিদ্র-সেবার জন্য গচ্ছিত অর্থ-ভাণ্ডারের দায়িত্ব যার হাতে দেওয়া হয়েছে সেই লোক যখন সেই অর্থ সরিয়ে দু'গুণ, তিনগুণ মুনাফা অর্জন করে ধনী হয়ে উঠেছে সেই লোককে কি করে শ্রদ্ধা দেখাবে অন্যেরা! মনে হয় লোকটা দুঃখী অনাথ শিশুদের জন্য গচ্ছিত অর্থও আত্মসাৎ করে, অথচ এই দুঃখী শিশুরা অন্য দুঃখী লোকদের চেয়ে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত। এবং ওর সম্বন্ধে এ কথা আমি বাজী ফেলে বলতে পারি। আঃ শয়তান! শয়তান! আমি নিজেও ত একজন অনাথ শিশু···কেননা আমার বাবা, দাদারা এবং সমগ্র পরিবারের লোকজনেরা আমাকে ঘৃণা করে।

সেণ্ট লুই স্মরণে ভোজের কয়েকদিন আগে কোরস্ ছা ফিডেলিতের ধারে বেলভেডর নামক ছোট একটা বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে জুলিয়ান তার দৈনিক প্রার্থনা পুস্তক থেকে প্রার্থনা-সঙ্গীত সোচ্চারে আবৃত্তি করছিল,

এমন সময় সে তার দাদাদের একটা গলিপথ দিয়ে তার দিকে আসতে দেখল। সে সব সময় তার দাদাদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। ভাইয়ের পরিচ্ছন্ন চেহারা, পরনের সুন্দর কালো স্যুট্ এবং মুখে তাদের প্রতি অনুকম্পার প্রকাশ দেখে তার দাদাদের মনে দারুণ হিংসা জন্মাল এবং তারা তাকে ভীষণভাবে মারধোর করে তার রক্তাপ্লুত ও অচেতন দেহ বনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল।

সহকারী শাসক এবং মঁসিয়ে ভালেনদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মাদাম ছ্য রেনল সেই বনের মধ্যে এসে পড়লেন এবং জুলিয়ানের দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন যে, সে মারা গেছে। তার এই অবস্থা দেখে তিনি এত আঘাত পেলেন যে, তা' মঁসিয়ে ভালেনদের মনে প্রতিহিংসা সৃষ্টি করল।

অল্প দিনেই সে সশঙ্কিত হয়ে উঠল। জুলিয়ান দেখল, মাদাম ছ্য রেনল অপূর্ব রূপসী, কিন্তু এই রূপের জন্যই সে তাঁকে ঘৃণা করে···কেননা তাঁর রূপের প্রবাল-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তার চরিত্রের জাহাজখানা ডুবতে চলেছে। সেই প্রথম দিন প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁর হস্ত চুম্বন করে যে পরমানন্দ সে লাভ করেছিল সেই স্মৃতি ভোলবার জন্যে জুলিয়ান যতটা সম্ভব তাঁর সাথে কম কথা বলে।

মাদাম ছ্য রেনলের ঝি এলিসা এই তরুণ গৃহশিক্ষকের প্রেমে পড়েছিল তাই কর্ত্রীর কাছে সে তার সম্বন্ধে নানা কথা বলত। তার প্রতি কুমারী এলিসার এই প্রেম একজন উর্দিপরা অনুচরের মনে জুলিয়ানের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করল। জুলিয়ান একদিন শুনল সেই অনুচরটি এলিসাকে বলছে: 'ওই তেল-চকচকে গৃহশিক্ষকটা এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তুমি আর আমার সাথে কথা বল না।' এ ধরনের অসম্মান জুলিয়ান পছন্দ করে না, কিন্তু একজন সুশ্রী তরুণ হিসেবে তার মন গর্বে ফুলে উঠল এবং ব্যক্তিগত চলনের দিকে সে আরও বেশী নজর দিল। তার প্রতি মঁসিয়ে ভালেনদের ঘৃণা আরও তীব্র হল। সে খোলাখুলি বলতে লাগল যে, একজন তরুণ পাদরির পক্ষে এ ধরনের বাবুগিরি শিষ্টাচারহীন আচরণ। যদিও জুলিয়ান খ্রীস্টিয় যাজকদের পোশাক ক্যাসক পরে না তবুও পাদরিরা যে ধরনের পোশাক পরতে অভ্যস্ত সে তাই পরিধান করে।

মাদাম ছ্য রেনলের নজরে পড়ল যে, জুলিয়ান স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে প্রায়ই কুমারী এলিসার সাথে কথা বলছে এবং বলছে তার পোশাকের আলমারির দুরবস্থা সম্পর্কে। তার পোশাক-পরিচ্ছদের সংখ্যা এত কম যে ঘন ঘন তাকে সেগুলো বাইরে থেকে ধুইয়ে আনতে হয় এবং এই সামান্য ব্যাপারে এলিসা তাকে সাহায্য করে। মাদাম ছ্য রেনল তার এই তীব্র অভাবের জন্য মনে আঘাত পেলেন, তিনি এটা একেবারেই সন্দেহ করেন নি। অনেক দিন ধরেই তাকে ছোট-খাট দু'একটা উপহার দেওয়ার কথা ভাবতেন মাদাম, কিন্তু দেওয়ার সাহস তাঁর হয় নি। জুলিয়ানের ব্যাপারে তাঁর অনুভব এবং মনের বিরোধিতার জন্য তিনি প্রথম যন্ত্রণার স্বাদ লাভ করলেন। এর আগে পর্যন্ত জুলিয়ান তাঁর কাছে

পবিত্র এবং স্বর্গীয় আনন্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রতিভাত ছিল। এই দারিদ্র্যের চিন্তায় অস্থির হয়ে তিনি স্বামীকে অনুরোধ করলেন তাকে আরও কিছু পরিচ্ছদ উপহার দিতে।

তিনি জবাব দিলেন—'কি অসঙ্গত ধারণা! কি! যে মানুষটার কাছে আমরা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত এবং যে আমাদের ভালভাবে সেবা করছে তাকেই দিতে হবে উপহার? যদি সে ব্যক্তিগত আচরণের দিকে অবহেলা করে তখনই তার উদ্যমে উৎসাহ দেওয়ার সময় হবে।'

ঘটনার এভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মাদাম দ্য রেনল অপমানিত বোধ করলেন, যদিও জুলিয়ানের আসবার আগে এমন বোধ তাঁর হয় নি। পাদরি যুবকের পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা দেখে তিনি কখনও তার তীব্র অভাবের ধারণা করতে পারেন নি: 'হতভাগ্য যুবক এটা নির্বাহ করে কেমনভাবে? জুলিয়ানের অভাবের জন্য তাই তার উপর মাদামের অনুকম্পা হয়, আঘাতের কথা ভুলে যান।

মাদাম দ্য রেনলের মতন মেয়েদের দেশে দেশে দেখা যায়…এরকম মেয়েদের সাথে পরিচিত হওয়ার পনের দিনের মধ্যেই তাকে স্রেফ বোকা বলে মনে হবে। জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্য অভিজ্ঞতা তার আছে এবং কথোপকথনের ক্ষমতাও সীমিত। সংবেদনশীল এবং অহঙ্কারী রুচিশীল মেজাজের তিনি অধিকারিণী। সহজাত মানবিক স্বাভাবিক সুখ আহরণের প্রবণতা তাঁর মনে। ঘটনা সম্পাতে এবং ভাগ্যের ফলে যে স্থূল, রুচিহীন পরিবেশে পড়েছেন সে-দিকে বেশীর ভাগ সময় তিনি এড়িয়ে চলেন।

যদি তাঁর মধ্যে শিক্ষার ধার থাকত তবে এই স্বতঃস্ফূর্তভাব এবং মনের সজীবতা তাঁকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে তুলত। কিন্তু তিনি একজন উত্তরাধিকারিণী তাই পবিত্র হৃদয়ের পূজারিণী সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন এবং তাই জেসুইটদের শত্রু ফরাসীদের প্রতি দারুণ বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। রুচিহীন বহু জিনিস ভোলবার গুণ আছে মাদাম দ্য রেনলের, এ সব শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন কনভেণ্টে। কিন্তু এর বেশী কিছু আহরণ করার বা জানার ক্ষমতা তাঁর নেই।

যেহেতু তিনি এক বিশাল সম্পদের অধিকারিণী তাই শৈশব থেকেই তাঁকে বহু প্রশংসা এবং পরিচর্যা করা হত এবং নানা ধর্মীয় শিক্ষার ফলে তিনি আত্ম-সুখী হয়ে উঠেছেন। বাইরে তিনি সম্পূর্ণ বশ্যতা প্রদর্শন করেছেন এবং আত্মসমর্পণ করেছেন ইচ্ছার কাছে যা' দেখে ভেরিয়ার শহরের স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে এবং এর জন্য মঁসিয়ে দ্য রেনল দারুণ উল্লসিত। অথচ তাঁর অন্তর-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এক সদাশয় মেজাজের শাসনে। অনেক রাজকুমারী তাদের প্রেমিক-পুরুষরা তাদের ঘিরে যে সব কীর্তিকলাপ করে থাকে সে সব এই মিষ্ট স্বভাবের ও আপাত-দৃষ্টিতে নম্র আচরণের নারী তার স্বামীর কাজ ও কথা যতটা সমর্থন করে তার চেয়েও বেশী সমর্থন জানায়; অনেক বেশী

গর্ব অনুভব করে। জুলিয়ান এ বাড়ীতে আসবার আগে সত্য সত্যই তিনি তাঁর ছেলেদের দিকেই কেবল খুব নজর দিতেন। তাদের ছোটখাট অসুস্থতা, তাদের দুঃখ, তাদের ছেলেমানুষি খুশি তাঁর মনের সবটা, সব অনুভবশক্তি অধিকার করে রাখত। বেসানকন শহরের পবিত্র অন্তর নামক কনভেণ্টে পড়ার সময় থেকে সারা জীবন তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে পূজা করেন না।

যদি তাঁর কোনও ছেলের জ্বরজারি হত তবে তাঁর মনের অবস্থা হত যেন ছেলেটি মারা গেছে এবং কাউকে তিনি এ কথা বলতেও পারতেন না। এই ধরনের বিপদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা মন খুলে বলবার প্রয়োজন হলে তিনি বিবাহের প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর তাঁর স্বামীর কাছে বললেই তাঁর স্বামী সজোরে এবং কর্কশভাবে হেসে উঠতেন, কাঁধ নাচাতেন কিংবা নারীমনের বোকামি সম্পর্কে উদাহরণ দিতেন। এই ধরনের রসিকতা, বিশেষ করে ছেলেদের অসুখ সম্বন্ধে যখন তাঁর স্বামী করতেন তখন যেন মাদাম দ্য রেনলের বুকে ছোরা বসিয়ে ঘোরানো হত। এগুলো যেন শৈশবে জেসুইট কনভেণ্টে যে-সব আনুগত্য ও সুমধুর প্রশংসাবাক্য লাভ করেছিলেন তারই স্থান দখল করত। তিনি দুঃখের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বান্ধবী মাদাম দারভিলের কাছে এসব উল্লেখ করতে তার অহঙ্কারী-মন বাধা সৃষ্টি করত, কারণ সব পুরুষই তাঁর স্বামীর মতন, সবাই মঁসিয়ে ভালেনদ অথবা সহকারী শাসক চারকট দ্য মজিরনের সমগোত্রীয়। অর্থ, উচ্চতর পদের প্রশ্ন এবং পদকাদি সম্মান-চিহ্ন ছাড়া আর সব কিছুই তাদের কাছে অশিষ্ট এবং জানোয়ার-স্বভাবের নিদর্শন; তারা যা' বিশ্বাস করে তার বিরোধিতা অন্ধ-বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটায়···তাই তাঁর ধারণা যে, উঁচু জুতো পরলে আর ফেল্টের টুপি মাথায় দিলে পুরুষ-জাতটাই এমনি স্বভাবের হয়ে ওঠে। এত বছর ধরে এদের মধ্যে বাস করেও এই সব অর্থ-লিপ্সু লোকদের সম্পর্কে তাঁর জীবন সহজ হয়ে উঠতে পারে নি।

এমন সময় এসেছে এই সফল-জীবন চাষী যুবক জুলিয়ান। এই আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ মহান স্বভাবের প্রতি সংবেদনশীল আসক্তি তাঁর মনে সুমধুর আনন্দ এবং আড়ম্বরের মনোহর উজ্জ্বলতার সন্ধান দিয়েছে। তাই তার মধ্যে অভব্যতা এবং অজ্ঞতার যে সব প্রকাশ ঘটে নিজের মহানুভবতার স্পর্শে মাদাম দ্য রেনল সে সব শুধরে দেন এবং অচিরে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাই তার সঙ্গে দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ঘটনা এমন কি রাস্তা অতিক্রম করার সময় একজন কৃষকের গরুর গাড়ীর চাকায় পিষ্ট একটা কুকুরের বিষয় নিয়ে কথা বলার ক্ষণেও তিনি উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। অথচ এই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে তাঁর স্বামী সজোরে হেসে ওঠেন···আর তখন জুলিয়ানের কালো ভ্রূ-যুগল ধনুক হয়ে ভ্রূকুটি সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় হল যে, আত্মার মহানুভবতা এবং মানবিক সদাশয়তা এই যুবক পাদরী ছাড়া আর কারও অন্তরে স্থান লাভ করে নি। তাই কেবল তার জন্য তিনি সমবেদনা অনুভব করেন··· প্রশংসার সৃষ্টি হয়···এবং এ ধরনের গুণগুলো সৎ অন্তরেই জন্মলাভ করে।

জুলিয়ানের প্রতি মাদাম স্থ রেনলের এই মনোভাব প্যারী শহরে অচিরে সহজ ও সরল বলে প্রতিভাত হত…প্যারী শহরে প্রেম হচ্ছে উপন্যাসের সন্তান। তিন-চারখানা উপন্যাসে অথবা দু'একটা গল্প কিংবা অভিনয়-গৃহে যেসব গান গাওয়া হয় তার মধ্যে এই যুবক গৃহশিক্ষক এবং তার লাজুক প্রেমিকা তাদের পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের ব্যাখ্যা পরিষ্কার দেখতে পেত। উপন্যাসের মধ্যে তারা অনুকরণ করার মতন চরিত্রাদর্শের সন্ধান পেত। এবং অল্পকাল মধ্যেই আনন্দশূন্য এবং সম্ভবত অভিরুচিহীন হলেও জুলিয়ানের অহমিকা এই সব আদর্শ অনুকরণ করতে তাকে বাধ্য করত।

এ্যাভেরণের কোনও ছোট শহরে অথবা পিরেনীজ পর্বতের আগুনঝরা গরম আবহাওয়ায় ক্ষুদ্রতম ঘটনার সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের এই শহরে ধূসর আকাশের নীচে কপর্দ্দকহীন এক যুবক অর্থের দ্বারা কেনা সম্ভব এমন সব আনন্দ উপভোগের উচ্চাশায় যার মন উজ্জ্বল, সে প্রতিদিন সত্যিকারে ধর্মপরায়ণা ত্রিশোর্ধ এক মহিলার সঙ্গ ভোগ করছে…এবং সেই মহিলা তার ছেলেদের লালন-পালনে নিরত ও কোনভাবেই উপন্যাসের মডেল হওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। প্রতিটি বস্তুই ধীরগতিসম্পন্ন। প্রতিটি ঘটনাই প্রদেশগুলোর বুকে ঘটছে আর তার প্রত্যেকটিই স্বাভাবিক।

বহুবার, যখনই গৃহশিক্ষকের দারিদ্র্যের কথা ভাবছেন তখনই মাদাম স্থ রেনলের দু'চোখে জলের ধারা নামছে। একদিন ত তাঁকে প্রকাশ্যে কাঁদতে দেখে জুলিয়ান অবাক হয়ে গেল।

'কেন মাদাম, আপনি কি কোনও কিছুর জন্যে দুঃখ পেয়েছেন?'

তিনি জবাব দিলেন—'না' প্রিয় বাছা, ছেলেদের ডাক, আমরা বেড়াতে যাব।'

এবং মাদাম তার কাঁধ ধরলেন আঁকড়ে, জুলিয়ানের এটা অদ্ভুত মনে হল। এই প্রথম তিনি তাকে 'প্রিয় বাছা' বলে সম্বোধন করলেন। ভ্রমণের শেষদিকে জুলিয়ানের নজরে পড়ল যে, তিনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছেন। আরও ধীরে ধীরে তিনি হাঁটছেন।

তার দিকে না তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'দেখ, তোমাকে বলা দরকার যে, বেসানকনে আমার এক ধনী মাসি থাকেন, আমি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তিনি সব সময় আমাকে গাদা গাদা উপহার পাঠান…আমার ছেলেরা ভালই পড়াশুনা করছে…আশ্চর্যজনকভাবে ভাল…আমার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাকে আমি কিছু উপহার দিতে চাই। কিছু স্বর্ণমুদ্রা তোমার পরিচ্ছদ কেনার জন্য। কিন্তু…।' তাঁর মুখমণ্ডল আরও রিক্তিম হল বলতে বলতে। তারপর থামলেন।

জুলিয়ান বলল—'আচ্ছা, মাদাম?'

মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন—'না না, আমার স্বামীকে একথা বলবার দরকার নেই।'

সহসা থামল জুলিয়ান, টান টান হয়ে খাড়া হল, রাগে তার দু'চোখ জ্বলছে। সে বলে উঠল—'নীচু বংশে জন্মগ্রহণ করলেও আমি নীচ নই, মাদাম। এটা এমন একটা বিষয় যা' নিয়ে আপনি যথেষ্ট চিন্তা করেন নি। আমার বেতনের সাথে বিজড়িত এমন কোন কিছু মঁসিয়ে দ্য রেনলকে না জানিয়ে গোপনে গ্রহণ করলে আমি হীন অনুচরের চেয়ে নীচে নামব।'

মাদাম দ্য রেনল হতবাক হয়ে গেলেন।

জুলিয়ান আবার বলতে লাগল—'যেদিন থেকে এ বাড়ীতে বাস করছি তার-পর থেকে মাননীয় মেয়র আমাকে আমার ছত্রিশ ফ্রাঙ্ক বেতনের পাঁচগুণ অর্থ দিয়েছেন। মঁসিয়ে দ্য রেনলকে এমন কি ওই মঁসিয়ে ভালেনদ, যিনি আমাকে ঘৃণা করেন, তাঁকেও আমার হিসাবের বই দেখাতে তৈরী আছি।'

তার মনের এই আবেগের বিস্ফোরণ দেখে মাদাম দ্য রেনল বিবর্ণদেহে কাঁপতে লাগলেন, এবং দু'জনেই আর কথা বলার প্রসঙ্গ না পেয়ে ভ্রমণ শেষ করলেন।

জুলিয়ানের অহঙ্কারী অন্তরে মাদাম দ্য রেনলের প্রতি প্রেমের অন্বেষণ অসম্ভব হয়ে উঠল। তাকে ভর্ৎসনা করার জন্য মাদাম তার প্রতি খুশি হয়েছিলেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি তাকে যে অসম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্য এখন তিনি অপূর্ব চারিত্রিক গুণের মাধ্যমে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে লাগলেন, এবং এই জন্যে গোটা একটা সপ্তাহ তিনি আনন্দে কাটালেন। এর ফলে জুলিয়ানের রাগ কিছুটা পড়ল। কিন্তু এই মনোভাবের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝোঁকের কোনও চিহ্নের হদিস সে পেল না। মনে মনে আওড়াল সে—এই দেখ। এটাই ধনীদের স্বভাব। তারা তোমাকে অসম্মান করবে তারপর কল্পনা করবে যে, কয়েকটা বাঁদর নাচ দেখিয়ে আবার সবকিছু তারা সমাধান করে ফেলবে।

এ ব্যাপারে সবকিছু স্থির হয়ে গেলেও মাদামের অন্তর এত পরিপূর্ণ এবং নিরপরাধ যে, জুলিয়ানকে যা' তিনি দিতে চেয়েছিলেন এবং যেভাবে সে তা' প্রত্যাখ্যান করেছিল সে সব কথা তিনি স্বামীকে না বলে পারলেন না।

দারুণ উত্তেজিত হয়ে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'কি ? একটা চাকরের প্রত্যা-খ্যান তুমি সহ্য করলে !'

এই শব্দটা ব্যবহার করাতে মাদাম প্রতিবাদ জানালেন। তখন মঁসিয়ে বললেন—'মাদাম, হিজ হাইনেস স্বর্গীয় প্রিন্স দ্য কর্নদির কথা বলছি শোন। একবার তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে রাজকীয় ভৃত্যদের অধ্যক্ষকে এনে বলেছিলেন, এ ধরনের সব লোকেরা আমাদের চাকর। তোমার মনে আছে ত বেসেনভলের আত্মকথা ? প্রয়োজনীয় যেসব কাজের সাথে পদমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত সে সম্বন্ধে খানিকটা লেখা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। যারা তোমার গৃহে বাস করে অথচ বংশগৌরবে ভদ্রলোক নয়, তারা যদি কর্মের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করে তবে তারা চাকর পদবাচ্য। আচ্ছা, মাস্টার জুলিয়ানের সাথে দু-একটা কথা

বলে তাকে একশ' ফ্রাঙ্ক দেব।'

মাদাম কম্পিতদেহে বললেন—'ওগো! অন্য চাকরদের সামনে এসব বলো না।'

কত অর্থ দেওয়ার কথা বলেছিল তাই ভাবতে লাগলেন মঁসিয়ে। এবং চলে যেতে যেতে বললেন—'হাঁ, ঠিক বলেছ। এতে ওদের মনে হিংসা জন্মাবে এবং তার কারণও রয়েছে।'

গভীর দুঃখে প্রায় অচেতনদেহে মাদাম একখানা চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। ও আবার জুলিয়ানকে অসম্মান করতে চলল এবং এর জন্য দায়ী আমি! স্বামীর সম্পর্কে তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিল, দু'হাতে মুখ ঢেকে মনে মনে শপথ করলেন, বিশ্বাস করে স্বামীকে কখনও কোন কথা বলবেন না।

আবার যখন জুলিয়ানের সাথে দেখা হল তখন মাদামের দেহ কাঁপছিল। তাঁর মনের ভাব বুকের মধ্যে এমনভাবে অবরুদ্ধ রয়েছে যে, একটা কথাও বলতে পারলেন না। দারুণ বিব্রত হয়ে জুলিয়ানের দুটো হাত চেপে ধরে শুধু সজোরে নাড়া দিলেন।

এবং অবশেষে বললেন—'প্রিয় বাছা! আমার স্বামীর ব্যবহারে খুশি ত?'

তিক্ত একটুকরো হাসি হেসে জুলিয়ান জবাব দিল—'কেন হব না? তিনি ত আমাকে একশ' ফ্রাঙ্ক দিয়েছেন।'

মাদাম দ্য রেনল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। অবশেষে বললেন—'দাও তোমার হাত!' তাঁর কণ্ঠস্বরে সাহসের ছোঁওয়া, এমন কণ্ঠস্বর জুলিয়ান আগে কখনও শোনে নি।

খুবই সাহসী মাদাম, তাই তিনি ভেরিয়ার শহরের বইয়ের দোকানে অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রবেশ করেন, অথচ দোকানদারের কাছে উদারনীতিক বলে ভয়ঙ্কর খ্যাতি ছড়িয়েছে। সেখানে তিনি দশ লুই দামের বই কিনে ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং দোকান ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রত্যেককে তখনি নিজের নিজের ভাগের বইয়ের উপর নাম লিখতে বললেন। জুলিয়ানের চোখের সামনেই এই দারুণ সাহসিকতা দেখিয়ে মাদাম মনে মনে উল্লসিত হলেন, আর জুলিয়ান তখন দোকানে এত অজস্র বইয়ের সংখ্যা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এমন একটা পার্থিব জায়গায় এর আগে সে ঢুকতে সাহস করে নি। তার বুকের ধুকপুকুনি বাড়ল। এই মুহূর্তে মাদার দ্য রেনলের অন্তরে কি ঘটছে তা আন্দাজ করার চেষ্টা না করে সে এই চিন্তায় ডুবে ছিল যে, কেমন করে ধর্মতত্ত্বের একজন যুবক ছাত্র নিজের জন্য এর কয়েকখানা গ্রন্থ আহরণ করতে সক্ষম হবে। অবশেষে তার মাথায় একটা মতলব খেলল। একটু কৌশলে চেষ্টা করলেই তা' সম্ভব হবে। মাদামকে বোঝাতে হবে যে, ছাত্রদের প্রবন্ধ লেখাবার জন্য এ অঞ্চলের একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষের একখানা জীবনী-গ্রন্থ প্রয়োজন।

একমাস ধরে এই মতলব সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করার পর জুলিয়ান তার মতলব

হাসিল করতে পারল। এবং এতদূর হাসিল করতে পারল, মঁসিয়ের সাথে কথা প্রসঙ্গে মহান মেয়রের পক্ষে যা' আরও কঠিন কাজ তেমন একটা কাজ করার প্রস্তাব সাহস করে বলল। শুধু তার পাঠাগারের সদস্য হওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি এই উদারনীতিক পুস্তক ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের হিসাবে কিছু টাকা সাহায্য করলেন। মঁসিয়ে রেনল নিশ্চয় এই জন্যে রাজি হয়েছিলেন যে সেনাবাহিনীর পরীক্ষায় কথোপকথনে সুবিধার জন্য বড় ছেলের কিছু বইপত্রের নাম জানা ও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন এবং এতে তার মঙ্গল হবে। কিন্তু জুলিয়ান দেখল যে, মেয়র আর অধিক দূর অগ্রসর হতে কিছুতেই রাজী নন। সে সন্দেহ করল যে, এর কোন গোপন কারণ আছে। কিন্তু সেটা যে কি তা সে আন্দাজ করতে পারল না।

একদিন জুলিয়ান মেয়রকে বলল—'ভেবে দেখলাম স্যার, একজন নিম্ন-শ্রেণীর বইয়ের দোকানদারের খাতায় রেনলএর মতন একজন সম্মানীয় ভদ্রলোকের নাম থাকা ভীষণ অনুপযুক্ত কাজ। মঁসিয়ে রেনলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জুলিয়ান আবার খুব কোমল স্বরে বলতে লাগল—'আবার ওই যে দোকানদার বই ধার দেয় তার খাতায় যদি আমার মতন ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্রের নাম কোন-দিন আবিষ্কৃত হয় ত সেটাও খারাপ হবে। একটা কুৎসাজনক কাজ করার জন্য একদিন উদারনীতিকরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে, কে বলতে পারে হয়ত তারা কোন নোঙরা বইয়ের প্রকাশক হিসাবে আমার নাম ব্যবহার করবে না!' কিন্তু জুলিয়ান তার উদ্দেশ্যপথ থেকে সরে গেল। সে দেখল যে, মেয়র সহসা বিষণ্ণ হলেন ক্ষণিকের জন্য। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলা বন্ধ করলেন। সে শুধু মনে মনে আওড়াল, আমারও হাতে লোক আছে।

কিছু দিন পরে মঁসিয়ে দ্য রেনলের উপস্থিতিতে বড় ছেলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানা বইয়ের কথা জুলিয়ানকে বলল। তরুণ গৃহশিক্ষক মন্তব্য করল—'চরমপন্থী রাজনীতিকদের উল্লসিত হওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে গেলেও মাস্টার এ্যাডলফির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার মাল-মশলা প্রয়োজন স্যার। আপনি যদি আপনার অনুচরদের কাউকে অনুমতি দেন তবে সে পুস্তক-ব্যবসায়ীর একজন গ্রাহক হতে পারে।'

সুস্পষ্টভাবে দারুণ খুশি হয়ে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'এটা খারাপ ধারণা নয়!'

দীর্ঘ দিন ধরে কোনও একটা ইচ্ছা অবিরাম পোষণ করবার পর সেই ইচ্ছা পূরণ হলে কারো কারো মনে যেমন বিষণ্ণতা দেখা দেয় তেমনি বিষণ্ণ-কণ্ঠে জুলিয়ান বলল—'সেই একই কথা, চাকরটাকে বুঝিয়ে দেবেন সে যেন কোন উপন্যাস না নিয়ে আসে। একবার এই বিপজ্জনক গ্রন্থগুলো এ বাড়ীতে ঢুকলে মাদামের ঝি এমন কি ওই চাকরটারও মন বিষাক্ত হয়ে পড়বে।'

তাঁর ছেলেদের গৃহশিক্ষকের এই রকম সবদিক মানিয়ে চলার পারদর্শিতা

দেখে তিনি তাকে মনে মনে প্রশংসা করলেন এবং এই ভাবটুকু গোপন করার ইচ্ছায় উদ্ধতভাবে তিনি বললেন—'তুমি রাজনৈতিক পুস্তিকার কথা ভুলে গেছ।'

এমনিভাবে ছোটখাট চুক্তির আলোচনার মাধ্যমে জুলিয়ানের জীবন গড়ে উঠল। এই সবের সাফল্য মাদাম দ্য রেনলের মনের মধ্যে তার জন্যে যে ভাব ছিল তার চেয়ে তার মনের পট বেশী অধিকার করে ছিল, অথচ তার ইচ্ছা হলে সে সহজেই মাদামের অন্তরের খবর বেশী জানতে পারত।

সারা জীবন ধরে যেমন ছিল মেয়রের বাড়ীতেও তেমনি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে পড়ল জুলিয়ান। পিতৃগৃহের মতন এখানে যাদের সঙ্গে সে বাস করছে তাদের সকলের জন্য তার মনে যথেষ্ট অনুকম্পা এবং সকলে তাকে ঘৃণা করে। প্রতিদিন সহকারী শিক্ষক মঁসিয়ে ভালেনদ এবং পরিবারের অন্যান্য বান্ধবরা যে-সব প্রত্যক্ষ ঘটনা বলে তা' শুনে সে উপলব্ধি করল যে, বাস্তবের সাথে ওদের ধারণার অতি সামান্য মিল রয়েছে।

যদি কোন কাজ ওর কাছে প্রশংসার যোগ্য বলে মনে হয় তবে তা' হচ্ছে ওদের ভিতর কেউ যখন বিরুদ্ধ মন্তব্য করে। ওর আন্তরিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সব সময়—কি অসভ্য অথবা কি বোকার দল! একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, অহমিকা থাকা সত্ত্বেও সে প্রায়ই ওদের কথাবার্তা বুঝতে সক্ষম হত না।

সারা জীবন ধরে সে একমাত্র সামরিক-বাহিনীর শল্য-চিকিৎসক ছাড়া আর কারো সাথে মন খুলে কথা বলে নি এবং তাই বোনাপার্টের কয়েকটা অভিযান অথবা শল্য-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুর ধারণা তার নেই। তার যুব-জনোচিত সাহস ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শরীর-ব্যবচ্ছেদের খুঁটিনাটি বর্ণনা করত। এবং মনে মনে সে বলত, আমি কারোর চেয়ে কোন ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

ছেলেদের উল্লেখ না করে সব প্রথম একদিন মাদাম দ্য রেনল তার সঙ্গে শল্য-চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। জুলিয়ান শল্য-চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে লাগল। বিবর্ণমুখে তাকে তিনি থামতে বললেন।

এসব বিষয় ছাড়া জুলিয়ান আর কোন কিছুই স্পষ্টভাবে জানত না। এবং কাজেই জুলিয়ান যখন মাদাম দ্য রেনলের সাহচর্যে থাকত তখন যেখানেই তারা কেবলমাত্র দু'জনে থাকত সেখানেই তাদের মধ্যে কৌতুককর নীরবতা বিরাজ করত। বসবার ঘরে তার আচরণের মধ্যে যত অসম্মানজনক ভাবেরই উদয় হোক না কেন, মাদাম তার চোখে, যারা তাঁর সাথে দেখা করতে আসত, তাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্শ দেখতে পেতেন। কয়েকটা মুহূর্ত তার সঙ্গে একা থাকলেই তার মধ্যে দৃশ্যমান লাজুকতা তাঁর নজরে ধরা পড়ত। নারীর সহজাত বুদ্ধির ফলে এটা তাঁকে অসোয়াস্তির মধ্যে ফেলেছিল, তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই লাজুকতার মধ্যে কোমল অনুভবের কোনও চিহ্ন নেই।

সৎ সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলো ধারণা জুলিয়ানের মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল এবং এই ধারণাগুলো সে লাভ করেছিল সেই বৃদ্ধ সামরিক-বাহিনীর শল্য-চিকিৎসকের

অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী শুনে তাই কোনও নারীর সাহচর্যে নীরব হয়ে থাকাটা জুলিয়ান অসম্মানজনক মনে করে এবং যেন এই নীরবতা তার নিজেরই কোন বিশেষ দোষের জন্য। কথাবার্তার সময় এমনটা ঘটলে সেটা তার কাছে শতগুণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তার কল্পনায় ঠাসা রয়েছে দারুণ অতিশয়োক্তি···দারুণ ভাবপ্রবণতা···নির্জনে কোনও নারীর সঙ্গলাভ করলে একজন পুরুষ কি ধরনের বাক্যালাপ করবে তারই ধারণাসমূহ, উত্তেজনার মুহূর্তে তার মনের এই ধারণা-সমূহ কিন্তু একেবারেই অচল ছাড়া আর কিছু নয়। তার মন যেন শূন্যে ভাসমান কিন্তু তবু এই অসম্মানজনক নীরবতা ভাঙবার উপায় সে খুঁজে পায় না। সেজন্যে সে যখন মাদাম দ্য রেনলের সঙ্গে ছেলেদের নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বার হয় তখন নিষ্ঠুরতম মনস্তাপে তার ভিতরটা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তার মুখমণ্ডলে কঠিন ভাব ফুটে ওঠে।

নিজের উপর তার ভয়ানক ঘৃণা জন্মাল। সে যদি দুর্ভাগ্যবশত কোন দিন কথা বলতে বাধ্য হয় তবে সে দারুণ হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করে। তার দুঃখের চরম অবস্থা সৃষ্টি হল কারণ অসংগতি ও অতিশয়োক্তি সম্পর্কে সে খুবই সচেতন এবং ধারণাও পরিষ্কার। যা' হোক সে যা' দেখে নি তা' হচ্ছে চোখের ভাব, এবং সেই ভাব খুব সুন্দর এবং আগ্রহশীল অন্তরের সাক্ষ্য বহনকারী···যার কোন অর্থ নেই তেমন জিনিসের আনন্দময় অর্থ সৃষ্টি করছে। মাদাম দ্য রেনলও বুঝতে পারলেন যে, সে যখন তাঁর সঙ্গে একা থাকে তখন শোনবার যোগ্য কোন কথা বলতে পারে না···শুধু যখন কোনও অভাবিত ঘটনার জন্য তার মন নিজের চিন্তা থেকে মুক্ত হয় তখন সুন্দর সুন্দর প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করার কথা সে ভাবে। যে সব বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর বাড়ীতে আসে তারা কেউ অভিনব কোন ধারণার কথা তাঁকে বলে না, তাই তিনি জুলিয়ানের বুদ্ধি-উজ্জ্বল মনের ঝলককে অভিনন্দন জানান।

নেপোলিয়নের পতন হওয়ার পর থেকে প্রদেশ সমূহের বীরত্বের কথা বলা বা ভাব প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। প্রত্যেকেই নিজের পদ হারাবার ভয়ে ভীত। বদমাশরা খৃস্টিয় যাজক দলের সমর্থন চাইছে, ভণ্ডামি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। এমন কি শিক্ষিত সমাজেও ভণ্ডামির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একঘেয়েমী দু'গুণ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং দেশে চাষ-বাস এবং পড়াশুনা ছাড়া আর কোন আনন্দ নেই।

মাদাম দ্য রেনল তাঁর ধনী আচারনিষ্ঠ মাসিমার উত্তরাধিকারিণী, ষোল বছর বয়সে সদ্বংশজাত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, সারা জীবন ধরে প্রেমের কোন অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি। পাদরি মঁসিয়ে চেলান তাঁর পাপ-স্বীকার শ্রবণকারী পুরোহিত···মঁসিয়ে ভালেনদ তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করার যে চেষ্টা করেছিল সে-কথা পাদরি উল্লেখ করাতে তিনি প্রেম বিনিময়ের যে ভয়ানক বিপ্লবাত্মক চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা' জঘন্য লাম্পট্য ছাড়া আর

কিছু নয়, তার আর অন্য কোনও অর্থ হয় না। তিনি এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম বলে পরিগণিত অথবা এমন কি এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, যে সামান্য কয়েকখানা উপন্যাস তাঁর হাতে পড়েছে তা' থেকে তিনি প্রেমের পাঠ আহরণ করেছেন। এই অজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ, তাই নিজেকে সামান্যতম নিন্দা করার কথা দূরে থাক জুলিয়ানের চিন্তায় তাঁর মন অবিরাম ভরপুর এবং মাদাম দ্য রেনল পুরোপুরি সুখী।

৮: ছোটখাট ঘটনাবলী

তার দীর্ঘশ্বাস পতন, দমন-জনিত গভীরতর তা',
চোরা চাহনি, চোরের কাছে তা' মধুরতর,
আর প্রজ্জ্বলন্ত রক্তিমতা, যদিও পাপ নয় তা'।
—ডন জুয়ান

যখন তাঁর খাস চাকরাণী এলিসার কথা তাঁর মনে পড়ে তখনই মাদাম দ্য রেনলের পবিত্র মধুর মানসিক প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে···এর জন্য তিনি তাঁর চরিত্র ও বর্তমান অবস্থার সুখানুভূতিকে ধন্যবাদ জানান। এই যুবতী হাতে কিছু পয়সা জমতেই সোজা মঁসিয়ে চেলানের কাছে গিয়ে স্বীকার করল যে, সে জুলিয়ানকে বিয়ে করতে চায়। বন্ধুর এই সৌভাগ্য দেখে মঁসিয়ে চেলান ভারি খুশি হলেন, কিন্তু তিনি দারুণ বিস্মিত হলেন যখন জুলিয়ান কঠিনভাবে জানাল যে, সে কুমারী এলিসার প্রস্তাব গ্রহণে একেবারেই রাজী নয়।

পাদরি ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন—'বাছা, তোমার অন্তরে কি ঘটছে তা' ভালভাবে পরখ কর। আরও যথেষ্ট সম্পদের আশায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যদি তোমার মানসিক ইচ্ছা হয় তবে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। জান ত এই ভেরিয়ার শহরের গীর্জায় আমি ছাপ্পান্ন বছর ধরে পুরোহিত রয়েছি, তবুও আজ আমার উপজীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা আমার মনোবেদনার কারণ। তবু ত আমার আট শ' লিভার আয়ের নিজস্ব সম্পত্তি আছে। এসব কথা আমি তোমার কাছ থেকে গোপন করছি না কারণ যাজকগিরি গ্রহণ করলে ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে তোমার মনে যেন কোন ভ্রান্ত-ধারণার সৃষ্টি না হয়। তুমি যদি কর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করার কথা চিন্তা কর তবে তোমার অনন্তকাল নরকভোগ সুনিশ্চিত। তুমি অবশ্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে নামতে পার কিন্তু তোমার কাজের ফলে দরিদ্র ও অভাবীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তোমাকে সহকারী শাসক, মেয়র এবং সংক্ষেপে পদমর্যাদাসম্পন্ন সব ব্যক্তিকে তোষামোদ করতে হবে এবং হতে হবে তাদের লালসার অনুচর। সংসারে এ ধরনের আচরণকে কণ্ডুয়ন-বৃত্তি বলা হয়··· অপেশাদার কোন ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের আচরণ সম্ভব, কিন্তু কোন মুক্তিকামী পথযাত্রীর পক্ষে এটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ বৃত্তি। কিন্তু আমাদের সমাজে সফলতা বা বিফলতার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে সংসার-জীবন অতিবাহিত করতে হবে···

এর মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। যাও বাছা ; চিন্তা কর এবং তিনদিন পরে এসে তোমার সুনির্দিষ্ট জবাব আমাকে বলে যেও। আমি চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছি যখন দেখছি তোমার অন্তরের গভীরে রয়েছে ভস্মাচ্ছাদিত জলন্ত আগুন...যা' যাজক-বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জাগতিক সুখ পরিহারের ইচ্ছা এবং সংযমের একান্ত অভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। তোমার মানসিক গঠনের ব্যাপারে বলছি যে, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার গভীর আশা ছিল। কিন্তু এখন যদি আমাকে বলতে দাও ত বলব যে, যাজক-বৃত্তি গ্রহণ করলে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আমি আশঙ্কিত হব।' বলতে বলতে বৃদ্ধ যাজকের দু'চোখ কানায় কানায় জলে ভরে গিয়েছিল।

তাঁর এই ভাবপ্রবণতা দেখে জুলিয়ান লজ্জিত হয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সে ভালবাসা লাভ করেছিল। আনন্দের অশ্রু-বর্ষণ, সেই অশ্রু লুকোতেই সে ভেরিয়ার শহরের উপান্তে জঙ্গলে পালিয়েছিল।

মনে মনে সে বলেছিল, কি কারণে আমার এমন অবস্থা হল ? আমার ধারণা, এই সৎ যাজকের জন্য শত শত বার আমি আমার জীবন আহুতি দিতে পারি... কিন্তু তবু তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, আমি একটা নিরেট আহাম্মক। তাঁকে প্রবঞ্চিত করতে পারি এমন মানুষ ত তিনি আমার কাছে নন, কিন্তু আমার স্বরূপ তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। জীবনে উন্নতি করার যে পরিকল্পনা আমার মাথায় রয়েছে তাকেই তিনি 'ভস্মাচ্ছাদিত আগুন' বলছেন। যখন ভাবছিলাম যে, বছরে পঞ্চাশ লুই করে তাঁকে বৃত্তি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে আমার ধর্মপরায়ণতা ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা লাভ করতে পারব তখনই তিনি আমাকে যাজক হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। জুলিয়ান ভাবতে লাগল যে, 'ভবিষ্যতে আমার চরিত্রের যে গুণগুলো পরীক্ষিত হয়েছে সেগুলোর দিকেই নজর রাখব। কে বলেছে যে, আনন্দে আমার অশ্রু ঝরবে ? কিংবা যে ব্যক্তি আমাকে আহাম্মক বলে প্রমাণিত করেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হব ?

তিনদিন পরে জুলিয়ান বলবার মতন একটা ওজোর খুঁজে পেল, অথচ এই ওজোরটা প্রথম দিনই সে বলতে পারত। এই ওজোরটা হচ্ছে দুর্নাম...কিন্তু তাতে কি ? অনেক দ্বিধার পর অবশেষে সে পাদরির কাছে স্বীকার করল, প্রথম দিনই সে যে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল তার একটা কারণ আছে, কিন্তু সে কারণ সে সম্ভবত ব্যাখ্যা করতে পারবে না, তাতে তৃতীয় আর একজন আঘাত পাবে। এটা হচ্ছে এলিসার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ। মঁসিয়ে চেলান তার আচরণে এমন কতকগুলো জাগতিক আগ্রহ দেখলেন যেগুলো যাজক হওয়ার জন্য কোন যুবককে উৎসাহিত করার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত এবং ভিন্ন।

তিনি আবার তাকে বলেছিলেন—'পেশাহীন কোন যাজক না হয়ে বরং তুমি একজন সম্মানিত ও সুশিক্ষিত গ্রামীণ যুবক হওয়ার পথ বেছে নাও, বাছা।'

বাক্যের মাধ্যমে যতদূর বলা সম্ভব তেমনিভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য জুলিয়ান সুন্দর জবাব দিল। একজন যুবক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র যেমন ভাব প্রকাশ করে ঠিক তেমনি ভাব সে প্রকাশ করল। কিন্তু যেভাবে সে কথাগুলো উচ্চারণ করল সেই কণ্ঠস্বর এবং তার দৃষ্টির আড়ালে লুক্কায়িত কু-ভাব দেখে মঁসিয়ে চেলান শঙ্কিত হলেন।

জুলিয়ানের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আগে থেকে কিছু বলতে চাই না। সে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল...এবং সঠিকভাবে...তার ভাষায় চতুরতা এবং সতর্ক ভণ্ডামির মিশেল। তার বয়সী একজন বালকের পক্ষে এটা একেবারে মন্দ নয়। তার আচরণ এবং ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে, সে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে বাস করে। উত্তম ধরনের কোনও মডেল দেখার সুযোগ তার হয় নি। পরবর্তীকালে যে মুহূর্তে সে বিশ্বের নামকরা লোকদের সাথে মিশবার সুযোগ পেল তখনই তার ভাব-ভঙ্গি এবং মুখের ভাষা প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠল।

মাদাম দ্য রেনল অবাক হয়ে দেখলেন যে, তাঁর চাকরাণী নতুন সম্পদ লাভ করা সত্ত্বেও আরও খুশি হতে পারে নি। তিনি মন্তব্য করলেন যে, মেয়েটি প্রায়ই পাদরির কাছে যায় এবং কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। অবশেষে এলিসা তার কর্ত্রীর কাছে বিয়ের কথা বলল।

মাদামের বিশ্বাস হল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক ধরনের জ্বরতপ্ত উত্তেজনা তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল। যখনই হয় চাকরাণী আর না হয় জুলিয়ান তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল তখনই কেবল তাঁর দেহে জীবন ফিরে আসছিল। এই দু'জন এবং তারা তাদের বাড়ীতে কত সুন্দর সুখের জীবন কাটাবে এছাড়া আর কিছুই তিনি ভাবতে পারছিলেন না। বছরে মাত্র পঞ্চাশ লুই খরচ করে তারা যে বাড়ী ভাড়া করে তারা সংসার পাতবে সেই ছোট্ট বাড়ীর দারিদ্র্য এবং সেখানকার রঙীন পরিবেশ তিনি কল্পনা করছিলেন। এই ভেরিয়ার শহরের মাইল ছয়েক দূরে ব্রে শহরে জুলিয়ান আইন ব্যবসা সুরু করতে পারবে এবং ওখানে সহকারী শাসক বাস করেন। তেমন হলে তিনি মাঝে মাঝে ওদের দেখতে যাবেন।

আন্তরিকভাবে তাঁর বিশ্বাস হল যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীকেও তিনি সে কথা বললেন এবং অবশেষে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঝি যখন তাঁর ঘরে কাজ করছিল তিনি দেখলেন যে, মেয়েটি কাঁদছে। এলিসার উপর তাঁর দারুণ ঘৃণা হল এবং তিনি তাকে বকলেন। মেয়েটিকে ক্ষমা চাইতে বললেন, কিন্তু মেয়েটি দ্বিগুণ জোরে কাঁদতে লাগল। সে বলল যে, কর্ত্রী যদি শুনতে চান তবে সে তার দুঃখের কথা বলতে পারে।

মাদাম দ্য রেনল বললেন—'বেশ বল।'

'মাদাম, ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিছু বদমাশ লোক আমার সম্পর্কে তাকে মন্দ কথা বলেছে আর সে তা' বিশ্বাস করেছে।'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, মাদাম দ্য রেনল জানতে চাইলেন—'কে প্রত্যাখ্যান করেছে ?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঝি জবাব দিল—'মঁসিয়ে জুলিয়ান ছাড়া আর কে মাদাম। পাদরি সাহেব অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার মন বদলাতে পারেন নি। মাননীয় পাদরি সাহেব মনে করেন যে, একটি সুন্দরী যুবতীকে কেবল খাস-ঝিয়ের কাজ করার জন্য প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ নয়। অথচ মঁসিয়ে জুলিয়ানের বাবা ত একজন করাতী। মাদামের বাড়ী আসার আগে সেই বা কি কাজ করে জীবিকা অর্জন করত ?'

মাদাম দ্য রেনলের কানে তার কথা আর ঢুকছিল না—অতিশয় আনন্দে তিনি যুক্তি হারিয়ে ফেললেন। বার বার জিজ্ঞাসা করে মেয়েটির কাছ থেকে সুনিশ্চিত-ভাবে জানতে পারলেন যে, জুলিয়ান নির্দিষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার আর পুনর্বিবেচনা করার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তিনি তাঁর ঝিকে বললেন—'বেশ, আমি শেষবার চেষ্টা করব, নিজে মঁসিয়ে জুলিয়ানের সঙ্গে কথা বলব।'

পরদিন সকালবেলা মাদাম দ্য রেনল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য অনুরোধ করে অপরিমিত আনন্দ উপভোগ করলেন এবং এক ঘণ্টা ধরে কথা বলেও এলিসার হাত এবং তার ভবিষ্যৎ বার বার প্রত্যাখ্যাত হল।

ক্রমে ক্রমে জুলিয়ান কঠিন জবাব দেওয়ার প্রবণতা ত্যাগ করল এবং অবশেষে মাদাম দ্য রেনলের বিবেচনাপ্রসূত যুক্তিগুলো উৎসাহভরে ও বুদ্ধির সঙ্গে খণ্ডন করল। অনেকগুলো নৈরাশ্যভরা দিন পার হওয়ার পর আজ আনন্দের বন্যায় তার জীবন কানায় কানায় এমন ভরে গেল যে, আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং মৃতের মতন অচেতন হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর চেতনা ফিরে এল, আবার সুস্থ হয়ে বসলেন নিজের ঘরে, তখন ঘর থেকে সকলকে চলে যেতে বললেন, তিনি গভীরভাবে বিস্মিত হলেন। আচ্ছা, আমি কি জুলিয়ানকে ভালবাসি ?—নিজের মনে সে অবশেষে আওড়াল।

অন্য সময় এই সত্য আবিষ্কার করলে তাঁর হৃদয় গভীর মনস্তাপ ও অনু-শোচনায় ভরে যেত, কিন্তু আগে যে-সব দৃশ্যের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন এখন সেগুলো তাঁর কাছে আনন্দদায়ক মনে হল। এতক্ষণ ধরে সংঘটিত ঘটনায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু এখন আবেগে চালিত হওয়ার মতন কোনও ভাব তাঁর হৃদয়ে নেই।

তিনি কাজ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তন্দ্রায় অভিভূত হলেন। জাগরণের পর যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা শঙ্কিত হলেন না। ব্যাপারটির অন্ধকার দিক দেখার ক্ষমতা হওয়ায় তিনি খুব আনন্দিত হলেন। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি অপটু আর নিরপরাধী হওয়ার জন্য এই গ্রামীণ মহিলা কোন অভিনব ভাবাবেগ বা দুঃখানুভূতি থেকে নিজের অন্তর খুঁজে আনন্দ বা নিরানন্দ ভোগের

চেষ্টা করেন না। জুলিয়ান আসার আগে প্যারী থেকে দূরে একজন সুগৃহিণী এবং জননীর মতন সাংসারিক কর্তব্যে রত থাকতেন। আবেগকে মাদাম দ্য রেনল ভাগ্যের খেলা বলে মনে করতেন···নিশ্চিত হতাশা এবং এক ধরনের সুখ অনুভব করার জন্য এটা বোকাদের খেলা।

ডিনারের ঘণ্টা বাজল। জুলিয়ান ছেলেদের নিয়ে বাড়ী ঢুকছে, তার কণ্ঠস্বর শুনে মাদাম লজ্জায় লাল হলেন। প্রেমে পড়ার পর থেকে তিনি ঈষৎ চতুর হয়েছেন, এবং অভিযোগ করেন যে, ভয়ানক মাথা ধরার জন্য তাঁর মুখমণ্ডল এমন রক্তিম।

মঁসিয়ে দ্য রেনল হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন—'তোমরা মেয়েরা সব এক ধাঁচের। ছোটখাট যন্ত্র ত তাই প্রায়ই সারাবার দরকার হয়।'

যদিও এ ধরনের রসিকতা শুনতে মাদাম অভ্যস্ত তবুও স্বামীর কণ্ঠস্বরে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। এ ব্যাপারটা ভোলবার জন্যে তিনি জুলিয়ানের দিকে তাকালেন। লোকটা যদি জগতের কুৎসিততম আকৃতির হত তবে এই মুহূর্তে সে তাকে আনন্দ দিতে পারত।

আবার বসন্তের সুন্দর দিনগুলো ফিরে এল। সভায় সমাজে নিজের জীবন-আচরণের আদর্শ বজায় রাখার জন্য মঁসিয়ে রেনল ভার্জি গ্রামে বাস করতে গেলেন···গ্যাব্রিয়েলের বিয়োগান্ত অভিযানের স্মৃতির জন্য গ্রামখানা প্রসিদ্ধ। ছবির মতন সুন্দর গোথিক গীর্জার ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েক শ' ফুট দূরে রয়েছে একখানা পল্লী-নিবাস। এই পল্লী-নিবাসের মালিক মঁসিয়ে রেনল। বাড়ীখানায় চারটে গম্বুজ এবং সুন্দর একটি বাগান রয়েছে—যেন 'টুইলারিস গার্ডেনস্।' রয়েছে অজস্র ফুলের কেয়ারী···রাস্তার ধারে ধারে বাদাম-গাছের সার, বছরে দু'বার ছাঁটা হয়। কাছেই চাষের জমি···আপেলের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেড়াবার রাস্তা। ফলের বাগানের শেষ সীমানায় ন-দশটা আখরোটের গাছ···তাদের পত্রবহুল ঝাঁকড়া মাথাগুলো আশী ফুট উঁচু।

ওই গাছগুলোর প্রশংসা করবার ইচ্ছা হলে তিনি স্ত্রীকে বলেন—'দেখ, আমার এই প্রতিটি সুখী আখরোট গাছের দাম এক একর জমির ফসলের দামের সমান। ওদের আওতায় কোনও গম জন্মায় না।'

এই নিসর্গ দৃশ্য যেন এই প্রথম দেখছেন, তাই মাদাম রেনল অভিভূত হলেন। এমন কি তার প্রশংসায় অপার আনন্দ লাভ করলেন। এই অনুভবশক্তি তাঁকে এত উৎসাহিত করে তুলল যে, তিনি উদ্যমশীল ও দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভার্জি গ্রামে পৌছবার পরের দিন মঁসিয়ে রেনল মেয়রের অফিসের একটা কাজের ব্যাপারে শহরে গিয়েছিলেন এবং মাদাম নিজের খরচে বাগানে কয়েকজন মজুরকে কাজে লাগালেন। ফলের বাগান ঘিরে এবং আখরোট গাছগুলোর নীচ দিয়ে নুড়ি-পাথরের একটা রাস্তা বানাবার মতলব তাঁকে দিয়েছিল জুলিয়ান। এ রকম একটা রাস্তা হলে ছেলেরা সকালবেলায় শিশিরে জুতো না ভিজিয়েও

বাগানে বেড়াতে পারবে। এই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কাজ সুরু করার পর চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে রাস্তাটা তৈরী হয়ে গেল। সারা দিন ধরে আনন্দের সাথে মাদাম মজুর খাটানোর কাজে জুলিয়ানকে সাহায্য করলেন।

ভেরিয়ার শহরের মেয়র ফিরে এসে রাস্তাটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে দেখে খুব অবাক হলেন। তাঁর আগমন মাদামকেও অবাক করল, কারণ তিনি তাঁর অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন একটা জরুরি কাজ দুঃসাহসের দ্বারা সম্পূর্ণ করার জন্য এর পরে মাস দু'য়েক ধরে তিনি মেজাজে কথাবার্তা বললেন। তবে একটা মাত্র সান্ত্বনা এই যে, মাদাম নিজের খরচে কাজটা করিয়েছেন।

ফলের বাগানে ছেলেদের সঙ্গে প্রজাপতি ধরার জন্যে ছুটোছুটি করে মাদাম দিন কাটাতেন। তাঁরা স্বচ্ছ কাপড় দিয়ে একটা জাল তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই জাল দিয়ে হতভাগ্য লেপিডপটেরাগুলো ধরতেন। জুলিয়ানের কাছ থেকে প্রজাপতির এই বুনো নামটা জেনে নিয়েছিলেন। এদের সম্পর্কে গডার্টের লেখা বই তিনি বেসানকন শহর থেকে আনিয়েছেন এবং এই হতভাগ্য প্রাণীদের মজার মজার স্বভাবের কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছে। একখানা বড় কার্ডবোর্ডের শো-কেসে তাঁরা প্রজাপতিগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে পিন দিয়ে আটকে রাখছেন এবং শো-কেসটা বানিয়েছে জুলিয়ান।

অবশেষে মাদাম এবং জুলিয়ান আলোচনা করার মতন একটা বিষয় পেয়েছেন। ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা যা' মাঝে মাঝে তাকে ভোগ করতে হত, তা আর রইল না। তারা অবিরাম উৎফুল্ল হৃদয়ে কথা বলতেন এবং নির্দোষ বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনা করতেন। কাজ এবং আনন্দে ভরা এই জীবন-ধারা কুমারী এলিসা ছাড়া আর সকলের মনে সাড়া জাগাল, কেননা কুমারী এলিসা কাজের মধ্যে নিজেকে ক্ষয় করতে লাগল। রোমান ক্যাথলিকদের পর্বোৎসবের দিন সে আর ভেরিয়ারের বল-নাচের সময় জানতে চাইত না, চাইত না জানতে যে, মাদামের পরিধানের পোশাক অসোয়াস্তিতে ফেলছে কি-না! তিনি দিনের মধ্যে দু-তিন বার পোশাক বদলাতেন।

কারো খোশামুদে ছবি আঁকা আমাদের ইচ্ছে নয়, তবে অস্বীকার করব না, মাদামের গাত্র-ত্বক অতীব সুন্দর। তাঁর পোশাক এমনভাবে তৈরী যে, তাঁর হাত দু'খানা এবং কাঁধের কিছুটা অংশ থাকে নিরাভরণ। সুঠাম আর পেলব তাঁর অঙ্গ এবং এই ধরনের পোশাকে তাঁকে দেবীর মতন মনে হয়। ভার্জিতে নিমন্ত্রণে এসে তাঁর ভেরিয়ার শহরের বন্ধু-বান্ধবরা মন্তব্য করে, আপনাকে এমন তরুণী আর কখনও মনে হয় নি ত! (এ অঞ্চলে এটাই এখন সাম্প্রতিক প্রশংসা-বাক্য।)

এটা যথেষ্ট বিস্ময়কর ব্যাপার···আমাদের এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট ঝোঁক আছে যে, এই সব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ইচ্ছা মাদামের মনে ছিল

-না। এতে তিনি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করতেন। বেশী চিন্তা ভাবনা করতেও হত না। জুলিয়ান এবং ছেলেদের সঙ্গে যে সময়টা তিনি প্রজাপতি ধরতে ছোটা-ছুটি করতেন না, তখন এলিসাকে নিয়ে তিনি পোশাক বানাতেন। মুলহাউস থেকে গরমের কোন পোশাক সদ্য এলে তিনি তা কিনতে মাঝে মাঝে ভেরিয়ার শহরে যেতেন।

ভার্জিতে তিনি তাঁর এক যুবতী আত্মীয়াকে নিয়ে এলেন। বিয়ের পর থেকে মাদাম দারভিলের সঙ্গে মাদাম রেনলের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠেছে···উনি পবিত্র হৃদয় নামক কনভেন্টে তাঁর সঙ্গে পড়াশুনা করতেন।

মাদাম যখন তাঁর আত্মীয়ার অদ্ভুত এবং অভিনব ধারণার কথা বলতেন তখন মাদাম দারভিল উপহাসের খোরাক খুঁজে পেতেন। তিনি বলতেন—'এমন কারো কথা আমি নিজে ভাবতেই পারি না।' স্বামীর সাথে নিরিবিলি থাকলে এই সব অদ্ভুত মজার বিষয়, যেগুলো প্যারী শহরের কৌতুকের সৃষ্টি করতো, সেগুলো আহাম্মকি বলে তিনি লজ্জিত হতেন। কিন্তু মাদাম দারভিলেব উপস্থিতি তাঁকে সাহসী করে তুলেছে। তাঁর চিন্তার কথা যখন বলতেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে লজ্জার ছোঁওয়া থাকতো। কিন্তু দুই সখি যখন বহুক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করতেন তখন মাদাম রেনলের বুদ্ধি সজীব হয়ে উঠত এবং সুদীর্ঘ নির্জন সকাল যেন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেত আর দু'জনেই অপার আনন্দে মেতে উঠতেন। এইবার সফরকালে চতুর মাদাম দারভিল তাঁর সখির মনে আনন্দ ও সুখের ঘাটতি দেখলেন।

জুলিয়ানের ব্যাপার হচ্ছে এই গ্রামে বাস করতে আসার পর সে ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে, নিজের ছাত্রদের মতন সেও প্রজাপতির পিছনে আনন্দে ছুটোছুটি করে। এমন সংযত এবং চতুর পরিকল্পনাসম্মত জীবন যাপন করেও অন্য পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে এবং সহজাতভাবে মাদাম রেনলের ভয় ত্যাগ করেও নিজেকে সে বড় পরিত্যক্ত মনে করছে···বিশ্বের সুন্দরতম পার্বত্য পরিবেশে তার বয়সী ছেলেরা যা চায় সেই বেঁচে থাকার আনন্দের মধ্যে সে আত্মসমর্পণ করেছে।

মাদাম দারভিল এখানে আসার পর জুলিয়ান তাঁকে বন্ধু বলে মনে করল। নতুন রাস্তাটার শেষে বিশাল আখরোট গাছগুলোর নীচ থেকে কি সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য নজরে পড়ে সে তাঁকে তাড়াতাড়ি দেখাল। সুইজারল্যাণ্ড অথবা ইতালির হ্রদগুলোর চমৎকার দৃশ্যসৌন্দর্য অতিক্রম না করলেও এখানকার দৃশ্যসৌন্দর্য তারই সম-গোত্রীয়। কিছুটা দূর থেকে খাড়া চড়াইয়ের সুরু, সুদীর্ঘ ওক গাছ-গুলো খাড়াইয়ের ধারে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। আরও দূরে গিয়ে বন ঝুঁকে পড়েছে নদীর বুকে। এই পর্বতের সানুদেশে একেবারে জলের ধারে মুক্ত আর আনন্দিত জুলিয়ান একটা নির্জন স্থানের সন্ধান পেয়েছে, এটা যেন রাজকীয় দুর্গ-প্রাসাদের চেয়েও তার কাছে আরামদায়ক। দুই সখিকে এখানেই নিয়ে এল। তাঁরা এই স্থানের নির্জনতায় অবাক হলেন। মাদাম দারভিল বললেন—'আমার কাছে এটা মজার্টের সঙ্গীততুল্য।'

ভেরিয়ার শহরের চারধারের পরিবেশের আনন্দ জুলিয়ানের কাছে নষ্ট হয়েছিল তার হিংসুক দাদাদের এবং ক্রুদ্ধ ও অত্যাচারী পিতার উপস্থিতির জন্য। ভার্জিতে ও ধরনের তিক্ত স্মৃতির সম্মুখীন তাকে হতে হল না, এই প্রথম সে জীবনে শত্রু দেখল না। যখন মঁসিয়ে রেনল শহরে থাকতেন, যা' খুব কমই ঘটত, তখন সে পড়তে সাহস করত। অচিরে রাতে পড়া ছেড়ে সে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করতে লাগল এবং তখন এমনকি একটা উল্টানো ফুলের টব দিয়ে আলো আড়াল করে রাখত। দিনের বেলায় ছেলেদের পড়ানোর অবসরে সে তার গ্রন্থ হাতে নিয়ে এই পাথরের উপর এসে বসত···এখানা হচ্ছে তার চরিত্র-গঠনের এবং তার আনন্দঘন স্বপ্ন রচনার সার গ্রন্থ। হতাশার মুহূর্তগুলিতে এই গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা থেকে সে আহরণ করেছে আনন্দ, কবিসুলভ উন্মাদনা এবং আরাম।

নারীদের সম্পর্কে নেপোলিয়নের কিছু মন্তব্য অথবা তাঁর রাজত্বকালে প্রচলিত উপন্যাসের মূল্যায়ণ সম্বন্ধে তাঁর দু-একটা প্রবন্ধ পড়ে জুলিয়ানের কয়েকটা ধারণা হয়েছিল, এ সব ধারণা তার বয়সী যুবকরা অনেক আগেই আহরণ করে নেয়।

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ দিনগুলো ফুরিয়ে এল। বাড়ী থেকে খানিক দূরে সন্ধ্যেবেলায় একটা বিশাল লেবু-গাছের নীচে বসে কিছুটা সময় অতিবাহিত করা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। এই ওখানটা বাস্তবিকই খুবই অন্ধকার। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মহিলাদের উপস্থিতিতে নিজের আনন্দ ও বাকপটুতা প্রদর্শনের জন্য জুলিয়ান উৎসাহভরে কথা বলছিল, নানারকম আকার-ইঙ্গিত করার সময় বাগানে রক্ষিত রঙ-করা একখানা চেয়ারের পিঠে ছড়ানো মাদাম রেনলের হাতে তার হাত স্পর্শ করল।

সেই হাতখানা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হল, তবে জুলিয়ান অনুভব করল যে, তার এমন একটা ব্যবস্থা করা কর্তব্য যা'তে তার হাত স্পর্শ করলেও যেন সেই হাতখানা সরিয়ে নেওয়া না হয়। ধারণাটা কার্যে পরিণত করা তার কর্তব্য, আর এ কাজ না করলে সে হাস্যাস্পদ হবে অথবা হবে নিজের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করা। ফলে তৎক্ষণাৎ তার হৃদয় থেকে সব আনন্দ অন্তর্হিত হল।

৯ : *গ্রামে একটি সন্ধ্যা*

মঁসিয়ে গুয়েরিনের দিদো, একখানা মনোহর ব্যঙ্গ-নাটক!

—স্ট্রমবেক্

পরের দিন সকালবেলায় দেখা হতেই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে জুলিয়ান তাকাল মাদাম দ্য রেনলের দিকে। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার আগে সে বুঝি নিজের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করছিল। আগের সন্ধ্যা থেকে তার দু'চোখের ভিন্ন দৃষ্টি মাদাম রেনলকে হতবুদ্ধি করে ফেলল। তিনি তার প্রতি সর্বদা সদয়, কিন্তু সে যেন বিরক্ত। তিনি তাঁর দৃষ্টি তার দিক থেকে সরিয়ে নিতে পারলেন না।

মাদাম দারভিলের উপস্থিতি তাকে কম কথা বলতে এবং নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আরও বেশী চিন্তা করার সুযোগ দিল। তার সারা দিনের কাজ হচ্ছে সেই উদ্দীপনাময় গ্রন্থখানা পাঠ করে নিজেকে দুর্ভেদ্য করে তোলা···এই গ্রন্থখানাই তাকে সাহসে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ছেলেদের পাঠের সময় সে অনেকটা কমিয়ে দিল, এবং মাদাম রেনলের উপস্থিতি তার চিন্তাকে পুরোপুরি প্রভাবিত করল, তার মনে একটা দাবি সোচ্চার হল, সে স্থির করল, আজ সন্ধ্যেবেলাটা তার হাতে হাত রেখে মাদামকে বসে থাকতে হবে।

সূর্য অস্তমিত হল। নির্ধারিত সময় এগিয়ে এল। জুলিয়ানের বুকের মধ্যে অদ্ভুত ধুকপুকুনি সুরু হল। রাত নামল। সে দেখল যে, আনন্দের শিহরণে তার বুকের উপর থেকে গুরু-ভার সরে গেল···আজ রাতটা গভীর আঁধারে ঢাকা। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন সারা আকাশ···গরম বাতাসের তাড়নায় মেঘের খণ্ডগুলো ভাসছে। মনে হয়, ঝড় আসছে। অনেকক্ষণ ধরে রমণী দু'জন হেঁটে বেড়াল··· সেদিন সন্ধ্যায় তারা যা' করল তা' জুলিয়ানের কাছে অদ্ভুত লাগল। তারা যে ধরনের আবহাওয়ায় এখন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে আবেগ-ধর্মী মন ভাববে বুঝি তারা প্রেমের আনন্দকে বর্ধিত করছে।

অবশেষে তারা সকলে বসল। জুলিয়ানের পাশেই মাদাম রেনল। আর মাদাম দারভিল তাঁর বন্ধুর পাশে। এখনি যে প্রচেষ্টা গ্রহণে সে প্রস্তুত তার চিন্তায় জুলিয়ানের মন ভরপুর···সে কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। ব,ক্যালাপ বন্ধ।

যখন প্রথম দ্বৈরথ লড়তে হবে তখন কি আমার দেহ কম্পিত হবে এবং আমি এমনিভাবে নিজেকে নিঃস্ব ভাবব? জুলিয়ান মনে মনে বলল। নিজের উপর তার অত্যধিক অবিশ্বাস এবং অন্যদের কাছে তার মানসিক অবস্থা ধারণাতীত। এমন সাংঘাতিক মনস্তাপের সময়, এর চেয়ে যে কোন ধরনের বিপদ মনে হয় অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। কতবার সে আশা করছে একটা প্রয়োজন দেখা দেবে আর মাদাম রেনল বাগান ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন। মানসিক ইচ্ছা অবদমনের জন্যে তাকে এমন তীব্র চেষ্টা করতে হচ্ছিল যে, তার ফলে তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। অচিরে মাদাম দ্য রেনলের কণ্ঠস্বরও কাঁপতে লাগল, অবশ্য জুলিয়ান তা' জানতে পারল না। লাজুকতার সঙ্গে তাকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হচ্ছিল তাই নিজের মনের বাইরে আর কিছুই তার নজরে পড়ছিল না।

বাড়ীর ভিতরে ঘড়িতে পৌনে দশটা বাজল এবং তখনও কিছু বলবার সাহস হল না জুলিয়ানের। নিজের মনের কাপুরুষতা দেখে সে চটে উঠল। মনে মনে বলল—আজ সারা দিন ধরে ভেবে সন্ধ্যেবেলা যে কাজ করব ঠিক করেছি রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তা করব, নইলে দোতলার ঘরে গিয়ে নিজের মস্তিষ্ক উড়িয়ে দেব।

প্রতীক্ষার কয়েকটি উদ্বিগ্ন মুহূর্ত পার হল এবং জুলিয়ান এই ক্ষণগুলো আবেগে

আত্মহারা হয়ে কাটাল, অবশেষে তার মাথার উপরে ঘড়িতে রাত দশটা বাজল। ঘড়ির ঘণ্টার প্রতিটি আওয়াজ যেন তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল, তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠল।

অবশেষে ঘড়িতে শেষ ঘণ্টা বাজল, বাজনার রেশ তখনও ছড়িয়ে পড়ছিল··· জুলিয়ান হাত বাড়িয়ে মাদাম রেনলের হাত ধরল। অবশেষে সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা টেনে নেওয়া হল। কি যে সে করতে চলেছে তা' ভালভাবে না জেনেই জুলিয়ান দ্বিতীয়বার হাতখানা জড়িয়ে ধরল। আবেগে সে গভীরভাবে বিচলিত, তবু জড়িয়ে ধরা হাতখানা বরফের মতন ঠাণ্ডা অনুভব করে সে হতভম্ব হয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে হাতখানায় চাপ দিচ্ছিল। তার হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তিনি শেষ চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষে তাঁর হাত তার হাতেই রইল।

মাদাম দ্য রেনলের প্রতি ভালবাসার জন্য তার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল না, অবশেষে যন্ত্রণার এক ভয়ানক পরিস্থিতির অবসান ঘটার জন্য সে আনন্দিত। মাদাম দারভিল যাতে কোন কিছু সন্দেহ করতে না পারে তাই সে কথা বলতে বাধ্য হল। সেই মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর হয়েছে সুতীব্র এবং গম্ভীর ভাবপূর্ণ। অন্যদিকে মাদাম দ্য রেনলের কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে রুদ্ধ হচ্ছে বারে বারে এমনভাবে যে তাঁর বন্ধুর ধারণা হল যে, তিনি হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি তাঁকে বাড়ীর মধ্যে যেতে বললেন। জুলিয়ান তার বিপদের আঁচ পেল। সে ভাবল, মাদাম রেনল যদি এখন ড্রয়িং-রুমে ফিরে যান তবে সারাদিন যে যন্ত্রণা ভোগ করেছে আবার তাকে সেই ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। জয়ের সুযোগ হিসাব করার পক্ষে অতি সামান্য ক্ষণ আমি তাঁর হাত ধরে আছি।

মাদাম দারভিল ড্রয়িং-রুমে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, তার হাতের মুঠোয় ছেড়ে দেওয়া হাতখানা জুলিয়ান সজোরে চেপে রইল। ইতিমধ্যে মাদাম রেনল তাঁর আসন থেকে উঠে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবার বসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—'সামান্য শরীর খারাপ লাগছিল, তবে এই খোলা হাওয়ায় শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে।'

কথাগুলো জুলিয়ানের সুখ সুনিশ্চিত করল, এই মুহূর্তে সুখের মাত্রা চরম হয়ে উঠল। সে সমানে কথা বলতে লাগল, ভুলে গেল সব ভণ্ডামি ও ছলনা, শ্রোতা রমণী দু'জনের কাছে নিজেকে আরও উপযোগী করে তোলার জন্য সমানে কথা বলতে লাগল। তবু সবই একই সমান। তার এই নব-আবিষ্কৃত বাকপটুতার আড়ালে রয়েছে সামান্য সাহস-শূন্যতার ফল্গুধারা। সে খুব ভীত হয়ে উঠল কেননা ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ হিসাবে দারুণ জোরে বাতাস বইতে দেখে যদি মাদাম দারভিল বাড়ীর মধ্যে চলে যেতে চান তবে তাকে মাদাম দ্য রেনলের সঙ্গে একা বসে থাকতে হবে। তার মনে অবশ্য এক ধরনের অন্ধ সাহস আছে যার দ্বারা সে কোন কোন কাজ পারে। তবে তাঁর কাছে সহজ সরল কোনও মন্তব্য করার

মতন যে ক্ষমতা তার নেই তা' সে অনুভব করে। যাহোক তাঁর ভৎ‍র্সনা যত মৃদুই হোক সে পরাজিত হতে বাধ্য এবং যে সুযোগ সে লাভ করেছে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সৌভাগ্যবশত, সেদিন সন্ধ্যায় তার জোরালো এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরের আলাপে মাদাম দারভিল তার প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন, অথচ কথা বলার সময় ছেলে-মানুষের মতন তার লাজুকতায় তিনি তাকে একটা নিরেট আহাম্মক বলে ধারণা করে নিয়েছিলেন। আর মাদাম দ্য রেনল তখনও জুলিয়ানের হাতে হাত রেখে বসেছিলেন, তিনি কিছুই ভাবছিলেন না···যেন এমনিভাবে বেঁচে থাকাটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট। এই বিশাল লাইম গাছের নীচে সময় কাটতে লাগল, এটা তাঁর ভাল লাগার সময়···এবং জনরব যে, এই গাছটা চার্লস দ্য বোলড্ এখানে পুঁতে-ছিলেন। বাতাস দীর্ঘ লাইম পাতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে যেন কাতরাচ্ছে আর বৃষ্টির ফোঁটাগুলো উপর থেকে একেবারে নীচের পাতাগুলোর উপর ঝরে ঝরে পড়ছে···মাদাম একমনে কান পেতে আছেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জুলিয়ান কোন মন্তব্য করল না যাতে সে সুনিশ্চিত হতে পারে। এক সময় বান্ধবীকে একটা ফুল তুলে দেওয়ার জন্যে মাদাম আসন ছেড়ে উঠলেন, তাঁর হাতখানা জুলিয়ানের হাত-ছাড়া হল, অমনি একটা হাওয়ার ঝাপটা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। মাদাম বসে পড়লেন। আবার তিনি জুলিয়ানকে তাঁর হাত ধরতে দিলেন, কোনও ঝঞ্ঝাট হল না, যেন তাঁদের মধ্যে এটা একটা চুক্তি।

মাঝরাত নির্দেশ করে ঘড়ির ঘণ্টা অনেক আগেই বেজেছে। অবশেষে তাঁরা বাগান ছেড়ে উঠলেন এবং রাতের জন্যে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন। মাদাম রেনলের মন ভালবাসার আনন্দে ভরপুর, এমন অভিজ্ঞতা আগে তাঁর হয় নি তাই এর জন্যে নিজেকে তিনি এতটুকু তিরস্কার করলেন না। আনন্দ তাঁকে দু'চোখের পাতা এক করতে দিল না। আর জুলিয়ান মনে মনে সারাদিন ধরে ভীরুতা আর অহঙ্কারের লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সারা রাত কাঠের গুড়ির মতন পড়ে পড়ে ঘুমোল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় জুলিয়ানের ঘুম ভাঙল। সে মাদামের মনে কোনও চিন্তার উদ্রেক করতে পারে নি এবং তাহলে সেটা মাদামের কাছে নিষ্ঠুর হতাশার রূপ নিত। সত্যিই, জুলিয়ান তার কর্তব্য এবং বীরত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করেছে। চিন্তায় আনন্দ-ভরপুর মন নিয়ে নিজের ঘরেই সে বন্দী হয়ে রইল এবং তার বীরদের কাহিনী পড়ায় মন দিল।

দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা বাজল। গ্রাণ্ড আর্মির ঘোষণাপত্র পড়তে পড়তে জুলিয়ান সবকিছু ভুলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল গত সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা অর্জনের কথাও। নিচে ড্রয়িং-রুমে যাওয়ার পথে সে অস্ফুটে আওড়াল—'এই মহিলাকে বলব, আমি তাকে ভালবাসি।'

প্রণয়াবেগের মূর্তিমতীকে দেখার বদলে কুপিত মঁসিয়ে রেনলের সাথে জুলিয়ানের চোখাচোখি হল। ঘণ্টা দুয়েক আগে মঁসিয়ে রেনল শহর ভেরিয়ার থেকে ফিরে এসেছেন এবং সারা সকালটা ছেলেদের নিয়ে কাটাতে বাধ্য হয়ে কুপিত হয়েছেন। এ ধরনের ভদ্রলোকেরা যখন কুপিত হন এবং তাঁদের স্বাধীনতা জাহির করেন তখন তাঁদের কোপের প্রকাশ বড় জঘন্য হয়ে ওঠে।

স্বামীর প্রতিটি তিক্ত কথা মাদামের হৃদয় বিদীর্ণ করতে লাগল। আর জুলিয়ান! তার জীবনে গত সন্ধ্যায় যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে তারই আনন্দে তার মন কানায় কানায় ভরা, কয়েক ঘণ্টা ধরে সেই আনন্দের প্রলেপ তার দু'চোখে জড়িয়ে রয়েছে। তাই তাকে উদ্দেশ করে বলা এই সব কর্কশ কথার দিকে তার এতটুকু মন ছিল না, শুনছিল না মঁসিয়ে রেনলের কথা। অবশেষে কোন রকমে সে বলল—'শরীরটা খারাপ ছিল।'

উত্তর দেওয়ার এই ধরণ শুনে ভেরিয়ারের মেয়রের চেয়েও শান্ত মেজাজের মানুষ জুলিয়ানকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একটা প্রবাদ-বাক্য তাঁকে সংযত করল—কাজের ব্যাপারে কখনও তড়িঘড়ি করতে নেই। তাঁর মনে পড়ল, এ বাড়ীতে এই আহাম্মক নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই ভ্যালেনদ ছোকরাকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অথবা ছোকরা একদিন এলিসা-কে বিয়ে করে বসতে পারে। তাঁর মনে হল, এর যে কোন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে সে তাকে বোকা বানাবে।

মনের এসব ভাবনা সত্ত্বেও মঁসিয়ে রেনলের রাগ প্রকাশিত হল, এ ধরনের ইতর-ভাষার প্রয়োগে একসময় জুলিয়ান দারুণ বিরক্ত হল। মাদাম রেনল প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। দুপুরের খাওয়া প্রায় শেষ হওয়ার মুখে মাদাম সহসা জুলিয়ানকে বললেন তাঁর হাত ধরে বাইরে নিয়ে যেতে। তিনি একটু বেড়াবেন। বন্ধুর মতন তিনি তার হাত ধরে রইলেন। এবং তিনি যা' কিছু বললেন তার জবাবে জুলিয়ান কেবল বলল—'সব ধনীরাই এক।'

ওদের খুব কাছাকাছি হাঁটছিলেন মঁসিয়ে রেনল, এবং তাঁর উপস্থিতি জুলিয়ানকে আরও রাগান্বিত করল। সহসা জুলিয়ান দেখল একটা ইচ্ছার তাড়নায় ইঙ্গিতবহ অবস্থায় মাদাম রেনল তার দেহে ঠেস দিয়েছেন। তাঁর এই ব্যবহারে সে ভীত হল…কঠিন হাতে সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল।

সৌভাগ্যবশত এই নতুন অশিষ্টতার দৃশ্য মঁসিয়ে রেনলের চোখে পড়ে নি, তবে মাদাম দারভিলের নজরে পড়ল। তাঁর বন্ধু কাঁদতে লাগলেন, ঠিক তখনি চাষীদের একটা বাচ্চা মেয়ে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও যে ফলের বাগানের কোণ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে তাড়াবার জন্যে মঁসিয়ে রেনল পাথর ছুঁড়ছিলেন।

মাদাম দারভিল তাড়াতাড়ি বললেন—'মঁসিয়ে জুলিয়ান, দোহাই, নিজেকে সংযত করুন। মনে রাখবেন প্রত্যেকের জীবনেই রাগের মুহূর্ত আসে।'

জুলিয়ান তাঁর দিকে ঘৃণামিশ্রিত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল। তার দৃষ্টি দেখে মাদাম দারভিল দারুণ বিস্মিত হলেন এবং এই ভাবাবেগের কারণ আন্দাজ করতে পারলে তাঁর বিস্ময় আরও বাড়ত। তিনি ওর দৃষ্টিতে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণের অস্পষ্ট আভাষ দেখতে পেতেন। সন্দেহ নেই, এমনি ধরনের অসম্মানের মুহূর্তে রোবসপীয়েরের মতন মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল।

মাদাম দারভিল বান্ধবীর কানে ফিস ফিস করে বললেন—'তোমার এই জুলিয়ান ছোকরা বড় দুর্দান্ত, সে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

বান্ধবী জবাব দিলেন—'ওর রাগের কারণ রয়েছে। ছেলেরা ওর কাছে পড়াশুনা করে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, একদিন সকালে যদি ও না থাকে তাদের সঙ্গে তবে কি এসে যায়? নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, পুরুষরা বড় কঠোর।'

জীবনে এই প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক ধরনের ইচ্ছা মাদাম রেনল অনুভব করলেন। ধনীর প্রতি তিক্ত ঘৃণার অভিব্যক্তি দুরন্ত বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার জন্য জুলিয়ানের মনে ইচ্ছা জাগল। ভাগ্যগুণে মঁসিয়ে রেনল তখন বাগানের মালীকে ডাকলেন এবং কাঁটাগাছের ডাল পুঁতে বেআইনীভাবে চলাচলের পথটা বন্ধ করতে ব্যস্ত হলেন। অবশিষ্ট ভ্রমণ-পথটুকু তাকে অনেক সৌহার্দপূর্ণ কথা বলা হলেও জুলিয়ান কোন জবাব দিল না। মহিলা দু'জন ভ্রমণে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মঁসিয়ে রেনল ছাড়লেন না এবং অবশেষে জুলিয়ানকে বললেন তাদের দু'জনের হাত ধরে নিয়ে যেতে।

জুলিয়ানের উদ্ধত পাণ্ডুরবর্ণ মুখমণ্ডলের ভাব এবং তার দু'পাশে দুটি নারীর বিক্ষুব্ধ ও অতীব দুঃখজনিত মুখমণ্ডলের লজ্জারুণ ভাবের মধ্যে এক হৃদয়গ্রাহী সৌসাদৃশ্য দেখা দিল। তার মনে কোমল আবেগ থাকা সত্ত্বেও সে নারী দু' জনকেই ঘৃণা করে।

কি! মনে মনে সে বলল, পড়াশুনা শেষ করার জন্য বছরে মাত্র পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক সাহায্য তাকে দেওয়া গেল না। আমি কি করতে ব্যবসায়ে কাজ করব।

এই সব কঠোর চিন্তায় তার মন যখন নিমগ্ন তখন দুই বন্ধু তাকে বোঝাবার জন্য নানা সদয় কথা বলছিলেন এবং সেসব শুনে সে খুব ক্ষুব্ধ হল…কথাগুলো যেন অর্থহীন, দুর্বল…এক কথায় নারীসুলভ বাচালতা।

কথার পিঠে কথা বলা হচ্ছে, চেষ্টা হচ্ছে কথোপকথনের ধারা অটুট রাখতে …এক সময় মাদাম রেনল মন্তব্য করলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর এক চাষীর কাছ থেকে ভুট্টার খড় কেনার জন্য ভেরিয়ার থেকে চলে এসেছেন (এ সব অঞ্চলে বিছানার গদি বানাবার জন্যে ভুট্টার খড় ব্যবহার করা হয়)।

আবার এক সময় মাদাম রেনল বললেন—'আমার স্বামী এখন আর আমাদের কাছে আসবেন না। বাড়ীর সব বিছানার গদি ঠিক করার জন্যে খানসামা আর মালীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। সকালের দিকে এবাড়ীর একতলার সব ঘরের বিছানার গদি ফিরে ভরতি করিয়েছেন। এখন দোতলার ঘরগুলোর

ব্যবস্থা করছেন।'

জুলিয়ানের চিবুকের রঙ উবে গেল। সে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে মাদামের দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মাদামের কাছে এল এবং তাঁর হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বলল—'আমার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করুন! আপনিই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারেন, কেননা জানেন ত খানসামা আমার শত্রু। স্বীকার করছি মাদাম, আমার কাছে একজনের ছবি আছে। বিছানার গদির নীচে সেখানা লুকোন আছে।'

ওর কথা শুনে মাদামের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

—'এখন একমাত্র আপনিই আমার শোবার ঘরে ঢুকে ছবিখানা আনতে পারেন। একদম জানালার কাছেই গদির তলায় হাত দিলে একটা চৌকো ছোট কার্ড-বোর্ডের বাক্স পাবেন। ওটা খুব ঝকৃঝকে।'

মাদাম নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছিলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন—'ওর মধ্যে ছবিখানা আছে বুঝি?'

জুলিয়ান মাদামের মুখে মানসিক অশান্তির চিহ্ন স্পষ্ট দেখল। এবং সে তার সুযোগ নিল। বলল—'আপনার দ্বিতীয় অনুগ্রহ চাইছি, মাদাম। দয়া করে বাক্সটা খুলবেন না।'

খুব ক্ষীণ স্বরে মাদাম আওড়ালেন—'গোপনীয়।'

যদিও একদল ধন-সম্পদে অহঙ্কারী এবং অর্থগৃধ্নু লোকের মধ্যে মাদাম লালিত-পালিত হয়েছেন, তবু আজ প্রেমের মুকুল ধরেছে তাঁর হৃদয়ে। নিষ্ঠুরতা তাঁর মনে আঘাত করলেও আত্মসমর্পণের আবেশ মাখানো মৃদু কণ্ঠে মাদাম ওই জিনিসটা নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে সব কিছু জুলিয়ানের কাছ থেকে জেনে নিলেন।

যেতে যেতে আপন মনে তিনি বললেন—'তাহলে ছোট্ট একটা গোল বাক্স, ঝকৃঝকে কালো কার্ড-বোর্ডের।'

বিপদে-পড়া পুরুষের মতন অনুভূতিহীন কণ্ঠে জুলিয়ান বলল—'হাঁ, মাদাম।'

যেন মরণের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে এমনিভাবে ধীরে ধীরে মাদাম পল্লী-নিবাসের দোতলায় উঠলেন। নিদারুণ মনের কষ্টে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু জুলিয়ান চাইছে, এই চিন্তা তাঁকে সবল করে তুলল। মনে মনে তাই তিনি বললেন, বাক্সটা আমাকে পেতেই হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জোরে পা চালালেন।

মাদাম শুনতে পেলেন তাঁর স্বামী খানসামার সাথে কথা বলছেন।

তিনি গদির নীচে সজোরে হাত ঢোকালেন। হাতের চামড়া ঘষে গেল। যন্ত্রণা গ্রাহ্য করলেন না, কেননা চক্চকে ছোট বাক্সটা পাওয়ার জন্য তাঁর মন অধীর। সেটাকে টেনে বার করে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। স্বামীর হাতে ধরা পড়ার ভয় ঘুচতে না ঘুচতেই মাদামের মনে নতুন ভয় দেখা দিল।

তাঁর জ্ঞান হারানোর মতন অবস্থা হল। তিনি ভাবলেন, তাহলে জুলিয়ান কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং আমি সেই মেয়ের ছবি এখানে ধরে আছি।

নিভৃত কক্ষে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট মাদাম ভয়ঙ্কর হিংসার শিকার হয়ে পড়লেন। ভয়ানক অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর মনের উপর এই মুহূর্তে প্রভাব ছড়াল···বিস্ময় তাঁর দুঃখের ভার লাঘব করল। ঠিক তখনি জুলিয়ান ঘরে ঢুকল। একটি কথাও না বলে, কোন রকম ধন্যবাদ না জানিয়ে সে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে সে দেয়াশলাই জ্বেলে বাক্সটা পুড়িয়ে ফেলল। সে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়ল, কেননা যে বিপদের মুখে সে পড়েছিল সেটা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিহ্বল হয়েছিল।

মনে মনে সে বলতে লাগল···নেপোলিয়নের ছবি এমন একটা মানুষের ঘরে লুকোন রয়েছে যার পেশা হচ্ছে অন্যায়ভাবে দখলকারীদের ঘৃণা করা! এবং সেখানা হাতে পাচ্ছেন মঁসিয়ে রেনলের মতন মানুষ যিনি হচ্ছেন অতি আধুনিক এবং তাঁর প্রতি বিরক্ত। এবং বোকামির চরম প্রমাণ, ও ছবির পিছনে সাদা কার্ডবোর্ডে নিজের হাতে লেখা কয়েকটা ছত্র। এবং প্রেমপ্রকাশের প্রতিটি লেখাই তারিখ-সমন্বিত। কয়েকটি ত পরশুদিন লেখা! এই নিদর্শনের দ্বারাই আমার সব সম্মানই নস্যাৎ, ভূমিস্যাৎ। বাক্সটা পুড়ছে আর তাই দেখতে দেখতে জুলিয়ান ভাবছে···এবং তবুও দোহাই ঈশ্বর, কি জীবন!

ঘণ্টাখানেক পরে অবষন্ন এবং আত্মসমবেদনায় ভরপুর মনে জুলিয়ান প্রেমের সন্ধানে মাদাম রেনলের সাথে দেখা করল। এবং তাঁর হাতে গভীরভাবে চুম্বন এঁকে দিল। কিন্তু মনের হিংসার জ্বালায় তিনি নিঃসাড় হয়ে রইলেন। মাদাম রেনলের মধ্যে জুলিয়ান কেবল একজন ধনী মহিলার রূপ দেখল। তাই ঘৃণার সঙ্গে তাঁর হাত সরিয়ে দিল। তারপর নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল···তার অধরে ফুটে উঠল একচিলতে তিক্ত হাসি।

১০ : উদার হৃদয় এবং সামান্য জমিদারী

যৌন-ভালবাসা—হোক একান্ত গোপনীয়, তবু নয়
একনিষ্ঠ এমনকি থাকুক না তার আঁধার-আড়াল,
যেমন কালো আকাশ জানান দেয় আসছে দুরন্ত ঝড়।
—ডন যুয়ান

একটার পর একটা ঘরের কাজ শেষ করতে করতে মঁসিয়ে রেনল অবশেষে ছেলেদের ঘরে এসে হাজির হলেন, তাঁর সঙ্গে চাকররা গদিগুলো বয়ে আনছিল। এই মানুষটির আকস্মিক অনুপ্রবেশ জুলিয়ানের কাছে শেষ অবলম্বন বলে মনে হল। বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরও বিষণ্ণ গম্ভীর করে জুলিয়ান তাঁর কাছে ছুটে গেল। চাকরদের দিকে তাকিয়ে মঁসিয়ে রেনল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জুলিয়ান বলল—'স্যার আপনার কি ধারণা যে, আপনার ছেলেরা আমার

চেয়ে অন্য শিক্ষকের কাছে বেশী উন্নতি করত ?'

তারপর তাঁকে জবাব দেওয়ার সময় না দিয়ে জুলিয়ান আবার বলল—'যদি আপনার জবাব হয় 'না', তাহলে আমি ওদের পড়ানোয় অবহেলা করছি এ অনুযোগ কেন করলেন ?'

এই চাষী ছোকরার বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে মঁসিয়ে রেনল ভীত হয়ে পড়লেও, ভয় থেকে মুক্তি পেলেন। তাকে ত্যাগ করবেন ভাবছিলেন।

জুলিয়ানের মনে রাগ বাড়ল। সে বলে উঠল—'আপনার সাহায্য ছাড়াও আমি বাঁচতে পারব স্যার।'

মঁসিয়ে রেনল বললেন—'তোমাকে এমন ক্ষুব্ধ দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

চাকররা তখন ফিট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে বিছানার গদি ঠিক করছিল।

রাগে তখন জুলিয়ান আত্ম-হারা। সে বলতে লাগল—'ওটা আমি চাই না, স্যার। যে অপমানজনক কথাগুলো আপনি মহিলাদের সামনে আমাকে বলেছেন সেগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন।'

মঁসিয়ে রেনল স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, জুলিয়ান কি চাইছে, এক যন্ত্রণাদায়ক অসোয়াস্তিতে তাঁর হৃদয় দু'টুকরো হয়ে গেল।

জুলিয়ান প্রচণ্ড রাগে যেন ক্ষেপে গেল, বলল—'আপনার গৃহ ছেড়ে কোথায় যেতে হবে আমাকে তা' জানি।'

ওর কথা শুনে মঁসিয়ে দ্য রেনল স্পষ্ট দেখলেন যে, জুলিয়ান ওই ভালেনদের বাড়ী গিয়ে উঠছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি শল্য-চিকিৎসককে ডাকছেন এমনভাবে বললেন—'বেশ মশায় যা' চাইছেন তাই দেব। আগামীকাল মাস-পয়লা, কাল থেকেই আপনাকে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আরও বেশী বেতন দেব।'

বজ্রাহতভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তার দারুণ হেসে উঠবার ইচ্ছা হল। তার মন থেকে সব রাগ উবে গেছে। মনে মনে ভাবল, ওই ইতরটার উপর ততটা ঘৃণা হয় না। এ ধরনের নীচমনাদের ক্ষমা প্রার্থনার এটাই সেরা রীতি।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছেলেরা সব শুনছিল···তারা বাগানে ছুটল মা-কে খবর দিতে যে, মঁসিয়ে জুলিয়ান দারুণ রেগে গেছেন তবে মাসে তিনি আরও পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বেশী বেতন পাচ্ছেন।

অভ্যাস অনুযায়ী রাগান্বিত মঁসিয়ে রেনলকে ছেড়ে জুলিয়ান ছেলেদের পিছনে চলল।

মেয়র তখন ভাবছিলেন যে মঁসিয়ে ভালেনদের জন্যই তাঁর এক শ' ষাট ফ্রাঙ্ক গচ্চা যাচ্ছে। সত্যিই আমার উচিৎ ছিল অনাথ-আশ্রমে সরবরাহের চুক্তি নিয়ে সোজাসুজি ওর সাথে কথা বলা।

এক মুহূর্ত পরেই জুলিয়ান সোজা এসে মেয়রের সামনে দাঁড়াল। বলল—'নীতিজ্ঞান সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য আমি একবার মঁসিয়ে চেলানের সাথে

দেখা করব। তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে, আজ কয়েকঘণ্টা অনুপস্থিত থাকব।'

মঁসিয়ে রেনল কৃত্রিম হাসি হেসে বললেন—'প্রিয় জুলিয়ান, বেশ ত সারাদিন থেক। ইচ্ছে করলে কালকের দিনটাও ছুটি নিতে পার বন্ধু। মালীর ঘোড়াটা নিয়ে যাও, ভেরিয়ার শহর ঘুরে আসতে পারবে।'

উনি ভাবলেন, জুলিয়ান যাচ্ছে ভালেনদকে তার জবাব দিতে। আমার কাছে ছোকরা অবশ্য কথা দেয় নি তবে ওর পক্ষে এখন শান্ত হওয়াই ভাল। মাথাটা ঠাণ্ডা হোক।

জুলিয়ান তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বনের দিকে চড়াইয়ের পথ ধরে হাঁটতে লাগল—এ পথেই লোকে ভারজি থেকে ভেরিয়ার যায়। সে খুব তাড়াতাড়ি মঁসিয়ে চেলানের বাড়ী যেতে চায় না। আবার একটা কপটাচারী দৃশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা তার নেই। সে এখন স্পষ্ট করে নিজের হৃদয়ের আলেখ্য দেখতে চায়।

লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর বনের নির্জনতায় পৌঁছে সে মনে মনে আওড়াল—একটা লড়াই আমি জিতেছি। মনের এই প্রতিক্রিয়া সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে রঙীন করে তুলল এবং মনে শান্তি খুঁজে পেল। তাহলে এখানেই রইলাম আর আমার মাসিক বেতন বাড়ল পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক। মঁসিয়ে ছ্য রেনল নিশ্চয় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিসের জন্য? এমন ভাগ্যবান আর প্রভাবশালী লোক কাকে এমন ভয় করেন, অথচ একটু আগেই তিনি রাগে ফুলছিলেন এবং সেই কুপিত মেজাজ একেবারেই এখন ঠাণ্ডা। কিছুক্ষণের জন্য হু'ধারের অরণ্য-শোভা তাকে বিমোহিত করল। বহুকাল আগেই পর্বত থেকে খসে-পড়া বিশাল বিশাল পাথরের খণ্ডগুলো বনের মধ্যে বিরাজ করছে। দীর্ঘ-দেহ প্রায় পর্বতের মতন উঁচু পত্রবহুল বিট-গাছগুলো সজীব ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ মাত্র হু' পা দূরে ঝাঁঝালো রোদে মাথা রাখা দায়।

ছায়ায় ঢাকা বিশাল পাথরের উপর বসে জুলিয়ান কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল এবং তারপর আবার উৎরাই পথে উঠতে লাগল। ছাগল পালকদের চলাচলের সুঁড়িপথ ধরে একসময় সে একখানা বিশাল পাথরের উপর এসে হাজির হল··· এখানে সে নিশ্চিত যে, কেউ কোথাও নেই। এমনই অবস্থায় হাজির হওয়ার পর তার মুখে হাসি ফুটল···এমন একটা স্থান সে মন-প্রাণ দিয়ে খুঁজছিল। এটা যেন তার কাছে নৈতিক জগৎ। বিশাল পর্বতের সজীব হাওয়া তার মন ভরিয়ে দিল, সে প্রশান্তি লাভ করল এবং আনন্দিত হল। তার দৃষ্টিতে ভেরিয়ারের মেয়র তামাম বিশ্বের ধনী ও উদ্ধত মানুষদের প্রতিভূ। তাদের ভয়ানক সব কর্মানুষ্ঠানের একজন হোতা। তাই ওদের প্রতি যে ঘৃণা জন্মেছে তা' ব্যক্তিগত নয়। মঁসিয়ে রেনলের সঙ্গে তার দেখা না হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু ভুলে যেত···ভুলে যেত তাঁর পল্লীনিবাস, তাঁর কুকুরদের, ছেলেদের এবং আসবাবপত্রের কথা। সে ভাবল, জানি না কেমন করে তবে আমি তাকে ক্ষতি

স্বীকার করতে বাধ্য করেছি। কি হবে বছরে পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রার ক্ষতি হলে ? এক মুহূর্ত আগে জীবনের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে আমি বেঁচে গেছি! কাজেই এক দিনে দু'বার বিজয়ী হয়েছি। দ্বিতীয় বিজয়ের মধ্যে কোন বুদ্ধির স্পর্শ নেই…কেন এমনটা হল সেটাই এখন আমাকে অনুমান করতে হবে। এই ক্লান্তিকর বিশ্লেষণ করার জন্য আগামীকাল অনেক সময় পাব।

বিশাল একখানা পাথরের উপর উঠে দাঁড়াতেই জুলিয়ান দেখতে পেল, সারা আকাশ আগস্টের অস্তগামী সূর্যের আলোকে যেন জ্বলছে। মাঠের মধ্যে বুলবুলিরা কিচির মিচির করছে। ওরা যখন থামল তখন চারধারে গভীর নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ের সানুদেশে বিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র…মাঝে মাঝে মাথার উপর চড়াই-শিকারী বাজপাখী চক্রাকারে উড়ছে। যান্ত্রিকভাবে জুলিয়ানের নজর শিকারী পাখীর উপর পড়ল। তার শক্তিময় অথচ শান্ত উড়ার কৌশল দেখে সে অবাক হল—এমন শক্তি, এমন একাকীত্বকে সে হিংসা করে।

এমনি ছিল নেপোলিয়নের ললাট-লিখন…একদিন তারও কি এই হবে ?

১১ : একটি সন্ধ্যা

তবু জুলিয়ার ঔদাসীন্যে ছিল স্নেহশীলতা, এবং ভীরু শান্ত তার দু'খানা ক্ষুদ্র কর-কমল ছাড়ল তার করকমলের আশ্রয় স্বতঃই, তবু রয়ে গেল সামান্য একটি পেষণের স্মৃতি, শিহরণময় এবং এত স্নিগ্ধতার মৃদু স্পর্শ, এত মৃদু যে, মনের পটে একটা সন্দেহের আবেশ আনল।

—ডন যুয়ান

জুলিয়ান সশরীরে ভেরিয়ার শহরে হাজির হয়েছিল। যাজকের বাড়ী থেকে চলে আসার পথে আকস্মিকভাবে তার সঙ্গে মঁসিয়ে ভালেনদের দেখা হয়ে গেল এবং সে ব্যস্তভাবে তার পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বেতন-বৃদ্ধির খবরটা তাকে জানাল।

ভার্জিতে ফিরে আঁধার না নামা পর্যন্ত জুলিয়ান বাগানে গেল না। সারা দিন ধরে নানা ধরনের তীব্র আবেগ ও উত্তেজনার আনা-গোনায় তার মন ক্ষত-বিক্ষত। মহিলাদের কথা মনে পড়তেই সে ভাবল, কি বলব আমি ওদের ? সে বুঝতে অক্ষম যে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার মনের এই আশঙ্কা কেবল নারী-মনেই আগ্রহ সৃষ্টি করে! মাদাম দারভিল এবং তাঁর বন্ধুর কাছে সে অপরিহার্য হলেও তাঁদের কাছে সে যা-কিছু বলেছে তা' তার নিজের কাছেই একেবারে অজানা।…সাহস করে বলা যায় যে, ওঁদের যৌন-কামুকতার তাড়না এই যুবকের মনে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করেছিল। এমন প্রত্যেক দিন ঝড়ো আবহাওয়া একেবারেই অসাধারণ ব্যাপার।

সেদিন সন্ধ্যায় জুলিয়ান যখন বাগানে এল তখন সুন্দরী দুই বন্ধুর সম্পর্কে আগ্রহ তার মাথায় কিলবিল করছিল। তার জন্যে তারা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রতিদিনকার মতন সে মাদাম দ্য রেনলের পাশে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। সে একখানা সাদা হাত ধরবার চেষ্টা করল, অনেকক্ষণ ধরে হাতখানা যেন ধরা দেওয়ার জন্যে তার চেয়ারের পিঠে পড়ে আছে। সামান্য দ্বিধা···অবশেষে হাতখানা যেন বিরক্তিতে সরে গেল। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা নিয়ে জুলিয়ান আনন্দে বক্‌বক্ করছিল এমন সময় শুনতে পেল যে, মঁসিয়ে রেনল এদিকেই আসছেন।

সেই সকালের নিষ্ঠুর অপমানের কথাগুলো তখনও জুলিয়ানের কানে বাজছিল। ভাবল, ওই অহঙ্কারী ধনী মানুষটার উপস্থিতিতেই তার বউয়ের হাত ধরে একান্তে বসে থাকলে মন্দ হয় না! হাঁ, তাই করব—যার সঙ্গে ঘৃণিত ব্যবহার করেছে সেই আমি ওই কাজ করব।

তখন থেকেই ওর স্বভাবের দ্বিধা-ভাবটুকু দ্রুত বিলুপ্ত হল। মাদাম রেনল তাঁর হাত ধরে থাকতে সম্মতি দিন এই চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাকে উদ্বিগ্ন করল না।

মঁসিয়ে রেনল রাজনীতি নিয়ে রাগতভাবে আলোচনা করছিলেন। ভেরিয়ার শহরের দু'তিন জন শিল্প-কারখানার মালিক তাঁর চেয়ে ধনী হয়ে উঠছিল এবং তারা নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছিল। মাদাম দারভিল তাঁর কথা শুনছিলেন। এসব কথা শুনে জুলিয়ান দারুণ বিরক্তি বোধ করছিল, সে তার চেয়ারখানা মাদাম রেনলের দিকে সরিয়ে আনল। তার আচরণ অন্ধকারে ঢাকা। এবার সে মাদামের পেলব নগ্ন হাতখানা জড়িয়ে ধরার জন্য মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল। দারুণ উত্তেজিত সে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। ওই সুন্দর বাহুর উপর অধর-স্পর্শ বুলিয়ে দেওয়ার জন্য সে ঝুঁকল।

মাদাম রেনল কেঁপে উঠলেন। তাঁর স্বামী কেবল ফুট চারেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি জুলিয়ানের হাতে হাত রেখে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। আর মঁসিয়ে রেনল তখনও অনামী লোকদের আর ধনী জ্যাকোবিনদের মুণ্ডুপাত করছিলেন। জুলিয়ান মাদামের হাতের উপর যৌন-লালসা-মাখা চুম্বন এঁকে দিতে লাগল, অন্ততঃ মাদামের তাই মনে হল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দিনেই হতভাগিনী নারী প্রমাণ পেয়েছেন, যদিও তিনি তাকে মনে মনে কামনা করেন এবং সে তাঁর কাছে স্বীকার করে নি, তবু সে অন্য নারীকে ভালবাসে। আর তাই যতক্ষণ জুলিয়ান অনুপস্থিত ছিল ততক্ষণ তিনি নিরানন্দের শিকার হয়েছিলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, আমি কি ওকে ভালবাসতে পারি, ওর জন্যে পারি ভালবাসা অনুভব করতে? আমার মতন একজন বিবাহিতা নারী ভালবাসায় পড়তে পারে? তবু তিনি ভাবলেন, স্বামীর জন্যে আমার মনে এমন

নিষিদ্ধ, গোপন ভালবাসা ত জন্মায় নি, তাই জুলিয়ানকে দৃষ্টির আড়াল করতে পারি না। অবশ্য সে শিশু, আমাকে শ্রদ্ধা করে। এটা কাজেই বোকামি হচ্ছে! এই যুবকের প্রতি আমার মনের এই অবস্থা জানতে পারলে আমার স্বামীর কি অবস্থা হবে? জুলিয়ানের সাথে আমার কাল্পনিক বাক্যালাপ শুনে মঁসিয়ে রেনল বিরক্তি বোধ করেন। কারণ তিনি তাঁর ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। তাঁর কাছ থেকে কিছুই নিয়ে আমি জুলিয়ানকে দিই না।

এমন যৌন-লালসা যা' আগে কোনদিন মনে স্থান পায় নি, তার আঘাতে একটি নিরপরাধ মন ছন্নছাড়া হয়ে উঠল এবং এর মধ্যে কোন কপটচারিতা ছিল না। অজান্তে তিনি নিজেকে নিজে ঠকালেন, তবু তাঁর মনের সহজাত নীতিবোধ শঙ্কিত হল। তাই জুলিয়ান যখন বাগানে এল তখন তাঁর মধ্যে এমনিভাবে মানসিক দ্বন্দ্ব সুরু হল। তিনি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাঁর পাশে বসতে দেখলেন। এবং গত এক পক্ষকাল যে মন্ত্রমুগ্ধকর আনন্দের স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তা' তাঁর কাছে আরও বিস্ময়ের মনে হল। সব কিছুই তাঁর জীবনে আকস্মিকভাবে ঘটেছে। তাই কয়েক মুহূর্ত পরে মনে মনে তিনি আওড়ালেন: কেবলমাত্র জুলিয়ানের উপস্থিতি কি তার সব দোষ অপনোদন করতে পারে? ভীত হলেন তিনি...এবং সেই মুহূর্তে হাতখানা সরিয়ে নিলেন।

কিন্তু তার যৌন কামনা-রাঙা চুম্বনের স্পর্শ লাভ করে তিনি ভুলে গেলেন যে, জুলিয়ান অন্য নারীতে সমর্পিত মন। তাই সে আর তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধী নয়। সন্দেহের দংশন থেকে মুক্তি এবং অকল্পনীয় সুখের অনুভূতি তাঁর মনে আনন্দের উল্লাস সৃষ্টি করল...বন্য এবং অপরিমিত আনন্দ।

সেই সন্ধ্যা একমাত্র ভেরিয়ার শহরের মেয়র ছাড়া আর সকলের কাছে আনন্দময় হয়ে উঠল...মেয়র শুধু তাঁর অর্থ-গৃধ্নু শিল্প-কারখানার মালিকদের কথা ভাবছিলেন। জুলিয়ান এখন আর তার অপূর্ণ উচ্চাশার কথা ভাবছে না, তার জীবনের ভবিষ্যৎ দুঃসাধ্য পরিকল্পনার কথা। কেননা জীবনে এই প্রথম সে সৌন্দর্যের স্রোতে ভেসে চলেছে। অস্পষ্ট আর মধুর স্বপ্নের আবেশ...এমন আবেশ এতকাল তার কাছে ছিল অজানা। পেলব করকমলে মৃদু নিস্পেষণ, পত্র-বহুল লাইম গাছের ঝোপে রাত-বাতাসের কানাকানি...দৌবের তীরে কারখানার ধার থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক...তার স্বপ্নাবিষ্ট মনে সাড়া জাগাল।

এই আবেগ হচ্ছে আনন্দ, যৌন-লালসা নয়। তাই নিজের ঘরে যখন ফিরে এল তখন তার চিন্তা এক ধরনের আনন্দে রূপান্তরিত হল, নিজের প্রিয় গ্রন্থখানা সে হাতে তুলে নিল। বিশ বছর বয়সে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং তার ফলাফল অন্য সব কিছুর চেয়ে তার মনকে বেশী আচ্ছন্ন করে।

হাতের বই রেখে দিল জুলিয়াম। নেপোলিয়নের বিজয় তার জীবনের নতুন বিষয় সম্বন্ধে শঙ্কিত করে তুলল। মনে মনে সে ভাবল—হাঁ, একটা

লড়াইয়ে আমি বিজয়ী হয়েছি। এবার আমি আমার সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করব। এই জেদী যখন বিশ্রাম করছে আমি তখনই তার অহঙ্কার চূর্ণ করব। এবং এটাই হচ্ছে সত্যিকারের নেপোলীয়ন রণ-চাতুর্য। তিনদিনের ছুটি নিয়ে আমার বন্ধু ফোকের সাথে দেখা করতে যাব। ছুটি না দিলে রাগ দেখাব এবং তখন রাজী হবে।

মাদাম রেনল একটুও ঘুমোতে পারলেন না। জুলিয়ান যখন তাঁর করকমলে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিচ্ছিল তখনকার সুখানুভূতি তিনি ধরে রাখতে পারছিলেন না··· তাঁর মনে হচ্ছিল যেন এই মুহূর্তে তাঁর দেহে প্রাণ নেই।

সহসা তাঁর সামনে একটা শব্দ ঝলসে উঠল···ব্যভিচার। প্রেমের সঙ্গে ব্যভিচারের এক ধরনের নিম্নস্থানীয় সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে দৈহিক সম্পর্ক···এখন সেই সম্পর্কের কথা মনে পড়তেই জুলিয়ানের সঙ্গে তাঁর নিষ্কাম, পবিত্র এবং শান্ত প্রেম-মূর্তি আবিল হল। তাই ভবিষ্যৎ তাঁর সামনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। নিজেকে তাঁর ঘৃণার বস্তু বলে মনে হল।

এ এক ভীতিজনক মুহূর্ত···তাঁর মন যেন এক অজানা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। বিগত সন্ধ্যায় তিনি অপরিমিত সুখ উপভোগ করেছেন, এমন সুখ তিনি পূর্বে কখনো উপভোগ করেন নি, আর এখন সহসা তাঁর জীবন দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আবিল। এমনভাবে কোনও মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তা' তাঁর কাছে অজানা, এর ফলে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। একবার ভাবলেন যে, তাঁর এই প্রেমে-পড়া অবস্থার কথা স্বামীর কাছে স্বীকার করবেন। অন্ততঃ একবার জুলিয়ানের নাম উচ্চারণ করবার তাঁর সুযোগ হবে। কিন্তু তাঁর মাসির বলা বহুদিনের একটা সাবধানবাণী তাঁর মনে পড়ল। বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে কোন্ কোন্ কথা গোপন রাখতে হবে তারই উপদেশ। দারুণ বিষণ্নতায় তিনি হাত কচলাতে লাগলেন।

নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক ভিন্নধর্মী যন্ত্রণাদায়ক চিন্তায় তাঁর মন ভারি হয়ে উঠল। একবার ভাবলেন হয় ত কেউ তাঁকে ভালবাসে না, আবার ভয়ঙ্কর চিন্তায় তাঁর মন খান্ খান্ হল, তিনি যন্ত্রণায় অধীর হলেন···যেন আগামীকাল সকালে ভেরিয়ার শহরের পাবলিক স্কোয়ারে ব্যভিচারের দায়ে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান হবে এবং সবাই যাতে তাঁর অপরাধের কথা জানতে পারে তাই তাঁর পিঠে একখানা বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

জীবন সম্বন্ধে মাদাম রেনলের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপরাধী অথবা জনগণের কাছে বিশ্রীভাবে নিন্দার্হ···এই দুই অবস্থার মধ্যে বিরামের কথা কখনও তিনি চিন্তা করতেন না যদি তিনি তখন জেগে থাকতেন।

যখনই ব্যভিচার আর লোক-অপবাদের কথা মনে পড়ে, কল্পনা করেন এই অপরাধের জন্য দুর্ভোগের ছবি তখনই তাঁর মনের শান্তি লোপ পায়···মুছে যায় জুলিয়ানের সঙ্গে মধুর প্রেম-জীবন যাপনের আশা। অমনি তিনি ভাবেন যে,

জুলিয়ান অন্য মেয়েকে ভালবাসে। ছবিখানা হারাবার ভয়ে তার বিবর্ণ মুখের বিবর্ণ ছবি তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন। সাধারণভাবে শান্ত এবং মহানুভব একখানা মুখে সেই প্রথম তিনি ভয়ের চিহ্ন দেখলেন। এর আগে তাঁর অথবা তাঁর ছেলেদের সম্বন্ধে জুলিয়ান এত আগ্রহ কোনদিন দেখায় নি। এটাই মানব-জীবনের সব-সেরা দুঃখ এবং তাকে এই দুঃখ ভোগ করতে হয়। কি করছেন বুঝতে না পেরে মাদাম চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ঝিয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানার পাশে সহসা তিনি আলো দেখতে পেলেন। এলিসা-কে চিনতে পারলেন।

সাময়িকভাবে তিনি যেন প্রলাপ বকলেন—'তুমি ওকে ভালবাস বুঝি?'

তার নিজের মতন গিন্নীকেও সেই একই দুঃখে দুঃখিনী দেখে ঝি অবাক হয়ে গেল এবং কোন রকম মন্তব্য করতে পারল না। মাদাম রেনল নিজের হঠকারিতা বুঝতে পারলেন। বললেন—'দেখ আমার জ্বরভাব হয়েছে। মাথাটা হাল্কা লাগছে। আমার কাছে থাক।'

আত্ম-সংযমের জন্য তিনি পুরোপুরি জেগে উঠলেন, তাঁর দুঃখের ভার কিছুটা কমল। আধ-ঘুম আধ-জাগরণে যা পারে নি এখন যুক্তি সব কিছু সরিয়ে দিল। পরিচারিকার বিস্মিত দৃষ্টি দূর করার জন্য তিনি তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে বললেন। এবং তার পড়া শুনতে শুনতে তিনি ঠিক করলেন যে, জুলিয়ানের সাথে এরপর দেখা হলে তিনি আর আগ্রহ দেখাবেন না।

১২ : ভ্রমণ

পরের দিন ভোর পাঁচটা বাজল।

মাদাম রেনলের সাথে দেখা হওয়ার আগেই জুলিয়ান তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিল। আশার বিরুদ্ধেই তার মন মাদামের দেখা পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠল। বার বার ভাবতে লাগল তাঁর পেলব নগ্ন বাহুর কথা। বাগানে বেরিয়ে এল জুলিয়ান। অনেকক্ষণ বসে রইল। দৃষ্টি থাকলে সে দেখতে পেত, উনি আধ-বন্ধ জানালার খড়খড়ির আড়ালে চোখ পেতে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন তাকে। অবশেষে উনি বাগানে আসবেন ঠিক করলেন। সবলা মহিলা মনে মনে উদ্বিগ্ন, লজ্জারুণ মুখমণ্ডল, স্বাভাবিক শান্তভাব রাগে বিপর্যস্ত। জীবনের ছোটখাট সমস্যায় ক্ষত-বিক্ষত মানসিক অবস্থা তাঁর মুখমণ্ডল অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছে।

শালের নীচে সুন্দর পেলব দু'খানা বাহু···প্রশংসা করার জন্য জুলিয়ান এগিয়ে গেল দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে। সকালের মৃদু হাওয়ার শান্ত পরিবেশে তাঁর অঙ্গের রূপ যেন ঝলমল করছে, মুখমণ্ডলে চিন্তার ছাপ। আর জুলিয়ানের মনে এই রূপের, যা' নাকি ধনী গৃহ ছাড়া নিম্নস্তরের কোথাও চোখে পড়ে না, সেই রূপের প্রশংসায় ভরপুর। তবু তাঁর মুখের বরফ-ঠাণ্ডা নির্লিপ্ততা দেখে জুলিয়ান অবাক হল।

আনন্দের হাসি অধরে ফুরিয়ে গেল জুলিয়ানের। মনে পড়ল, সমাজের কোন্ স্তরের সে মানুষ এবং একজন ধনী বড় ঘরের উত্তরাধিকারিণী তাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন। এই মুহূর্তে তার মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন, শুধু দু'চোখে ঘৃণার স্ফুরণ···নিজের উপর তার নিজের রাগ হচ্ছে। এমন অসম্মানজনক ব্যবহার পাওয়ার জন্যই সে যেন তার চলে যাওয়া একটা ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছিল। তাই তার রাগ আর ঘৃণা এমন দুর্বার হয়ে উঠছে।

মনে মনে সে আওড়াল, সে বোকা তাই অপরের কথা ভেবে রাগ করছে। পাথর মাটিতে থাকে নিজের ভারে, তাই পড়ে না। চিরকাল কি আমি শিশু থাকব? আর কবে আমার বোঝবার জ্ঞান হবে যে, ওদের অর্থ আছে বলে আমি ওদের কাছে আমি আমার আত্মা বিক্রয় করছি? ওদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে হলে আমাকে দেখাতে হবে যে, দারিদ্র্যের জন্য আমার শ্রম বিক্রয় করলেও আমার মন তখন থাকে বহুদূরে, এমন স্থানে যেখানে ওদের অসম্মান আর অনুগ্রহের ঘৃণা পৌঁছতে পারে না।

সারাক্ষণ একটার পর একটা এমনি ধরনের চিন্তা যুবক শিক্ষকের মনে তোলপাড় করতে লাগল এবং তার মুখে আহত সম্মানের ছাপ পড়ল। এ সব দেখে মাদাম রেনল ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভেবেছিলেন, নির্লিপ্তভাবে তাকে গ্রহণ করবেন, এখন নির্লিপ্ততা সহসা আগ্রহের সৃষ্টি করল এবং তাঁর মনে নানা কথা আনা-গোনা করতে লাগল। জুলিয়ানের বিচার-বোধ এটুকুই বুঝিয়ে দিল যে, মাদামের সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষে সে কত নগণ্য। তাই তার ভ্রমণের সম্পর্কে মাদামকে কোন কিছু না বলে সে নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

চলে যাওয়ার সময় ওর মুখের বিরক্তিভাব তিনি দেখতে পেলেন, অথচ কাল সন্ধ্যায় ওই মুখে বন্ধুত্বের চিহ্ন দেখেছিলেন। এমন সময় তাঁর বড় ছেলে বাগান থেকে ছুটতে ছুটতে এল এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল—'আজ আমরা ছুটি পেয়েছি। ম সিয়ে জুলিয়ান বেড়াতে গেছেন।'

মাদাম রেনলের সারা শরীর কথাটা শুনে হিম হয়ে গেল। তাঁর ধর্মবোধ তাঁকে অসুখী করল এবং দুর্বলতা করল আরও বেশী অসুখী।

অবস্থা নূতন দিকে মোড় নিতেই তাঁর আবেগ এবং কল্পনা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। ওই ভয়ঙ্কর রাতে তিনি অভিজ্ঞতা-প্রসূত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা' ভেসে গেল। এখন ওই আনন্দময় প্রেমিককে প্রতিরোধ করার চেয়ে তাকে চিরকালের জন্য হারানোর প্রশ্নটাই বড়।

মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তাঁকে খাওয়ার টেবিলে হাজির হতেই হল। তাঁর দুর্ভাগ্য, মাদাম দারভিল এবং মঁসিয়ে রেনল তখন জুলিয়ানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সে চলে গেল। ছোকরা যে-ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ছুটি চাইল তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভাব তাঁর নজরে পড়েছিল।

সন্দেহ নেই, এই চাষী ছোকরা আর কারো কাছ থেকে আরো ভাল অফার

পেয়েছে। কিন্তু যার কাছ থেকেই এই অফার পাক, তা সে মঁসিয়ে ভালেনদের কাছ থেকেই হোক, বছরে ছ'শ ফ্রাঙ্ক বৃত্তি বাড়ানোর প্রস্তাবেই তিনি থেমে যাবেন। তাই সে ভেরিয়ার শহরে চলে গেল তিন দিন ধরে ভাববার জন্যে। আজ সকালে নির্দিষ্ট জবাব না দিয়ে ছোকরা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এধরনের অবাধ্য মজুরের সঙ্গে শর্ত নিয়ে চুক্তি করা রীতিমত কষ্টকর। আর আজকাল আমাদের সমাজে এটাই রীতি হয়েছে।

আর মাদাম রেনল ভাবছিলেন, আমার স্বামী জানেন না যে, কি ভীষণভাবে তিনি তাকে অপমান করেছেন। অথচ ভাবছেন সে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি কি ভাবব? এখন সবকিছু মিটে গেল।

মাদাম দারভিলের প্রশ্ন শুনে মাদাম রেনলের কান্না পেল, কিন্তু তাঁর দারুণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে এই অছিলায় শুতে চলে গেলেন।

মঁসিয়ে রেনল আর একবার মন্তব্য করলেন—'এটাই হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব। জটিল দেহযন্ত্রের একটা না একটা অংশ বিগড়ে যাবেই।' তারপর বক্‌বক্ করতে করতে তিনিও চলে গেলেন।

ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়ে মাদাম দ্য রেনল যখন যৌন-লালসায় ছটফট করছিলেন তখন জুলিয়ান মনোরম পাহাড় আর বনভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটছিল। ভার্জির উত্তরে এই পাহাড় পার হয়ে তাকে যেতে হবে। দৌব উপত্যকার উত্তরে বিশাল পাহাড়…দীর্ঘদেহী বিট গাছের ঘন অরণ্য। এরই ভিতর দিয়ে সর্পিল পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে উৎরাইয়ে উঠে গেছে। পাহাড় পার হতে নজরে পড়ল বিস্তীর্ণ বজোলেই এবং বারগাণ্ডির উর্বর সমতলভূমি। উচ্চাশায় আচ্ছন্ন তার মন অবাক হয়ে গেল এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে সে এই সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

অবশেষে একটা বিশাল পাহাড়ের সানুদেশে সে হাজির হল। কাঠ ব্যবসায়ী তার বন্ধু ফৌকের বাড়ী যেতে গেলে এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। বন্ধু কিংবা অন্য কারো সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করার এখন কোনও ইচ্ছা নেই জুলিয়ানের। পাথরের আড়ালে শিকারী পাখীর মতন বসে সে এদিকে কেউ আসছে কি-না তা' দেখতে পাচ্ছে।

একখানা খাড়াই পাথরের গায়ে সে একটা গুহা দেখল। গুহার ভিতরে গিয়ে সে বসল। মনে তার আনন্দ, দু'চোখে খুশির ছোঁওয়া…না, এখানে কেউ আমার ক্ষতি করতে আসবে না। ভাবল, এখানে বসেই সে তার চিন্তার কথা লিখবে, অন্য জায়গায় বসে লেখা তার পক্ষে বিপজ্জনক। একখানা চারকোণা পাথর হল তার লেখবার টেবিল। সে লিখতে শুরু করল। কোন দিকে আর নজর নেই।

অবশেষে তার নজরে পড়ল, দূরে বজোলেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্তগামী।'

মনে মনে ভাবল জুলিয়ান, এখানেই আজ রাতটা কাটাই না কেন। পকেটে কয়েক টুকরো রুটি আছে, এবং নিজে আমি স্বাধীন। তার মনের এই সোচ্চার কথাগুলো তাকে উল্লসিত করে তুলল। বন্ধু ফৌকের সঙ্গে থাকার সময় তার ভণ্ড-স্বভাব মুক্তি পায় না। হাতের উপর মাথা রেখে সে গুহার মধ্যে বসে রইল …সে মুক্ত, নিজের স্বপ্নে সে নিজেই বিভোর। এমন সুখ সে আর কখনও উপভোগ করে নি।

কোন শঙ্কা নেই জুলিয়ানের মনে। নজরে পড়ছে, একে একে অপরাহ্নের আলোকরশ্মিগুলো নিভে যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে তার চার ধারে। আগামী দিনগুলোতে প্যারী শহরের কল্পনায় তার মন ভরপুর। প্রথমেই এসব অঞ্চলের চেয়েও অনুপম সুন্দরী একটি যুবতীর সে দেখা পাবে। মনোরম হবে তার স্বভাব। সে যুবতীকে মহা আবেগে ভালবাসবে এবং যুবতীও তাকে প্রতি-দান দেবে। তার সাথে যদি তার বিচ্ছেদ হয় তবে হবে গৌরবজনক কাজ করার জন্য এবং আরও ভালবাসা পাওয়ার জন্য।

কিন্তু দিনের আলোর স্থান নিল রাতের অন্ধকার। অথচ ফৌকের গ্রামে হাজির হতে হলে এখনও তাকে বহু পথ হাঁটতে হবে। গুহা ছেড়ে যাওয়ার আগে জুলিয়ান আগুন জ্বেলে তার লেখা কাগজগুলো সব পুড়িয়ে ফেলল।

রাত একটার সময় বন্ধুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে জুলিয়ান অবাক হয়ে গেল। সে দেখল, তার বন্ধু বসে বসে হিসাব কষছে। দীর্ঘদেহী যুবক, শক্ত, সমর্থ সবল চেহারা, দীর্ঘ নাসা এবং তার এই ভয়ঙ্কর দেহে ভারি কোমল দয়ালু স্বভাব।

—'এমন অসময়ে আমার বাড়ী এসেছ তবে কি মঁসিয়ে রেনলের সাথে গোল-মাল করেছ?'

আগের দিনের ঘটনা জুলিয়ান রেখে-ঢেকে বন্ধুকে বলল।

তখন ফৌকে বলল—'বেশ ত, থাক আমার এখানে। মঁসিয়ে রেনল, সহকারী শাসক মজিরন আর যাজক মঁসিয়ে চেলনকে তুমি ভালভাবেই জান। ওদের স্বভাবের অন্দর-বাহির সবই তোমার জানা…তাই ওদের সাথে চুক্তি করবার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তোমার সাফ মাথা, আমার হিসাব-পত্তর দেখতেও পারবে। ব্যবসায় প্রচুর টাকা ঢেলেছি। একা আমার পক্ষে সব কিছু দেখা-শোনা করা অসম্ভব। অথচ অংশীদার হিসাবে কোন শয়তানকে নিলে সে আমার ব্যবসা লাটে তুলে ছাড়বে। এই ত মাস-খানেক আগে সেণ্ট আমান্দের মিচোকে একটা সুযোগ করে দিয়েছিলাম, সে হাজার ছয়েক ফ্রাঙ্ক রোজগার করেছে। অথচ বছর ছয়েক ওর সাথে আমার দেখাই হয় নি। সহসা একদিন পনটারলিয়ারের নীলামঘরে ওর সাথে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। তা' তুমি এই ছ'হাজার, নিদেন তিন হাজার পাবে না কেন? সেদিন তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে তাহলে আমি তোমার নামে কাঠের নীলাম ডাকতাম এবং প্রত্যেকেই আমারগুলো পেতে চায়।

কাজেই বলছি, তুমি আমার অংশীদার হও।'

এই প্রস্তাব শুনে জুলিয়ানের মেজাজ গেল বিগড়ে, তার অদ্ভুত স্বপ্নের বিরোধী এই প্রস্তাব। ফৌকে একা থাকে তাই হোমারের বীরদের মতন তারা নিজেরাই নিজেদের রান্নাবান্না করে নিল। ফৌকে তার হিসাব-পত্তর সব বন্ধুকে বলে বুঝিয়ে দিল যে, কাঠের ব্যবসাতে তার কি পরিমাণ লাভ হয়। জুলিয়ানের চরিত্র আর বুদ্ধ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তার।

তারপর জুলিয়ান তার ছোট্ট ঘরের চার-দেওয়ালের মাঝে ফিরল যখন তখন মনে মনে ভাবল : এটা ঠিক যে, এখানে কয়েক হাজার ফ্রাঙ্ক আমি রোজগার করতে পারি। এবং প্যারী শহরে গিয়ে ওখানকার যুবকদের রীতি অনুযায়ী সৈনিক কি যাজক হলে এর চেয়ে বেশী কিছুতেই রোজগার করতে পারতাম না। এই ছোট্ট ঘরে থাকলে রোজগারের উপায় খোঁজার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। এই পাহাড়ী অঞ্চলে থাকলে বাইরের জগতের মানুষদের আগ্রহের বিষয়সমূহ যা' আমার কাছে অজানা, সে সবের হাত থেকেও মুক্তি পাব। ফৌকে বিয়ে করার সব ধারণা ত্যাগ করেছে অথচ একক জীবন-যাপনের দুঃখ দুর্দশার কথা বলেছে। তাই এটা স্পষ্ট যে, আমাকে সারা জীবনের সাথী হিসাবে পাওয়ার জন্যেই সে মূলধন ছাড়াই তাকে এই ব্যবসার অংশীদার করে নিতে চাইছে।

বিষণ্ণকণ্ঠে জুলিয়ান বলে উঠল—'বন্ধুকে কি আমি ঠকাতে পারি ?'

কিন্তু সহসা জুলিয়ান আনন্দিত হল···রাজী না হওয়ার একটা সে কারণ খুঁজে পেল। কি ! নীচ কাজে আমি আমার জীবনের সাত-আট বছর নষ্ট করব ! তারপর আঠাশ বছর হয়ে যাবে ! অথচ এই বয়সে বোনাপার্ট তাঁর সব বড় বড় কীর্তিগুলো করেছিলেন ! ধর, এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে আর একটার পর একটা নীলাম ঘরে কাঠের নীলাম ডেকে আর বোকা লোকগুলোকে ঠকিয়ে দু'পয়সা রোজগার করলাম কিন্তু সুনাম অর্জনের জন্যে যে আগুন আমার মধ্যে জ্বলছে কে বলে তা' আর বজায় থাকবে ?

ফৌকে ধরে নিয়েছিল যে, ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে···কিন্তু পরদিন সকালে উঠে জুলিয়ান বলল যে, পবিত্র কাজে সে উৎসর্গীকৃত-মন কাজেই এ কাজ সে নিতে পারবে না। বিস্ময়ের সীমা রইল না ফৌকের।

সে বার বার বলল—'কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, তুমি যদি আমার অংশীদার না হও তবে তোমাকে আমি বছরে চার হাজার ফ্রাঙ্ক দেব ? এবং তুমি যে মঁসিয়ে দ্য রেনলের কাছে ফিরে যেতে চাইছ সে তোমাকে পায়ের কাদা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। যখন তোমার হাতে কয়েক শ' লুই জমবে তখন তোমার কলেজে ভর্তি হওয়ার কোন বাধা থাকবে না।

কিন্তু কিছুতেই জুলিয়ান তার পেশা ছাড়তে রাজী হল না।

তৃতীয় দিন খুব ভোরে সে বন্ধুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। সারা দিন কাটাল সেই পাহাড়-ভূমি আর গুহায়। হারকিউলিসের মন পাপ ও পুণ্যের

দ্বন্দ্বে তোলপাড় হয়ে ছিল…তার মনে নিশ্চিত অর্থ অর্জনের নিরুদ্বেগ জীবন আর যৌবনের স্বপ্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হল। তাই মনে মনে সে বলল, আমার চরিত্রে সত্যিকারের কোন দৃঢ়তা নেই। মহান ব্যক্তিদের মন যে ধাতুতে গড়া আমার মন সে ধাতুতে গড়া নয়। ভয় হয় আট বছর ধরে রুজি-রোজগার করতে গিয়ে অসাধারণ কিছু করবার মানসিক ইচ্ছাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩ : হাতে-বোনা মোজা

উপন্যাস পথ চলার দর্পণ।
—সেণ্ট রিয়্যাল

এক সময় ভাজির ভাঙ্গা গীর্জার ছবির মতন সুন্দর দৃশ্য জুলিয়ানের চোখে পড়ল। তার মনে হল যে, আজ দু'দিন সে একবারও মাদাম দ্য রেনলের কথা ভাবে নি। সেদিন চলে আসার সময় আমাদের দু'জনের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধানের কথা ওই মহিলা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উনি আমার সাথে মজুরের ছেলের মতন ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, আগের দিন সন্ধেবেলায় তাঁর হাত ধরার জন্য তিনি কত বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু কি অপরূপ পেলব করকমল! কি মনোরম, কি মহান আর মর্যাদাপূর্ণ মহিলার ভাব প্রকাশ!

ফৌকের কারবারে যোগ দিয়ে ধন উপার্জনের সম্ভাবনা এখন জুলিয়ানের চিন্তাধারাকে অনেকটা সহজ করে তুলল। ওই চিন্তা আর বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হচ্ছে না, বিশ্বের চোখে সে যে দরিদ্র এই কাঁটা আর তার মনে ফুটছে না। সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড উচ্চভূমিতে সে যেন দণ্ডায়মান, ধনসম্পদ-ভরা পরিবেশে সে এখন দারিদ্র্যকে বিচার করতে পারছে। নিজের অবস্থার দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে সে অপারগ, তবে পাহাড়-ভূমিতে এই ভ্রমণ সেরে আসার পর সে যে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তা বুঝতে পারছে।

তাঁর অনুরোধ শুনে জুলিয়ান তার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতে মাদাম দ্য রেনল অতীব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন…তাই দেখে জুলিয়ান অবাক হল।

ফৌকের বিয়ে করার মতলব ছিল, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে সে আঘাত পেয়েছে …দুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ আলোচনার সময় পরস্পর পরস্পরকে সব কথা বিশ্বাস করে বলে। খুব অল্প দিনের মধ্যে খুশি হয়ে একদিন ফৌকে আবিষ্কার করেছিল যে, সে তার প্রেমিকার একমাত্র প্রেমিক নয়। এ সব কাহিনী অবাক হয়ে শুনেছিল জুলিয়ান এবং শিখেছিল অনেক নতুন বিষয়। তার একক জীবন নানা আজগুবি ধারণা ও সন্দেহে ভরা, সব কিছু থেকে সে দূরে রয়েছে…তাই তার মনের দৃষ্টি খুলে গেছে।

তার অনুপস্থিতির সময়ে মাদাম রেনলের জীবন অসহনীয় পীড়নে ভরে

গিয়েছিল।

সত্যিই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

জুলিয়ানকে আসতে দেখে মাদাম দারভিল বললেন—'দেখ, এই রুগ্ন শরীরে আর এখন বাগানে যেও না। জলো বাতাসে তোমার কষ্ট আরো বাড়বে।'

মাদাম দারভিল দেখে অবাক হলেন যে, স্বল্প পোশাক পরার জন্যে তার বন্ধুর স্বামী তার বন্ধুকে প্রায়ই বকাবকি করেন, অথচ তিনি এখন সম্প্রতি প্যারী থেকে কিনে-আনা হাতে-বোনা মোজা পরেছেন এবং অপরূপ একজোড়া চটি পায়ে দিয়েছেন। গত তিন দিন ধরে মাদাম রেনলের বিরক্তি-মাখা তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে এলিসা সুন্দর পাতলা কাপড় কেটে তাঁর জন্যে একটা গরমকালের উপযোগী পোশাক বানাচ্ছিল, জুলিয়ান ফেরবার কিছুক্ষণ আগে পোশাকটা তৈরী শেষ হয়েছে। মাদাম সঙ্গে সঙ্গে পোশাকটা পরলেন। এই পোশাকটা হাল আমলের ফ্যাসান।

আর কোনও সন্দেহ রইল না মাদাম দারভিলের মনে। বন্ধুর রোগের সব লক্ষণ তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে বললেন—হতভাগিনী প্রেমে পড়েছে!

তিনি দেখলেন জুলিয়ানের সঙ্গে তার বন্ধু কথা বলছেন। বিবর্ণ মুখে গভীর উচ্ছ্বাসের চিহ্ন। যুবক গৃহশিক্ষকের মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে উদ্বিগ্নতার ছবি। মাদাম দ্য রেনল প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন যে, আর থাকবে কি থাকবে না এ সম্বন্ধে জুলিয়ান তার ইচ্ছা ব্যাখ্যা করে বলবে। জুলিয়ানের কিন্তু এ সম্পর্কে বলবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এ চিন্তা তার মাথায় ঢোকে নি। অবশেষে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের পর মাদাম রেনল কথাটা জিজ্ঞাসা করার মতন সাহস মনে খুঁজে পেলেন এবং সমস্ত আবেগ নিয়ে বললেন—'তোমার ছাত্রদের ছেড়ে তুমি কি আর কোথাও চলে যাচ্ছ?'

তাঁর কণ্ঠস্বরের দ্বিধাভাব এবং দৃষ্টি জুলিয়ানকে চমকিত করল। মনে মনে সে ভাবল, এই নারী আমাকে ভালবাসে। কিন্তু মনের যে দুর্বলতার জন্য তাঁর অহঙ্কার-বোধ তাঁকে ভৎর্সনা করছে সেই দুর্বল মুহূর্ত কেটে গেলে এবং আমি চলে যাচ্ছি এই ভয়ের নিরসন ঘটলে তিনি আবার অহঙ্কারী হয়ে উঠবেন আগের মতন। তাঁদের পরস্পরের এই অবস্থার ছবি বিদ্যুৎ ঝলকের মতন জুলিয়ানের মানস-পটে ঝলসে উঠল। সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল—'এমন আনন্দময় এবং সদ্বংশজাত ছেলেদের ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে তবে তার হয় ত প্রয়োজন হবে। কর্তব্য ত করতেই হয়।

জুলিয়ান যখন সদ্বংশজাত কথাটা (সম্প্রতি অভিজাত সমাজে প্রচলিত এমনি ধরনের কতকগুলো শব্দ সে আহরণ করেছে) উচ্চারণ করল তখন তার মনে গভীর বিতৃষ্ণা দেখা দিল। ভাবল, এ নারীর চোখে আমি কোনমতেই সদ্বংশজাত নই।

ওর কথা শুনে মাদাম ওর বুদ্ধির এবং সু-দৃষ্টির প্রশংসা করলেন এবং সে চলে যাবে এই কথা ভেবে তাঁর হৃদয় খান্ খান্ হয়ে গেল। জুলিয়ানের অনুপস্থিতির সময় তাঁর যেসব বন্ধুরা ভেরিয়ার শহর থেকে ভার্জিতে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল তারা সবাই বলে গেছে যে, তাঁর স্বামী মাটি খুঁড়ে এক আশ্চর্যজনক মানুষ আবিষ্কার করেছেন, সবাই পঞ্চমুখে জুলিয়ানের প্রশংসা করেছে। তারা যে সবাই পড়াশুনায় ছেলেদের উন্নতি দেখে একথা বলেছে তা' ঠিক নয়। ভেরিয়ার-বাসীরা যখন শুনেছে যে, ল্যাটিনের মতন ভাষায় সমস্ত বাইবেলখানা তার কণ্ঠস্থ তখন তারা বিস্মিত হয়েছে এবং হয় ত এই বিস্ময়ের ভাব এক শ' বছর তাদের মনে গেঁথে থাকবে।

জুলিয়ান নিজে কাউকে কখনও এসব বলে নি, তাই এ সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। মাদাম রেনলের এতটুকু উপস্থিতবুদ্ধি থাকলে তিনি সম্প্রতি জুলিয়ান যে প্রশংসা লাভ করেছে তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতেন এবং একবার জুলিয়ানের গর্ববোধ তার মনে প্রতিষ্ঠিত হলে সে তাঁর সঙ্গে মধুর ব্যবহার করত এবং তাঁকে তার ভাল লাগত কেননা নতুন পোশাকে তাঁকে সে অপরূপ মূর্তিতে দেখত। এবং জুলিয়ান প্রশংসাও করেছে।

নতুন পোশাকে সজ্জিতা মাদাম জুলিয়ানের প্রশংসা শুনে খুশি হলেন এবং একবার সারা বাগানটা ঘুরে বেড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অচিরে স্বীকার ক'লেন যে, হাঁটবার মতন তাঁর দেহের অবস্থা নয়। সঙ্গীর বাহুটি তিনি জড়িয়ে ধরলেও কোনও শক্তি আহরণ করতে পারছিলেন না, বরং পরস্পরের বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

রাত নামল। তারা সবেমাত্র বসেছে, অমনি জুলিয়ান তার পুরানো সুযোগ গ্রহণ করতে চাইল, পেলব কর-কমলে তার চুম্বন এঁকে দেওয়ার সাহস করল। ফৌকে তার প্রেমিকার সঙ্গে যে সাহসী ব্যবহার করেছিল তা' তার মনে পড়ছিল। তবে মাদাম রেনল নয় কেননা সদ্বংশজাত শব্দটা তার মনে ভারি হয়ে গেঁথেছিল। তার হাতে চাপ পড়ল, কিন্তু তাতে সে কোন রকম আনন্দ লাভ করল না। বিগত সন্ধ্যায় মাদাম রেনল অভ্রান্ত লক্ষণ দেখান সত্ত্বেও সে গবিত হওয়া ত বহু দূর, এতটুকু কৃতজ্ঞতাও সে অনুভব করল না...তাঁর সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য এবং নির্দোষ সজীবতা তার কাছে অনুভূতিহীন হল। অন্তরের পবিত্রতা এবং ঘৃণ্য যৌন-লালসার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে। অধিকাংশ সুন্দরী নারীর মুখের ভাবেই বয়স ধরা পড়ে।

সারা সন্ধ্যা জুলিয়ান বিষণ্ণভাবে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার রাগ ধন-সৌভাগ্য সমাজের বিরুদ্ধেই ফেনায়িত। কিন্তু ফৌকে যখন থেকে তাকে ধন উপার্জনের পথ দেখিয়েছে, দেখিয়েছে স্বস্তিতে থাকবার পথ, তখন থেকেই নিজের উপর আর তার রাগ নেই। নিজের চিন্তায় সে আত্মহারা, যদিও আনমনাভাবে জুলিয়ান মহিলাদের উদ্দেশ্যে দু'একটা কথা বলতে বলতে এক সময় মাদাম রেনলের

হাত ছেড়ে দিল। এই ব্যবহারে মহিলা উন্মত্তপ্রায় হলেন…নিজের ভাগ্যের প্রকাশ তাঁর নজরে পড়ল।

যদি তিনি জুলিয়ানের প্রেম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতেন তাহলে তাঁর ধর্মবোধ তাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি তাঁকে জোগাত। তাকে চিরকালের জন্য হারাতে হবে এই চিন্তায় তাঁর সারা দেহ কাঁপছিল, তাঁর মনে যৌন-লালসা এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যে, চেয়ারের পিঠে রাখা জুলিয়ানের হাতখানা তিনি জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর কাজ উচ্চাকাঙ্খী যুবককে চিন্তান্বিত অবস্থা থেকে জাগাল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল ভোজের টেবিলে যারা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারা যদি এখানে সাক্ষী হিসাবে থাকত তবে ভাল হত। ভাবল, এই নারী আর তাকে ঘৃণা করে না। কাজেই ওর সৌন্দর্যে আমি সাড়া দেব। ওর প্রেমিক হওয়ার জন্য নিজের কাছে আমি নিজে ঋণী। বন্ধুর মুখ থেকে তার অকপট বিশ্বাসের কথা না শোনা পর্যন্ত এমন ইচ্ছা তার মনে কখনও স্থান পায় নি।

এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত তাকে আনন্দে পাগল করে তুলল। সে ভাবল, এই দুই নারীর একজনকে সে পুরোপুরি ভালবাসবে। সে বুঝতে পারল যে, মাদাম দারভিলের সঙ্গে প্রেম করাই তার কাছে বেশী কাম্য। তাঁকে বেশী পছন্দ বলে তার এই ইচ্ছা নয়, আসলে সে একজন বিদ্বান গৃহশিক্ষক হিসাবে মাদাম দারভিলের কাছে পরিচিত, সম্মানিত…কিন্তু মাদাম রেনলের কাছে সে একজন ছুতোরের ছেলে, ছেঁড়া জামা বগলে নিয়ে তাঁর দরজায় একদিন লজ্জারুণ মুখে দাঁড়িয়েছিল, এমন কি দরজার ঘণ্টা টেপবার মতন তার মনে সাহসটুকুও ছিল না… তার সম্বন্ধে মাদাম রেনলের মনে এই মনোরম ছবি আঁকা রয়েছে।

অবস্থার মূল্যায়ন করে জুলিয়ান এটাও বুঝল যে, তবু মাদাম দারভিলের প্রেম জয় করার চেষ্টা করা তার উচিৎ হবে না কেননা মাদাম রেনলের মনের ঝোঁক হয়ত মাদাম দারভিল জেনেছেন। তাই মাদাম রেনলের দিকে মনের গতি ফিরিয়ে এনে সে ভাবল, এই নারীর চরিত্রের কতটুকুই বা আমি জানি? চলে যাওয়ার আগের দিন আমি তাঁর হাত ধরেছিলাম, তিনি হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন। আজ আমি হাত সরিয়ে নেওয়ার পর তিনিই আমার হাত ধরে পেষণ করছেন। আমার প্রতি তিনি যত ঘৃণা অনুভব করেন সেই ঘৃণার প্রতিদান দেওয়ার সুন্দর সুযোগ এসেছে। ঈশ্বর জানেন আর কত প্রেমিক তাঁর আছে। হয়ত আমাদের মেলামেশা খুব সহজ বলে তিনি আমাকে এই অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন।

হায়! অতি-সভ্যতার এটাই বুঝি ফলশ্রুতি! বিশ বছর বয়সে সামান্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এক যুবকের হৃদয়ে প্রেম উত্তেজনাহীন একঘেয়ে কর্তব্যে পর্যবসিত হয়। জুলিয়ানের গর্ববোধ যুক্তিজাল বিস্তার করল…এই নারীর প্রেম জয় করার জন্য আমি নিজেই নিজের কাছে ঋণী, যখন আমি এখান থেকে চলে যাব কেউ যদি সামান্য গৃহশিক্ষক হয়ে থাকার জন্য খোঁটা দেয় তবে তাকে বোঝাতে পারব যে, প্রেমের জন্যই এ অবস্থা মেনে নিয়েছিলাম।

তখন মাঝ রাত, তারা বসবার ঘরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, মাদাম রেনল কানে কানে বলল—'তুমি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, সত্যিই কি চলে যাচ্ছ ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল জুলিয়ান—'সত্যিই আমার চলে যাওয়া উচিৎ, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। এ ভালবাসা পাপ···একজন যুবক যাজকের পক্ষে কি ভয়ানক পাপ !'

মাদাম রেনল তার বাহুর উপর ঝুঁকলেন, তাঁর গালে তার উষ্ণ স্পর্শ লাগল।

এই দু'জনের কাছে সে রাত ভিন্নতর হল। সেরা নৈতিক আদর্শ বজায় রাখতে পারার জন্য মাদাম রেনলের মেজাজ খুবই উল্লসিত। অল্প বয়সে ছিনাল মেয়েরা প্রেমে পড়লে প্রেমের জন্যই তারা অস্থিরতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু যৌন-লালসা উপভোগের বয়স হলে তাদের কাছে অভিনবত্বের আকর্ষণ কমে যায়। যেহেতু মাদাম রেনল কখনও কোন উপন্যাস পড়েন নি তাই সুখকর প্রতিটি অবস্থাই তাঁর কাছে অভিনব। দুঃখজনক কোনও সত্য তাঁর আনন্দকে শীতল জমাট বরফ করতে পারে না, এমনকি ভবিষ্যতের প্রেত-ছায়াও তা' পারে না। তাই দশ বছর আগেও যেমন ছিলেন এই মুহূর্তেও তেমনি খুশি। ধর্মবোধ এবং বিশ্বস্ততা যা' বজায় রাখবেন বলে মঁসিয়ে রেনলের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধা, এবং যা' কয়েকদিন আগেও তাঁর মনকে উদ্বিগ্ন করেছে সেই চিন্তা বৃথাই তাঁর মানসপটে ফুটে উঠল। যেভাবে নাছোরবান্দা অতিথিকে তিনি তাড়িয়ে দেন তেমনিভাবে এই ধরনের চিন্তাগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিলেন। মাদাম রেনল মনে মনে বললেন, না, জুলিয়ানকে আর কোনও অনুগ্রহ দেখাব না। বিগত মাস যেভাবে কাটিয়েছি ভবিষ্যতেও তেমনিভাবে কাটাব। সে কেবল বন্ধু হয়েই থাকবে।

১৪ : এক জোড়া কাঁচি

ষোড়শী অঙ্গলাবণ্য যার গোলাপী,
—সে মেখেছে অধরে রঙ।
—পলিডরি

ফৌকের প্রস্তাব জুলিয়ানের জীবনের সমস্ত সুখের ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়েছে। কোনদিকেই আর সে মনস্থির করতে পারছে না।

হায়! সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার চরিত্রে হীনতা দেখা দিয়েছে। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর একজন হতভাগ্য সৈনিক আমি। মনে মনে সংযোজন করল, তবে এ বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে আমার যে মাখামাখি তা' কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে তার পক্ষে সুখের কথা এই যে, এমন সব ছোটখাট অনিশ্চিত অবস্থাতে তার অন্তরের নিহিত আবেগের সাথে বাচাল কণ্ঠের মিল খুব সামান্য। মাদাম রেনলের পরনের খাটো ফ্রক দেখে সে ভীত হল কেননা তাঁকে মনে হচ্ছিল

প্যারী শহরের অগ্রগামী রক্ষী, তার মনের গর্ববোধ কিছুতেই কোন সুযোগ অথবা মুহূর্তের আবেগ হাতছাড়া করবে না। তাই ফৌকের গভীর বিশ্বাস এবং বাইবেলে পড়া প্রেম-কাহিনীর উপর নির্ভর করে সে নিজের অভিযানের খসড়া তৈরী করল। যদিও সে স্বীকার করল না তবুও সে বিচলিত, সে নিজের খসড়া লিখতে সুরু করল।

পরের দিন সকাল বেলায় কয়েক মুহূর্তের জন্য মাদাম একলা তার সঙ্গে ছিলেন।

'জুলিয়ান ছাড়া তোমার আর কি কোন নাম নেই?' তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন।

এমন খোসামুদে প্রশ্নের কি জবাব দেবে তা' আমাদের বীর-পুঙ্গব বুঝতে পারল না। তার মতলবের খসড়ায় সে এমন অবস্থা কল্পনা করে নি। জবাব তৈরীর ব্যাপারে তার বোকামি থাকলেও তার উপস্থিতবুদ্ধি তাকে সাহায্য করতে পারত···বিস্ময়ের ভাবটুকু তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে জীবন্ত করে তুলল।

আনাড়িভাবে সে জবাব দিল এবং বাস্তবের চেয়েও সে নিজেকে আনাড়ী মনে করল।

মাদাম রেনল আনাড়িপনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করলেন।

মাঝে মাঝে মাদাম দারভিল তাঁর বন্ধুকে বলেন—'দেখ বাপু, তোমার এই গৃহশিক্ষককে আমার সন্দেহ হয়। সব সময় ওর মনে চিন্তা তোলপাড় করে, একটা গোপন উদ্দেশ্য ছাড়া সে কোনও কাজ করে না। লোকটা খুবই ধরিবাজ।'

মাদাম রেনলের প্রশ্নের জবাব না জানার দুর্ভাগ্যের জন্য জুলিয়ান গভীর অপমান বোধ করল। ভাবল, তার মতন মানুষের এই অসফলতা তার নিজেরই দোষ। মুহূর্তের সুযোগ সে গ্রহণ করল, এঘর থেকে ওঘরে যখন তারা যাচ্ছিল তখন তার মনে হল মাদাম রেনলকে চুম্বন করা উচিৎ।

অপ্রস্তুত অবস্থায় এর চেয়ে বেশী আর কিছু করা যায় না, দু'জনের কাছেই এর চেয়ে কম আনন্দজনক আর কিছু নেই, নেই এর চেয়ে বড় আর কোন হঠকারিতা। মাদাম রেনলের মনে হল, জুলিয়ান তাঁর চেতনা-বোধকে ছন্নছাড়া করে দিয়েছে। তিনি ভীত হলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা তিনি বেদনাহত হলেন। তাঁর এই বোকামি তাঁকে মঁসিয়ে ভালেনদকে মনে করিয়ে দিল।

ভাবলেন, ওর সঙ্গে একা থাকলে তাঁর জীবনে কি ভয়ানক ঘটনা ঘটত? প্রেমে গ্রহণ লাগায় তাঁর মনে ধর্মবোধ ফিরে এল। এর পর থেকে সব সময় একটি ছেলেকে সঙ্গে রাখবেন।

জুলিয়ানের পক্ষে সেটা বড় ক্লান্তিকর দিন। প্রলুব্ধ করার মতলব সিদ্ধ করার জন্য সারাটা দিন সে কৌশলহীন চেষ্টা করতে লাগল। ইঙ্গিত-কুটিল দৃষ্টি ছাড়া একবারও সে মাদাম রেনলের দিকে তাকাতে পারল না। কিন্তু তবুও তাঁকে সম্মত করার ব্যাপারে এবং নিজেকে মনোহর করে তোলার কাজে সে

সফল হল না।

একই সময়ে জুলিয়ানকে আনাড়ী, লাজুক এবং অতি সাহসী দেখার বিস্ময় কিছুতেই মাদাম রেনল কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। প্রেমে-পড়া পণ্ডিতের এই লাজ-ভাব! অবর্ণনীয় আনন্দে তিনি ভাবলেন। আমার প্রতিবন্দ্বিনী কি ওকে ভালবাসতে পারে নি!

সহকারী প্রশাসক মঁসিয়ে মজিরন তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর মাদাম রেনল বসবার ঘরে তাঁর কাছে গেলেন। দেওয়াল ঢাকার জন্য একখানা ঢাকা তিনি বুনছিলেন, পাশে ছিলেন মাদাম দারভিল। দুপুরের আলো চারধারে। তিনি যখন ওই অবস্থায় বোনার কাজে মন দিয়েছেন তখন আমাদের বীর-পুঙ্গব ভাবল যে, ঠিক যে সময় প্যারির চটি পরা সিল্কের মোজায় ঢাকা তাঁর পায়ের দিকে সাহসী প্রশাসকের নজর থাকবে তখন জুতো দিয়ে সে মাদামের সুন্দর পায়ের পাতা মাড়িয়ে দেবে।

মাদাম রেনল দারুণ ভয় পেলেন। তিনি হাতের কাঁচি, পশমের গোলা এবং ছুঁচগুলো হাত থেকে ফেলে দিলেন, এবং কাঁচির পতন রোধ করার জন্য জুলিয়ানের প্রচেষ্টা বোঝাতে চাইলেন। সৌভাগ্যবশত কাঁচিখানা ইংলণ্ডের শেফিল্ড শহরের তৈরী. ভেঙে গেল ওটা...মাদামের বড় দুঃখ হল যে জুলিয়ান তার ধারে কাছেও ছিল না।

তিনি বললেন—'আমার আগেই তুমি ওগুলোকে পড়তে দেখলে, তোমার পতন রোধ করা উচিৎ ছিল। তার বদলে অতি উৎসাহে আমাকেই লাথি কষিয়ে দিলে।'

সহকারী প্রশাসক ঠকলেও মাদাম দারভিলের নজরে কিছুই এড়াল না। ভাবলেন, এই সুন্দর তরুণেরও বড় বিচিত্র আচরণ। পাড়াগাঁয়ে জন্মেছে বলে এ ধরনের ভুল ক্ষমার অযোগ্য। এবার মাদাম রেনল জুলিয়ানকে বলার সুযোগ পেলেন—'বাধ্য হয়ে তোমাকে সাবধান হতে আদেশ করছি।'

নিজের ভুল বুঝতে পারল জুলিয়ান এবং বিরক্ত হল। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল যে, 'বাধ্য হয়ে আদেশ করছি' এ কথা বলার জন্য সে অপমান বোধ করবে কি-না! ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করলে তিনি বলতে পারতেন 'আমি এটা আদেশ করছি', কিন্তু তা না বলে তিনি আমার প্রেমের বদলে সাম্যের প্রশ্নে জোর দিলেন। সাম্য ছাড়া প্রেম হয় না। তার মন সাম্যের সমস্থানীয় একটা শব্দের অন্বেষণ করতে লাগল। মাদাম দারভিল ক'দিন আগে তাকে বলেছেন কর্নেইলের সেই লেখাগুলো রাগতভাবে আওড়াল: প্রেম সাম্য সৃষ্টি করে, তার অন্বেষণ করে না।

যে না-কি নারী-সঙ্গ জীবনে কখনও লাভ করে নি সেই ডন জুয়ানের অভিনয় জেদী প্রচেষ্টায় করে ফেলে জুলিয়ান দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু বোকার মত আচরণ করল। একটা বিবেচনা-প্রসূত ধারণা তখনও তার মাথায় ছিল। সে দারুণ

বিরক্ত। সন্ধ্যা আসন্ন। এর পর রাতে বাগানে তাকে মাদাম রেনলের পাশে বসে থাকতে হবে। অন্ধকার নামবে। কাজেই ভেরিয়ার শহরে যাজকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে মঁসিয়ে রেনলের কাছ থেকে ছুটি নিল। সান্ধ্য-ভোজনের পর সে বাড়ী ছাড়ল এবং গভীর রাতের আগে ফিরল না।

ভেরিয়ার শহরে জুলিয়ান দেখল যে, মঁসিয়ে রেনল বাড়ী ছাড়বার জন্য ব্যস্ত। তাঁর জীবিকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং মঁসিয়ে ম্যাসলন আসছেন তাঁর জায়গায়। ভালমানুষ যাজককে সাহায্য করতে জুলিয়ান ফৌকেকে লিখবে ঠিক করল যে, পবিত্র গীর্জার কাজে জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান তাকে তার প্রস্তাবে সাড়া দিতে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু এই অবিচারের দৃষ্টান্ত দেখে সে তার কল্যাণে হুকুমের চাকর না হওয়ার সুযোগ গ্রহণে রাজী। যাজকের বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা তার জীবনে ব্যবসার দরজা খুলে দিয়েছে যদিও এই মৃদু সাবধান বাণী বীরত্বের পরিপন্থী। জুলিয়ান নিজেকে অভিনন্দন জানাল।

১৫ : মোরগ ডাকা ভোর

ল্যাটিন ভাষায় প্রেম হচ্ছে নীতিহীনতা,
মরণশীল মানুষের ভাগ্যে প্রেম আনে মরণ,
এবং যন্ত্রণাদায়ক উদ্বেগ, যা আগেই সৃষ্টি হয়,
সাথে থাকে বিলাপ, শোক আর তীব্র ক্রন্দন,
প্রবঞ্চনা আর পাপ, এবং তারপর বলপ্রয়োগ,
নিরর্থক অনুশোচনার তিক্ত দংশন—
কিন্তু সময় আর ফিরে আসে না।

—ব্লাসন ছ' আমুর

জুলিয়ানের মনে যদি এতটুকু খল-বুদ্ধি থাকত তাহলে পরদিন সকালের ফলাফল দেখে সে নিজেই নিজেকে অভিনন্দিত করবার সুযোগ পেত…ভেরিয়ার শহরে যাওয়ার এই ফল। অনুপস্থিতির জন্য তার সব ভ্রান্তি ভুলে যাওয়া হয়েছে। সেদিন আবার সে বিষণ্ণ হল। সন্ধ্যা আসন্ন। তার মাথায় এক আজগুবি ধারণা জন্মাল। অস্বাভাবিক চঞ্চলতায় অস্থির হয়ে মাদাম রেনলকে সে ধারণার কথা খুলে বলল।

সবেমাত্র তারা বাগানে এসে বসেছে এবং অন্ধকারও যথেষ্ট গাঢ় হয় নি; জুলিয়ান অমনি মাদাম রেনলকে প্রলুব্ধ করার জন্য তার কানের কাছে মুখ এনে বলল—'মাদাম, আজ রাত দুটোর সময় তোমার ঘরে যাব। তোমাকে কিছু বলতে চাই।'

পাছে তার অনুরোধ মঞ্জুর না হয় তাই জুলিয়ান কাঁপছিল। প্রলোভিত করার ইচ্ছা তার মনের উপর ভারি হয়ে বসেছিল এই অনুরাগের জন্য মন ছিল ঝুঁকে

তাই বেশ কয়েকদিন সে তার নিজের ঘরে বসে থাকবে এবং আর কখনও মহিলার কাছে মুখ দেখাবে না। সে বুঝেছিল যে, গতকাল অতি চালাকের মতন আচরণ করার জন্য সে আগের দিনের সমস্ত সুন্দর সুন্দর শপথ নষ্ট করেছে এবং সত্যিই কোন দেবতার সাহায্য নেবে কিনা জানে না।

জুলিয়ান অতি দুঃসাহসে যে উদ্ধত ঘোষণা করেছে তা' শুনে সত্যিই মাদাম রেনল রাগত-কণ্ঠে জবাব দিলেন এবং এর বাড়াবাড়ি কিছু ছিল না। তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাবে সে ঘৃণার আঁচ পেল। মৃদু কণ্ঠে বলা জবাবে নিশ্চিতভাবে এই কথাগুলো ছিল—'তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ।'

ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন এই অছিলায় জুলিয়ান তাদের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে রেনলের কাছ থেকে অনেকটা দূরে মাদাম দারভিলের পাশে বসল, এবং এমনিভাবে তাঁর হাত ধরবার সম্ভাবনা গেল এড়িয়ে। তাদের কথাবার্তা গভীরতার দিকে মোড় নিল, নিজেকে দোষমুক্ত করার সুযোগ পেল জুলিয়ান··· শুধু নীরব মুহূর্তে সে তার মগজ হাতড়াচ্ছিল। ভাবল, কতকগুলো ধূর্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদাম রেনলকে প্রেমের অভ্রান্ত লক্ষণ প্রকাশে আজ বাধ্য করতে পারছি না কেন। অথচ দিন তিনেক আগেও ওই সব লক্ষণ দেখে বিশ্বাস করেছিলাম যে, সে আমার!

তার ব্যাপারটা এমন একটা বেপরোয়া অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার জন্য জুলিয়ান ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তবে সাফল্য ছাড়া আর কোন কিছুই তাকে এর বেশী লজ্জিত করত না। সে রাতের মতন তাদের ছাড়াছাড়ি হল। তার মনের দুঃখবাদ থেকে তার দৃঢ় ধারণা হল যে, সে মাদাম দারভিলের ঘৃণা লাভ করেছে এবং হয়ত মাদাম রেনলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছুটা মধুর হয়েছে।

দারুণ বিরক্তি এবং ভয়ানক অপমান-বোধের জন্য জুলিয়ান কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। এসব মতলব এবং ছল পরিত্যাগ করা থেকে তার মন বহু মাইল দূরে বিরাজ করছে এবং দিনের পর দিন মাদাম রেনলের সঙ্গে থেকে শিশুর মতন প্রতি দিনে পাওয়া সুখ নিয়ে বাস করার ইচ্ছাও নেই তার।

একটা ধূর্ত কৌশল আবিষ্কার করার জন্য তার মগজ কাজ করছিল অথচ এক মুহূর্ত পরেই মনে হচ্ছিল, এটা উদ্ভট। পল্লীনিবাসের ঘড়িতে যখন রাত দুটো বাজল তখন মনের অবস্থা ভীষণ খারাপ হল।

মোরগ-ডাকা ভোরে সেন্ট পিটার যেমন জেগে উঠেছিলেন তেমনিভাবে ঘণ্টার শব্দে সে জেগে উঠল। বুঝতে পারল, তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর অভিযানের সময় এসে গেছে। বলবার পর থেকে নিজের উদ্ধত প্রস্তাব সম্পর্কে সে একবারও মাথা ঘামায় নি···এ ব্যাপারটা এমনই বিশ্রীভাবে গৃহীত হয়েছিল!

বিছানা ছেড়ে উঠে সে মনে মনে বলল, তাকে বলেছি রাত দুটোর সময় তার

ঘরে যাব। চাষীর ছেলের কাছ থেকে লোকে যেমন আশা করে আমি হয় ত তেমনি অনভিজ্ঞ আর অশিষ্ট। মাদাম দারভিল অবশ্য যথেষ্ট সরলভাবে তা' আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন···কিন্তু আমি কিছুতেই দুর্বল হব না।

সাহসের জন্য নিজেকে সে বাহবা দিল। এমন কঠিন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে সে আর কখনও পড়ে নি। দরজা খোলবার সময় তার সারা দেহ এমন কাঁপছিল যে তার হাঁটু ভেঙ্গে পড়ল এবং সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

পায়ের জুতো খুলে ফেলল। সে এগিয়ে গিয়ে মঁসিয়ে রেনলের দরজায় কান পাতল। তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনল। আওয়াজ তাকে বিরক্ত করল, এখন ওর ঘরে না ঢোকার কোন অছিলা আর তার মনে নেই। কিন্তু হায় ভগবান! সে ওখানে ঢুকে কি করবে? তার মাথায় কোন মতলব নেই, এবং থাকলেও সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, সে ওসব মনে রাখতেই পারল না।

অবশেষে মরণের পথে যাওয়ার চেয়েও বহুগুণ দুর্ভোগ ভুগতে ভুগতে সে মাদাম রেনলের ঘরে ঢোকার বারান্দায় মোড় নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে দরজা খুলল, এবং দরজা খোলার সময় বিশ্রী শব্দ হল।

ঘরে আলো ছিল। ঢাকনার নীচে একটা আলো জ্বলছিল। নতুন করে এমন আর একটা বিপদ সে আশা করে নি। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মাদাম রেনল বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। বললেন—'বদমাস্!' মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। জুলিয়ান তার অর্থহীন মতলবের কথা গেল ভুলে এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে পেল। এমন রূপবতী নারীকে আনন্দ দেওয়ার কাজে অসফলতা জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। ভৎর্সনার জবাবে সে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল এবং দু'হাতে তাঁর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল। তিনি যখন তাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বকছিলেন তখন জুলিয়ান কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা পরে জুলিয়ান যখন মাদাম রেনলের ঘর থেকে চলে এল তখন উপন্যাসের ভাষায় বলা যায় যে, তার ইচ্ছা পূরণের আর কিছুই বাকি ছিল না। সে যে ভালবাসা মূর্ত করে তুলেছিল তার জন্য সে নিজেই নিজের কাছে ঋণী। তাঁর যৌন-মিলনের মোহময় কর্ম-প্রয়াস যা' জুলিয়ানের অনভিজ্ঞ আচরণ কিছুতেই সৃষ্টি করতে পারত না তা' তার মনের উপর অপ্রত্যাশিত ছাপ এঁকে দিল।

তবু তার মনের বিচিত্র অহঙ্কার-বোধ হল পরাজিত এবং সবচেয়ে মধুর, আশীর্বাদ-পূত মুহূর্তগুলোতে সে নারীকে নিজের ইচ্ছার কাছে পরাভূত করার পুরুষের স্বভাব বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং শপথ দৃঢ় হল তার নিজের মনোর প্রেমময় কর্মানুষ্ঠান নষ্ট করেও প্রচেষ্টায় সফল হতে। যে যৌন কামনা সে তাঁর মনে সৃষ্টি করেছিল তার দিকে যখন তার মন দেওয়া উচিৎ ছিল তখন সে চরম আনন্দের উচ্চগ্রামে পৌঁছবার প্রচেষ্টায় রত হল, অবিরামভাবে নিজের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা তার

মনে বিরাজ করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, সফলতার খসড়া থেকে সে যদি বিচ্যুত হয় তবে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলবে, অনুশোচনা ভোগ করতে হবে। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে নিজের আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল বলেই জুলিয়ান কামনা-সঙ্গী হিসাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব রূপায়িত করতে পারল। সে যেন ষোড়শী তন্বী, সুকুমার তার দেহ-লাবণ্য এবং বল-নাচের আসরে যাওয়ার আগে রঙের স্পর্শ বুলিয়ে অধর রাঙানোর কৌশলে যথেষ্ট পটিয়সী।

জুলিয়ানের আকস্মিক আগমনে ভীত হয়ে মাদাম রেনল অচিরে নিষ্ঠুরতম আশংকার শিকার হয়ে পড়লেন। জুলিয়ানের চোখের জল এবং হতাশা তাঁকে ভয়ানক বিচলিত করে তুলল……এবং এমন অবস্থা হল যখন তাকে অস্বীকার করবার আর তাঁর ক্ষমতা ছিল না তখন ঘৃণায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন এবং পরমুহূর্তে তার আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ ধরনের আচরণের কোন বাঁধা-ধরা ছক নেই। তাঁর বিশ্বাস হল যে, পাপ-মুক্তির কোনও আশা নেই, তাই আদরের উচ্ছ্বাসে তিনি জুলিয়ানের মন ভরে দিলেন এবং নরক-দর্শন এড়াবার জন্য চোখ বন্ধ করে রইলেন। সংক্ষেপে, আমাদের বীর-পুঙ্গবের রমণ-সুখের কোনও রকম কমতি হল না, এখনি যে নারীতে সে উপগত হল তার কাছ থেকেও কম প্রতিদান লাভ করল না, সে তাই পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করল। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যে আবেগের উচ্ছ্বাসে তাঁর মন উদ্দীপনায় ভরে গেছে জুলিয়ান চলে গেলেও তা' কমল না, শেষ হল না বিষণ্ণতা যা' তাঁর হৃদয় খান্‌-খান্‌ করে দিচ্ছিল।

হায় ঈশ্বর! এই কি সুখ? এ' ছাড়া আর কিছু কি প্রেম নয়? নিজের ঘরে ফিরে আসার পর এই চিন্তাই জুলিয়ানের মনে দেখা দিল। অনেক দিন ধরে যা' সে কামনা করছিল তা' পাওয়ার পর পুরুষের হৃদয় যেমন ধীরে ধীরে প্রচণ্ড উদ্দীপনায় ভরে যায় তেমনি বিস্মিত, উদ্দীপিত অবস্থায় জুলিয়ান বসে রইল। হৃদয় কামনা করতে অভ্যস্ত, কামনা করার মতন কোন কিছুই আর নেই অথচ স্মৃতির কোন চিহ্ন নেই মনে। সৈনিক যেমন সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে ফিরে আসে তেমনিভাবে বসে বসে জুলিয়ান তার আচরণ বিশ্লেষণ করতে লাগল। নিজের কাছে আমার যা' ঋণ তা' পরিশোধে কি অপারগ হয়েছি? আমার ভূমিকা কি ঠিক মত পালন করি নি?

এবং কি ভূমিকা! নারীর সাথে পুরুষের যৌন-মিলনের সফলতার অভ্যাস!

১৬: পরের দিন

সে তার অধর এগিয়ে দিল তার পানে, এবং দীর্ঘশ্বাস সহ তার মাথার একগুচ্ছ কেশদাম পিছনে সরাল।

—ডন জুয়ান

জুলিয়ানের মনে গর্ববোধ থাকা সত্ত্বেও মাদাম রেনল সুখে বিচলিত হলেন এবং অবাক হলেন যে, এই আহাম্মক লোকটা তাঁর জীবনের সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে তিনি তাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন—'হায় ঈশ্বর! আমার স্বামী যদি টের পান তবে আমার সর্বনাশ হবে।'

এতক্ষণে বলবার মতন কিছু শব্দ খুঁজে পেল জুলিয়ান। বলল—'তুমি কি অনুশোচনা করছ?'

'হাঁ! এই মুহূর্তে কিছু কিছু করছি, তবে তোমাকে পাওয়ার জন্যে করব না গো!'

প্রকাশ্য দিবালোকে ঘরে ফিরে আসার মধ্যে জুলিয়ান যেন নিজের মর্যাদার সন্ধান পেল, তাই কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করল না।

তার কর্মানুষ্ঠান সে অবিরাম সযত্নে সম্পাদন করল এবং বোকার মতন একটা ধারণা পোষণ করল যে, সে পুরুষের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এতে তার একটা সুবিধা হল —দুপুরের খাওয়ার টেবিলে যখন মাদামের সাথে তার দেখা হল তখন সে চমৎকার সংযত ব্যবহার করল।

অথচ তার দিকে নজর পড়লেই মাদামের মুখমণ্ডল গভীর লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিমুহূর্তে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না। উদ্দীপনা সম্পর্কে তিনি সচেতন, এবং উদ্দীপনা লুকোতে গিয়ে তিনি আরও উদ্দীপিত হচ্ছেন। জুলিয়ান কেবল তাঁর পানে চোখ তুলে তাকাল। অচিরে এই বারেক দৃষ্টিপাত আর পুনর্বার অনুষ্ঠিত হল না, মাদাম শংকিত হলেন। ভাবলেন, তবে কি ও আর তাঁকে ভালবাসতে পারছে না? ওর পক্ষে আমার বয়স বড় বেশী হয়েছে। হায়! ওর চেয়ে আমি দশ বছরের বড়।

ওরা যখন খাওয়ার পর ঘর ছেড়ে বাগানে যাচ্ছিল তখন মাদাম জুলিয়ানের হাতটা ধরে চাপ দিলেন। প্রেমের এই বিশেষ ধরনের বহিঃপ্রকাশ অনুভব করে জুলিয়ান বিস্মিত হল এবং তাঁর দিকে যৌন-লালসা ভরা দৃষ্টিতে তাকাল… প্রাতরাশের সময় তাঁকে অপরূপ রূপবতী মনে হচ্ছিল। যদিও সে তার দৃষ্টি অবনত করে রেখেছিল তবু সেই অবস্থায় সে তাঁর লাবণ্যভরা দেহের ছবি…মনে মনে কল্পনা করছিল। তার এই দৃষ্টি দেখে মাদাম সোয়াস্তি পেলেন। তাঁর উদ্বেগ পরিপূর্ণভাবে দূর না হলেও স্বামীর জন্য তাঁর যে উদ্বেগ বিষণ্ণতায় পরিণত হয়েছিল তার কিছুটা উপশম হল।

তারা যখন দুপুরের ভোজ সারছিল তখন তাঁর স্বামী এসব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মাদাম দারভিলের কাছে এসব অজানা রইল না, তিনি বুঝতে পারলেন যে, মাদাম রেনল লালসার কাছে ধরা পড়েছেন। তাই সারা দিন ধরে তাঁর বন্ধু যে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছে সে সম্পর্কে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং শোচনীয় পরিণামের ছবি খুব সাহসের সঙ্গে তিক্ত-কণ্ঠে বর্ণনা করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে জুলিয়ানকে একা পাওয়ার জন্যে মাদাম রেনলের মন অধীর হয়ে পড়েছিল…তিনি জানতে চান যে, সে এখনও তাকে ভালবাসে কি না।

তাঁর স্বভাবের অপরিবর্তনীয় মধুরতা সত্ত্বেও অনেকবার তিনি বন্ধুর কাছে মনের কথা খুলে বলতে এবং তাকে বোঝাতে উদ্যত হলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগানে মাদাম দারভিল সুব্যবস্থার মাধ্যমে মাদাম রেনল এবং জুলিয়ানের মাঝখানে বসে পড়লেন। কাজেই মাদাম রেনল জুলিয়ানের হাত ধরে চুম্বন করে এবং দু'চারটে প্রেমের কথা বলে তৃপ্তিলাভের যে চেষ্টা করছিলেন তা' আর সম্ভব হল না।

এই হতাশা তাঁর উত্তেজনা বাড়াল। একটা ব্যাপারে তিনি খুব দুঃখ অনুভব করলেন…আগের রাতে অমন তাড়াহুড়ো করে জুলিয়ান তাঁর ঘরে ঢুকেছিল বলে তিনি তাকে বলেছিলেন, এখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন পাছে সে আর তাঁর ঘরে না আসে সে রাতে। তিনি আগেভাগেই বাগান থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকলেন এবং নিজের মনের অধীরতা সংযত করতে না পেরে জুলিয়ানের ঘরের দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শুনলেন। উদ্বেগ এবং যৌন-কামনা থাকা সত্ত্বেও নিজে তার ঘরে ঢোকবার সাহস করলেন না। কাজটা তাঁর কাছে খুব নীচুমানের মনে হল…এবং এদেশীয় লোকেরাও তাই মনে করে।

চাকর-বাকররা এখনও সবাই শুতে যায় নি। তাই তাঁর বিবেচনা-বুদ্ধি তাকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দু'ঘণ্টার প্রতীক্ষা যেন যন্ত্রণাদায়ক দু'শতাব্দী মনে হচ্ছিল।

মনে মনে যা' করবে বলে ঠিক করেছিল জুলিয়ান তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। রাত একটা বাজল। বাড়ীর কর্তা ঘুমিয়ে পড়েছেন এ কথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেই সে নিঃশব্দে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, চলল মাদাম রেনলের সঙ্গে মিলিত হতে। এবার প্রণয়িনীর সঙ্গে তার মিলন তাকে দারুণ খুশি করে তুলল, মিলনের ভূমিকা নিয়ে সে কম চিন্তা করছিল। দেখা এবং শোনার দিকেই ছিল তার মন।

নিজের বয়স সম্বন্ধে মাদাম যে কথা বললেন তা' শুনে তার মনে বিশ্বাস ও সাহস ফিরে এল। তিনি বললেন,—'ওগো, আমি যে বয়সে তোমার চেয়ে দশ বছরের বড়। কেমন করে তুমি আমায় ভালবাসবে!' অনেকবার উদ্দেশ্যহীনভাবে কথাগুলো তিনি বললেন এবং বললেন কেননা বয়সের চিন্তাটা তাঁর মনের উপর ভার হয়ে বসেছে। জুলিয়ান তাঁর অতৃপ্তির কারণ বুঝতে পারল না, কিন্তু বুঝল কথাটা ঠিক। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে তার মনের ভয় ঘুচল।

অনভিজাত বংশে জন্মগ্রহণের ফলে নিজেকে নিকৃষ্টমানের প্রেমিক কল্পনা করার বোকামি দূর হল। তাই জুলিয়ানের আদর ভীরু প্রণয়িনীর মনে আবার আনন্দ ফিরিয়ে আনল, এবং নাগর সম্পর্কে তাঁর মনে একটা সুন্দর ধারণা জন্মাল। যে কঠিন আত্ম-সচেতনতা-বোধ আগের রাতে জুলিয়ানের মনে জয় করার ইচ্ছা জাগিয়েছিল আজ রাতে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না, তাই তাদের মিলন আনন্দ-ঘন মুহূর্ত হয়ে উঠল। যদি তার প্রণয়িনী যৌন-আচরণের দৃশ্য দেখতেন তাহলে

এই দুঃখজনক আবিষ্কার চিরকালের জন্য তাঁর আনন্দ নষ্ট হয়ে যেত এবং এর কারণ হত তাঁদের মধ্যে বয়সের ফারাকের জন্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই এ বয়সের ধর্ম অনুযায়ী জুলিয়ান বেপরোয়াভাবে গভীর প্রেমে পড়ল। মনের কথা সব সে মাদাম রেনলের কাছে খুলে বলল। 'স্বীকার করছি তুমি দেবীর মতন অপরূপা।' বলল, ভয় উদ্বেগ আর বিশ্বাসের কথা। কাজেই মাদাম রেনল ভাবলেন—না, আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনী নেই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানতে চাইলেন যে, সেই ছবিখানা কার! জুলিয়ান জানাল যে, ওখানা একখানা পুরুষের ছবি।

এমন আনন্দের অস্তিত্বও পৃথিবীতে আছে! অথচ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। ভাবলেন—আহা! দশ বছর আগে যদি জুলিয়ানের সঙ্গে আমার পরিচয় হত! তখন সুন্দরী বলে আমার সুনাম ছিল।

জুলিয়ানের মনে এসব চিন্তার নামগন্ধও ছিল না। তখনও তার কাছে প্রেমের আর একটা নাম উচ্চাশা। তার মানে, সে নিজে গরীব এবং অসুখী, লোকে তাকে ঘৃণা করে অথচ আজ সে একটি সুন্দরী নারীকে লাভ করেছে। তার প্রেম-পূজা, প্রণয়িণীর সৌন্দর্য দেখে তার মনের গদগদ ভাব এসব দেখে মাদাম রেনল নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাদের মধ্যেকার বয়সের পার্থক্য প্রেমের পথে কোনও বাধা হয় নি। তবে তাঁর যদি কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকত, যা' নাকি সভ্য সমাজের ত্রিশ বছরের যে-কোনও নারীই লাভ করে তাহলে বুঝতে পেরে তিনি ভীত হতেন যে, বিস্ময় এবং আত্ম-সচেতন কৃতজ্ঞতা-বোধের উপর প্রেমের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

অনেক সময় নিজের উচ্চাশার কথা ভুলে গিয়ে জুলিয়ান মাদাম রেনলের মূল্যবান গহনাগুলো অবাক নয়নে দেখে, তাঁর দামী পোশাকের ঘ্রাণ নেয়। তার প্রণয়িনী তার গায়ে ঠেস দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সে তাকিয়ে থাকে প্রণয়িনীর গহনা আর পোশাকের দিকে।

মাঝে মাঝে তাই মাদাম রেনল ভাবেন, এমনই পুরুষকে আমার বিয়ে করা উচিৎ ছিল। কি তীব্র ভালবাসা, যেন আগুনের শিখার মতন দেদীপ্যমান জীব। ওর সঙ্গে জীবন কত না রোমাঞ্চকর হত!

আর জুলিয়ান? এমন নারীর সঙ্গে সে কখনও সহবাস করে নি। এ নারীর তূণীরে অজস্র প্রেমের শর। প্যারীর কোন নারী এমন অনুপম সুন্দরী নয়। এমন আনন্দ-ঘন মুহূর্তে ভালবাসা সুখ উপভোগে কোন বাধা সে লাভ করে না। একদিকে প্রেম-পূজায় পরিপূর্ণ তার মন, অন্যদিকে প্রণয়িনীর মন ভালবাসায় কানায় কানায় ভরা···তাই প্রথম ভালবাসার মুহূর্তে তার হাস্যাস্পদ অবস্থার কথা, নানা ধারণার কথা সে একদম ভুলে গেল। সে মনের কথা প্রণয়িনীর কাছে নিঃসঙ্কোচে খুলে বলে। প্রণয়িনীর সামাজিক অবস্থা তাকেও উন্নীত করেছে।

প্রেম এবং দেহ-মিলনের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ অথচ নানা বিষয়ে পণ্ডিত

প্রণয়ীকে শিক্ষা দেন। কেননা মঁসিয়ে ভালেনদ এবং সহকারী প্রশাসক তাঁর প্রণয়ীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে থাকেন। মাদাম দারভিল কিন্তু প্রশংসার ধারে কাছেও যান না। তাই যাওয়া সম্পর্কে কোনও কারণ না দেখিয়ে মাদাম দারভিল একদিন ভারজি ছেড়ে চলে গেলেন। মাদাম রেনল চোখের জল ফেললেন। কিন্তু অচিরে বুঝতে পারলেন যে, দুঃখের চেয়েও তাঁর সুখের মাত্রা অনেক বেশী, কেননা সারাদিন এখন তিনি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে একলা থাকার সুযোগ পাবেন।

জুলিয়ানও এখন অনেকক্ষণ ধরে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে থাকে।

কেবল মাঝে মাঝে ফৌকের ভাগ্যহীন প্রস্তাব তার মনকে পীড়া দেয়। একটা সময় ছিল যখন সে প্রেমে পড়ে নি কিংবা কেউ তার প্রেমে পড়ে নি···কিন্তু এখন এই নতুন জীবন সুরু করার পর থেকেই প্রেমের আনন্দে তার জীবন কানায় কানায় ভরপুর। সে ভাবে তার উচ্চাশার কথা তার প্রণয়িনীর কাছে খুলে বলবে···সে বড় হতে চায়। বলবে, ফৌকের বিচিত্র প্রস্তাবের কথা।

কিন্তু বলা হল না। একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল।

১৭: মেয়রের প্রধান সহকারী

অহো, প্রেমের বসন্তের কি অপরূপ সাদৃশ্য
এপ্রিলের দিনগুলোর অনিশ্চিত উজ্জ্বলতার সাথে;
কখনো বা সূর্যের দেদীপ্যমান সৌন্দর্য
এবং কখনো বা মেঘে ঢাকা পড়ছে সেই শোভার রূপ!

—সেক্সপীয়ার

সন্ধ্যেবেলা। জুলিয়ান বাগানের মধ্যে এক নিভৃত কোণে প্রণয়িনীর পাশে বসেছিল। গভীর স্বপ্নে মগ্ন মন। এখানে বাইরের কেউ এসে বিরক্ত করবে না। এমন মধুর মুহূর্ত কি চিরন্তন হবে? জীবনে একটা পেশা নির্বাচনের জন্য তার মন সম্পূর্ণভাবে বিচলিত, এই বিচলিতভাব তার শৈশব অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং তার মতন সম্বলশূন্য এক যুবককে পুরুষ-জীবনে অভিষিক্ত করেছে।

সোচ্চারে বলে উঠল জুলিয়ান—'আহা! ফরাসী যুবকদের জীবনে নেপোলিয়ন ছিলেন এক ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ! এখন তাঁর স্থান কে দখল করবে? এখন হতভাগ্য যুবকরা, এমন কি কিছুটা শিক্ষালাভের জন্য যাদের সঙ্গতি আছে, তারা বাধ্যতামূলক-সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার দায় এড়িয়ে চরিত্র গঠন করবে? যা কিছুই আমরা করি না কেন এই মহান ধ্বংসের স্মৃতি আমাদের অসুখী করে তুলবে!'

সহসা সে দেখল যে, মাদাম রেনলের মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন। তাঁর সারা মুখমণ্ডলে ঘৃণার ঠাণ্ডা প্রলেপ। এমন ধরনের চিন্তা কেবলমাত্র চাকর-বাকরদের

পক্ষেই উপযুক্ত! ধন-সম্পদের মধ্যেই তিনি লালিত-পালিত, স্বাভাবিকভাবে তাঁর ধারণা যে জুলিয়ানও একই রকম। তিনি হাজারবার জুলিয়ানকে ভালবাসেন, এবং ভালবাসেন নিজের জীবনের চেয়েও বেশী···তাই তার কোন দিকে নজর নেই।

জুলিয়ান তাঁর চিন্তা আন্দাজ করতে পারল না, তবে তাঁর ভ্রূকুটি তাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলল। তার উপস্থিতবুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ তাই প্রতিটি কথা সে বুঝে বলতে লাগল এবং তার পাশে-বসা সুন্দরী রমণীর আচরণ আন্দাজ করতে তার অসুবিধা হল না। নদীর তীরে ঘাসের উপর তারা পাশাপাশি উপবিষ্ট···সঙ্গিনীর মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল! কাঠ-ব্যবসায়ী বন্ধুর মন্তব্য তার মনে পড়ল!

দু'চোখে তখনও ঠাণ্ডা দৃষ্টি! তবু মাদাম রেনল বললেন—দেখ, ওধরনের মানুষের সাথে আর মেলামেশা করো না।

তাঁর ভ্রূকুটি অথবা তার হঠকারিতার জন্য তাঁর বিরুদ্ধভাব ভাসমান জুলিয়ানের মনের শান্তি দূর করল। ভাবল, আমার সঙ্গিনীর স্বভাব কোমল এবং মধুর, সে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু সে লালিত-পালিত হয়েছে বৈরী শিবিরে। এ ধরনের মানুষরা বিশেষ করে সেই সব স্তরের মানুষদের ভয় করতে বাধ্য হয় যারা সুশিক্ষা লাভ করেও যথেষ্ট অর্থের অভাবে জীবনে উন্নতির সুযোগ পায় না। আচ্ছা, আমরা যদি একই ধরনের অস্ত্র নিয়ে এই সব অভিজাতদের সাথে লড়াই করি তবে তাদের অবস্থা কি হবে? আমি যদি মঁসিয়ে রেনলের জায়গায় ভেরিয়ার শহরের মেয়রের চেয়ার দখল করতাম, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সৎ হতাম তাহলে অসৎ মঁসিয়ে মাসলন এবং ভালেনদের মতন লোকদের কবল থেকে ছাড়া পেতাম। তবে ভেরিয়ার শহরে ন্যায়ের কেমন জয় হত। তাদের ক্ষমতা হত না আমাকে রসাতলে টেনে নিয়ে যাওয়ার। তারা নিজেরাই ধুলোয় লুটোত!

সেইদিনই জুলিয়ানের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছিল, কিন্তু একনিষ্ঠ হওয়ার মতন সাহস আমাদের বীরপুঙ্গবের কম ছিল। বিবাদ বাধলে তৎক্ষণাৎ তা' মিটিয়ে ফেলার সাহস তার থাকা উচিৎ ছিল। জুলিয়ান যে মন্তব্য করল তা' শুনে মাদাম রেনল বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর পরিচিত জনেরা প্রায়ই বলে থাকে যে, নীচ স্তরের যুবকরা যখন লেখাপড়া করে বড় হয়, উচু পদ পায় তখন রোবসপীয়ার তাদের কাঁধে বিশেষভাবে ভর করে। তাই অনেকক্ষণ ধরে তাঁর আচরণ শীতলভাব ধারণ করল। জুলিয়ান মনে করল, এই শীতলতা ইঙ্গিতবহ। তার কাছে অপছন্দ কোনও মন্তব্যে সে যা' সোজাসুজি বলেছে তা' তাঁর কাছে পছন্দ নয়, তাঁকে তা' আঘাত করেছে। তাই নিরানন্দের পরিষ্কার ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে···অথচ যারা তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামায় তাদের সঙ্গসুখে তাঁর নির্মল হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জুলিয়ানের মন আর স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করতে চাইল না। শান্ত মনে এবং স্বল্প প্রেমাবেগে জুলিয়ান ভেবে দেখল যে মাদাম রেনলের ঘরে যাওয়া তার পক্ষে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন কাজ হবে। তাঁর পক্ষেই তার ঘরে আসা উত্তম। কোনও চাকর-বাকরের নজরে পড়লে তাঁর এ-ঘরে আসার একটা সমীচিন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

এই ব্যবস্থার একটা নিজস্ব অসুবিধাও আছে। ফোকের কাছ থেকে জুলিয়ান কতকগুলো বই পেয়েছে, এগুলো ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে কোন দিন পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে আনতে পারত না। এগুলো সে একমাত্র রাতের বেলা খুলে পড়তে বসে। ফলের বাগানের সেই ছোট্ট ঘটনার পর থেকে রাতে তার ঘরে অন্য কারো আগমনে পড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না···এমন অবস্থা সে আশা করে নি এবং সে খুশি।

বইগুলো পড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য সে মাদাম রেনলের কাছে ঋণী। খুঁটিনাটি অনেক বিষয় সে প্রশ্ন করে মাদাম রেনলের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর বাইরে জাত কোনও মূর্খ যুবকের এসব জানা খুবই অসম্ভব। তার যত উপস্থিতবুদ্ধিই থাক না কেন সে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়বে।

নারীর কাছ থেকে নেওয়া প্রেমের ব্যাপারে এই সামান্য পাঠ জুলিয়ানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করল কারণ আজকের উপরতলার সমাজের একটা স্পষ্ট ছবি সে দেখতে পেল। দু'হাজার বছর অথবা মাত্র ষাট বছর আগে ভলতেয়ার এবং পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কার সামাজিক অবস্থার বর্ণনা তার মনকে কুয়াশাচ্ছন্ন করতে পারল না। অকথ্য আনন্দে সে দেখল যে, তার চোখের সামনে থেকে ঘোমটা খসে পড়ল···ভেরিয়ার শহরে কি ঘটে চলেছে তা সে বুঝতে পারল।

বেসানকন শহরে সহকারী প্রশাসকের দপ্তরে জটিল চক্রান্তের শিশুরা গুটি গুটি পায়ে হাঁটছে আজ গত দু'বছর ধরে এবং তারই ফলে প্যারীর নামকরা নেতাদের চিঠিগুলো তারই উপর নির্ভর করে লেখা হচ্ছে। এই অঞ্চলের গোঁড়া ধর্মীয় নেতা মঁসিয়ে দ্য ময়রডের ভেরিয়ার শহরের মেয়রের দ্বিতীয় সহকারী নয় প্রধান সহকারীর পদে নিযুক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একজন ধনবান শিল্প-কারখানার মালিক, তাকেই দ্বিতায় সহকারী পদে নামানো প্রয়োজন।

মঁসিয়ে দ্য রেনলের বাড়ীতে ডিনারে আগত উপরতলার সমাজের মানুষদের আলাপ যা' তার কানে গিয়েছিল তা' শুনে কিছু কিছু ধারণা করতে পারল। সমাজের সুবিধা-ভোগী মানুষরা মেয়রের সহকারী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে দারুণ ব্যস্ত, কিন্তু শহরের অন্য লোকেরা এবং বিশেষ করে উদারনীতিকরা এ সব সম্ভাবনার কথা সন্দেহ করে না। প্রত্যেকেই জানে এ ব্যাপারের জরুরি দিক হচ্ছে যেহেতু ভেরিয়ার শহরের হাই স্ট্রীট একটা জন-পথ তাই তাকে আরও ন'ফুটের উপর চওড়া করা প্রয়োজন।

এখনকার সহকারী মেয়র মঁসিয়ে ময়রডের রাস্তার ধারের তিনখানা বাড়ী

ভেঙ্গে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে···যদি মঁসিয়ে রেনল চেম্বার অব ডেপুটিজে নির্বাচিত হন তাহলে তিনিই হবেন মেয়র। তখন তিনি চোখ বুজে থাকবেন এবং বাড়ীগুলো না সরিয়ে ছোটখাট ভাঙচুর করা হবে। আগামী এক শ' বছর বাড়ীগুলো রাস্তার খানিকটা অংশ অধিকার করে থাকবে। মঁসিয়ে ময়রডের একজন নামকরা ঈশ্বর-ভক্ত এবং অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। তবু উচ্চবংশ-জাত বলে লোকের ধারণা তাঁকে দিয়ে সহজে কাজ করানো যাবে। কাজেই সরানোর যোগ্য ন'খানা বাড়ীর মালিক ভেরিয়ার শহরের সবসেরা ব্যক্তি।

জুলিয়ানের দৃষ্টিতে ফন্‌টিনয়ের যুদ্ধের চেয়েও এই ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ···ফোকের পাঠানো বইগুলো থেকে ফন্‌টিনয়ের নাম সে জেনেছে। বছর পাঁচেক আগে সে যখন প্রথম প্রতি সন্ধ্যায় যাজকের বাড়ী যাওয়া সুরু করে তখন কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা তার নজরে পড়েছিল। কিন্তু সে তখন ধর্ম-তত্ত্বের একজন শ্রদ্ধাশীল বিনয়ী ছাত্র, তাই সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা তার পক্ষে ছিল একান্তভাবেই অসম্ভব।

একদিন মাদাম রেনল তাঁর স্বামীর খাস খানসামাকে হুকুম করছিলেন। লোকটা জুলিয়ানের শত্রু।

লোকটা মুখে বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে বলল—'কিন্তু মাদাম, আজ মাসের শেষ শুক্রবার!'

মাদাম বললেন—'বেশ, তুমি যাও।'

জুলিয়ান বলল—'তাহলে লোকটা তার পুরোন বাড়ীতে খড় তুলতে গেল, আগে ওই খড় ছিল গীর্জার সম্পত্তি, এখন আবার ফিরে দান করা হয়েছে। কিন্তু ওরা সত্যি সত্যি ওখানে কি করে? ওটা একটা রহস্য যার কূল-কিনারা-তল আজও আমি খুঁজে পাই নি।'

মাদাম রেনল বললেন—'এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠান তবে অদ্ভুত। ওখানে নারীর প্রবেশাধিকার নেই এবং জানি ওখানকার সকলের মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে। এই যে আমাদের চাকরটা ওর সঙ্গে ওখানে মঁসিয়ে ভালেনদের দেখা হবে, এবং আমাদের চাকর জঁ যদি তার সঙ্গে বন্ধুর মতন কথা বলার চেষ্টা করে তবে ওই অহঙ্কারী বোকা মঁসিয়ে ভালেনদ মনে কিছু করবেন না, তার কথার জবাব দেবেন একই রকমভাবে। তুমি যদি সত্যিই ওখানকার কাণ্ড-কারখানা সম্পর্কে জানতে চাও তবে আমি মঁসিয়ে মজিরণ এবং ভালেনদের কাছ থেকে সব জানব। ওরা যাতে একদিন আমাদের গলা না কাটে তাই প্রত্যেক চাকরকে আমরা কুড়ি ফ্রাঙ্ক করে দি।'

সময় দ্রুত কাটতে লাগল। প্রণয়িনীর রূপের মোহের স্মৃতি জুলিয়ানের মন থেকে কাটে। উচ্চাশার চিহ্ন লুপ্ত হল। যেহেতু তারা দু'জনে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ তাই দুঃখজনক অথবা গভীর কোন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করার প্রয়োজনীয়তা বাড়তে লাগল, এবং যে-সুখের জন্য সে তাঁর কাছে

ঋণী এবং সেই যে তাঁর সাম্রাজ্য তা' সে একেবারেই সন্দেহ করতে পারল না।

মাঝে মাঝে উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেদেরও বাক্ সংযত করার দরকার হয়। জুলিয়ান অবাক হয়ে প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সংসার সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা মন দিয়ে শোনে। কখনও কখনও রাস্তা তৈরী বা পণ্য সরবরাহের চুক্তি নিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দেখান···মাদাম রেনলের মন তখন বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়। এবং নিজের ছেলেদের দিকে যেভাবে মাদাম তাকায় সেভাবে তার দিকে তাকাতে দেখে জুলিয়ান তাঁকে ভৎর্সনা করে! তবে মাঝে মাঝে এমন সব ক্ষণ আসে যখন মাদামের চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যায়। তিনি ভাবেন—'জুলিয়ানকে তিনি ভালবাসেন কারণ সে সন্তানতুল্য।'

বড় পরিবারের ছেলেরা যে সব বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ নয় সে-সব বিষয়ে জুলিয়ানের হাজারো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর মুহূর্তে তাকে তাঁর প্রেমিক হিসাবে কি প্রশংসা করেন না? তার প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি শঙ্কিতহৃদয়। এই যুবক ধর্মযাজকের মধ্যে প্রতিদিন তিনি ভবিষ্যতে এক মহাত্মা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পান। তিনি কখনও তাকে কল্পনা করেন পোপ হিসাবে, আবার কখনও ভাবেন সে ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রী রিচেল্যু। তিনি জুলিয়ানকে বলেন—'ওগো, তোমার গৌরব দেখার জন্য আমি কি বেঁচে থাকব? মহান ব্যক্তির আদর এখনও আছে। রাজা এবং গীর্জা দু'জনেই মহান ব্যক্তির সন্ধান করে।'

১৮ : রাজা এলেন ভেরিয়ারে

তুমি কি অন্তঃসার-শূন্য, তাই বিক্ষিপ্ত হতে চাও
পচা একদলা মাংসের মতন, আত্মা নেই এমন কি মানুষ,
এবং তোমার ধমনীতে রক্তস্রোত বইছে না কি?
সেণ্ট ক্লিমেণ্ট গীর্জায় বিশপের ভাষণ

সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখ। রাত তখন দশটা।

হাই স্ট্রীটের বুকে একজন ঘোড়-সওয়ার পুলিশের দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনির শব্দে সারা ভেরিয়ার শহরের লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘোড়-সওয়ার ঘোষণা করছিল—আগামী রবিবার রাজা আসবেন এবং আজ মঙ্গলবার শেষ হল। সহকারী প্রশাসক রাজাকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং রাজার শুভ আগমন উপলক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব হবে ঠিক হল। সেই রাতেই ভার্জিতে মঁসিয়ে রেনলকে খবর দিতে লোক ছুটল। সারা শহরেই আনন্দের উত্তেজনা। রাজার শোভাযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোর সব ঝুল-বারান্দা লোকেরা আগে থেকেই ভাড়া করে রাখল।

কে 'গার্ড অব অনার' পরিচালনা করবেন? মঁসিয়ে রেনল দেখলেন বাড়ী সারানোর স্বার্থে মঁসিয়ে ময়রডেরকে এ কাজটার ভার দেওয়া উচিত। তাছাড়া

তিনি শহরের সহকারী মেয়র। ঈশ্বর-ভক্ত হিসাবে ম'সিয়ে ময়রডের চরিত্রে কোন খুঁত লোকে খুঁজে পাবে না, কিন্তু জীবনে তিনি কখনও ঘোড়ায় চড়েন নি। ছত্রিশ বছর বয়সের একজন ভীরু স্বভাবের লোক, ঘোড়া থেকে পড়ে হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে তিনি ভীত।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় মেয়র তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—'দেখুন স্যার, আপনার অভিমত চাইছি কেননা আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এর মধ্যেই মেয়রের পদ লাভ করেছেন। এই নিরানন্দ শহরে কারখানার পর কারখানা গড়ে উঠছে। লিবারেল দলের লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। তারা সব কিছু অস্ত্রে পরিণত করছে। আমরা রাজা এবং রাজতন্ত্রের স্বার্থ দেখব। বিশেষ করে আমরা পবিত্র গীর্জার সমর্থক, কাজেই ভেবে দেখুন কাকে এসময় গার্ড অব অনার পরিচালনার ভার দেব?'

ঘোড়া সম্বন্ধে তাঁর মনে দারুণ ভয়। তবু শহীদের সম্মান লাভের ইচ্ছা নিয়ে ম'সিয়ে ময়রডে রাজী হয়ে বললেন—'উপযুক্ত আচরণ করার রাজনীতি আমি জেনে নেব। এখন আর নতুন করে ইউনিফরম বানাবার সময় নেই, তবে বছর সাতেক আগে রাজবংশের একজন রাজপুরুষ ভেরিয়ার শহর দিয়ে গিয়েছিলেন, তখনকার বানানো পোশাক আছে।

সকাল সাতটায় মাদাম রেনল চলে এলেন ভার্জি থেকে। সঙ্গে জুলিয়ান এবং ছেলেরা। দেখলেন, তাঁর বসবার ঘরে লিবারেল দলের নারীরা অপেক্ষা করছেন। তাঁরা লিবারেল এবং রাজতন্ত্রীদের মিলন চান। তাঁরা অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর স্বামীকে বলে 'গার্ড অব অনারে' তাঁদের জায়গা করে দেন। একজন ত বলেই বসলেন যে, তাঁর স্বামী 'গার্ড অফ অনারে' স্থান না পেলে দুঃখে যথা-সর্বস্ব হারাবেন, দেউলিয়া হয়ে পড়বেন। মাদাম রেনল বুঝিয়ে সুঝিয়ে সবাইকে বিদায় করলেন। তিনি খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠলেন।

তাঁর মন রহস্যপূর্ণভাবে বিচলিত দেখে জুলিয়ান বিস্মিত ও বিরক্তচিত্ত। রাজাকে নিজের গৃহে আহ্বান করার জন্য তাঁর মনের প্রেম-ভাবে যেন গ্রহণ লেগেছে। এই সব গোলমাল আর ব্যস্ততায় তাঁর মূর্তি যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ভাবল, অভিজাত সমাজের এই সব কর্মানুষ্ঠান শেষ হলে আবার হয়ত তিনি আমার সঙ্গে প্রণয় খেলায় মাতবেন। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এসব সত্ত্বেও জুলিয়ান এখনও তাঁকে ভাসবাসে।

বাড়ীখানা সাজান হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে বৃথাই একটা সুযোগ খুঁজছিল···একবারও সে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ পেল না। অবশেষে দেখল, মাদাম তার ঘর থেকে তার একটা কোট-জামা নিয়ে বেরোচ্ছেন। তাদের ধারে কাছে আর কেউ নেই। জুলিয়ান তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু মাদাম তার কথা কানেই তুললেন না। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ভাবল জুলিয়ান··· কি বোকা আমি! এমন এক নারীর প্রেমে পড়েছি! উচ্চাশা তাঁর স্বামীর মতন

তাঁরও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

তাঁর মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। জুলিয়ান পাছে মনে আঘাত পায় তাই তাকে তিনি কিছু আগে থেকে বলেন নি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে, জুলিয়ান তার কালো কোট ফেলে 'গার্ড অফ অনারে' যোগ দেবে। মঁসিয়ে ময়রডে এবং সহকারী প্রশাসককে তিনি অনুরোধ করেছেন জুলিয়ানকে দলে নেওয়ার জন্য। দলে পাঁচ-ছ'জন যুবককে নেওয়া হবে। জুলিয়ান হবে তাদের একজন। মঁসিয়ে ভালেনদ ভেবেছিলেন যে, এই শহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে তিনি তাঁর ঘোড়ারগাড়ীখানা ধার দেবেন। এখন মাদামের অনুরোধে তিনি তাঁর নরম্যান ঘোড়াটি জুলিয়ানকে দিতে রাজী হলেন; যদিও জুলিয়ানকে তিনি মনে মনে অপছন্দ করেন। এদিকে 'গার্ড অফ অনারে' মনোনীত লোকেরা ঠিক সাত বছর আগের মতন আকাশ-নীল কোট ধার করল। তার উপর লাগাল ঝকঝকে কর্ণেলের চিহ্ন-সূচক প্রতীক। কিন্তু মাদাম চাইলেন যে, জুলিয়ানের জন্য তিনি একটা নতুন কোট বানাবেন। মাত্র চারদিন সময় আছে। বেসানকনে তার কালো কোট পাঠিয়ে নতুন একটা ইউনিফর্ম মায় তরোয়াল ও টুপি শুদ্ধ বানিয়ে আনবেন···এ সবই গার্ড অফ অনারে দরকার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার··· জুলিয়ানের পোশাক তিনি ভেরিয়ার শহরে কিছুতেই বানাতে দেবেন না। জুলিয়ানকে এবং সারা শহরের লোককে তিনি তাক লাগিয়ে দেবেন।

সাধারণ মানুষদের ইচ্ছা মতন গার্ড অফ অনারের ব্যবস্থা করে মেয়র এবার মন দিলেন এই উপলক্ষে এক ধর্মীয় উৎসব করার জন্য। রাজা নিশ্চয় শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'ব্রে-লা-হাউতে' অবস্থিত 'সেন্ট ক্লিমেন্ত' গীর্জার ধ্বংসাবশেষ না দেখে ভেরিয়ার ছেড়ে যাবেন না। ওখানেই সমস্ত যাজকদের সমবেত করা হবে। কিন্তু মঁসিয়ে মাসলনকে নিয়ে মুস্কিল হল। এই নতুন যাজক যেমন করে হোক মঁসিয়ে চেলানের হাত থেকে মুক্তি চান। মঁসিয়ে রেনল বৃথাই তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে, এটা বোকামি হবে। মারকুইস দ্য লা মোলের পূর্ব-পুরুষরা বহুকাল ধরে এই প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন এবং তিনি নিজে এবার রাজার সঙ্গী হয়ে আসছেন। বিগত ত্রিশ বছর ধরে মারকুইসের সঙ্গে মঁসিয়ে চেলানের বন্ধুত্ব। তাই এখানে এসেই মারকুইস নির্ঘাৎ মঁসিয়ে চেলানের খোঁজ করবেন। তারপর হয়ত নিজেই মঁসিয়ে চেলানকে তাঁর ছোট্ট বাড়ী থেকে দল-বল সহ নিয়ে আসবেন। তাহলে সেটা কি গালে চড় খাওয়া হবে।

মঁসিয়ে মাসলন বললেন—'আমার যাজকদের মধ্যে সে এলে এখানে এবং বেসানকনে আমার দুর্নাম রটবে। হায় ঈশ্বর! সে একটা ঈশ্বর-বিরোধী বিপ্লবী।'

জবাব দিলেন মঁসিয়ে রেনল—'আপনি যাই বলুন না কেন, যাজকমশাই, মঁসিয়ে দ্য লা মোল ভেরিয়ার নগর সমিতিকে হাস্যাস্পদ করবেন তা হবে না। আপনি তাকে জানেন না। রাজসভায় যখন থাকেন তখন তাঁর মতবাদ খুবই

সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু এখানে এই প্রদেশে এলে তার মুখ থেকে তিক্ত কথার ফুলঝুরি ছুটবে, সব কিছু তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন, করবেন উপহাস। ফলে সবাই লজ্জায় পড়বে। নিজের আনন্দের জন্য তিনি আমাদের সকলকে লিবারেলদের চোখে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন।'

তিন দিন ধরে তর্কাতর্কির পর শনিবার রাতে মঁসিয়ে মাসলন অবশেষে মেয়রের ভয়ের কাছে মাথা নোয়ালেন। মেয়র সাহস ফিরে পেলেন। যদি বৃদ্ধ বয়সেও সম্ভব হয় তাহলে মঁসিয়ে চেলানকে ব্রে-লা-হাউতের উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি লেখা হল। মঁসিয়ে চেলান চিঠি লিখে জানালেন যেন জুলিয়ানকে তাঁর সহকারী হিসাবে সঙ্গে থাকার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

রবিবার সকাল বেলায় আশপাশের পাহাড় ও গ্রাম থেকে হাজার হাজার চাষী ভেরিয়ার শহরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। উজ্জ্বল রোদ উঠেছিল। অবশেষে বেলা তিনটের সময় জনতার মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। শহর থেকে মাইল চারেক দূরের পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল···রাজা আসছেন তাই এই অগ্নিশিখার ইঙ্গিত। ঘণ্টাধ্বনি সুরু হল, একটা পুরোন স্পেনীয় কামান দাগা হল। এই শুভ আগমন উপলক্ষে সবাই খুশি হয়ে উঠল। তামাম শহরের অর্ধেক লোক এসে রাস্তার ধারে সমবেত হল। নারীদের সমাবেশে ঝুল-বারান্দাগুলো গেল ভরে। সার দিযে দাঁড়াল 'গার্ড অফ অনার'। তাদের সুন্দর পোশাক সকলের প্রশংসা কুড়োল। নিজের নিজের আত্মীয় এবং বন্ধুদের তারা চিনতে পারল। ভীত, সন্ত্রস্ত মঁসিয়ে ময়রডেকে প্রতি মুহূর্তে ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরতে দেখে লোকেরা হাসছিল।

একজনের দিকে সকলের নজর ছিল, তারা সব ভুলে যাচ্ছিল। নবম সারির প্রথমেই এক সুদর্শন তরুণ ঘোড়সওয়ার···কেউ তাকে চেনে না। সহসা কারো একজনের বিরক্ত কণ্ঠের চিৎকারে বিস্ময়কর নীরবতা ভেঙ্গে গেল, উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এই তরুণ মঁসিয়ে ভালেনদের ঘোড়ায় চেপেছে···এবার তারা চিনতে পারল, ও কাঠুরে সোরেলের ছেলে।

তারা প্রত্যেকে চিৎকার করে মেয়রকে এবং বিশেষ করে লিবারেল দলের লোকদের গাল দিতে লাগল। কি! ছোকরা যাজকের পোশাক পরে আর তাঁর বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করে বলে তাকে গার্ড অফ অনারে নেওয়া হয়েছে! শহরে ধনী শিল্প-পতিদের'পাশে দাঁড়াতে দেওয়া হয়েছে! একজন ব্যাঙ্ক-মালিকের বউ মন্তব্য করল—'একটা উদ্ধত ভুঁইফোড়কে নর্দমা থেকে তুলে এনে এই ভদ্রলোকেরা অন্যায় কাজ করেছে।' তার পড়শী বলল—'লোকটা চোর খরিদ্দার, আবার তরবারি নিয়েছে। ও বিশ্বাসঘাতকের মতন আমাদের মুণ্ডু কাটবে।'

উপরতলার লোকদের মন্তব্য আরও বিপজ্জনক। মেয়রের প্রবৃত্তির অভাব দেখে মহিলারা অবাক হয়ে গেল। আর সাধারণ লোকেরা নীচ বংশজাত বলে তাকে অনুকম্পা প্রদর্শন করতে লাগল।'

এই সব মন্তব্য শুনে জুলিয়ান নিজে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, অনুভব করল সে সবচেয়ে সুখী লোক। স্বভাবগুণে সাহসী এবং উৎসাহী হওয়ার জন্য এই পাহাড়ী অঞ্চলের অন্যান্য তরুণদের চেয়ে অনেক ভালভাবে সে ঘোড়ার পিঠে বসেছিল। নারীদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিল যে, তারা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে।

তার নাম-চিহ্নের ফলকগুলো নতুন, তাই বেশী ঝকঝকে। প্রতি মুহূর্তে তার ঘোড়াটা পিছনের পা দুটো উঁচু করছে…বিশালদেহী ঘোড়াটার জন্য সে আনন্দিত। পুরোন দুর্গ-প্রাকারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কামান দাগার আওয়াজ হল, অমনি তার ঘোড়াটা ছট্‌ফট্‌ করে লাফিয়ে উঠল…খুশিতে সে আত্মহারা হল। তার সৌভাগ্য যে, সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল না এবং তখন থেকে সে ভাবল যে, সে একজন বীর। সে নিজে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর একজন সেনানায়ক…দুর্গ আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে।

আরও একজন এখানে ছিলেন, তিনি ওর চেয়েও বেশী আনন্দিত। টাউন হলের জানালা দিয়ে সর্ব প্রথম তিনি তাকে যেতে দেখেছিলেন। তার ঘোড়া যখন লাফিয়ে উঠেছিল তখন তিনি ঘোড়ারগাড়ীতে দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁর ঘোড়ারগাড়ী শহর থেকে বেরিয়ে রাজা আসার রাস্তায় গার্ড অফ অনারের সার থেকে কুড়ি পা পিছনে সোনালী ধূলোর মেঘের মধ্য দিয়ে ছুটছিল।

মেয়র যখন রাজাকে শহরে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তখন হাজার দশেক চাষী সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—'রাজা দীর্ঘজীবি হোন!' ঘণ্টাখানেক পরে সব ভাষণ শোনার পর রাজা যখন শহরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন তখন কামানটা মুহুর্মুহু গর্জন করতে লাগল, ঠিক তখনি দুর্ঘটনাটা ঘটল। না, গোলন্দাজ সৈনিকদের কোনও বিপদ হয় নি, তারা লিপজিগ এবং মণ্টমিরেলে তাদের পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছে। ঘোড়া ভয় পেয়ে মঁসিয়ে ময়রডেকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে শুধু সাজ পরে রাস্তায় ছুটতে লাগল। কেলেঙ্কারী বাধল। রাজার গাড়ী যাওয়ার আগেই ময়রডেকে খুঁজে বার করতে হল।

গোলাপী রঙে রাঙানো নতুন গীর্জার সামনে রাজা গাড়ী থেকে নামলেন। খানা-পিনা সেরে প্রাচীন সেণ্ট ক্লীমেণ্ট গীর্জায় প্রার্থনা করার জন্য রাজা আবার গাড়ীতে উঠলেন। রাজা প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়ান দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মঁসিয়ে রেনলের বাড়ীতে হাজির হল।

সে তার সুন্দর আকাশ-নীল কোট, নাম-চিহ্ন, তরবারি এসব খুলে নিজে একটা বিশ্রী যাজকের পোশাক পরল এবং ঘোড়া ছুটিয়ে ব্রে-লা-হাউতে এসে হাজির হল। উদ্দীপনা জুলিয়ানের মনে হাজার গুণ বেড়েছে। শহরের রাস্তায় এখন ঘোড়া ছোটানো অসম্ভব। হাজার হাজার মানুষ পুরনো গীর্জার চারধারে জমায়েত হয়েছে।

সাধারণতন্ত্রীদের প্রতিহিংসায় গীর্জার অর্ধেক ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গীর্জাটা সুন্দরভাবে সারানো হয়েছিল। এখন সেখানে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। জুলিয়ান ফাদার চেলানের কাছে হাজির হল। তিনি তার হাতে যাজকের পোশাক এবং শুভ্র বহির্বাস দিয়ে বকলেন। জুলিয়ান পোশাক পরে মঁসিয়ে চেলানের অনুসরণ করল। তিনি তাকে আগদির যুবক বিশপের কাছে নিয়ে গেলেন। এই বিশপ মারকুই দ্য লা মোলের ভাগনে। সম্প্রতি সে একটি কাজে নিযুক্ত হয়েছে। রাজাকে এই পুরনো ধ্বংসাবশেষ দেখানোই তার কাজ। বিশপকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

যাজকরা সবাই অধীর হয়ে উঠেছিল। তাদের উপরওয়ালার জন্যে তারা সেই পুরনো গীর্জার গথিক খিলানের নীচে অপেক্ষা করছিল। চব্বিশ জন যাজক ব্রে-লা-হাউতের পুরনো আমলের মতন সেখানে হাজির হয়েছে। সতের শ' উননব্বই সালের আগে এই গীর্জার সম্মানে চব্বিশ বার কামান দাগা হত। এক ঘণ্টার তিন ভাগ সময় এই যুবক বিশপের জন্য অপেক্ষা করার পর তারা ডীনকে পাঠাল বিশপকে খুঁজে দেখতে। রাজার আগমনের সময় হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে পড়বেন। তার আগেই বিশপকে এখানে এসে দাঁড়াতে হবে।

সৎ বৃদ্ধ বলে মঁসিয়ে চেলানকে ডীন-রূপে মনোনীত করা হয়েছিল। বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি জুলিয়ানকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। বহির্বাস পরে জুলিয়ানকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তবে তার বহির্বাসের ভিতর দিয়ে পরনের গার্ড অফ অনারে পরা অশ্বারোহীর জুতার কাঁটা নজরে পড়েছিল। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন।

বিশপের ঘরের দরজায় তাঁরা হাজির হলেন। দীর্ঘদেহী খানসামারা জানাল যে, মহামান্য বিশপ এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি তাদের বোঝাতে চাইলেন যে, ব্রে-লা-হাউতের ডীন যে কোন সময় বিশপের সঙ্গে দেখা করার অধিকারী। তারা তাঁকে উপহাস করল।

এই উর্দিপরা চাকরগুলোর ঔদ্ধত্যে জুলিয়ানের মেজাজ গেল বিগড়ে। সে গীর্জার মধ্যে ঢুকে সব দরজায় হানা দিতে লাগল। একটা ঘরের ছোট্ট দরজা খুলে গেল। ভিতরে বিশপের উর্দি-পরা চাকররা। বিশপ ডেকেছেন ভেবে তারা জুলিয়ানকে বাধা দিল না। সে দ্রুতপায়ে ভিতরে ঢুকল। দু'ধারে দর-দালান...গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন। পুরনো আমলের সুন্দর কাঠের কাজ। চৌদ্দ শ' সত্তর সালে 'ডিউক চার্লস দি বোল্ড' এই গীর্জা তৈরী করিয়েছিলেন। কাঠখোদাই মূর্তিসমূহ দিয়ে ভিতরটা চমৎকারভাবে সাজানো।'

জুলিয়ান নীরবে, নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। দালানের ওখানে আয়নার সামনে বেগুনি রঙের যাজকের পোশাক পরা একজন যুবক যাজক দাঁড়িয়ে আছে। বহির্বাসে সুন্দর নক্সা কাটা। এই দালানে এ ধরনের আয়না কেমন বেমানান।

জুলিয়ান ভাবল, ইনি বোধ হয় বিশপের সেক্রেটারি।

ধীর পায়ে জুলিয়ান তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। কিছুটা দূরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

যুবক যাজক সহসা আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। তার মুখের বিরক্তি-ভাব দূর হল। জুলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করল—'কি মহাশয়, সব ঠিক হয়েছে ত ?'

জুলিয়ান বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। যুবক ঘুরে দাঁড়াতেই তার বুকে ঝোলানো বিশপের বিশেষ ধরনের ক্রশ চিহ্ন জুলিয়ানের নজরে পড়ল। এই তাহলে আগদির যুবক বিশপ। কত কম বয়স ওর···আমার চেয়ে বড় জোর ছ' আট বছরের বড় হবে! নিজের পায়ের অশ্বারোহীর জুতোর কাঁটার জন্য সে নিজেই লজ্জিত হল।

সে লজ্জিতভাবে জবাব দিল—'ইওর লর্ডশিপ! এই গীর্জার ডীন মঁসিয়ে চেলান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।'

বিশপ এমন ভদ্রভাবে কথা বলল যে জুলিয়ান আরও মুগ্ধ হল। দুঃখিত-ভাবে বলল—'হাঁ দেখ, তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে তিনি অনেক প্রশংসার কথা বলেছেন। কিন্তু আমি তোমাকে আমার মুকুট আনতে পাঠানো চাকর ভেবে-ছিলাম। অসাবধানে সেটা আমি প্যারীতে ফেলে এসেছি। রুপোর মুকুটের মাথাটা ভেঙ্গে গেছে। এর জন্যে একটা বিশ্রী অবস্থা হবে। সেটার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।'

—'আপনি যদি অনুমতি দেন ত আমি গিয়ে সেটা আনতে পারি।'

জুলিয়ানের সুন্দর চোখ-দু'টো স্বাভাবিক প্রভাব সৃষ্টি করল।

তখন মন্ত্রমুগ্ধকর ভদ্র কণ্ঠে বিশপ জবাব দিল—'বেশ ত, গিয়ে আন! সত্যিই ওটা এখনি আমার প্রয়োজন। গীর্জার ভদ্রলোকদের দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।'

দর-দালানের মাঝামাঝি পৌঁছে জুলিয়ান ঘুরে বিশপের দিকে তাকাল। দেখল, বিশপ স্বস্তিবচন মুখস্থ করছেন। জুলিয়ান অবাক হয়ে ভাবল, এর মানে কি? সন্দেহ নেই, আসন্ন উৎসবে গীর্জায় হয়ত এরকম ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে হয়।

অনুচরদের ঘরে ঢুকে সে দেখল মুকুটটা ওদের হাতে রয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহামান্য বিশপের মুকুটটা তারা জুলিয়ানের হাতে তুলে দিল।

মুকুটটা বহন করার জন্য সে মনে মনে গর্ব অনুভব করল। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ধীরে ধীরে সে মুকুট হাতে দর-দালান পার হল, দেখল, আয়নার সামনে বিশপ বসে আছে, মাঝে মাঝে ডান-হাত নাড়িয়ে স্বস্তিবচনের মহড়া দিচ্ছে।

জুলিয়ান বিশপের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল। বিশপ একবার মাথা নাড়ল।

খুশিভরা দৃষ্টিতে জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল—'ব্যস! এটা মাথায় থাকুক। তুমি কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াতে কি কিছু মনে করবে?'

বিশপ তাড়াতাড়ি দালানের মাঝ বরাবর চলে এল, মাপা পায়ে এসে দাঁড়াল

আয়নার সামনে। তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে আরও স্বস্তিবচন আওড়াচ্ছিল বিষণ্ণভাবে।

বিস্ময়ে নিথর জুলিয়ান। এর কিছু ব্যাখ্যা করার তার লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোল না। বিশপের মুখমণ্ডল আর বিষণ্ণ নয়। জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল—'মুকুট সম্পর্কে তোমার কি ধারণা স্যার? ঠিক হয়েছে ত?'

—'একেবারে ঠিক হয়েছে, মি লর্ড!'

—'এটা খুব পুরনো নয়? এটা বরং বোকামি মনে হচ্ছে। তবে অফিসারের টুপির মতন এটা সকলের চোখের সামনে পরতেই হবে।'

—'আমার মনে হচ্ছে, এটা সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে।'

—'রাজা আবার বয়স্ক এবং গম্ভীর প্রকৃতির পাদরিদের বেশী পছন্দ করেন। আমার বয়সের জন্য আমি খুব গম্ভীর হতে পারি না, পছন্দও করি না।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বিশপ আবার স্বস্তিবচন আওড়াচ্ছিল।

এতক্ষণে জুলিয়ান ভাবল এবং বোঝার সাহস হল যে, বিশপ স্বস্তিবচন পাঠের কায়দা-কানুন রপ্ত করছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিশপ বলল—'আমি প্রস্তুত। ডীন এবং যাজকদের গিয়ে সাবধান করে দাও।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দরভাবে কাঠ খোদাই করা একটা বিশাল দরজা দিয়ে মঁসিয়ে চেলান সবচেয়ে বয়স্ক একজন পাদরিকে সঙ্গে নিয়ে দালানে ঢুকলেন। জুলিয়ান এই দরজাটা দেখে নি আগে। এখন জুলিয়ান একেবারে পিছনে…সে শুধু বিশপের কাঁধের কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। বিশপ ধীরে ধীরে দালান পার হয়ে দরজার কাছে পৌছলেন। পাদরিরা এখন শোভাযাত্রা করে হাঁটছে, স্তোত্র পাঠ করছে। মসিয়ে চেলান এবং বয়স্ক পাদরির মাঝখানে বিশপ। শোভাযাত্রায় সকলের শেষে মঁসিয়ে চেলানের অনুচররূপে বিশপের ঠিক পাশে জুলিয়ান। ব্রে-লা-হাউত গীর্জার অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দা দিয়ে শোভাযাত্রা এগুচ্ছে। বাইরে কড়া রোদ কিন্তু বারান্দার খিলানের নীচে অন্ধকার।

উৎসবের এমন জাঁকজমক দেখে বিস্ময়ে জুলিয়ান একেবারে থ' হয়ে গেছে। যুবক বিশপের তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং তার হৃদয়ের সুন্দর ভদ্র আচরণের প্রমাণ পেয়ে জুলিয়ান খুব খুশি, তার মনে আবার উচ্চাশা জেগে উঠেছে। মঁসিয়ে দ্য রেনলের সুদিনেও তাঁর কাছে এমন ভদ্র আচরণ আশা করা যায় নি। জুলিয়ান ভাবল, সমাজের উচ্চাসনের যত কাছাকাছি লোকে পৌছায় তার আচরণও তত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

পাশের একটা দরজা দিয়ে তারা গীর্জার মধ্যে ঢুকল। সহসা ছাদের খিলানে খিলানে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। জুলিয়ান ভাবল, এবার হয়ত গীর্জাটা ভেঙ্গে পড়বে। এটা সদ্য-আগত কামানের গর্জনধ্বনি। আটটা ঘোড়া এই কামানটা দ্রুতবেগে টেনে এনেছে। আনার সঙ্গে সঙ্গে লিপজিগ

গোলন্দাজরা মিনিটে পাঁচবার তোপধ্বনি করছে…বুঝি প্রুসিয়ান বাহিনী সামনেই খাড়া রয়েছে।

কিন্তু এই চমৎকার শব্দ জুলিয়ানের মনে আর প্রভাব বিস্তার করছে না। সে আর নেপোলিয়ান বা তাঁর সামরিক জয়ের স্বপ্ন দেখছে না। এত অল্প বয়স, অথচ এই বয়সেই আগদির বিশপ? ভাবছে সে। আচ্ছা, আগদি কোথায়? এবং সেখান থেকে কত টাকা রোজগার করে? বোধ হয় বছরে হাজার দুই তিন ফ্রাঙ্ক হবে?

বিশপের অনুচর সুন্দর জমকালো একটা ছাতা নিয়ে এল। মঁসিয়ে চেলান ছাতাটা ধরলেও আসলে জুলিয়ান ছাতাটা উঁচু করে ধরল। বিশপ নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন। এখন তাকে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। আর আমাদের বীরপুঙ্গবের বিস্ময় সীমাহীন হয়ে উঠল। সে ভাবল, পারদর্শী হলে একজন লোক কি না করতে পারে?

রাজা প্রবেশ করলেন। জুলিয়ানের সৌভাগ্য…খুব নিকট থেকে সে রাজাকে দেখল। বিশপ এক মোলায়েম ভাষণ দিল। উত্তেজনার মধ্যেও রাজার তোষামোদ করতে তার ভুল হল না। বিশপের ভাষণ শুনে জুলিয়ান জানতে পারল যে. রাজা চার্লস দি বোল্ডের একজন বংশধর।

এরপর এই উৎসবের জন্য খরচের হিসাব তৈরীর ভার পড়ল জুলিয়ানের উপর। মারকুইস দ্য লা মোল তাঁর ভাগনে বিশপের অভিভাবক। তাই এই উৎসবের জন্য সব খরচ তিনি দিতে চাইলেন। ব্রে-লা-হাউতের উৎসবের জন্য খরচ হল প্রায় তিন হাজার আট শ' ফ্রাঙ্ক।

বিশপের ভাষণের পর রাজা জবাবী ভাষণ দিলেন। তিনি ছাতার নীচে বেদীর পাদমূলে একখানা পুরু গদিমোড়া আসনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দু'ধারে থাক থাক সিঁড়ি। একেবারে নীচের সিঁড়িতে মঁসিয়ে চেলানের পায়ের কাছে বসেছিলেন জুলিয়ান। সে যেন রোমের সিসটাইন গীর্জার প্রধান ধর্মযাজকের পরিচ্ছদের ভূলুণ্ঠিত অংশ ধরবার অনুচর। সুগন্ধ সুরভিত গীর্জা, একের পর এক কামান দাগার শব্দ আসছে। ধর্মীয় আচরণের শুদ্ধতা বিরাজ করছে। চাষীরা যেন আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে।

রাজা প্রার্থনায় আত্ম-নিমগ্ন। জুলিয়ান রাজার কাছ থেকে কেবল ছ'ফুট দূরে উপবিষ্ট। রাজার ছোট-খাট শরীর…মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ…পরনে নক্সা-হীন কোট। তার উপর আকাশ-নীল একটা ফিতে: জড়ানো। সোনার জরি দেওয়া পোশাক-পরা অভিজাত পুরুষদের চেয়েও রাজার অনেক কাছে বসেছে জুলিয়ান।

কয়েক মুহূর্ত পরে জুলিয়ান বুঝতে পারল যে, মারকুইস দ্য লা মোল খুব অহংকারী ও উদ্ধত স্বভাবের মানুষ। তিনি তাঁর সুদর্শন যুবক বিশপ ভাগনের মতন ভদ্র নন। আহা! কত ভদ্র এবং জ্ঞানী হলে তবে যাজকের পেশা গ্রহণ

করা যায়! কিন্তু রাজা ত ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছেন কিন্তু ধ্বংসাবশেষ ত চোখে পড়ল না। সেণ্ট ক্লীমেণ্ট কোথায় থাকতে পারেন।

পাশে উপবিষ্ট একজন ছোকরা পাদ্রি বলল যে, ওই ধ্বংসাবশেষ গীর্জার অন্দর-মহলে রয়েছে। জুলিয়ান ভাবল, গীর্জার আন্দর-মহল কোনটা? কিন্তু সে ব্যাখ্যা জানতে চাইল না বরং আরও একাগ্র হয়ে বসে রইল।

এবার গীর্জার অন্দর-মহলে যাওয়ার পালা।

বিশপ ডাকল মঁসিয়ে চেলানকে তার সঙ্গে থাকার জন্য। জুলিয়ান তাদের পিছনে চলল।

অনেক সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে তারা একটা খুব ছোট্ট দরজার সামনে হাজির হল। গথিক-রীতির সোনালী কাজ করা দরজা, মনে হচ্ছে হাল আমলে রঙ করা।

এই ছোট দরজার সামনে ভেরিয়ার শহরের নামকরা অভিজাত পরিবারের চব্বিশজন যুবতী হাঁটু মুড়ে বসে আছে। দরজা খোলার আগে এই চব্বিশ জন অনুপম যুবতীর পাশে বিশপ হাঁটু গেড়ে বসল। সারাক্ষণ সে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করছিল। তার নক্সা-করা পোশাক, তার সদয় মহানুভব আচরণ এবং তার মধুর, তরুণ মুখমণ্ডল কোন কিছুই তাদের কাছে প্রশংসার যোগ্য নয়।

সহসা দরজা খুলে গেল। সারা গীর্জায় সহসা যেন আগুন ধরে গেল। বেদীর উপর আট সারিতে অজস্র মোমবাতি জ্বলছে, মাঝখানে রয়েছে বিশাল একটা ফুলের মালা। সুমিষ্ট গন্ধবহ ধূপ পুড়ছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলি মেঘের মতন ভাসছে ঘরের হাওয়ায়। সোনালা কাজ করা গীর্জার এই ঘরখানার পরিসর খুব ছোট হলেও এর ছাদ খুব উঁচুতে। যুবতীরা প্রশংসায় কেঁদে ফেলল। এই চব্বিশজন যুবতী, দু'জন যাজক আর জুলিয়ান ছাড়া আর কাউকে এই অন্দর মহলে ঢুকতে দেওয়া হল না।

অনতিবিলম্বে রাজা পৌছলেন। তাঁর সাথে মারকুইস দ্য লা মোল এবং প্রধান গৃহাধ্যক্ষ।

দেহরক্ষীরা অস্ত্র হাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

হিজ ম্যাজেস্টি সেই বেদীমূলে সাষ্টাঙ্গে নত হলেন। কেবল যখনি জুলিয়ান দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একজন যুবতীর নগ্ন বাহুর ফাঁক দিয়ে সে একজন যুবক রোমক সৈনিকের ছদ্মবেশে সেণ্ট ক্লীমেণ্টের মনোহর মূর্তি দেখতে পেল। মূর্তি বেদীর ঢাকার নীচে রয়েছে। তাঁর কণ্ঠনালীতে বিশাল ক্ষত-চিহ্ন···মনে হচ্ছে যেন রক্ত বেরিয়ে আসছে। শিল্পী তাঁর প্রতিভাকে ছাড়িয়ে গেছেন। অবসন্ন, অর্ধ-নীমিলিত দু'টি নয়ন করুণায় পরিপূর্ণ। মুকুলিত গুম্ফে তাঁর মনোহর মুখমণ্ডল শোভিত, অর্ধ-বিস্ফারিত অধর-যুগল···যেন এখনও প্রার্থনায় নিরত। জুলিয়ানের পাশের যুবতীর চোখ থেকে গরম চোখের জল ঝরে পড়ছে···এক ফোঁটা পড়ল জুলিয়ানের হাতের উপর।

গভীর নীরবতার মধ্যে এবার প্রার্থনা শুরু হল।

এক সময় রাজার অনুমতি নিয়ে আগদির বিশপ বলতে লাগল :

—'খৃস্টান কুমারীরা, কখনও ভুলো না যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা তোমাদের চোখের সামনে সর্বশক্তিমান এবং ভয়ঙ্কর দেবতার বেদীমূলে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। রক্ত-ক্ষরিত সেণ্ট ক্লীমেণ্টের মূর্তি দেখছ ত, তিনি বিজয়ীরূপে স্বর্গে রয়েছেন। ঈশ্বরের অনুচরেরা দুর্বল এবং এই পৃথিবীতে নিহত হয়েছেন। আজকের দিনটার কথা তোমরা চিরকাল মনে রেখ, রাখবে না? নাস্তিক মানুষকে তোমরা ঘৃণা করবে না? এবং এই যে বিশাল এবং ভয়ঙ্কর অথচ করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হবে না?'

এবার কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে বিশপ উঠে দাঁড়াল।

দু'হাত সামনে ছড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বিশপ—'তোমরা আমার কাছে কি শপথ করবে?'

যুবতীরা কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমরা শপথ করছি।'

তখন বিশপ গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল—'ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের নামে আমি তোমাদের শপথ গ্রহণ করলাম।'

শেষ হল উৎসব।

রাজা নিজেই কাঁদছিলেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হল। অবশেষে প্রশ্ন করার মতন যথেষ্ট আত্ম-সচেতনতা লাভ করল জুলিয়ান...রোম থেকে বারগাণ্ডির ডিউক, ফিলিপ দি গুডের কাছে সেণ্টের যে অস্থি পাঠান হয়েছিল তা' কোথায় রাখা হয়েছে? তাকে বলা হল ওই সুন্দর মোমের মূর্তির মধ্যে সে-সব লুকোন রয়েছে।

হিজ ম্যাজেস্টি প্রত্যেক যুবতীকে একটা লাল ফিতে পরবার অনুমতি দিলেন।

তাতে লেখা রয়েছে—'নাস্তিকের প্রতি ঘৃণা...ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।'

মারকুইস দশ হাজার মদের বোতল চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বললেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ভেরিয়ার শহরের লিবারেলরা রাজতন্ত্রীদের চেয়েও বেশীগুণ আলোক-সজ্জায় তাদের বাড়ীগুলো সাজাল। প্রস্থানের আগে রাজা মঁসিয়ে ময়রডেকে দর্শন দিলেন।

১৯ : চিন্তাই যন্ত্রণা

প্রতিদিনকার ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক মজা আমাদের যৌন-লালসাজনিত সত্যিকারের দুঃখকে গোপন করে রাখে।

—বারনেভ

মারকুইস দ্য লা মোল যে ঘর দখল করে ছিলেন সেই ঘরের আসবাব-পত্তর

সরাবার সময় একখানা চার-ভাঁজ করা কাগজ জুলিয়ানের হাতে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায় মারকুইসের পদবীসহ নাম লেখা ছিল।

বাঁকা বাঁকা অক্ষরে চোলিন নামক একজন পাচকের লেখা আবেদন-পত্র।

এই আবেদন-পত্রের ধারে মঁসিয়ে ময়রডে লিখেছেন—যে অভাবী লোকটার কথা গতকাল আপনাকে বলেছিলাম এখানা তারই আবেদন-পত্র···।

জুলিয়ান ভাবল, তাহলে এই আহাম্মক চোলিনও আমাকে জীবনের পথ দেখাচ্ছে!

ভেরিয়ার শহর থেকে রাজার প্রস্থানের পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। শুধু পড়ে আছে অসংখ্য মিথ্যায় ভরা জনরবের ঝুড়ি···এখানে ওখানে অবিবেচনা-প্রসূত নির্মিত বস্তুসমূহ আর হাস্যকর আলোচনার বিষয়। রাজা, বিশপ, মারকুইস দ্য লা মোলের সম্বন্ধে সরস গুজব। দশ হাজার মদের বোতল এবং উল্টেপড়া হতভাগ্য ময়রডে···একটা উঁচু পদ পাওয়ার আশায় লোকটা মাসখানেক ধরে ঘর থেকে বেরোয় নি। কাঠুরের ছেলে জুলিয়ান মোরেলকে অন্যায়ভাবে গার্ড অব বাহিনীতে গ্রহণ করার অসংগত আচরণ। কাপড় ছাপার কারখানার ধনী মালিক, যারা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যেবেলায় রোজ কাফেতে বসে সাম্য নিয়ে মোটাগলায় গুলতানি করে, তারা এ বিষয়ে কি বলাবলি করছে নিশ্চয় তুমি শুনেছ। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার মূলে রয়েছে অহঙ্কারী, ঘৃণ্য রমণী মাদাম দ্য রেনল। এবং কেন? ওই যুবক যাজক সোরেলের সুদর্শন আঁখি-যুগল এবং গোলাপী গাল বলেছে এসবের দরকার আছে·· তাই।

ভার্জিতে ফিরে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ছোট ছেলে স্ট্যানিস্লাস জেভিয়ার জ্বরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম দ্য রেনল ভীতিকর বিষণ্ণতার শিকার হলেন। এই প্রথম প্রেমের জন্য তিনি নিজেকে দোষ দিলেন। মনে হল, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এই ভয়ানক অন্যায় কাজে তিনি নিজেকে টেনে নামিয়েছেন। যদিও তিনি গভীরভাবে ধর্মভীরু, তবু এই মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে ঈশ্বরের চোখে অন্যায় কাজ করেছেন সে-ধারণা তাঁর হয় নি।

বহু কাল আগে নির্মল হৃদয়ে কনভেন্টে তিনি ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আজকের পরিস্থিতিতে তার সম্পর্কে তাঁর মনে ভীষণ ভয়। ভয়ানক অন্তরদ্বন্দ্বে তাঁর মন খান খান হতে লাগল কারণ তাঁর মনের ভয়ে কোন যুক্তি নেই। জুলিয়ান বুঝল যে, এ সময় সামান্যতম যুক্তি উত্থাপনের প্রয়াসে তাঁর মন শান্ত হবে'না, কেবল তিনি আরও বিরক্ত হবেন···এ ধরনের যুক্তির ভাষা তাঁর কাছে শয়তানের তুল্য। তবু যেহেতু জুলিয়ান নিজে স্ট্যানিস্লাসকে খুব ভালবাসে তাই তার অসুখে এবং অসুখ যখন সাংঘাতিক হয়ে উঠছে তখন তার কথা বলার অধিকার নিশ্চয় আছে। তারপর মাদাম রেনলের অবিরাম বিষণ্ণতা এত তীব্র হয়ে উঠল যে, তিনি আর ঘুমুতে পারছিলেন না। তিনি কখনও তাঁর ভীষণ বিষণ্ণ নীরবতা ভঙ্গ করলেন না। যদি তিনি

মুখ খুলতেন তবে তা হত ঈশ্বর ও মানুষের কাছে অপরাধ স্বীকারের নামান্তর।

যে মুহূর্তে তারা একা থাকার সুযোগ পেত অমনি জুলিয়ান বলত—'তোমাকে আন্তরিকভাবে মিনতি করছি কাউকে কিছু বলো না। তোমার দুঃখের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে একা আমাকে থাকতে দাও। যদি এখনও তুমি আমাকে ভালবাস তবে কিছু বলো না। তোমার মুখের কথায় ত স্ট্যানিস্লাসের অসুখ সারবে না।'

তার এই সান্ত্বনাবাক্যে কোন ফল হল না। জুলিয়ান জানে না যে, মাদাম দ্য রেনলের মাথায় একটা বদ্ধ ধারণা জন্মেছে যে, কুপিত দেবতার কোপ শান্ত করার জন্য হয় তাঁকে ঘৃণা করতে হবে জুলিয়ানকে আর না হয় তাঁর ছেলের মৃত্যু হবে। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর প্রণয়ীকে ঘৃণা করতে পারছেন না তাই এত নিরানন্দ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন।

একদিন তিনি তাকে বললেন—'তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। ঈশ্বরের নামে বলছি, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও তুমি। এখানে তোমার উপস্থিতির ফলে আমার ছেলে মরণাপন্ন। ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। ঈশ্বর ন্যায়-পরায়ণ, তাঁর ন্যায়ের জন্য আমি তাঁর উপাসনা করি। আমার অপরাধ ভয়ানক তবু বিষণ্ণতার অনুভূতি ছাড়াই আমি বেঁচে আছি। ঈশ্বর তাই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আমি দ্বিগুণ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।'

জুলিয়ান গভীরভাবে বিচলিত হল। এর মধ্যে সে হঠকারিতা বা অতি-শয়োক্তির চিহ্ন দেখল না। জুলিয়ান ভাবতে লাগল, তার মনে হচ্ছে আমাকে ভালবেসে সে নিজের ছেলেকে খুন করছে। তবু হতভাগিনী নিজের ছেলের চেয়েও আমাকে এখনও বেশী ভালবাসে। আর তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। বিষণ্ণতাই তাকে শেষ করছে। এই অনুভবের মধ্যে মহত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু এমন প্রেমকে আমি কেমন করে অনুপ্রাণিত করে তুলব···যে আমি দরিদ্র, নীচস্তরে জাত, এত অজ্ঞ এবং মাঝে মাঝে ভয়ানক অসৎ আচরণ করি?

এক রাতে ছেলেটির রোগ সঙ্গীন হয়ে উঠল। প্রায় রাত দু'টোর সময় মঁসিয়ে রেনল ছেলেকে দেখতে এলেন। ছেলেটি জ্বরে বিকারগ্রস্ত···বাবাকে চিনতে পারল না। সহসা মাদাম রেনল স্বামীর পায়ের নীচে আছড়ে পড়লেন। জুলিয়ান দেখল যে, তিনি সবকিছু বলতে চলেছেন এবং নিজের সর্বনাশ নিজেই করছেন। তাঁর এই অস্বাভাবিক আচরণে মঁসিয়ে রেনল বিরক্ত হলেন।

—'বিদায়! আমি যাচ্ছি।' চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন।

—'না! আমার কথা শোন!' তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—'সমস্ত সত্য তোমার জানা উচিৎ। আমিই আমার নিজের ছেলেকে খুন করছি। আমি তার জীবন দিয়েছি, এখন আমিই তার জীবন কেড়ে নিচ্ছি। ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন খুনী। নিজেকে আমি শেষ করব, অসম্মানিত করব···আমার জীবন উৎসর্গ করলে হয়ত ঈশ্বর শান্ত হবেন।'

যদি মঁসিয়ে রেনল কল্পনাপ্রবণ মানুষ হতেন তবে সবই বুঝতে পারতেন।

তাঁর স্ত্রী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন—'ভাবাবেগের খেয়াল! এ সব স্রেফ ভাববিলাস, জুলিয়ান! ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখ যেন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হয়।' তিনি নিজের বিছানায় শুতে চলে গেলেন। অর্ধ-চেতনের মতন মাদাম রেনল হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেলেন। আর জুলিয়ান যখন তাঁর কাছে আসতে চেষ্টা করলে তিনি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। বিস্মিত জুলিয়ান দাঁড়িয়ে রইল।

তাহলে এটাই হচ্ছে ব্যভিচারের অর্থ! মনে মনে সে আওড়াল…তাহলে এই প্রবঞ্চক পাদরীরা যা বলে সেটাই ঠিক? যারা নিজেরা জীবনভোর অজস্র অপরাধ করে তারাই অপরাধ-তত্ত্বের সত্য রূপ দেখতে পায়? কি অদ্ভুত ধারণা!…

মিনিট কুড়ি হল মঁসিয়ে রেনল তাঁর ঘরে ফিরে গেছেন। জুলিয়ান দেখল তার প্রণয়িনী নিথর প্রায় অচেতন দেহে ছেলের বিছানায় মাথা রেখে লুটিয়ে পড়ে আছে। এই স্বভাব-সুন্দরী রমণী আজ কেবল আমাকে ভালবাসার জন্যই গভীর দুঃখের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। কাল-স্রোত দ্রুত প্রবহমান। ওকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? যেমন করে হোক আমাকে মনস্থির করতে হবে। এখন আর এটা কেবল আমার স্বার্থের প্রশ্ন নয়। এই সব মানুষ আর তাদের বাজে জনরব কি আমি গ্রাহ্য করি? কিন্তু কি ভাবে ওকে সাহায্য করব?…ওকে কি ছেড়ে চলে যাব? কিন্তু তাহলে ত ওকে ফেলে যাব ভয়ঙ্কর নির্জনতার যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য। এর জন্য ও তার স্বামীর কাছ থেকে সাহায্যের বদলে কেবল বাধাই পাবে। যেহেতু স্বামী মোটাবুদ্ধির বর্বর মানুষ তাই কেবলই ওকে কর্কশ কথা শোনাবে। হয় ত ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। জানালা দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে।…

যদি ওকে ছেড়ে চলে যাই, ওর উপরে নজর না রাখি, তাহলে ও নির্ঘাৎ সব দোষ স্বামীর কাছে স্বীকার করে বসবে। তখন ওর স্বামী এটা নিয়ে একটা দুর্নামের ঝড় তুলবে, যদিও তার আশা, ওর দৌলতে সে বহু সম্পত্তি হাতাতে পারবে। হায় ঈশ্বর! এমনও হতে পারে, ও হয়ত ওই বর্বর ফাদার মাসলনের কাছেই দোষ স্বীকার করে বসবে। আর ওই লোকটা একটা ছ' বছরের ছেলের অসুখের অছিলায় এ বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে যাচ্ছে না। কোন কারণেই সে হঠছে না এখান থেকে। দুঃখের অভিঘাতে যাকে ও ভালবাসে তাকে ভুলে গেছে…ওর দৃষ্টি অন্বেষণ করছে একজন পাদরিকে।

সহসা চোখ মেলে তাকালেন মাদাম। বললেন—'ওগো, তুমি চলে যাও।'

জুলিয়ান জবাব দিল—'তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি হাজার বার জীবন দিতে পারি। ওগো, এর আগে আর এমন গভীরভাবে তোমাকে ভালবাসি নি। এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার দেবী। জানি, তোমার এই মনোবেদনার কারণ আমি, তাই তোমাকে ছেড়ে আমি দূরে গিয়ে থাকব কি করে! আমার নিজের

যন্ত্রণার কথা বলছি ভেব না। চলে যাব···হাঁ, আমি চলে যাব! কিন্তু আমি যদি চলে যাই, তোমার উপর নজর না রাখি, তোমার এবং তোমার স্বামীর মাঝখানে না দাঁড়াই তবে একদিন তুমি তাকে সব বলে ফেলবে। নিজেকে তুমি শেষ করবে। ব্যাপারটা ভেবে দেখ, সে তোমাকে অসম্মানজনকভাবে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। সারা ভেরিয়ার শহর, সারা বেসানকন শহর তোমার দুর্ণামে ভরে যাবে। সবাই তোমার বিরুদ্ধে যাবে। এই লজ্জার হাত থেকে তুমি কোন দিন মুক্তি পাবে না··· ।'

উঠে দাঁড়িয়ে মাদাম বললেন—'ওগো, আমি তাই চাই। যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই। যত যন্ত্রণা ভোগ করব ততই উত্তম।'

—'কিন্তু এই ঘৃণ্য দুর্ণামে তুমি ত তোমার স্বামীরও সর্বনাশ করবে!'

—'আমি নিজেই নিজের কাছে লজ্জা, নিজেই গায়ে পাঁক মেখেছি। যন্ত্রণা ভোগ করে হয় ত ছেলেকে বাঁচাতে পারব। জনতার সামনে এমন অবমাননা ভোগ করাই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার দুর্বল হৃদয় এটাই বুঝছে। ঈশ্বরের দরবারে এটাই হবে আমার সবসেরা উৎসর্গ, তাই না?···তিনি হয় ত করুণা করে আমার লজ্জা গ্রহণ করে আমার ছেলেকে মুক্তি দেবেন। আরও কোন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার পথ দেখাও, আমি সেটাই ভোগ করতে ছুটব।'

—'তাহলে আমাকেও শাস্তি পেতে দাও, আমিও ত অপরাধী। তুমি কি চাও আমি মৌনব্রতীদের সঙ্গে বন্দী হয়ে থাকব? এমনভাবে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করলে হয় ত তোমার ঈশ্বরের করুণা পাব। হায় ঈশ্বর! আমি কেন স্ট্যানিস্লাসের রোগ-যন্ত্রণা নিজের দেহে নিতে পারছি না··· ।'

—'ওহো! তুমিও ত তাকে ভালবাস।' মাদাম রেনল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দুরন্ত আবেগে জুলিয়ানের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তে দারুণ ভয়ে তখনি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

তারপর হাঁটু মুড়ে বসে বলতে লাগলেন—'ওগো, আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু! তুমি কেন স্ট্যানিস্লাসের বাবা হলে না। তাহলে তোমার নিজের ছেলের চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসাটা আমার কাছে এত বড় পাপ হত না।'

—'আচ্ছা, এখানে থেকে তোমাকে বোনের মতন ভালবাসব এটা কি তুমি চাও না? তাহলে এটাই হবে একমাত্র যুক্তিসহ প্রায়শ্চিত্ত। এবং এতে হয় ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বর শান্ত হবেন।'

তিনি বললেন—'আমার কি হবে? কি অবস্থা হবে আমার? ভাইকে যেমন বোন ভালবাসে আমি কি তেমনিভাবে তোমায় ভালবাসতে পারব? তেমনভাবে ভালবাসার ক্ষমতা কি আমার আছে?'

জুলিয়ান এবার কেঁদে ফেলল। তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলল—'ওগো, আমি তোমার কথা শুনব। হাঁ, তুমি যা' বলবে তাই মেনে নেবো।

এটাই হবে আমার একমাত্র কাজ। আমার মন অন্ধ হয়ে গেছে। কি করব ভাবতে পারছি না। যদি তোমাকে ছেড়ে যাই, তুমি তোমার স্বামীকে সব বলে দেবে। তখন তোমার এবং তোমার স্বামীর সর্বনাশ ঘটবে। এ ধরনের দুর্ণাম রটলে তিনি আর ডেপুটি হতে পারবেন না। অথচ আমি যদি এখানে থাকি তবে তোমার মনে ধারণা জন্মাবে তোমার ছেলের মৃত্যুর কারণ আমি। মনোবেদনায় তুমি মারা যাবে। আমার প্রস্থানের ফল কি তুমি দেখতে রাজী? যদি চাও, আমাদের পাপের জন্য এক সপ্তাহ এ বাড়ী ছেড়ে গিয়ে শাস্তি গ্রহণ করব। যেখানে যেতে বলবে সেখানে গিয়েই আমি থাকব। ধর যদি ব্রে-লা-হাউতের গীর্জায় গিয়ে থাকি। কিন্তু শপথ করো, তোমার স্বামীর কাছে কোন কথা স্বীকার করবে না আমার অনুপস্থিতির সময়। ভেবে দেখ, যদি বল ত আমি আর কখনও ফিরব না।'

তিনি শপথ করলেন এবং সে চলে গেল। কিন্তু দু'দিন পরে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

—'ওগো, তুমি আমার পাশে না থাকলে আমি আমার শপথ রাখতে পারব না। আমার পাশে থেকে সব সময় যদি নীরব থাকার জন্য ইঙ্গিতে আমায় আদেশ না কর তবে আমার স্বামীকে আমি সব বলে ফেলব। আমার ঘৃণ্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমার কাছে এক একটা দিনের মতন দীর্ঘ।'

অবশেষে এই অসুখী মায়ের উপর ঈশ্বরের করুণা হল। খুব ধীরে ধীরে স্ট্যানিসলাসের জীবনের বিপদ কাটতে লাগল। কিন্তু বরফ ভেঙ্গে গেছে…যুক্তি তাঁর পাপ সম্পর্কে তাঁর মনকে সচেতন করে তুলেছে। তাই এখন শান্তভাবে কোন কিছু স্থির করতে পারছেন না। এখনও তিনি বিষণ্ণতার দংশন-জ্বালা ভোগ করছেন, তাঁর মতন আন্তরিকতা-পূর্ণ রমণীর জীবনে এটাই একান্তভাবে স্বাভাবিক। তাঁর জীবন একাধারে স্বর্গ ও নরক…জুলিয়ান যখন থাকছে না তখন নরক এবং যখন তিনি উঠে দাঁড়াচ্ছেন তখন স্বর্গ।

এমন কি যখন প্রেমিকের আলিঙ্গনে ধরা দেওয়ার মতন সাহস তাঁর মনে আসছে সে-সব মুহূর্তেও তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'আর আমি নিজেকে ঠকাব না। হারিয়ে গেছি, মুক্তির সব আশা হারিয়েছি। তুমি যুবক, তোমাকে প্রলোভিত করেছি, তুমি ধরা দিয়েছ। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু নিশ্চিত চিহ্ন দেখে বুঝেছি আমি হারিয়ে গিয়েছি। ভয় পাচ্ছি। নরক দেখে কে না ভয় পাবে? কিন্তু যা' কিছু বলেছি, করেছি তার জন্য অনুশোচনা করছি না। যদি পাপ করতেই হয় তবে নতুন করে আবার পাপ করব। কেবল ঈশ্বর যেন এখনি আমাকে আমার ছেলেদের উপলক্ষ করে শাস্তি না দেন। আমার পাওনার চেয়েও বেশী শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।' আবার মাঝে মাঝে বলেন—'ওগো জুলিয়ান এতে কি অন্ততঃ তুমি সুখী হবে? তুমি কি বুঝতে পারছো গো, আমি তোমায় কত ভালবাসি?'

আর জুলিয়ান? বিশেষভাবে তার প্রেম উৎসর্গের উপর নির্ভরশীল…সে বুঝতে পারছে, প্রতি মুহূর্তে তার মনের সন্দেহ আর আহত গর্ববোধ কিছুতেই এমন মহান এবং অভ্রান্ত উৎসর্গকে সহ্য করতে পারছে না। সে মাদাম দ্য রেনলকে দেবীর মতন পূজা করে। সে একজন অভিজাত রমণী আর আমি একজন মজুরের ছেলে তাতে কিছু এসে যায় না…ও আমাকে ভালবাসে। ওর অনুচররা প্রেমিকরূপে কাজ করে কিন্তু সেই দৃষ্টিতে ও আমাকে দেখে না। মনের ভয় যখন ঘুচল তখন জুলিয়ান প্রেমের বন্য আনন্দে ঝাঁপ দিল এবং মারাত্মক অনিশ্চয়তা মাথা পেতে নিল।

যখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, সে তার প্রেমে সন্দেহ করছে অমনি তিনি বলেন—'যে সামান্য ক'দিন আমরা একসঙ্গে থাকছি সে দিনগুলোতে তোমাকে সুখী করার সুযোগ অন্ততঃ আমাকে দাও গো। এস তাড়াতাড়ি উপভোগ কর, আগামীকাল হয় ত আমি আর তোমার থাকব না। আমার ছেলেদের উপলক্ষ করে যদি আমার মাথার উপর ঈশ্বরের শাস্তি বর্ষিত হয় তবে কেবল তোমার ভালবাসার জন্য আমার বেঁচে থাকা বৃথা হবে, বৃথা হবে যে পাপ আমার সন্তানদের প্রাণ হরণ করছে সেই পাপের প্রতি চোখ বুজে থাকা। এমন আঘাত আমি সহ্য করতে পারব না। ইচ্ছে থাকলেও পারব না…পাগল হয়ে যাব। আহা! তুমি যেমন করুণা করে স্ট্যানিস্‌লাসের রোগ নিজের দেহে নিতে চেয়েছিলে আমি যদি তেমনিভাবে তোমার পাপ আমার দেহে ধারণ করতে পারতাম!'

এই ভয়ঙ্কর নৈতিক দুর্ভোগ জুলিয়ান এবং তার প্রণয়ীর মধ্যে প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ় করল। তার প্রেম এখন আর কেবল রূপজ মোহ বা দৌলতের অহঙ্কার নয়। এখন থেকে তাদের প্রেম—আনন্দ—সুখের অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠল। তাদের উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ আরও বাড়ল, চরম আনন্দের অভিজ্ঞতা তাদের পাগল করে তুলল। লোকের দৃষ্টিতে তাদের আনন্দ আরও আকর্ষণীয়। কিন্তু প্রথম দিনের মতন তাদের প্রেমের রূপ মধুর শান্ত এবং মেঘমুক্ত আশীর্বাদের মত নয়…তখন মাদাম দ্য রেনলের মনে ভয় ছিল হয়ত জুলিয়ান তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসে না। একটা সময়ে এই ভালবাসা ছিল পাপের নামান্তর।

তীব্রতম আনন্দ এবং প্রশান্ত মুহূর্তে মাদাম রেনল বিব্রতভাবে জুলিয়ানের হাত আঁকড়ে ধরে বলে ওঠেন—'হায় ঈশ্বর! নরক আমার চোখের সামনে ভাসছে! কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! তবু এসব আমার প্রাপ্য।' আইভিলতা যেমন দেওয়াল আঁকড়ে ধরে তেমনিভাবে তিনি তাকে দু'হাতে আলিঙ্গনে বাঁধেন।

এই উদ্বিগ্ন মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য জুলিয়ান বৃথাই চেষ্টা করছিল। তিনি তার হাত মুঠোয় ধরে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেন, মৃদু ক্রন্দনের সুরে বলতে থাকেন—'নরক আমার কাছে দয়ার সাগর হবে। এ পৃথিবীর বুকে আরও কয়েকদিন ওকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখত পারব। কিন্তু এখানে, এই পৃথিবীও যে নরক… আমার ছেলের মৃত্যু …যদিও এই মূল্যের বিনিময়ে আমার পাপ ক্ষমা করা হবে

…হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! এই মূল্যের বিনিময়ে আমার পাপ ক্ষমা করো না… তোমাকে ত কোনও আঘাত করে নি আমার এই হতভাগ্য সন্তানরা। কেবল আমি একাই অপরাধী…আমার স্বামী নয় এমন একজনকে আমি ভালবাসি।'

তারপর গভীর প্রশান্তির মধ্যে তাঁকে নিমগ্ন দেখতে পায় জুলিয়ান। নিজেকে সংযত করার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন…ভালবাসার জনের জীবন বিষাক্ত করে তুলতে তিনি চান না। ভালবাসা, বিষণ্ণতা, আনন্দ…এই তিন অবস্থার পরিবর্তিত ক্ষণে তাদের জীবন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতন ঝলসে উঠছে বার বার। চিন্তা করার অভ্যাস জুলিয়ানের মন থেকে ঘুচে গেল।

তার নিজের ব্যাপারে একটা আইনঘটিত মোকদ্দমার জন্য মাদমোজেল এলিসা গিয়েছিল ভেরিয়ার শহরে। সেখানে জুলিয়ানের উপর রুষ্ট মঁসিয়ে ভালেনদের সঙ্গে তার দেখা হল। এবং যেহেতু এলিসা এই গৃহশিক্ষককে ঘৃণা করত তাই সে এই লোকটার নামে অনেক কথা তার কাছে বলল।

একদিন এলিসা মঁসিয়ে ভালেনদকে বলেছিল—'আপনাকে সত্যি কথা বললে আপনি আমাকেই দুষবেন, স্যার। কোন জরুরী বিষয়ে আপনারা কর্তারা দস্তানায় হাত ঢেকে পরস্পরের সঙ্গে মোলাকাত করেন…কোন কোন বিষয়ে আমরা ঝি-চাকররা কোনও কথা বললে আপনারা আমাদের ক্ষমা করেন না… ।'

আগ্রহে তখন অধীর হয়ে উঠলেন মঁসিয়ে ভালেনদ। অনেক কথা শুনে তাঁর অহঙ্কারে আঘাত লাগল। এ জেলার সব সেরা সুন্দরী এই রমণী। আজ ছ'বছর ধরে এই রমণীর প্রীতি লাভের জন্য আমি যত্ন করে চলেছি। দুর্ভাগ্য। সকলের সামনে এই গর্বিতা রমণী তার ঘৃণা প্রকাশ করে আমাকে গভীর লজ্জায় ফেলেছে বহুবার। আজ মজুরের ছেলে এক যুবক গৃহশিক্ষককে সে প্রেমিকরূপে বরণ করেছে। এর চেয়ে আর কোন খবর অনাথ-আশ্রমের কর্তাকে এমন বিরক্ত আর অসম্মানিত করতে পারে না। এই প্রেমিককে মাদাম রেনল পূজা করছে।

এলিসা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকে—'তাছাড়া, মঁসিয়ে জুলিয়ান গিন্নীকে নিজের চেষ্টায় জয় করে নি, সে তার যোগ্য নয়।'

পল্লীনিবাসে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এলিসা এই প্রেমের অস্তিত্বে সন্দেহ করে নি। বহুদিন আগের একটা ঘটনা তার মনে পড়ল। ওই ঘটনার ফলেই যে এটা ঘটেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এলিসা মঁসিয়ে জুলিয়ানকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু জুলিয়ান রাজী হয় নি। এলিসা তখন মাদামকে অনুরোধ করেছিল জুলিয়ানকে বলার জন্য।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। শহর থেকে পাঠানো সংবাদ-পত্রটি মঁসিয়ে রেনলের হাতে পড়ল, সঙ্গে একখানা বেনামী চিঠি। তাঁর বাড়ীতে যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছে তারই পূর্ণ বিবরণ সেই চিঠিতে লেখা। চিঠির কাগজখানা ধুসর-নীল। পড়তে পড়তে মঁসিয়ে রেনলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হল। জুলিয়ান সব কিছুই দেখ-

ছিল। মাঝে মাঝে বিশ্রীভাবে তিনি তাকে দেখছিলেন। সেদিন সারা সন্ধ্যা ঘঁসিয়ে রেনলের উত্তেজনা প্রশমিত হল না। বৃথাই জুলিয়ান তাঁর কাছে বায়-গাণ্ডির অভিজাত পরিবারগুলোর কুলজি সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করছিল।

২০: বেনামী চিঠি

প্রেমালিঙ্গনে দিও না ধরা
ছেড় না এত বেশী রাশ; কঠিনতম শপথ সম খড়কুটো
রক্তে ধরায় যেন আগুন-শিখা।

দি টেম্পেস্ট

মাঝ রাত।

ওরা তখন বসবার ঘর ছেড়ে উঠে পড়ল। জুলিয়ান তার প্রণয়ীকে বলল—'আজ রাতে আমাদের দেখা হবে না। তোমার স্বামী একটা কিছু সন্দেহ করেছেন। একখানা বেনামী চিঠি তিনি পড়ছিলেন দেখেছি। পড়তে পড়তে তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন।'

জুলিয়ান ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মাদাম রেনল হয় ত পাগলামি করে ভাববে যে, তার সাথে আজ দেখা করবে না বলেই জুলিয়ান সাবধান-বাণী শুনিয়েছে। তাঁর পাগলামি চরমে পৌঁছেছিল, রোজকার মতন সময়ে তিনি তার ঘরের দরজায় হাজির হলেন। বাইরে বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শুনেই জুলিয়ান আলো নিভিয়ে দিল। কেউ তার দরজা খোলবার চেষ্টা করছে—ও কি মাদাম রেনল? কিংবা তার ঈর্ষান্বিত স্বামী?

পরদিন সকালবেলায় পাচক একখানা বই জুলিয়ানকে এনে দিল। তার মধ্যে একখানা চিঠি পিন দিয়ে আটকানো। তাড়াতাড়িতে চিঠিখানা লেখা—বানানের দিকে নজর দেওয়া হয় নি একটুও। আর চিঠিখানার উপর ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়েছে। সত্য কথাই লিখেছেন মাদাম রেনল। জুলিয়ান মুগ্ধ হল, এবং মাদামের হঠকারিতা সে ভুলে গেল।

ওগো প্রিয়, আজ রাতে তাহলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না। জীবনে কতকগুলো ক্ষণ আসে যখন আমার ধারণা হয়, তোমার মনের কথা আজও আমি পড়তে পারি নি। তোমার দৃষ্টি দেখে আমার ভয় হয়। তোমাকে ভয় পাই। হায় ঈশ্বর! এর অর্থ তবে কি তুমি আমায় কখনও ভালবাস নি? যদি তাই হয়, আমাদের ভালবাসার কথা যদি আমার স্বামী টের পায় তবে আমার ছেলেদের কাছ থেকে দূরে এই পল্লীনিবাসে চিরদিনের জন্যে আমাকে বন্দিনী করে রেখে দেবে। হয় ত ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা। অচিরে আমি মারা যাব···আর তখন তুমি হবে দানব।

ওগো, তুমি কি আমায় ভালবাস না? আমার বোকামি, আমার বিষণ্ণতার জন্যে কি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, নাস্তিকপ্রবর? তুমি কি আমার সর্বনাশ করতে চাও? একটা সহজ পথ তাহলে তোমায় বাৎলে দিচ্ছি। এই চিঠি-খানা ভেরিয়ারে যাকে খুশি দেখাও গিয়ে কিংবা বরং গিয়ে মঁসিয়ে ভালেনদকে দেখাও। তাকে বলো, আমি তোমাকে ভালবাসি···কিন্তু না, এমন অপবিত্র কথা বলো না। বলো আমি তোমায় পূজো করি। যেদিন থেকে তোমায় দেখেছি সেদিন থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হয়েছে। তোমার কাছে যে সুখ পেয়ে আমি ঋণী এমন সুখ আমার যৌবনকালের মত্ততম মুহূর্তগুলোতেও আমি পাই নি। তাই তোমার জন্যে নিজেকে আমি সমর্পণ করেছি···তোমার জন্যেই আমার আত্মা আমি উৎসর্গ করছি। তুমি ত জান, তোমার জন্যে আমি আরও কিছু বিসর্জন দিতে পারি।

কিন্তু এমন মানুষ কি আত্ম-বিসর্জনের অর্থ বুঝতে পারবে? তাকে বলো··· বলো তাকে, কষ্ট দেওয়ার জন্যই তাকে বলো···দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের আমি গ্রাহ্য করি না। এই সংসারে কেবল এক ধরনের নিরানন্দ বিরাজ করছে। শুধু একটিমাত্র লোকই আমার জীবনের ধারা দিয়েছে বদলে। জীবন হারিয়ে আমি কত আনন্দ পাব, কারণ সেটা হবে আমার আত্মোৎসর্গ, আমার ছেলেদের জন্যে আর আমাকে ভীত হতে হবে না।

ওগো, ওই ঘৃণ্য জীবটার কাছ থেকে কোনও বেনামী চিঠি এলে তুমি আমাকে সন্দেহ করো না। ওই লোকটা আজ ছ'বছর ধরে আমার পিছনে ঘুর ঘুর করছে, কতবার মোটা কর্কশ কণ্ঠে ওর লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ার কাহিনী, সাহসিকতার গল্প আর নানা সুখসুবিধার কথা আমাকে শুনিয়েছে।

সত্যিই কি কোন বেনামী চিঠি এসেছে? ওগো নিষ্ঠুর, আমি ত তাই নিয়ে কথা বলতে চাই। কিন্তু না, তুমি ঠিকই করেছ। হয়ত শেষ বারের মতন তোমাকে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বড় নিরাসক্ত কণ্ঠে এসব বলতাম, কিন্তু এখন একাকী শান্তভাবে আমি সবদিক বিচার করতে পারছি। এখন থেকে খুব সহজে আনন্দ উপভোগের অবসর আর আমরা পাব না। তুমি কি কষ্ট পাবে? হাঁ, হয়ত যেদিন মঁসিয়ে ফৌকের কাছ থেকে কোন চিত্তাকর্ষক বই পাবে না সেদিন কষ্ট পাবে। নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে আমি মন বেঁধেছি··· আগামীকাল, কোন বেনামী চিঠি আসুক বা নাই আসুক, আমার স্বামীকে বলব যে, আমিও একখানা চিঠি পেয়েছি। এবং অনতিবিলম্বে সুন্দর পরিবেশে সহজ-ভাবে তুমি যা'তে তোমার পরিবারের লোকজনদের মধ্যে ফিরে যেতে পার তার ব্যবস্থা করে দেব।

হায়! হয় ত একপক্ষ কাল কিংবা এক মাস আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবে। হাঁ, তোমার সাথে আমি ভাল ব্যবহার করছি···আমার মতন তুমিও কষ্ট পাবে। কিন্তু এই বেনামী চিঠির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ। আমার

বিরুদ্ধে বেনামী চিঠি আমার স্বামীর কাছে এটাই প্রথম আসে নি। হায় রে, ওরা কিভাবে আমাকে হাসায়!

দেখ, আমার সমস্ত আচরণের লক্ষ্য হবে আমার স্বামীকে বোঝান যে, এ-সব বেনামী চিঠি আসছে মঁসিয়ে ভালেনদের কাছ থেকে। এ বাড়ী ছেড়ে গিয়ে ভেরিয়ার শহরে থাকতে ভুলো না। আমার স্বামীর ওখানে একপক্ষ কাল কাটাবার ব্যবস্থা আমি করব, তাহলে ওই সব বোকারা বুঝবে যে, আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে কোন রকম মন-কষাকষির অস্তিত্ব নেই। ভেরিয়ারে গিয়ে প্রত্যেকেব সাথে মেলামেশা করবে, এমন কি লিবারেলদের সাথেও। দেখবে, ওদের বউরা উদ্বিগ্ন-ভরা দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাবে।

মঁসিয়ে ভালেনদের বাড়ী গিয়ে মেজাজ গরম করো না। তোমার একদিনের কথা মতন তার কান কাটতে যেও না। বরং তার বদলে যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবহার করবে। সাধারণভাবে ভেরিয়ারে সবাইকে বিশ্বাস করানো প্রয়োজন যে, ভালেনদ বা আর কারো বাড়ী তুমি যাচ্ছ তাদের ছেলেদের পড়াতে।

এবং এই জিনিসটা আমার স্বামী কিছুতেই অনুমতি দেবে না। এমন কি এটা যদি তিনি মেনেও নেন তবু তুমি ভেরিয়ারে থাকবে এবং মাঝে মাঝে আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারব। আমার ছেলেরাও তোমাকে ভালবাসে, তারাও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। ঈশ্বর আছেন! আমার ছেলেরা তোমাকে ভালবাসে তাই আমিও তাদের ভালবাসি। ওগো, আমি কত বিষণ্ন হব! কি ভাবে এ ব্যাপারটা শেষ হবে!···আমরা বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছি··· বুঝতে পারছ ত কি ভাবে আচরণ করবে। শান্ত হবে, ভদ্র হবে, ওই কুৎসিত লোকগুলোর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে যেও না···তোমাকে পায়ে ধরে অনুরোধ করছি। তারাই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না জনমত যে কথা বলবে আমার স্বামী সেই মত আচরণ তোমার সাথে করবে।

তোমাকে এই বেনামী চিঠিখানা পাঠাচ্ছি দেখবার জন্যে। এখানা মঁসিয়ে ভালেনদের কাছ থেকে পেয়েছি। ধৈর্য ধরবে। একখানা কাঁচি রাখবে। যে বইখানা পাঠালাম তাই থেকে শব্দ কেটে এর সাথে পাঠানো নীলচে-ধূসর কাগজে আঠা দিয়ে লাগাবে। যদি ঠিক মত শব্দ না পাও ত একটা একটা করে অক্ষর কেটে নেবে। তোমার সুবিধার জন্য বেনামী চিঠির একটা বয়ান লিখে পাঠালাম। হায়! যদি তুমি আর আমাকে না ভালবাস এবং সেটাই আমার ভয়, কতক্ষণে যে তুমি আমার চিঠি পাবে! দেখ, বইখানা পুড়িয়ে ফেল, তোমার ঘর তল্লাসী হতে পারে।

এবার বেনামী চিঠিখানা পড়তে লাগল জুলিয়ান:

মাদাম,

তোমার সব ছোটখাট খবরই রাখি, যে লোকের এসব বন্ধ করার

স্বার্থ, তাকে সব জানিয়েছি। তোমার সাথে আমার যতটুকু বন্ধুত্বের বন্ধন আছে তাতে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি ওই চাষী ছোকরার সাথে তুমি মেলা-মেশা বন্ধ কর। তুমি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হও তবে তাই করবে। তোমার স্বামীকে যে সাবধান-বাণী পাঠিয়েছি এর ফলে সে ভাববে ওটা একটা তামাশা এবং তাকে ভুলের মধ্যে রাখতে পারব। মনে রেখ, তোমার গোপন-প্রেমের খবর আমি জানি। ওগো অসুখী রমণী, নিজের জন্যে ভয়ে কাঁপ। এখন থেকে আমার সাথে তুমি ভাল ব্যবহার করতে বাধ্য হবে।

জুলিয়ান আবার মাদাম রেনলের লেখা চিঠি পড়ায় মন দিল।

এই বেনামী চিঠি বানানোর জন্য যেমনি কাগজে শব্দ কেটে বসানোর কাজ শেষ হবে অমনি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে। তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব···আমি গ্রামের দিকে যাব এবং আমাকে খুব বিব্রত দেখাবে। অমনি একটা তীব্র ভাব আমার মনে দানা বাঁধবে। ঈশ্বর! কি ভীষণ বিপদের ঝুঁকি আমি নিচ্ছি, এ সবের কারণ তুমি ভেবেছ এবং আন্দাজ করেছ একখানা বেনামী চিঠি এসেছে। অবশেষে তুমি আমার হাতে যে চিঠিখানা দেবে সেখানা আমি আমার স্বামীকে দেব। বলব, একজন অচেনা লোক আমাকে দিয়ে গেছে। এর পর তুমি ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরোবে এবং ডিনারের আগে বাড়ী ফিরবে না।

পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের বাড়ীর পায়রার খোপ তোমার নজরে পড়বে। আমাদের এই ছোট ব্যাপারটা যদি ভালভাবে সম্পন্ন হয় তবে ওই পায়রার খোপে আমি একখানা সাদা রুমাল বেঁধে দেব। এর বিপরীত কিছু ঘটলে কিছুই বাঁধব না।

ওগো নিষ্ঠুর, এই কাজে বেরোবার আগে তোমার মন কি আমাকে বলতে চাইছে না, আমি তোমায় ভালবাসি? যাই ঘটুক না কেন এটা ঠিক জেন আমাদের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটবার পর আমি একদিনও বেঁচে থাকব না। আহা দুষ্টু মা! ওগো প্রিয়, ওগো জুলিয়ান, দুটো শব্দ আছে যার কোন অর্থ নেই আমার কাছে। ওদের সম্বন্ধে আমার কোনও অনুভূতি নেই···এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারছি না। এ সব আমি লিখছি যা'তে তুমি আমাকে না নিন্দে কর। এখন বুঝতে পারছি, আমি তোমাকে হারাতে চলেছি···ভাণ করে কি আর ভাল হবে? হাঁ, আমার মন তোমার কাছে ভয়ানক কাল হয়ে উঠুক, কিন্তু যা'কে আমি পুজো করি তার কাছে যেন মিথ্যে না বলি। এর মধ্যেই জীবনে আমি অনেক ঠকেছি। ঠিক আছে, আমাকে ভালবাসতে না পারার জন্যে তোমায় ক্ষমা করছি।

আমার চিঠি পড়বার আর সময় নেই। সম্প্রতি তোমার আলিঙ্গনে যে সুখের মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছি তার জন্যে জীবন দেওয়া আমার কাছে কিছুই নয় মনে হচ্ছে। তুমি ত জান ওর জন্যে আরও বেশী দিতে আমি রাজী।

২১ : একজন জমিদার এবং মালিকের সঙ্গে গোপন আলাপ

হায়, আমাদের নৈতিক দুর্বলতা এর কারণ, আমরা নই। কেননা, আমরা এমনভাবে গঠিত, এমনটাই আমরা হব।

টুয়েলফথ্‌ নাইট

এক ঘণ্টা ধরে শিশুর মতন জুলিয়ান শব্দ সংগ্রহ করে সাজালো। ঘর থেকে যখন সে বেরোচ্ছিল তখনই ছেলেদের এবং তাদের মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তিনি খুব সরলভাবে এবং সাহসের সঙ্গে তার হাত থেকে চিঠিখানা নিলেন…তাঁর শান্তভাব দেখে জুলিয়ান বিস্মিত হল।

তিনি জানতে চাইলেন—'আঠা বেশ শুকিয়েছে ত?

সে ভাবল…বিষণ্ণতার দরুণ রমণীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

এই মুহূর্তে তাঁর মাথায় কি মতলব ঢুকেছে? সে এত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে যে, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না। বোধ হয় আজ তাঁকে ভীষণ আকর্ষণীয় লাগছে।

ঠিক তেমনি শান্তভাবে তিনি বললেন—'এতে যদি ভালভাবে কাজ না হয় তবে আমার যা' কিছু আছে সর্বস্ব ওরা কেড়ে নেবে। তোমাকে এই বাক্সটা দিচ্ছি, পাহাড়ের উপর কোথাও পুঁতে রাখবে। একদিন হয় ত এগুলোই আমার একমাত্র সম্বল হবে।'

এই বলে যেমন বাক্সে কাঁচ রাখা হয় তেমন লাল মরক্কো চামড়ার একটা বাক্স তাকে দিলেন। সেটি সোনা আর হীরেয় ঠাসা।

তিনি বললেন—'এবার চলে যাও।'

ছেলেদের তিনি চুম্বন করলেন…ছোট ছেলেটিকে দুটো চুমু দিলেন। জুলিয়ান নিথরভাবে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে তিনি দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

চিঠি খোলবার পর থেকেই মঁসিয়ে রেনলের জীবন ভয়ানক যন্ত্রণা-পীড়িত হয়ে উঠেছে। আঠার শ' যোল সালে একবার তিনি ডুয়েল লড়েছিলেন, তারপর থেকে এমন যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনায় আর কখনও তাঁকে পড়তে হয় নি। সেদিন বুলেটে বিদ্ধ হলে আজ তাঁকে এমন নিরানন্দ জীবন ভোগ করতে হত না। চিঠিখানা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। এখানা কোন রমণীর লেখা না?

মনে মনে ভাবলেন। যদি তাই হয় তবে কি ধরনের রমণী লিখেছে? কোনও নির্দিষ্ট একজনকে দোষী সাব্যস্ত করতে না পেরে তিনি ভেরিয়ার শহরের সব পরিচিতা রমণীর কথা মনে মনে ভাবতে লাগলেন। কোনও পুরুষ কি এই চিঠির বয়ান বলে দিয়েছে? তাহলে সেই পুরুষটি কে? এখানেও সেই একই অনিশ্চয়তা। তিনি যাদের চেনেন তাদের অধিকাংশ লোক হয় তাঁকে হিংসে করে আর না হয় নিঃসন্দেহে ঘৃণা করে। আরাম কেদারায় শুয়ে ছিলেন, উঠে বসে অভ্যাসবশে ভাবলেন—ঠিক আছে। স্ত্রীর কাছে জানতে চাইব।

কিন্তু উঠে দাঁড়াবার আগেই তিনি বলে উঠলেন—হায় ভগবান! তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। কেন, আমি তাকে অবিশ্বাস করব কেন…এই মুহূর্তে সে আমার শত্রু। রাগে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। কঠিন হৃদয়ের জন্য সারা অঞ্চলের লোকে যাকে বলে জ্ঞানী সেই মঁসিয়ে রেনল এখন তাঁর অত্যন্ত পরিচিত দু'জন বন্ধুকে সবচেয়ে ভয় পাচ্ছেন।

মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এরা ছাড়া আমার জনা দশেক বন্ধু আছে। একে একে তিনি তাদের কথা ভাবতে লাগলেন, কতটুকু সান্ত্বনা তারা তাঁকে দিতে পারবে তা' যাচাই করলেন। হাঁ, তাঁর এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তারা প্রত্যেকে খুশি হবে। সবাই তাঁকে হিংসে করে। শহরে তাঁর বিশাল প্রাসাদ …রাজা এখানে রাত কাটিয়েছেন। ভার্জিতে তাঁর পল্লী-নিবাসের মতন এমন সুন্দর পল্লীনিবাস আর কারো নেই। সাদা রঙ-করা বাড়ী, সবুজ রঙের ঝিলিমিলি দেওয়া জানালা। অনেক দূর থেকেই তাঁর এ-বাড়ী সকলের নজরে পড়ে।

তবে একজন বন্ধুর কথা মঁসিয়ে রেনলের মনে পড়ল। সে গ্রামের গির্জার প্রতিনিধি। তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা শুনলে সে চোখের জল ফেলবে। তবে লোকটা আহাম্মক এবং কেবল কাঁদতেই জানে। সেই একমাত্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে।

রাগে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার দুঃখের সঙ্গে আর কার দুঃখ তুলনা করা যায়? আর কেই বা এমন সঙ্গীহীন? এমন আর কোন লোক আছে কি যে আমার মতন দুঃখের দিনে বলছে পরামর্শ চাওয়ার মতন আমার কোন বন্ধু নেই? মনের বিবেচনা-শক্তি আমি হারিয়ে ফেলছি। ফ্যালকজ এবং ডুক্রজ…তাঁর শৈশবকালের দুই বন্ধুর কথা মনে পড়ল। তারা অভিজাত বংশের সন্তান নয় এবং তাই তাদের সঙ্গে সমান অবস্থায় মিশতে তিনি চান নি।

ফ্যালকজ খুব বুদ্ধিমান আর সাহসী। ভেরিয়ার শহরে তার খবরের কাগজের দোকান ছিল। শেষে সে একটা ছাপাখানা কিনেছিল। নিজেও 'জনসভা' নামের একখানা কাগজ বার করেছিল। একবার সরকার থেকে তার কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, কেড়ে নেওয়া হয় তার প্রিন্টারস্ লাইসেন্স। তখন সে দশ বছরের পর প্রথম মঁসিয়ে রেনলের কাছে চিঠি লিখেছিল। ভেরিয়ার শহরের মেয়র প্রাচীন রোমান ভদ্রলোকের মতন জবাব দিয়েছিলেন—'রাজার প্রধান মন্ত্রী

যদি আমার পরামর্শ চেয়ে সম্মান দেখান তবে বলব, প্রদেশের সব ছাপাখানা ভেঙ্গে দিন। তামাকের মতন ছাপাখানাও একচেটিয়া ব্যবসা হোক।'

বন্ধুর কাছে লেখা এই চিঠি সে সময় ভেরিয়ার শহরে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ওই চিঠিই তাঁর কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছে। কে আমাকে বলেছে যে, আমার এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধনদৌলত, মানসম্মান থাকা সত্ত্বেও এই চিঠি লেখার জন্য একদিন আমাকে অনুশোচনা করতে হবে? তাঁর মনে দুর্নিবার রাগ···কখনও নিজের উপর রাগ করছেন মঁসিয়ে রেনল, আবার কখনও বা আশ-পাশের বন্ধুদের উপর রাগছেন। অনিদ্রায় তিনি সারা রাত বিছানায় ছটফট করলেন। সৌভাগ্যবশত, একবারও স্ত্রীর উপর গোয়েন্দাগিরি করার ইচ্ছা তাঁর হল না।

ভাবলেন লুইজির সাথে বসবাস করতেই আমি অভ্যস্ত। কাল যদি আবার আমার বিয়ে করার প্রয়োজন হয় ত ওর জায়গায় আমি আর কাউকে বসাতে পারব না। তাঁর স্ত্রী নিরপরাধী একথা ভাবতেই তাঁর মনে সুখ উথলে উঠল। এমন একটা অভিমত তাঁকে সুস্থ করে তুলল। তাছাড়া এমন কত লোকের স্ত্রীর দুর্ণাম রটে নি!

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সহসা তিনি বলে উঠলেন—তাই বলে আমাকে বোকা বানিয়ে সে তার নাগর নিয়ে ফূর্তি করবে আমি কি তা' হতে দেব? আমি কি ফালতু এবং একটা বদমাইশ? এরকম বাধ্য মেজাজী হলে ভেরিয়ার শহরে সবাই আমায় কি উপহাস করবে না? এ অঞ্চলের নামকরা প্রবঞ্চিত স্বামী চারমিয়ার সম্পর্কে কি লোকে নানা কথা বলে না? যখনই তারা তার কথা বলে, সে হাসে না? সে একজন ভাল আইনজ্ঞ, কিন্তু কে তার পাণ্ডিত্যের কথা বলে? যে লোকটা ওর নামে কলঙ্ক লেপন করেছে তার নাম জড়িয়ে তাকে ডাকে বারনার্ডের চারমিয়ার।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোনও মেয়ে-সন্তান নেই আমার। একবার ভাবলেন মঁসিয়ে রেনল। কাজেই মা-কে শাস্তি দিলে সন্তানদের উপর তার আঘাত পড়বে না। এই চাষী যুবকের সঙ্গে আমার স্ত্রীকে মিলিত দেখলে আমি দু'জনকেই খুন করে ফেলব! এরকম ঘটলে আর আমি হাস্যাস্পদ হব না। মতলবটা মনে আসতেই তিনি খুশি হলেন। নানা কথা ভাবতে লাগলেন। পেনাল কোড আমাকেই সমর্থন করবে, আর ধর্মসভার বন্ধুরাও আমাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসবে। শিকারের ছুরিখানা হাতে নিয়ে তিনি পরখ করলেন। ছুরিতে খুব ধার···কিন্তু রক্তের কথা মনে পড়তেই তিনি ভীত হলেন।

এই উদ্ধত গৃহশিক্ষককে এখনি বরখাস্ত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে ভেরিয়ার শহরে সোরগোল পড়ে যাবে। চারধারে দুর্ণাম ছড়াবে। ফ্যালকজের কাগজের নিন্দা করার এবং তার সম্পাদক জেল থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন তার চাকুরী ঘোচাবার জন্য ছ'শ' ফ্রাঙ্ক খরচ করেছিলাম।

বদমাইশ লেখক তখন বেসানকনে আমার নামে কলঙ্ক রটাবার সাহস দেখিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় নি।…সে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে সত্যি কথা বলছে। প্যারীর ভয়ঙ্কর কাগজগুলোতেও আমার নাম বেরিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! কি ভয়ানক কাণ্ডকারখানা! প্রাচীন রেনল বংশের নামে কলঙ্ক-লেখা এবং সেই নাম নিয়ে উপহাস।…যদি কখনও দেশভ্রমণে যাই তবে আমার নাম পাল্টে নিতে হবে। যে নাম আমাকে প্রশংসা ও প্রতিপত্তি এনে দিয়েছে সেই নাম পরিত্যাগ করতে হবে! কি চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য আমার।

যদি আমার স্ত্রীকে খুন না করে দুর্ণাম দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দি' তাহলে সে নির্ঘাৎ বেসানকনে তার মাসীর বাড়ী চলে যাবে আর তার মাসী সঙ্গে সঙ্গে তার সব ধন-দৌলত দিয়ে দেবে। আমার স্ত্রী প্যারীতে চলে যাবে জুলিয়ানকে নিয়ে। ভেরিয়ার লোকজন সব জেনে ফেলবে এবং আমাকে বোকা বলবে।

বাতির আলো বিবর্ণ হয়ে আসছিল। এই অসুখী মানুষটা বুঝতে পারলেন যে, বাইরে দিনের আলো ফুটেছে। বাইরে হাওয়ায় বেড়াবার জন্ত তিনি বাগানে এলেন। না, তিনি কোন রকম কেলেঙ্কারী করবেন না। কেননা এর ফলে ভেরিয়ারে তাঁর বন্ধুরা আনন্দিত হয়ে উঠবে তা' তিনি হতে দেবেন না। বাইরে বাগানে বেড়িয়ে তিনি শান্ত হলেন। না, স্ত্রীকে আমি হাতছাড়া করতে পারি না। ও আমার কাছে কাজের। স্ত্রী-হীন সংসারের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। একটা খুব বিবেচনা-প্রসূত ধারণা তাঁর মাথায় এল কিন্তু তাঁর মতন দুর্বল লোকের পক্ষে কিছু করা কি সম্ভব হবে। ভাবলেন, যদি তিনি স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখেন তাহলে কোনও না কোন দুর্বল মুহূর্তে তিনি হয়ত তাঁকে ভৎর্সনা করে বসবেন। স্ত্রী খুব অহঙ্কারী রমণী, হয় ত এর ফলে তার মাসীর বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার আগেই তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ পাকাপাকি হয়ে যাবে। লোকে তখন আমাকে দেখে হাসবে। আমার স্ত্রী তার ছেলেদের খুবই ভালবাসে, তাই পরিণামে ছেলেরা সব সম্পত্তির অধিকারী হবে ঠিকই। ভেরিয়ারে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। বলবে—কি! লোকটা স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নিতেও পারল না। কাজেই এখন সন্দেহ মনে পুষে' চুপচাপ থাকাই ভাল, সত্য নিরূপণ করতে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই না? কিন্তু তাহলে এর পরে কোন দিন তাকে ভৎর্সনা করতে পারব না।

কিন্তু পর-মুহূর্তে মঁসিয়ে রেনলের গর্বে আঘাত লাগল। মনে পড়ল, ভেরিয়ার শহরের ভদ্রলোকেরা ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলার আসরে তাঁর পরিবারের কেচ্ছা নিয়ে আলোচনা করবে, হাসাহাসি করবে। কি নিষ্ঠুর ওদের এই সব ফূর্তি করে বলা টিকাটিপ্পনী।

হায় ঈশ্বর! আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল না কেন! তাহলে এই হাসির হাত এড়াতে পারতাম। কেন আমি মৃতদার হলাম না? তাহলে ছ'মাস প্যারীতে থেকে আনন্দ করতাম। এই সুখকর চিন্তার পর মুহূর্তে ব্যাপারটার সত্য নিরূপণ করার

ইচ্ছা হল। তাহলে কি জুলিয়ানের ঘরের দরজায় রাতে একটা কিছু ছড়িয়ে রাখব, তাহলে পরদিন তার পায়ের ছাপ দেখে সব বুঝতে পারব?

এমন সময় বাগানের পথে স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল মঁসিয়ে রেনলের।

গ্রামের গীর্জার প্রার্থনা সেরে মাদাম রেনল ফিরে আসছেন। ভার্জির এই পুরনো গীর্জায় প্রার্থনা করার সময় তিনি একটা ছবি স্পষ্ট দেখছিলেন…তাঁর স্বামী শিকারে যাওয়ার নাম করে জুলিয়ানকে পাহাড় জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছেন এবং পরে সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে বলছেন যে, দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে।

ভাবলেন, আমার কথা শোনার পর আমার স্বামী কি ভাববে তারই উপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। হয় ত এই চূড়ান্ত পনের মিনিট পরে আমি আর তার সঙ্গে কথা বলারই সময় পাব না। যুক্তি-বিবেচনার উপর নির্ভর করার মতন মানুষ সে নয়। তেমন হলে আমার সামান্য যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছি সে কি করবে বা বলবে। আমার স্বামী আমাদের দু'জনের ভাগ্য স্থির করবে। তার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার ভাগ্য আমার পারদর্শিতার উপরও খানিকটা নির্ভর করবে…এই যে খামখেয়ালী আর রাগী লোকটা রাগলে যে তার সামনে কি আছে দেখতে পায় না তাঁকে চালাকি করে চালাতে হবে।

বাগানে ঢুকে স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবলে তাঁর মুখের চেহারা গেল বদলে। আলুথালু মাথার চুল আর পারিপাট্যহীন পোষাক দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষটা সারা রাত ঘুমোয় নি। তিনি স্বামীর হাতে চার-ভাঁজ করা চিঠিখানা দিলেন…খামের মুখ ছেঁড়া। চিঠিখানা বার না করে তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন…তাঁর দৃষ্টিতে উন্মত্ত-ভাব।

তিনি স্বামীকে বললেন—'কি জঘন্য ব্যাপার দেখ। উকিলবাবুর বাগানের পাশ দিয়ে আসছিলাম যখন সে সময় তোমার পরিচিত এবং তোমার কাছে কৃতজ্ঞ একটা কদাকার লোক এই চিঠিখানা আমার হাতে দিল। কেবল একটা অনুরোধ করছি, দেরী না করে মঁসিয়ে জুলিয়ানকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দাও।' তাড়াতাড়ি মাদাম রেনল কথাগুলো বললেন, যেন এসব বলবার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তিনি একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন। স্বামীর মনে দারুণ আনন্দের জোয়ার আনতে পেরেছেন দেখে নিজেও উল্লসিত হলেন। যে-দৃষ্টিতে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তাতে বুঝতে পারলেন যে, জুলিয়ানের কথাই ঠিক। এমন দুর্ভাগাজনক বাস্তবের জন্য দুঃখ করার বদলে তিনি ভাবতে লাগলেন—কি প্রতিভা! কি পারদর্শিতার সঙ্গে অবস্থার মোকাবিলা করা হল! এবং যুবকটির মাথায় অভিজ্ঞতার কত অভাব! কালে সে কোথায় পৌঁছবার আশা করে তা' কি জানে না? হায়! সে যখন উন্নতি করবে তখন আমাকে ভুলে যাবে।

ভালবাসার মানুষটিকে এভাবে প্রশংসা করে তাঁর মেজাজ শান্ত হল। এমন

একটা উপায় অবলম্বন করার জন্য নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানালেন। গোপনে মধুর আনন্দ উপভোগ করতে করতে ভাবলেন—আমি জুলিয়ানের কাছে বেমানান নই।

মেজাজ খারাপ করার ভয়ে মঁসিয়ে রেনল চিঠিখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন।

মঁসিয়ে দ্য রেনল ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, ভাবতে লাগলেন···এখনও কেউ কেউ আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে। আমার স্ত্রীর জন্যই আমাকে নতুন নতুন উপায়ে অসম্মানিত করছে। বেসানকনের ধন-দৌলতের উত্তরাধিকারিণী হওয়ার আগেই তিনি তাঁকে কটু কণ্ঠে ভৎর্সনা করার ইচ্ছা কোন রকমে সংযত করলেন। কাউকে বা কোন কিছুকে দায়ী করার ইচ্ছা তাঁর মনকে ভীষণ চঞ্চল করে তুলেছিল···বেনামী চিঠিখানা দুমড়ে ধরে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা তাঁর মাথায় এল··· কিন্তু পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত পরে অনেকটা শান্ত হয়ে আবার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন।

সোজাসুজি মাদাম রেনল বললেন—'জুলিয়ানকে বরখাস্ত করার কথা আমাদের ঠিক করতেই হবে। ও ত সামান্য একটা মজুরের ছেলে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিও। ও চালাক ছোকরা, একটা কাজ আবার জুটিয়ে নেবে। ধর, মঁসিয়ে ভালেনদ বা মঁসিয়ে মজিরনের ত ছেলেমেয়ে আছে, ওদের বাড়ীতে কাজ পেয়ে যাবে। কাজেই তুমি ওর কোনও ক্ষতি করবে না···।'

মঁসিয়ে রেনল তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—'ঠিক বোকা মেয়েমানুষের মতনই কথা বলছ। একজন মেয়েমানুষের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কি বুদ্ধি আশা করা যায়? যুক্তির দিকে তোমাদের কারো নজর থাকে না···তাহলে কি করে তোমাদের জ্ঞান হবে? প্রজাপতির পিছনে ছোটার সময় তোমাদের খুশিতে ডগমগ এবং অলস মন কোন কিছুই সন্দেহ করে না। অতি দুর্বল জীব তোমরা। তোমাদের মতন জীবদের নিয়ে সংসার করা খুবই দুর্ভোগ···।'

মাদাম রেনল তাঁর বকবকানিতে বাধা দিলেন না। অমনিভাবে তিনি তাঁর মনের রাগ হজম করবেন।

রাগে অন্ধ মানুষটাকে এখন ঠিকমত চালিত করতে হবে···এরই উপর জুলিয়ানের সঙ্গে একই বাড়ীতে তাঁর থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। তাই তাঁর অনেক অপমানকর খোঁটা শুনেও তিনি অনড় হয়ে রইলেন। এখন তাঁর চিন্তা জুলিয়ানকে ঘিরেই মূর্ত হয়ে উঠেছে···ও কি আমার উপর খুশি হবে?

অবশেষে মাদাম তাঁকে বললেন—'দেখ, এই যে চাষী ছোকরাকে আমরা এত যত্ন করছি, নানা পুরস্কার দিচ্ছি, আসলে ও নিরপরাধ। জান ত, এ ধরনের অপমানকর চিঠি আমি এই প্রথম পাই নি···তাই সে যখন উপলক্ষ তখন চিঠি পড়তে পড়তে শপথ করেছি যে, এ বাড়ীতে হয় ওই ছোকরা থাকবে না হয়

আমি থাকব।'

—'তুমি কি তোমার আর আমার জীবনে একটা অসম্মান টেনে আনতে চাও? তোমার জন্যই ভেরিয়ার শহরে সোরগোল বাধবে।'

—'ঠিকই বলেছ। বুদ্ধি খাটিয়ে শাসন করে তুমি নিজের, তোমার পরিবারের এবং শহরের উন্নতি করেছ তাই সাধারণভাবে সবাই তোমায় হিংসে করে। আচ্ছা, তাহলে···জুলিয়ানকে বলছি তোমার কাছ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে পাহাড়-অঞ্চলে ওর এক বন্ধু থাকে তার কাছে চলে যাক।'

এবার অনেকটা শান্তভাবে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'কোনও কিছু করা থেকে দয়া করে বিরত হও। তুমি ওর সঙ্গে কোন কথা বলো না এটাই আমি চাই। তোমার কথায় রাগের ঝাঁঝ থাকলে ওর সঙ্গে আমার চুক্তিতে আমার বাধা দেখা দেবে। জান ত, ওই ছোকরা ভদ্রলোক দারুণ আবেগপ্রবণ।'

মাদাম জবাব দিলেন—'কিন্তু ওই ছোকরা ভদ্রলোকের মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। হতে পারে সে একজন পণ্ডিত···অবশ্য সে সম্বন্ধে তোমারই ভাল ধারণা আছে···কিন্তু আসলে সে একটা চাষীর ছেলে, এবং আমার দিক দিয়ে বলতে পারি এলিসাকে বিয়ে না করতে চাওয়ার জন্যে আমি ওকে একটুও সুনজরে দেখি না। মাঝে মাঝে যদিও চালাকি করে মেয়েটা মঁসিয়ে ভালেনদের কাছে যাতায়াত করে তবু ওর সাথে বিয়ে হলে ছোকরার কিছু আয় বাড়ত।

মঁসিয়ে রেনল ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—'কি বলেছিল তোমাকে জুলিয়ান?'

—'না, ঠিক তা' নয়। পাদরির পেশা গ্রহণের তার খুব ইচ্ছে তাই সে সম্বন্ধেই বলেছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এসব সামান্য সম্বলের লোকদের প্রথম উচিৎ কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টা করা। সে পরিষ্কার আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মেয়েটার এসব গোপন অভিসারের কথা তার কাছে অজানা নয়।'

মঁসিয়ে রেনলের মেজাজ আবার তিরিক্ষি হয়ে উঠল, বললেন—'কই, এসব কথা ত আমি কিছু শুনি নি। আমার বাড়ীতেই ঘটনা ঘটছে আর আমি কিছুই জানি না। কি! এলিসা আর ভালেনদের মধ্যে কিছু হয়েছে না কি?

জবাব দিলেন মাদাম—'ওগো এসব ত পুরনো কাহিনী। হয় ত অন্যায় কোন কিছু এখনও ঘটে নি। তোমার প্রাণের বন্ধু ভালেনদ এমন গোপন প্রেম করেও কিন্তু শহরের কাউকে বিরক্ত করছে না। সবাই ভাবছে তার আর আমার মধ্যে পরকীয়া প্রেম গাঢ় হচ্ছে।'

মাথায় ধীরে ধীরে চাপড় মারতে মারতে মঁসিয়ে বললেন—'এক সময় আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল, তবে তুমি ত আমায় আগে কিছু বল নি?'

—'আমাদের সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের গর্ববোধ একটু ফুলে ফেঁপে উঠেছে বলে দুই বন্ধুর মধ্যে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া কি ঠিক হত? আমাদের জানা-শোনা পরিবারগুলোর কোন মেয়েটার কাছে সে দু'এক ছত্র চিঠি লেখে নি বা

:তার বীরত্বের কাহিনী শোনায় নি ?'

—'তাহলে সেই তোমাকে চিঠি লিখেছে ?'

—'সে প্রচুর লেখে।'

রাগে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন মঁসিয়ে রেনল, বললেন—'সব চিঠি আমায় দেখাও বলছি।'

নিরাসক্ত হওয়ার মতন শান্তভাবে তিনি বললেন—'না দেখানোর জন্যই চেষ্টা করেছিলাম। তবে তোমার মেজাজ ঠাণ্ডা হলে একখানা চিঠি দেখাব।'

মঁসিয়ে রেনল এখন দারুণ রাগে টঙ হয়ে উঠেছেন, তবু মনে মনে খানিকটা খুশিও হয়েছেন। বললেন—'এই নমুনাটার কথা বলছ!'

তখন বিষণ্নকণ্ঠে মাদাম বললেন—'এই চিঠিগুলোর ব্যাপার নিয়ে অনাথ-আশ্রমের কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করবে না, একথা আমার কাছে শপথ করবে কি ?'

দারুণ রেগে বললেন—'ঝগড়া হোক বা নাই হোক, ওকে অনাথ-আশ্রম থেকে তাড়াব। কিন্তু ওই চিঠিগুলো আমার চাই। কোথায় ওগুলো ?'

—'আমার লেখার টেবিলের ডান দিকের দেরাজে আছে। কিন্তু দেরাজের চাবি কিছুতেই তোমায় দেব না।'

স্ত্রীর ঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে তিনি বললেন—'দেরাজ ভেঙ্গে ফেলব।'

এই মেহগনি কাঠের লেখার টেবিলখানা মঁসিয়ে রেনলের খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে পরনের কোটের ঝুল দিয়ে তিনি এই টেবিল ঝাড়েন নিজেই। আজ একখানা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এই টেবিলের ড্রয়ার ভাঙ্গতে তিনি ছুটলেন।

মাদাম এই অবসরে এক'শ' কুড়িটা সিঁড়ি টপকে ছুটলেন পায়রার খোপের দিকে। ওখানে একটা লোহার শিকে একখানা সাদা রুমাল বেঁধে দিলেন। এবার তাকালেন পাহাড়-জঙ্গলের দিকে। ওখানেই কোন বীচগাছের তলায় জুলিয়ান অপেক্ষা করছে নির্ঘাৎ। এই ইঙ্গিত সে দেখবে, খুশি হবে। কিন্তু সে ইঙ্গিতে তার আনন্দের কথা কি জানাতে পারে না ?

নীচে নেমে এসে দেখলেন, তাঁর স্বামী ভালেনদের চিঠি পড়বার চেষ্টা করছেন। রাগে তিনি অগ্নিশর্মা।

এমন উত্তেজনার মুহূর্তে একটা সুযোগ পেয়েই মাদাম রেনল বললেন—'আমারও ওই একই ধারণা, জুলিয়ান কিছুদিনের জন্যে বাড়ী যাক। লাটিন ভাষায় তার যতই দখল থাক, আসলে সে একটা জঙ্গলী আর চাষী-মজুরের ছেলে। বুদ্ধিহীন। উপন্যাস পড়ে ভদ্র-ভাষা মুখস্থ করে রোজ আমার কাছে আওড়ায়...।'

মসিয়ে রেনল বললেন—'না, কখনও তাকে পড়তে দেখি নি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। তুমি কি ভাব বাড়ীর কর্তা হয়েও নিজের বাড়ীতে যা' কিছু ঘটছে তার দিকে চোখ বুজে আছি ?'

—'যদি না পড়ে থাকে ত নিজেই এসব বানিয়ে বলছে। ভেরিয়ার শহরে

থাকার সময়ও সে এমনি কণ্ঠস্বরে কথা বলত। হয় ত এলিসার সামনেও এমনি-ভাবে বলেছে। এবং এলিসার সামনে বলাও যা' মঁসিয়ে ভালেনদের কাছে বলাও তা'।

সহসা মঁসিয়ে রেনল সজোরে টেবিলের উপর ঘুষি মারলেন। ঘর এবং টেবিল দুই কেঁপে উঠল। বললেন—'এই বেনামী ছাপা চিঠি এবং ভালেনদের লেখা চিঠি দু'খানা একই কাগজে লেখা দেখছি।'

অবশেষে······

ঘরের একদিকে একখানা গদি-মোড়া চেয়ারে বসে মাদাম রেনল ভাবতে লাগলেন···অবশেষে আমি বিজয়িনী হলাম। এবার চেষ্টা করতে হবে আমার স্বামী যাতে বেনামী চিঠির সন্দেহজনক লেখকের কাছে না যায়।

তাই বললেন—'দেখ, যথেষ্ট প্রমাণ যখন হাতে নেই তখন মঁসিয়ে ভালেনদের সঙ্গে ঝগড়া করা কি বোকামি হবে না? লোকেরা তোমাকে হিংসে করে, কিন্তু অন্যায়টা কোথায়? তোমার অসাধারণ কর্মক্ষমতা। নিপুণ পরিচালক, বাড়ীঘর সম্পর্কে তোমার সুরুচীপূর্ণ ব্যবস্থা, তার ওপর তোমার স্ত্রী এসেছে অজস্র যৌতুক নিয়ে। এসবের জন্যই ভেরিয়ার শহরে তুমি সেরা পুরুষ।'

মৃদু হেসে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'তুমি আমার বংশের কথা ভুলে গেছ!'

মাদাম রেনল তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—'এই জেলায় তুমি একজন নাম-করা ভদ্রলোক। তোমার এমন কিছু কাজ করা উচিৎ নয় যাতে বদলোকেরা তোমার নামে দুর্ণাম ছড়ায়। এই চিঠির কথা এখন যদি ভালেনদকে বল তাহলে ভেরিয়ার এমন কি বেসানকনেও জুলিয়ানের নাম জড়িয়ে রেনল বংশের দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়বে। এখন ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে আমাদের প্রতিবেশীরা অপেক্ষা করছে। তারাও আমাদের নামে গুজব ছড়াবে।'

—'আমার বন্ধুত্বের প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই দেখছি!' তিক্তকণ্ঠে মঁসিয়ে রেনল বললেন।

হাসতে হাসতে মাদাম রেনল জবাব দিলেন—'দেখ, বারো বছর ধরে তোমার ঘর না করলে আজ তোমার চেয়েও বেশী ধনী হতে পারতাম। তাই তোমার ব্যাপার, বিশেষ করে আজ যা' ঘটেছে, সে সম্পর্কে কথা বলার অধিকার আমার আছে। এখন আমার চেয়ে তুমি যদি জুলিয়ানকে বেশী পছন্দ কর, থাক। আমি বরং শীতকালটা মাসির বাড়ী গিয়ে কাটিয়ে আসছি।'

অনেক বাছবিচার করে কথাগুলো বলা হল। ভদ্রতার পোশাক-পরানো কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল।

এমনিভাবে কথাবার্তা যখন চলছিল তখন মাঝে মাঝে স্বামীর জন্য মাদামের মনে সমবেদনা জাগছিল···আজ বারো বছর ধরে যে পুরুষটি তাঁর বন্ধু, তাঁর সঙ্গী, সে আজ কত অসুখী। কিন্তু সত্যিকারের যৌন-লালসা বড় স্বার্থপর। এখন তিনি জানতে চান যে, তাঁর স্বামী তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কেন না তারই

উপর তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছে। আর এ সব প্রদেশে স্বামীরাই জনমত নিয়ন্ত্রণ করে। হাস্যাস্পদ অবস্থাকে চাপা দেওয়ার জন্যই স্বামী অনুযোগ করে এবং এ ধরনের অনুযোগ ফরাসীদেশে আর বিপজ্জনক নয়। এমন লোক যদি তার স্ত্রীকে হাত খরচ না দেয় তবে সে মজুরের কাজ নেয়…এবং তাকে কাজ দেওয়ার মতন দয়ালু লোক দেশে অনেক আছে।

কিন্তু তুকি হারেমে যত বিপদপাতই হোক হারেমের মুসলমান নারী তার স্বামীকে ভালবাসে। তার স্বামীই সবচেয়ে শক্তিমান। সে কোন রকম চালাকি করে স্বামীর কর্তৃত্বকে বঞ্চিত বা অস্বীকার করে না। তার স্বামীর মনের প্রতি-হিংসা-স্পৃহা বড় সাংঘাতিক আর রক্তাক্ত। সৈনিকদের মতন আবার মহান… তরবারির আঘাতে সব কিছু শেষ করে দেয়। কিন্তু উনিশ শতকের স্বামী যখন তার স্ত্রীকে আঘাত হানে তখন তার হাতিয়ার হচ্ছে জনতার ঘৃণা। সব বাড়ীর বসবার ঘরের দরজা স্ত্রীর মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তার স্বামী।

বাগান থেকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই মাদাম রেনল ভয়ানক বিপদের আচ পেলেন। তাঁর ঘরের এলোমেলো অবস্থা দেখে তিনি মনে দারুণ আঘাত পেলেন। তাঁর সব ক'টা সুন্দর সুন্দর বাক্সের তালা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। প্রতিটি দেরাজের তালা ভাঙ্গা। এমন কি মেঝের কাঠের পাটাতন চাড় দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। তাঁর কোন ছেলে ভিজে জুতো পায়ে ঘরে ঢুকলে তাঁর স্বামী এই নকসা-কাটা মেঝে নষ্ট হওয়ার ভয়ে রেগে লাল হয়ে যান। আজ সব চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। একটু আগে মাদামের মনে স্বামীর প্রতি করুণার ভাব জন্মেছিল, এখন এই সাংঘাতিক ভাঙ-চুর দেখে তাঁর মন থেকে সে-ভাব উবে গেল।

ডিনারের খনিক আগে জুলিয়ান ছেলেদের নিয়ে ফিরে এল।

চাকর-বাকররা চলে যেতেই মাদাম রেনল সংক্ষিপ্তভাবে জুলিয়ানকে বললেন —'দেখ, তুমি পনের দিন ছুটি নিয়ে ভেরিয়ারে যাবে বলেছিলে তাই মঁসিয়ে রেনল তোমাকে ছুটি দিয়েছেন। তবে ছেলেমেয়েদের পড়ার যাতে ক্ষতি না হয়, তাই তাদের লেখা রোজ তোমার কাছে পাঠানো হবে, তুমি সংশোধন করে দেবে।'

মঁসিয়ে রেনল তিক্তকণ্ঠে বললেন—'না, আমি এক সপ্তাহের বেশী ছুটি দেব না।'

তখন তারা দু'জনেই কেবল বসবার ঘরে ছিল।

জুলিয়ান তার প্রণয়িনীকে বলল—'তোমার কর্তা এখনও মনস্থির করতে পারেনি।'

সকাল থেকে যা' কিছু ঘটেছে তা' খুব ছোট করে মাদাম বললেন—'দেখ, রাতে যখন তোমার কাছে যাব তখন সব বিশদভাবে বলব।'

জুলিয়ান ভাবল, নারীমনের যৌন-বিকৃতি! কি আনন্দের, কি স্বভাবজাত প্রবণতায় তারা আমাদের প্রবঞ্চিত করে! তাই নিরাসক্ত-কণ্ঠে জুলিয়ান তাঁকে বলল—'আজ সাদা-চোখে তোমার রূপ দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার ভালবাসা আমার দু'চোখ ঝাপসা করে দিয়েছে। তোমার আজকের আচরণ খুবই আশ্চর্যজনক। তবু আজকে রাতে আমাদের মিলিত হওয়ার চেষ্টা করা সমীচিন হবে? বাড়ীতেও শত্রুরা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। জান ত এলিসা কি নিদারুণভাবে আমাকে ঘৃণা করে।'

মাদাম বললেন—'যে যৌন-লালসাপূর্ণ নিরাসক্তির ভাব তুমি আমার প্রতি দেখাচ্ছ এই ঘৃণা তারই সমগোত্রীয়।'

—'এটাকে যদি নিরাসক্তি বল তবে যে বিপদে তোমাকে টেনে এনেছি তা' থেকে তোমাকে বাঁচাতে চাই বলে এই নিরাসক্তি। মঁসিয়ে যদি এলিসাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন তবে সে সব কথা বলে দেবে। হয়ত আজ রাতে সশস্ত্র অবস্থায় তিনি আমার ঘরের কাছে লুকিয়ে থাকবেন, যদি থাকেন?'

অভিজাত বংশের নারীমনের সমস্ত ঘৃণা উজাড় করে দিয়ে মাদাম বললেন—'কি! মনে এতটুকু সাহস নেই!'

জুলিয়ান ঠাণ্ডা গলায় বলল—'আমার সাহস নিয়ে আলোচনা করতে ঘৃণাবোধ করি। ওতে মনের নীচতা প্রকাশ পায়। জনসাধারণ আমার কাজ দেখে আমার চরিত্রের বিচার করবে। কিন্তু তোমাকে যে আমি কত গভীরভাবে ভালবাসি তার ধারণা তোমার নেই। এই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের আগে আজ রাতে তোমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা যে আমার কাছে কত আনন্দের হত তাও তুমি জান না।'

২২ : আঠার শ' ত্রিশ সালের মানুষ এবং আচরণ

মানুষকে ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে চিন্তা গোপন করার জন্য।
—আর. পি. মালাগ্রিদা

ভেরিয়ার শহরে সবে পৌঁছল জুলিয়ান। কিন্তু তার আগেই মাদাম রেনলের উপর অবিচার করার জন্য সে নিজেই মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করছিল। নৈতিক দুর্বলতার জন্য সে অবশ্য মঁসিয়ে রেনলের সঙ্গে একটা মিলন দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে নি বলে আমি তাকে বোকা মেয়েমানুষ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি···কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা একজন ধুরন্ধর কূটনীতিকের মতন সমাধা করেছে। এবং আমি এখানে তার এবং আমার দু'জনেরই শত্রুকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এ কাজের মধ্যে একটা অশ্লীলতার নোংরা ছোঁওয়া রয়েছে··· আমার গর্ববোধে আঘাত লাগছে···আর যাই হোক মঁসিয়ে রেনল একজন পুরুষ।

আর পুরুষ সমাজের আমিও একজন পুরুষ···আমাদের মধ্যে রয়েছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। দেখ, আমার মধ্যে কেমন গাধার ভাব।

জীবিকা অর্জনের অবলম্বন এবং মাথা গোঁজবার আশ্রয় কেড়ে নেওয়ার পর লিবারেলরা যে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল মঁসিয়ে চেলান তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। প্রতিবেশী লিবারেলদের মধ্যে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল। মঁসিয়ে চেলানের দু'খানা ঘর এখন বইয়ে ঠাসা। ভেরিয়ার শহরের লোকদের একজন যাজক দেখাবার ইচ্ছেয় জুলিয়ান তার বাবার কাঠের কারখানা থেকে পিঠে করে কাঠ বয়ে এনেছে হাই স্ট্রীটে এবং যন্ত্রপাতি চেয়ে এনে মঁসিয়ে চেলানের জন্য বইয়ের তাক তৈরী করে দিয়েছে।

বৃদ্ধ যাজকের দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছিল। বললেন—'অহঙ্কারী সংসার তোমাকে নষ্ট করে দিয়েছে···একটা কথা মনে রেখ, সেদিন 'গার্ড অফ অনার' দেওয়ার সুন্দর পোশাকটা পড়ার জন্য সবাই তোমার শত্রু হয়েছে।'

মঁসিয়ে রেনল জুলিয়ানকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ীতে থাকার জন্যে। তাহলে যা' সব ঘটেছে তা' আর কেউ সন্দেহ করবে না। তৃতীয় দিনের দিন জুলিয়ান দেখল আর কেউ নয় মঁসিয়ে মজিরন সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে উঠে আসছেন। দু'ঘণ্টা ধরে জুলিয়ান বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বকবকানি শুনল···মানুষ বড় দুর্বল, জনসাধারণের অর্থ যাদের হাতে গচ্ছিত রয়েছে তাদের মধ্যে সততার অভাব, এই নিরানন্দ-ভূমি ফ্রান্সের সংকট আসন্ন···এমন ধরনের কত বিষয়ের একটানা আলোচনা। অবশেষে জুলিয়ান তাঁর এখানে আসার কারণ জানতে পারল।

গরীব অর্ধ-নিন্দিত গৃহশিক্ষক আগামী দিনের কোনও সংস্থার হোমরা-চোমরা প্রশাসককে বিদায় জানাবার জন্যে সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা সিঁড়ির মাথায় হাজির হল। তখন প্রশাসক খুশি হয়ে জুলিয়ানের কিছু কল্যাণ করতে চাইলেন। পিতৃত্ব-সুলভ স্নেহে জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরে মঁসিয়ে মজিরন বললেন যে, রেনলের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে জুলিয়ান কোন পাবলিক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করুক। তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। শহর এবং গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার সুবিধা হবে। এর জন্য সে বেতন হিসাবে পাবে আট শ' ফ্রাঙ্ক। তবে মাসে মাসে নয়···তিন-মাস অন্তর আগাম পাবে।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে জুলিয়ান একটাও জবাব দেওয়ার সুযোগ পায় নি। এবার সুযোগ পেয়ে জবাব দিল। সোজাসুজি বক্তব্য রাখল জুলিয়ান···যেন সে মুনাফা লুটতে চাইছে। সকলের সম্বন্ধে বলল। প্রশংসা করল মঁসিয়ে রেনলের। শ্রদ্ধা জানাল ভেরিয়ার শহরের মানুষদের। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সহকারী প্রশাসকের কাজের জন্য। অত্যন্ত কৌশলে জুলিয়ান সব কিছুই বলল। কিন্তু সব কিছু অবোধ্য হয়ে রইল। এই ধুরন্ধর প্রশাসক যাওয়ার সময় বুঝে গেল যে, পাদরিদের মধ্যে এমন ধড়িবাজ ছোকরা আর তার নজরে পড়ে নি।

মঁসিয়ে মজিরন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়ান বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল।

এবং যা' কিছু ঘটেছে তার সরস আর বিশদ বর্ণনা করে মঁসিয়ে রেনলকে একখানা ন' পৃষ্ঠার চিঠি লিখে তাঁর উপদেশ চাইল। জুলিয়ান ভাবল, এই রাস্কেল কার কাছ থেকে এই অফার এনেছে তা' ত বলল না। এ নিশ্চয় মঁসিয়ে ভালেনদের অফার। তার বেনামী চিঠির ফলে আমাকে ভেরিয়ার শহরে নির্বাসিত দেখে এই 'অফার' পাঠিয়েছে।

শরৎকালের এবং সুন্দর সকালে কোন শিকারী মাঠে এসেই একদঙ্গল শিকার দেখে যেমন খুশি হয়ে ওঠে সেও তেমনি খুশি মনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। ইচ্ছে, মঁসিয়ে চেলানের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু মঁসিয়ে চেলানের বাড়ী পৌছবার আগেই পথে মঁসিয়ে ভালেনদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। জুলিয়ান তার দ্বিখণ্ডিত মনের অবস্থা লুকোতে চাইল না। তার মতন একজন গরীব ঈশ্বরের কাজ যাজকের বৃত্তি পেশা হিসেবে গ্রহণে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে···কিন্তু এই বাস্তব পৃথিবীতে পেশা-ই সব নয়। জমিদারের আঙুর ক্ষেতে যদি কাজ করা উপযুক্ত কাজ হয় তবে শিক্ষিত মজুরদের সহকর্মী হিসাবে পাওয়াটা অনুপযুক্ত হবে না। আসলে শিক্ষাই হচ্ছে প্রয়োজন। এবং বেসানকন বিদ্যালয়ে এর জন্য দুটো মূল্যবান বছর ব্যয় করা অপরিহার্য। এর জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে হবে। ছ' শ' ফ্রাঙ্ক মাসে মাসে যা' পাওয়া যাচ্ছে তা' সহজেই খরচ হয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে তিন মাস অন্তর আট শ' ফ্রাঙ্ক হাতে পড়লে অর্থ সঞ্চয় করা সহজ। অন্যদিকে রেনল-শিশুদের শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য চাকরি খোজা সমীচিন হবে না, ওদের পড়িয়ে সে অন্য ধরনের স্নেহ-পূর্ণ উৎসাহ লাভ করে। কাজেই ওদের ছেড়ে অন্য কারো ছেলেদের পড়ানো কি তার পক্ষে ঠিক হবে?

বাড়ী ফিরে এল জুলিয়ান। দেখল, মঁসিয়ে ভালেনদের একজন উর্দিপরা অনুচর তার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটা সারা শহর ঘুরে জুলিয়ানকে খুঁজেছে। আজ ডিনারে জুলিয়ানকে নিমন্ত্রণ করে লেখা একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে সে।

জুলিয়ান এর আগে কখনও মঁসিয়ে ভালেনদের বাড়ী যায় নি। অথচ কয়েকদিন আগে ভাবছিল কিভাবে এই লোকটাকে বেইজ্জৎ করবে কৌশলে কিন্তু তার দায়ে আদালতে আসামী হতে হবে না। চিঠিতে অবশ্য ডিনারের সময় দেওয়া ছিল বেলা একটা, কিন্তু জুলিয়ান ভাবল যে, বেলা সাড়ে বারোটার আগেই অনাথ-আশ্রমের কর্তার বাড়ীতে হাজির হওয়াটাই ভদ্রতা হবে। সে দেখল, মঁসিয়ে ভালেনদ তাঁর দপ্তরে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে নিজের গুরুত্ব জাহির করছেন। তাঁর গালে কালো পুরু জুলপি, মাথায় অজস্র চুলের সমাবেশ, ধোঁয়াটে টুপিটা মাথায় পরা, বিশাল একটা তামাকের পাইপ, ফুলতোলা চটি-জুতো, বুকের উপর চারধারে পরানো সোনার শিকল, প্রদেশের একজন কাজের লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকিছু তার রয়েছে, এবং সে নিজেকে রমণী-মনোহর মনে করে···কিন্তু এ সবের কোন কিছুই জুলিয়ানকে প্রভাবিত করতে পারল না। লোকটা তার কাছে যে ঋণ করেছে তার সমাধানের কথাই

ভাবছিল জুলিয়ান।

সে মাদাম ভালেনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সম্মান প্রার্থনা করল। কিন্তু মাদাম তখন পোশাক পরতে ব্যস্ত তাই আসতে পারলেন না। তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনাথ-আশ্রমের কর্তা যখন পোশাক পরছিল সে তখন হাজির রইল। তারপর তারা মাদাম ভালেনদের ঘরে ঢুকল। মাদাম জলভরা চোখে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে জুলিয়ানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি ভেরিয়ার শহরে এক-জন নামকরা মহিলা। তাঁর কর্কশ ও ভারি পুরুষালি ছাঁদের মুখমণ্ডল···এই মুখে আবার উৎসবের দিনে রঙ মাখেন। মায়ের মনের দুঃখের ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

জুলিয়ান এবার মাদাম রেনলের কথা ভাবতে লাগল।

অনাথ-আশ্রমের কর্তার বাড়ী দেখার সময় তার মনের ভাবনা আরও প্রবল হল। প্রতিটি আসবাবপত্র নতুন এবং ব্যায়সাধ্য। প্রতিটি আসবাবপত্রের দাম তাকে শোনান হল। জুলিয়ান দেখল, এখানে নীচতার অস্তিত্ব রয়েছে, যেন চুরি করা সম্পত্তির গন্ধ ম' ম' করছে। এখানকার প্রতিটি বস্তু একেবারে চাকরগুলো পর্যন্ত যেন সবাই মিলে ঘৃণা প্রতিরোধ করার জন্য দেওয়াল তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে।

খাজনা-আদায়ের পরিদর্শক, মাদকদ্রব্যের অফিসার, প্রধান কনেষ্টবল এবং আরও দু'তিনজন সরকারি কর্মচারী তাদের বউ নিয়ে হাজির হল। তাদের অনু-সরণ করে হাজির হল লিবারেল পার্টির কয়েকজন সদস্য। ভোজের টেবিলে খাদ্য পরিবেষণ করা হল। এ সবের প্রতি এর মধ্যেই জুলিয়ানের মন খিঁচড়ে ছিল এখন তার ধারণা হল যে, খাবার ঘরের দেওয়ালের ওপাশে জনাকয়েক হতভাগ্য মানুষ বন্দী হয়ে রয়েছে···তাদের জন্য বরাদ্দ মাংস না কিনে অর্থ চুরি করে এই সব স্বাদহীন বিলাস ব্যসনের ব্যবস্থা হয়েছে···ওই লোকটার দৈনন্দিন জীবনকে উজ্জ্বল করা হয়েছে।

জুলিয়ান ভাবছিল, এই মুহূর্তে ওই লোকগুলো হয়ত 'ভূখা' রয়েছে। তার দম আটকে আসছে। খাদ্য গিলতে পারছে না, এমন কি কথা বলাও সম্ভব নয়। মিনিট পনের পরে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তারা জনপ্রিয় সঙ্গীতের টুকরো টুকরো কলি শুনতে পাচ্ছিল। এটা স্বীকার করতেই হবে, ওটা অশ্লীল গানের কলি···। বোধ হয় কোন বন্দী গান গাইছে। মঁসিয়ে ভালেনদ তাঁর অনুচরদের একজনের দিকে তাকালেন। লোকটা চোখের আড়ালে গেল। ব্যস! আর গান শোনা গেল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন উর্দিপরা অনুচর জুলিয়ানকে সবুজ গ্লাসে রাইন মদ পরিবেষণ করল। মাদাম ভালেনদ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাল যে, বাজারে এক বোতল এই মদের দাম ন' ফ্রাঙ্ক। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে জুলিয়ান বলল মঁসিয়ে ভালেনদকে—'তেমনি মৃদু কণ্ঠে তারা ত আর গান গাইছে না!'

মঁসিয়ে ভালেনদ বিজয়ীর মতন জবাব দিলেন—'হায় ঈশ্বর! মনে হয় ওরা আর গান গাইবে না। ভিখারিগুলোকে আমি থামিয়ে দিয়েছি।'

কথাগুলো দারুণ আঘাত করল জুলিয়ানকে। সে আচরণ শিখেছে তবে বর্তমান পদ অনুযায়ী সে মনটাকে তৈরী করতে পারে নি। প্রায়শই ভণ্ডামির অভ্যাস করা সত্ত্বেও তার গালের উপর দিয়ে বড় একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

সবুজ ঘাসের আড়ালে সে তার চোখের জল গোপন করতে চাইল কিন্তু সুন্দর রাইন মদের সদ্‌ব্যবহার এবং সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। 'ওর গান থামিয়ে দাও!' সে মনে মনে বলল—'হে ঈশ্বর! কেমন করে তুমি এটা সহ্য করছ!'

সৌভাগ্যবশতঃ কেউ তার এই অশভ্য ভাবাবেগ সম্পর্কে মন্তব্য করল না। খাজনা আদায়ের পরিদর্শক রাজার গান গাইতে লাগল। তারপর সমস্বরে সবাই ধুয়া ধরল। জুলিয়ানের বিবেক তখন বলছিল—দেখছ ত জঘন্য সম্পদের নমুনা আর তাই তুমি আহরণ করতে চাইছ—এই রকম অবস্থা, এই রকম সঙ্গ না পেলে তুমি ধন-দৌলত আহরণ করতেও পারবে না। হয় ত তুমি একটা বিশ হাজারী ফ্রাঙ্কের পদ পেয়ে যাবে। কিন্তু সে সময় দারুণ লালসায় মাংস চিবোতে হলে কোন হতভাগ্য বন্দীর গান থামাতে হবে। তার সামান্য বরাদ্দ থেকে অর্থ চুরি করে তোমাকে ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে···তুমি যখন ভোজে বসবে সে তখন আরও নিরানন্দ জীবন ভোগ করবে। ওহো, নেপোলিয়ন! তোমার সময়ে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্য ফেরানো কত না মধুর ছিল!···কিন্তু এখন কত দরিদ্রকে দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার নীচতা গ্রহণ করতে হয়!···

বলতে বাধ্য হচ্ছি স্বগতোক্তির মাধ্যমে জুলিয়ান এই যে তার দুর্বলতা প্রকাশ করল এর ফলে তার সম্বন্ধে মনে একটা খারাপ ধারণা গড়ে উঠল। সেও এই সব দস্তানা পরা ষড়যন্ত্রকারীদের উপযুক্ত সহযোগী হয়ে উঠতে পারত এবং আঁচড় মাত্র গায়ে না লাগিয়ে একটা বিশাল দেশের পথ এবং স্বভাব বদলে দিতে পারত।

এখানে যে ভূমিকা তার পালন করার কথা তা' জুলিয়ানের মনে পড়ল। কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখার এবং একটিও কথা না বলার জন্য এই বিশিষ্ট মানুষদের ভোজ-উৎসবে সে নিমন্ত্রিত হয় নি। টেবিলের অপরপ্রান্তে একজন অবসরপ্রাপ্ত শিল্প-কারখানার মালিক বসেছিলেন, তিনি আবার বেসানকন এবং উজেস্ শহরের দু'টি শিক্ষা-সংগঠনের সদস্য। তিনি জানতে চাইলেন যে, জুলিয়ানের না-কি আশ্চর্য-জনক ক্ষমতা আছে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' মুখস্থ বলার, এটা কি সত্যি কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে গভীর নীরবতা নেমে এল। যাদুবলে সেই ভদ্রলোকের হাতে একখানা 'নিউ টেস্টামেণ্ট' গ্রন্থও দেখা গেল। জুলিয়ানের জবাবে, এলো-মেলোভাবে ল্যাটিন ভাষায় আধখানা বাক্যে উদ্ধৃতি বলা হল। এবার সে আবৃত্তি

সুরু করল : নিখুঁত তার স্মরণশক্তি। তার এই ধরনের অদ্ভুত মেধার পরিচয় লাভ করে ভোজ-উৎসবে আগত নিমন্ত্রিতরা প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত-মুখ মহিলাদের দিকে জুলিয়ান তাকাল। তারা অবশ্য সবাই কুৎসিৎ-দর্শন নয়। বিশেষ করে খাজনা আদায়ের পরিদর্শকের বউটি খাসা।

জুলিয়ান সেই বউটির দিকে তাকিয়ে বলল—'এই সব মহিলার কাছে এতক্ষণ ধরে ল্যাটিন আওড়ানোর জন্য আমি সত্যিই খুব লজ্জিত। যদি মঁসিয়ে রবিনো (সেই শিক্ষা-সংগঠনের সদস্যের নাম) খুশিমত গ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা থেকে একটা বাক্য উদ্ধৃত কল্লেন তবে আমি তার তাৎক্ষণিক অনুবাদ শুনিয়ে দিতে পারি।'

তার মেধার এই দ্বিতীয় পরীক্ষা তাকে গৌরবে ভূষিত করলো।

ভোজ-উৎসবে কয়েকজন লিবারেল দলের ধনী সদস্য হাজির ছিলেন। বৃত্তি-পাওয়া ছেলেদের সুখী পিতা তাঁরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনের অজুহাতে তাঁরা দলত্যাগ করে শুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এমনিভাবে চতুরতার সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদ বদলানো সত্ত্বেও মঁসিয়ে রেনল কখনও তাঁদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন নি। এই সব চমৎকার লোকেরা এতদিন জুলিয়ানের সুনাম শুনেছিলেন এবং রাজার শুভাগমনের দিন তাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখেছিলেন...এখন তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। জুলিয়ান ভাবছিল এই আহাম্মকগুলো কখন বাইবেল পাঠ শোনা বন্ধ করবে, ওরা ত এর একবর্ণও বুঝতে পারছে না? বরং তাঁরা তার আবৃত্তি করার সুন্দর ধরণ দেখে আনন্দে হাসছিল। জুলিয়ান কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

ছ'টা বাজল। জুলিয়ান গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল যে, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লিগুরির লেখা একটা অধ্যায় পড়ে মুখস্থ করে আগামীকাল মঁসিয়ে চেলানকে শোনাতে হবে। এবার সে খুবই আনন্দদায়ক ভদ্রকণ্ঠে বলল—'আমার কাজ অপরের পাঠ শোনা এবং নিজের কথা অপরকে শোনানো!'

প্রত্যেকেই শুনে প্রচুর হাসতে লাগল, প্রত্যেকেই তার প্রশংসা করল। এই ধরনের বুদ্ধির খেলাই ভেরিয়ার শহরের সমাজের উপযুক্ত। জুলিয়ান ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভব্যতার পরিপন্থী হলেও প্রত্যেকে উঠে দাঁড়াল...এটাই হচ্ছে প্রতিভার শক্তি।

চলে যাওয়ার আগে জুলিয়ান আরও চার-পাঁচটি ভোজের নিমন্ত্রণ লাভ করল।

—'এই ছোকরা আমাদের সমাজে সম্মান এনে দিয়েছে!' সবাই সমস্বরে বলল। তারা এমন প্রস্তাবও করল যে, তাদের সমাজের গচ্ছিত ভাণ্ডার থেকে জুলিয়ানকে একটা বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া দরকার, তা'হলে সে প্যারিসে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। খাবার-ঘরে সবাই যখন এই হঠকারী প্রস্তাব নিয়ে চেঁচামেচি করছিল জুলিয়ান তখন দেউড়িতে বেরিয়ে এল। আহা! শুয়োরের বাচ্চারা! নোংরা সব শূকরনন্দন! জোরে জোরে বার কয়েক টাটকা বাতাসে শ্বাস নিল জুলিয়ান।

ওই বাড়ীর হঠকারী কর্তৃত্বের পরিবেশে এতক্ষণ সে ঘৃণার হাসি হাসছিল কিন্তু মঁসিয়ে রেনলের বাড়ী ফিরে আসার পর সে অনুভব করল যে, এ বাড়ীর আবহাওয়া পুরোপুরি অভিজাত। এই পার্থক্য সম্বন্ধে সে সচেতন। ওরা সবাই গরীবের অর্থ আত্মসাৎ করে। হতভাগ্যদের জেলখানায় আটক করে রাখে এবং তাদের গান গাইতে পর্যন্ত দেয় না···এসব বাস্তব ঘটনা এড়িয়ে গেলেও মঁসিয়ে রেনলের মতন মানুষ কি কখনও অতিথিকে যে মদ পরিবেষণ করছেন সেই মদের বোতলের বাজার দর শোনাতে পারতেন? নিজের সম্পত্তি সম্পর্কেও মঁসিয়ে ভালেনদ সচেতন। তাই স্ত্রীর সামনেই 'তোমার বাড়ী' বা 'তোমার সম্পত্তি' না বলে বলেছেন 'তাঁর বাড়ী', 'তাঁর সম্পত্তি।'

এই সম্পত্তি ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে সচেতন মহিলা ভোজের টেবিলে এক বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন। একটি পরিবেষণকারী চাকর একটি কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলায় তাঁর শখের সেট নষ্ট হয়ে যায়···তিনি যখন চাকরটিকে বকাবকি করেন তখন চাকরটিও তাঁর মুখের উপর কড়া জবাব দিয়ে বসে।

জুলিয়ান ভাবল, কি সব লোক জড়ো হয়েছে এ বাড়ীতে। ওদের চুরি করা অর্থের অর্ধেকও যদি ওরা আমাকে দেয় তবু এ বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। এক সুন্দর দিনে হয় ত নিজেই আমি নিজের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বসব। আমার ঘৃণার অনুভব আমি ভাষায় প্রকাশ করে ফেলব, নিজেকে সংযত করতে সক্ষম হব না।

মাদাম রেনলের হুকুম পালনের জন্য এ ধরনের আরও কতকগুলো ভোজ-উৎসবে জুলিয়ান যোগদান করল। এবং প্রতিবার সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল, তার 'গার্ড অফ অনারের' নতুন পোশাকটার জন্যে সবাই তাকে ক্ষমা করল অথবা তার এই অপরিণামদর্শী কাজই তার সফলতার কারণ। এই যুবককে বাড়ীতে রাখবার লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে মঁসিয়ে রেনল, না অনাথ-আশ্রমের কর্তা? এ ছাড়া ভেরিয়ার শহরে আর কোন কথা নিয়ে এখন তোলপাড় হচ্ছে না।

এই দু'জন ভদ্রলোক এবং মঁসিয়ে মাসলন মিলে তিনজনের এক শাসক দল তৈরী করেছে···তারা কয়েক বছর ধরে শহরে একটা ভয়ের রাজত্ব চালাচ্ছিল। জনসাধারণ মেয়রকে হিংসে করত, এবং লিবারেল দলের সদস্যদের তার উপর রাগও ছিল···কিন্তু তা' হলেও সে হচ্ছে ধনী অভিজাত বংশের সন্তান! অথচ এই ভালেনদের বাবা ছেলের জন্য মাত্র বছরে ছ' শ' ফ্রাঙ্ক আয়ের সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। শহরের লোক দেখেছে ছোটবেলা তার একটা মাত্র জঘন্য আপেল-সবুজ রঙের কোট ছিল···সেটা পরে রোজ সকালে রাস্তায় বেরোত। আর আজ তার একজোড়া নরম্যান দেশীয় ঘোড়া, সোনার শিকলি হার, প্যারিস থেকে তার পোশাক তৈরী হয়ে আসে এবং এখন তার হাতে অজস্র ধন-সম্পদ।

ভার্জি থেকে জুলিয়ানের কাছে একটা প্যাকেট আসে···ছেলেদের লেখা খাতা। প্রায়ই তাকে তার বাবার সাথে দেখা করতে হয়। ধীরে ধীরে তার সুনামে একটা

ভাঁটা পড়ে আসছে। এমন সময় এক সকালে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল দু'চোখে হাতের চাপ পড়তে।

হাতের মালিক মাদাম রেনল। হঠাৎ তিনি শহরে বেড়াতে এসেছিলেন। ছেলেদের বাগানে রেখে উপরতলায় জুলিয়ানের ঘরে ছুটে এসেছেন। ছেলেরা বাগানে খরগোস নিয়ে মেতেছে। সামান্য একটু সময় পেলেন মাদাম রেনল··· আনন্দে উথলে উঠলেন। ছেলেরা খরগোস নিয়ে উপরে উঠে এল তাদের বন্ধুকে দেখাবার জন্যে আর মাদাম রেনল সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়লেন।

জুলিয়ান তাদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাল···এমন কি তাদের খরগোসটিকেও। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। সে এদের ভালবাসে···সত্যিকারের অভিজাত বংশের সন্তান এরা। যে কুৎসিৎ আচরণ-সমন্বিত পরিবেশে শ্বাস নিতে সে বাধ্য হচ্ছে এখন ভেরিয়ার শহরে তার স্মৃতি ভোলার জন্যে এদের তার প্রয়োজন। এখানে সব কিছুতে ভয়···অভাব, বিলাস, দুঃখ সব কিছুর মধ্যে রয়েছে ভয় মিশে।

যে সব ভোজ-উৎসবে যোগ দিতে সে বাধ্য হচ্ছে তারই বর্ণনা করতে এক সময় মাদামকে বলল জুলিয়ান—'দেখ, তোমরা সুবংশ-জাত মানুষ, তোমাদের, গর্ব করার অধিকার রয়েছে।'

মাদাম রেনল যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, প্রতিবার জুলিয়ানের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আগে ভালেনদের বউ অধর রাঙিয়ে নিচ্ছে। তাই হেসে বললেন—'হ্যাঁ গো, তুমি তাহলে এখন শহরের ফ্যাসান, বল! ওই মেয়েমানুষটা তোমার মনও রাঙাতে পেরেছে!'

ওদের আজকের দুপুরের ভোজ বেশ আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। ছেলেদের উপস্থিতির জন্য অবশ্য বাহ্যিক সংযম প্রকাশ পেলেও সাধারণভাবে ওদের আনন্দের সীমা ছিল না। জুলিয়ানকে আবার কাছে পেয়ে ছোটরা আনন্দ প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। চাকররা বলতে ভুলল না যে, মাসে দু' শ' ফ্রাঙ্ক বেতনে জুলিয়ান যাবে মঁসিয়ে ভালেনদের ছেলেদের পড়াতে।

দুপুরের ভোজ চলছিল। স্ট্যানিসলাস জেভিয়ার এখনও রোগ থেকে সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি। বিবর্ণ দেহ। সহসা সে জানতে চাইল যে, তার রূপোর টেবিল সেট এবং তার রূপোর পানপাত্র কাপটার দাম কত।

—'কেন জানতে চাইছ?'

—'ওটা আমি বিক্রি করে দেব। আর সেই টাকা মঁসিয়ে জুলিয়ানকে দিয়ে দেব, তাহলে উনি আর আমাদের ঘোড়ার গাড়ি দেখাবেন না, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।'

জুলিয়ান জল-ভরা চোখে তাকে জড়িয়ে ধরল। মাদাম রেনলের চোখেও জল। জুলিয়ান ওকে কোলে তুলে নিয়ে বোঝাচ্ছিল যে, ও কথাটা খাটে না এখানে। ওটা ছোটলোকদের ভাষা। মাদাম রেনলের আনন্দ দেখে জুলিয়ান

আরও খুশি হয়ে উঠল।

অবশেষে স্ট্যানিস্লাস বলল—'বুঝেছি, বোকা কাকের মুখ থেকে মাংস টুকরো ফেলবার জন্তে শিয়াল তাকে তোষামোদ করছে।'

নিজের আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলেন না। জুলিয়ানের গায়ে ঠেস দিয়ে তিনি ওদের অজস্র চুম্বনে আদর করতে লাগলেন।

সহসা দরজাটা দু'হাট হয়ে খুলে গেল···মঁসিয়ে রেনল দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখমণ্ডলে কঠিন নিরানন্দের ছাপ। তাঁর আগমনে ধরে আনন্দঘন শান্ত পরিবেশ উবে গেল। মাদাম রেনলের মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে। তাঁর মুখ থেকে কথা সরল না। জুলিয়ান তাঁকে স্ট্যানিস্লাসের কথা বলল। জানে উনি শুনে রেগে যাবেন।

অর্থের কথা শুনলেই মঁসিয়ে রেনলের ভুরু কুঁচকে যায়। এটাই তাঁর স্বভাব। এখনও তিনি ভাবলেন—তার মানে আমার পকেট কাটার ফন্দি! কিন্তু এখন অর্থের চেয়েও বড় স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সন্দেহ বাড়ল। এই লোকটা তার জঘন্য অহঙ্কার নিয়ে তাঁরই সংসারে আজ কর্তৃত্ব করছে এবং তাঁর অনুপ-স্থিতিতে তাকে কেন্দ্র করে আমার পরিবারের লোকেরা খুশি হয়ে উঠছে।

তাই মাদাম ছেলের বুদ্ধি উপলক্ষ করে বেশ গর্বভরে কথা বলতে গেলেন এবং বলতে চাইলেন যে, জুলিয়ানের সুশিক্ষায় এটা হয়েছে তখন তিনি বাধা দিলেন—'থাম! সব জানি। আমার ছেলেদের চোখে ও আমাকে ঘৃণ্য করে তুলেছে। আমি ওদের পিতা এবং এ বাড়ীর কর্তা, অথচ আমার চেয়ে ওই লোকটা আমার ছেলেদের কাছে বেশী প্রিয়। আইনানুগ কর্তৃত্বের বিরোধী একটা শক্তি এ দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হায় রে হতভাগ্য ফরাসী দেশ!'

মঁসিয়ে রেনল প্রকাশ্যে বললেন—'দেখছি, আমার এখানে আসাটা আমার পরিবারের লোকেরা পছন্দ করছে না।'

মাদাম রেনল শুধু স্বামীকে এক পাশে ডেকে নিয়ে অনুরোধ করলেন যে, জুলিয়ানকে এবাড়ী থেকে এখন চলে যেতে বলাই ভাল। কয়েক ঘণ্টা জুলিয়ানের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে মাদামের মনের জোর ফিরে এসেছে। গত পনের দিন ধরে যে মতলব তাঁর মাথায় ঘুরছে এখন সেটা তিনি কাজে পরিণত করবেন।

কিন্তু ভেরিয়ার শহরে হতভাগ্য মেয়র দারুণ বিব্রত হয়ে পড়লেন কারণ তাঁর ধনলিপ্সার জন্যে সবাই প্রকাশ্যে তাঁকে ঠাট্টা করছে।

২৩ : পদমর্যাদার আকর্ষণ

সারা বছর ধরে মাথা উঁচু করে চলতে হলে কতকগুলো প্রচেষ্টার ক্ষণ আসে যেগুলো পার হওয়ার প্রয়োজন হয়।

—কাসৃতি

এই ক্ষুদ্র মানবকে আমরা তার ছোট খাট ভয় ডর নিয়ে থাকতে দিই।

যখন তার একজন উর্দি-পরা চাকরের মতন লোক দরকার তখন একজন তেজস্বী লোককে সে বাড়ীতে রেখেছিল কেন? লোক পছন্দ করার ক্ষমতা তার ছিল না কেন? উনিশ শতকে কোন অভিজাত প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে কোন তেজস্বী লোকের সাক্ষাৎ ঘটলে সাধারণ নিয়মে হয় সে তাকে হত্যা করে, কিংবা নির্বাসনে পাঠায় বা কারাগারে নিক্ষেপ করে অথবা এমন জঘন্যভাবে অপমান করে যে লোকটি দুঃখে বোকার মতন মরণ বরণ করে।

নিউ ইয়র্কের মতন ফরাসী দেশের ছোট ছোট শহরগুলোর অথবা সরকারের মহা দুর্ভাগ্য যে মঁসিয়ে রেনলের মতন লোক বেঁচে আছেন এ-কথা ভুলে গিয়ে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই হাজার কুড়ি অধিবাসী রয়েছে এমন শহরে একটা জনমত গড়ে ওঠে এবং সনদ আছে এমন দেশে জনমত বড় ভয়ঙ্কর বস্তু। তাই সদাশয় অভিজাত কোন লোক, যে নাকি মাত্র এক শ' লিগ দূরে রয়েছে, সে জনমতের উপর ভিত্তি করে তোমার বিচার করবে এবং সেখানকার ধনী, অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত বোকারা এই জনমত গঠন করে। অবশিষ্ট জনতার থেকে আলাদা মানুষটার জীবন দুঃখে ভরে যাক!

মধ্যাহ্ন ভোজের পরেই পরিবারের সবাই আবার ভার্জি চলে গেল।

কিন্তু দিন দুয়েক পরেই জুলিয়ান ওদের সকলকে আবার ভার্জি ফিরে আসতে দেখল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, মাদাম রেনল তার কাছ থেকে একটা বস্তু লুকোবার চেষ্টা করছেন। প্রতিবার সে এসে পড়তেই মাদাম তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে দিচ্ছেন এবং তাঁর মনের ইচ্ছে যে, জুলিয়ান এখুনি সরে যাক এখান থেকে। এই সাবধানবাণী দ্বিতীয়ববার শোনার জন্য জুলিয়ান অপেক্ষা করছিল না। কাজেই জুলিয়ান সংযত ও উদাসীন হয়ে উঠলো, কিন্তু মাদাম দেখে বুঝেও এর কারণ জানতে বা জানাতে চেষ্টা করলেন না।

উনি কি আমার উত্তরাধিকারীর খোঁজ পেয়েছেন? ভাবল জুলিয়ান। অথচ গতকালও তিনি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লোকে বলে, অভিজাত মহিলাদের এটাই স্বভাব···ঠিক যেমন রাজা সভাসদদের মধ্যে কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে প্রীতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হলেন না তবে বাড়ী পৌছে মন্ত্রী দেখলেন তাঁর নামে বরখাস্তের রাজকীয় হুকুমনামা।

এই যে কথাবার্তার মধ্যে আকস্মিক ছেদ পড়ছিল তখন টুকরো টুকরো শব্দ কানে যেতে জুলিয়ান বুঝতে পারল যে, তাঁরা ভেরিয়ার শহরের নামকরা পাড়ায় গীর্জার মুখোমুখি একটা বিশাল অট্টালিকা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। নতুন প্রণয়ী এবং এই বাড়ীর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে? সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। বিষণ্ণ মনে প্রথম ফ্রান্সিসের বিখ্যাত কথাগুলো সে মনে মনে আওড়াতে লাগল…মাত্র মাসখানেক আগে মাদাম রেনল-ই তাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। কত না শপথের ঘটা, কত না আনন্দের প্রাবল্য…এই শূন্যগর্ভ কথাগুলো সে সময় তিনি শুনিয়েছিলেন কেমন করে?

নারীর মনে বারে বারে রঙ বদলায়,
বোকা তুই সমঝে চল, বিশ্বাস নৈব নৈব চ।

একদিন খুব ব্যস্ততার সঙ্গে মঁসিয়ে রেনল বেসানকন যাত্রা করলেন। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই যাওয়া ঠিক হল, এবং তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ফিরে এসে ধূসর কাগজে মোড়া একটা বিশাল প্যাকেট টেবিলে রাখলেন।

স্ত্রীকে বললেন—'যাক, ওই বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারটা মিটল।'

ঘণ্টাখানেক পরেই জুলিয়ান সব কিছু জানতে পারল। ওই প্যাকেটের মধ্যে ছিল বড় বড় অক্ষরে ছাপা বিজ্ঞাপন। যে বাড়ীখানার কথা জুলিয়ান শুনছিল সেই বাড়ীখানা নীলামের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়ার জন্য ওই বিজ্ঞাপন শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেঁটে দেওয়া হল।

বাড়ীখানা দেখার জন্য জুলিয়ান বেরিয়ে পড়ল। ওই বাড়ীর কেয়ার-টেকার তখন একজন বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। সে প্রথমে জুলিয়ানকে দেখতে পায় নি। বলছিল—'কি দরকার! শুধু শুধু সময় নষ্ট! মঁসিয়ে মাসলন ত এই বাড়ীর জন্যে তিন শ' ফ্রাঙ্ক ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেয়র জেদ ধরেছেন তাই প্রধান উপাচার্য মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ারকে বিশপের কাছে পাঠানো হয়েছে।' এতক্ষণে সে জুলিয়ানকে দেখতে পেয়ে চুপ করল।

নীলাম দেখতে যেতেও ভুললনা জুলিয়ান।

স্বল্প আলোয় আলোকিত জনাকীর্ণ নীলাম ঘর। এক' বিশেষ-নজরে সবাই নিজের নিজের পাশের লোককে দেখছে। একখানা টেবিলের উপর জ্বালিয়ে রাখা তিনটে মোমবাতি থেকে মোম গলে গলে পড়ছে। নীলামের কেরাণী চিৎকার করছে—'তিন শ' ফ্রাঙ্ক মহাশয়রা।'

দু'জন লোকের মাঝখানে জুলিয়ান দাঁড়িয়েছিল। ওদের একজন মন্তব্য করল—'তিন শ' ফ্রাঙ্ক! এর মূল্য আট শ' ফ্রাঙ্ক হওয়া উচিৎ। আমি বেশী ডাকব!'

—'শুধু শুধু মাথায় বিপদ ডেকে আনবে। মঁসিয়ে মাসলন এবং মঁসিয়ে ভালেনদকে শত্রু করে তোমার কি লাভ হবে। বিশপ, প্রধান-উপাচার্য এবং তার সব দলবলও আবার রয়েছে।

অন্য লোকটা কিন্তু ডাক দিল—'তিন শ' কুড়ি!'

তার পাশের লোকটা ধমক দিল তাকে—'বোকা গাধা কোথাকার। তোর পাশে মেয়রের গুপ্তচর রয়েছে দেখছিস না!' সে আঙুল দিয়ে জুলিয়ানকে দেখিয়ে দিল।

এ ধরনের মন্তব্যের জন্যে লোক দু'টোকে কড়া ধমক দিতে চাইল জুলিয়ান। কিন্তু ফরাসী দেশের নাগরিক দু'জন তাকে গ্রাহ্যই করল না। ওদের আত্ম-সচেতন ভাব তাকেও আত্ম-সচেতন করে তুলল। ঠিক তখনি তৃতীয় মোম বাতিটা নিভে গেল। নীলাম-ডাকা শেষ হল। জেলাশাসকের অফিসের প্রধান কেরাণী মঁসিয়ে জিরোদ তিন শ' তিরিশ ফ্রাঙ্ক ভাড়ায় বাড়ীখানা ন' বছরের জন্য দখল করল।

মেয়র চলে গেলেন।

লোকেরা নানা ধরনের মন্তব্য করতে লাগল।

জুলিয়ানের বামদিকে একজন মোটা-সোটা লোক দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—'কি লজ্জার কথা! এই বাড়ীখানার জন্যে আমি আট শ' ফ্রাঙ্ক দিতে রাজী ছিলাম। ওখানে একটা কারখানা খোলবার ইচ্ছে ছিল। তাতে আমার মুনাফাও হত।'

লিবারেল দলের একজন তরুণ শিল্পপতি বলল—'ওসব বলে এখন কি লাভ হবে?--মঁসিয়ে জিরোদ কি ধর্মসভার সভ্য নন? তাঁর চারটি ছেলে কি বৃত্তি পায় নি? গরীব মানুষ। ভেরিয়ারের মন্ত্রণা-পরিষদের উচিৎ তার পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক বধিত করা।'

তৃতীয় জন মন্তব্য করল—'এবং তুমি কি ভাবছ যে, মেয়র এটা বন্ধ করতে পারতেন না। তিনি একজন চরম-পন্থী, কিন্তু পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন না।'

অমনি আর একজন বলে উঠল—'আত্মসাৎ করেন না? সব আত্মসাতের কড়ি এক জাগায় জমা হয়। তারপর বছরের শেষে সবাই ভাগ করে নেয়। ওই দেখ বুড়ো সোরেলের ছেলে রয়েছে। চল, পালাই।'

মেজাজ খারাপ করে বাড়ী ফিরল জুলিয়ান। তার সামনেই পড়লেন বিষণ্ণ মাদাম রেনল।

—'নীলাম ঘরে গিছলে বুঝি?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—'হ্যাঁ, মাদাম। গিয়েছিলাম। এবং ওখানে পরম পূজ্যপাদ মেয়রের গুপ্তচর-রূপে সম্মানিত হয়েছি!'

—'তিনি যদি আমার কথা শুনতেন তবে আজ শহরের বাইরে যেতেন।'

ঠিক তখনি বাড়ী ফিরলেন মেয়র। বিষণ্ণ তিনি। নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকল। মেয়র ছেলেদের সাথে জুলিয়ানকে ভার্জিতে যেতে বললেন। দুঃখ-ম্লান এই ভ্রমণ। মাদাম নানাভাবে তাঁর স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন।

বললেন—'এসব তোমাকে সহ্য করতে হবে গো।'

সন্ধ্যেবেলায় সবাই ঘরের মধ্যে আগুনের চারপাশ ঘিরে বসেছিল। বীচ

কাঠগুলো আগুনের মধ্যে শব্দ করে ফাটছিল। বিষণ্ণ মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে পার হচ্ছিল।

সহসা ছেলেদের একজন বলে উঠল—'বেল বাজছে। কেউ হয়ত ডাকছে!'

মেয়র বললেন—'মরুক গে যাক! তবে মঁসিয়ে গিরোদ যদি এখন আমাকে জ্বালাতে আসে তবে ধমক দেব। এটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। লোকটার উচিৎ এর জন্যে ভালেনদের কাছে যাওয়া। ওদের সাথে আমি মিটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছি। জ্যাকোবিনদের কাগজগুলো জানতে পারলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই সব কাহিনী লিখবে।

সিনিয়ার জেরোনিমো একজন সঙ্গীতশিল্পী এবং হাস্যরসিক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। মাদাম রেনল তাঁকে চলে যেতে দিলেন না। নীলাম ঘরে জুলিয়ানকে গুপ্তচর বলা হয়েছে। সে বিষণ্ণ, দুঃখিত। বার দুয়েক সে এর মধ্যে কথাটা মাদামকে বলেছে…কিন্তু মাদাম কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সান্ধ্যভোজের পর গানের আসর বসল। বিচিত্র মানুষ জেরোনিমো। কোন ফরাসীর চরিত্রে এক সঙ্গে এমন দুটো গুণের সমাবেশ ঘটে না। প্রথমেই জেরোনিমো একটা দ্বৈত-সঙ্গীত গাইল মাদাম রেনলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। তারপর সে বলতে সুরু করল গল্প। একটার পর একটা গল্প বলতে বলতে রাত একটা বেজে গেল। তখন ছেলেদের বিছানায় শুতে যেতে বললেন মাদাম।

—'আর একটা গল্প শুনি।' বড় ছেলেটি আবদার করল।

সিনিয়ার জেরোনিমো বলল—'বেশ, এবার তাহলে নিজের গল্প বলি। বছর আষ্টেক আগে আমি নেপলস শহরের একটা গানের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। তবে ভেরিয়ার শহরের মেয়রের মতন আমার বাবা ত ধনী ছিলেন না। আমাদের শিক্ষক ছিলেন সিনিয়ার জিংগারেলি বড় কড়া ধাতের মানুষ। তাঁকে কেউ পছন্দ করতো না অথচ তিনি চাইতেন সবাই তাঁকে পছন্দ করুক। প্রায়ই আমি সান কালিনো থিয়েটারে গান শুনতে যেতাম, ওখানে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের জলসা বসত। কিন্তু ওখানে ঢোকবার দর্শনী লাগত আট সাউ, কিন্তু পাব কোথায়? ও ত অনেক অর্থ!

জেরোনিমোর টানা টানা ইতালি ভাষা শুনে সবাই হাসছিল।

—'একবার সান কারলিনো থিয়েটারের ম্যানেজার সিনিয়ার গিয়োভানোন আমার গান শুনলেন। ভারি খুশি হয়ে বললেন, এই ছোকরা একটা হীরের টুকরো।'

গল্প বলার ধরনটা খুবই সুন্দর, সবাই অবাক হয়ে শুনছিল।

গিয়োভানোন বলেছিলেন—'ওহে ছোট্ট বন্ধু, আমি একটা কাজ দিলে করবে?'

—'কত টাকা দেবেন আমাকে?'

তিনি বললেন—'মাসে চল্লিশ দুকাত।'

—'তার মানে মাসে মাসে একশ' ষাট ফ্রাঙ্ক।' মনে হল স্বর্গের দরজা আমার সামনে খুলে গেছে। তাই বললাম, কেমন করে কাজ নেব, জিংগারেলি কি আমাকে ছাড়বেন?'

—'লাসিয়া ফেয়ার এ মি।' তিনি বললেন।

বড় ছেলেটি অমনি বলে উঠল—'ওর অর্থ, ওটা আমার হাতে ছেড়ে দাও!'

তারপর সিনিয়ার গিয়োভানোন আমাকে বললেন—'বন্ধু, তার আগে ত তোমাকে চুক্তির কাজটা সারতে হবে।' চুক্তিপত্রে সই করলাম, উনি আমাকে তিনটে ডুকাত দিলেন! এর আগে আমি কখনও এত টাকা হাতে পাই নি। তারপর আমাকে যা' যা' করতে হবে বলে দিলেন।

পরদিন সকালবেলা এই ভয়ঙ্কর সিনিয়ার জিংগারেলি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর বুড়ো চাকরের সঙ্গে গেলাম। জিংগারেলি বললেন—'কি চাস রে, বদমাস?' বললাম—'গানের শিক্ষক হব! আমার অসদ আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত। আর কখনও স্কুলের রেলিঙ ডিঙ্গিয়ে পালাব না। তার চেয়েও দু'গুণ কঠিন কাজ এবার আমায় করতে হবে।'

—'খুদে বদমাস, আমার সব চেয়ে সুন্দর সুরেলা কণ্ঠের ক্ষতির ভয় যদি না থাকত ত তোকে আমি নির্জন ঘরে আটকে রাখতাম। এক সপ্তাহ শুধু জল আর রুটি দিতাম।'

জবাব দিলাম—'গান বাঁধব। এই স্কুলে সকলের সামনে একটা নজির স্থাপন করব। তবে একটা অনুগ্রহ আপনার কাছে চাইছি। কেউ যদি আপনার কাছে এসে আমাকে স্কুলের বাইরে গান গাইতে যাওয়ার জন্যে অনুমতি দিতে বলে ত দেবেন না। দয়া করে অনুমতি দেবেন না।'

—'তোর মতন একটা বদমাসকে কোন্ শয়তান ডাকতে আসবে? আমার সঙ্গে কি মসকরা করছিস না কি? এখন বেরো আমার সামনে থেকে, দূর হ'। সাবধান করে দিচ্ছি, নইলে তোকে শুকনো রুটি দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখব।' এই বলে তিনি আমার দিকে নিশানা করে সজোরে লাথি ছুঁড়লেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সিনিয়ার গিয়োভানোন এলেন গানের স্কুলের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তাকে বললেন, 'আমি এসেছি আপনার কাছে জেরোনিমোকে চাইতে। ওকে দিন, ওর জন্যে আমার কিছু টাকা-পয়সা রোজগার হবে। ও আমার থিয়েটারে গান গাইবে। এবং আগামী শীতকালে তাহলে আমি মেয়েটার বিয়ে দিতে পারব।'

জিংগারেলি তখন বলেছিলেন—'ওই বদমাসটাকে নিয়ে কি করবেন? মত দেব না, ওকে পাবেন না। আর আমি যদি মত দিই তবুও ও গানের স্কুল ছেড়ে যাবে না। এইমাত্র ও আমার কাছে বলে গেছে যাবে না।'

পকেট থেকে চুক্তি-পত্রখানা বার করে গিয়োভানোন বলেছিলেন—'এ ত কেবল তার চাওয়ার প্রশ্ন নয়। এই দেখুন কার্তা কান্তা। চুক্তি-পত্র। এই ও সই করেছে।

এই শুনেই জিংগারেলি রাগে টঙ হয়ে উঠলেন এবং সজোরে ঘণ্টা বাজালেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জেরোনিমোকে এখুনি স্কুল থেকে বার করে দে।' কাজেই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিল, আর আমি দারুণ হাসতে লাগলাম। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা থিয়েটারে গান গাইলাম। পাঙ্কিনেল্লো বিয়ে করতে রাজি হল। তার বাড়ির জন্যে কি কি চাই তা' হিসেব করে বলল। বার বার সে হিসেবে গোলমাল করে ফেলছিল।

মাদাম রেনল বললেন—'ওই গানটা আমাদের একবার শোনান।'

রাত দু'টোর পর সবাই খুশিমনে শুতে গেল। পরদিন জেরোনিমো চলে গেল। মঁসিয়ে এবং মাদাম ফরাসী রাজসভায় তার নামে প্রয়োজনীয় পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন।

জুলিয়ান ভাবতে লাগল, সব জায়গায় তাহলে প্রবঞ্চনা রয়েছে। এই যে সিনিয়র জেরোনিমো লণ্ডনে যাচ্ছে ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক বৃত্তি নিয়ে। কিন্তু সান কারলিনোর ম্যানেজারের চালাকির জন্যে এতকাল জেরোনিমো তার স্বর্গীয় কণ্ঠে গান গাইতে পারে নি। দশটা বছর তার জীবন থেকে বৃথাই খসে পড়েছে।··· আমিও মঁসিয়ে রেনল না হয়ে বরং জেরোনিমো হব। সমাজ তাকে এখনও কোন সম্মান দেয় নি, এবং সে কোনও চুক্তিও করে নি ঠিকই তবে সে এখন আনন্দে আছে।

সে ভেবে দেখল, যে ক'দিন ভেরিয়ারে সে একা ছিল তার আনন্দে কেটেছে। ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কখনও সে বিরক্তি বা বিষণ্ণতা উপভোগ করে নি। এই পরিত্যক্ত বাড়ীতে সে মহা আনন্দে কি লেখা-পড়া আর কল্পনা-বিলাসে মগ্ন ছিল না? হঠকারি কাজ বা কথার দ্বারা তার স্বপ্নময় মুহূর্তগুলো একবারও আবিল হয়ে ওঠে নি। তাহলে এমন সহজে কি আনন্দকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়···এমন জীবনচর্যার জন্য প্রয়োজন ত অতি সামান্য। ইচ্ছে হলে আমি এলিসাকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু হতে পারি ফৌকের ব্যবসার অংশীদার···কিন্তু এই মাত্র ওই যে পথিক পাহাড়ে উঠে একখানা পাথরে বসে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে করতে বিশ্রাম করছে, সে যদি অনন্তকাল ধরে ওমনি বিশ্রাম করে সে কি আনন্দ লাভ করবে?

জুলিয়ান যখন এমনি চিন্তায় বিভোর তখন মাদাম রেনল তার কাছে এলেন। ভাবছিলেন, এই বাড়ী ভাড়া দেওয়ার সব ঘটনাটা তিনি জুলিয়ানকে খুলে বলবেন। তাহলে তার কাছে যে-সব শপথ তিনি করেছিলেন তা' কি সে ভুলে যাবে?

তিনি যদি তাঁর স্বামীকে বিপদে পড়তে দেখেন তবে নিজের জীবন দিয়েও তিনি স্বামীকে রক্ষা করবেন। এই ধরনের অভিজাত মহিলা তিনি···সদ আচরণ করার বদলে কোন অপরাধ করলে তাঁর মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। তাই ত মাঝে মাঝে ভাবেন যে, যদি তিনি বিধবা হতেন তাহলে আজ দারুণ সুখী হতেন

এবং জুলিয়ানকে বিয়ে করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে পারতেন। তাঁর স্বামী ছেলেদের যত না ভালবাসেন জুলিয়ান তার চেয়ে তাদের বেশী ভালবাসে। তার কঠোরতা সত্ত্বেও ছেলেরা তাকে পূজো করে। অবশ্য এটাও ঠিক, জুলিয়ানকে বিয়ে করলে তিনি আর ভার্জিতে থাকতে পারবেন না, অথচ এই ছায়াঘেরা পল্লী-নিবাস তিনি পছন্দ করেন। কল্পনার চোখে তিনি দেখতে পান প্যারিসে বাস করছেন এবং সবাই প্রশংসা করছে এমনভাবে ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলছেন। তাঁর ছেলেরা, তিনি নিজে এবং জুলিয়ান সেখানে অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে বাস করছেন।

বিবাহের কি অদ্ভুত পরিণাম···কিংবা বলা যায় উনিশ শতকে বিবাহের কি ছিরি হয়েছে! বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমী প্রেমের সমাধি রচনা করেছে। বিবাহের পর এই প্রেমের জন্ম হলে তা' আরও জীবনকে জঘন্য করে তুলেছে। অবশ্য কোন কোন দার্শনিকের মতে, ধনীর ঘরে এমন পরিবেশ সব রকম কর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে, প্রশান্ত আনন্দের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং স্বভাবজ কাম-শীতল নারী-মনের প্রেম-ভাব বিদূরিত হয়। দার্শনিকদের অভিমত অনুযায়ী আমি মাদাম দ্য রেনলকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ভেরিয়ারে একজনও নাগরিক তাঁকে ক্ষমা করে নি। তিনি নিজে সন্দেহ না করলেও শহরময় তাঁর প্রেমের কেলেঙ্কারি রটে গিয়েছিল। ফলে সে বছর শরৎকালটা লোকের কাছে অনেক কম একঘেয়ে মনে হচ্ছিল।

শরৎকাল এবং শীতকালের প্রথম দিকটা খুব দ্রুত কেটে গেল।

রেনল পরিবার ভার্জির বনভূমি পিছনে ফেলে চলে এল। ভেরিয়ারের অভিজাত সমাজ দেখল যে তাদের রটানো দুর্নাম মঁসিয়ে রেনলের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি তখন তারা আরও রেগে গেল। এই সব গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরা যারা এ-ধরনের কেলেঙ্কারী রটিয়ে আনন্দ পায়, তারা আরও জঘন্য সন্দেহ ছড়াতে লাগল।

মঁসিয়ে ভালেনদ আর একটি অভিজাত-পরিবারের আরও পাঁচটি পরিচারিকার মধ্যে এলিসার কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। এলিসা দারুণ ভয় পেয়েছিল তাই সেই শীতকালেই অনেক কম বেতনের চাকরি গ্রহণ করল, অথচ মেয়রের বাড়ীতে সে এর বেশী বেতন পেত। তারপর স্বেচ্ছায় এই যুবতী একদিন যাজক মঁসিয়ে চেলানের কাছে গিয়ে জুলিয়ানের প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে এল।

জুলিয়ান এই শহরে ফিরে আসার পরদিন সকাল ছ'টার সময় মঁসিয়ে চেলান তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—'দেখ, তোমাকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি না, বরং কিছু না বলার জন্যই তোমাকে আদেশ করছি। তবে তোমায় বলছি, তিন দিনের মধ্যে বেসানকনের গীর্জায় অথবা তোমার বন্ধু ফৌকের কাছে চলে যাও। তোমার বন্ধু তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সব রকম ব্যবস্থা করে দেবে। তোমাকে সাহায্য করার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাকে ভেরিয়ার ছাড়তেই হবে

এবং এক বছরের আগে এখানে ফিরবে না।'

কোন জবাব দিল না জুলিয়ান। তার পিতা না হয়েও মঁসিয়ে চেলান এই যে তার উপর খবরদারি করলেন তার জন্য সে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হবে কি না তাই ভাবছিল। অবশেষে সে শুধু বলল—'কাল ঠিক এই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' একজন তরুণের সঙ্গে মঁসিয়ে চেলানের এ ধরনের জবর-দস্ত ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু জুলিয়ান পরিপূর্ণ বিনয় প্রকাশ করে এবং কোথাও কিছু না বলে চলে এল।

বাড়ী ফিরে এসে জুলিয়ান চাইল মাদামকে সাবধান করে দিতে কিন্তু দেখল মাদামের মন জুড়ে একটা বেপরোয়াভাব বিরাজ করছে। খানিক আগে তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে সব কিছু খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। বেসানকনের উত্তরাধিকারীত্ব হারাবার ভয়ে মঁসিয়ে রেনলের মন দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই মাদামকে তিনি নিরপরাধ স্থির করেছেন। ভেরিয়ারের নাগরিকদের এই দুর্ণাম রটানোর কারণ যা' তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা' স্ত্রীর কাছে বিশ্বাস করে বললেন, মিথ্যা দুর্ণাম। হিংসার জ্বালায় লোকেরা ছটফট করছে…কিন্তু এ অবস্থায় তিনি কি করতে পারেন?

মুহূর্তের জন্য মাদামের মনে ভয় হল যে, হয়ত জুলিয়ান মঁসিয়ে ভালেনদের প্রস্তাব গ্রহণ করে এই ভেরিয়ার শহরে থেকেই যাবে। কিন্তু এক বছর আগের মতন আর তিনি লাজুক এবং সরল মহিলা নন। তাঁর মনের ভয়ানক যৌন-লালসা এবং বিষণ্ণতা তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। তাই একই সময়ে যেমন তিনি নিজের মন যাচাই করলেন তেমনি স্বামীর কথাও কান পেতে শুনলেন…বুঝলেন যে, অল্পদিনের জন্য এই বিচ্ছেদ আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই ভাবতে লাগলেন যে, আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে নির্ধন ব্যক্তির মতন জুলিয়ান আবার তার উচ্চাশা সফল করার ভাবনায় ডুবে থাকবে। আর আমি হে ঈশ্বর, আমি কত ধন সম্পদের অধিকারিণী! আমার আনন্দ উপভোগের পথে এই ধন-সম্পদ কত নিরর্থক! ও আমাকে ভুলে যাবে। ভালবাসার কত উপযুক্ত পাত্র ও…তাই কেউ নিশ্চয় ওকে ভালবাসবে এবং ও ভালবাসার প্রতিদান দেবে। আহা, আমি কত দুর্ভাগিনী!…ওর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আমি করব? ঈশ্বর ন্যায় বিচারক। পাপ করা থেকে বিরত হওয়ার মতন মনের জোর আমার নেই, এবং আমার বিচার করার ক্ষমতা ঈশ্বর কেড়ে নিয়েছেন। আরও কিছু অর্থ দিয়ে এলিসাকে আমি ধরে রাখতে পারতাম। এর চেয়ে সহজ কাজ আর কিছুই ছিল না। অথচ মুহূর্তের জন্যেও এ-চিন্তাটা আমার মাথায় এল না। প্রেমের পাগল-করা স্বপ্ন সারাক্ষণ আমার মন জুড়ে রইল। এবং এখন আমি সব কূল হারালাম।

একটা ব্যাপার জুলিয়ানকে আঘাত দিল…সে যখন মাদাম রেনলকে জানাল যে, সে দূরে চলে যাচ্ছে তখন তাঁর মুখ থেকে স্বার্থপরের মতন কোন প্রতিবাদ

সে শুনতে পেল না। চোখের জল রোধ করার জন্য স্পষ্টত তিনি তখন চেষ্টা করছিলেন।

মাথার এক গুচ্ছ কেশ কেটে নিয়ে তিনি বললেন—'ওগো, এসময় মনের দৃঢ়তা আমাদের প্রয়োজন। জানি না এখন আমি কি করব! কিন্তু যদি মরে যাই ত শপথ কর, আমার ছেলেদের তুমি ত্যাগ করবে না কখনও। কাছে বা দূরে যেখানেই থাক তাদের মানুষের মতন মানুষ করে তুলবে। আবার নতুন করে যদি বিপ্লব হয় তবে অভিজাতরা শেষ হয়ে যাবে। ছাদের উপর সেই কৃষকটিকে হত্যা করার জন্য ওদের বাবা-কে হয়ত এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। আমার পরিবারের উপর তুমি নজর রেখ। তোমার হাত আমার হাতে রাখ। ওগো, বিদায়! এই আমাদের শেষ দেখা। সাহস সঞ্চয় করে যখন এত বড় উৎসর্গ করতে পারলাম তখন আশা রাখি আবার আমার সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবতে পারব।'

জুলিয়ান একটা বেপরোয়া ভাব আশা করেছিল। কিন্তু এই সহজ বিদায়-ভিক্ষা তাকে বিচলিত করল।

বলল—'না। এভাবে তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে তাতে আমি রাজী নই। চলে আমি যাব···আমার যাওয়া ওরা চাইছে। এমনকি তুমি নিজেও তাই চাইছ। কিন্তু চলে যাওয়ার তিন দিন পরে রাতে আমি ফিরে আসব এবং তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

মাদাম রেনলের জীবন-চর্যা গেল বদলে। তাহলে জুলিয়ান সত্যিই তাঁকে ভালবাসে, তাই স্বেচ্ছায় সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। তাঁর মনে ভয়ানক দুঃখ আনন্দের আলোক ঝরণায় রূপান্তরিত হল···এমন আনন্দ সারা জীবনে তিনি কখনও উপভোগ করেন নি। এখন সবকিছু তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠল। প্রণয়ীকে আবার দেখতে পাওয়ার নিশ্চয়তা তাঁর হৃদয় নিঙড়ানো যন্ত্রণার অবসান ঘটালো। সেই মুহূর্ত থেকে মাদাম রেনলের আচরণ এবং মুখমণ্ডলে তার বাহ্যিক প্রকাশ আবার অভিজাতসুলভ, অটল এবং প্রশান্ত হয়ে উঠল।

অল্প সময় পরেই রাগে টঙ হয়ে ম সিয়ে রেনল বাড়ী ফিরে এলেন। এক সময় স্ত্রীকে তিনি ছ'মাস আগে পাওয়া বেনামী চিঠিখানার কথা বললেন।

—'চিঠিখানা আজ আমি নাচঘরে নিয়ে যাব এবং সকলকে দেখাব। বলব, যে ভালেনদকে আমি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচিয়েছি এবং ভেরিয়ার শহরের অন্যতম সম্পদশালী লোক করে তুলেছি সেই এই চিঠির লেখক। সাধারণ লোকের সামনে আমি তাকে অপমান করব এবং 'দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে' আহ্বান জানাব। এটা সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

হায় ঈশ্বর! এবার তাহলে আমি বিধবা হব, ভাবতে লাগলেন মাদাম রেনল। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ যদি আমি বন্ধ না করি, অবশ্য সে ক্ষমতা আমার আছে, তাহলে স্বামীকে খুন করার দোষে দোষী হব।

তাই অহঙ্কারী স্বামীকে তিনি বহুকষ্টে শান্ত করলেন।

মঁসিয়ে রেনল বুঝতে পারলেন যে তাঁর কিছু অর্থের অপচয় ঘটবে। এবং তাঁর জীবনে এই আঘাত এসেছে ওই তরুণ জুলিয়ানের জন্যে। এখন জুলিয়ান যদি ভালেনদের বাড়ী গৃহশিক্ষকতা করতে যায় তবে ভেরিয়ার শহরে কানাকানি আরও তীব্র হয়ে উঠবে। একদিকে ভালেনদের স্বার্থ যে জুলিয়ান তার প্রস্তাব গ্রহণ করুক···অন্যদিকে মঁসিয়ে রেনলের সুনাম রক্ষার জন্য জুলিয়ানের উচিৎ ভেরিয়ার ছেড়ে চলে যাওয়া এবং বেসানকন বা দিজনে গিয়ে যাজকের পেশা গ্রহণ করা। কিন্তু কি করে ও এই বৃত্তি গ্রহণ করবে? তাছাড়া ওখানে গিয়ে সে খাবে কি? তার মানে এখনি তাঁকে কিছু অর্থ গুণাগার দিতে হবে। স্ত্রীর চেয়েও তাই তিনি বেশী হতাশ হলেন। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয় তিনি খুব আত্ম-সচেতন পুরুষ···কিন্তু এখন স্ত্রীর জন্য তাঁর জীবন অবসাদগ্রস্ত। যেন হতাশায় ডুবে গিয়ে তিনি ওষুধ পান করে ঝিমোচ্ছেন। হতাশায় নিমগ্ন তাঁর মন। কোনও কাজে তাঁর একটুও উৎসাহ নেই। চতুর্দ্দশ লুইয়েরও এমনি অবস্থা হয়েছিল। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হয়ে তিনি বলেছিলেন···'যখন আমি রাজা ছিলাম।' বড় সুন্দর সেই মন্তব্য!

পর দিন খুব ভোরে মঁসিয়ে রেনল আবার একখানা বেনামী চিঠি পেলেন। জঘন্য ভাষায় চিঠিখানা লেখা। চিঠির ছত্রে ছত্রে তাঁর সম্পর্কে অপমানকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিঠি কোনও হিংসুটে লোকের লেখা। চিঠি পেয়েই ভালেনদের সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছা আবার তাঁর মনে জাগল। তাঁর মন উজ্জীবিত হয়ে উঠল। কাউকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তিনি একটা বন্দুকের দোকানে হাজির হলেন। একটা পিস্তল কিনলেন এবং গুলি ভরে নিলেন।

স্বামীর চরিত্রের শীতল ভয়ঙ্করতায় আবার মাদাম রেনল সশঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামীকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। বোঝালেন। শেষে বললেন যে, সেমিনারে গিয়ে এক বছর পড়াশোনা করার খরচ করার হিসাবে তাকে ছ'শ ফ্রাঙ্ক দেওয়া হোক। আবার সেই অর্থ অপচয়ের প্রস্তাব। মঁসিয়ে রেনল ভাবলেন, কি কুক্ষণেই না ছেলেদের জন্য গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন।

তাঁর স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য ভালেনদের দেওয়া আটশ' ফ্রাঙ্ক বেতনের প্রস্তাব নাকচ করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু সে তাঁদের কাছ থেকে নিক···এই কথাটা জুলিয়ানকে বোঝাতে এবং রাজী করাতে খুব অসুবিধায় পড়লেন মাদাম।

জুলিয়ান জোর দিয়ে বলল—'দেখ, ওর প্রস্তাব গ্রহণ করার ইচ্ছা আমার কোন দিন হয় নি। এক মুহূর্তের জন্যও ও কথা আমার মাথায় আসে নি। তা ছাড়া তোমরা আমাকে এমন সুন্দর পরিবেশে অভ্যস্ত করে তুলেছ যে, ওই লোকগুলোর জঘন্য সঙ্গে থাকলে আমি মারা পড়ব।'

অবশেষে নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কঠিন আলিঙ্গনে জুলিয়ান রাজী হতে বাধ্য হল। মেয়রের দেওয়া অর্থ সে ধার হিসাবে গ্রহণ করল এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সুদ

সহ সব টাকা শোধ করে দেবে বলে হ্যাণ্ড নোট লিখে দিল।

তখনও সেই পাহাড়ের গুহায় মাদামের তিন হাজার ফ্রাঙ্ক লুকোন ছিল। জানতেন যে, রেগেমেগে জুলিয়ান ওই টাকা নিতে অস্বীকার করবে তবু কম্পিত-বক্ষে ওই টাকা নিতে অনুরোধ করলেন মাদাম।

—'তুমি কি চাও আমাদের প্রেমের স্মৃতি আমার কাছে বিরক্তিকর হোক!' বলল জুলিয়ান।

অবশেষে জুলিয়ান ভেরিয়ার শহর ছেড়ে চলে গেল।

এই বিচ্ছেদের জ্বালা মাদাম রেনলের জীবনে ভয়ানক তীব্র হয়ে দেখা দিল। প্রেমের এই এক নিষ্ঠুর দংশন। তিনি ঘণ্টা, মুহূর্ত গুণতে লাগলেন। তিন দিনের দিন রাতে দূরে নির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেলেন মাদাম রেনল। তারপর অনেক বিপদের বেড়া ডিঙ্গিয়ে জুলিয়ান এসে দাঁড়াল মাদাম রেনলের সামনে।

ভয়ে-দুঃখে মাদামের মন অসাড় হয়ে পড়েছিল। থেমে থেমে বললেন—'ওগো, আমার চেয়ে আর বোধ হয় কেউ অসুখী নয়···ইচ্ছে হয় মরে যাই···আমার ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছে···।' বিচ্ছেদের পর এমন জবাবই জুলিয়ান তাঁর কাছ থেকে আশা করছিল।

দিনের আলো ফুটছে। এবার জুলিয়ানকে চলে যেতে হবে। মাদামের চোখের জল পড়া বন্ধ হয়েছে। মুখে কথা সরছে না। দিলেন না তার চুম্বনের প্রতিদান। নিথর হয়ে দেখছিলেন সে জানালায় দড়ি বাঁধছে। বৃথাই জুলিয়ান বলল—'এমনি একটা অবস্থা হোক তুমি চাইছিলে। এখন আর তুমি বিষণ্ণ হয়ে থাকবে না। তোমার ছেলেদের অসুখ-বিসুখ হলেও আর তাদের মৃত্যু তোমায় দেখতে হবে না।'

শীতল কণ্ঠে মাদাম বললেন—'দুঃখিত। স্ট্যানিস্লাসকে তুমি বিদায়-চুম্বন জানাতে পারলে না।'

এই জীবন্ত মৃতদেহের শীতল আলিঙ্গনের স্মৃতি জুলিয়ানের মনে গভীর ছাপ ফেলল। হাঁটার সময় সে আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, পাহাড় পার হওয়ার আগে যতদূর নজর যায় সে পিছন ফিরে তাকাল। চোখে পড়ল ভেরিয়ারের গীর্জার চূড়াটা।

২৪ : একটি গ্রাম্য রাজধানী

> **কি সোরগোল! কত অজস্র, কর্ম-চঞ্চল মানুষ!**
> **ভবিষ্যৎ জীবনের কত বিশ-সালা পরিকল্পনা—**
> **নিঃসৃত মস্তক। প্রেম ভোলবার জন্য কত অগণিত**
> **আনন্দ উৎসবের পরিবেশ! —বারনেভ**

অবশেষে অনেক দূরের এক পাহাড়ের সানুদেশে পৌছলো জুলিয়ান। এখান

থেকে কালো প্রাচীর নজরে পড়ছে। ওই বেসানকন শহর। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, ওই শহরের রক্ষীবাহিনীর সেনানী-রূপে আজ যদি ওখানে প্রবেশ করতাম তাহলে সেটা কত পৃথক হত আমার কাছে!

ফরাসীদেশে বেসানকন কেবল অন্যতম শহর নয়, এখানে উদার আর বুদ্ধিমান লোকের ছড়াছড়ি। কিন্তু জুলিয়ান ত একজন সামান্য সরল চাষী, গণ্যমান্য লোকদের সামনে হাজির হওয়ার মতন সামর্থ্য কোথায় তার। ফৌকের কাছ থেকে চেয়ে আনা একটা সাধারণ পোশাক তার পরনে···ধীরে ধীরে সে ড্র-ব্রীজের উপর উঠল। ষোল শ' চুয়াত্তর সালে এই শহর অধিকারের কাহিনী তার মনে পড়ল। বিদ্যালয়ে বন্দী হওয়ার আগে সে পরিখা আর শহরটা ঘুরে দেখে নিতে চাইল। যে সব জায়গায় সেনাবাহিনী রয়েছে সে জায়গাগুলোয় উঁকি মারতে গিয়ে সে বার দুই-তিন ওদের হাতে ধরা পড়তে গিয়ে বেঁচে গেল। এসব জায়গায় জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ!

পরিখা বরাবর রাজপথের ধারে অবস্থিত কাফের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় তার মন আকৃষ্ট করে ছিল প্রাচীরের বিশালতা, দুর্গ-পরিখার গভীরতা এবং কামান-গুলোর ভীষণতা। বিস্মিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো মস্ত বড় দরজার মাথায় খোদিত করা 'কাফে' শব্দটা তার পড়বার প্রয়োজন হল না। নিজের চোখ দুটোকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনের লাজুক ভাব জয় করে সে কাফের মধ্যে প্রবেশ করল একসময়। ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দীর্ঘ একখানা ঘর। ছাদ প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে। সেদিন সব কিছু যেন তার কাছে যাদু বলে মনে হচ্ছিল।

দু' জায়গায় বিলিয়ার্ড খেলা চলছে ঘরের মধ্যে। পরিচারকরা খেলার পয়েণ্ট হাঁকছে। টেবিল ঘিরে খেলোয়াড়রা ছুটোছুটি করছে। ওদের চারধারে অজস্র দর্শক। তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলি। সকলের মুখ থেকেই ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নীলচে ধোঁয়ার মেঘ সবাইকে ঘিরে রেখেছে। লোকগুলোর বিশাল দেহ, গোলাকার কাঁধ, ভারি পদক্ষেপে চলন, মোটা জুলপি আর পরনে লম্বা ঝুল ফ্রক-কোট। এ সবই জুলিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রাচীন ভেসনতিও বংশের এই সব কুমাররা না চিৎকার করে কখনো কথা বলতে পারে না। তাদের সকলেরই যেন লড়াই করার ভঙ্গি। জুলিয়ান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছিল এবং বিশাল, মহান আর আড়ম্বরপূর্ণ রাজধানী বেসানকনের কল্পনা করছিল। ওই সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলার সাহস তার মনে হল না, যে সব পরিচারকরা পয়েণ্ট হাঁকছিল তাদের এক কাপ কফি এনে দিতে বলতেও পারল না।

এই মান্যগণ্য সুদর্শন গ্রাম্য তরুণকে বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক মদ-পরিবেশনকারিণী তরুণীর খুব ভাল লাগল। সে ওখানে দাঁড়িয়ে তরুণ রাজার সাদা প্লাষ্টারে তৈরী মূর্তিটা দেখছিল। দীর্ঘকায়া

ফরাসী তরুণীর সুঠাম দেহ-বল্লরী। এই কাফের সুনাম অনুযায়ী বড় সুবিন্যস্ত পোশাক তার পরনে। বার দুয়েক তাকে 'হাঁ, মহাশয় ?' 'হাঁ, মহাশয় ?' বলে এমন মৃদুকণ্ঠে আহ্বান জানাল যা' একমাত্র জুলিয়ানের কানে গেল। জুলিয়ানের দৃষ্টি দুটি বিশাল, নীল সরল চোখের সাথে মিলিত হল এবং বুঝতে পারল যে, তাকেই আহ্বান করা হচ্ছে।

সে ধীর পদক্ষেপে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। যেন সে শত্রুর বিরুদ্ধে সমতালে পা ফেলে যাচ্ছে···এই প্রচেষ্টায় তার বগল থেকে পুঁটলিটা গেল পড়ে। এই সুন্দরী তরুণীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জুলিয়ান মনে সাহস সঞ্চয় করল। মন থেকে লাজুক-ভাব ঝেড়ে ফেলল। ভাবল, আমি নির্ঘাৎ সত্য বলব।

—'মাদাম, জীবনে এই প্রথম এইমাত্র আমি বেসানকন শহরে এলাম। কিছু খাবার এবং এক কাপ কফি আমার চাই। অবশ্য তার জন্য আমি দাম দেব।'

পরিচারিকা মৃদু হাসল এবং লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল। এই সুদর্শন তরুণকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে খেলোয়াড়রা দেখছে এবং তরল রসিকতা করছে ···তরুণীর খুব ভয় হল। হয় ত এই তরুণ ভয়ে এরপর এই কাফেতে আর কখনো আসবে না।

—'এখানে এই আমার কাছে বস!' তরুণী তাকে বলল। মেহগনি কাঠের তৈরী কাউন্টারের আড়ালে প্রায়-অদৃশ্য একখানা শ্বেত-পাথরের টেবিল তাকে দেখিয়ে দিল।

নিজের অপূর্ব দেহসুষমা দেখাবার জন্যে পরিচারিকা কাউন্টারে ভর দিয়ে ঝুঁকল। জুলিয়ান তার সৌন্দর্যের তারিফ করল। তার ধারণা নতুন দিকে মোড় নিল। সুন্দরী পরিচারিকা তার টেবিলে একটা কাপ, চিনির পাত্র এবং কিছু খাবার রাখল। একজন পরিচারককে কফি ঢেলে দেওয়ার কথাটা বলতে সে ইচ্ছে করে দেরী করতে লাগল, কেননা পরিচারক এলেই জুলিয়ানের সাথে তার আলাপ বন্ধ হয়ে যাবে।

জুলিয়ানের মন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে যে অনুপম সৌন্দর্যের স্মৃতি তার মনকে উতলা করে তুলছিল, সেই সৌন্দর্যের সাথে সে এই যুবতী-দেহের সৌন্দর্যের তুলনা করছিল। এই যে যৌন-লালসার ভাবনা, যা' তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা' তার লাজুক ভাবকে দূর করল। সুন্দরী যুবতী ক্ষণেকের জন্য সময় পেল। জুলিয়ানের দৃষ্টির অর্থ সে বুঝতে পারল।

—'তামাকের ধোঁয়ায় তুমি কাসছ! কাল আটটা বাজার আগে এখানে এসে প্রাতরাশ খেও। সে সময় আমি প্রায় একা থাকি।'

লাজুক লাজুক হাসি হেসে জুলিয়ান জানতে চাইল—'তোমার নাম কি ?'

—'আমান্দা বিনেত্।'

—'দেখ, এখন থেকে ঘণ্টাখানেক পরে তোমাকে যদি এমনি বড় একটা

প্যাকেট পাঠাই, রাখবে ?'

সুন্দরী আমানদা ক্ষণেক ভাবল।

—'আমার উপর নজর থাকে। তুমি যা' বলছ তাতে আমি বিপদে পড়তে পারি। তবে আমি একখানা কার্ডে আমার ঠিকানা লিখে দেব, তুমি তোমার প্যাকেটে আটকে দিতে পার। পাঠাতে ভয় পেও না।'

এবার যুবক বলে উঠল—'আমার নাম জুলিয়ান সোরেল। বেসানকন শহরে আমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব নেই।'

বেশ খুশি খুশি ভাব যুবতীর, বলল—'আহা! বুঝেছি। তুমি আইন পড়তে এসেছ।'

জুলিয়ান জবাব দিল—'হায়, না! আমি গীর্জার বিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি।'

আমানদার মনে ভয়ানক হতাশা দেখা দিল। সে একজন পরিচারককে ডাকল...এখন এ কাজ করার সাহস তার হয়েছে। তার দিকে না তাকিয়ে পরিচারক তার পেয়ালায় কফি ঢেলে দিল।

আমানদা কাউন্টারে পয়সা গুণে নিচ্ছিল। তার সাথে সাহস করে কথা বলার জন্য জুলিয়ান এখন গর্বিত। ওধারে বিলিয়ার্ড টেবিলে তখন ঝগড়া বেধেছে। খেলোয়াড়রা মিথ্যা বলার জন্যে পরস্পরকে দোষ দিচ্ছে। ওদের চেঁচামেচিতে ঘরের মধ্যে একটা সোরগোল বাধতে দেখে জুলিয়ান অবাক হল। আমানদা যেন স্বপ্নে আচ্ছন্ন...নতমুখী।

সহসা খুব সাহস দেখিয়ে জুলিয়ান তাকে বলল—'সুন্দরী, তুমি যদি চাও ত বলব যে, আমি তোমার ভাই।'

এই সামান্য কর্তৃত্বের ভাব দেখে আমানদা ভারি খুশি হ'ল। ভাবল, 'ও ত কেবল সম্পর্কহীন একটি মানুষ নয়। ওর দিকে নজর না তুলে তাড়াতাড়ি বলল —'দিজনের কাছে জেনলিস গ্রামে আমাদের বাড়ী। বলো, তোমারও বাড়ী জেনলিসে। তুমি আমার মায়ের সম্পর্কে ভাই।'

—'বলতে ভুলব না।'

—'গরমকালে প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা পাঁচটার সময় গীর্জার বিদ্যালয়ের যুবক ছাত্ররা এই কাফের সামনে দিয়ে যায়।'

—'যখন যাব, তুমি যদি আমায় পছন্দ করো ত হাতে এক গোছা ভায়লেট ফুল রেখ!'

আমানদা অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। তার দৃষ্টি জুলিয়ানকে আরও সাহসী করে তুলল। তাই ওর সাথে কথা বলার সময় গভীর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল—'মনে হচ্ছে, তোমাকে দারুণ ভালবেসেছি, সুন্দরী।'

যুবতী বলল—'আরও আস্তে কথা বলো।'

খুশিতে জুলিয়ান প্রেমের কবিতা আওড়াতে লাগল।

তার মনের শৌর্য-ভাব দেখে যুবতীর মুখমণ্ডলে খুশি খুশি ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তা' ক্ষণিকের জন্য। সহসা ফরাসী যুবতী নাগরিকার মুখে শীতল-ভাব ফুটে উঠল। ঠিক তখনি তার আর একজন প্রেমিক কাফের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

সে শিস্ দিতে দিতে কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে এল, তাকাল জুলিয়ানের দিকে। এবং জুলিয়ানের মনে হল হয় ত এবার তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামতে হবে। বিবর্ণ হল তার মুখ। কফির পেয়ালা সে হাত দিয়ে সরিয়ে রাখল। বিশ্বাসে দৃঢ় করল নিজেকে। এবং খুব মন দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর আচরণ দেখতে লাগল। লোকটি যখন নিজেই মাথা নুইয়ে গ্লাসে ব্রাণ্ডি ঢালছিল তখন আমানদা জুলিয়ানকে দৃষ্টি নামাতে ইঙ্গিত করল। তার ইঙ্গিতে সাড়া দিল জুলিয়ান, যেখানে বসেছিল ঠিক সেখানেই মাথা নুইয়ে বিবর্ণ ও কঠিন মুখে মিনিট দুয়েক থেকে কি ঘটতে চলেছে তা' ভাবতে লাগল, এই মুহূর্তে তাকে খাসা দেখাচ্ছিল।

জুলিয়ানের দৃষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে বিস্মিত করেছিল। এক চুমুকে গ্লাসের সবটা মদ নিঃশেষ করল, আমানদার সাথে দু'চারটে কথা বলল, বিশাল ঝুল কোটের দু'পকেটে হাত ভরে দিল এবং বারেকের জন্যে জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে শিস্ দিতে দিতে বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে সরে গেল।

বৃথাই তার মিতব্যয়ী মন ভাবছিল, বেসানকন শহরে পা দেওয়ার সাথে সাথে যদি তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামতে হয় তবে ত গীর্জায় চরিত্র-গঠনের সম্ভাবনা নষ্ট হল। কিন্তু সে পরক্ষণেই ভাবল, কি এসে যাবে তাতে? কেউ বলতে পারবে না যে, আমি অপরের ঔদ্ধত্য হজম করেছি।

আমানদা তার সাহসের তারিফ করল। তার সাদাসিধে চালচলনের উপর এ ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য ওই ঝুল-কোট-পরা যুবকের চেয়ে জুলিয়ানকে তার বেশী পছন্দ হল। যেন রাজপথের কাউকে সে দেখছে এমনি একটা ভাব দেখিয়ে সে উঠে এল এবং জুলিয়ানও বিলিয়ার্ড টেবিলের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল।

—'সাবধান! এই ভদ্রলোকের সাথে টক্কর লড়তে যেও না। ও আমার ভগ্নীপতি।'

—'আমার তাতে কি? সে আমাকে চোখ রাঙিয়েছে।'

—'তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও? ও তোমাকে চোখ রাঙিয়েছে তাও ঠিক, হয়ত তোমার সাথে এসে ও কথাও বলবে। ওকে বলেছি তুমি আমার মায়ের দিকে আত্মীয়। সদ্য জেনলিস থেকে এসেছ। ও ফরাসী গ্রামের বাসিন্দা…বারগাণ্ডির পথে দোল শহরের ওপাশে কখনও যায় নি। কাজেই বলবে যে, ওকে তোমার খুব পছন্দ আর কোন কিছুতে ভয় পাবে না।'

জুলিয়ানের মনে তখনও দ্বিধা। মদ পরিবেশনকারিণী তখনও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলছিল। যুবতী তাড়াতাড়ি বলল—'দেখ, ও তোমায় ঠিকই চোখ রাঙিয়েছিল। তবে ও আমায় বলতে চাইছিল, এই লোকটা আবার কে।

লোকটা সকলের সাথেই এমনি ব্যবহার করে। ও তোমায় অপমান করে নি।'

জুলিয়ান যুবতীর পাতানো ভগ্নীপতিকে দেখল। দূরের টেবিলে খেলার জন্যে লোকটা তখন একটা টিকিট কিনল। জুলিয়ান শুনতে পেল লোকটা ভীষণ কণ্ঠে বলছে—'এই এবার আমার খেলার পালা।' তারপর আমানদা-কে ঠেলে সরিয়ে সে খেলার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। আমানদা জুলিয়ানের হাত চেপে ধরে বলল—'এস, আগে আমার দাম মিটিয়ে দাও।'

তখন জুলিয়ান ভাবল, যুবতী ঠিক করেছে। ভাবছে হয় ত আমি ওর টাকা না দিয়ে পালাব। আমানদাও খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তার সারা মুখ লালচে। ধীরে ধীরে সে জুলিয়ানের খুচরো পয়সা ফেরৎ দিল। মৃদুকণ্ঠে বলল—'দেখ, এখখনি তুমি এখান থেকে সরে পড় যেন আমি তোমায় পছন্দ করি না। কিন্তু আসলে আমি তোমায় খুব ভালবাসি।'

জুলিয়ান খুব ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে আওড়াল, ওই বর্বর লোকটার সোজাসুজি মুখোমুখি হওয়া কি তার কর্তব্য নয়? এই অনিশ্চিত ভাবের জন্য সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, কাফের সামনে পরিখার ধারে বেড়াতে লাগল। দেখছিল লোকটা বাইরে বেরিয়ে আসে কি না। কিন্তু সে এল না কাজেই জুলিয়ান চলে গেল।

বেসানকন শহরে মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এসেছে জুলিয়ান, কিন্তু এর মধ্যে বেশ সংশয়ের মধ্যে সে পড়ে গেছে। দেহে বাতের ব্যথা থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর বৃদ্ধ শল্য চিকিৎসক তাকে অসিযুদ্ধের নিয়ম কানুন শিখিয়েছিলেন। রাগ নিরসনের জন্যে জুলিয়ান সেই পারদর্শিতা ব্যবহার করবে। তবে রাগ দেখাবার জন্যে সে তার মুখে কয়েকটা ঘুষি মারতে চায় কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিশ্চয় তাকে মারধোর করে ফেলে রেখে যাবে।

আমার মতন একজন হতভাগ্য শয়তান, যার পৃষ্ঠপোষকও নেই, অর্থও নেই, তার কাছে গীর্জার বিদ্যালয় এবং জেলখানার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। কোনও পান্থশালায় আমার এই সাধারণ পোশাক ছেড়ে রেখে আমি আমার ভাল পোশাকটা পরে নেব। তারপর বিদ্যালয় থেকে যদি ঘণ্টা কয়েকের জন্য বেরিয়ে আসতে পারি তবে আবার আমানদার সাথে দেখা করব। এই মতলবটা জুলিয়ানের ভাল লাগল। কিন্তু অনেক পান্থশালা চোখে পড়লেও তার ভিতরে ঢোকবার সাহস হল না জুলিয়ানের।

অবশেষে দ্বিতীয়বার হোটেল এ্যামবাসাডারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হোটেলের দরজায় একজন স্থূলাঙ্গিনী এবং সুদর্শনা মহিলার সাথে জুলিয়ানের চোখাচোখি হল।. বয়স হলেও মহিলার অঙ্গ থেকে যৌবন এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। মুখে হাসি-খুশি ভাব। জুলিয়ান তার কাছে গিয়ে তার কাহিনী বলল।

হোটেলের ল্যাণ্ডলেডি বলল—'বেশ ত যাজক-মশাই, আমি তোমার পোশাক রেখে দেব এমন কি ঝেড়ে পরিষ্কারও করব। দামী পোশাক আজকালকার দিনে

না পরিষ্কার করে রেখে দেওয়া ঠিক নয়। সে একটা চাবি নিয়ে নিজেই জুলিয়ানকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিল। এবং রেখে-যাওয়া পোশাকগুলোর উপর নাম লিখে রাখতে বলল।

খানিক পরেই পোশাক পরে সে যখন রান্নাঘরে নেমে এল তখন স্থূলাঙ্গিনী বলল—'তোমাকে আশীর্বাদ করছি। খাসা দেখাচ্ছে তোমাকে মঁসিয়ে সোরেল। তোমার কাছ থেকে মাত্র বিশ সাউ খরচ নেব যদিও অপরের কাছ থেকে পঞ্চাশ সাউ নিয়ে থাকি। তোমার কাছে অত টাকাও নেই।'

জুলিয়ান বেশ গর্বের সাথে বলল—'আমার কাছে বিশ লুই আছে।'

বেশ শঙ্কিত কণ্ঠে ল্যাণ্ডলেডি বলল—'দেখ, ঈশ্বরের দোহাই। অত জোরে এসব কথা বলো না। বেসানকনে অজস্র বদমাস থাকে। ওরা জানলে অল্প সময়ের মধ্যেই সব তোমার কাছ থেকে হাত সাফাই করে নেবে। যে কোন কাফেতে কখখনো ঢুকবে না, যত বদ স্বভাবের লোক ওখানে থাকে।'

—'সত্যি?' জুলিয়ান জানতে চাইল। তার কথা শুনে সে চিন্তিত হল!

—'আমার এখানে ছাড়া আর কোথাও ঢুকবে না। মনে রেখ, মাত্র বিশ সাউ খরচ করে এখানে সঙ্গ পাবে ভাল এবং ভাল খাবার। এটা বলা দরকার বলে বলছি। এখন টেবিলে গিয়ে বস, খাবার দিচ্ছি।'

জুলিয়ান বলল—'কিছু খেতে পারব না এখন। মনে দারুণ উত্তেজনা। তোমার এখান থেকে বেরিয়ে আমি বিদ্যালয়ে যাব।'

তার দু'পকেটে খাবার বোঝাই না করে দিয়ে সৎ মহিলা তাকে ছাড়ল না। জুলিয়ান এখান থেকে বেরিয়ে হানা-বাড়ীর দিকে চলল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল ল্যাণ্ডলেডি।

২৫ : গীর্জার বিদ্যালয়

> **মাথা পিছু পঁচাশি সেন্তিমে তিন শ' ছত্রিশ জনের দুপুরের খাদ্য, আটত্রিশ সেন্তিমে তিন শ' ছত্রিশ জনের রাতের খাদ্য, তার সঙ্গে প্রত্যেকের এক পেয়ালা চকোলেট পাওয়ার অধিকার—আমার চুক্তিতে আমি এর বেশী দাবি কি করতে পারি?**
>
> **—বেসানকনের ভালেনদ**

অনেক দূর থেকেই দরজার মাথায় সোনালী···ক্রস নজরে পড়ছিল।

খুব ধীরে ধীরে ওইদিকে হাঁটছিল জুলিয়ান। তার হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে আসছিল। তাহলে এই পৃথিবীতে এখনও নরক আছে এবং এই নরক থেকে আমি কখনও ছাড়া পাব না। সে অবশেষে ঠিক করল ঘণ্টা বাজাবে।

ঘণ্টার আওয়াজ পোড়ো-বাড়ীর মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

দশটা মিনিট পার হল। কালো-পোশাক-পরা একজন বিবর্ণ মুখ মানুষ তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল। চাকরটার মুখখানা ভারি অদ্ভুত। ঠেলে-বেরিয়ে আসা তার দু'চোখের সহজ তারা দুটো গোল গোল···যেন বিড়ালের চোখ। খাড়া ভুরু-জোড়া যেন ঘোষণা করছে যে, করুণা দেখাবার ক্ষমতা তার নেই। দস্তুর মুখে পাতলা অর্ধ-বৃত্তাকার অধর জোড়া। এখনি অপরাধ করার কোনও চিহ্ন প্রকাশ না পেলেও করার সম্ভাবনার কচি মুখগুলো ভয় পায়। লোকটার দৃষ্টিতে একটা আবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল তা' হচ্ছে ঈশ্বর প্রসঙ্গে অন্য কথা যারা বলে তাদের প্রতি ঘৃণা।

জুলিয়ান ওর দিকে তাকাল। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিট্‌ছিল ভয়ে। তবু জানাল যে, বিদ্যালয়ের রেকটর মঁসিয়ে পিরার্দের সাথে সে দেখা করবে। লোকটা তাকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করল। কাঠের রেলিং দেওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওরা দু'জনে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির ধাপগুলো ঢালু। একটা দরজার মাথায় কবরে নিয়ে যাওয়ার বিশাল ক্রস্ চিহ্নটা আটকানো। অনেকক্ষণ টানাটানি করতে দরজাটা খুলল। একখানা চুনকাম করা ছোট অন্ধকার ঘরে চাকরটা তাকে নিয়ে ঢুকল। ঘরে ঝুলে ভরা দু'খানা ছবি টাঙানো। জুলিয়ান একা দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের সাহস গেল ফুরিয়ে। বুকের ঢিপ-ঢিপ বাড়ছে। কাঁদতে পারলে সে হয় ত খুশি হত। সারা বাড়ীখানায় মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা।

মিনিট পনের পার হল।

সেই কুৎসিৎ-দর্শন অনুচরটা ঘরের অন্যদিকের দরজার ধারে এসে দাঁড়াল। কথা না বলে হাত নেড়ে তাকে ডাকল। আরও একখানা বড় ঘরে ওরা ঢুকল, সে ঘরখানাতেও আলো কম। দু' একটা নোংরা ফুলদানি রয়েছে ঘরে। যাজকের ছেঁড়া পোশাক পরা একজন লোক টেবিলের ধারে বসে আছেন। এ ছাড়া ঘরে একখানা খাট, খাটে বিছানা, খান-দুয়েক চেয়ার এবং একখানা আরাম-কেদারা রয়েছে। তিনি টেবিলে বসে লিখছেন। চারধারে কাগজ-পত্র ছড়ানো।

আরও মিনিট দশেক পার হল।

তিনি তখনও লিখছেন। জুলিয়ানের ভয় ও উত্তেজনা বাড়ছিল। সৌন্দর্য-প্রিয় মনের উপর অসুন্দর এমনিভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দার্শনিকের বলা এই কথাগুলো জুলিয়ান ভাবছিল।

অবশেষে তিনি মুখ তুললেন। এবার তাঁর মুখমণ্ডল জুলিয়ানের নজরে পড়ল। ভয়ঙ্করদর্শন মুখখানা নজরে পড়তে সে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সরু মুখখানা শুকনো রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্নে ভরা, মৃতদেহের মতন বিবর্ণ কপাল! কপাল আর মুখের মাঝে ছোট ছোট দুটো কালো চোখ। আর কপালের উপর নিকষ কালো গোছা গোছা চুল। এ সব দেখলে অতি বড় সাহসীর বুকও ভয়ে দমে যায়।

তিনি অবশেষে অধির কণ্ঠে বলে উঠলেন—'কি তুমি কাছে আসবে না আসবে না?'

টলায়মান পদক্ষেপে জুলিয়ান এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে ফুট তিনেক দূরে দাঁড়াল। ভয়ে বিবর্ণ দেহ তার। মনে হচ্ছিল, এখনি সে জ্ঞান হারাবে।

—'আরও কাছে এস।' তিনি বললেন।

এবার সামনে দু'হাত বাড়িয়ে জুলিয়ান এগিয়ে গেল, যেন কোন কিছু সে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

—'তোমার নাম কি?'

—'জুলিয়ান সোরেল।'

সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি তার মুখের উপর স্থাপন করে তিনি বললেন—'বড় দেরী করে এসেছ।'

জুলিয়ান সেই দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। হাত বাড়িয়ে কিছু ধরে নিজেকে খাড়া রাখতে চাইল। পারল না। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান হারাল।

আবার যখন জুলিয়ান চোখ মেলল তখন সেই ভয়ঙ্করদর্শন লোকটি লিখছেন। অনুচরটি অদৃশ্য। আমাদের বীর-পুঙ্গব ভাবল, আমাকে সাহসী হতে হবে। মনের ভাবনা লুকোতে হবে। একটা কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটলে ওরা কি ভাববে।

এবার লোকটি লেখা ছেড়ে জুলিয়ানকে বললেন—'আমার কথার জবাব দেওয়ার মতন তোমার অবস্থা হয়েছে?'

খুব মৃদু-কণ্ঠে জুলিয়ান বলল—'হাঁ, স্যার।'

—'সৌভাগ্য।'

তিনি কাগজ-পত্র ঘেঁটে একখানা চিঠি বার করে বললেন—'দেখ, মঁসিয়ে চেলান তোমার নাম সুপারিশ করেছেন। এ অঞ্চলে তিনিই সেরা পাদরি। তাঁর চেয়ে সৎ লোক কাউকে জানি না। আর গত তিরিশ বছর ধরে তিনি আমার বন্ধু।'

জুলিয়ান আরও মৃদু-স্বরে বলল—'তাহলে আমি মঁসিয়ে পিরার্দের সাথে কথা বলছি।'

—'নিশ্চয়।'

তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের দু'পাশে মাংসপেশীগুলো আপনা থেকে তির তির করে নড়ছিল, যেন শিকারকে ছিঁড়ে ফেলার আগে বাঘ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

তিনি বললেন—'ছোট্ট চিঠি লিখেছেন মঁসিয়ে চেলান। এমন চিঠি আজ-কালকার দিনে কেউ লিখতে পারে না।'

চিঠিখানা তিনি চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন—'এই গীর্জার জুলিয়ান সোরেলকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। কুড়ি বছর আগে আমি ওকে দীক্ষা দিয়েছিলাম, ও একজন কাঠুরের ছেলে। কাঠুরে বিত্তবান, তবে ছেলেকে কিছু দেয় না। আমাদের ঈশ্বরের আঙুর-ক্ষেতে সে ভাল মজুর হবে। স্মরণ-শক্তি বা বুদ্ধি তার কম নয়। খুব চিন্তাশীল মন। কিন্তু সে কি তার পেশায় টিকে থাকতে পারবে?

তাকে একটা বৃত্তি পাইয়ে দেওয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি নিজে তাকে কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ব পড়িয়েছি। তাকে পরীক্ষা করবেন। যদি সে অকৃতকার্য হয় তবে তাকে আমার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। আপনার পরিচিত অনাথ-আশ্রমের কর্তা তাকে ছেলেদের গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি এখন শান্তিতে আছি।'

ধীরে ধীরে জুলিয়ানের মনের ভয় দূর হল।

ফাদার পিরার্দ এবার ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জুলিয়ানের জ্ঞান পরীক্ষা করলেন।

পরীক্ষা শেষে তিনি আপন-মনে বললেন, এই একটি সুস্থ, সাহসী মন। কিন্তু দেহ বড় দুর্বল।

এক সময় জুলিয়ানকে বললেন—'এমনিভাবে কি প্রায়ই মূর্চ্ছা যাও?'

শিশুর মতন লজ্জায় লাল হয়ে জুলিয়ান বলল—'এই প্রথম হলাম। ওই চাকরটার ভয়ঙ্কর মুখ দেখে ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলাম।'

ফাদার পিরার্দ হাসলেন, বললেন—'সংসারের বৃথা জাঁক-জমক আর অহঙ্কারের ফল এটা, বুঝেছ! তোমরা হাসি-খুশি মুখ দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে ওরা মিথ্যের অভিনয় করছে। সত্য খুবই সাদাসিধা। তাই এই সংসারে কি আমাদের সাদাসিধা হওয়া উচিৎ নয়? এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে তোমার চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখবে। তোমাকে যদি মঁসিয়ে চেলান না পাঠাতেন তবে এই সংসারের চালু ভাষায় কথা বলতাম, আর সেই ভাষায় তুমি অভ্যস্ত। তোমার সমস্ত খরচ চালাবার মতন একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। কিন্তু দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর ধরে একনিষ্ঠভাবে যিনি ঈশ্বরের কাজ করেছেন যদি তাঁর অনুরোধে এই বিদ্যালয়ে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা না করতে পারি তবে অন্যায় হবে।'

ফাদার পিরার্দ তাকে কোন গুপ্ত সমিতি বা ধর্ম-সভার সভ্য হতে নিষেধ করলেন।

সুখে-পালিত হওয়ার উত্তেজনায় জুলিয়ান খোলা মনে বলল—'আমি কথা দিচ্ছি।'

এই প্রথম বিদ্যালয়ের পরিচালক হাসলেন। বললেন—'ও ধরনের আবেগ এখানে প্রকাশ করা চলবে না। ওর মধ্যে সংসারী মানুষের সম্মান প্রকাশের ভাব লুকিয়ে রয়েছে। এ থেকেই যত ভ্রান্তির সৃষ্টি। এবং এরই জন্য মানুষ অপরাধ করে। তোমার সৎ-শিক্ষার জন্য তুমি আমার প্রতি অনুগত। আচ্ছা, তোমার কাছে কত টাকা আছে?'

জুলিয়ান ভাবল, এবার আমরা বাস্তবে ফিরে এলাম।

তাই সে বলল—'পঁয়তিরিশ ফ্রাঙ্ক, ফাদার।'

—'কি কাজে এই টাকা ব্যবহার করছ লিখে রাখবে। কেননা তোমাকে হিসেব দেখাতে হবে।'

তিনঘণ্টা ধরে এই সাক্ষাতের পালা চলল।

ফাদার পিরার্দ অনুচরকে বললেন—'জুলিয়ান সোরেলকে এক শ' তিন নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।'

ছোট্ট ঘর···আট ফুট চওড়া, আট ফুট লম্বা। একেবারে উঁচুতলায় ঘর। একটামাত্র জানালা···পরিখার দিকে খোলা। নজরে পড়ল বিশাল সীমাহীন প্রান্তরের বুকে সর্পিল দৌব নদী।

কি চমৎকার দৃশ্য!

সামান্য কয়েক ঘণ্টা হল সে বেসানকনে এসেছে···কিন্তু পরিপূর্ণ ক্লান্ত তার দেহ।

জানালার ধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে জুলিয়ান বসল। এবং অচিরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল···কিন্তু তার কানে গেল না। সবাই তার কথা ভুলে গেল।

পরদিন। প্রথম রোদ ঢুকল ঘরে। ঘুম ভাঙতে জুলিয়ান দেখল, সে মেঝেতে পড়ে আছে।

২৬ : সংসার অথবা ধনীদের যা' অভাব

এ সংসারে আমি একা, কেউ আমাকে চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে না। যাদের জীবনে সফল হতে দেখছি তারা সবাই উদ্ধত আর কঠিন-হৃদয়, কিন্তু ও-ভাব ত আমার মধ্যে আসছে না। যেহেতু আমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে করুণা রয়েছে তাই তারা আমায় ঘৃণা করে। আহা! মানুষকে এখন শিলীভূত-হৃদয় দেখে হয় ভুখায় না হয় দুঃখে আমার মৃত্যু হবে।

—ইয়ং

সে তাড়াতাড়ি পোশাক ঝেড়ে নিয়ে নীচে নেমে এল। তার দেরীর জন্ত একজন সহকারী শিক্ষক খুব ধমক দিলেন। কোনও রকম ছুতো না দেখিয়ে সে বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত দু'খানা রেখে বলল—'ফাদার, আমি অপরাধ করেছি, তাই আমার অপরাধ স্বীকার করছি।'

এই প্রথম আবির্ভাব দারুণ সফলতা লাভ করল। বেশী-জান্তা ছেলেগুলো দেখল যে, এমন একটা লোকের সাথে তাদের কাজ করতে হবে যে তার পেশার চেয়ে বেশী জানে। জুলিয়ান সকলের কাছে কৌতূহলের পাত্র হলেও তার নীরবতা এবং গম্ভীরতার শেষ হল না। একটা আচরণ-নীতি সে ঠিক করত তাতে এই তিন শ' কুড়িটা ছেলে তার শত্রু···সবচেয়ে শত্রু হচ্ছে ফাদার পিরার্দ।

কয়েক দিন পরে জুলিয়ানকে তার পাপ স্বীকারের কথা শোনবার জন্তে একজন পুরোহিত পছন্দ করতে হল এবং তার হাতে নামের একটা তালিকাও দেওয়া

হল। হায় ঈশ্বর! ওরা ভেবেছে কি আমাকে? সে ভাবতে লাগল। ওরা কি ভেবেছে কি থেকে কি হয় আমি বুঝি না? এবং সে ফাদার পিরার্দকে পছন্দ করল।

যদিও তার ধারণা ছিল না, তবু এটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ের একজন কিশোর ছাত্র প্রথম দিন থেকেই জুলিয়ানের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সে জানাল যে, সহকারী পরিচালক মঁসিয়ে কাস্তনেদকে পছন্দ করলে সেটা জুলিয়ানের পক্ষে মঙ্গলের হত।

তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিশোর ছাত্রটি বলল—'ফাদার কাস্তনেদ হচ্ছেন ফাদার পিরার্দের শত্রু। তাঁকে সবাই জানসেন পন্থী বলে সন্দেহ করে।'

কাজেই প্রথম ক্ষণ থেকেই আমাদের বীর-পুঙ্গব ভুল পথে পা বাড়াতে লাগল। অথচ সে খুবই সাবধানী। কল্পনাপ্রবণ মানুষের মতন নিজের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তার ধারণা যে, ভণ্ডামিতে সে দারুণ দক্ষ। এটাই তার একমাত্র অস্ত্র। শত্রুদের চোখের সামনেই এই বিদ্যে জাহির করেই তাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ছিল স্তরভেদ। ন' দশ জন ছেলেকে সাধুর মতন মনে করা হত, তারা সেইভাবে আলাদা জীবন যাপন করত। শ'খানেক ছাত্রকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। খাটতে খাটতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত, তাদের পড়াশুনার দিকে কারো নজর ছিল না। আর অত্যন্ত মেধাবী হিসাবে জন দুই তিন ছাত্রের উপর সকলের নজর থাকত। শ্যাজেল ছিল এমনি ধরনের এক মেধাবী ছাত্র। কিন্তু জুলিয়ান যেমন তাদের অপছন্দ করত, তেমনি তারাও তাকে দেখতে পারত না। অবশিষ্ট ছাত্ররা ছিল নোঙরা আর জঘন্য··· তারা ল্যাটিন পড়লেও তার অর্থ বুঝত না। তাদের বেশীর ভাগ চাষীর ছেলে। প্রথম দিন থেকেই এটা বুঝতে পেরেছিল জুলিয়ান তাই সে দ্রুত পড়াশুনায় উন্নতি করার দিকে নজর দিল। অনেক কাজ করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন মেধা। নেপোলিয়নের অধীনে আমি নির্ঘাৎ শল্য-চিকিৎসক হতাম। আর এই সব গ্রাম্য পাদরিদের মধ্যে আমি হব প্রধান পুরোহিত। .

এই হতভাগা শয়তানরা এখানে আসার আগে পর্যন্ত ছোটবেলা কেবল টক দুধ আর পোড়া পাঁউরুটি খেয়ে মানুষ হয়েছে। বছরে দু'তিন দিনের বেশী মাংস তাদের কপালে জোটে নি। কুঁড়ে ঘরে থেকেছে। রোমান সৈনিকদের মতন লড়াইয়ের ময়দান তাদের কাছে বিশ্রামের জায়গা···তাই এই চাষীর ছেলেরা বিদ্যালয়ের জীবনে দেখেছে আনন্দের অবসর।

জুলিয়ান তাই এই সব মুখে পেট-পুরে খাওয়ার পর দৈহিক ক্ষুধার অস্তিত্ব দেখতে পেল, পেটের ক্ষুধা মেটার পরই দৈহিক ক্ষুধার তাড়না স্বাভাবিক। এদের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। কিন্তু যে-কথা জুলিয়ান জানত না এবং কেউ তাকে বলেও দেয় নি যে, এরই মধ্যে থেকে তাকে ধর্মতত্ত্ব এবং গীর্জার ইতিহাস আয়ত্ব

করতে হবে…আর ছাত্রদের মুখে ছড়িয়ে রয়েছে বৃথা গৌরবের ভাবটুকু এই শিক্ষা লাভের জন্য।

মাঝে মাঝে জুলিয়ান ভাবতে লাগল…তবে কি সবাই আমাকে ভুলে গেল ?

সে জানত না যে, দিজনে ডাকঘরের ছাপ-মারা খান-কয়েক চিঠি ফাদার পিরার্দ আগুনে ফেলে দিয়েছেন। আবেগময় ভাষায় সে-সব চিঠিতে প্রেম নিবেদন করা হয়েছে। প্রেমের আকুতির সাথে মিশে রয়েছে বিষণ্ণতার ছোঁওয়া। চিঠি পড়ে ফাদার পিরার্দ ভেবেছেন…যাক, এই ছেলেটা অন্তত নাস্তিক রমণীকে ভালবাসে নি।

একদিন ফাদার পিরার্দ একখানা চিঠি খুললেন…চোখের জলে চিঠির অর্ধেক লেখা মুছে গেছে। এই চিঠিতে চির বিদায়ের আকুতি জানানো হয়েছে :

অবশেষে ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন, আমার পাপের স্রষ্টাকে আর আমি ঘৃণা করব না…এই পৃথিবীতে আমার যা' কিছু প্রিয় সবই সে লাভ করবে …তবে পাপকে আমি ঘৃণা করব। আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার প্রিয়তমকে পরিত্যাগ করছি। এই মুক্তির জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী এবং তুমিও ত তাঁকে ভালবাস…অবশেষে তিনিই জয়ী হলেন। মায়ের অপরাধের জন্য আর কোনও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর তাদের উপর প্রতিহিংসা নিতে পারবেন না। বিদায় জুলিয়ান…মানুষের সঙ্গে তুমি ন্যায় আচরণ করো…।

এই চিঠির শেষাংশ একেবারে ঝাপসা। দিজনের একটা ঠিকানা লেখা… আশা, হয়ত জুলিয়ান কোনও দিন চিঠির জবাব দেবে না এবং দিলেও সেই চিঠি পড়ে ঈশ্বরভক্ত রমণী আর লজ্জায় লাল হবে না।

মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য মাথা পিছু তিরাশী সেন্টিমের খাদ্য সরবরাহ করা হত বিদ্যালয়ে…এই সামান্য আর জঘন্য খাবার খেয়ে এবং মানসিক বিষণ্ণতার ফলে জুলিয়ানের দেহ ভেঙ্গে পড়ছিল দিন দিন। এমন সময় একদিন ফৌকে তার ঘরে এসে হাজির হল।

বলল—'বৎস! অবশেষে তোমার ঘরে এসে ঢুকতে পারলাম। দেখ, তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে বেসানকনে এর আগে পাঁচবার এসেছি। আর প্রতিবার দেখেছি দরজা বন্ধ। একজনকে বিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড় করিয়ে এসেছি। আচ্ছা, তুমি একদিনও বাইরে বেরোও না কেন ?'

—'নিজের মনের জোর পরীক্ষা করছি।'

—'তুমি বেশ বদলে গেছ। যাক, দেখা ত হল। আমাকে দু'টো রূপোর টাকা ওদের ঘুষ দিতে হয়েছে। তবে বোকামি করেছি, আগেই টাকাটা দিলে ভাল হত।'

সীমাহীন সময় ধরে দুই বন্ধুর মধ্যে গল্প চলল। জুলিয়ানের মুখের রঙ বদলাল যখন ফৌকে বলল—'যাক গে, কথাটা শুনেছ ? তোমার ছাত্রদের মা ধর্মে মন দিয়েছে।' সে খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলল এবং তার ফলে জুলিয়ানের

লালায়িত মনে যেন কামনার আগুন ধরে গেল। বক্তা বুঝি তাকে কথার আঘাত হানছে।

ফৌকে তখন বলছিল—'হাঁ হে, ঠিক! সবাই বলাবলি করছে, সে প্রায়ই তীর্থ করতে যায় এখানে ওখানে। ওই যে মঁসিয়ে মাসলন যে নাকি ফাদার চেলানের উপর নজর রাখে তার সাথে মহিলা দেখা করে না। সে দিজনে কিংবা বেসানকনে যায় অপরাধ স্বীকার করতে।'

জুলিয়ানের কেশ-মূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। বলল—'সে বেসানকনেও আসে!'

ফৌকে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বলল—'হাঁ, প্রায়ই আসে।'

—'সংবিধান গ্রন্থের কোনও কপি তোমার কাছে আছে?'

ফৌকে জানতে চাইল—'কি বলছ?'

জুলিয়ান জবাব দিল—'বলছি তোমার কাছে কোন সংবিধান গ্রন্থের কপি আছে কিনা···এখানে বইখানার দাম নেয় তিরিশ সাউ।'

—'কি! এখানেও তুমি লিবারেল! এই বিদ্যালয়ের মধ্যেও! হায় রে ফরাসী দেশ!' ফাদার মাসলনের ভণ্ডামী-মাখা, মধু-ঝরা কণ্ঠের অনুকরণ করে ফৌকে বলল।

এই সাক্ষাৎকার তার মনের উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত, কিন্তু ভেরিয়ার-আগত এই তরুণ বিদ্যার্থী আবার ভুল পথে পা বাড়াল। জুলিয়ানের চরিত্রই এমনি। নিজেকেই সে উপহাস করল। জীবনে সব কাজই জুলিয়ান বেশ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করে, তবে কাজের খুঁটিনাটি দিকটায় একেবারে নজর দেয় না। অথচ বিদ্যালয়ের বিচক্ষণতম ব্যক্তিরা এই খুঁটিনাটির দিকেই নজর রাখে। তার সহপাঠীরা এর মধ্যেই তাকে একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ বলে মনে করছে। কিন্তু একগাদা বাজে কাজে সে যেন ফাঁপরে পড়ে গেল।

তার সহপাঠীদের ঘরে দু'বেলা পেট পুরে খাওয়া জুটত না। তাদের পিতারা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখতে অভ্যস্ত যে, খাওয়ার জন্য একটুকরো পাউরুটি বা আলুও নেই। শীতের অসহ্য রাত তারা অনাহারে কাটায়। এই বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেরা তাই অবাক হয়ে যায় যখন কাউকে ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে এবং ঝকঝকে পোশাক পরতে দেখে। তারাও তাই এই পেশা গ্রহণ করেছে সুখে থাকবে বলে··· ভাল খাওয়া-দাওয়া করবে আর শীতের উপযুক্ত পোশাক পরতে পাবে।

একদিন জুলিয়ান শুনতে পেল এক তরুণ ছাত্র বন্ধুকে বলছে—'পোপ পঞ্চম সিক্সটাস একজন শূকর-পালক ছিলেন, তবে আমি কেন পোপ হতে পারব না?'

তার বন্ধু জবাব দিল—'একমাত্র ইতালিবাসীরাই পোপ হতে পারে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রধান পুরোহিত বা বিশপ হতে পারে। শ্যালনের বিশপ ত ছেলেদের নৌকোয় মদ বিক্রেতার ছেলে ছিলেন। আমার বাবাও তাই।

সেদিন ধর্মতত্ত্বের ক্লাস হচ্ছিল। জুলিয়ান ক্লাসে পড়ছিল। সহসা মঁসিয়ে পিরার্দ তাকে ডেকে পাঠালেন। ক্লাসের আবহাওয়া থেকে মুক্তি লাভ করে যুবক জুলিয়ান খুশি হল।

এই বিদ্যালয়ে প্রথম দিন রেকটর তাকে যেমন ভীতিজনক অবস্থার মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি অবস্থা আজও করলেন। জুলিয়ান সেদিনকার মতন ভয় পেল।

—'এই খেলবার তাসে কি লেখা আছে বল,' রেকটর বললেন জুলিয়ানকে। এবং এমনভাবে তার দিকে তাকালেন যে, মনে হল সে ভয়ে মাটিতে ঢুকে যাবে।

জুলিয়ান কথাগুলো পড়ল···আমান্দা বিনেত, কাফে দ্য লা জিরেফে আটটার আগে। বলব জেনলিস থেকে এসেছে, আমার মাসতুতো ভাই। এবার বিপদের গভীরতা সে বুঝতে পারল। ফাদার কাস্তনিদের গুপ্ত পুলিশ তার বাক্স থেকে এই তাস চুরি করেছে।

তাঁর ভয়ঙ্কর চোখ জোড়ার দিকে তাকাতে পারছিল না জুলিয়ান···তাই তাঁর কপালের উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করে সে বলতে লাগল—'যেদিন এখানে এসেছিলাম সেদিন ভয়ে কাঁপছিলাম। মঁসিয়ে চেলান বলেছিলেন যে, এখানে নানা ধরনের গালগল্প আর বদমাইসি চলে। সহপাঠীরা একজন আর একজনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, একাজে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। জীবনের আসল রূপ দেখবে তরুণ যাজকরা। সংসার এবং জাঁকজমকের দিকে তাদের মন বিরূপ হবে।'

ফাদার পিরার্দ রেগেমেগে বললেন—'ক্ষুদে বদমাস, তোর ভাষার কেরামতি এবার আমার উপর দেখাচ্ছিস!'

জুলিয়ান ঠাণ্ডা গলায় বলল—'ভেরিয়ারে যখন ছিলাম আমার ভা'য়েরা হিংসের জ্বালায় আমায় ধরে মারত।'

ফাদার পিরার্দ নিজেকে হারিয়ে ফেলে বললেন—'ঠিক জবাব দে।'

একটুও ভয় না পেয়ে জুলিয়ান তার কাহিনী বলতে লাগল—'দুপুর বেলায় বেসানকনে পৌঁছেছিলাম। দারুণ ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই একটা কাফেতে ঢুকেছিলাম। জায়গাটা বড় নোংরা, ঘৃণায় মন ভরে গিয়েছিল। কিন্তু ভেবেছিলাম, সরাইখানার চেয়ে এখানে খাবারের দাম কম পড়বে। বোধ হয় কাফের মালিক এক মহিলা আমাকে অনভিজ্ঞ দেখে অনুকম্পা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, বেসানকন শহর বদমাইসের আড্ডাখানা। তোমার জন্যে ভয় হচ্ছে। বিপদে পড়লে আমাকে বিশ্বাস করো, সাহায্য করব। আটটার আগে আমার কাছে এস। দারোয়ানরা বাধা দিলে বলো জেনলিস থেকে আসছ, আমার মাসতুতো ভাই··· ।'

আর নিজের জায়গায় বসে থাকতে পারলেন না ফাদার পিরার্দ। ঘরময় পায়চারি করতে করতে বললেন—'তোমার এই গাল-গল্পের সত্যতা পরে খুঁজব।

এখন নিজের ঘরে যাও।'

জুলিয়ানকে ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যাজক দরজায় তালা দিয়ে দিলেন।

এবার তোরঙ্গ হাতড়ে দেখতে লাগল জুলিয়ান। ওর নীচে এই মারাত্মক তাসখানা লুকোন ছিল। তোরঙ্গ থেকে কিছুই খোয়া যায় নি, তবে জিনিষগুলো ওলোট পালোট করা অথচ চাবি ত তার কাছেই থাকে। জুলিয়ান এবার ভাবতে লাগল। নিজের বোকামি এবার ধরা পড়ল। মাঝে মাঝে সে ফাদার কাস্তনে-দের কাছে ছুটি নিয়ে পোশাক বদলে বাইরে সুন্দরী আমানদার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছা হয় তার! ভাগ্য ভাল সে যায় নি কোন দিন। ফাদার অবশ্য খুশি হয়ে ছুটি দেন। এমনিভাবে তার কিছু খবর জোগাড় করে তার বিনিময়ে ঘুষ না পেয়ে তারা জুলিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসেছে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে রেকটর তাকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন—'দেখ, তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো নি। তবে এই ঠিকানাটা কাছে রাখাও অন্যায়, তা তুমি অস্বীকার করতে পার না। দশ বছরের মধ্যে এটা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।'

২৭: জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা

> আধুনিক যুগ, কল্যাণময় ঈশ্বর! এটা প্রভুর সিন্দুক—যে লোক তা' স্পর্শ করবে সে দুঃখে পড়বে!
>
> —দিদেরো

এবার জুলিয়ানের এ সময়কার জীবনযাত্রার একটা ছোটখাট বর্ণনা দেওয়া যাক।

এখানে যা' বলা হচ্ছে তার চেয়ে এই বিদ্যালয়ের জীবন-চিত্র অনেক বেশী গভীর কালো। এখানকার ভয়ঙ্করতা সব রকম আনন্দের সম্ভাবনাকে সমূলে নষ্ট করে দেয়। এখানে ভণ্ডের আচরণ করতে গিয়ে জুলিয়ান অসফল হয়েছে। ফলে এই অসফলতার জন্য তাকে বিরক্তি ও নৈরাশ্যেভরা মুহূর্ত কাটাতে হচ্ছে···তার এই পেশার অসফলতা তার কাছে আরও পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। বাইরে থেকে সামান্য সাহায্য লাভ করলে তার জীবনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হত, সে সব রকম বাধা অতিক্রম করার মতন শক্তি লাভ করত ··কিন্তু না, তার জীবন সঙ্গীহীন। এ যেন অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে দিকভ্রান্ত একখানা জাহাজ।

মনে মনে সে ভাবে, জীবনে আমাকে যদি সফল হতে হয় তবে এই অসদ সংসর্গেই থাকতে হবে। এই পেটুকের দল ভোজের টেবিলে পরিবেশন করা ডিম-মাখানো মাংসের টুকরো ভাজা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। আর এই ফাদার কাস্তনেদ···যা'র কাছে কোনও অপরাধই তমসালিপ্ত নয়। তারাই

ক্ষমতা দখল করে আছে…কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন, কি মূল্যের বিনিময়ে তা' করেছে!

মানুষের ইচ্ছা প্রবল!…সব জায়গায় তা' পড়া যায়!…কিন্তু এ ধরনের মানসিক বিরক্তি দূর করার পক্ষে কি যথেষ্ট প্রবল? মহান ব্যক্তির কাছে কাজ, তা' সে কাজ যত বিপদসঙ্কুল হোক, করা সহজ…তাঁরা সে কাজের মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্যের সন্ধান পান। কিন্তু আমাকে ঘিরে যে কুশ্রীতা বিরাজ করছে তা' আমি ছাড়া আর কে জানবে!

তার জীবনে এটাই হয়ে উঠল সঙ্গীন মুহূর্ত। বেসানকন শহরে অবস্থিত যে কোন সুন্দর একটা সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো তার পক্ষে সহজ হত। সে ল্যাটিন ভাষা পড়ানোর শিক্ষক হতে পারত…জীবনে তার প্রয়োজন খুবই কম! কিন্তু তাহলে জীবনে আর সে উন্নতি করতে পারবে না, ভবিষ্যতে তার কল্পনা আলোড়ন সৃষ্টি করবে না…এবং তার অর্থ তার মৃত্যু।

এবার তার বিষণ্ণ-জীবনের একটা দিনের বর্ণনা করা যাক!

এক সকালে জুলিয়ান মনে মনে আওড়াল, অন্য তরুণ চাষীর ছেলেদের চেয়ে তার জীবন ভিন্নতর। যথেষ্টবার দেখেছি, এই পার্থক্য ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। তার জীবনের সবচেয়ে বড় অসফলতার মুহূর্তে এই মহান সত্য সে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

সাধুতার পরিবেশে বাস করে এমন একটা ছাত্রের সঙ্গে ভাব করার জন্যে সে গোটা একটা সপ্তাহ ধরে চেষ্টা কর্‌ছিল। উঠোনে সেই ছাত্রটির সঙ্গে পায়চারি করতে করতে জুলিয়ান তার ক্লান্তিকর প্রলাপ শুনছিল। সহসা ঝড় উঠল, বাজের গর্জন সুরু হল। সেই সাধু-প্রতিম ছাত্রটি কঠোরভাবে তাকে ঠেলে দিয়ে বলল—'শোন, প্রত্যেকের এই সংসারে জায়গা আছে। বাজের আগুনে পুড়ে মরার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি অবিশ্বাসী, তুমি আর এক ভলতেয়ার, তাই ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করার জন্য বজ্রকে আদেশ দিয়েছেন।'

দারুণ রাগে তার দাঁতে দাঁত পিষলো। বাজের আগুনে ঝলসানো আকাশের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। তার অন্তর আর্তনাদ করে উঠল, এমন ঝড়ের মুহূর্তে যদি ঘুমোতে যাই তবে আমি আত্মহারা হয়ে যাব। ভণ্ডামির আর এক চূড়ান্ত নিদর্শন!

গীর্জার ইতিহাস সম্পর্কে ফাদার কাস্তনেদের ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। তাদের বাপ-ঠাকুরদা-কে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম এবং দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে দেখে এই সব তরুণ চাষীর ছেলেরা ভীত। তাই পাদরীদের শেখানো বুলি তারা বিশ্বাস করে যে, এই মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে প্রদত্ত শক্তি ছাড়া শাসক-সরকারের আর কোনও ক্ষমতা নেই।

তিনি বলছিলেন—'তোমাদের জীবনের পবিত্রতা এবং বাধ্যতার বিনিময়ে পোপের সস্নেহ অনুকম্পার যোগ্য হয়ে ওঠো তোমরা। হয়ে ওঠো তাঁর হাতের

যষ্টি! তাহলেই তোমরা উচ্চ আসন লাভ করতে পারবে, অর্জন করবে অমিত শক্তি। এবং সে শক্তি হবে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের অতীত। এই অজেয় পদের জন্য সরকার এক-তৃতীয়াংশ বৃত্তি দান করে এবং তোমাদের বিশ্বস্ত, শিক্ষিত উপদেশাবলীর জন্য অর্জিত হয় অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ বৃত্তি।

ক্লাস থেকে পড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় মঁসিয়ে কাস্তনেদ উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। একদল তরুণ ছাত্র তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি আবার বলতে লাগলেন—'এটা সত্যি কথা যে, গীর্জার যাজকের পদের মূল্যমান যাজকের নিজের উপযুক্ততার উপর নির্ভরশীল। এই যে আমি এখন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সেই আমি জানি যে, মালভূমির উপর পাহাড়-চূড়ায় এমন সব গীর্জা আছে যেখানকার যাজকরা শহরের যাজকদের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ বকশিশ লাভ করে। অজস্র অর্থ তারা অর্জন করে থাকে, খাসি, মোরগ, ডিম, টাটকা মাখন এবং আরও নানা রকম বস্তুর কথা নাই বা বললাম। এবং পাহাড়-চূড়ার এই যাজকের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একটাও সুখকর ভোজ-উৎসবে সে অনিমন্ত্রিত থাকে না এবং সেখানে তাকে নানা ভাবে আদর যত্ন করা হয়।'

ফাদার কাস্তনেদ চলে যেতে না যেতেই ছাত্ররা দলে দলে ভাগ হয়ে গেল। কোন দলেই জুলিয়ানের স্থান হল না। সে যেন দলের কাছে জুয়াচোর হিসাবে পরিত্যাজ্য। দলের কোন কোন ছেলেকে সে মুদ্রা-নিক্ষেপে ভাগ্য পরীক্ষা করতে দেখল। যার আন্দাজ ঠিক হচ্ছিল সে যে অচিরে বকশিশ-সমৃদ্ধ গীর্জার যাজক হবে তা' তারা ঘোষণা করছিল।

ঘটনার ইতিবৃত্তে রয়েছে: একবার এক তরুণ যাজক এক বৃদ্ধ যাজকের চাকরাণীকে একটা পোষা খরগোস বকশিশ দিয়ে সহকারী যাজকের পদ লাভ করেছিল। এবং অল্প-দিনের মধ্যে সেই যাজকের মৃত্যু হতেই যাজকের পদ দখল করেছিল। ফলে সে সুখী হয়ে উঠল। আর একজন প্রতিদিন এক বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত যাজকের খাওয়ার সময় টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে মুরগীর মাংস কেটে কেটে দিত, এবং এর জন্য সে এক বড় বন্দর-শহরের গীর্জার যাজকের পদ লাভ করেছিল। অবশ্য প্রত্যেক বৃত্তির মানুষদের মতনই তরুণ যাজকরাও ছোট-খাট ঘটনাগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে, কল্পনার রঙ চড়ায়।

জুলিয়ান ভাবল, এ সব প্রলাপ শুনতে আমাকে অভ্যস্ত হতেই হবে। তারা যখন ভোজ্য-দ্রব্য বা বিলাস-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে না তখন তারা যাজক-জগতের বাস্তব ঘটনা নিয়ে কথা বলে···বিশপের সাথে জেলা-শাসকের মনোমালিন্য অথবা মেয়রের সঙ্গে গীর্জার যাজকের বিবাদের বিষয় আলাপ করে। জুলিয়ান বুঝতে পারল যে, দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটছে। কিন্তু এই ঈশ্বর প্রথম ঈশ্বর অপেক্ষা অনেক বেশী ভীতিজনক ও শক্তিশালী···আর এই দ্বিতীয় ঈশ্বর হচ্ছেন পোপ। যখন তারা বোঝে যে, ফাদার পিরার্দ তাদের আলোচনা আড়ি

পেতে শুনছেন না তখনই তারা শ্বাস-রুদ্ধ অবস্থায় এসব কথা বলাবলি করে… যদিও পোপ ফরাসীদেশের সব জেলাশাসক এবং মেয়র নির্বাচনের ভার তাঁর নিজের হাতে রাখেন নি, সে ভার তিনি গীর্জার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফরাসীদেশের রাজার হাতে অর্পণ করেছেন।

এই সময়ে নিজের প্রতি বিশ্বাস আহরণের জন্য জুলিয়ান মঁসিয়ে দ্য মেইসত্রির 'পোপের জীবনকথা' বইখানা পড়ে ফেলল। নিশ্চয় সে তার সহপাঠীদের বিস্মিত করেছিল এবং নিজের বিপদও বাড়িয়েছিল…কেননা সহপাঠীদের নিজেদের মতবাদ গড়ে তোলার অবসর না দিয়ে সে তার নিজের ধারণা তাদের কাছে জাহির করতে সুরু করল। নিজের জীবনের মতন জুলিয়ানের ব্যাপারেও ম সিয়ে চেলান এই মারাত্মক ভুলটি করেছিলেন। নিখাদ যুক্তি মানতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত, অর্থহীন প্রলাপ শুনে তিনি তৃপ্তি পেতেন না…তাই তিনি তাকে বলতে অবহেলা করে-ছিলেন যে, যারা সামান্যতম শ্রদ্ধাও অর্জন করতে চায় তেমন মানুষের কাছে এমন স্বভাব অপরাধের সামিল। সমস্ত যথার্থ যুক্তিই অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

তাই জুলিয়ানের এই সোচ্চার ঘোষণা নূতন অপরাধ বলে ঘোষিত হল। তার সব সহপাঠীরা তার সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল এবং সে তাদের যে ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে তা' অনুভব করল…এবং শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র শব্দে তারা জুলিয়ানের নামকরণ করল—মার্টিন লুথার! কেননা ওই নাস্তিকের মতন সেও নারকীয় দর্শন আওড়ায়…এমনই অহঙ্কারী সে।

অনেক বিদ্যার্থীর দেহ গৌরবর্ণ এবং জুলিয়ানের চেয়েও সুদর্শন। কিন্তু জুলিয়ানের হাত দু'খানা বড় সাদা এবং সুতীব্র পরিচ্ছন্ন স্বভাব গোপন করতে পারে না। ভাগ্য তাকে এই যে নিরানন্দ বাড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এখানে তার স্বভাব একটা চমক সৃষ্টি করেছে ফলে অপরিচ্ছন্ন চাষীর ছেলেরা তার সম্বন্ধে কানাকানি করে, বলে তার নৈতিক বিচ্যুতি আছে।

এমনিভাবে আমাদের বীরপুঙ্গবকে বহু দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছিল।

তার একজন দুর্দান্ত সহপাঠী ত তার সাথে মারামারি করার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকত। তাই জুলিয়ান সব সময় হাতে একখানা স্টিলের কমপাস রাখত এবং সেখানা প্রয়োজনে ব্যবহার করার ভাব দেখাত। গোয়েন্দার রিপোর্টে বলা হয়েছে, কথার মতন হাবভাব প্রকাশ তত সুবিধাজনক হয় না।

২৮ : একটি শোভাযাত্রা

সমস্ত হৃদয় হল বিচলিত। এই সঙ্কীর্ণ, গথিক রাজপথগুলোর
বুকে ঈশ্বরের উপস্থিতি ঘটল, দু'পাশ সজ্জিত
হল নানা রঙের ঝালরে এবং বিশ্বস্তদের যত্নে রাজপথের বুক
ভরে গেল বালুকণায়।
—ইয়ং

জুলিয়ান বৃথাই নিজেকে বিনয়ী এবং আহাম্মক হিসাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা

করছিল, সে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারছিল না···তার স্বভাবই ভিন্নতর। তবু এখানকার সব শিক্ষক তীক্ষ্ণ মেধাবী এবং অনেকের ভিতর থেকে তাদের বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কেমন করে তারা তার বিনয়ভাব পছন্দ করতে পারছেন না? একজন ত আবার জুলিয়ানের এই নম্রতা এবং যা' কিছু বলা হয় তা' বিশ্বাস করার প্রবণতার সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেন। তিনি হচ্ছেন ফাদার শ্যাজ বারনারদ। গীর্জার করণীয় ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। গীর্জায় কেমনভাবে উপদেশাবলী বলতে হয় তা শিক্ষা দিচ্ছেন পনের বছর ধরে অথচ কোন গীর্জায় তাঁকে যাজকের পদ দেওয়া হচ্ছে না।

জুলিয়ান তাঁর ক্লাসের সেরা ছাত্র। এই সুযোগে ফাদার বারনারদ তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতালেন। ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তার হাত ধরে বারান্দায় কিছুটা পথ হাঁটেন। জুলিয়ান তাই ভাবতে থাকে, মতলব কি তাঁর? এই গীর্জায় রক্ষিত এক গাদা যাজকের পোশাক সম্পর্কে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তার সঙ্গে আলোচনা করেন। মোটা সুতোর কাজ করা যাজকের সাদা বহির্বাস আছে সতেরখানা। শব-যাত্রার পোশাকগুলোর কথা নাই বললাম। প্রেসিডেন্টের বৃদ্ধা স্ত্রী মাদাম দ্য রুবেমপ্রির হেফাজতে রয়েছে এসব। ফাদার শ্যাজ বললেন—কোন কোন উৎসবে এ সব পোশাক ব্যবহার করা হয়। শুনেছি মাদাম রুবেমপ্রির কাছে রূপোর গিল্টি করা ছ'টা সুন্দর বাতিদান আছে। বারগাণ্ডির ডিউক চার্লস দ্য বোল্ড এগুলো ইতালি থেকে কিনে এনেছিলেন···ডিউকের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন মাদামের পূর্বপুরুষ।

মাথায় ভাবনার পোকারা কিলবিল করতে লাগল জুলিয়ানের···প্রাচীনকালের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এ সব বাজে কথা বলছে কেন লোকটা? একটা নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ও কথার জাল বিস্তার করছে, কিন্তু ওর মতলব বোঝা যাচ্ছে না। অন্যদের চেয়ে ও অনেক বেশী ধূর্ত। তবে দিন পনেরোর মধ্যে ওর মতলব বোঝা যাবে। একটা আঁচ করা গেছে! এই লোকটার উচ্চাশা পনের বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা। তরবারি-চালনা শিক্ষার ক্লাসে ছিল জুলিয়ান।

ফাদার পিরার্দ তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'দেখ, আগামীকাল করপাস ডোমিনির ভোজ উৎসব। গীর্জা সাজাবার কাজে ফাদার শ্যাজ বারনারদ তোমাকে চাইছেন। যাও তাঁর কাছে। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, এই সুযোগে শহরে ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করো না।'

জবাব দিল জুলিয়ান—'জানি, আমার গোপন শত্রু আছে।'

পরদিন। খুব ভোরেই গীর্জার দিকে হাঁটতে লাগল জুলিয়ান। মাটির দিকে নজর নত। এতে সুবিধাই হল। পথ দেখা যাচ্ছে, শহরের চঞ্চল জীবনের ছবি চোখে পড়ছে। লোকেরা তাদের বাড়ীর সদর দরজায় ঝালর টাঙাচ্ছে। শোভাযাত্রার জন্যই তাদের এসব প্রস্তুতি। এতদিন সে বিদ্যালয়ে বন্দী ছিল···এখন

মনে হচ্ছে এতদিন নয় যেন একটা মুহূর্ত। সব সময় সে ভাবছে ভার্জির কথা, ভাবছে সুন্দরী আমানদা বিনেতের কথা…এই ত কাছেই কাফে, গেলে হয়ত ওর সাথে দেখা হত। খানিকটা দূর থেকেই নজরে পড়ল, ফাদার শ্যাজ বারনারদ তাঁর প্রিয় গীর্জার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সারা মুখে সপ্রতিভ উত্তেজনা। এদিন দারুণ উল্লসিত তিনি।

—'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই কষ্টকর কাজ করতে হবে। এস তার আগে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিই। আবার দশটার সময় খাবার জুটবে।'

জুলিয়ান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—'বড় উদ্বিগ্ন রয়েছি। মুহূর্তের জন্যও আমাকে একলা ছাড়বেন না। আর মনে রাখবেন, স্যার, আমি এখানে পাঁচটা বাজতে এক মিনিট আগে এসেছি।'

ফাদার শ্যাজ বললেন—'বুঝেছি। বিদ্যালয়ের ক্ষুদে বদমাসগুলোর জন্যে তুমি ভয় পেয়েছ। তুমি ত বড় বোকা, ওদের কথা ভাবছ। দুধারে কাঁটা ঝোপ আছে বলে কি পথের সৌন্দর্য কমে যায়? পথিক চলার পথে কাঁটা ঝোপ কেটে এগিয়ে যায়, আর ডালগুলো পথের ধারে পড়ে পড়ে শুকোয়। তাছাড়া বাছা, আমাদের কাজ করতে হবে, কাজ করতেই হবে।'

গীর্জা সাজাবার কাজ সত্যই খুব কঠিন। খিলানে খিলানে ঝালর টাঙানো, চাঁদোয়ার নীচে বাতিদানের ঝাড় ঝোলানো খুবই বিপজ্জনক কাজ। মই বেয়ে উপরে উঠে জুলিয়ান সব কাজ করল। দু'জন মজুর যেখানে ভয়ে উঠল না, কাঠের পাটাতন ভেঙ্গে পড়তে পারে ভেবে…নির্ভয়ে জুলিয়ান সেখানে উঠে গেল।

শেষ হল সব কাজ।

জুলিয়ান মই বেয়ে নীচে নেমে এল।

ফাদার শ্যাজ বললেন—বড় সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। মহান বিশপকে তোমার কথা বলব।'

তাদের জন্য সকাল দশটার খাবার এসে পৌঁছল।

ফাদার বললেন—'দেখ, ছোটবেলা থেকে মায়ের সঙ্গে এই গীর্জায় আসা-যাওয়া করেছি। এই বিশাল বাড়ীখানায় বলতে গেলে আমার শৈশব কেটেছে, তারপর রোবসপীয়ারের শাসনকালে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার যখন বছর আষ্টেক বয়স তখন গোপনে এই গীর্জায় প্রার্থনা সভা বসত। আর প্রার্থনার দিন থাকলে আমার কিছু খাওয়া জুটত। যাজকদের পোশাকগুলো আমার মতন আর কেউ ভাঁজ করতে পারত না। সুতোর কাজগুলো একটাও এদিক ওদিক হত না। নেপোলিয়ন আবার ধর্ম আলোচনার দিনগুলো ফিরিয়ে আনলেন। তখন এই গীর্জার সব কিছু গুছিয়ে রাখার ভার পড়ল আমার উপর। বছরে বার পাঁচেক এই গীর্জায় ধর্ম-উৎসব হয়। আমিই তখন গীর্জার থামে ঝালর টাঙাবার ব্যবস্থা করি আবার সেগুলো গুছিয়ে রাখি। কিন্তু আজকের মতন এমন সুন্দর-

ভাবে আর কখনো ওগুলো টাঙানো হয় নি।'

জুলিয়ান ভাবতে লাগল, ফাদার এবার তার নিজের অতীত কথা শোনাচ্ছে।

পবিত্র উৎসবের দিন আজ।

ঘণ্টা বাজতে লাগল।

জুলিয়ানের ইচ্ছা ছিল যাজকের বহির্বাস পরে সে শোভাযাত্রায় যোগ দেবে।

ফাদার বারনারদ বললেন—'চোরেরা রয়েছে, বাছা। ওদের কথা ত ভাব নি। গীর্জা থেকে শোভাযাত্রা চলে যাবে, কিন্তু তুমি আর আমি এখানে পাহারায় থাকব। ওই থামগুলোর নীচের দিক থেকে ঝালর যদি চুরি না যায় তবে আমাদের ভাগ্য ভাল জানবে। ওই ঝালরগুলোর নীচে ঝোলান থাকবে আসল সোনার দানা। ওগুলো মাদাম দ্য রুবেমপ্রির পূর্বপুরুষরা দান করেছেন। এতে লজ্জার কিছু নেই। তুমি উত্তরদিকটায় পাহারা দেবে আর আমি থাকব দক্ষিণ দিকে। অন্দর মহলটার উপরও তুমি নজর রাখবে, ওখানে নারী গোয়েন্দারা থাকবে।

পৌনে বারটা বাজল।

অমনি গীর্জার বিশাল ঘণ্টাটাও বাজতে লাগল। একটানা বিষণ্ণ ঘণ্টাধ্বনি।

ভিতরে ধূপের গন্ধ···শিশুরা বেদীর উপর গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাতাসে গোলাপের মিষ্টি সুবাস।

ঘণ্টার উচ্চ নিনাদে জুলিয়ানের আর কিছু মনে পড়ছিল না···সে শুধু ভাবছিল বিশজন জোয়ান ওই বিশাল ঘণ্টাটা বাজাচ্ছে। মজুরি হিসাবে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ পয়সা পাবে। জন পনের ভক্ত ওদের মজুরি দান করেছে। কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ঘণ্টাটা বাঁধা। ওর দড়িদড়া পুরনো···তাই বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। শুনেছে দু'শ বছর অন্তর ঘণ্টাটা একবার ছিঁড়ে পড়ে। কোনওক্রমে যদি ওই ঘণ্টাবাদকদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া যায় কিংবা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাতে এই গীর্জার ধনভাণ্ডারের কোন ইতর-বিশেষ হবে না।

জুলিয়ানের মন কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেল। ঘণ্টার উচ্চ নিনাদ কেমন ক্রমশঃ শূন্যে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে···আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে একের পর এক কল্পনার রাজ্যে। না, জুলিয়ান কখনও ভাল যাজক হতে পারবে না, একজন শাসক হতেও পারবে না, এমন কল্পনাপ্রবণ যার স্বভাব সে শুধু শিল্পী হওয়ার যোগ্য। এই নিরিখে জুলিয়ানের সহপাঠীরা জীবনের আসল পাঠ শিখছে। তারা বারেমের অঙ্কশাস্ত্রের সঠিকতা বুঝে নিচ্ছে। জনগণ কত পরিমাণ অর্থ বকশিশ দেবে তারই আসল পরিমাণ তারা আয়ত্ত করছে। ইচ্ছে করলে পাদরী-জীবনের এ বাস্তব দিকটা জুলিয়ান অনুধাবন করতে পারত।

রোদ ঝলসাচ্ছে। বেসানকন শহরের রাজপথের বুকে শোভাযাত্রা এখন এগিয়ে চলেছে।

এখানে গীর্জার অভ্যন্তরে আলো-আঁধারের রাজ্য। সুন্দর শীতল পরিবেশ।

বাতাসে ফুল আর ধূপের মিষ্টি গন্ধ। নিথর নিস্তব্ধতা, অনড় নির্জনতা কার্নিশে কার্নিশে শীতলতার প্রলেপ। জুলিয়ানের কল্পনাপ্রবণ মন আরও কল্পনায় আবিষ্ট হল। সে ধীরে ধীরে পায়চারি করছিল।

সহসা দুটি নারীদেহের উপর জুলিয়ানের নজর পড়ল। তার কল্পনাবিষ্ট মন জেগে উঠল। ওরা সুবেশা। একজন স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে, আর একজন সঙ্গিনীর খুব কাছেই। জুলিয়ান ওদের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কিছুই যেন ও দেখছে না। সাধারণ পোশাক ওদের দেহে, কিন্তু কি সুন্দর মানিয়েছে। কই স্বীকারোক্তি শোনার জন্য ও ঘরে ত কোন যাজক নেই। ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ মনে হচ্ছে…যদি ভক্ত হয় তবে কোন বেদীমূলে হাঁটু মুড়ে বসে নেই কেন…দেখে মনে হচ্ছে ওরা সমাজের অভিজাত ঘরের মহিলা, তবে ঝুল বারান্দার প্রথম সারিতে বসে নেই কেন…কি সুন্দর পোশাকের কাট্-ছাঁট্। কেমন মানানসই পোশাকের ঝুল!

ওদের দেখবার ইচ্ছায় জুলিয়ান ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

জুলিয়ানের পদধ্বনি এই নিথর নীরবতা ভাঙল। স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে বসা মহিলা সামান্য ঘাড় ফেরালেন। সহসা তীব্র চিৎকার করে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর দেহের সব শক্তি নিঃশেষিত, তিনি পিছনে হেলে পড়লেন। তাঁকে ধরার জন্যে তাঁর সঙ্গিনী এগিয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তে সংজ্ঞাহীনা মহিলার কাঁধ জুলিয়ানের নজরে পড়ল। ওঁর গলায় একছড়া মুক্তোর মালা…ওই মালা তার অতি পরিচিত। মাদাম দ্য রেনলের মাথার কেশগুচ্ছ চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কি ধরনের মনের অবস্থা হল জুলিয়ানের! উনি মাদাম রেনল। আর তাঁর সঙ্গিনী মাদাম দারভিল।

দুজনকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করল জুলিয়ান। মাদাম রেনলের ভাবলেশহীন বিবর্ণ মুখমণ্ডল। তাঁর দেহ একখানা চেয়ারের উপর ন্যস্ত করল। নিজে হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে বসল।

মাদাম দারভিল এবার তাকে চিনতে পারলেন। রাগত-স্বরে তীব্র-কণ্ঠে বললেন—'যাও, বেরোও এখান থেকে। আর কখনও ওর সামনে আসবে না। তোমার দর্শনে ও আবার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে। তুমি আসার আগে ওর জীবন কত সুখের ছিল। জঘন্য তোমার চরিত্র! ভদ্রতার লেশমাত্র তোমার দেহে থাকলে তুমি এখনি এখান থেকে দূর হবে।'

এমন আদেশের ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো শুনে জুলিয়ানের মন দুর্বল হয়ে পড়ল। সে ধীরে ধীরে ওখান থেকে সরে এল। সে জানে, এই মহিলা তাকে সব সময় ঘৃণার চোখে দেখে।

ঠিক তখনি শোভাযাত্রার যাজকদের নাকি-সুরে গাওয়া গানের সুর গীর্জার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা ফিরে আসছে। ফাদার বারনারদ ডাকলেন জুলিয়ানকে। কিন্তু তাঁর ডাক জুলিয়ান শুনতে পেল না। অবশেষে তিনি প্রায় অর্ধমৃত জুলিয়ানকে

একটা থামের আড়ালে খুঁজে পেলেন।

জুলিয়ানের বিবর্ণ ও অক্ষম দেহ দেখে ফাদার তার হাত ধরে তুললেন।

বললেন—'সারাদিন খুব খেটেছ তাই ক্লান্ত তুমি। এই চেয়ারখানায় আমার পিছনে বস, ওরা তোমায় দেখতে পাবে না।'

শোভাযাত্রা গীর্জার পশ্চিম দিকের দরজায় পৌছল।

ফাদার বললেন—'শান্ত হও। মহামান্য বিশপের এখানে আসতে এখনও কুড়ি মিনিট সময় লাগবে। নিজেকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করো। উনি এলে আমি তোমাকে আমার পাশে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখব।'

কিন্তু বিশপ এলেন···চলে গেলেন।

জুলিয়ানের দেহ তখনও কাঁপছিল। ফাদার ওকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন না। শুধু বললেন—'দুঃখ করো না। আবার সুযোগ এলে তোমাকে মহামান্য বিশপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

হতভাগ্য জুলিয়ান। মাদাম রেনলকে দেখার পর থেকে তার মাথায় আর কিছুই প্রবেশ করছে না।

২৯ : প্রথম পদক্ষেপ

তিনি তাঁর সময়ের মেজাজ বোঝেন···জানেন তাঁর জেলার পরিচয়···তাই এখন তিনি ধনী।
—দি ফোররানার

গীর্জার ঘটনার পর এখনও জুলিয়ানের মনের গভীর চিন্তাচ্ছন্নভাব সম্পূর্ণ কাটে নি এমন সময় কঠোরহৃদয় পিরার্দ তাকে ডেকে পাঠালেন।

—'তোমার কাজের প্রশংসা করে ফাদার বারনারদ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। সাধারণভাবে তোমার চরিত্র সম্বন্ধেও আমি খুশি। তুমি খুব ব্যস্তবাগীশ আর অস্থির, তবে এমন হওয়া উচিৎ নয়। এখনও পর্যন্ত তুমি সমবেদনা এবং সাহস দেখিয়েছ, সাধারণের চেয়ে তোমার বুদ্ধি বেশী। তোমার মধ্যে এমন একটা স্ফুলিঙ্গ আমার নজরে পড়েছে যা'কে নিভতে দেওয়া যায় না।'

বারেক থেমে ফাদার আবার বলতে লাগলেন—'পনের বছর ধরে পরিশ্রম করার পর আজ এবাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আমার ছাত্রদের আমি বিবেকের স্বাধীনতা দিয়েছি এবং স্বীকৃতিদানের সময় তুমি আমাকে যে গুপ্ত-দলের অস্তিত্বের কথা বলেছিলে তাকে সমর্থন বা ধ্বংস করি নি এই হচ্ছে আমার অপরাধ। যাওয়ার আগে আমি তোমার জন্যে কিছু করতে চাই। তোমার কাছ থেকে আমানদা বিনেতের চিঠিখানা পাওয়া গিয়েছিল তাই নইলে মাস দু'য়েক আগেই আমি এ কাজ করতাম। বাইবেল ক্লাসে আমি তোমায় সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত করলাম।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য জুলিয়ানের ইচ্ছা হল তাঁর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ধন্যবাদ জানাবে ঈশ্বরকে। কিন্তু সত্যিকারের আবেগে তার মন ভরে গেল। এগিয়ে গিয়ে ফাদার পিরার্দের হাত ধরল এবং চুম্বন করল।

রেকটর রেগে গিয়ে বললেন—'কি ভেবেছ তুমি?'

কিন্তু জুলিয়ানের দৃষ্টি তখন তার কাজের চেয়ে বেশী বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।

ফাদার পিরার্দ তার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। তিনি এমন মানুষ যিনি বহুকাল ধরে সূক্ষ্ম ভাব-প্রবণতার সম্মুখীন হন নি। রেকটর শান্ত হলেন। তাঁর কথার ঝাঁঝ উবে গেল।

বললেন—'দেখ, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। ঈশ্বর জানেন, এমন ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার ব্যবহার নিরপেক্ষ হওয়া উচিৎ। কাউকে ঘৃণা বা ভালবাসা সমীচিন নয়। তোমার জীবন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে, তোমার চরিত্রে এমন কিছু আছে যা' সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। ঈর্ষা এবং অপবাদ তোমাকে অনুসরণ করবে। পেশার খাতিরে তুমি যেখানেই থাক তোমার সহকর্মীরা তোমাকে ঘৃণা না করে থাকবে না। তোমার সঙ্গে সহজে ও সাংঘাতিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তারা তোমাকে ভালবাসার ভাণ করবে। নিরাময়ের একটাই মাত্র পথ রয়েছে…ঈশ্বরের শরণ নেবে। কেননা তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই তিনি এক দুর্নিবার ঘৃণার পরিবেশে তোমাকে নিক্ষেপ করেছেন। তোমার চরিত্র নির্মল রাখবে…সেটাই পরিত্রাণের পথ। তুমি যদি অজেয় ইচ্ছা নিয়ে সত্যকে আঁকড়ে ধর তবে আজই হোক বা পরেই হোক তোমার শত্রুরা পরাজিত হবে।

বহুদিন হল এমন: বন্ধুত্বপূর্ণ সমবেদনাভরা কণ্ঠস্বর জুলিয়ান শোনে নি। সে কেঁদে ফেলল।

ধর্মাধ্যক্ষ জুলিয়ানের হাত ধরলেন। এই মুহূর্তটি তাঁদের দু'জনের কাছেই বড় সুখকর।

জুলিয়ান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। এই প্রথম সে উচ্চ পদ লাভ করল …এর জন্য সে অজস্র সুবিধা ভোগ করবে। এখন আর তাকে চাষী ছাত্রদের কান-ফাটানো চিৎকার শুনতে হবে না, হুল্লোড় ভোগ করতে হবে না। এখন থেকে জুলিয়ান একা বসে খাবার খেতে পারবে। বিদ্যার্থীদের খাওয়া-দাওয়ার ঘণ্টা খানেক পরে তাকে খেতে দেবে। এবং যখন কেউ কোথাও থাকবে না তেমন সময়েও সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

অবাক হল জুলিয়ান। কেউ আর তাকে ঘৃণা করছে না। অথচ তার ভয় ছিল যে, হয়ত ওরা ঘৃণা করবে। কেউ তার সঙ্গে কোনও কথা বলবে না এটাই ছিল তার গোপন ইচ্ছা। এখানে তার বহু শত্রু…সে আর হাস্যাস্পদ অহঙ্কার প্রকাশ করতে চায় না। তার অল্প-বয়সী সহপাঠীদের মনে তার প্রতি ঘৃণার ভাব অনেক কমে গেছে এবং তারা এখন ভদ্র ব্যবহার করছে। তারা অনেকেই তার

পাশে এগিয়ে এল। আর কেউ তাকে মার্টিন নামে ডাকছে না।

তার এই সব বন্ধু বা শত্রুদের নাম করার কি দরকার? এ ধরনের জিনিষ কদাকর, এবং যেহেতু এটাই সত্যিকারের বাস্তব চিত্র তাই এটা আরও কদাকার। অথচ জনগণকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র তাদের মতন শিক্ষিত যাজক-দের, তারা না থাকলে জনগণের কি অবস্থা হবে? সংবাদপত্র কি গীর্জার পাদরী-দের স্থান গ্রহণ করতে পারবে?

ফাদার পিরার্দ একজন কঠোর জানসেন-পন্থী। তাঁর চরিত্রে এমন বিচক্ষণতার ভাব রয়েছে যা' শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কে আগ্রহান্বিত করে তোলে। সবচেয়ে বড় কথা তিনি শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মনে একটা কঠিন আদর্শ-বোধ আছে···সেই নিরিখে তিনি সবাইকে বিচার করেন। তিনি কাউকে মেধাবী বলে মনে করলে তার ইচ্ছা এবং প্রয়াসের সামনে নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করেন ···যদি তার মেধা সত্য হয় তবে সে এসব বাধা-অপসারণের পথ বার করতে পারবে।

এখন শিকারের মরশুম।

যেন জুলিয়ানের কোন আত্মীয় পাঠিয়ে দিয়েছে এধরনের একটা অবস্থা বোঝাবার জন্যে ফৌকে একটা বুনো শুয়োর আর একটা মদ্দা হরিণ শিকার করে বিদ্যালয়ে একদিন পাঠিয়ে দিল। মরা জানোয়ার ছুটো সারা বিদ্যালয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। ছোটরা বুনো শুওরের দাঁত দেখে ভয় পেল। কেউ কেউ দাঁতে হাত দিল। বিদ্যালয়ে জুলিয়ানের নূতন পরিচয়ের কথা রাষ্ট্র হল। এমন উপহার যার আত্মীয়রা পাঠায় সে নিশ্চয় ধনী-ঘরের সন্তান। সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল। মানুষটাকে নয় এখানে সবাই শ্রদ্ধা করে টাকাকে।

একদিন বিদ্যালয়ের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে জুলিয়ান দু'জন পাথর-মিস্ত্রীর কথোপকথন শুনল। সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দেওয়া সম্পর্কে তারা আলোচনা করছিল। জুলিয়ান গীর্জার একজন ছাত্র তাই তাকে সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে হবে না।

ওদের একজন বলল—'এবার আমাকে যেতেই হবে। নতুন করে ডাক হচ্ছে।'

—শুনেছি সেই মানুষটার সময়ে রাজ-মিস্ত্রী সেনাপতি হয়েছিল। সে সময় তাই হত।'

—'কিন্তু এখন ওদের দেখ। শুধু ভিখারীরা সেনা-বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। যার টাকা আছে সে যায় না, বাড়ীতে থাকে।'

—'গরীব হয়ে যে জন্মায় সে গরীব-ই থাকে, এটাই নিয়ম।'

—'আচ্ছা, ওরা বলাবলি করছে সেই মানুষটা মারা গেছে, এটা কি সত্যি কথা?'

—'কে বলছে সেইটা বুঝে দেখ। ওরা সেই মানুষটাকে ভয় পেত।'

—'তাহলে এটা কি পৃথক নয়। তাঁর সময়ে কি ভাবে কাজ হত। এবং তাঁর সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে নোংরা ব্যবহার করেছিল। বলতে পার, বিশ্বাস-ঘাতকতা।'

নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এই কথোপকথন শুনে জুলিয়ান শান্ত হল।

চলে যাওয়ার সময় সে আওড়াল—'জনগণ কেবল রাজা-রাজড়ার কথা মনে রাখে।'

পরীক্ষার দিন এসে পড়ল।

জুলিয়ান খুব ভালভাবে পরীক্ষা দিল। সবাই পরীক্ষার জন্য খুব খাটছিল।

বিখ্যাত প্রধান পুরোহিত মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ারকে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন তরুণ জুলিয়ান প্রচুর নম্বর লাভ করে প্রত্যেক বিষয়ে হয় প্রথম না হয় দ্বিতীয় স্থান পাচ্ছে। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বলাবলি করতে লাগল যে সব বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করলে পরীক্ষায় জুলিয়ান নির্ঘাৎ প্রথম স্থান দখল করবে…এবং মহামান্য বিশপের সঙ্গে ভোজন করার সম্মান অর্জন করবে।

পরীক্ষা শেষ হল।

কয়েক সপ্তাহ পরে জুলিয়ানের নামে একখানা চিঠি ডাকে এল। চিঠিতে প্যারিসের ডাকঘরের ছাপ। জুলিয়ান ভাবল যে, হয়ত এতদিনে মাদাম রেনল তাঁকে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু চিঠির লেখক একজন পল সোরেল…সে না কি জুলিয়ানের আত্মীয়। এবং চিঠির সঙ্গে সে জুলিয়ানকে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পাঠিয়েছে। যদি জুলিয়ান ল্যাটিন সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে তবে পল সোরেল তাকে বছরে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক করে বৃত্তি দেবে।

খুবই মুগ্ধ হল জুলিয়ান। মনে মনে ভাবল—এ টাকা নির্ঘাৎ মাদাম রেনল পাঠিয়েছেন। এর সঙ্গে তাঁর অনুকম্পা ভরা মনের স্পর্শ রয়েছে। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চান। কিন্তু একটাও ভালবাসার কথা লিখলেন না কেন?

আসলে জুলিয়ানের ভুল হয়েছে। মাদাম রেনল তাঁর বিষণ্ণতা ভরা জীবন নিয়ে দূরে সরে গেছেন। তাঁর জীবনে রূপান্তর ঘটে গেছে। তাই তিনি জুলিয়ানকে কোন চিঠি লেখেন নি, চিঠি লেখার কোন ইচ্ছাই তাঁর নেই।

লোকে বলে, চিঠি লিখেছেন মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ার…তিনিই জুলিয়ানকে বেনামে এই টাকা পাঠিয়েছেন।

বার বছর আগে যাজক ফ্রিলেয়ার একটা টিনের তোরঙ্গ ঘাড়ে করে এই শহরে এসেছিলেন। সেই দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি ধীরে ধীরে ধন-সম্পদ অর্জন করেছেন। আজ তিনি এই জেলার অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তিনি একটি জমিদারীর অর্ধেক অংশ কিনেছেন। বাকী অর্ধেক জমিদারীর মালিক জমিদার দ্য লা মোল। এই জমিদারীর স্বত্ব নিয়ে ভাইকার জেনারেল ফ্রিলেয়ার এবং মারকুইস মোলের মধ্যে এক জটিল মামলা বেধেছে।

প্যারিসের অভিজাত সমাজে এবং রাজসভায় মহামান্য মারকুইসের অখণ্ড

প্রভাব রয়েছে কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ভাইকার জেনারেল সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষ। এই প্রধান পুরোহিত খুশিমতন জেলার শাসক বরখাস্ত করতে বা নতুন নিয়োগ করার কাজে প্রভাব বিস্তার করেন। বেসানকনের বিশপ তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছেন।

এই মামলার প্রাথমিক রায়ে জয়ী হলেন ভাইকার জেনারেল।

মারকুইস বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পক্ষের আইন ব্যবসায়ীরা ভাইকার জেনারেলের বিরুদ্ধে এই মামলা পরিচালনা করতে ভয় পেয়েছেন। তাই মার-কুইস মঁসিয়ে চেলানের সাথে পরামর্শ করলেন এবং ফাদার পিরার্দের হতে মামলার ভার ছেড়ে দিলেন। মামলার খুঁটিনাটি বিষয় এবং নথিপত্র দেখে ফাদার পিরার্দ বিচার করে দেখলেন যে, মারকুইসের দাবি ন্যায়সঙ্গত। এবং সর্বশক্তিমান ভাইকার জেনারেলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মারকুইসের পক্ষে তাই তিনি দাঁড়ালেন।

ফলে ভাইকার জেনারেল দারুণ কুপিত হলেন ফাদার পিরার্দের উপর।

ফাদার পিরার্দের পরিশ্রম এবং আইন-মন্ত্রীর সঙ্গে মারকুইসের বন্ধুত্ব থাকার জন্য মামলা পুরোপুরি ধ্বস্যাৎ হল না। আবার পুনরুজ্জীবিত হল।

এই মামলার ব্যাপার নিয়ে মারকুইস এবং ফাদারের মধ্যে পরিচয় গাঢ় হল।

তাঁরা প্রায়ই পরস্পরের কাছে চিঠি লিখতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে সামাজিক অবস্থার পার্থক্য রয়েছে, তবু ধনী জমিদার হয়েও এই বিচিত্র স্বভাবের দরিদ্র যাজককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হলেন না মারকুইস। ফাদার ও পিরার্দ অকুণ্ঠিত হৃদয়ে জানালেন যে, তাঁর শত্রুরা চাইছে তিনি যাতে পদত্যাগ করেন। মারকুইসকে তিনি সব কাহিনী সবিস্তারে জানালেন। মারকুইসের অমিত পরিমাণ ধন-সম্পদ···কিন্তু তিনি কৃপণ-স্বভাব ন'ন। জুলিয়ান যে ফাদারের প্রিয় ছাত্র তা' জানতেন মারকুইস। এই সব চিঠি লেখার খরচ ফাদারকে দিতে চেয়েছিলেন মারকুইস, কিন্তু ফাদার তা' নেন নি। তাঁর মাথায় একটা মতলব এল, তিনি নিজের হাতে বেনামী চিঠি লিখে তার মধ্যে পাচ শ' ফ্রাঙ্ক ভরে ফাদারের প্রিয় ছাত্র জুলিয়ানকে পাঠিয়ে দিলেন।

একদিন ফাদার পিরার্দ বেসানকনের শহরতলিতে একটা সরাইখানায় একটা জরুরি ব্যাপারে দেখা করার নিমন্ত্রণ পেলেন। সেখানে মারকুইস দ্য লা মোলের নায়েবের সাথে ফাদারের দেখা হল।

নায়েব বলল—'জমিদারবাবুর হুকুমে আপনার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি। তিনি চান যে, তাঁর এই চিঠি পড়ে পাঁচদিনের মধ্যে আপনি প্যারিসে যাবেন। এ ক'দিন আমি তাঁর জমিদারী পরিদর্শন করতে যাব। ক'দিন পরে আপনি যেতে পারবেন দয়া করে বলুন। ফেরার পথে আপনাকে সঙ্গে করে প্যারিসে নিয়ে যাব।

চিঠিখানা খুবই ছোট :

গ্রামাঞ্চলের এই উদ্বিগ্ন পরিবেশ পরিত্যাগ করে মুক্ত হোন, প্রিয় মহাশয়।

এবং প্যারিসের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শ্বাস নিতে চলে আসুন। আমার গাড়ি পাঠালাম। আপনার সিদ্ধান্ত জানার জন্য গাড়ি চারদিন অপেক্ষা করবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি নিজেও আপনার অপেক্ষায় প্যারিসে থাকব। আপনি শুধু হাঁ বলুন, তাহলেই প্যারিসের উপকণ্ঠে আপনার জন্য আরামে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা আমি করে দেব। ধনী প্যারিসবাসীরা আপনাকে দেখে নি, তবে তারা আপনার খুব ভক্ত হবে এ কথাটা বিশ্বাস করুন।

তাঁর অনেক শত্রু আছে এই ধর্ম-বিদ্যালয়ে, তবু এই বিদ্যালয়কে ঘিরেই পনের বছর ধরে তাঁর চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠেছে। মারকুইসের এই চিঠি তাঁকে সোয়াস্তি দান করল, যেন প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অস্ত্রোপচারের প্রাক-মুহূর্তে কোনও দক্ষ শল্য-চিকিৎসকের হাতে তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন। এখান থেকে তাঁর বরখাস্ত পাকা। তিনি দিনের মধ্যেই তিনি নায়েবের সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক করলেন।

তারপরের আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা জ্বর-তপ্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটালেন ফাদার পিরার্দ।

তাঁর সিদ্ধান্তের কথা মারকুইসকে লিখে জানালেন।

এবং বিশপকে একখানা চিঠি লিখতে বসলেন। দীর্ঘ চিঠি। তবে লেখার গুণে এই চিঠির ভাষা হয়ে উঠল অনবদ্য। বিশপের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি সবিস্তারে এই ধর্ম বিদ্যালয়ের সব ঘটনা লিখলেন। এই চিঠি অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাইকার জেনারেল মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ারের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের পটভূমি এবং তার খুঁটিনাটি দিকগুলো বর্ণনা করলেন, লিখলেন গোপন চক্রের কার্য-কর্ম সম্পর্কে···ছ'বছর ধরে তিনি এসব সহ্য করেছেন এবং অবশেষে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর কাঠের গাদা থেকে কাঠ চুরি করা হচ্ছে। বিষ-প্রয়োগে তাঁর রক্ষী কুকুরটাকেও হত্যা করা হয়েছে···এমনি ধরনের সাবলীল ভাষায় তিনি সব কিছু লিখলেন।

সন্ধ্যা আটটা।

চিঠি লেখা শেষ হল।

বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য ছেলেদের মতন জুলিয়ানও তখন নিদ্রিত। ফাদার তাকে ডেকে তুললেন। সুন্দর ল্যাটিন ভাষায় তিনি জুলিয়ানকে বুঝিয়ে বললেন—'বিশপের প্রাসাদ কি তুমি চেন? এই চিঠিখানা তাঁর কাছে নিয়ে যাও। দেখ, তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছি না, কতকগুলো নেকড়ের মধ্যে তোমায় পাঠাচ্ছি। মিথ্যে কথা নয় মনে রেখ। বুঝে জবাব দেবে। যারা খুশি মনে কিছু জানতে চাইবে তারা তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। যাওয়ার আগে তোমার এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিতে পারছি বলে আমি

আনন্দিত। যে চিঠি নিয়ে যাচ্ছ ওখানা আমার পদত্যাগ পত্র।'

নিথর-দেহে দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়ান। ফাদার পিরার্দকে সে পছন্দ করে। তার সংযত কণ্ঠস্বর বৃথাই তাঁকে সাবধান করে দিল: এই মানুষটি এখানকার জেসুইট-পন্থীদের ত্যাগ করার সাথে সাথে এরা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবে এবং দেবে তাড়িয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের কথা সে ভাবতে চায় না। সে দারুণ লজ্জায় পড়ল, কেননা ভদ্রভাবে মনের কথা সে বলতে চায় কিন্তু বলবার মতন সাহস সে পাচ্ছে না।

—'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

জুলিয়ান ভয়ে ভয়ে বলল—'হাঁ, স্যার। লোকে বলাবলি করে যে, এতদিন এই পদে থেকেও আপনি এক পয়সাও সঞ্চয় করেন নি। আমার কাছে এক শ' ফ্রাঙ্ক আছে', চোখের জলে মুখ ভেসে গেল, সে আর কিছু বলতে পারল না।

প্রাক্তন রেকটর শান্ত গলায় বললেন—'কথাটা মনে রাখব। এখন বিশপের বাড়ি যাও। দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বিশপের বসবার ঘরে ডিউটিতে ছিলেন ফাদার ফ্রিলেয়ার। জেলা শাসকের সঙ্গে বিশপ খানা-পিনা সারছিলেন। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তাই জুলিয়ান ফাদার ফ্রিলেয়ারের হাতে চিঠিখানা দিল।

জুলিয়ান অবাক হয়ে গেল, কেমন সাহসের সঙ্গে বিশপের কাছে লেখা চিঠি যাজক খুলে পড়তে সুরু করলেন। তাঁর সুন্দর মুখে তৃপ্তি মেশানো বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল···তারপর সেই ভাব ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যে রূপান্তরিত হল। উনি যখন চিঠি পড়ছিলেন জুলিয়ান তখন তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করছিল। তাঁর মুখে এক ধরনের কাঠিন্য না থাকলে মুখমণ্ডল আরও সুন্দর গাম্ভীর্যে ভরে উঠত···যদি মুখের মালিক মুহূর্তের জন্য সুন্দর দেহের কথা ভুলতে পারতেন তবে তাঁর ধূর্ততাও ওই মুখে ভালভাবেই ফুটত। তাঁর দীর্ঘ সরলরেখার মতন খাড়া নাক এবং দুর্ভাগ্যের কথা এই খাড়া নাকের জন্য তাঁর মুখের সঙ্গে খেঁকশিয়ালের মুখের একটা সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। ফাদার পিরার্দের পদত্যাগপত্র পড়ায় নিবিষ্ট মন পাদরীর পরনে খাসা সুন্দর পোশাক···জুলিয়ানের খুব ভাল লাগছে। এমন সুন্দর মানানসই পোশাক সে আর কোন পাদরীকে পরতে দেখে নি। ফাদার ফ্রিলেয়ারের বিশেষ গুণের কথা তখনও জুলিয়ানের জানা ছিল না, পরে সে তা' জেনেছিল। প্যারিসের জীবনে বসবাসে অভ্যস্ত বৃদ্ধ আনন্দময় বিশপকে তিনি নানাভাবে সেবা-যত্ন করতেন। এই বেসানকন শহরে তিনি যেন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছিলেন। বিশপের চোখের দৃষ্টি ভাল ছিল না, অথচ তিনি মাছ খেতে খুব ভালবাসতেন। ফাদার ফ্রিলেয়ার কাছে দাঁড়িয়ে বিশপের পাতের মাছের কাঁটা বেছে দিতেন।

জুলিয়ান নীরবে দাঁড়িয়ে ফাদার ফ্রিলেয়ারকে চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়তে দেখছিল এমন সময় বিশেষ ধরনের ক্রস পরিহিত বিশপ সেই ঘরের মধ্যে

ঢুকলেন। জুলিয়ান তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসবার সুযোগ পেল। বিশপ বারেকের জন্য তার দিকে করুণাস্নিগ্ধ হাসি হেসে চলে গেলেন। এবং জুলিয়ানকে একলা ঘরে রেখে ফাদার ফ্রিলেয়ারও চলে গেলেন বিশপের সঙ্গে।

বেসানকন শহরের বিশপকে জীবনে বহু দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে, তাঁর আত্মশক্তি বার বার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। বয়স হয়েছে পঁয়ষট্টি। আগামী দশ বছর তাঁর জীবনে কি অবস্থা ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন। বিশপ জানতে চাইলেন—'ওই বুদ্ধিউজ্জ্বল মুখমণ্ডল, তীক্ষ্ণ চেহারার ছাত্রটি, যাকে আসবার সময় দেখলাম সে কে? আমার অনুশাসন অনুযায়ী ওদের এখন বিছানায় শোওয়ার সময় নয়?'

—'ছেলেটি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে প্রভু। সে একটা গুরুতর খবর এনেছে। আপনার এই শহরের শেষ জানসেন-পন্থীর পদত্যাগপত্র ও নিয়ে এসেছে। সেই দুর্দান্ত ফাদার পিরার্দ অবশেষে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে।'

বিশপ হেসে বললেন—'আচ্ছা। ওর জায়গায় কোনও লোককে নিয়োগ করতে তোমায় নিষেধ করছি। ওর মূল্য আমি বুঝি তাই ওকে কাল আমার সাথে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

ভাইকার জেনারেল দু'চার কথায় পরবর্তী পাদরীর গুণপনা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বিশপ এ-ব্যাপার নিয়ে ওর সাথে আলোচনা করতে রাজী নন। তাই বললেন—'নতুন লোক নিয়োগ করার আগে আমি জানতে চাই ও কেন চলে যাচ্ছে। ছাত্রটিকে ডেকে আন। শিশুদের মুখেই সত্য কথা শোনা যায়।'

মঁসিয়ে ভালেনদের চেয়েও দামী পোশাক পরা দু'জন খানসামা তখন বিশপের পোশাক খুলে রাখছিল…জুলিয়ান ঘরের মধ্যে ঢুকল। বিশপ ভাবলেন, ফাদার পিরার্দ সম্পর্কে কিছু জানার আগে তিনি ছেলেটির লেখা-পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। ধর্মমত সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং তার জবাব শুনে বিশপ অবাক হলেন। অচিরে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য আলোচনায় তিনি মেতে উঠলেন। জুলিয়ান উল্লেখ করল ভারজিল, হোরেস এবং সিসেরোর নাম এবং তাঁদের সাহিত্য। বিশপ নিজেও প্রাচীন সাহিত্য বিশারদ…তিনি দারুণ খুশি হয়ে উঠলেন। সাহিত্য আলোচনায় নিমগ্ন বিশপ ফাদার পিরার্দের কথা ভুলে গেলেন। ভার্জিল এবং সিসেরোর রচনা থেকে জুলিয়ান আবৃত্তি করে শোনাল। সতেজ এবং সুরেলা তার কণ্ঠস্বর।

জুলিয়ানের প্রশংসা করে বিশপ বললেন—'এমন অসুবিধার মধ্যে এর চেয়ে বেশী কেউ শিখতে পারে না।'

—'আপনার প্রশংসা পাবে না বা তার যোগ্য নয় এমন বহু ছাত্র বিদ্যালয়ে আছে, মি লর্ড!'

বিশপ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন—'কি রকম?'

—'সরকারী নথি থেকে আমার বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাৎসরিক পরীক্ষায় আমার স্থান হয়েছে একশ' সাতানব্বই জনের পর। আমার যে জবাব-গুলো আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তা পরীক্ষকদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি।'

ফাদার ফ্রিলেয়ারের দিকে বারেক তাকিয়ে হেসে বিশপ বললেন—'তাহলে তুমিই ফাদার পিরার্দের প্রিয় ছাত্র। আমিও তাই আশা করছিলাম। লড়াই-য়ের ময়দানে সবাই নিষ্কলঙ্ক। কথাটা ঠিক না বন্ধু? ওরা ঘুম থেকে তুলে আমার কাছে তোমাকে পাঠিয়েছে, তাই না?'

—'হাঁ, মি লর্ড। জীবনে মাত্র একবার একা আমি বিদ্যালয় থেকে বাইরে বেরিয়েছিলাম। তাও বেরিয়েছিলাম ফাদার বারনারদকে গীর্জা সাজাবার কাজে সাহায্য করতে।

বিশপ বললেন—'শুনেছি, তুমি অমিত সাহস দেখিয়ে চাঁদোয়ার উপর পালকের মুকুট পরিয়েছিলে। খুব তোমার সাহস ত? প্রতি বছর ওটার কথা ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। ভয় হয় ওর জন্যে একজনের জীবন একদিন যাবে। ক্ষুদে বন্ধু, জীবনে তুমি আরও অনেক উন্নতি করবে। চমৎকার উন্নতি করবে, অনাহারে তোমার জীবন শেষ হোক তা' আমি চাই না।'

এর পর দু'জনে গীর্জার ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে জুলিয়ানের ধারণা বড় সীমিত। সম্রাট কনসটানটাইনের যুগে নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বললেন বিশপ। কথায় কথায় উনিশ শতকের কথা উঠল। বিধর্মীদের আচার আচরণের কাল সমাপ্ত। সন্দেহ এবং অস্থিরতাও হ্রাস পেয়েছে। ফলে বিষণ্ণতা ও মানসিক-উদ্বেগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এক সময় বিশপ মন্তব্য করলেন যে, জুলিয়ান টাসিটাসের নাম শোনে নি।

কিন্তু বিশপকে বিস্মিত করে জুলিয়ান বলল যে, বিদ্যালয়ের পাঠাগারে টাসি-টাসের কোন গ্রন্থ নেই।

বিশপ খুব খুশি মনে বললেন—'তোমার সঙ্গে আলোচনা করে আজ সন্ধ্যে-বেলাটা বড় ভালভাবে কাটল। আমার বিদ্যালয়ে এমন সব বিষয়ে পণ্ডিত ছাত্র এর আগে নজরে পড়ে নি। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি তোমাকে কিছু উপহার দেব। আমি তোমাকে টাসিটাসের গ্রন্থ দিচ্ছি।

টাসিটাসের গ্রন্থগুলোর আটখানা খণ্ড বিশপ তাকে পুরস্কার দিলেন। নিজের হাতে তিনি লাটিন ভাষায় জুলিয়ান সোরেলের নাম লিখে দিলেন। বললেন—'যুবক, তুমি যদি সু আচরণ করতে শেখ তবে জীবনে প্রচুর উন্নতি করবে এবং আমার প্রাসাদ থেকে তোমার স্থান খুব দূরে হবে না।'

ঘড়িতে মাঝরাতের ঘণ্টা বাজল।

সেই বইয়ের খণ্ডগুলো হাতে নিয়ে জুলিয়ান ফিরে এল।

ফাদার পিরার্দ সম্পর্কে বিশপ তাকে একটা কথাও বলেন নি। তবে বিশপের সুন্দর ব্যবহারে সে মুগ্ধ। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক মর্যাদা-বোধের সঙ্গে নাগরিক

সম্ভ্রমশীলতার মিলন ঘটেছে !

সব কিছু জানার জন্যে ফাদার পিরার্দ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জানতে চাইলেন—'তোমাকে কি বললেন ?'

জুলিয়ান বলল এবং উপহারের কথাও জানাল।

—'একজন তরুণ ছাত্রকে বিশপ এমন উপহার দিলেন এও বিস্ময়ের ব্যাপার !' তিনি মন্তব্য করলেন।

সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে রাত দুটো বাজল।

অবশেষে ফাদার পিরার্দ বললেন—'বিশপের নিজের হাতে তোমার নাম লিখে দেওয়া টাসিটাসের প্রথম খণ্ডখানা আমার কাছে রেখে যাও। এখান থেকে আমি চলে যাওয়ার পর এই ল্যাটিন শব্দগুলোর বজ্রশিখার মতন তোমার পথ আলোকিত করবে। এরিত টিবি, ফিলি মি, সাকসেসর মিউস, তানকোয়াম্ লিও কোয়ারেনস্ কুয়েম দেভোরেত…শোন পুত্র, আমার পদে যিনি আসবেন তিনি কুপিত সিংহের মতন তোমাকে অন্বেষণ করবেন ধ্বংস করার জন্য।'

পরের দিন সহপাঠীদের সম্ভাষণ ও আচরণের পরিবর্তন জুলিয়ানের নজরে পড়ল। সে আরও গম্ভীর হল। সে ভাবল, ফাদার পিরার্দের পদত্যাগই এর কারণ। এ বাড়ীর সবাই খবরটা জানে এবং এও জানে যে, আমি তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র। অপমান করার জন্যই তাদের এই আচরণ। তবে ওদের দৃষ্টিতে যে আর ঘৃণার চিহ্ন নেই তা বুঝতে পারে নি জুলিয়ান।

অবশ্য সেই ক্ষুদে সহপাঠী বলল—'টাসিটাসের সমগ্র রচনাবলী এর কারণ।'

দুপুর বেলায় ফাদার পিরার্দ বিদায় সম্ভাষণ জানালেন বিদ্যালয়ের সকলকে।

বললেন—'তোমরা কি চাও…সাংসারিক সম্মান, সামাজিক সুবিধা উপভোগ করার সুযোগ, কর্তৃত্ব করার আনন্দ, আইন-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার প্রবণতা অথবা সমস্ত মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করার অধিকার ? অথবা চিরন্তন পরিত্রাণ লাভের কামনা ? তোমাদের মধ্যে যাদের মেধা-শক্তি কম তারা এই দুই পথের ভিতরকার প্রভেদ ধরবার জন্য সজাগ হয়ে থাকবে।'

বিদ্যালয়ের কেউ ফাদার পিরার্দের ভাষণের কোন গুরুত্ব দিল না।

সবাই বলাবলি করতে লাগল—'এই পদত্যাগের ফলে তিনি মনে বড় আঘাত পেয়েছেন।'

পনের বছর এই বিদ্যালয়ে থাকার পর ফাদার পিরার্দ বেসানকন ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নেই। বন্ধুরা চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানাল। আলিঙ্গন করল।

পরে কেউ কেউ বলল—'আমাদের ফাদার খুব ভাল মানুষ ছিলেন, তবে যাওয়ার সময় এই মিথ্যে কথাগুলো না বললেই পারতেন। সবাই তাঁর এই কথা শুনে হাসছে।'

সাধারণ মানুষ ওরা। অর্থ লালসায় তাঁরা অন্ধ। তাই ফাদার পিরার্দের

অকপটতা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। অথচ এই অকপটতার শক্তির উপর নির্ভর করেই ফাদার পিরার্দ সুদীর্ঘ ছ'বছর ধরে মেরী আলাকক্, যীশুর নির্মল হৃদয় সংস্থা, জেস্যুইট্-পন্থী খৃস্টান ও তার বিশপের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন।

৩০ : একজন উচ্চাভিলাষী মানুষ

আভিজাত্যের একটি মাত্র কৃতিত্ব আছে···ডিউকের উপাধি। মারকুইস কথাটা হাসির উদ্রেক করে, কিন্তু 'ডিউক' শব্দটা উচ্চারণ কর অমনি প্রত্যেকেই ফিরে তাকাবে।

—এডিনবার্গ রিভিউ

মারকুইস্ দ্য লা মোল খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ফাদার পিরার্দকে নিজের প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানালেন। অভ্যর্থনার ব্যাপারে যথেষ্ট আড়ম্বর ও জাঁকজমক না থাকলেও ভদ্রতার ছোঁয়া ছিল। তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ। রাজসভায় তাঁর যথেষ্ট কদর। সম্প্রতি ডিউক হওয়ার জন্য তিনি রাজসভায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন।

ফাদার পিরার্দ মামলার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মারকুইসকে দিলেন।

খুব খুশি হলেন মারকুইস। বললেন—'এই প্রথম আপনাকে দেখলেও আমি আপনাকে পছন্দ করি, শ্রদ্ধা করি। আপনাকে যদি বছরে আট হাজার ফ্রাঙ্ক বা তরে দু'গুণ অর্থ দি', আপনি কি আমার সচিবের পদ গ্রহণ করবেন? আপনাকে বলছি, তাতেও আমার লাভ হবে। যদি কোন দিন আপনার সঙ্গে আমার সদ্ভাব না থাকে তবু আপনি যাতে সুস্থভাবে জীবন ধারণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

ফাদার পিরার্দ তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না।

বললেন—'বিদ্যালয়ে আমি একটি গরীবের ছেলেকে রেখে এসেছি। তার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। সন্ন্যাসী হলেও সরল, পবিত্র এবং নির্জনবাসী সন্ন্যাসী হবে। ল্যাটিন ভাষা এবং ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। তবে ভবিষ্যতে তার পক্ষে খ্যাতিমান হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। হয় সে ধর্মপ্রবক্তা কিংবা আত্মিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ হয়ে উঠবে। কি হবে তা জানি না, কিন্তু ওর মধ্যে জ্বলন্ত আগুন আছে।'

—'এই যুবকের বংশ পরিচয় কি?'

—'শুনেছি পাহাড়ী-অঞ্চলের একজন কাঠুরের ছেলে। কিন্তু আমার মনে হয় স্বাভাবিকভাবে ও কোন ধনীর সন্তান। ছদ্মনামে কেউ ওকে চিঠির সঙ্গে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পাঠিয়েছে দেখেছি।'

এবার মারকুইস বলে উঠলেন—'জুলিয়ান সোরেলের কথা বলছেন?'

অবাক কণ্ঠে ফাদার পিরার্দ জানতে চাইলেন—'আপনি তার নাম জানলেন

কি করে ?'

এই প্রশ্ন শুনে মারকুইস লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। জবাব দিলেন—'সে কথা আপনাকে বলব না।'

ফাদার পিরার্দ বলতে লাগলেন—'আচ্ছা, এই যুবককে আপনি আপনার সচিব করতে পারেন। সে খুব উত্তমী এবং বিবেচক। তাকে দিয়ে পরীক্ষা করা যায়।'

মারকুইস জবাব দিলেন—'কেন যাবে না ? পুলিশের কর্তা বা আর কেউ অর্থ উৎকোচ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করাতে পারে ? সেখানেই আমার আপত্তি।'

এ ব্যাপারে ফাদার পিরার্দ তাকে আশ্বাস দিলেন।

মারকুইস একখানা হাজার ফ্রাঙ্কের নোট তাঁকে দিয়ে বললেন—'আসার খরচ হিসাবে এই অর্থ জুলিয়ান সোরেলকে পাঠিয়ে দিন। তাকে আসতে বলুন।'

ফাদার পিরার্দ বললেন—'আপনারা প্যারিসে বাস করছেন, ভালই আছেন। গ্রামাঞ্চলে মফঃস্বলে আমাদের উপর যে কি ধরনের অত্যাচার করা হয় তা' আপনারা জানেন না। ওই সব পাদরীরা আবার জেস্যুইট্-পন্থীদের সুনজরে দেখে না। ওরা কিছুতেই জুলিয়ান সোরেলকে আসতে দেবে না। নানা ধরনের ওজোর তুলে ওকে বাধা দেবে। হয় ত বলবে অসুস্থ। কিংবা ডাকের চিঠি চেপে দেবে।'

বললেন মারকুইস—'ঠিক আছে। বিশপের কাছে মন্ত্রীর একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেব।'

কয়েকদিন পরে অপরিচিত হাতে লেখা একখানা চিঠি পেল জুলিয়ান। চিঠিখানায় চেলনের ডাকঘরের ছাপ। সঙ্গে বেসানকনের একজন ব্যবসায়ীর নামে একখানা অর্থ-দানের দলিল। অতি শীঘ্র সে যাতে প্যারিসে চলে আসে তারই নির্দেশ চিঠিতে। চিঠির স্বাক্ষর জাল লোকের। তবে চিঠি পড়তে গিয়ে তার নজরে পড়ল তেরো নম্বরের শব্দটার উপর বড় এক ফোঁটা কালির দাগ··· এটাই ফাদার পিরার্দের চিঠির গোপন চিহ্ন।

ঘণ্টাখানেক পরে বিশপের বাড়ী যাওয়ার আমন্ত্রণ পেল জুলিয়ান।

পিতার মতন বিশপ তাকে সস্নেহ অভ্যর্থনা জানালেন। হোরেসের গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, প্যারিসে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তিনি তাকে অভিনন্দন জানালেন এবং তাকে মেয়রের স্বাক্ষর করা ছাড়পত্র দিলেন।

সেদিনই···মাঝরাত হয় নি তখনও।

জুলিয়ান ফোকের বাড়ীতে হাজির হল। সব শুনে আনন্দের বদলে বেশী বিস্মিত হল ফোকে। সে নিজে লিবারেল-পন্থী। বলল—'ব্যস ! এবার তোমার হয়ে গেল। ওখানে কোন সরকারী পদে তোমাকে কাজ করতে বাধ্য করা হবে এবং খবরের কাগজগুলো তোমার দুর্নাম রটাবে। তোমার দুর্নামের

খবর আমার কানে আসবে। মনে রেখ, কাঠের ব্যবসায়ে এক শ' লুই রোজগার করার চেয়ে অনেক নিরাপদ। সরকারের চাকর হিসাবে তা' সে তুমি রাজা সলোমনের চাকর হলেও, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক রোজগার করার চেয়ে নিজেই নিজের মনিব এটাই ভাল।

একজন সঙ্কীর্ণমন গ্রাম্য ভদ্রলোকের মন্তব্য এটা! ভাবল জুলিয়ান। সে চায় বিশাল রঙ্গমঞ্চে হাজির হতে। সে প্যারিস শহরেই যাবে।

পরের দিন বেলা বারোটার সময় জুলিয়ান ভেরিয়ার শহরে পৌঁছলো। নিজেকে তার খুব সুখী মনে হচ্ছিল কেননা আবার সে মাদাম দ্য রেনলকে দেখতে পাবে। সে সর্ব প্রথম তার পৃষ্ঠপোষক ফাদার চেলানের বাড়ীতে হাজির হল, কিন্তু তিনি জুলিয়ানকে কর্কশ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

—'তুমি কি আমার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে এসেছ? তুমি আমার সঙ্গে খাবে। একজন সে সময় গ্রাম থেকে তোমার জন্যে একটা ঘোড়া ভাড়া করে আনবে। এবং কারো সঙ্গে দেখা না করে তুমি ভেরিয়ার ছেড়ে চলে যাবে।

ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্রের বাধ্যতা দেখিয়ে জুলিয়ান বলল—'যা' বলছেন তাই মানব।'

জুলিয়ান ঘোড়ায় চড়ে শহর ছেড়ে তিন মাইল দূরে চলে গেল। নজরে পড়ল বনভূমি—কেউ কোথাও নেই। বনের মধ্যে সে প্রবেশ করল। সূর্য অস্ত গেল। এবার জুলিয়ান ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য। তারপর এক চাষীর বাড়ী গিয়ে একখানা মই কিনল এবং চাষীকে দিয়ে সেখানা বনের মধ্যে বইয়ে আনল। জনপথ ফিদেলিতের কাছাকাছি বনের মধ্যে সে আশ্রয় নিল।

চলে যাওয়ার সময় চাষীটি মনে মনে ভাবল—একজন ভয়ানক জেল-পলাতক দাগী আসামী অথবা একজন চোরাই-চালানকারী দেখছি এই বনে আশ্রয় নিল। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি। আমার মইখানার জন্য ভালই মূল্য পেয়েছি এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে এসব কাউকে বলব না।

ঘন কালো রাত নামল।

জুলিয়ান একটা বাজার পর মই-ঘাড়ে নিয়ে ভেরিয়ার শহরে ঢুকল। পাহাড় থেকে সে নদীর খাদে নামল। ফুট দশেক গভীর নদীর খাদ। নদীটা মঁসিয়ে রেনলের সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। দু'ধারে পাঁচিল। মইয়ের সাহায্যে জুলিয়ান পাঁচিলের উপর উঠল। ভাবল, রক্ষী কুকুরগুলো কি ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে সেটাই এখন আসল প্রশ্ন। কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে তেড়ে এল। জুলিয়ান ধীরে ধীরে শিশ্ দিল—কুকুরগুলো তাকে চিনতে পেরে লেজ নাড়তে সুরু করল।

অবশেষে মাদাম রেনলের শোবার ঘরের জানালার নীচে এসে দাঁড়াল

জুলিয়ান। মাটি থেকে আট ন' ফুট উঁচুতে জানালাটা। সার্সি আর খড়খড়ি বন্ধ। জুলিয়ান ভালভাবেই জানে বন্ধ খড়খড়িতে একটা গোপন ফাঁক আছে। কিন্তু ঘরে ত আলো জ্বলছে না। তাহলে আজ রাতে মাদাম রেনল নিশ্চয়ই এ ঘরে ঘুমোচ্ছে না। কোথায় কোন ঘরে ঘুমোচ্ছে ? কুকুরগুলো যখন এখানে রয়েছে তখন পরিবারের লোকজনও নিশ্চয় ভেরিয়ারে আছে। এ ঘর অন্ধকার। সহসা মঁসিয়ে রেনল বা আর কারও সামনে পড়ে গেলে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী ঘটবে। এখন তার পক্ষে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল, কিন্তু পালানোর কথা ভাবতেই তার মনে ভয় হচ্ছে। জানি না তবে অন্য কাউকে যদি ও ঘরে দেখি তাহলে মই ফেলে রেখেই ছুটে পালাব। কিন্তু সে যদি ওখানে থাকে, কি ভাবে আমাকে সে অভ্যর্থনা জানাবে ? সন্দেহ নেই বিষণ্ণতা এবং গভীর ধর্মবোধ তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এখনও আমার স্মৃতি তার মনের কিছুটা নিশ্চয় দখল করে রেখেছে···কেননা সে ত এই সেদিনও আমাকে চিঠি লিখেছে।

হৃদয় কাঁপছে। তবু কঠিন শপথ মনে মনে, হয় ওকে দেখব নয় মরব! অবশেষে এক মুঠো নুড়ি পাথর নিয়ে জানালার গায়ে জুলিয়ান ছুঁড়ে মারল। ভয় হল জুলিয়ানের রাত যত আঁধারে ঢাকাই হোক তার দেহ নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে অসুবিধে হবে না। কাজেই পাগলামি নয়, এবার তাকে সাহসে ভর করতে হবে। আজ রাতে এ ঘরখানা নিশ্চয় ফাঁকা, কেউ শোয় নি···নইলে এতক্ষণ সে জেগে উঠত। আর সাবধান হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু তার সাড়া-শব্দে পাশের ঘরে কেউ না জেগে ওঠে।

জানালার একদিকের খড়খড়িতে মই লাগিয়ে সে উঠে পড়ল উপরে। খড়খড়ির সেই গোপন ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তার ধরে টানল। খড়খড়ি-জানালা খুলে গেল। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে মাথা ঢোকাল। সহসা কেউ তাকে গুলি করতে পারে। তাই মৃদুস্বরে আওড়াল—'বন্ধু আমি।'

ঘরে বাতি জ্বলছে না। ফায়ারপ্লেসের আগুনও প্রায় নিভু-নিভু। জানালার সার্সি বন্ধ।

লক্ষণটা ভয়াবহ।

বন্দুকের গুলির হাত থেকে সাবধান হতে হবে। কিছুটা সময় স্তব্ধভাবে অপেক্ষা করল জুলিয়ান। ধীরে ধীরে জানালার সার্সিতে টোকা দিল। কোন জবাব নেই। আরও জোরে টোকা দিল।

মনে মনে ভাবছিল জুলিয়ান, সার্সি ভেঙে যদি ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয় তাই ঢুকব। আরও জোরে জানালায় টোকা দিল। এবার ও যেন দেখতে পেল, ঘরের মধ্যে কারো ছায়া-শরীর। আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সার্সিতে ওই ছায়া-মূর্তি গাল রাখল।

জানালার কাছ থেকে সামান্য সরে এল জুলিয়ান। রাত বড় অন্ধকার। এত

কাছ থেকেও সে বুঝতে পারছে না যে, ওই ছায়া-শরীর মাদাম রেনলের কি-না! সহসা ওই ছায়া-শরীর যদি চেঁচিয়ে ওঠে তবে একটা কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। লোক-জন ছুটে আসবে। নীচে কুকুরগুলো মুখিয়ে আছে।

—'আমি বন্ধু! দয়া কর, ভিতরে ঢুকতে দাও, তোমার সাথে কথা বলব। বড় অসুখী আমি।' বলতে বলতে খুব জোরে টোকা দিল। এবার হয় ত জানালাটা ভেঙ্গে যাবে।

একটা আওয়াজ হল। জানালাটা ভেঙ্গে যাবে।

একটা আওয়াজ হল। জানালার সার্সি খুলে গেল।

লাফিয়ে ঘরে ঢুকল জুলিয়ান। ছায়া-শরীর তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। জুলিয়ান তার হাত চেপে ধরল। নারীর হাত। মুহূর্তে ওর মনের সব সাহস যেন উবে গেল। যদি সত্যিই সে হয় তবে কি বলবে? নারীর মৃদুকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে জুলিয়ান চিনতে পারল মাদাম রেনলকে।

জুলিয়ান সজোরে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মাদাম রেনলের দেহ কাঁপছে, নিজেকে আলিঙ্গন-মুক্ত করার মতন শক্তি তার নেই।

—'হতভাগ্য পুরুষ! কি করছ?' মাদাম আবার আর্তস্বরে বললেন।

আবেগে কম্পিত তাঁর কণ্ঠস্বর…শব্দগুলো ঠিক মতন উচ্চারণ করতে পারছেন না। রাগের ঝাঁজ কথায়।

—'ওগো, চৌদ্দমাসের নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের পর তোমায় দেখতে এসেছি।'

অস্বাভাবিক জোরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাদাম বললেন—'বেরোও এ ঘর থেকে। হায়! মঁসিয়ে চেলান কেন আপনি ওকে চিঠি লিখতে দিলেন না? তাহলে এই ভয়ানক ঘটনায় আমি বাধা দিতে পারতাম। নিজের পাপের জন্য আমি অনুশোচনা করছি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। বেরোও এ ঘর থেকে। তাড়াতাড়ি যাও।'

—'চৌদ্দ মাস ধরে দুঃখভোগ করেছি, এখন তোমার সব কথা না জেনে কিছুতেই আমি যাব না। তোমার সব কথা বল। তোমাকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি…তাই সব আমি জানতে চাই।'

তার কথায় মুরুব্বির ঝাঁজ মাদাম দ্য রেনলের ইচ্ছার উপর আঘাত হানল। কাম-লালসায় জর-জর জুলিয়ান মাদামের দেহ জড়িয়ে ধরেছে। আর নিজেকে মুক্ত করার জন্য মাদাম সমানে চেষ্টা করছে। দু'জনের মধ্যে চলেছে নিঃশব্দ লড়াই।

জুলিয়ান বলল—'মইখানা টেনে তুলে নি। নইলে কোন চাকর-বাকর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বাইরে বেরোলে দেখে ফেলবে।'

এবার সত্যি সত্যি মাদাম রেগে গেলেন। বললেন—'না, ও কাজ করো না। বরং এখান থেকে এখুনি চলে যাও। লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না।

আমার ভয় ঈশ্বরকে। তুমি যে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করছ তার জন্যে তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন। এক সময়ে তোমাকে ভালবাসতাম, তুমি ছোটলোকের মতন সেই সুযোগ নিচ্ছ। শুনছ জুলিয়ান, আমার সে-মন বদলে গেছে।'

কোনও রকম সাড়া-শব্দ না জাগে এমনিভাবে ধীরে ধীরে মইখানা টেনে তুলছিল জুলিয়ান।

—'হাঁ গো, তোমার স্বামী আছে না-কি ঘরে?' পুরনো অভ্যাস মতন জুলিয়ান প্রশ্নটা করল।

—'ওভাবে আমার সাথে কথা বলবে না, বলছি! আমার স্বামীকে ডাকব এখুনি। যা' ঘটে ঘটুক, তোমাকে এতক্ষণ তাড়িয়ে দিই নি বলে আমার যা' অপরাধ হবার তা' ত হয়েছে। তবে তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে…' মাদাম রেনল তার অহঙ্কারী মনে আঘাত হানতে বললেন। তিনি এখন আক্রমণ করতে উদ্যত।

ঘনিষ্ঠতাকে নস্যাৎ করার এই বাচন-ভঙ্গি। অতি কোমল প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করার এই প্রবণতা…অথচ এই প্রেমের উপরই সে নির্ভরশীল। জুলিয়ানের কাম-লালসা এই আঘাতে উদভ্রান্ত হল।

—'এও কি সম্ভব তুমি আর আমাকে ভালবাস না?' বলল জুলিয়ান। সেই হৃদয়-ভেদী কণ্ঠস্বর। আবেদনে আকুল। যে কণ্ঠস্বর শুনে নীরব থাকা যায় না। মাদাম রেনল জবাব দিলেন না। কিন্তু জুলিয়ান কাঁদছিল। তার আর কথা বলবার মতন শক্তি নেই যেন শরীরে। জীবনে একমাত্র যে আমাকে ভালবেসেছিল সে তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে? আর বেঁচে থাকায় তাহলে লাভ কি? তার মনের সাহসও ঘুচে গেছে কেননা এখন আর তার সঙ্গে কোনও পুরুষের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রেম ছাড়া তার হৃদয়ে এই মুহূর্তে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এক সময় জুলিয়ান বলল—'তোমার সব কথা বল।'

মাদাম রেনল কর্কশ-কণ্ঠে বলতে লাগলেন। যেন তাঁর জীবনে যা' কিছু ঘটেছে তার সব কিছুর জন্যে দায়ী জুলিয়ান। অথচ চোদ্দ মাস আগে এমন অবস্থা ছিল না। অনুপস্থিতি সমস্ত কোমলভাব নষ্ট করে দিয়েছে।

—'দেখ, তুমি চলে যাওয়ার পর আমার ভুল সারা শহরের লোকরা জেনে ফেলল। তোমার আচরণ এই অসম্মান সৃষ্টি করল। আমার দেহ-মন নিরাশায় আচ্ছন্ন হল। এমন দিনে ফাদার চেলান এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি আমার স্বীকারোক্তি শোনবার জন্য বৃথা চেষ্টা করলেন। শেষে একদিন তিনি আমাকে দিজনের গীর্জায় নিয়ে গেলেন। কি ভয়ানক লজ্জার মুহূর্ত! ওখানে সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। দয়ালু মানুষ তিনি। তাই রাগ প্রকাশ করে আমার জীবনের ভার বাড়ালেন না। হলেন আমার দুঃখের ভাগী। প্রতিদিন একটা সময়ে বসে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখতাম, কিন্তু চিঠি তোমার কাছে পাঠাতে সাহস হত না। লুকিয়ে রাখতাম। মন খারাপ হলে

ঘরের দরজা বন্ধ করে সেই চিঠিগুলো পড়তাম। খান কয়েক চিঠি খুব সাবধানে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তুমি উত্তর দাও নি। অবশেষে ফাদার চেলান চিঠিগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন।'

—'কিন্তু ধর্ম-বিদ্যালয়ে তোমার কোনও চিঠি ত আমি পাই নি। দিব্যি করে বলছি।'

—'হায় ঈশ্বর! কে তাহলে চিঠিগুলো মাঝ-পথে হাতিয়ে নিল?'

—'তাহলে আমার মনের দুঃখ বুঝতে পারছ ত…গীর্জায় তোমাকে দেখবার আগে ভাবতেই পারি নি যে, তুমি বেঁচে আছ।'

মাদাম জবাব দিলেন—'ঈশ্বর আমায় করুণা করেছেন। অথচ আমি ঈশ্বরের, আমার সন্তানদের এবং স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করেছি। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস তোমার মতন আর কেউ আমাকে কোনদিন ভালবাসে নি।'

জুলিয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদাম রেনলকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু মাদাম তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, বলতে লাগলেন—'আমার মঙ্গল-কারী বন্ধু ফাদার চেলান আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মঁসিয়ে রেনলকে বিয়ে করে আমার মনের সব ভালবাসা তাঁকে উজাড় করে দেব বলে শপথ করেছি। আগে জানতাম না, এখন জেনেছি বিবাহ করার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সৃষ্টি হয়। দেখ, চিঠিগুলো দিয়ে দেওয়ার পর থেকে সবকিছু ভুলতে না পারলেও আমার জীবনে শান্তি ফিরে এসেছে। আমার শান্তি বিঘ্ন করো না। আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাক…।'

জুলিয়ানের দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। সে চুম্বনে চুম্বনে মাদামের হাত ভরে দিচ্ছিল।

—'দেখ, তুমি কেঁদো না…এবার তোমার কথা বল, শুনি। ধর্ম-বিদ্যালয়ে কেমনভাবে ছিলে সব খুলে বল। তারপর চলে যাও।' মাদাম রেনল বললেন।

অনেকক্ষণ ধরে আবোল-তাবোল বকবার পর জুলিয়ান বলল—'তোমার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এমন সময় তোমার পাঠানো পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক হাতে পেলাম।'

—'আমি কখনও ত অর্থ পাঠাই নি।' বললেন মাদাম দ্য রেনল।

—'কিন্তু খামে প্যারিসের ডাক-ঘরের ছাপ ছিল আর নাম সই ছিল পল সোরেলের। তাই ত আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে এ তোমার চিঠি।'

মাদাম রেনল সংক্ষেপে বললেন—'এবার চলে যাও।'

কি অসম্মান আমার জীবনে, ও আমাকে দরজা দেখিয়ে দিচ্ছে! এই অপমানের কাঁটা সারা জীবন ধরে আমার মনে বিঁধবে আর আমার জীবন বিষাক্ত করে তুলবে। ও কখনও আর আমাকে চিঠি লিখবে না। ঈশ্বর জানেন, এদিকে আর কবে ফিরে আসব। এলেও আমি আর ওকে পাব না। এই মুহূর্তে যে সুন্দরী যুবতী আমার পাশে বসে আছে একদিন কত না আনন্দ লাভ

করেছি তার সঙ্গে সহবাসে। আঁধারে ওকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওর বুকের ওঠা-নামা অনুভব করে বুঝতে পারছি যে, ও কাঁদছে। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভেরিয়ার শহর ছেড়ে ওরা গেল ভার্জিতে। সেখানে ওদের মিলন ঘটল। কি আনন্দে ওরা দিন কাটাত। তারপর এল বিচ্ছেদ। জুলিয়ান নির্বাসিত হল ধর্ম-বিদ্যালয়ে। নিরানন্দের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ চৌদ্দ মাস কেটে গেল।

সহসা জুলিয়ান বলে বসল—'জান, বিশপকে আমি শেষ বিদায় জানিয়ে এসেছি।'

—'কি! বেসানকনে আর ফিরে যাবে না! চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?'

জুলিয়ান দৃঢ় কণ্ঠে বলল—'হাঁ। জীবনে যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিলাম সে আমাকে ভুলে গেছে। এখানে তাই আর ফিরে আসব না। প্যারিসে চলে যাচ্ছি…।'

—'প্যারিসে চলে যাচ্ছ!' অবাক কণ্ঠে সজোরে বললেন মাদাম। কান্নায় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ।

এখন অসম সাহসের প্রয়োজন জুলিয়ানের, প্রয়োজন উৎসাহের। একটিমাত্র পদক্ষেপ তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারণ করবে। অধিকার…কিছুই তার নজরে পড়ছে না। মাদাম রেনলের এই রুদ্ধ কান্নার আওয়াজ এই মাত্র সে শুনল, এর তার কথাগুলো কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা' সে বুঝতে পারে নি। আর তার মনে কোন দ্বিধা নেই। নিজেকে সে সংযত করল। উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত-কণ্ঠে বলল—'হাঁ, মাদাম। চিরকালের জন্য সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি। তুমি সুখী হও। বি-দা-য়!'

সে জানালার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জানালাটা খোলার জন্য টানল।

তিন ঘণ্টা ধরে নিষ্ফল কথাবার্তার পর জুলিয়ানের মনের কাম-লালসা পূর্ণ হল।

কোথায় হারিয়ে গেল মাদামের মনের বিষণ্ণভাব! কাম-লালসায় ভরে গেল তাঁর মন। দেহমিলনের অপূর্ব কলা-কৌশলের চরিতার্থতায় তাঁর মনের আনন্দ কানায় কানায় ভরে উঠল। জুলিয়ান জেদ ধরল ঘরে বাতি জ্বালিয়ে প্রণয়িণীর দেহ-সৌন্দর্য নয়ন-ভরে দেখবে। কিন্তু মাদাম তার ইচ্ছায় বার বার বাধা দিলেন।

জুলিয়ান বলল—'তোমাকে দেখার কোন স্মৃতি না নিয়েই তুমি তাহলে আমাকে চলে যেতে বলছো? ওই সুন্দর চোখ-জোড়ার ভালবাসা-মাখানো দৃষ্টি আমার কাছে হারিয়ে যাবে? এই শঙ্খধবল হাত দু'খানা আমার কাছে অদেখা হয়ে থাকবে? একবার ভেবে দেখ, হয়ত বহুদিনের জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।'

এই ভাবনায় মাদাম রেনল কেঁদে ফেললেন, ওকে আর কিছু দিতে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। কিছুই আর অদেয় নেই তাঁর। ওদিকে যে দ্রুত ভোরের আলো ফুটছে। ভেরিয়ারের পূবদিকে পাহাড়ের উপর বিশাল ফার গাছ-গুলোর দেহ-রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চলে যাওয়ার কথা আর ভাবছে না জুলিয়ান। বুঝি দেহ-মিলন, প্রেম আর আনন্দের আবেগে তার মাথা বিগড়ে গেছে। তাই মাদামকে বলল যে সে সারাদিন তার ঘরে তার কাছে লুকিয়ে থাকবে এবং কাল রাতে চলে যাবে।

দু'হাতে জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরে মাদাম বললেন—'ওগো, কেন যাবে না? তোমার এই সাংঘাতিক প্রয়াস চিরকালের জন্যে আমার সম্মান নষ্ট করবে, আমার সুখ বিলীন হবে। না গো, না। আমার স্বামী আর আগের মানুষ নেই। আমাকে সন্দেহ করে। তার ধারণা, এ ব্যাপারে আমি তাকে ঠকিয়েছি। সে তাই আমার উপর বিরক্ত। তার কানে কোন শব্দ গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা জঘন্য পাপী আমি, সে ঠিক আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

এবার জুলিয়ান বলল—'ফাদার চেলানের কথাগুলো আওড়াচ্ছো। বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে ত তুমি এভাবে আমার সাথে কথা বলতে না। তখন তুমি আমাকে ভালবাসতে।'

এমন আবেদনের ভঙ্গিতে প্রাণে সাড়া জাগানো ভালবাসার কথা বলল জুলিয়ান যে, শেষ পর্যন্ত তারই জয় হল। বাড়ীতে স্বামীর উপস্থিতিতে ধরা পড়ার জানা-জানি হওয়ার ভয় রয়েছে···কিন্তু তাঁর ভালবাসায় সন্দেহ করছে, সে যে তাঁর কাছে আরও ভয়ানক, আরও বিপজ্জনক। ভোরের আলো আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, ঘরখানা এখন আলোয় আলোময়। নতুন করে এই মোহিনী নারীর রূপ-সুধা পান করল, তার নয়ন তিরপিত ভেল। এই নারীতেই ত তার মন একমাত্র মজেছে, ভালবেসেছে তাকে। খানিক আগে যে নারী ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হয়ে বিবর্ণ ছিল সেই এখন প্রেমের করণীয় কাম-কৃতি সম্পাদনের জন্য তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে।

অচিরে বাড়ীর মধ্যে জীবনের সাড়া জাগল।

মাদাম তাঁর প্রণয়ীকে বললেন—'ওগো, সেই বদমাইস মাগি এবার এঘরে আসবে। এতবড় মইখানা কোথায় রাখব? কোথায় লুকিয়ে রাখব ওখানা? ঠিক আছে, মইখানা আমি চিলে-কুঠরিতে রেখে আসছি।' মাদামের কণ্ঠস্বর ছেলেমানুষের মতন তরল।

জুলিয়ান অবাক-কণ্ঠে বলল—'কিন্তু তোমাকে ত চাকরদের ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।'

—'মইখানা বারান্দায় রেখে চাকরটাকে ডেকে আমার কোন কাজে পাঠিয়ে দেব।'

—'বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় মইখানা দেখে ও যদি কিছু জিজ্ঞেস করে তার

জবাবও ভেবে রাখ।'

মাদাম রেনল খুশি হয়ে জুলিয়ানকে আদর করলেন, চুমু দিয়ে বললেন—'ঠিক বলেছ, সোনা। আর তখন এলিসা যদি এ ঘরে ঢোকে তাহলে আমার খাটের নীচে লুকিয়ে পড়বে। আমি ত ঘরে থাকব না।'

মাদামের মনে এই আকস্মিক উল্লাসের স্ফুরণ দেখে বিস্মিত হল জুলিয়ান। তাহলে এখন সত্যিকারের বাস্তব বিপদের সম্ভাবনা আর মাদামকে উদ্বিগ্ন করছে না, আবার তার মন পালকের মতন হালকা হয়ে উঠেছে, দূর হয়েছে বিষণ্ণ ভাব। সত্যিকারের একজন বরণীয়া নারী! এমন হৃদয়ের উপর আধিপত্য করা গৌরব-জনক? জুলিয়ান মন্ত্রমুগ্ধ হল।

খুব ভারী মইখানা। মাদাম সেখানা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে রাখলেন। জুলিয়ান তাকে সাহায্য করল। তিনি চাকরটাকে ডাকলেন এবং জুলিয়ানকে পোশাক পরার সুযোগ দেওয়ার জন্য চিলে-কোঠায় উঠে গেলেন। খানিক পরে নীচে নেমে এলেন। মইখানা আর নজরে পড়ল না। কোথায় গেল সেখানা? জুলিয়ান যদি বাড়ী ছেড়ে চলে যেত তাহলে তার কোনও বিপদের সম্ভাবনা থাকত না কিন্তু এই মুহূর্তে মইখানা যদি তার স্বামীর নজরে পড়ে তবে কি হবে! এই ঘটনার পরিণাম বড় বিষময় হয়ে উঠবে। সারা বাড়ী ছুটোছুটি করলেন মাদাম। অবশেষে নজরে পড়ল চাকরটা মইখানা ছাদের নীচে আটকে রেখে দিয়েছে। এ এক বিচিত্র অবস্থা...অথচ ঘটনাটা খানিক আগে তাঁকে শঙ্কিত করে তুলেছিল।

আচ্ছা, চব্বিশঘণ্টা পরে জুলিয়ান যখন চলে যাবে তখন আমার অবস্থা কি হবে? তখন সব কিছুই কি আমার কাছে ভীতিজনক আর বিষণ্ণময় হয়ে উঠবে না? তাঁর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, একদিন তিনি আত্মহত্যা করবেন...কিন্তু তাতে কি এসে যাবে? এই নিষ্ঠুর দীর্ঘ-বিচ্ছেদ-কাল শেষে সে আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। অফুরন্ত প্রেমের স্বাদে তাঁর জীবন আনন্দময় করে তুলেছে। অথচ তিনি ভাবছিলেন যে, তাঁদের এই বিচ্ছেদ চিরন্তন।

সরাইখানার ঘটনা তিনি জুলিয়ানকে বলে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যাঁগো, মইখানা পাওয়ার কথা চাকরটা যদি আমার স্বামীকে বলে তবে কি জবাব দেব?' তারপর খানিক ভেবে আবার নিজেই বললেন—'যে চাষী তোমাকে মইখানা বেচেছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তাকে খুঁজে বার করবে। দারুণ কাম-লালসায় তিনি জুলিয়ানকে দু' বাহু-ডোরে বাঁধলেন। তাঁর দেহে প্রেমের আক্ষেপ। চুম্বনে চুম্বনে জুলিয়ানের মুখ ভরে দিতে দিতে বললেন—'ওগো, এমনি ভাবে যদি মরতে পারতাম! কিন্তু তোমাকে ত আমি অনাহারে মরতে দিতে পারি না।' সোহাগে আদরে ভরে উঠল জুলিয়ানের মন।

—'দাঁড়াও, মাদাম দারভিলের ঘরে তোমার থাকার ব্যবস্থা করি। ঘরখানা ত সব সময় চাবি-বন্ধ থাকে।' বলতে বলতে উঠে গেলেন মাদাম। বারান্দার

শেষে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। এ ঘর থেকে বেরিয়ে জুলিয়ান ও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে মাদাম বললেন—'ওগো, কেউ যদি দরজায় টোকা দেয় ত দরজা খুলো না। হয় ত ছেলেরা খেলতে খেলতে দরজায় টোকা দেবে।'

—'ওদের একবার বাগানে আমার জানালার নীচে এনো। ওদের সাথে কথা বলো। আনন্দ পাব।'

চলে যেতে যেতে মাদাম বললেন—'হ্যাঁ, আনব।'

খানিক পরে কমলা লেবু, বিস্কুট আর এক বোতল মালাগা মদ নিয়ে ফিরে এলেন মাদাম। না, তিনি রুটি চুরি করতে পারলেন না।

জুলিয়ান জিজ্ঞাসা করল—'তোমার স্বামী ফিরেছে, গো?'

—'কয়েকজন চাষীর সাথে বিক্রি-কবলা লেখাচ্ছেন।'

বেলা আটটা বাজল। বাড়ীময় এখন নানা সাড়া শব্দ। কোথাও মাদাম রেনলকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই তাই তাঁর খোঁজ করছে। ওকে ছেড়ে তাই তাঁকে চলে আসতে হল। কোনও রকম সাবধানতা অবলম্বন না করে এক সময় তিনি তাকে এক কাপ কফি এনে দিলেন। তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন কেননা হয় ত অনাহারে জুলিয়ান মারা পড়বে। সকালের খাওয়া-দাওয়া চুকল। ছেলেদের নিয়ে মাদাম বাগানে এলেন। দাঁড়ালেন ঠিক মাদাম দারভিলের ঘরের জানালার নীচে।

সারা সকাল মঁসিয়ে রেনল বাড়ী থেকে বেরলেন না। চাষীদের সঙ্গে একটা চুক্তি করার কাজে ব্যস্ত রইলেন। বার বার উপর নীচে যাতায়াত করলেন। কাজেই বন্দীর দিকে সারাক্ষণ নজর রাখতে হল মাদাম রেনলকে। অবশেষে মধ্যাহ্ন-ভোজের ঘণ্টা বাজল। খাদ্য পরিবেশন করল। মাদাম এক প্লেট ঝোল নিয়ে বন্দীকে দিতে চললেন গোপনে। কিন্তু তখনি চাকরটা সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠছিল। হয়ত তার মনে সন্দেহ হয়েছে। মাদামকে দেখে চাকরটা লজ্জা পেয়ে সরে গেল। ভয়ে কম্পিত হল মাদামের দেহ।

মাদাম রেনল বললেন জুলিয়ানকে—'তুমি খুব ভয় পেয়েছ, তাই না! আমি কিন্তু সংসারের সব বিপদ এখন মাথা পেতে নেব। কেবল একটা ভয়, যখন তুমি চলে যাবে এবং আমি একলা থাকব তখন আমার কি হবে!' বলতে বলতে মাদাম ছুটে চলে গেলেন।

আহা! জুলিয়ানের মন খুশিতে উপচে পড়ল…বিষণ্ণতা ছাড়া এই রমণী আর কিছুতে ভীত নয়!

সন্ধ্যা নামল। মঁসিয়ে রেনল ক্লাবে চলে গেলেন। মাদাম রেনল জানালেন তাঁর ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বিছানায় শুতে গেলেন। সরিয়ে দিলেন এলিসাকে। তারপর উঠে গিয়ে জুলিয়ানকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

জুলিয়ান জড়িয়ে ধরল মাদাম রেনলকে। এমন সুন্দরী তাকে আর কোন সময় মনে হয় নি।

দারুণ ক্ষুধায় অধীর হয়ে জুলিয়ান রাতের খাবার খাচ্ছিল। আর তার প্রণয়িনী ছোট-খাট রসিকতা করছিল এমন সময় দরজাটা সজোরে নড়ে উঠল। মঁসিয়ে রেনল দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলেন।

—'সন্ধ্যে বেলায় দরজা বন্ধ করে আছ কেন ?'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মঁসিয়ে রেনল বললেন—'একি ! খাওয়া-দাওয়া সেরে পোশাক পরে ঘরে বসে আছ দরজায় চাবি দিয়ে !'

অন্যদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের রসিকতা শুনলে মাদাম রেনল বিব্রত হয়ে পড়তেন কিন্তু এখন তিনি জানেন সামান্য নীচু হয়ে তাকালেই তাঁর স্বামীর নজরে জুলিয়ান পড়বে। এক মুহূর্ত আগে জুলিয়ান যে চেয়ারখানায় বসেছিল মঁসিয়ে রেনল এখন সেই চেয়ারখানায় বসলেন। তাঁর নজর সোজা সোফার দিকে।

মাথার যন্ত্রণা একটা সুন্দর ওজর হল। মঁসিয়ে রেনল ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করছিলেন—'জান, আজ খুব জিতেছি খেলায়। উনিশ ফ্রাঙ্ক পেয়েছি।' সহসা মাদাম রেনলের নজরে পড়ল ফুট তিনেক দূরে আর একখানা চেয়ারের উপর জুলিয়ানের টুপিটা পড়ে রয়েছে। মাদাম নিজের পোশাক খুলতে সুরু করলেন এবং স্বামীর পিছনে গিয়ে একটা পোশাক দিয়ে টুপিটা ঢাকা দিয়ে দলেন।' কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক করল না।

অবশেষে মঁসিয়ে রেনল চলে গেলেন।

মাদাম রেনল আবার জুলিয়ানকে অনুরোধ করলেন—'ওগো, ধর্ম-বিদ্যালয়ে কিভাবে ছিলে এবার বলো। কাল যখন বলছিলে আমি শুনি নি। কি করে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব তাই কেবল ভাবছিলাম।'

তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বলতা দেখা দিল।

তখন রাত দু'টো। তাঁরা দু'জনেই জোরে জোরে কথা বলছিলেন।

সহসা মঁসিয়ে রেনল সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। বাইরে থেকে বললেন—'তাড়াতাড়ি দরজা খোল। বাড়ীতে চোর ঢুকেছে। চাকরটা আজ সকালে ওদের মই পেয়েছে।'

জুলিয়ানের আলিঙ্গনে আবদ্ধা মাদাম রেনল আরও কাম-লালসায় জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন—'ব্যস ! সব কিছুর শেষ। আমাদের দু'জনকেই খুন করতে আসছে ও। চোর ঢুকেছে এ কথা ও বিশ্বাস করে না। এমনিভাবে তোমার আলিঙ্গনে থেকে আমি মরব। এ মরণ হবে সুখের। এমন সুখ আর জীবনে পাব না।'

আদেশের ভঙ্গিতে জুলিয়ান বলল—'মাথা ঠাণ্ডা রাখ, স্ট্যানিসলাসের মা। আমি পোশাকের ঘরের জানালা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ছি বাগানে। আমার পোশাকগুলো পুঁটুলি করে নীচে ফেলে দিও। এর মধ্যে ও দরজা ভেঙ্গে ঘরে

ঢুকুক। ওদের কাছে কিছু স্বীকার করো না। নিশ্চিত হওয়ার চেয়ে বরং সন্দেহ করাই ভাল।'

জবাব দিলেন তিনি—'লাফিয়ে পড়লে তুমি মারা যাবে।' এটাই তার মনের একমাত্র উদ্বেগ।

তিনি তার সাথে পোশাকের ঘরে ঢুকলেন। তার পোশাক ছুঁড়ে ফেলার সময় নিলেন। অবশেষে দরজা খুললেন।

রাগে টঙ হয়ে ভিতরে এলেন মঁসিয়ে রেনল। ঘরের চার দিকে নজর বুলোলেন। মুখে একটা কথাও নেই। এ ঘর থেকে পোশাকের ঘরে ঢুকলেন। তারপর অদৃশ্য হলেন।

বাগানে লাফিয়ে পড়েছিল জুলিয়ান।

পোশাকের বাণ্ডিলটা নিয়ে জুলিয়ান দোব নদীর তীরের দিকে ছুটতে লাগল। পিছনে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল। এক ঝাঁক গুলি শিস্ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে ভাবল, মঁসিয়ে রেনল নিজে গুলি ছুঁড়ছেন না। কেননা বন্দুক ছোঁড়ায় তিনি তত পারদর্শী নন। কুকুরগুলো নিঃশব্দে তাঁর পাশে ছুটছিল। দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হল। একটা কুকুর যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। বোধ হয় ওর পায়ে গুলি বিঁধেছে। একটা পাঁচিল লাফ দিয়ে টপকাল জুলিয়ান…গাছ-গাছড়ার আড়ালে কয়েক পা ছুটে গেল। তারপর ভিন্ন দিকে বাঁক নিল। ওরা পরস্পর পরস্পরকে চেঁচিয়ে ডাকছিল…ও স্পষ্ট শুনল। পরিষ্কার নজরে পড়ল ওর শত্রু খানসামা গুলি ছুঁড়ছে আর একজন চাষী দলে ভিড়েছে। সে বাগানের আর এক দিকে এলোমেলোভাবে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু জুলিয়ান তখন দোবের তীরে পৌঁছে গেছে। সে পোশাক পরে নিল।

ঘণ্টাখানেক পরে সে ভেরিয়ার ছেড়ে মাইল তিনেক দূরে চলে এল।

চলেছে সে জেনেভার দিকে।

জুলিয়ান ভেবে দেখল, সন্দেহ করলে ওরা প্যারিসের পথেই তার অনুসন্ধান করবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সুন্দরী নয় সে, সে রুজ মাখে না।

—সেণ্ট বভ্

১: গ্রাম্য-জীবনের আনন্দ

হে আমার স্বদেশ-ভূমি দৃশ্য, কবে তোমাকে
দেখে আমার দু'চোখ জুড়োবে!

—হোরেস

প্রাতরাশের জন্য একটা পান্থশালায় উঠেছিল জুলিয়ান। পান্থশালার মালিক

বলল—'স্যার, সন্দেহ করবেন না। আসুন। প্যারিসের ডাক-গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

—'আজকের বা আগামীদিনের···তা' নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।' জবাব দিল জুলিয়ান।

ডাক-গাড়ী নিয়ে সে যখন তার অনাসক্তি প্রকাশ করছে ঠিক তখনি ডাক-গাড়ী এসে দাঁড়াল। দুটো বসবার আসনও রয়েছে ফাঁকা।

জুলিয়ানের সাথে একই সময়ে আরও একজন গাড়ীতে উঠছিল, তাকে উদ্দেশ করে জেনেভার দিক থেকে আগত একজন যাত্রী বলে উঠল—'এ কি! হতভাগা ফ্যালকজ তুমি?'

ফ্যালকজ বলে উঠল—'মনে হচ্ছে! তা' তুমি ত জানি, এই দিকে রোন নদীর ধারে লয়েনস্ গ্রামের কাছে স্থিতু হয়েছ। বসবাস করছ।'

—'হাঁ খুব সুন্দর বসবাস করছি! ওখান থেকে পালাচ্ছি।'

—'সত্যি বলছ! পালাচ্ছ তুমি? তুমি সেণ্ট জিরদ, সবাই তোমায় মান্যি-গন্যি করে, কোন অপরাধ করেছ না-কি? হাসতে হাসতে শুধাল ফ্যালকজ।

—'সত্যি কথাই বলছি! এই নোংরা গ্রাম্য-পরিবেশ ছেড়ে পালাচ্ছি। জান ত, শীতল বনভূমি আর ছায়া-ঘেরা মাঠ আমি ভালবাসি···এমন ভাবপ্রবণ হওয়ার জন্য কতদিন তুমি আমাকে দোষ দিয়েছ। জীবনে কখনও রাজনীতির কচকচানি শুনতে চাই নি, আজ সেই রাজনীতি আমাকে তাড়াচ্ছে।'

—'কিন্তু তুমি কোন দলের হে?'

—'কোন দলের নই···আর তাই আমার এই সর্বনাশ। আমার জীবনের রাজনীতি হচ্ছে···সঙ্গীত পছন্দ করি, ছবি ভালবাসি, একখানা ভাল বই হাতে পাওয়া আমার জীবনে বড় পাওয়া। বয়স আমার চুয়াল্লিশ। আর কত দিন বাঁচব? পনের, কুড়ি···কিংবা বড় জোর তিরিশ বছর। ধর, তিরিশ বছরই বাঁচলাম, ধর্ম-যাজকদের আর একটু বেশী চালাক হওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা আজকাল সব পরিচ্ছন্ন-মন ভদ্রলোক। ইংরাজী ইতিহাস আমার কাছে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দর্পণ। রাজা থাকবেন এবং তাঁর বিশেষ অধিকার ভোগ করতে চাইবেন, উচ্চাভিলাষী লোকেরাও চাইবে আইন-সভার সভ্য হতে···নামজাদা হাজার ফ্রাঙ্কের মিরাবোর মুনাফা এই গ্রাম্য ধনীদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে। তারা সবাই লিবারেলপন্থী হয়ে জনগণের বন্ধু সাজতে চাইবে। আর দক্ষিণী চরমপন্থীরা স্বপ্ন দেখবে লর্ডসভার সভ্য হতে অথবা অভিজাত ভদ্র-কুলীন বনতে। প্রত্যেকেরই নজর সরকারী জাহাজের মাঝির পদের দিকে। কারণ এই পদলাভে মোটা আয়ের ব্যবস্থা হয়। তাহলে সরল-স্বভাব যাত্রীরা কি একটা ছোটখাট সামান্য স্থানও পাবে না?'

—'ঠিক বলেছ। আর তোমার ঠাণ্ডা মেজাজের সঙ্গে খাপ খেলে সেটা খুবই আনন্দের হবে। তোমাকে যখন গ্রাম্য-পরিবেশ থেকে তাড়াচ্ছে তাহলে

এটাই কি শেষ নির্বাচন হবে ?'

—'আমার বিপদ খুব পুরনো। বছর চারেক আগে আমার বয়স ছিল চল্লিশ। তখন আমার হাতে রেস্ত ছিল পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক···এখন আমার চার বছর বয়স বেড়েছে। অথচ হাতে আছে পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। রোন নদীর ধারে মণ্টফ্লুরিতে অবস্থিত আমার সুন্দর পল্লীনিবাস বিক্রয় করার ফলে এই অবস্থা হয়েছে।'

—'প্যারিসে উনিশ শতকের সভ্যতা যে ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য করে সেই মিলনান্ত নাটক দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সহানুভূতি-সম্পন্ন, সহজ-গামী, সরল-জীবন যাপনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলাম। তাই ত রোন নদীর তীরে জমি-জমা কিনেছিলাম। না, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হয় না।'

—'ছ' মাস ধরে গ্রামের ধর্মযাজক এবং প্রতিবেশী গ্রামের কুচক্রী জমিদার আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিল। ওদেরকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বলেছিলাম, প্যারিস ছেড়ে এসেছি কেননা অবশিষ্ট জীবনে আর রাজনীতিতে যোগ দিতে বা আলোচনা করতে চাই না। দেখছ ত, খবরের কাগজ পর্যন্ত রাখি না। ডাক-পিয়ন যে সামান্য কয়েকখানা চিঠি আনে ওতেই আমি খুশি।'

—'কিন্তু ওতে ধর্মযাজক খুশি হল না। ফলে গাদা গাদা ধৃষ্টতামূলক আবেদন-পত্র আমার কাছে আসতে লাগল। একে সাহায্য কর, অমুক সংস্থায় চাঁদা দাও। কেবল দাও আর দাও। আমি রাজী হলাম না। অমনি নানা ভাবে ওরা আমাকে অপমান করতে সুরু করল। বোকা আমি তাই বিরক্ত হলাম। ব্যস! সকালে যে পাহাড়ের দিকে একটু বেড়াতে যাব তার উপায় রইল না। মানুষগুলো নানা রকম বদ কাজ করে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে লাগল। আমার ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে গেল। ধর্মযাজক বলল, নাস্তিকের জমি তাই অমন অবস্থা হয়েছে। গ্রামের একজন ধর্ম-পরায়ণা নারীর দুধলো গাইটা মরে গেল···ধর্মযাজক বলল, প্যারিস থেকে আসা মুক্ত-চিন্তার, ঈশ্বর-বিরোধী মানুষ আমি এবং আমার পুকুরটার জন্যই গরুটা মরেছে। সপ্তাহখানেক পরে দেখলাম, আমার পুকুরের সব মাছ মরে পেট উল্টে ভাসছে, চূণের বিষে ওরা মরেছে। গ্রামের যত দুষ্ট আর বদমায়েস লোক আমাকে ঘিরে ফেলল। শান্তিরক্ষক একজন সুন্দর ভদ্রলোক, কিন্তু খোয়াবার ভয়ে সে আমার বিরুদ্ধে রায় দিল। আমার শান্তির বাসভূমি আমার কাছে নরক হয়ে উঠল। এক সময় দেখলাম গ্রামের ধর্মসভার প্রধান ওই ধর্মযাজক আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল, উদারপন্থীরা তার কথায় সায় দিল। কেউ আর আমায় সমর্থন করল না। রাজমিস্ত্রী, যাকে এক বছর ধরে কাজ দিয়ে আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, সেও আমার বিরুদ্ধে গেল। গরুর গাড়ীর মিস্ত্রী আমার গাড়ীর চাকা খুলে নিয়ে পালাল। সমর্থন পাওয়ার জন্যে এবং আদালতে মামলায় সুবিধে হবে ভেবে উদারপন্থীদের দলে নাম লেখালাম। কিন্তু ওই যে তুমি

বলছিলে, নির্বাচন আসন্ন…ওরা আমার ভোট প্রার্থনা করল…।'

—'যাকে চেন না তার জন্য ভোট চাইল ত… ।'

—'একেবারেই না, যাকে আমি ভালভাবে চিনি তার জন্য ভোট চাইল। আমি অস্বীকার করলাম! আরে বাপ, দারুণ অবিবেচকের মতন কাজ করলাম! সেই মুহূর্ত থেকে উদার-পন্থীদের কাছেও আমি হলাম ঘৃণার পাত্র। অসহ্য হল আমার অবস্থা। সত্যিই বলছি আমার বিশ্বাস, ধর্মযাজক যদি অভিযোগ আনে যে, আমি আমার বাড়ীর ঝি-কে খুন করেছি তাহলে দু'দলের অন্ততঃ বিশ জন সাক্ষী হলফ করে বলবে এই খুনের সত্য ঘটনা তারা নিজের চোখে দেখেছে।'

—'তাহলে তুমি তোমার প্রতিবেশীদের আবেগের সঙ্গী না হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী না হয়ে গ্রামে বাস করতে চাইছ। এটা ত দারুণ ভুল!…'

—'যা হোক ভুল শুধরে নিয়েছি। মণ্টফ্লুরির সম্পত্তি বিক্রি করব ঠিক করেছি। বিক্রি হলে আবার পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক হারাব, কিন্তু তাতেও আমার মহা আনন্দ…এই বিরক্তিকর আর ভণ্ডামির নরক আমি ছাড়তে চাই। ফ্রান্সের যে অঞ্চলে অনাবিল শান্তি বিরাজ করছে এবার সেখানেই চলে যাব। অবশ্য মাঝে মাঝে ভাবছি, ধর্মযাজকদের মধ্যে রুটির টুকরো বিলিয়ে আবার নতুন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে পড়ব কি-না।

—'কিন্তু বোনাপার্টের রাজত্বকালে কিছুতে তোমার এমন অবস্থা হত না।' বলল ফ্যালকজ। তার দৃষ্টিতে রাগ আর দুঃখের মিলিত স্পর্শ।

—'হয় ত কথাটা ঠিক! তবে তোমার বোনাপার্ট নিজের পদ বজায় রাখতে পারল না কেন? আজ আমাকে যা' কিছু সহ্য করতে হচ্ছে তার জন্যে দায়ী ত বোনাপার্ট।'

জুলিয়ান কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। ওদের কথোপকথনের সুরু থেকেই সে বুঝতে পেরেছে যে, এই বোনাপার্ট-পন্থী মঁসিয়ে রেনলের শৈশবের বন্ধু। এবং এই সেণ্ট জিরদ হচ্ছে জেলাশাসকের অফিসের সিনিয়র কেরাণীর ভাই…এই কেরাণীটি সরকারী বাড়ী সস্তায় ভাড়া করতে সক্ষম হয়েছে।

সেণ্ট জিরদ তখনও বলছিল—'আর এসব তোমার বোনাপার্টের কাজের ফল…চল্লিশ বছর বয়সের একজন পরিচ্ছন্ন এবং শান্তিকামী ভদ্রলোক পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্কের মালিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের বুকে শান্তিতে বাস করতে পারল না। ওরই দলের পুরোহিত আর অভিজাতরা তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল।'

ফ্যালকজ বলল—'আহা! তাঁকে গাল দিও না। তাঁর তের বছরের রাজত্বকালে ফরাসীদেশ অন্য জাতিসমূহের কাছ থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। তখন লোকদের প্রতিটি কাজে মহানুভবতার গুণ যুক্ত ছিল।

চুয়াল্লিশ বছরের মানুষটা জবাব দিল—'তোমার সম্রাট শয়তানের খপ্পরে পড়ুক। একমাত্র লড়াইয়ের ময়দানে তার মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল। আবার দু'মাসের কাছাকাছি সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থা কিছুটা গড়ে তুলতে পেরেছিল।

কিন্তু তারপর তার চরিত্রের কি অবস্থা হয়েছিল ? কি হয়েছিল তার মন্ত্রীদের অবস্থা ? কি বা হয়েছিল তার আড়ম্বর ও জাঁকজমকের ? তুইলারিস শহরে কি ভাবে তাকে সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ? রাজতন্ত্রের বিবেচনাহীন ভ্রান্তির এক নতুন সংস্করণ সৃষ্টি করেছিল। সেটা ছিল সংশোধিত সংস্করণ এবং আগামী দু'এক শতাব্দী ধরে তা বজায় থাকবে। অভিজাত এবং পুরোহিতরা আবার নতুন অবস্থায় ফিরে এসেছে। কিন্তু জনগণকে দলে টানবার মতন লৌহ-কঠিন ক্ষমতা তাদের নেই।'

—'ঠিক যেন বুড়ো মুদ্রাকরের মত কথা বলছ!'

মুদ্রাকর রেগেমেগে বলল—'আমার জমি থেকে কে আমাকে তাড়াল? সরকার যেভাবে ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী এবং জ্যোতিষীদের সাথে ব্যবহার করেছিল তেমনভাবে পুরোহিতদের সাথে ব্যবহার না করে নেপোলিয়ন এই সব পুরোহিতদের সমাজে স্থান দিয়ে চুক্তি করেছিল এবং তাদের পেশায় সাহায্য করেছিল। বোনাপার্ট যদি জমিদার এবং অভিজাতদের সমাজ সৃষ্টি না করত তাহলে কি এই সব উদ্ধত রাজপুরুষদের অস্তিত্ব থাকত ? না, ওরা সব সমাজে অচল হয়ে গিয়েছিল। পুরোহিতদের পরে এই সব অভিজাত রাজপুরুষরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করেছে এবং আমাকে উদারপন্থী হতে বাধ্য করেছে।'

এক নাগাড়ে ওরা কথা বলছিল। ফরাসীদের মধ্যে এই মনোভাব আরও অর্ধ শতাব্দী ধরে বজায় থাকবে। সেন্ট জিরদ বার বার যখন বলছিল যে, গ্রামে বাস করা কেমনভাবে তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে···তখন জুলিয়ান ভয়ে ভয়ে মঁসিয়ে রেনলের নাম উল্লেখ করল।

ফ্যালকজ বলল—'যুবক, তুমি ত দেখছি বেশ সরল লোক। ওই মানুষটি হাতুড়ির মতন শক্ত-ধাতের মানুষ, ভয়ঙ্কর স্বভাব। তাকে কখনও রেহাই করা যাবে না। শুনেছি, ভালেনদ তাকে জ্বালাতন করার চেষ্টা করছে। সেই বদমাসটাকে চেন তুমি ? ও একটু নিথাদ বস্তু। আগামী কোন দিন তাকে বরখাস্ত করে ওই মঁসিয়ে ভালেনদকে যদি তার জায়গায় বসানো হয় তবে তোমার মঁসিয়ে রেনল কি বলবেন ?'

সেন্ট জিরদ মন্তব্য করল—'তার অপরাধের বোঝা নিয়ে তাকে সরে যেতে হবে। তুমি তাহলে ভেরিয়ার শহর চেন, যুবক ? তাহলে দেখছ বোনাপার্ট এদের সৃষ্টি করেছে···তার রাজকীয় কীর্তির ফলে রেনল এবং চেলনদের উদ্ভব হয়েছে, আবার তাদেরই জন্য সমাজে গজিয়েছে এই সব ভালেনদ আর ম্যাসলনরা।'

এই বিষণ্ণময় রাজনীতির কচকচানি শুনে জুলিয়ান অবাক হল, ইন্দ্রিয়সুখবর্ধক স্বপ্ন থেকে তার মন সরে গেল। দূর থেকে প্যারিস শহর দেখবার আগেই তার সামাজিক অবস্থার কথা কিছুটা জানতে পেরে জুলিয়ান অভিভূত হল। বুঝতে পারল নিজের ভাগ্য রচনার জন্য তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে···অথচ এখনও

চব্বিশ ঘণ্টা আগে সংঘটিত ভেরিয়ার শহরের স্মৃতি তার মনে জাগরূক রয়েছে। মনে মনে শপথ করল যদি এই সব হঠকারি যাজকদের ক্রিয়াকলাপের ফলে ফরাসীদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে অভিজাত-পুরুষদের হত্যা করা হয় তবে সে তার প্রণয়িণীর পুত্রদের কখনও পরিত্যাগ করবে না।

সেদিন রাতে ভেরিয়ারে পৌঁছে দেওয়ালে মই লাগিয়ে ঘরে ঢুকে সে যদি মঁসিয়ে রেনল বা অন্য কাউকে ঘরে দেখতে পেত তাহলে তার কি অবস্থা হত? অথচ সেই প্রথম দু'ঘণ্টা অন্ধকারে প্রণয়িণীর পাশে বসে সে বার বার তার কথা বলছিল আর তার প্রণয়িণী তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল সেই ক্ষণটা তার জীবনে কত রমণীয় স্মৃতি বহন করছে! এই স্মৃতি জুলিয়ানের মতন মানুষের জীবনে চিরদিন জাগরূক থাকবে! চোদ্দমাস আগে প্রথম যেদিন তারা কাম-পীড়িত হৃদয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তেমনিভাবে এ রাতের মিলনের স্মৃতিও তার মনে জট পাকিয়ে গেছে।

রাস্তাটার নাম জঁা-জ্যাকুস্-রুশো। এখানেই ডাক-গাড়ীর আস্তানা।

ওদের গাড়ী দাঁড়াল।

জুলিয়ান একখানা ঘোড়ার গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে বলল—'স্যালমাইসনে যাব, নিয়ে চল।'

—'দিনের এই সময়, স্যার? সেখানে কি প্রয়োজন আপনার?'

—'তা' তোমার জানবার দরকার নেই। চল!'

সব মৌলিক আবেগের ধর্ম আর কিছু ছাড়া নিজেকে চিন্তা করা। প্যারিসে আবেগের কোন স্থান নেই কেননা এখানে প্রতিবেশীরা সর্বক্ষণ তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে মুখিয়ে আছে। স্যালমাইসন দেখে জুলিয়ান গভীর আনন্দ লাভ করল। তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার দেখতে যাওয়ার আগে জুলিয়ান বহুক্ষণ ধরে দ্বিধা করল...এই সাংঘাতিক জায়গাটা সম্পর্কে তার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। গভীরে প্রোথিত সন্দেহ একালের প্যারিস শহরকে প্রশংসা করতে তাকে বাধা দিচ্ছে। তার আদর্শ বীর যে-সব স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গেছেন সে-সব দেখেই সে মুগ্ধ। এই শহর ভণ্ডামি আর জটিলতার কেন্দ্রভূমি। এখানেই এ্যাবি গু-ফ্রিলেয়ারের পৃষ্ঠপোষকরা প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা ফাদার পিরার্দের সাথে দেখা করার মতলব করল জুলিয়ান।

শান্ত আর নিরুত্তাপ কণ্ঠে ফাদার পিরার্দ তার কাছে মারকুইসের পারিবারিক পরিবেশ বর্ণনা করলেন।

—'দেখ, কয়েক মাসের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয়তা যদি তুমি প্রমাণ করতে না পার তবে আবার তোমায় সদর-দরজা পেরিয়ে ধর্ম-বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে। মারকুইসের বাড়ীতেই তুমি থাকবে, তিনি ফরাসী দেশের একজন সম্ভ্রান্ত

রাজপুরুষ। কালো পোশাক পড়তে হবে তোমায়, তবে সে পোশাক পাদরীদের পোশাক নয়। তবে আমি চাই এখানকার কোন বিদ্যালয়ে ধর্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে সপ্তাহে তিনদিন পড়াশুনা করবে, আমি চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে দেব। প্রতিদিন বেলা বারোটার মধ্যে তুমি মারকুইসের লাইব্রেরী ঘরে হাজির হবে। তিনি তোমাকে দিয়ে মামলার এবং নানা-ধরনের ব্যবসার চিঠি-পত্র লেখাবেন। প্রাপ্ত চিঠির মারজিনে মারকুইস্ নোট লিখে দেবেন, তুমি সেই নোট দেখে চিঠির জবাব লিখবে। বলেছি, মাসতিনেকের মধ্যেই তুমি তোমার করণীয় কাজ বুঝে নিতে পারবে এবং তখন তোমার লেখা জবাবের নীচে মারকুইস্ নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাক্ষর করতে পারবেন। রাত আটটার সময় লেখার টেবিল গুছিয়ে ফেলবে এবং দশটার সময় তোমার ছুটি।'

জুলিয়ান মন দিয়ে সব শুনতে লাগল।

ফাদার পিরার্দ বলতে লাগলেন—'এমন হতে পারে, কোন বৃদ্ধা মহিলা বা মৃদু-বাক কোনও ভদ্রলোক প্রচুর সুযোগ সুবিধা বা সোনাদানার প্রলোভন দেখিয়ে তোমার কাছে মারকুইসের চিঠি দেখতে চাইতে পারে…'

কথা শুনে জুলিয়ান লজ্জায় লাল হল।

জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে ফাদার পিরার্দ বলতে লাগলেন—'এটা ত খুব বিচিত্র ব্যাপার, মারকুইস তোমাকে জানলেন কি করে?…জানি না কেমন করে। এখন উনি তোমাকে এক শ' লুই বেতন দেবেন। উনি নিজের মর্জি মতন কাজ করেন এবং এটাই মারকুইসের দোষ। ছেলেমানুষের মতন উনি তোমার সাথে রসিকতা করবেন। তোমার কাছে খুশি হলে অচিরে উনি তোমাকে হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন দেবেন। কিন্তু মনে রেখ তোমাকে ভালবেসে এই বেতন তিনি দেবেন না। তোমার কাজ হবে তোমার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা। আমি হলে খুব কম কথা বলতাম এবং যে ব্যাপারে আমি অজ্ঞ সে সম্বন্ধে উচ্চ-বাচ্য করতাম না।'

নীরবে সব কথা শুনছিল।

ফাদার পিরার্দ বললেন—'বলতে ভুলে গেছি, তোমার জন্যে মারকুইসের পারিবারিক কিছু খবর সংগ্রহ করে রেখেছি। মারকুইস দুই সন্তানের জনক… একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। আঠার বছরের তরুণ ছেলে, মেজাজী আর পাগলাটে। এক ঘণ্টা পরে তার মাথায় কি বুদ্ধি গজাবে তা সে জানে না। অথচ খুব বুদ্ধিমান আর সাহসী। স্পেন অভিযানে সে লড়াই করেছে। এই তরুণ কাউণ্ট নরবার্টের সাথে তুমি বন্ধুত্ব করবে এটাই মারকুইসের ইচ্ছা। হয় ত তাঁর ইচ্ছে যে, সিসেরো বা ভারজিলের কিছু কিছু লেখা তুমি ওকে পড়াবে। আমি হলে ওই ছোকরার সাথে বেশী মিশতাম না।'

জুলিয়ান অবাক হল।

—'একটা কথা আমি তোমার কাছ থেকে লুকোতে চাই না, যেহেতু তুমি

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তাই মারকুইসের ছেলে নিশ্চয় তোমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। তার পূর্বপুরুষ রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রাজনৈতিক জটিলতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য পনের শ' চুয়াত্তর সালের ছাব্বিশে এপ্রিল প্লেস দ্য গ্রেভে তাঁর মাথা কাটা গিয়েছিল। তুমি নিজে ভেরিয়ার শহরের একজন ছুতোরের ছেলে এবং তার বাবার কর্মচারী। এসব পার্থক্য মাথায় রেখে এই পরিবারের ইতিহাস জেনে নেবে। মাঝে মাঝে বড় বড় সব ধনী রক্ষণশীলরা এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসবে। বুঝে সুঝে কাউণ্ট নরবার্টের রসিকতার জবাব দেবে। সে হুসার বাহিনীর একজন সেনাপতি এবং ভবিষ্যতে একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ হবে। পরে আমাকে যেন দোষ দিও না।'

জুলিয়ান গভীর লজ্জায় লাল হয়ে বলল—'মনে হচ্ছে, আমাকে যে ঘৃণার চোখে দেখে তার কোন কথার আমি জবাব দিতে পারব না।'

—'এ ধরনের ঘৃণা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। হয় ত অজস্র উপঢৌকনরূপে এই ঘৃণা প্রকাশ পাবে। তুমি বোকামি করে তা' গ্রহণ করবে। অবশ্য সংসারে বড় হতে গেলে তোমাকে এসব সহ্য করতেই হবে।'

জুলিয়ান বলল—'এ সব অসহ্য হয়ে উঠলে যদি আমি ধর্ম-বিদ্যালয়ে আমার পুরনো এক শ' আট নম্বর ঘরে ফিরে যাই তবে কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে?'

ফাদার পিরার্দ জবাব দিলেন—'না, একেবারেই না। সবাই তোমার দুর্নাম রটাবে। কিন্তু আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। বলব, এসব আমার শেখানোর ফল।'

জুলিয়ান ফাদার পিরার্দের এই তিক্ত কণ্ঠস্বর শুনে দুঃখ পেল। আসলে ফাদার ভালবাসেন জুলিয়ানকে···তাই তার ব্যাপারে সোজাসুজি নাক গলাতে তিনি কুণ্ঠিত নন। একই রকম করুণাহীন কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন; যেন একটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কাজ তিনি করছেন।

বললেন—'জমিদার-গৃহিণীর সাথেও তোমার দেখা হবে। দীর্ঘাঙ্গিনী, সুন্দরী মহিলা তিনি। ধর্মে অচলা ভক্তি। তবে খুবই জেদী। কিন্তু অসম্ভব ভদ্র ব্যবহার তাঁর। এবং গোঁড়া অভিজাত পুরুষের কন্যা তিনি···যাদের পূর্বপুরুষরা ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের ছাড়া আর কাউকে তিনি অভিজাত বলে মনে করেন না। এসব শুনে কি তুমি অবাক হচ্ছ? মনে রেখ বন্ধু, আমরা আর এখন গ্রামে নই। ওদের বসবার ঘরে প্রায়ই অভিজাত পরিবারের লোকেরা জড় হয়ে নম্রকণ্ঠে রাজা-রাজড়ার কথা আলোচনা করে। বিশেষ করে মাদাম দ্য লা মোল কোন রাজার আলোচনা করার সময় শ্রদ্ধায় আপ্লুতা হন। একটা উপদেশ দিচ্ছি শুনে রাখ, ওদের সামনে কখনও বলবে না যে, দ্বিতীয় ফিলিপ অথবা অষ্টম হেনরী নর-পিশাচ ছিল। আসলে ওরা ছিল রাজা এবং এতেই ওরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। ওদের চোখে আমরা দু'জন নীচ শ্রেণীর

মানুষ। তোমাকে ত ওরা উঁচু জাতের চাকর বলেই মনে করবে।'

জুলিয়ান বলল—'স্যার, মনে হচ্ছে প্যারিসে আমি থাকতে পারব না।'

—'তা' হতে পারে। তবে মনে রেখ, আমাদের মতন মানুষরা এই সব জমিদার আর রাজপুরুষদের সাহায্য ছাড়া বড় হতে পারে না। তোমার চরিত্রে এমন একটা বস্তু আছে যা' আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কাজেই নিজের বুদ্ধি মতন চলবে। নিজেকে ঠকিয়ো না। লোককে কিছু না দিলে তোমার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করবেই। আমাদের মতন সমাজের এটাই দোষ, লোক সম্মান দেখায় এমন পদ লাভ করতে না পারলে তোমার পতন অনিবার্য।'

সামান্যক্ষণ নীরব থেকে আবার ফাদর পিরার্দ বলতে লাগলেন—মারকুইসের মর্জি না হলে বেসানকনে তোমার কি অবস্থা হত একবার ভেবে দেখেছ? তোমার জন্যে তিনি যা' করেছেন একদিন তুমি জানতে পারবে, সেদিন দু'পাওয়ালা জানোয়ার না হলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের কাছে তুমি চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। তোমার মতন গরীব অথচ তোমার চেয়ে বিদ্বান এমন অনেক ধর্ম-যাজক এই প্যারিস শহরে বাস করছে। প্রার্থনা সভার জন্য তাদের রোজগার পনের সউ এবং সোরবোনে বক্তৃতা দিয়ে তারা পায় আরো দশ সউ···ব্যস! গত-বছর শীতকালে বদমাস কার্ডিনাল ডিউবয়েসের প্রথম জীবনের কথা ত তোমায় বলেছিলাম। একথা কি তুমি বিশ্বাস করবে যে তুমি ওদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান? এই আমার কথাই ধরো না। একজন মধ্যবিত্ত মানুষ, ভেবেছিলাম যে, ওই ধর্ম-বিদ্যালয়ে আমার জীবন কেটে যাবে। ছেলেমানুষের মতন একটা জটিলতায় জড়িয়ে গেলাম, ওরা আমাকে বরখাস্ত করার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলাম। ভাবতে পার আমার হাতে তখন কত অর্থ ছিল? মাত্র পাঁচ শ' কুড়ি ফ্রাঙ্ক মূলধন···এর কমও নয় বেশীও নয়। বন্ধু বলতে কেউ নেই। দু'চারজন কেবল পরিচিত জন আছে। তখনও এই মারকুইসকে আমি চোখে দেখি নি। উনি এক কথায় আমার সুব্যবস্থা করে দিলেন। আমি যা' কাজ করি তার তুলনায় আমি এত বেশী বৃত্তি পাই যে, আমার নিজেরই লজ্জা করছে। এত কথা বলছি কারণ তোমার মগজে আমি কিছু বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে চাই।'

জুলিয়ান মুগ্ধ।

ফাদার পিরার্দের কণ্ঠের তিক্ততা নিঃশেষিত। তিনি মধুর কণ্ঠে বলতে লাগ-লেন—'মারকুইসের বাড়ীতে থাকা তোমার পক্ষে যদি কোন কারণে সম্ভব না হয় তবে প্যারিসের কাছাকাছি কোন ধর্ম-বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনাটা শেষ করে ফেলবে। তবে প্যারিস থেকে দক্ষিণে যাবে না, যাবে উত্তর অঞ্চলে। আমার অধীনে তোমাকে একটা পুরোহিতের পদ আমি দেব। আমার বেতনের অর্ধেক দিয়ে দেব তোমাকে। অবশ্য তোমার কাছে আমি এর চেয়েও বেশী ঋণী। সেদিন বেসানকনে তুমি আমাকে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক দিতে চেয়েছিলে, আমার হাতে অর্থ না থাকলে অনাহার থেকে বাঁচার জন্য তোমার অর্থ আমাকে নিতে হত।'

জুলিয়ান অভিভূত হয়ে পড়ল।

বলল—'শৈশবে আমার বাবা আমাকে ঘৃণা করতেন। আমার জীবনে সেটা ছিল দুর্ভাগ্য। কিন্তু আর আমি সুযোগ হারাব না। আপনার মধ্যে আমি বন্ধু খুঁজে পেয়েছি, স্যার।'

ফাদার পিরার্দ বললেন—'সুযোগ বলো না, বল সময়োচিত আয়োজন।'

ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল।

এটাই মারকুইসের হোটেল। বিশাল প্রাসাদ। ঠিক দরজার কালো পাথরের উপর বাড়ীর নাম লেখা।

এত বিশাল জাঁক-জমক-ভরা প্রাসাদ দেখে অখুশি হল জুলিয়ান। এরাই জ্যাকোবিনদের ভয়ে ভীত! প্রতিটি ঝোপ নড়তে দেখলে এরা রোবসপীয়ারের প্রেতাত্মা দেখে···লোকে হেসে মরে যায়। এরা নিজেদের প্রাসাদ সবাইকে তাক লাগাবার জন্য বানায়···যেন বিপ্লব আসন্ন।

জুলিয়ান নিজের মনের ভাব ফাদার পিরার্দকে বলল।

—'দেখছি, খুব শিগ্‌গির তুমি আমার অধীনে কাজ করতে যাবে। ওখানে তোমার মাথায় কি ভয়ানক ধারণা ঢুকেছে।'

জুলিয়ান—'এর চেয়ে সরল কথা আমি ভাবতে পারছি না।'

চাকরের গম্ভীর আচরণ এবং বিশেষ করে উঠোনের পরিচ্ছন্নতা দেখে জুলিয়ান বিস্মিত হল।

কড়া রোদ চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভল্‌তেয়ারের মৃত্যুর পর জারমানির ফবারগে এমনি বিশাল এক প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল। সেটা ব্যক্তিগত প্রাসাদ। ফ্যাসান এবং সৌন্দর্যের এমন ছড়াছড়ি কোথাও আর কখনও নজরে পড়ে নি।

২ : সমাজে প্রবেশ

> আঠার বছর বয়সে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ছাড়া একাকী কোন বৈঠকখানা ঘরে প্রথম পদার্পণের স্মৃতি কি হাস্যকর এবং মর্মস্পর্শী! কোনও নারীর অপাঙ্গ দৃষ্টি আমাকে ভয়ার্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট, আমি যত তাকে খুশি করার চেষ্টা করি ততই আমার আনাড়িপনা প্রকাশ পায়। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা রয়েছে। হয় আমার কোনও উদ্দেশ্য না থাকার পক্ষে সরল আর না হয় যারাই না হেসে আমার দিকে তাকাচ্ছে তাদের মধ্যে শত্রুতা নজরে পড়ছে। কিন্তু তারপর, এই ভীতিজনক নিরানন্দের মাঝে আমার লজ্জা আমাকে বুঝিয়ে দিল, সত্যিই কি সুন্দর দিনটি! —কাণ্ট

উঠোনের মাঝখানে হাঁ-করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জুলিয়ান।

ফাদার পিরার্দ বললেন—'বিবেচনা করে কাজ কর। এমন ভাব করছ যেন ছেলেমানুষ তুমি। হোরেসের সেই লেখা কি ভুলে গেছ, নিল মিরারি (কখনও উচ্ছ্বাস দেখিও না)? একটু ভেবে দেখ, তোমাকে এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাকরগুলো তোমার সঙ্গে মজা করবে, তোমাকে ওরা ওদের নিজের মতন ভাববে, শুধু ভুল করে তোমাকে উঁচুপদে বসানো হয়েছে। পরে ভালমানুষের মতন তোমাকে উপদেশ দেবে, ঠিক পথ দেখাবার ভাণ করবে, আর তুমি দারুণ ভুল করে বসবে।'

জুলিয়ান ঠোঁট কামড়াল, তার মনে সব অবিশ্বাস ফিরে এল। বলল—'ওদের নিষেধ করব।'

ওরা নীচের রিসেপশান রুমের মধ্যে ঢুকল। জুলিয়ান তখনও সব দেখে শুনে মন্ত্রমুগ্ধ। সে ভাবছিল, এমন সুন্দর বাস করার বাড়ীতে লোকে অসুখী হবে কেমন করে!

অবশেষে তারা সুন্দরভাবে সাজানো একখানা ঘরে ঢুকল। এ ঘরে দিনের আলো ঢোকে না। একজন ক্ষীণকায় ছোটখাট মানুষ সেখানে বসেছিলেন। তাঁর দু'চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মাথায় সোনালী পরচুলা। ফাদার পিরার্দ তখন জুলিয়ানের দিকে তা.কয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন···ইনিই মারকুইস! এমন সাধারণ চেহারা যে, জুলিয়ানের তাঁকে চিনতে কষ্ট হল। তাঁর পরচুলায় অজস্র চুল এবং তাঁর মুখ দেখে মনে হয় না যে, এর জন্য তিনি এতটুকু হতভম্ব। রাজা তৃতীয় হেনরীর বংশধরের বন্ধু তিনি অথচ তাঁর পোশাক অতি জঘন্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভদ্র···এমন কি বেসানকনের বিশপের চেয়েও ভদ্র ব্যবহার।

মারকুইস মাত্র তিন মিনিট তাদের সঙ্গে কথা বললেন।

তারা আবার ঘোড়ার গাড়ীতে চাপল। ফাদার পিরার্দ বললেন—'দেখ, ছবি দেখার মতন তুমি মারকুইসের দিকে তাকিয়েছিলে। এখানকার আদব-কায়দা সম্বন্ধে আমার খুব বেশী ধারণা নেই। অল্প দিনের মধ্যে তুমি সব জেনে নেবে। তবে তোমার দৃষ্টির সাহসিকতা আমার কাছে অভদ্রজনোচিত লাগল।'

পরিখার ধারে একটা বিশাল বাড়ীর একখানা প্রশস্ত ঘরে এসে ওরা হাজির হল।

একজন জমকালো চেহারার ভদ্রলোক হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে এলেন। উনি একজন দরজি। ভদ্রলোক তার কাঁধে হাত রাখলেন। জুলিয়ান চমকে পিছনে সরে এল, তার সারা মুখ রাগে লাল। গম্ভীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ফাদার হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

বললেন—'কয়েক দিনের জন্যে তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি। তার আগে তোমাকে মাদাম দ্য লা মোলের সামনে হাজির করা যাবে না। এই আধুনিক ব্যাবিলন শহরে প্রথম প্রথম সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকবে যেন সে একটা মেয়েছেলে। নিজেকে তুমি যদি নষ্ট করতে চাও নষ্ট করো···তোমার প্রতি আমি

দুর্বলতা দেখিয়েছি তা' আর দেখাব না। আগামী পরশু এই তোমার জন্যে দু'প্রস্থ কোট প্যান্ট আনবে। দরজির ছোকরাকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দেবে। ওদের সঙ্গে একদম কথা বলবে না। কেননা তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে ওরা তোমাকে নানা ভাবে হাস্যাস্পদ করবার পথ খুঁজবে। এ কাজে ওরা খুব দক্ষ। পরশু দুপুরবেলা বাড়ীতে থাকবে···একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছি, এই ঠিকানাগুলোতে গিয়ে তোমার বুটজুতো, শার্ট এবং টুপির অর্ডার দেবে।'

জুলিয়ান হাতে লেখা ঠিকানাগুলো পরখ করছিল।

ফাদার পিরার্দ বললেন—'মারকুইস নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। কাজের লোক। তাই প্রতিটি জিনিসের দিকে তাঁর নজর থাকে। হুকুম করে করিয়ে নেন। তিনি তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। তুমি আর যাতে তাঁকে বিরক্ত না করো তাই এই ব্যবস্থা। এই বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইঙ্গিত মাত্র সব কাজ করার মতন দ্রুততা থাকবে ত তোমার? ভবিষ্যতেই তা' প্রমাণিত হবে···সতর্ক থেক।'

সেই সব ব্যবসাদারদের ঠিকানায় জুলিয়ান গেল এবং কোন কথা বলল না। সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধা দেখাল। জুতোর দোকানদার হিসাবের খাতায় তার নাম লিখল···মঁসিয়ে জুলিয়ান দ্য সোরেল।

পেরে লাকেইসের কবরখানায় একজন ভদ্রলোক তাকে মার্শাল নের কবরটা দেখাল। সরকার তাঁর কবরের উপর কোন সমাধি-স্তূপ বানায় নি। ভদ্রলোক কথাবার্তায় খুব উদার-পন্থী। সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রায় জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরল। সে চলে গেলে জুলিয়ান দেখল তার পকেট ঘড়িটাও অদৃশ্য হয়েছে। একদিনে জুলিয়ান অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করল এবং অবশেষে ফাদার পিরার্দের সঙ্গে আবার মারকুইসের কাছে হাজির হল।

মারকুইস তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে পরখ করে বললেন—'মঁসিয়ে সোরেল যদি নাচতে শেখে তাহলে আপনি কি আপত্তি করবেন?'

ফাদার পিরার্দ বিস্ময়ে নিথর হলেন। বললেন—'না' জুলিয়ান পাদরি নয়।'

মারকুইস্ নিজেই জুলিয়ানকে সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে এলেন। বেশ আরামদায়ক ছোটখাট ঘর এ বাড়ীর বিশাল বাগানটা ঘরের জানালার নীচে নজরে পড়ল। মারকুইস্ জানতে চাইলেন তার পোশাকের বাক্সে কতকগুলো শার্ট আছে।

এমন একজন অভিজাত পুরুষ এমন খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইছেন শুনে জুলিয়ান হতভম্ব হয়ে গেল। বলল—'দুটো।'

—'খুব ভাল। খুব ভাল। আরও বাইশটা করিয়ে নাও। এই নাও তোমার প্রথম তিন মাসের বেতন। গম্ভীরভাবে আর আদেশের সুরে সংক্ষেপে বললেন মারকুইস্।

ও ছোট্ট ঘর থেকে চলে আসার সময় মারকুইস একজন বুড়ো চাকরকে ডাকলেন। বললেন—'আরসেন, তুমি মঁসিয়ে সোরেলের দেখাশোনা করবে!'

কয়েক মুহূর্ত পরে জুলিয়ান লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো গোছানো লাইব্রেরী। আনন্দে তার মন ভরে উঠল। আবেগে বিস্মিত তার অবস্থা যাতে কারো নজরে না পড়ে তাই সে আলমারির আড়ালে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে বাঁধান বইগুলো দেখতে লাগল। ভাবল, এসব বই আমি পড়বার সুযোগ পাব। তাহলে এখানে আমি থাকতে চাইব না কেন? মারকুইস এই মুহূর্তে তার সঙ্গে যে ব্যবহার করছেন তার একশ' ভাগের এক ভাগও যদি মঁসিয়ে রেনল করতেন তবে তিনি চিরকাল লজ্জিত হয়ে থাকতেন।

কিন্তু দেখি কি চিঠির আমাকে অনুলিপি করতে হবে।

সব কাজ শেষ করে সে আলমারির মধ্যে বইগুলো দেখতে লাগল। ভলতেয়ারের এক সেট সম্পূর্ণ রচনাবলী দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হল। তার বিস্ময়ের ভাব যাতে কারো নজরে না পড়ে তাই ছুটে গিয়ে সে দরজাটা খুলল। তারপর মহা আনন্দে ভলতেয়ারের রচনাবলীর আশীখানা খণ্ড একে একে দেখতে লাগল। লণ্ডনের কোন বই বাঁধাইকরের সুন্দর করে বাঁধানো এক একটা খণ্ড। ওর আনন্দ শিখরে পৌঁছবার পক্ষে এটা যথেষ্ট।

ঘণ্টাখানেক পরে মারকুইস নীচে নামলেন। চিঠিগুলোর অনুলিপি দেখলেন। বিস্মিত হলেন 'সেলা' শব্দটা লিখতে জুলিয়ান দু'টো 'এল' ব্যবহার করেছে। তাহলে তার বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে পাদরি যা বলেছিল সবই গল্প-কথা। মারকুইস খুবই হতাশ হয়ে বললেন—'বানান সম্বন্ধে তুমি খুব পাকা নও?'

জবাবে নিজেকে কতটা বিপন্ন করছে তা' না ভেবেই জুলিয়ান বলল—'এটা সত্যি কথা।' মঁসিয়ে রেনলের মতন গর্বিত ব্যবহারের বদলে মারকুইসকে তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল জুলিয়ান।

মারকুইস ভাবছিলেন ফরাসী গ্রাম অঞ্চলের এই তরুণ পাদরিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে দেখছি সময় নষ্ট হবে। অথচ আমার একজন খুব বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। বললেন তাকে—'দেখ, সেলা শব্দে একটা 'এল' দিতে হয়। চিঠি লেখা হলে যে শব্দের বানান ঠিক লেখনি বলে সন্দেহ হবে সে শব্দটা অভিধানে দেখে নিও।'

ছ'টা বাজল। মারকুইস জুলিয়ানকে ডেকে পাঠালেন।

মারকুইস বললেন—'দেখ, একটা কথা তোমাকে বলি নি তার জন্যে আমি দোষী। প্রতিদিন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় তুমি পোশাক পরবে।'

এ আদেশের অর্থ কি বুঝতে না পেরে জুলিয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

—'বলছি তোমার জুতো-মোজা বদলাবে। আরসেন তোমায় মনে করিয়ে দেবে। তোমার আজকের অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

মারকুইস তাকে নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকলেন।

এরকম ক্ষেত্রে মঁসিয়ে রেনল জোরে জোরে হেঁটে আগে ঘরে ঢুকতেন। সেটাই নিয়ম। জুলিয়ান দ্রুত হাঁটতে লাগল। কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে

হাঁটতে গিয়ে বেতো পা মারকুইস যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন, একটা বেয়াড়া ব্যাপারে ফেঁসে গেছি দেখছি।

একজন দীর্ঘদেহী মহিলার সঙ্গে মারকুইস পরিচয় করিয়ে দিলেন জুলিয়ানের। মহিলা নিজেকে উদ্ধত পরিমণ্ডলে বন্দিনী করে রেখেছেন। মারকুইস যা বলছিলেন তা' জুলিয়ান শুনছিল না…ঘরে আরও কয়েকজন উপস্থিত রয়েছেন। জুলিয়ান আগদির বিশপকেও দেখতে পেল…ব্রে-লা-হাউতের উৎসবের দিন সে এই তরুণ বিশপের সঙ্গে কথা বলেছিল। জুলিয়ান লাজুকমনে তাঁর দিকে তাকাল কিন্তু মনে হল তরুণ বিশপ ফরাসী গ্রামাঞ্চলের এই ছোকরাকে চিনতে খুব একটা ব্যগ্র।

বসবার ঘরে উপস্থিত ভদ্রলোকদের ভ্রূকুটি-কুটিল অস্বাভাবিক আচরণ। প্যারিস সম্পর্কে তারা গলা খাটো করে আলোচনা করছে…তবে ছোটখাট বিষয়ের দিকে তাদের মাথাব্যথা নেই।

সাড়ে ছ'টা বাজল। সুন্দর সুদর্শন একজন তরুণ ঘরে ঢুকল। তার মুখে মোটা গোঁফ আর পাতলা শরীর। দেহের রঙ ফ্যাকাসে। মাথাটা তুলনায় খুব ছোট।

মারকুইস বলে উঠলেন—'তুমি সব সময় আমাদের বসিয়ে রাখ।'

জুলিয়ান বুঝতে পারল, এই হচ্ছে কমেৎ দ্য লা মোল। প্রথম দর্শনেই তাকে তার আকর্ষণীয় মনে হল। মনে মনে তাই ভাবল, এই কি সেই লোক যার আক্রমণাত্মক রসিকতা তাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াবে? সে তাকিয়ে দেখল, কাউন্ট নরবার্টের পায়ে নাল-লাগানো জুতো…কাজেই তাকে আরও খারাপ জুতো পায়ে দিতেই হবে।

তারা সবাই খাওয়ার টেবিলে বসল।

মারকুইস কি যেন একটা তীব্র মন্তব্য করলেন এবং ঠিক তখনি সুন্দরী এক যুবতী টেবিলে এসে বসল। তার মাথায় ফ্যাকাসে সোনালী চুল। জুলিয়ানের মুখোমুখি বসল যুবতী। তাকে খুব বেশী আকর্ষণীয়া মনে হল না। তবে মনোযোগ দিয়ে দেখে বুঝল, যুবতীর চোখ দু'টো ভারি মনোরম…তবে দৃষ্টিতে শীতলতার স্পর্শ। ওদের হাব-ভাবে একঘেয়েমি, তবে প্রত্যেকেই অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যগ্র।

জুলিয়ান ভাবছিল, মাদাম রেনলের চোখদুটোও খুব সুন্দর। সবাই তাঁর প্রশংসা করত। এই চোখ দুটোর সঙ্গে কিন্তু তার কোনও মিল নেই। সংসার সম্পর্কে জুলিয়ানের খুব সামান্যই ধারণা আছে…তাই মাঝে মাঝে মাদমোজায়েল ম্যাথিলদার দু'চোখে যে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছিল তার অর্থ সে বুঝতে পারল না। মাদাম দ্য রেনল যখন উজ্জ্বল চোখে তাকাতেন তখন মানসিক আবেগের জন্য সেই উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হত…সৃষ্টি হত কোন বাজে কাজের দরুণ ঘৃণা প্রকাশের জন্য।

ডিনারের পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এল।

মাদমোজায়েলের রূপ বর্ণনাকারী এক শব্দ জুলিয়ানের মাথায় এল। দৃষ্টিতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ। নইলে তরুণী ঠিক তার মায়ের মতন দেখতে…যতই দেখছে ততই মন বিরূপ হচ্ছে। তাই সে আর যুবতীর দিকে তাকাল না। অথচ অন্যদিকে কাউণ্ট নরবারট প্রশংসার যোগ্য…তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাল লেগেছে। জুলিয়ানের মন আবিষ্ট হল…সে তার চেয়েও অর্থবান এবং অভিজাত, তাই তাকে সে হিংসাও করে না বা ঘৃণাও করে না।

মারকুইস বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ডিনার টেবিলে দ্বিতীয় পদ পরিবেষণের সময় তিনি বললেন—'মঁসিয়ে সোরেলকে আমি নিয়োগ করেছি, আশা করি ওকে আমি সম্ভব হলে মানুষ করে তুলতে পারব। তুমি ওকে একটু দেখো।'

তারপর গলা খাটো করে মারকুইস তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বললেন—'ও আমার সেক্রেটারি, তবে ও 'সেলা' শব্দটা লিখতে দু'টো 'এল' ব্যবহার করে।'

প্রত্যেকেই জুলিয়ানের দিকে তাকাল।

জুলিয়ান একটু বেশী উৎসাহের সঙ্গে নরবার্টকে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল।

তবে সকলেরই ভাল লাগল জুলিয়ানকে।

কি ধরনের শিক্ষা জুলিয়ান লাভ করেছে তা' নিশ্চয় মারকুইস বলেছেন কারণ একজন অতিথি তার সাথে হোরেসের বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করল। এই হোরেসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আমি বেসানকনের বিশপের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলাম…ভাবছিল জুলিয়ান। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে এই লোকগুলো হোরেস ছাড়া আর কোন লেখকের নাম জানে না। এই মুহূর্ত থেকে সে আবার নিজেই নিজের কর্তা, মাদমোজায়েল মোল তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তাকে আর সে স্ত্রীলোক বলেই মনে করছে না। ধর্ম-বিদ্যালয়ে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে নি, কাউকে সে সুযোগ দেয় নি। খাওয়ার ঘরখানা কম সাজান হলেও তার কোনও ক্ষতি হত না কেননা নিজের উপর তার অগাধ বিশ্বাস ফিরে এসেছে। ঘরে দু'খানা আট ফুট উঁচু আয়না রয়েছে…হোরেস সম্পর্কে প্রশ্নকারীর প্রতিবিম্ব সেই আয়নার বুকে সে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিল। তার চোখ দুটো ভারি সুন্দর…তার দ্বিধাজড়িত, লাজুক আর উৎসাহব্যঞ্জক মুখ-চোখে আনন্দ উপচে পড়ছিল যখনই সে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সুযোগ সে পাচ্ছিল। তার দু'চোখে যেন আগুনের ফুলকি। সকলের তাকে মনে ধরল। খাওয়ার টেবিলে এ ধরনের আলোচনা আগ্রহের সৃষ্টি করে। তাকে আরও বাজিয়ে দেখবার জন্যে মারকুইস প্রশ্নকারীকে ইঙ্গিত করছিলেন। লোকটা কিছু জানে এটা কি সত্যি সম্ভব…জুলিয়ান ভাবছিল।

ভয় ভয় ভাবটা চলে গেল জুলিয়ানের…তার মগজে প্রতিটি জবাব আপনা থেকে গজিয়ে উঠল…বুদ্ধির স্পর্শ না থাকলেও প্যারিসের ভাষা জানে না এমন

লোকের পক্ষে এরকম জবাব দেওয়া একান্তভাবে অসম্ভব…কিন্তু জবাবগুলো মৌলিক। খুব ভাবগম্ভীব এবং মিল না থাকলেও বোঝা গেল যে, ল্যাটিন ভাষায় তার যথেষ্ট দখল আছে। আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে জুলিয়ানের কোন ধারণা নেই। সাদি, লর্ড বায়রণ প্রভৃতির কথা সে প্রথম শুনছে। তার দৌড় হোরেস এবং ট্যাসিটাস পর্যন্ত। কয়েকবার সে বেসানকনের বিশপের কথাগুলো আওড়াল…কিন্তু সে সব কথা এদের মনে ধরল না।

কথা বলতে বলতে ওরা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

স্বামীর যাকে ভাল লাগে মারকুইস-পত্নী তার প্রশংসা করেন। তাই তিনি জুলিয়ানকে দেখতে লাগলেন—'এই তরুণ পাদরি চাল-চলনে আনাড়ি হলেও লেখাপড়া কিছু জানে' মারকুইসের পাশে বসা একজন শিক্ষিত অতিথি মন্তব্য করলেন, এবং তাঁর মন্তব্যটা জুলিয়ান কিছুটা বুঝতে পারল। ছাঁচে-ঢালা মামুলি কথা বলাটাই এ বাড়ীর গৃহিণীর পছন্দ। জুলিয়ান সম্বন্ধেও তিনি সেই ধারণা করে খুশি হলেন এবং ওই শিক্ষিত ভদ্রলোককে আজ খাওয়ার টেবিলে পেয়ে তিনি আনন্দিত। তিনি ভাবলেন, তাঁর স্বামী ওই মানুষটার মধ্যে আনন্দের খোরাক পেয়েছেন।

৩ : প্রথম পদচিহ্ন

**এই বিশাল বিস্তৃত উপত্যকা, অফুরন্ত উজ্জ্বল আলোয় ভরা,
এবং এত অসংখ্য হাজারো মানুষ, ঝলসে দিচ্ছে আমার
দু'চোখের দৃষ্টি। এদের একজনও জানে না ত আমাকে, এরা
আমার চেয়েও শ্রেয়। তাই কেমন আচ্ছন্ন মগজ আমার।**

—রেইনা

পরের দিন সকালবেলা লাইব্রেরী ঘরে বসে জুলিয়ান চিঠির অনুলিপি তৈরি করছিল, ছোট একটা দরজা দিয়ে বইগুলোর পাশ দিয়ে গোপনে মাদমোজায়েল ম্যাথিলদা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে তার কৌশলের প্রশংসা করল জুলিয়ান মনে মনে। এসময় এ জায়গায় জুলিয়ানকে দেখে মাদমোজায়েল মনে হল দারুণ অবাক হল। তার হাব-ভাবে প্রগলভতা এবং পুরুষালি আচরণ প্রকাশ পেল। কুঞ্চিত কাগজে সে মাথার চুলগুলো জড়িয়েছে। অলক্ষে মাদমোজায়েল তার বাবার লাইব্রেরী থেকে বই সরিয়ে নিয়ে যায়। জুলিয়ানের উপস্থিতি তার সেদিন সকালের অভিযান ব্যর্থ করল। আজ সে ভলতেয়ারের দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রিন্সেস অ্ ব্যাবিলন' বইখানা নিতে এসেছিল…নামজাদা রাজতন্ত্রী এবং ধর্মশীল পরিবারের কন্যার পক্ষে এই উপন্যাস-পাঠ নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ ঘটনা। উনিশ বছরের এই হতভাগা মেয়েটা বুদ্ধি এবং রসের সংমিশ্রণে রচিত এই উপন্যাস পড়তে দারুণ আগ্রহী।

তখন বেলা তিনটে বেজেছে। কাউন্ট নরবারট ঢুকল লাইব্রেরী ঘরে। সে এসেছে খবরের কাগজ পড়তে…সন্ধ্যেবেলায় সে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তৈরি হতে ইচ্ছুক। এ বাড়ীতে জুলিয়ানের অস্তিত্ব সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন তাকে দেখে খুশি হল। নিখুঁত তার আচরণ…সে জুলিয়ানকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে ডাকল।

—'বাবা আমাদের ডিনারের সময় পর্যন্ত ছুটি দিয়েছেন।'

জুলিয়ান তার কথার মধ্যে আমাদের শব্দটা মন দিয়ে শুনল।

বলল—'মি লর্ড যদি একটা আশি ফুট লম্বা গাছকে কেটে তার ডাল-পালা ছেঁটে করাত দিয়ে তক্তা বানাতে বলেন তাহলে সে কাজটা আমি ভালভাবে করতে পারব, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে থাকা কাজটা জীবনে আমি কেবল ছ'বার করেছি।'

নরবারট বলল—'বেশ এবারটা হল সপ্তম বার।'

জুলিয়ানের মনের অতলে রাজার আগমন উৎসবের স্মৃতি জেগে উঠেছিল। এবং সে সত্যিই বিশ্বাস করে যে, সে একজন পাকা ঘোড়সওয়ার। ওরা বয় দ্য বুলোন সড়ক ধরে ফিরছিল, একখানা ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে জুলিয়ান রাস্তায় আছড়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, তার সারা দেহ হল কাদায় মাখামাখি। ভালই হয়েছে, ওর আর এক জোড়া পোশাক আছে। ডিনার টেবিলে মারকুইস আলাপ শুরু করলেন, তার ঘোড়ায় চড়ার বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। বিশেষ ঘটনাটা গোপন করে নরবারট তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

কিন্তু জুলিয়ান বলে উঠল—'মহামান্য কাউন্ট আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে সবচেয়ে শান্ত এবং সুদর্শন ঘোড়াটি চড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘোড়া আমাকে তার পিঠে রাখতে চাইল না এবং সাবধান না হওয়ার জন্য ঘোড়াটি সেতুর কাছে লম্বা রাস্তায় আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিল।'

মাদমোজায়েল বৃথাই বেদম হাসি চাপতে চেষ্টা করল এবং সব শুনতে চাইল।

জুলিয়ানও গম্ভীর না হয়ে সব কিছু সরলভাবে বলল।

সেই শিক্ষিত ভদ্রলোককে মারকুইস বললেন—'এই তরুণ পাদরি সম্পর্কে আমি ভাল আশা পোষণ করি। গ্রাম্য সরলতার সাথে কেমন ঘটনাটা বর্ণনা করছে। এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি, এবং পরেও কখনও ঘটবে না। তার এই পাগলামির কথা সে মহিলাদের সামনেও প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে না।'

যারা শুনছিল তাদের কাছে তার এই দুর্ঘটনার কথা জুলিয়ান এমন রসিয়ে রসিয়ে বলল যে, বলা শেষ হলে মাদমোজায়েল ম্যাথিলদা পুরো ঘটনা জানবার জন্যে তার ভাইকে প্রশ্ন করতে লাগল। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে চলল এবং ম্যাথিলদার সঙ্গে জুলিয়ানের বারকয়েক দৃষ্টি বিনিময় ঘটল, জুলিয়ান নিজেও তার

প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দিল যদিও ম্যাথিলদা নিজে জুলিয়ানকে কোন প্রশ্ন করেনি এবং শেষে তারা তিনজনেই একসঙ্গে হাসতে লাগল···যেন তারা গ্রামের গভীর বনের তিন জন যুবক-যুবতী বাসিন্দা।

পরদিন জুলিয়ান ধর্মতত্ত্বের ক্লাস করতে গেল এবং ফিরে এসে অনেকগুলো চিঠির অনুলিপি তৈরি করল। দেখল, লাইব্রেরী ঘরে তার চেয়ারের পাশে নিখুঁত পোশাক পরা একটি যুবক বসে আছে। কিন্তু তার মুখে হিংসার ছাপ এবং সাধারণভাবে তার দেহে ছোটলোকের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

মারকুইস ভিতরে ঢুকলেন।

তিনি আগন্তুককে কঠোর-স্বরে বললেন—'এখানে কি করছ, মঁসিয়ে তানবো ?'

ইতরের মতন হেসে যুবক বলল—'মনে করছিলুম······'

—'না স্যার, তুমি কিছুই মনে কর নি। পরখ করার জন্য একাজ করেছ, তবে সেটা অবিবেচকের মতন কাজ হয়েছে।'

দারুণ রেগে তানবো উঠে দাঁড়াল এবং অদৃশ্য হল। মাদাম দ্য মোলের সুহৃদপ্রতিম সেই শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাইপো এই তানবো। তার লেখক হওয়ার ভারি ইচ্ছে। সেই ভদ্রলোকের ইচ্ছায় মারকুইস তাকে সেক্রেটারি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তানবো সাধারণত অন্য একটা ঘরে বসে কাজ করে, তবে জুলিয়ানের প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা তার কানে গেছে এবং তার ভাগ নেওয়ার জন্যে কাগজ, কলম আর কালির দোয়াত নিয়ে সকাল থেকে লাইব্রেরী ঘরে এসে বসেছে।

সামান্য দ্বিধার পর ঠিক বেলা চারটের সময় জুলিয়ান কাউন্ট নরবারটের ঘরে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু কাউন্ট তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি, আচার আচরণে তার কোথাও গলদ নেই···তাই সে একটু লজ্জা পেল।

জুলিয়ানকে বলল কাউন্ট—'মনে হয় অচিরে তোমাকে ঘোড়ায়-চড়া শেখবার স্কুলে পাঠাতে হবে। এবং সপ্তাহের মধ্যে তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় ভ্রমণ করে আমি আনন্দ পাব।'

—'আপনি আমার সঙ্গে যে সদয় ব্যবহার করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কাছে আমার ঋণ সম্পর্কে আমি সচেতন। আনাড়ির মতন ব্যবহার করে আমি যদি আপনার ঘোড়াটাকে আঘাত না করে থাকি এবং আজ আর কেউ যদি ওই ঘোড়াটায় চড়ে থাকে তবে আজ ওটার পিঠে আমি চড়তে চাই।' জুলিয়ান বিষণ্নকণ্ঠে বলল।

—'ঠিক আছে, সোরেল। তবে এই বিপদের ঝুঁকি তুমি স্বেচ্ছায় নিচ্ছ। ধরে নাও, বাধা যা' দেওয়ার সব তোমাকে দিয়েছি। কিন্তু চারটে বেজে গেছে, বেড়াতে যেতে হলে আর নষ্ট করার মতন একটুও সময় নেই হাতে।'

ঘোড়ার পিঠে চড়বার পর জুলিয়ান জানতে চাইল—'পতন থেকে বাঁচবার জন্যে আমাকে কি কি করতে হবে ?'

সশব্দে হেসে উঠে নরবারট জবাব দিল—'অনেক বড় কাজ করা যায়···যেমন পিছন দিকে তোমার শরীর হেলিয়ে রাখবে।'

জুলিয়ান সবেগে ঘোড়া ছোটাল।

ওরা ষোড়শ লুই পার্কের কাছে হাজির হল।

নরবারট বলল—'এবার ওহে অসমসাহসী, এখানে অনেক গাড়ীর মেলা আর রয়েছে অসাবধানী চালকের দল! একবার যদি মাটিতে আছড়ে পড় তাহলে ওরা তোমার দেহ পিশে দেবে। ওরা কেউ লাগাম ওদের সংযত করবে না।'

তারপর নরবারট দেখল অনেকবার জুলিয়ান পড়তে পড়তে নিজেকে রুখে নিল। এবং অশ্বারোহণ পর্ব শেষ হল দুর্ঘটনায়। ফিরে এসে তরুণ কাউণ্ট তার বোনকে বলল—'এস, এই সাহসী এবং হঠকারী ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।'

ডিনার টেবিলে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করার সময় সে জুলিয়ানের সাহসের খুব প্রশংসা করল। তার বাবাকে বলল, যেভাবে ও ঘোড়া চালাল তাতে যথেষ্ট সাহসের ছোঁয়া ছিল। সেদিন সকালে তরুণ কাউণ্টের কানে গিয়েছিল যে, জুলিয়ানের পতনের ঘটনা নিয়ে আস্তাবলে সহিসরা হাসাহাসি করছে।

ওদের সদয় ব্যবহার সত্বেও অচিরে জুলিয়ান পরিবারের মধ্যে একঘরে হয়ে পড়ল। ওদের জীবনচর্যা এবং আচরণ তার কাছে বিচিত্র মনে হচ্ছিল এবং বার বার সে নানা ধরনের ভুল করতে লাগল। আর তার ভ্রান্তিসমূহ চাকরদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠল।

ফাদার পিরার্দ তাঁর নিজের কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। জুলিয়ান যদি দুর্বল শরগাছ হয় তবে তার পতন হবে তিনি ভেবে দেখলেন···আর যদি আত্মশক্তিসম্পন্ন মানুষ হয় তবে নিজের জীবনের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবে।

৪ : দি হোটেল দ্য লা মোল

এখানে সে কি করছে? জায়গাটি কি তার পছন্দসই?
সে কি ভাবছে সে অপরকে তার মতন করতে পারবে?
—রনসার্দ

যদি হোটেল দ্য লা মোলের বসবার ঘরের প্রতিটি ক্রিয়াকাণ্ড জুলিয়ানের কাছে বিচিত্র বলে প্রতিভাত হয় তাহলে এই ঘরে যারা আগমন করে এবং দেখে তাদের কাছেও এই কালো পোশাক পরিহিত বিবর্ণ তরুণকে এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব বলে মনে হবে। তাই মাদাম দ্য লা মোল তাঁর স্বামীর কাছে প্রস্তাব করলেন যে, এ বাড়ীতে যে-সন্ধ্যায় নামজাদা মানুষরা ডিনারে আসবেন সে সন্ধ্যায় কোন

কাজের অছিলায় জুলিয়ানকে বাইরে পাঠানো উচিৎ।

মারকুইস জবাবে বলেছিলেন—'আমার পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ আমি দেখতে চাই। ফাদার পিরার্দ জোর দিয়ে বলে থাকেন যে আমাদের গণ্ডীর মধ্যে যাদের আমরা ঢুকতে অনুমতি দি তাদের আত্ম-সম্মান-বোধ আমরা পিষ্ট করে দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রতিরোধের স্পৃহা ত লোকের থাকবে। এই ছেলেটির অবস্থা হয়েছে জল ছাড়া মাছের মতন কারণ এই পরিবেশ সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ, নইলে সে বোবা-কালার মতন নিরীহ।'

জুলিয়ান ভেবে দেখল, আমি যদি আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাই তাহলে এই বসবার ঘরে যাদের দেখি তাদের নাম এবং তাদের মুখের দু'চারটে কথা ও তাদের চরিত্র খাতায় লিখে রাখতে হবে।

প্রথমেই সে পাঁচ ছ'জনের নাম লিখল। এরা সবাই খেয়ালের বশে মারকুইসের পাখার নীচে আশ্রয় নিয়েছে এবং যত্রতত্র তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলে বেড়ায়। যদিও কম-বেশী এরা সবাই মারকুইসের অনুগত তবুও এরা জঘন্য-প্রকৃতির জীব…কেননা এটা বলা যায় যে, এ ধরনের লোকেরা সবাই একই রকম আনুগত্য প্রকাশ করে না। এদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা মারকুইসের রূঢ় আচরণ সহ্য করলেও মাদাম দ্য লা মোল কোনও কঠোর কথা বললে প্রতিবাদে মুখিয়ে ওঠে।

এ বাড়ীর কর্তা এবং গৃহিণীর চরিত্রের ভিত হচ্ছে একঘেয়েমি এবং গর্ব-ভাব …তাঁরা প্রকৃত বন্ধু লাভের আশায় একঘেয়েমি ত্যাগ করে অপরের মনোভাবে আঘাত করতে ভয় পান। দুঃখের দিন এবং একঘেয়েমির মুহূর্তগুলো ছাড়া তাঁরা পরিপূর্ণ ভদ্র-রূপেই সকলের কাছে পরিচিত।

পাঁচ ছ'জন রক্ষণশীল ভদ্রলোক, যারা তাকে পিতার মতন স্নেহ করে, তারা এবাড়ী ছেড়ে চলে গেলে মারকুইসকে বহুক্ষণের জন্য একাকীত্ব ভোগ করতে হবে। তাঁর সম-অবস্থার নারীর চোখে এই একাকীত্ব ভয়ানক ভীতিমূলক ব্যাপার …এটা সামাজিক দুর্নামের মতন।

মারকুইস স্ত্রীর সাথে নিখুঁত আচরণ করে থাকেন। তিনি নজর রাখেন যাতে তাঁর বসবার ঘরে বহু অতিথির আগমন ঘটে। লর্ড সভার সভ্যরা নয়… কারণ মারকুইসের নতুন বন্ধুরা সবাই পুরোপুরি অভিজাত নয়…এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি করার যোগ্যও তারা নয়।

এই রহস্যের সন্ধান পেতে জুলিয়ানের খুব বেশী দেরী হল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের ঘরে ঘরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের নীতি নিয়ে আলোচনা হয়…কিন্তু মারকুইসদের মতন মানুষদের ঘরে জরুরি অবস্থার সময় ছাড়া সরকারী সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামায় না।

একঘেয়েমির এই যুগে আনন্দ লাভের তীব্র ইচ্ছা এমনভাবে পেয়ে বসেছে, তাই যে-সব দিনগুলোতে ডিনারে নিমন্ত্রিত লোকজনেরা বসবার ঘরে এলে

মারকুইস একেবারেই ঘর ছেড়ে যান না…এবং অতিথিরা যতক্ষণ না চলে যায় বসে থাকেন। অতিথিরা রাজনীতি ছাড়া যা' খুশি আলোচনা করতে পারেন… আলোচনার বিষয় হতে পারে রাজা, ঈশ্বর, পাদরি, কবি বেরানজারের প্রশংসা, বিরোধীদলের সংবাদ-পত্র…এমন কি ভলতেয়ার এবং রুশো পর্যন্ত। একটা জিনিষ দেখল জুলিয়ান যে, জন দুয়েক ভাইকাউণ্ট আর পাঁচজন ব্যারণ এই ঘরের আলাপ-আলোচনা জিইয়ে রেখে দেয় এবং এরা দেশান্তরে বাস করার সময় থেকে মারকুইসের সঙ্গে পরিচিত। এদের প্রত্যেকের আয় ছয় থেকে আট হাজার ফ্রাঙ্ক। একজনের পোশাকে পাঁচটি তারকা…অন্যদের তিনটে। ওদের আলোচনা কি করে লোকেরা গম্ভীর হয়ে বসে শোনে তা' কিছুতেই জুলিয়ান ভাবতে পারে না।

মনের পক্ষে অসহ্য এই আবহাওয়ার অস্তিত্ব জুলিয়ান ছাড়া আরও অনেকে অনুভব করে। কেউ কেউ বসে বসে অজস্র বরফের টুকরো খাওয়ার সুযোগ নেয় আবার কেউ কেউ রাতের বেলা এখান থেকে ফিরে বন্ধুদের কাছে গল্প করে—'এই মাত্র হোটেল দ্য লা মোল থেকে ফিরছি। ওখানে শুনলুম যে রাশিয়া… এমনি ধরনের সব কথাবার্তা।'

পরিবারের এক অনুগত বন্ধুর কাছ থেকে শুনল যে, মাস ছয়েক আগে মাদাম দ্য লা মোল হতভাগ্য ব্যারণ বুরগুইননকে একটি শাসকের পদ পাইয়ে দিয়েছেন… কেননা পুনর্দখলের সময় এই ব্যারণ ছিলেন একজন সহকারী প্রশাসক এবং তিনি বিশ বছর ধরে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে মাদামের সঙ্গে মিশছেন। ফলে সমস্ত ভদ্রলোকেরা এই ভয়ানক ঘটনার পর নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হল। এর আগে তুচ্ছ ঘটনার জন্য প্রতিবাদ করত, কিন্তু এখন আর কোন কিছুর জন্যই তারা প্রতিবাদ করে না। এই বিবেচনার অভাব ইচ্ছাপ্রসূত নয়। কিন্তু বার দুয়েক জুলিয়ান ডিনার টেবিলে বসে শুনেছে, মারকুইস এবং তার স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে…এবং এই বাদ-প্রতিবাদ তাঁদের ধারে কাছে উপবিষ্টদের মনে নিষ্ঠুর আঘাত হানছে। যারা রাজার সহযাত্রী হয় নি তাদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব এই দু'জন অভিজাত-মানুষ কোন সময় চেপে রাখার চেষ্টা করেন না। জুলিয়ান বুঝতে পেরেছে যে, একমাত্র 'ধর্মযুদ্ধ' এই কথাটা তাঁদের মনে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

এই পরিবেশে একদিকে জাঁকজমক আর একদিকে একঘেয়েমি জুলিয়ানকে ঘিরে রেখেছে, তবু এরই মধ্যে সে মারকুইস সম্পর্কে খুবই আগ্রহান্বিত। একদিন সে তাঁকে প্রতিবাদ করে বলতে শুনল যে, বুরগুইননের উচ্চপদ-প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। এটা মারকুইসের ভদ্র মনের প্রকাশ। এর সত্য দিক পরে জুলিয়ান ফাদার পিরার্দের কাছে শুনেছিল।

একদিন সকালবেলায় ফাদার পিরার্দ জুলিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে মারকুইসের লাইব্রেরী ঘরে কাজ করছিলেন। ফাদার ফ্রিলেয়ারের সাথে মামলার কাগজ-পত্র

ঘাঁটছিলেন। সহসা জুলিয়ান বলে উঠল—'স্যার, প্রতিদিন মারকুই-পত্নীর সঙ্গে ডিনার খাওয়া কি আমার কর্তব্য-কাজ অথবা আমার প্রতি এটা তাঁদের করুণা প্রদর্শন ?'

ফাদার পিরার্দ মনে দারুণ আঘাত পেলেন। বললেন—'এ এক বিশিষ্ট সম্মান। ওই শিক্ষিত ভদ্রলোক আজ পনের বছর ধরে এঁদের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করেও নিজের ভাইপোর জন্য এই সম্মান ব্যবস্থা করে দিতে পারেন নি।'

—'কিন্তু আমার পক্ষে এই কাজটা সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক স্যার। ধর্ম-বিদ্যালয়ে আমি এর চেয়ে কম একঘেয়েমি ভোগ করেছি। আজকাল নজরে পড়ছে মাদমোজায়েল মোল টেবিলে বসে হাই তোলেন, অথচ পরিবারের এই সব বন্ধুদের প্রতি তাঁর আরও নজর দেওয়া উচিৎ। ভয় হয় আমি হয় ত টেবিলে একদিন ঘুমিয়ে পড়ব। আচ্ছা, প্রতিদিন চল্লিশ পয়সা খরচ করে কোনও ছোটখাট সরাইখানায় ডিনার খেতে কি আপনি আমায় অনুমতি দেবেন না ?'

এমনিভাবে অভিজাতদের সঙ্গে ডিনার-খাওয়া ফাদার পিরার্দের কাছে মহা-সম্মানের ব্যাপার। তাই তিনি জুলিয়ানকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন, সহসা একটা মৃদু শব্দ শুনে তাঁরা মাথা ঘোরালেন। জুলিয়ান দেখল, মাদমোজায়েল তাদের কথা শুনছে। সে লজ্জায় লাল হল। একখানা বই নেওয়ার জন্যে মাদমোজায়েল এ'ঘরে আসছিল···গোপনে ওদের কথা শোনার পর জুলিয়ানের প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ল। একজন লোকও আছে যে, ওই বুড়ো পাদরির মতন সংসারটাকে ইতরের মতন দেখে না। হায় ঈশ্বর ! লোকটা কি কুৎসিতদর্শন।

সেদিন ডিনার টেবিলে জুলিয়ান একবারও মাদমোজায়েলের দিকে তাকাতে পারল না।

এই ডিনারের আসরে মঁসিয়ে বালানদ প্রায়ই আসেন। বাইরে থেকে তাঁকে মনে হয় খুব সৎ···কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব ফন্দিবাজ। একটা গোপন ফন্দি নিয়ে সমাজে ঢুকেছিল, কিন্তু স্রেফ মনের জোর আর কিছুটা নীতিজ্ঞানের জন্যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। সমাজে অনুপ্রবেশের পরেই বালানদ এক ধনী মহিলাকে বিয়ে করেছিল। কয়েক বছর পরে বউ মারা গেল। তারপর আবার বিয়ে করল। এই বউটিও খুব ধনী এবং সমাজে কারো সঙ্গে মেশে না। বালা-নদের আয় এখন ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক। তারও একদল অনুগত আছে। এখানে বালানদের অবস্থা ঠিক বলির পশুর মতন।

সেদিন সন্ধ্যায় জন তিরিশেক ছোকরা বালানদকে ঘিরে ধরেছিল। সবাই হাসাহাসি করছিল।

জুলিয়ান ভাবছিল, আচ্ছা সবাই যখন তাকে নিয়ে মজা করে তখন লোকটা মারকুইসের বাড়ীতে আসে কেন ? সে ফাদার পিরার্দের কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইল।

মঁসিয়ে বালানদ শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচল।

নরবারট বলে উঠল—'যাক আমার বাবার একজন চর পালাল।'

তবে কি এটাই সমস্যার জবাব? কিন্তু তাহলে মারকুইস এখানে বালানদকে ঢুকতে দেন কেন?

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কঠোরহৃদয় ফাদার পিরার্দ বললেন—'এটা যেন চোর ছ্যাঁচড়দের একটা আড্ডাখানা। এখানে সুনাম খোয়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে আসতে দেখলাম না।'

আসলে সৎ-সমাজ বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে ফাদার পিরার্দের কোন ধারণা ছিল না। তবে জানসেন-পন্থী তাঁর এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলেন, কতকগুলো লোক আছে এ সব সমাজে তারা সব দলের প্রতি দক্ষতার সঙ্গে সেবা করে অথবা অতীব লজ্জাকর পথে ধন আহরণ করে অভিজাতদের বসবার ঘরে অনুপ্রবেশ করে থাকে···তাঁর অর্জিত এই ধারণা অনেকটা সত্য। তাই সেদিন সন্ধ্যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি জুলিয়ানের প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি ভয়ানক মনে আঘাত পেয়েছিলেন, মানুষের এ সব ক্রিয়াকাণ্ড তাঁর কাছে পাপ বলে মনে হয়েছিল···তাই তাঁর প্রতিটি কথায় ছিল হৃদয়াবেগের স্পর্শ। জানসেন-পন্থী, উগ্রমেজাজী ফাদার পিরার্দ বিশ্বাস করেন যে, বদান্যতা প্রতিটি খৃষ্টানের অবশ্য কর্তব্য কাজ···তাই সমাজে তাঁর জীবন অবিরাম দ্বন্দ্বময়।

নিজের আসনে ফিরে আসার সময় মাদমোজায়েলকে বলতে শুনল জুলিয়ান—'কি ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা ওই ফাদার পিরার্দের!'

জুলিয়ান বিরক্ত হল। কিন্তু সে ঠিকই বলেছে। এই ঘরে এই মুহূর্তে ফাদার পিরার্দের সততা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু তাঁর ব্রণ ভরা এবং বিবেকের দংশনে কোঁচকানো মুখমণ্ডলে একটা গোপন রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। এমন মুখ তোমায় কি বলতে পারে বলে বিশ্বাস কর! ভাবল জুলিয়ান। যখন কোন ছোট-খাট পাপ কাজ করার জন্য ফাদার পিরার্দের ধর্মভীরু মনে বিবেকের অনুশোচনা সুরু হয় তখন তাঁর মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অথচ ওই নেপিয়ার ছোকরা একজন নামজাদা গুপ্তচর কিন্তু তার মুখমণ্ডলে পবিত্র এবং শান্তির ভাব বিরাজ করছে। তবে ইদানীং ফাদার পিরার্দ যেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে পেরেছেন···তাঁর পোশাক-আশাকে আর সেই আলুথালুভাব নেই।

বসবার ঘরে আর একদিকে একদল অভিজাত-পুরুষ জটলা করছিল। এরা সাধারণত খুব একটা কথা বলে না, আলোচনায় যোগ দেয় না। এদের সকলেরই নামে কিছু না কিছু দুর্নাম রটেছে। তবে এরা খুবই ধূর্ত। মারকুইসের বাড়ী তারা হাজিরা দেয় কেননা জনরব যে মারকুইস অল্পদিনের মধ্যেই মন্ত্রীত্ব পাচ্ছেন। তরুণ তানবো এ ঘরে আজ প্রথম প্রবেশ করেছে···এই দলে সে বসেছিল। তার অনুভূতি খুব সূক্ষ্ম নয় তবে সে তা' আহরণ করতে চায়। তাই সজোরে হাত পা নেড়ে সে কথা বলছিল।

জুলিয়ান তখন নিজের দলের মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল।

—'ওরা এই লোকটাকে দশ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিচ্ছে না কেন? সরীসৃপদের মাটির নীচে গর্তে আটকে রাখা উচিৎ। যাতে ওরা অন্ধকারেই মরে যায়, নইলে ওদের বিষ উথলে ওঠে এবং আরও সাংঘাতিক বিপদ নেমে আসে। ওকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা করে কি-বা লাভ হল? ওই লোকটা গরীব, তাই হয় ত এই জরিমানা যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, কিন্তু ওর দলের লোকেরা ওর জরিমানা দিয়ে দেবে। ওর পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক জরিমানা এবং দশ বছরের কারাদণ্ড হলে উপযুক্ত শাস্তি হত।'

হায় ঈশ্বর! কে সেই দানব-পশু যার কথা সে বলছে? তার সহকর্মীর ভয়ানক কণ্ঠস্বর শুনে এবং হাত-পা নাড়া দেখে ভাবল জুলিয়ান। খানিক পরে সে বুঝতে পারল যে, দেশের সবসেরা কবি বারেঙ্গার সম্পর্কে সে এসব কটুকথা বলছে।

—'ওরে হতভাগা!' অনুচ্চ কণ্ঠে কথাগুলো আওড়াল জুলিয়ান। তার দু'চোখে জল দেখা দিল। বদমাস খুদে ভিখিরী, এসব কথা বলার জন্যে তোকে একদিন শাস্তি দেব!

তবু এ বাড়ীর বসবার-ঘরে এরাই অতিথি এবং মারকুইস গৃহকর্তা।

মাদমোজায়েল মোলকে ঘিরে বসেছে একদল তরুণ, তারা কমেৎ ড্য থালেরকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। হতভাগ্য থালের। অথচ এই থালের একজন ধনী ইহুদির একমাত্র ছেলে। নামজাদা সেই ইহুদি জনগণের সাথে রাজার যুদ্ধ বাধলে রাজাকে বহু অর্থ ধার দিয়েছিল। কিছুদিন হল বাপের মৃত্যুর পর থালের ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছে। তার এখন মাসে আয় এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। এবং হায় রে, তার নাম আজ সকলের কাছেই পরিচিত। সুতরাং এই বিশেষ অবস্থায় লোকটির চরিত্র খুবই সরল বা মনের জোর খুব প্রবল। কিন্তু দুঃখের কথা কমেৎ আজ তার তোষামোদকারীদের হাতে খেলার পুতুলের মতন… কারণ তারা তাকে তোষামোদ করে করে উৎসাহের ফানুসটাকে ফাঁপিয়ে তুলছে। কেউ কেউ তার মনে এই আশা জাগিয়ে দিয়েছে যে, সে একদিন মাদমোজায়েলকে বিয়ে করতে পারবে।

নরবারট মাঝে মাঝে সমবেদনা জানিয়ে বলে—'ওর ইচ্ছার কথা বলে ওকে দোষ দিও না!'

তবে কমেৎ ড্য থালেরের মনে একটা জিনিষের বড় অভাব আছে…ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম-চাঞ্চল্য তার মনে নেই। অনেকেই তাকে উপদেশ দেয়, সেও শোনে…কিন্তু উপদেশ অনুসারে কাজ করতে সে পারে না।

মাদমোজায়েল বলে যে, তার মুখ দেখলে যে কোন মানুষ অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে। ওর মুখে এক বিশেষ ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতা এবং অতৃপ্তির ভাব ফুটে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর দৃষ্টিতে আত্মসচেতনতার সাথে কর্তৃত্বের স্পর্শ পরিস্ফুট হয়…এই ধরনের ভাব ফরাসীদেশের ধনীশ্রেষ্ঠের মুখে থাকবারই কথা…

বিশেষ করে তার আকৃতি যখন সুন্দর এবং বয়স এখনও ছত্রিশ হয় নি।

একজন বলে উঠল—'ওর মধ্যে এক ধরনের ভীরু অবাধ্যতা রয়েছে।'

সে যাতে সন্দেহ না করে তাই নরবারট এবং অন্যান্যরা খুব জোরে হেসে উঠল।

অবশেষে রাত একটা বাজল। ওরা কমেৎ থালেরকে উঠিয়ে দিল।

নরবারট জানতে চাইল—'এই আবহাওয়ায় তোমার সেই বিখ্যাত আরবী ঘোড়াদু'টো বুঝি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?'

—'না, এ দু'টো নতুন। দামও অনেক কম। বাম দিকের ঘোড়াটার দাম পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক কিন্তু ডান দিকের ওটার দাম মাত্র এক শ' লুই। তবে ওটাকে কেবল রাতে বের করা হয়। এবং অন্যটার সঙ্গে ওটা তখন সমান তালে ছুটতে পারে।'

কমেৎ থালের চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে অন্য ভদ্রলোকেরাও হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ওরা হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে শুনে জুলিয়ান ভাবতে লাগল, তাহলে আমার অবস্থার একেবারে বিপরীত দিকটার সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটল। আমার বছরে বিশ লুই রোজগার করবার ক্ষমতা নেই অথচ আমার পাশে এমন একজনকে দেখলাম যে রোজ বিশ লুই রোজগার করে। এবং ওরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে···এমন দৃশ্য মানুষের মন থেকে ঈর্ষার স্পৃহা বিদূরিত করে।

৫ : অনুভূতি-প্রবণতা এবং একজন ধর্মভীরু মহিলা

ওরা ত অভ্যস্ত এখানে অনুভূতিশূন্য
বৈচিত্র্যহীন কণ্ঠস্বর শুনতে, তাই কোন ধারণায়
রঙের স্পর্শে ওদের মনে হয় অশ্লীলতা। নামুক দুঃখ
সেই মানুষটার মস্তকে যার মধ্যে রয়েছে মৌলিকত্ব!
—ফবলাস্

কয়েক মাস অতিবাহিত হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে···অবশেষে এ বাড়ীর গোমস্তা এসে জুলিয়ানকে তার তিন মাসের বেতন দিল। এবং সেদিনই সে একটা সিদ্ধান্তে পৌছল। মারকুইস তাঁর নরম্যাণ্ডি ও ব্রিটানির জমিদারী দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন জুলিয়ানকে। প্রায়ই তাকে সেখানে যাতায়াত করতে হয়। ফাদার পিরার্দের উপদেশ মত মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ারের সঙ্গে মারকুইসের সেই বিখ্যাত মামলা সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখা জুলিয়ানের একটা বিশেষ কাজ।

তাঁর নামে আসা প্রতিটি চিঠির মারজিনে মারকুইস নিজের হাতে নোট্ লিখে দেন, তাই দেখে জুলিয়ান চিঠির জবাব লেখে এবং মারকুইস কেবল স্বাক্ষর করে দেন। ধর্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা অভিযোগ করতেন জুলিয়ানের আবেদন-পত্র

লেখায় অক্ষমতার জন্য, তবে তাঁরা মনে করতেন যে সে একজন মেধাবী ছাত্র। প্রবল উৎসাহে নানা ধরনের কাজের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য জুলিয়ান গ্রাম থেকে যে দেহ-লাবণ্য নিয়ে এসেছিল তা খুব শীঘ্রই অন্তর্নিহিত হল। ধর্ম-বিদ্যালয়ে তার সহপাঠীদের কাছে তার ফ্যাকাসে চিবুক মেধার প্রমাণ বলে প্রতিভাত হত। এখানকার ধর্ম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনে অসদ-উদ্দেশ্যের পরিমাণ অনেক কম··· তারা তাকে ক্ষয়রোগী বলে মনে করত।

মারকুইস একটা ঘোড়া দিয়েছিলেন জুলিয়ানকে। কিন্তু ছাত্ররা তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে ফেলবে এই ভয় ছিল জুলিয়ানের মনে। সে তাদের বলেছিল যে, চিকিৎসক তাকে ঘোড়ায় চাপার ব্যায়াম করতে পরামর্শ দিয়েছেন। ফাদার পিরার্দ তাকে কয়েকজন জানসেন-পন্থীর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। জুলিয়ান খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে ভণ্ডামির সাথে ধর্ম-ভাবের একটা মিশ্র ধারণা ছিল এবং আশা ছিল এমনিভাবে সে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। কিন্তু এই লোকগুলোর মনে অত্যন্ত সাদাসিধা ঈশ্বর-ভক্তি এবং অনবরত উপায় অনুসন্ধানে বিরত থাকার প্রবণতা দেখে সে তাদের প্রশংসা করেছিল। তার সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হল। এই সব জানসেন-পন্থীদের মধ্যে কাউণ্ট আলতামিরা নামের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জুলিয়ানের পরিচয় হল··· ছ'ফুট দীর্ঘ তাঁর দেহ। একজন উদারপন্থী, স্বদেশে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে এবং তিনি খুব ধর্মপরায়ণ। তাঁর মধ্যে বিচিত্রভাবে ঈশ্বর-ভক্তি ও স্বদেশ-ভক্তির মিলন দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

কাউণ্ট নরবারট এবং জুলিয়ানের মধ্যে একটা শাস্তির ভাব বিরাজ করছিল। কাউণ্টের বন্ধুরা যখন জুলিয়ানকে ঠাট্টা করত তখন জুলিয়ান তীব্রভাষায় জবাব দিতে দ্বিধা করত না···এ ব্যাপারটা কাউণ্ট বুঝেছিল। দু'চারবার আচরণে বিচ্যুতি ঘটেছিল তাই পারতপক্ষে জুলিয়ান মাদমোজায়েলের সঙ্গে কথা বলত না। এ বাড়ীর প্রত্যেকে তার সঙ্গে ভদ্র-সুলভ আচরণ করলেও তার একটা ধারণা হয়েছিল যে, সে এদের চোখে ব্রাত্য। তার গ্রাম্য স্বভাব একটা প্রবাদ প্রমাণ করেছিল : ঘনিষ্ঠতা ঘৃণা সৃষ্টি করে। বোধ হয় প্রথম আগমনের সময় থেকে এখন তার দৃষ্টি-শক্তি অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে অথবা প্যারিসের নাগরিক-জীবনের মোহিনী-শক্তির আকর্ষণ এখন অনেক কমে গেছে। যখনি তার হাতের কাজ শেষ হয় তখনি সে দারুণ একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়ে। এমন পরিমিত এবং নিখুঁতভাবে গঠিত এই গ্রহণ-ব্যবস্থা যে, ভদ্রতা যেন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে···এবং এটাই হচ্ছে সৎ সমাজের বৈশিষ্ট্য। যে হৃদয়ে সামান্যতম অনুভূতি আছে এ খেলা তারই নজরে পড়ে।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, গ্রামীণ পরিবেশের অশ্লীল এবং অভদ্র কিছু কিছু আচরণ সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন···গ্রাম্য লোকদের জবাবে তাই উত্তাপের স্পর্শ অনুভব করা যায়। হোটেল দ্য লা মোলে জুলিয়ানের আত্ম-সম্মানে কখনও

আঘাত লাগে নি···কিন্তু তবু দিনের শেষে প্রতিদিন তার কান্না পায়। গ্রামে কোনও চা-খানায় ঢোকবার মুখে যদি দুর্ঘটনা ঘটে পরিচারকরা তোমার জন্যে আগ্রহ দেখাবে···বার বার জানতে চাইবে যে, এর ফলে তোমার অভিমানে আঘাত লেগেছে কি না এবং এর ফলে তোমার মনে মোচড় দেবে। কিন্তু শহর প্যারিসে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যে মানুষ মুখের হাসি চাপে···কিন্তু তুমি অপরিচিত হয়ে থাকবে।

কয়েকটা ছোটখাট এমন দুর্ঘটনা ঘটল যাতে জুলিয়ান হাস্যকর অবস্থায় পড়ল, যদিও নিজেকে সে কোন সময়ে হাস্যকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চায় না। তার উদ্ভট অনুভূতিপ্রবণতার জন্য সে অসংখ্যবার ভুল করে। আত্মরক্ষার কলা-কৌশল শিক্ষাগুলোই তার কাছে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল···তাই প্রতিদিন সে পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করত এবং অল্পদিনের অসি-চালনায় দক্ষতা অর্জন করল। যখনই সে অবসর পেত তখনই আর আগের অভ্যাস-মতন বই পড়ায় মন না দিয়ে ছুটে চলে যেত অশ্বারোহণ শেখবার স্কুলে এবং সবচেয়ে বেয়াড়া ঘোড়াটা চেয়ে নিত। এমনি ধরনের বেয়াড়া ঘোড়ায় চাপলে তার মাটিতে আছড়ে পড়ার অবস্থা হত।

জুলিয়ানের বুদ্ধিমত্তা, নীরবতা এবং কাজ করবার অদম্য উৎসাহ দেখে মারকুইস তাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। তাই ধীরে ধীরে জরুরি ব্যবসা-সংক্রান্ত সব কাজের ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মনের উচ্চাশা যখন নির্বাপিত হয়েছিল সেই মুহূর্তগুলোতে মারকুইস নিজের কাজ খুব দক্ষতার সাথে গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কোথায় কি ঘটছে তা' তাঁর জানা ছিল তাই ফাটকায় অর্থ লগ্নি করতে তিনি বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। বাড়ী আর বনাঞ্চল তিনি কিনেছিলেন। তবে বড় তাড়াতাড়ি তিনি মেজাজ খারাপ করতেন। এক নাগাড়ে শত শত ফ্রাঙ্ক তিনি খরচ করতেন, মামলা-মোকদ্দমায় বহু অর্থ ব্যয় করতেন। উগ্র স্বভাবের ধনীরা আমোদ-আহ্লাদে মন দেয় এবং তার ফলে ব্যবসায়ে তারা লাভ করতে পারে না। তাই হিসাবপত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এমন একজন কর্মচারীর খুব প্রয়োজন ছিল মারকুইসের যাতে তাঁর অর্থের লেন-দেন পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সহজে বোধগম্য হয়।

স্বভাব অনুযায়ী মাদাম দ্য লা মোলের মন খুবই সতর্ক, তবে মাঝে মাঝে তিনি জুলিয়ানকে নিয়ে মজা করেন। অনুভূতিপ্রবণ হওয়ার জন্যে অভিজাত মহিলাদের মনে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটা মনে হয় তাঁদের ভদ্র আচরণের বিপরীত ক্রিয়া। বারকয়েক জুলিয়ানের হয়ে মারকুইস তাঁকে বলেছিলেন—'দেখ যদিও তোমার বসবার-ঘরে হাস্যকর অচল কিন্তু নিজের লেখার টেবিলে সে খুবই পারদর্শী।' আর জুলিয়ান ভাবে, সে মারকুইসের গোপন কৌশল জেনে ফেলেছে। যে-মুহূর্তে ব্যারণ দ্য লা জুমেৎ বসবার-ঘরে প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত থেকে সব কাজে মারকুইস-পত্নীর আগ্রহ বেড়ে যায়। সে এক ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ ব্যক্তিত্ব···তার মুখমণ্ডলে কোনও আবেগের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

বেঁটে, রোগা আর কদাকার চেহারা এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত। সে তার পল্লী-নিবাসে দিন কাটায় এবং কোন কিছুর জন্যই তার মনে কোন অনুযোগ নেই। এটাই তার চিন্তার বিশেষ ধারা। তাঁর কন্যার স্বামীরূপে যদি তিনি ব্যারণ দ্য লা জুমেতকে পেতেন তাহলে সেটাই হত তাঁর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ক্ষণ। এটাই মাদাম দ্য লা মোলের মনের ইচ্ছা।

৬: প্রশ্বরের একটি প্রশ্ন

যদি আত্মশ্লাঘা ক্ষমার যোগ্য হয় তবে সেটা হওয়া উচিৎ যৌবনের প্রথম পাদে, কেননা তখনই অতিশয়োক্তি পছন্দসই একটি বিশেষ লক্ষণ হিসাবে প্রতিভাত হয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রেমের, উল্লাসের, উদ্দীপনার স্পর্শ। কিন্তু আত্মম্ভরি আত্মশ্লাঘার জন্য কি! আত্মশ্লাঘা থেকে গাম্ভীর্য এবং প্রভাব-বিস্তারের অহমিকা প্রকাশ পায়। এমন বোকামির বাড়াবাড়ি উনিশ শতকের জন্য সংরক্ষিত। এবং এসব লোকদের আশা, তারা 'বিপ্লব' নামক জল-মস্তকী দানবকে শৃঙ্খলিত করবে।

—লা জোহানিসবার্গ (পুস্তিকা)

নতুন কোন আগন্তুক অহমিকার দরুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, তার সামনে তাই জুলিয়ান কোন গুরুতর ভুল-ভ্রান্তি করে না। একদিন সেণ্ট হনর সড়কে জুলিয়ান যখন বেড়াচ্ছিল তখন চেপে বৃষ্টি এল···সে তাড়াতাড়ি একটা কাফেতে ঢুকে পড়ল। একজন দীর্ঘকায় যুবক পরনে বিভার কাপড়ের লম্বা-ঝুল কোট, ওর দিকে কটমট চোখে তাকাল। অবাক হল জুলিয়ান। বেসানকনে ঠিক এমনিভাবে আমানদার প্রেমিকও তার দিকে তাকিয়েছিল। জুলিয়ানও জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

এমন কটমটে দৃষ্টি সহ্য করা অপমানকর···তাই ফিরে তাকানো জুলিয়ানের কাছে অবশ্য কর্তব্য। অসহ্য। সে এর কারণ জানতে চাইল। যুবক তাকে জবাবে অপমানকর ভাষায় ধমক দিল। কাফেতে উপস্থিত প্রত্যেকে তাদের দুজনকে ঘিরে ধরল। পথচারীরা চলা থামিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যিকারের গ্রাম্য সতর্কতার স্বভাব জুলিয়ানের, তাই সব সময় সে পকেটে একটা গুলিভরা পিস্তল রাখে। পকেটে হাত ভরে সে পিস্তলটা চেপে ধরল। বুদ্ধিমানের মত সে কেবল মাঝে মাঝে থেমে একটা কথাই জানতে চাইছিল— 'মহাশয়ের ঠিকানাটা কি? আপনাকে ইতর মনে হচ্ছে।'

বার বার সে একটা কথাই জানতে জিদ করছে শুনে উপস্থিত জনতা প্রভাবিত হল। তারা বলল—'উচ্ছন্নে যাক! ওহে সেই থেকে ত বকছ, ও যখন ঠিকানা জানতে চাইছে বলে ফেল!' বার বার এই একই অভিমত শুনে

লম্বা-ঝুল কোট পরা যুবক পাঁচ ছ'খানা ঠিকানা লেখা কার্ড জুলিয়ানের মুখের উপর ছুঁড়ে দিল। ভাগ্য ভাল যে একখানাও তার গায়ে লাগে নি·· কেননা সে শপথ করেছিল যে তার গায়ে হাত না দিলে সে পিস্তল ব্যবহার করবে না। লোকটা এবার চলে গেল, তবে যাওয়ার সময় বার বার পিছন ফিরে ঘুষি উঁচিয়ে খিস্তি করছিল।

জুলিয়ানের সারা দেহ ঘামে জবজবে। এই নীচের শিরোমণি লোকটা তাকে এতদূর অপমান করে গেল! মনে মনে সে আওড়াল। এরকম অসম্মানকর অনুভূতির হাত থেকে কি করে নিজেকে উদ্ধার করব?

কোথায় এখন সে দ্বিতীয়বার তাকে খুঁজবে? তার ত একজনও বন্ধু নেই। জনা কয়েক পরিচিত লোক আছে তারা কিছুদিন তার সঙ্গে মিশে সরে গেছে। আমি একজন অসামাজিক তাই নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি পেলাম। অবশেষে লাইভেনের কথা তার মনে পড়ল···অবসরপ্রাপ্ত একজন সেনানী···তার সঙ্গে প্রায়ই অসি চালনা অভ্যাস করে জুলিয়ান।

সে লাইভেনকে সব কথা খুলে বলল।

—'বেশ, তোমার সঙ্গী হতে পারি। তবে আমার একটা শর্ত আছে। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যদি আহত করতে পার তবে তথ্‌খুনি ওখানে আমার সঙ্গে লড়তে হবে।' লাইভেন জবাব দিল।

—'তাই হবে।' বলল জুলিয়ান।

কার্ডে নাম ঠিকানা লেখা ছিল। ফাউবর্গের কেন্দ্রে মঁসিয়ে ব'ভয়সিসের বাসা।

সকাল বেলা···সাতটা বেজেছে।

ওরা ঠিকানায় হাজির হল। জুলিয়ান একখানা কার্ড চাকরের হাতে দিল। সে তখনও ভাবেনি যে, ইনি মাদাম রেনলের সেই প্রাক্তণ রাজপুরুষ আত্মীয়। রোম না নেপলসের রাষ্ট্রদূতের সহকারী ছিলেন। গায়ক জেরোনিমোকে ইনিই পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করল।

অবশেষে ফ্যাসান-দুরস্ত, দীর্ঘকায় এবং সুন্দর এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। যেন গ্রীক ভাস্কর্যের হাতেগড়া একটা মূর্তি। ছোট্ট মাথা-ভরা সুন্দর কোঁকড়ানো চুল···একেবারে অবিন্যস্ত নয়। পরনে ডোরা-কাটা ট্রাউজার, নক্সা দেওয়া চটিজোড়ার উপর গাউন লুটিয়ে পড়েছে। মুখে অভিজাত-সুলভ গাম্ভীর্য।

খানিক আগে লাইভেন বলছিল জুলিয়ানকে যে, নিজের অবাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য সে তাদের বসিয়ে রেখেছে। এটাও এক ধরনের অসম্মান দেখানো। তারাও অবাধ্যতা প্রকাশ করবে। কিন্তু মঁসিয়ে ব'ভয়সিসের শান্ত আচরণ; ভদ্রতার সঙ্গে মিশ্রিত আত্ম-সচেতন ও আত্ম-তৃপ্তির ভাব দেখে লাইভেনের

সব মনের ইচ্ছা ওলোট পালট হয়ে গেল এবং অবাক হল সে।

জুলিয়ানও অবাক হল। না, এ লোকটা সেই কালকের লোক নয়। ওই রকম কঠোর একটা লোকের বদলে এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার দেখা হবে তা' সে ভাবেই নি। তার মুখে কোন কথা সরছিল না। সে কেবল তাঁর দিকে একখানা কার্ড বাড়িয়ে ধরল।

—'হাঁ, ওটা আমারই নাম। মাপ করবেন, কিন্তু কিছুই ত বুঝতে পারলাম না...।' সকাল সাতটার সময় কালো কোট পরা জুলিয়ানকে দেখে তার মনে একটুও শ্রদ্ধার ভাব জাগে নি, তাই তিনি কথাগুলো বললেন।

কিন্তু তাঁর মুখে শেষ কথাগুলোর উচ্চারণ শুনে জুলিয়ানের মনে রাগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল—'স্যার, আপনার সঙ্গে লড়তে এসেছি।'

প্রথমটায় হাসি পেলেও এখন জুলিয়ানের কোট-জামার সুন্দর কাট-ছাঁট এবং নিখুঁত ওয়েস্ট কোট দেখে খুব খুশি হলেন ব'ভয়সিস। পায়ের বুট জুতো জোড়াও খুব দামী। কিন্তু সাত সকালে এই কালো পোশাকটা বড় বিশ্রী। এই পোশাকে বুলেট পিছলে যাবে। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের ভদ্র-ভাব ফিরে এল এবং জুলিয়ানকে সম-প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করল।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। ব্যাপারটা বড় মার্জিত। কিন্তু জুলিয়ান ত প্রমাণ উপেক্ষা করতে পারে না। তাঁর সামনে নিখুঁত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে গত দিনের অভদ্র লোকটার কোন মিল নেই অথচ সেই লোকটার হাতে সে অপমানিত হয়েছিল। সরে পড়বার এক অদম্য ইচ্ছা তার মনে বার বার উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু কোনও ওজোড় মনে আসছিল না। আর মঁসিয়ে ব'ভয়সিস মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন কেননা জুলিয়ান তাঁকে বার বার মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করছে।

যুবক রাজপুরুষ সানন্দে লড়তে রাজী হলেন।

লাইভেন এতক্ষণ জানুর উপর দু'হাত রেখে চুপচাপ বসেছিল। তার মনে হল, কেউ একজন অন্য লোকের ভিজিটিঙ্ কার্ড চুরি করেছে বলে তার সাথে মিথ্যে ঝগড়া করার মতন মানুষ তার বন্ধু মঁসিয়ে সোরেল নয়।

ওরা দু'জনে মেজাজ খারাপ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

ব'ভয়সিসের ঘোড়ার গাড়ী বাইরে অপেক্ষা করছিল। ওদিকে তাকাতেই গাড়োয়ানের উপর নজর পড়ল জুলিয়ানের। চিনতে পারল। এই সেই লোক। সেই মুহূর্তেই জুলিয়ান গাড়োয়ানের কোটের কলার ধরে টেনে নীচে নামিয়ে তারই চাবুক দিয়ে তাকে মারতে সুরু করল। দু'জন চাকর ছুটে এল তাকে বাঁচাতে। কিন্তু জুলিয়ান নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তেই তারা পালাল।

ক্যাভলিয়ার ব'ভয়সিস নীচে নেমে এলেন। গম্ভীর মুখ। অভিজাত-সুলভ কণ্ঠে বললেন—'কি ব্যাপার?' সব কিছু জানতে তিনি আগ্রহী। কিন্তু রাজপুরুষের মর্যাদাজ্ঞানে ভরপুর তাঁর মন। ঘৃণারও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু

তবু তিনি অচঞ্চল। মুখে মৃদু হাসির ঝলক...এ হাসি কোনও সময় তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে যায় না।

লাইভেন বুঝতে পারল, ব'ভয়সিসের আর ডুয়েল লড়াইয়ে আপত্তি নেই। তাই বন্ধু হয়ে এবার সে লড়াইয়ের প্রস্তাব করল—'এ ব্যাপারের জন্য লড়াই করা চলে।'

—'আমিও তাই ভাবছি।' বললেন রাজপুরুষ—'বদমাসটাকে আমি বরখাস্ত করে দিয়েছি। আপনারা গাড়ীতে উঠে পড়ুন।'

সকলে ব'ভয়সিসের বন্ধুর বাড়ীতে এলেন।

তিনি 'ডুয়েল' লড়ার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গার কথা বললেন।

জুলিয়ান ভাবছিল, মারকুইসের বাড়ী যাঁরা আসেন তাঁরা অভিজাত হলেও বিরক্তিকর ব্যক্তি। কিন্তু ব'ভয়সিস তেমন মানুষ নন।

মুহূর্তমধ্যে ডুয়েল শেষ হল।

গুলি বিদ্ধ হয়েছিল জুলিয়ানের বাহুতে। রুমাল ব্র্যাণ্ডিতে ভিজিয়ে ওরা তার ক্ষতস্থান বাঁধল। ব'ভয়সিস এই গাড়ীতেই জুলিয়ানকে তাঁর বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করল। মারকুইসের বাড়ীর উল্লেখ করতেই ব'ভয়সিস একবার বন্ধুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। কিন্তু জুলিয়ানের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল।

ব্যস! এইটুকুতেই 'ডুয়েল' শেষ হয়ে গেল? ভাবল জুলিয়ান। ভাগ্যিস ওই গাড়োয়ানের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়েছিল। এবং চা-খানায় আর তাকে অমনি ধরনের অপমান সহ্য করতে হবে না। তাদের আনন্দ-পরিহাসের কোনও ব্যাঘাত ঘটল না। ভালই হয়েছে, এই রাজপুরুষের স্নেহ তার প্রয়োজন আছে। তাহলে অভিজাত পরিবারে বিরক্তিকর আলাপ-আলোচনা একমাত্র বস্তু নয়। এ লোকগুলো ধর্ম-উৎসব নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করতে পারে। কেমন সুন্দর নিখুঁত এদের গল্প বলার ধরন! কি সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গি! ওর মন ঝুঁকল এদের দিকে। খুশি হল। মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে মিশতে ওর ভাল লাগবে।

জুলিয়ানদের বিদায় জানানোর পর ব'ভয়সিস তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ব্যগ্র হলেন। কিন্তু বিশেষ কোন খবর জোগাড় করতে পারলেন না। লোকটাকে জানতে তাঁর বিরাট আগ্রহ। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি ঠিক হবে? ওর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন তা' তত উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

এক সময় সঙ্গীকে ব'ভয়সিস বললেন—'দেখ, কি ভীতিজনক কাণ্ড। মারকুইসের সেক্রেটারীর সঙ্গে ডুয়েল লড়েছি এ কথা ভাবতে পারছি না। আমার গাড়োয়ান আমার নামের কার্ডগুলো চুরি করেছিল বলেই এমন একটা কাণ্ড ঘটল।'

—'তবে এটা ঠিক, এ ঘটনা শুনলে সবাই হাসাহাসি করবে।' সঙ্গী বলল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই ব'ভয়সিস আর তার বন্ধু রটিয়ে দিল যে, মঁসিয়ে সোরেল একজন খুব সুন্দর ভদ্রলোক। আসলে সে মারকুইস মোলের এক বন্ধুর ছেলে। কথাটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। এক পক্ষকালের মধ্যে ব'ভয়সিস বার দুয়েক আহত জুলিয়ানকে দেখতে গেলেন। জুলিয়ান তার ঘরে বন্দী। কথায় কথায় জুলিয়ান একদিন তাঁদের কাছে স্বীকার করল যে, সে জীবনে অপেরা দেখে নি।

তাঁরা বললেন—'সেটা ত ভয়ানক ব্যাপার! লোকে ত অপেরা ছাড়া আর কোথাও যায় না। সর্ব প্রথম তোমার অপেরা দেখা উচিৎ ছিল।'

ব'ভয়সিস একদিন জুলিয়ানকে নিয়ে অপেরায় গেল। তাকে গায়ক জেরোনিমোর সামনে হাজির করল। গায়ক হিসাবে জেরোনিমোর এখন খুব নাম-ডাক।

জুলিয়ানের যুবক-মন মন্ত্রমুগ্ধ হল। ব'ভয়সিসের মন আত্ম-সচেতনতা এবং রহস্যভরা-মর্যাদায় গম্ভীর, অথচ যুব-জনোচিত কৌতুকপ্রিয়তারও নেই অভাব। এমন মানুষ এর আগে জুলিয়ানের নজরে পড়েনি এবং তার মতন গ্রাম্য-লোকের পক্ষে এমন আচরণ অনুকরণ করাও সম্ভব নয়। একই মানুষের মধ্যে অনেক গুণের সমাবেশ ঘটেছে।

অপেরায় ব'ভয়সিসের সঙ্গে জুলিয়ানকে অনেকে দেখল। তাই:নিয়ে সমাজে কথাও উঠল।

একদিন মারকুইস তাকে বললেন—'আচ্ছা! তাহলে ফরাসী গ্রামাঞ্চলে এক ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, আর সেই ভদ্রলোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

জুলিয়ান বাধা দিতে চেষ্টা করল মারকুইসকে। এই জনরব রটানোর ব্যাপারে তার কোন হাত নেই।

—'স্যার, হয় ত মঁসিয়ে ব'ভয়সিস ছুতোরের ছেলের সাথে 'ডুয়েল' লড়তে চান না, তাই এই রটনা।'

মারকুইস বললেন—'জানি। জানি। এখন সুবিধা মতন আমাকেই এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করতে হবে। তবে একটা অনুরোধ করছি, এর জন্যে তোমার অবসর সময়ের অর্ধেক ব্যয় হবে। প্রতিদিন অপেরা সুরু হওয়ার আগে অপেরা-হাউসের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে। অভিজাত নর-নারীদের চাল-চলন দেখবে। তোমার মধ্যে এখনও অনেক গ্রাম্য-ভাব আছে। এগুলো তোমায় ত্যাগ করতেই হবে। তা ছাড়া কোনও কিছু দেখে শেখা ত খারাপ নয়। নামজাদা মানুষদের সঙ্গে হবে পরিচিত। একদিন ওদের কারো কারো কাছে তোমাকে আমার পাঠানোর দরকার হতে পারে। বক্স-অফিসে গিয়ে খোঁজ নেবে। ওরা তোমার জন্যে একখানা অনুমতি-পত্র রাখবে।'

৭ : বাতের ব্যথা

কাজেই পেলাম উচ্চ পদ, নিজের মেধার জন্য নয়
কিন্তু পেলাম আমার প্রভুর বাত-ব্যাধি আছে, তাই।
—বারতোলোত্তি

বাতের যন্ত্রণায় কাতর মারকুইস। তিন সপ্তাহ তিনি ঘর থেকে বেরোতে পারলেন না।

মাদমোজায়েল আর তার মা চলে গেছেন হায়ারিস শহরে···ওখানে মারকুইসের মা থাকেন। কাউন্ট নরবারট মাঝে মাঝে দু'চার মিনিটের জন্য বাবার সঙ্গে দেখা করে যায়। বাপ আর ছেলের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব থাকলেও কেউ কারো সাথে বড় একটা বাক্যালাপ করে না। কাজেই জুলিয়ানের সঙ্গ এখন মারকুইসের একমাত্র অবলম্বন। এই যুবকের নানা অভিনব ধারণা আছে দেখে মাইকুইস দারুণ খুশি হলেন। প্রতিদিন জুলিয়ান সংবাদ-পত্রের মজার খবরগুলো পড়ে শোনাত। একখানা সংবাদপত্রের নাম শুনলে মারকুইসের ঘৃণা জাগত, তিনি শপথ করেছিলেন যে, এই সংবাদপত্রখানা তিনি কখনো পড়বেন না। কিন্তু তবু রোজ একবার সেই সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করতেন। সব শুনে জুলিয়ানের হাসি পেত। আধুনিককালের চালচলনের জন্য মারকুইস বিরক্ত।

কখনও কখনও মারকুইসের অতিশয় ভদ্র কণ্ঠস্বর শুনে জুলিয়ান ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

সেদিন এমনি ধরনের অতীব ভদ্রতা প্রকাশ করে মারকুইস বললেন—'প্রিয় সোরেল, তোমাকে একটা নীল কোট উপহার দিচ্ছি। খুশি হলে সেটা পরে আমার কাছে এস। কমেৎ গু রেজের ছোট ভাই বলে তোমাকে মনে হবে। ওর বাবা ডিউক আমার পুরোন বন্ধু।'

এ সবের অর্থ জুলিয়ানের কাছে পরিষ্কার হল না। সেদিনই বিকালে নীল কোট পরে সে মারকুইসের ঘরে ঢুকল। মারকুইস তার সঙ্গে নিজের সম-গোত্রীয় হিসাবে ব্যবহার করলেন। সত্যিকারের ভদ্রতার প্রকাশ বুঝবার মতন বুদ্ধি জুলিয়ানের আছে···কিন্তু ভদ্রতার সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। তবে মারকুইসের খেয়াল দেখে সে মনে মনে শপথ করে যে, আর হয় ত ভদ্রভাবে শ্রদ্ধা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এখন একটামাত্র ধারণা জুলিয়ানের মন জুড়ে বসল : উনি কি আমার সাথে মজা করছেন ?

কাজেই জুলিয়ান ফাদার পিরার্দের কাছে গেল। তাঁর ভদ্রতাবোধ মারকুইসের চেয়ে কম। ওর কথার জবাবে তিনি শুধু মুখে একধরনের শব্দ করলেন। তারপর অন্য কথা পাড়লেন। পরের দিন সকাল বেলায় জুলিয়ান আবার তার কালো

কোটটা পরে মারকুইসের ঘরে গেল। হাতে একটা পোর্ট ফোলিও আর সই করাবার কাগজপত্র। মারকুইস পুরোন ভঙ্গিতে জুলয়ানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। কিন্তু নীল কোট পরে যখন বিকালে জুলিয়ান এল তখন মারকুইস একেবারে নিখুঁত অভিজাত হয়ে উঠলেন কথায় আর ব্যবহারে।

একদিন মারকুইস বললেন—'দেখ, একজন অসুস্থ বৃদ্ধকে প্রতিদিন সঙ্গ দিতে তুমি যখন বিরক্ত হচ্ছ না তখন তোমার জীবনের সব কথা আমাকে অকপটে বল। বলবে এমনভাবে যেন আমি আনন্দ পাই। আর সেটাই ত আসল জীবন। লড়াইয়ের ময়দানে কেউ প্রতিদিন আমার জীবন বাঁচাতে পারে না, পারে না আমাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপহার দিতে। কিন্তু আজ যদি রিভারোল আমার বিছানার পাশে আসনে বসে থাকত তবে সে ঘণ্টাখানেকের জন্য আমার যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারত, পারত আমার একঘেয়েমির জ্বালা ভোলাতে। দেশত্যাগের পর হামবুর্গে থাকার সময় ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।'

তারপর রিভারোলের সম্পর্কে নানা কথা জুলিয়ানকে বললেন মারকুইস।

এই যুবক পাদরিকে মারকুইস অভিজাত-সমাজে স্থান করে দিতে চান। তাই তাকে সজীব করে তুলতে তিনি ব্যগ্র। জুলিয়ানের মনের অহমিকাকে তেজস্বিতায় পরিণত করতে ইচ্ছুক। যেহেতু তাকে সত্য কথা বলতে বলা হয়েছে তাই জুলিয়ান ঠিক করল যে, দুটো বিষয় ছাড়া আর সব কথা সে তাঁর কাছে অকপটে বলবে।

এই বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে দারুণ আগ্রহী হলেন মারকুইস। আনন্দ আহরণের ইচ্ছায় প্রথম প্রথম তিনি জুলিয়ানের ছেলেমানুষি ধারণা শুনে বেশ খুশি হলেন। তারপর আরও খুশির খোরাক পেলেন শান্তভাবে তার ছেলেমানুষি শুধরে দিয়ে। মানুষ আর বস্তু সম্পর্কে যুবকের মনে নানা বিচিত্র ধারণা বিরাজ করছে। মারকুইস ভালভাবে জানেন, গ্রাম থেকে অন্য যারা আসে তারা প্যারিসের যা কিছু দেখে তাই প্রশংসা করে। কিন্তু এই যুবক সব কিছুকে দেখে ঘৃণার চোখে। তাদের মনে রয়েছে অফুরন্ত অনুরাগ কিন্তু তার অনুরাগ যথেষ্ট নেই···তাই বোকারা তাকেই বোকা মনে করে।

এ বছর শীতের প্রকোপ প্রবল। তাই বাতের যন্ত্রণা তীব্র হল। রোগ ভোগ করতে হল বেশ কয়েক মাস ধরে।

মারকুইস ভাবলেন, লোকে ত স্প্যানিয়েল কুকুর পোষে তবে আমি যদি এই যুবক পাদরিকে ভালবাসি তবে ক্ষতি কি? ওর মধ্যে মৌলিকত্ব রয়েছে। ওকে যদি আমি ছেলের মতন দেখি···তাতে ক্ষতি কি? আমার এই খেয়ালের জন্যে, ধরে নিলাম এই খেয়াল আমার মনে দীর্ঘকাল রইল, তাহলে আমার উইলে একখানা হীরের দাম হিসাবে পাঁচশ' লুইয়ের ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আশ্রিত মানুষটির দৃঢ় চরিত্রের ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারকুইস প্রতিদিন তার হাতে নতুন নতুন ব্যবসার ভার ছেড়ে দিতে লাগলেন। জুলিয়ান শঙ্কিত

হল, কারণ এই মহৎ লোকটি মাঝে মাঝেই তাকে পরস্পর-বিরোধী উপদেশ দেন। এর ফলে তাকে বিপদে পড়তে হতে পারে। তাই জুলিয়ান এখন নোট বই নিয়ে মারকুইসের সব উপদেশ লিখে সই করায়। একজন কেরাণী নিয়োগ করেছে জুলিয়ান…সে প্রতিটি ব্যবসার উপদেশ একখানা খাতায় লিখে রাখে এবং প্রতিটি চিঠির নকল রেখে দেয়।

এই নতুন ব্যবস্থা মারকুইসের কাছে প্রথমটায় হাস্যকর মনে হল, কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যে এর সুবিধা মারকুইস বুঝতে পারলেন। ব্যাঙ্ক থেকে একজন কেরাণী আনার প্রস্তাব করল জুলিয়ান। নতুন ধারায় সেই কেরাণীটি আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখতে সুরু করল। এর প্রতিটি হিসাব দেখবার দায়িত্ব ছিল জুলিয়ানের।

মারকুইস দেখলেন যে, আয়-ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব রাখার ফলে তিনি আরও নতুন নতুন ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করতে পারছেন। এতকাল দালালদের হাতের তিনি পুতুল ছিলেন, তারা তাঁকে শোষণ করত…এখন আর তাদের দেওয়া হিসাবের উপর নির্ভর করতে হয় নি।

একদিন মারকুইস তাঁর যুবক মন্ত্রণাদাতাকে বললেন—'দেখ, তোমার নিজের কাজের জন্যে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক নাও।'

—'কিন্তু স্যার, এতে লোকে আমার চরিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণা করবে।'

মারকুইস বিরক্ত হলেন। বললেন—'কি চাও তাহলে?'

—'আপনি নিয়ম-মাফিক একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুণ। তাহলে এটা খরচ হিসাবে লেখা হবে।'

মারকুইস চুক্তিপত্র লিখে দিলেন।

বিকালে নীল কোটটা পরে জুলিয়ান যখন আসে তখন মারকুইস তার সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে কোন কথা বলেন না। জুলিয়ান খুবই আত্মসচেতন…বৃদ্ধ তাই তাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সামরিক বাহিনীর শল্য চিকিৎসকের মৃত্যুর পর এমন স্নেহের চোখে তাকে আর কেউ কোনদিন দেখে নি। সে বুঝতে পারে যে, মারকুইস তার আত্মসচেতন-ভাবকে খুবই প্রশংসা করেন। মারকুইস এক-জন মহান অভিজাত পিতার পুত্র।

একদিন সকালে একটা কালো কোট গায়ে দিয়ে জুলিয়ান এল মারকুইসের ঘরে। ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করল। তাকে খুব ভাল লাগল মারকুইসের। তিনি ঝাড়া দু'ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলেন। খানিক আগে বোর্সের একজন দালাল মারকুইসকে অনেকগুলো ব্যাঙ্ক নোট পাঠিয়েছে। তারই খান-কয়েক নোট তিনি জুলিয়ানের হাতে গুঁজে দিলেন।

—'স্যার, আপনাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমাকে যদি বলবার অনুমতি না দেন ত, আপনার প্রতি আমার যে অফুরন্ত শ্রদ্ধা আছে তা' কমে যাবে।'

—'কি বলবে বল।'

—'এই দান গ্রহণের হাত থেকে দয়া করে আমাকে অব্যাহতি দিন। কালো কোট-পরা লোককে এই অর্থ দান করা হচ্ছে না। তাই নীল কোট-পরা যে লোকটির সঙ্গে আপনার ভাল সম্পর্ক আছে এই দান গ্রহণ করলে তা' টুটে যাবে।' জুলিয়ান বলল।

মারকুইসের দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা এই ঘটনার কথা মারকুইস বললেন ফাদার পিরার্দকে।

আরও কিছু দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকার পর মারকুইস অবশেষে সেরে উঠলেন।

জুলিয়ানকে বললেন মারকুইস—'কয়েক মাস লণ্ডনে বেড়িয়ে এস। আমার চিঠিপত্র এলে নোট লিখে তোমার কাছে লোক দিয়ে পাঠাব। তুমি জবাবী চিঠি লিখে পাঠাবে। এভাবে চিঠির জবাব পাঠাতে চার-পাঁচ দিনের বেশী দেরী হবে না।'

ক্যালে বন্দর হয়ে জুলিয়ান লণ্ডন শহরে পৌছল।

ইংলণ্ডের প্রতিটি অফিসার যেন এক একজন স্যার হাডসন লো। প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পুরুষ যেন এক একজন লর্ড বাথার্স্ট...ওরা সবাই মহান নেপোলিয়নকে অসম্মান করার জন্য তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দণ্ডের হুকুম দিচ্ছে।

লণ্ডনে একজন রুশ যুবক অভিজাত জমিদারের সাথে জুলিয়ানের বন্ধুত্ব হল।

ওখানকার পরিচিতরা বলল—'দেখ সোরেল, এটা তোমার ভাগ্য। প্রকৃতি তোমার মধ্যে একটা শীতল অনাসক্তির ভাব সৃষ্টি করেছেন। কৌতূহল থেকে তাই তোমার অবস্থান অনেক দূরে, অথচ এই অভ্যাস আহরণ করতে আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।'

রাজকুমার কোরাসফ বলল তাকে—'যে যুগে বাস করছ সে-যুগ সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। লোকে যা' চাইবে তুমি ঠিক তার বিপরীত কাজ করবে।, আমার কথা শোন, এটাই হচ্ছে আধুনিক কালের ধর্ম। বোকা ব'নো না বা স্নেহের পাত্রও হয়ো না। তাহলে লোকে তোমাকে বোকা বা করুণার পাত্র মনে করবে না।'

জুলিয়ানের ধারণা হল, এ দেশে আভিজাত্যের কোন কদর নেই। তাই অভিজাতদের রাগ দেখে সে হেসেছে। এখানে সে কেবল স্ফূর্তিবাজ লোকজনদের দেখেছে। ঈশ্বরের ধারণা করাই এখানে সেরা উৎপীড়ন।

ইংলণ্ড থেকে ফেরবার পর মারকুইস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ইংলণ্ড থেকে কি আনন্দের খবর আমার জন্যে আনলে?'

জুলিয়ান নীরব রইল।

—'বেশ ত, আনন্দ বা নিরানন্দ কি খবর আনলে?'

তখন জুলিয়ান জবাব দিল—'প্রথম, ইংলণ্ডের সব সেরা বুদ্ধিমান লোকটাও প্রতিদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য পাগল হয়ে যায়। আত্মহত্যা-রূপ দানব তাকে

তাড়া করে বেড়ায়। আর এই দানব ওদেশের জাতীয় দেবতা। দ্বিতীয়তঃ, কোনও বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাধর মানুষ ওদেশে পা দেওয়ার সাথে সাথে নিজের মূল্যমানের শতকরা পঁচিশ ভাগ হারায়। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতন এমন সুন্দর মনোহর এবং আকর্ষণীয় আর কোন বস্তু বিশ্বের কোথাও নজরে পড়বে না।'

মারকুইস বললেন—'এবার আমার বলার পালা। আচ্ছা, রুশীয় রাষ্ট্রদূতের ভোজের আসরে তুমি একথা বলেছিলে কেন যে, ফরাসীদেশ পঁচিশ বছর বয়সের তিন লক্ষ তরুণ যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে আছে? তুমি কি ভেবেছিলে যে, এ কথা বললে তুমি রাজার শ্রদ্ধা পাবে?'

—'দেখুন, নামজাদা রাষ্ট্রদূতদের সাথে কথা বলার সময় যে কি বলতে হবে তা' অনেকে জানে না। তারা তাই গুরুতর বিষয় নিয়ে কথা বলা সুরু করে। খবরের কাগজের চোখে যারা অতি সাধারণ মানুষ তারা বোকা। সত্য এবং মৌলিক কিছু বললেই তারা ফাঁফরে পড়ে যায়, জানে না কি জবাব দেবে। এবং পরের দিন প্রথম সচিব তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে অভব্য আচরণ করেছে।'

হেসে মারকুইস বললেন—'না, খারাপ কিছু হয় নি। তবে ওহে বুদ্ধিমান, ইংলণ্ডে তোমাকে যে কেন পাঠিয়েছিলাম তা' তুমি আন্দাজ করতে পার নি।'

—'মাপ করবেন। আমি ত মহামান্য রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন ভোজ খাওয়ার জন্যে গিয়েছিলাম। আর ওই রাষ্ট্রদূত ওদেশের সবচেয়ে ভদ্রব্যক্তি।'

কিন্তু মারকুইস বললেন—'এই 'ক্রস'-চিহ্নটা পাবে বলেই ওখানে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। তোমার কালো-কোট এখন আর আমি ঘৃণার চোখে দেখি না। আর তোমার খুশিঝরা কণ্ঠস্বরের সঙ্গেও আমি পরিচিত যখন তুমি তোমার নীল-কোট পরে থাক। এবার শোন, এই ক্রস যতক্ষণ তুমি পরে থাকবে ততক্ষণ তুমি আমার বন্ধু। অজান্তে ডিউক রেজের ছোট ছেলে কূটনীতির কাজে ছ'মাস বিদেশে গিয়েছিল।'

জুলিয়ানের দু'চোখে কৃতজ্ঞতা।

মারকুইস বললেন—'দেখ, তোমাকে কোন উঁচু পদে এখানে বসাচ্ছি না। তা' করলে ভুল হবে। তবে আমার মামলা-মোকদ্দমার কাজ করে যখন তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং আর একাজ তোমার ভাল লাগবে না তখন ঠিক ফাদার পিরার্দের মতন তোমার একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেব। ব্যস! আর কোন কথা বলার নেই।

'ক্রস' ধারণ করে জুলিয়ানের আত্ম-সচেতন ভাব সহজ হল। আরও খোলা-খুলি কথা বলতে পারল। আর কোন মন্তব্যের মধ্যে অসম্মানের স্পর্শ অনুভব করেও সে অপমান বোধ করল না…কেননা মাঝে মাঝে বৈঠকে ত এ ধরনের মন্তব্য কেউ কেউ করে বসে।

একদিন মঁসিয়ে ভালেনদের সাথে জুলিয়ানের দেখা হল।

নতুন ব্যারন হয়েছে মঁসিয়ে ভালেনদ। তাই প্যারিসে এসেছে মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে।

ওর কাছ থেকে জুলিয়ান ভেরিয়ারের অনেক খবর শুনল। ওখানে সকলের কাছে জানাজানি হয়ে গেছে যে, মঁসিয়ে রেনল একজন জ্যাকোবিন-পন্থী। তাই এবারকার নির্বাচনে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াবে এই নতুন ব্যারন। আর লিবাবেলরা সমর্থন জানাবে মঁসিয়ে রেনলকে।

জুলিয়ান অনেকবার চেষ্টা করল মাদাম রেনলের খবর জানতে…কিন্তু জানতে পারল না। কেননা প্রেমের ব্যাপারে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, হয়ত সে কথা মনে পড়তে কিছু বলতে চাইল না ব্যারন। অন্য কথা পাড়ল।

বলল—'আমার সাথে মহামান্য মারকুইস দ্য লা মোলের আলাপ করিয়ে দাও।'

জুলিয়ান ভাবতে লাগল, হাঁ সত্যিই আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিৎ। তুমি ত একটা পাকা বদমাস। বলল—'সত্যি কথা বলতে কি হোটেল দ্য লা মোলে আমি এমন নগণ্য একজন মানুষ যে কাউকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না।'

সেদিনই সন্ধ্যায় ভালেনদ সম্বন্ধে সব কথা জুলিয়ান বলল মারকুইসকে। বলল তার অতীত ইতিহাসও।

মারকুইস বললেন—'তুমি কেবল ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না ওকে আমি পরের দিন ডিনারেও আমন্ত্রণ করব। ও আমাদের একজন জেলা-শাসক হবে।'

—'তাহলে আমি অনাথ আশ্রমের সুপারিনটেনডেন্ট হব।' বলল জুলিয়ান।

—'সুন্দর! তোমার আরজি মঞ্জুর। তোমার শিক্ষা ঠিক হচ্ছে।'

ভালেনদের কাছ থেকেই জানা গেল যে, লটারি হাউসের কর্তা মারা গেছেন এবং মঁসিয়ে চেলন সেই পদ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছে। মারকুইসের ঘরে চেলনের সেই দরখাস্ত জুলিয়ানের নজরে পড়েছে। কিন্তু এই পদে চেলনের নিযুক্তির আগেই জুলিয়ান জানতে পারল যে, আইন-সভার সভ্যরা অন্ধবিদ মঁসিয়ে গ্রসকে এই পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। মহান হৃদয় এই ভদ্রলোকের আয় চোদ্দ শ' ফ্রাঙ্ক…কিন্তু তাঁর আয়ের অর্ধেক অর্থ তিনি আগের ভদ্রলোকের পরিবার প্রতিপালনের জন্য দান করেন।

নিজের কাজের জন্য অবাক হল জুলিয়ান। ভাবতে লাগল সে, এটা ঠিক হল না। এমনিভাবে চললে হয়ত আমাকে আরও অনেক অন্যায় কাজ করতে হবে। এবং নানা আবেগপ্রবণ কথা দিয়ে নিজের অন্যায় ঢাকা দিতে হবে। হতভাগ্য মঁসিয়ে গ্রস! সরকার ইচ্ছায় আজ যে 'ক্রস' চিহ্ন আমি গলায় ঝুলিয়েছি তা' তাঁর পাওয়ার কথা।

৮ : কোন ধরনের সাজ-সজ্জা সম্মান প্রদান করে ?

'তোমার জলে আমার তৃষ্ণা মিটল না', বলল দানব—'তবু আমি জানি ডায়ারবেকিরে এটাই সবচেয়ে ঠাণ্ডা জলের পাতকূয়া।'

—পেল্লিকো

সীন নদীর তীরে অবস্থিত ভিলিকোয়ারের জমিদারি দেখে একদিন জুলিয়ান ফিরে এল। এই সুন্দর জমিদারিটি ছিল মারকুইসের পূর্বপুরুষ বনিফেস দ্য লা মোলের। হোটেলে ফিরে জুলিয়ান দেখল যে, সেইমাত্র মারকুইস এবং তাঁর মেয়ে হাইয়ারস থেকে ফিরেছেন।

প্যারিসের জীবনচর্যার সাথে জুলিয়ান এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন নিখুঁত ঠাণ্ডা মেজাজে সে মাদমোজায়েলের সঙ্গে মেলামেশা করে। একদিন সে ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়লে এই মেয়েটি সব বৃত্তান্ত জানতে চেয়েছিল...না, সে কথা আর মনে নেই জুলিয়ানের।

মাদমোজায়েলের দৃষ্টিতে জুলিয়ান এখন অনেক দীর্ঘ এবং বিবর্ণদেহী পুরুষ। তার মধ্যে গ্রাম্য-ভাবের আর কোন চিহ্ন নেই—না দেহে, না পোশাক-আশাকে। তবে কথাবার্তার ধরণটা এখনও বদলায় নি। কিন্তু এ সব অতি আধুনিক গুণ-গুলো আহরণ করলেও তার মনের অহমিকাবোধের জন্য কোন রকম হীনমন্যতা দেখা দেয় নি। কেননা জীবনের অনেক কিছুকে সে এখনও গুরুত্ব দেয়। এবং সে এমন একজন পুরুষ যে, নিজের কথা মতন কাজ করে।

ওকে ক্রস চিহ্ন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য মাদমোজায়েল বাবাকে বকছিল একদিন। বলছিল—'ওর মধ্যে কোমলতা না থাকলেও মেধা আছে। দাদা আজ আঠারো মাস ধরে এটা তোমার কাছে চাইছে, অথচ তুমি তাকে ব্যবস্থা করে দিলে না। সে তাই এখনও লা মোল হয়েই রয়েছে।'

—'কিন্তু আশাতীত কাজ করার শক্তি রয়েছে জুলিয়ানের। কিন্তু সে শক্তি নেই লা মোলের।'

মাদমোজায়েল ভাবে, তার বয়স উনিশ। স্বর্ণ-দেহী গর্দভদের ধারণা, এটাই না-কি সুখ আহরণের বয়স। ন'-দশ খানা নতুন প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থের দিকে তার নজর পড়ল...সে যখন প্যারিসে ছিল না তখন এগুলো লাইব্রেরীতে এসেছে। তার দুর্ভাগ্য যে, সে তার সঙ্গী-সঙ্গিনীদের চেয়ে বুদ্ধিমতী। তারা কেবল তার কাছে ফরাসী গ্রামের সৌন্দর্য, কাব্য-মহিমা দক্ষিণাঞ্চলের শোভা এবং এ ধরনের সব কথা বলতে পারে।

অথচ জুলিয়ানের দৃষ্টিতে একঘেয়েমী ক্লান্তি এবং নিরানন্দের জন্য বিষণ্ণতার স্পর্শ। এটা ঠিক যে, জুলিয়ান ওদের থেকে ভিন্নতর মানুষ।

অভিজাত রমণীসুলভ কণ্ঠে ম্যাথিলডা একদিন বলল জুলিয়ানকে—'মঁসিয়ে

সোরেল, আজ রাতে মঁসিয়ে রেজের বাড়ীতে বল-নাচের আসরে যাচ্ছ ত ?'

—'মাদমোজায়েল, আমি ত ডিউকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি নি।'

—'তিনি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দাদাকে বলেছেন। তুমি যদি যাও ত ভিলিকোয়ার সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনব। আগামী বসন্ত-কালে আমরা ওখানে বেড়াতে যাব বলে কথা হচ্ছে। ওখানের বাড়ীখানা থাকবার উপযুক্ত কি না, লোকে যা' বলে তেমন সুন্দর কি না ওখানকার পরিবেশ! অনেক ভুল সংবাদ আমরা পেয়েছি।'

জুলিয়ান কোন জবাব দিল না।

সে সংক্ষেপে বলল—'তাহলে দাদার সঙ্গে বল-নাচের আসরে যাবে।'

জুলিয়ান মাথা নত করে অভিবাদন জানাল। 'তাহলে বল-নাচের আসরে আমাকে এ বাড়ীর প্রত্যেকের উপর নজর রাখতে হবে। এরা তাহলে আমাকে কেবল এদের ব্যবসার কর্মচারী মনে করে না? বদমেজাজে জুলিয়ান ভাবতে লাগল, ঈশ্বর জানেন মেয়েকে কোন কথা বললে বাবা মা আর ভাইয়ের মেজাজ বিগড়ে যাবে কি-না! এ যেন কোনও শাসক রাজার রাজসভা! এখানে একদম নিরাসক্তভাবে কাজ করতে হবে, এবং কেউ অভিযোগ করতে পারে এমন কিছু করা চলবে না।

মাদমোজায়েলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আওড়াল জুলিয়ান, অথচ এই দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটাকে আমার কি বিশ্রী না লাগে! ফ্যাসানের ব্যাপারে তার বাড়াবাড়ি, পরনের গাউন কাঁধ থেকে খসে পড়ছে···দেহের রঙ কেমন ফ্যাকাসে ···চুলের রঙ কটা···আচ্ছা ও সুন্দরী বলেই কি এমন? হয় ত বলবে, দিনের আলোর ছোঁয়ায় অমন হয়েছে! লোকের দিকে যখন তাকায়, অভিবাদন জানায় তখন কি উদ্ধতভাব না ফুটে ওঠে! অথচ রাণী-সুলভ আচরণ!

দাদাকে ডাকল মাদমোজায়েল।

কাউন্ট নরবারট এগিয়ে গেল জুলিয়ানের কাছে। বলল—'মঁসিয়ে সোরেল, কোথায় তোমার সাথে দেখা করব বল ত? মঁসিয়ে রেতজ বার বার বলে দিয়েছেন আজ রাতের বল-নাচের আসরে তোমাকে নিয়ে যেতে।'

জুলিয়ান আভূমি অভিবাদন জানিয়ে বলল—'আপনার করুণা আমার মনে থাকবে।'

সে রাতে বল-নাচের আসরে গেল জুলিয়ান। জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ীখানা দেখে সে তাজ্জব বনে গেল। ছোট ছোট ফুলের গাছে সুসজ্জিত অঙ্গন আর উদ্যান। বিশাল প্রাসাদ। আলোর মালা ঝোলানো নানা রঙ-বেরঙের পর্দা ঝোলানো। ওরা প্রথমে রিসেপসন রুমে ঢুকল। সুসজ্জিত ঘর। পাশেই বড় সুসজ্জিত হলঘরে নাচের আসর বসেছে। অজস্র সুবেশ নর-নারী নাচ-ঘরে ঢুকছে। অজস্র ভিড়। ওই ভিড় ঠেলে ও-ঘরে ঢোকা দায়। আবেগে আপ্লুত

জুলিয়ানের দেহ-মন লজ্জায় সঙ্কুচিত হল।

গোঁফওয়ালা এক তরুণ ওর বুকে খোঁচা মেরে বলল—'নিশ্চয় স্বীকার করবে ওই তরুণী আজকের নাচের আসরে রাণী!'

পাশ থেকে আর এক তরুণ বলে উঠল—'সারা শীতকাল মাদমোজায়েল ফোরমন্তকে সবাই সেরা সুন্দরী বলে মনে করত। আজ তার স্থান দ্বিতীয়। দেখছ, মেয়েটা কি রকম মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে।

—'আজ ও ওর দেহ-তরনীর সব পাল মেলে ধরেছে প্রশংসা কুড়োবার আশায়। ওই দেখ, একাকী নাচবার সময় ওর মুখে কি মোহিনী হাসি ফুটে উঠছে! দেখছ ত? ওর এই হাসি আমার কাছে অমূল্য।'

—'আর দেখ, এই জয়ের আনন্দ মন ভরে উপভোগ করছে মাদমোজায়েল, তার কাছে কিছুই যেন অজানা নেই। যার সাথেই ও কথা বলছে বুঝি একটা ভয়ের ভাব রয়েছে।'

—'হাঁ, ঠিক তাই। মন মাতাল করার এটাই ত কৌশল।'

ওই নারীর দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য জুলিয়ান বৃথাই চেষ্টা করছে। সাত আট জন দীর্ঘদেহী তরুণ মাদমোজায়েলকে ঘিরে রয়েছে, তাই সে তার দৃষ্টির আড়ালে।

গুঁফো তরুণ আবার বলল—'অভিজাতসুলভ আচরণের সাথে রয়েছে ছেনালি-ভাব।'

—'আর দেখ, যে মুহূর্তে ওই বড় বড় নীল চোখ দুটো অবনত হচ্ছে, মনে হচ্ছে ও যেন সব কিছু উজাড় করে দেওয়ার জন্য তৈরী। হায় ঈশ্বর! এর চেয়ে আর কিছুই ধূর্তমি হতে পারে না!'

তৃতীয় জন মন্তব্য করল—'ওর পাশে ফোরমন্তকে একেবারে সাধারণ মনে হচ্ছে।'

—'ওর এই নিখুঁত আচরণ যেন প্রকাশ করছে, তুমি যদি আমার যোগ্য হও তবে আমি তোমার কাছে কত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারি!'

এবার প্রথম জন জানতে চাইল—'ওই মহান ম্যাথিলডার কে হবে মনের মানুষ? হয় ত কোন সুদর্শন, সুকৌশলী আর সুষমদেহী রাজা, কোনও যুদ্ধের কোন খ্যাতনামা বীর…আর তার বয়স হবে বছর কুড়ি।'

—'রাশিয়ার সম্রাটের কোনও স্বাভাবিক ছেলের সাথে ওর বিয়ের কথা বিবেচনা করা যায়, ভাবা যায় একটা রাজত্বের কথা…কিংবা কমেৎ দ্য থেলর রয়েছে, রবিবারের সেরা পোশাক যখন ও পরে তখন ত ওকে অনেকটা চাষীর মতন দেখায়…।'

এতক্ষণে দরজার কাছটা ফাঁকা হল। ঘরের মধ্যে ঢুকল জুলিয়ান।

এই সারমেয় নন্দনদের দৃষ্টিতে ও যখন এতই গরীয়ান তখন ওকে যাচাই করে দেখা যেতে পারে, ভাবল জুলিয়ান। নিখুঁত বলতে এই লোকগুলো যে

কি বোঝায় তা' আমাকে জানতে হবে।

ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে যখন চেষ্টা করছিল ঠিক তখনই ম্যাথিলডা ওর দিকে তাকাল। জুলিয়ান মনে মনে আওড়াল, কর্তব্যের আহ্বান, কিন্তু মুখের ভাবে বদ-মেজাজের কোন চিহ্ন নেই। কাঁধের উপর ম্যাথিলডার গায়ের জামাটা অনেকটা নীচ পর্যন্ত কাটা···আনন্দ উপভোগের জন্য কৌতূহলী হয়ে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তীব্রতর হল তার মনের আবেগ। আত্মসচেতন তার মনের এই ভাব তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর দেহসুষমার সাথে যৌবনের ছোঁওয়া রয়েছে মিশিয়ে। একটু আগে যাদের দেখেছে জুলিয়ান তেমন দু'চার-জন তরুণ ওর চার ধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে।

ম্যাথিলডা বলল—'আচ্ছা মশায়, তুমি ত সারা শীতকালটা এখানে রয়েছ, এই বল-নাচের আসরটা তোমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর মনে হচ্ছে না ?'

জুলিয়ান কোন জবাব দিল না।

তরুণরা ঘাড় ঘোরাল। কে এই ভাগ্যবান যুবক যার কাছ থেকে জবাব চাইছে সুন্দরী ম্যাথিলডা। ওদের কাছে এটা একেবারেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

—'মাদমোজায়েল, এ সম্পর্কে আমি একেবারেই ভাল বিচারক নই। আমার জীবন লেখকের জীবন। এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ বল-নাচের আসরে এই প্রথম এলাম।'

গোঁফওয়ালা তরুণরা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

যেন আরও আগ্রহ দেখাবার জন্য ম্যাথিলডা বলে উঠল—'মঁসিয়ে সোরেল, তুমি ত পণ্ডিত লোক। ঠিক জাঁ-জ্যাকুস-রুশোর মতন একজন দার্শনিকের দৃষ্টিতে এ সব বল-নাচের আসর ও উৎসবের বিচার করতে সক্ষম। এ সব বোকামি তোমাকে লুব্ধ করতে পারে না, তুমি কেবল অবাক হও।'

ওর একটা কথা জুলিয়ানের আহত ভাবুলতা সংযত হল। তার হৃদয় থেকে সমস্ত ভ্রান্তি দূর হয়ে গেল। তার অধরে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল···এবং সেই ভাবটুকু অতিরিক্ত স্পষ্ট হল। জবাব দিল—'এই উন্নত সমাজের যে বিচার রুশো করেছেন তা' আমার কাছে বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। উঁচুপদ পাওয়া একটা চাকরের দৃষ্টিতে তিনি এই সমাজকে দেখেছেন, তাই এ-কে বুঝতে পারেন নি।'

কণ্ঠে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে ম্যাথিলডা বলল—'তিনি ত 'কনট্রাট সোস্যাল' গ্রন্থের লেখক।'

—'ডিনার খাওয়া শেষ হলে কোন ডিউক যদি তার পথ বদলে তার বন্ধুর বাড়ীতে হাজির হয় তাহলে সেটা যেমন অস্বাভাবিক হয় তেমনি এই ভুঁইফোড় গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করতে করতে রাজকীয় অধিকার এবং সুখ সুবিধার উচ্ছেদের কথা বলে নিজের পাগলামির পরিচয় দেন।'

ম্যাথিলডা সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যারনকে সহসা দেখে মহানন্দে সেখান থেকে

সরে যায়। এই ব্যারন হচ্ছে মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয়। চারধারে মানুষের ভিড়, তাই মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয় কাছে এগিয়ে আসতে পারল না…ফুট তিনেক দূর থেকে তার দিকে তাকাল। হাসি মুখ। ম্যাথিলডার মামাতো ভাই মারকুইস দ্য রুভরে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। সম্প্রতি সে ভালবেসে বিয়ে করেছে এক অসামান্যা সুন্দরীকে…তার স্ত্রী তার বাহু জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তাদের মিলন। বুড়ো কাকার মৃত্যুর পর রুভরে ডিউকের পদ লাভ করবে।

ভিড় ঠেলে তার কাছে না আসতে পারলেও মারকুইস তার দিকে তাকিয়ে ছিল হাসিমুখে…এবং ম্যাথিলডা তার অনুপম সুন্দর দু'টি নীল চোখে মারকুইস আর তার আশ-পাশের সঙ্গীদের দেখছিল। এই দলটার মতন অসহ্য জগতে আর কিছু নেই, ভাবছিল সে। ক্রয়সিনয়কে দেখ, ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওর স্বভাব খুবই মধুর আর ভদ্র, রুভরের মতনই নিখুঁত আচরণ। কিন্তু এরা সবাই ভদ্র হলেও এদের সঙ্গ ক্লান্তিকর। বল-নাচের আসরে সেও আমার সঙ্গী হবে। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠবে তৃপ্তির ছোঁওয়া। আমাদের বিয়ের এক বছরের মধ্যে আমার নিজস্ব গাড়ী হবে, থাকবে তার জন্য ঘোড়া। অনেক গাউন হবে এবং প্যারী থেকে স্বল্প দূরে গড়ে উঠবে আমার জন্য পল্লী-নিবাস। যা' কিছু হবে তা' হবে সব সেরা…এ সবই হবে একজন ভূঁইফোড়ের পক্ষে যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ। কিন্তু তার পর?…

এ সব সম্ভাবনার কথা ভাবতেই ম্যাথিলডার চিত্ত বিরক্তিতে ভরে গেল। মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয় তার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু স্বপ্নে বিভোর ম্যাথিলডার মন, কোন কথাই তাই সে শুনছিল না। নাচের আসরের গানের সঙ্গে মারকুইসের কণ্ঠস্বর মিশে গেল। অহমিকাভরে আর বিষণ্ণ ভাব নিয়ে জুলিয়ান এক ধারে সরে গিয়েছিল, ম্যাথিলডা তার দিকে তাকাল। এবং তখনি হল-ঘরের আর একদিকে কাউণ্ট আল্‌টামিরাকে দেখতে পেল ম্যাথিলডা। নিজের জন্মভূমিতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে কাউণ্ট আল্‌টামিরার। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে কাউণ্টের বংশের এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাজকুমার কন্তির …তাই ধর্মসংস্থার গোপন চরেরা তার ব্যাপারে দ্বিধা করছে।

ম্যাথিলডা ভাবল, মানুষের জীবনে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ছাড়া আর কোনও বড় সম্মান নেই। এই একটি মাত্র সম্মান যা' কেনা যায় না।

আহা! মনে মনে বড় সরস মন্তব্য করলাম ত! এমন মন্তব্য করলে যখন প্রশংসা পেতে পারি তখন এ ধরনের মন্তব্য মনে আসে না কেন! নিজের এই সরস মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করার একটা ইচ্ছা ম্যাথিলডার থাকলেও অহমিকা-বোধ বাধা হয়ে দাঁড়াল। একঘেয়েমির মেঘ কেটে গেল এবং উল্লাসের ভাব তার মুখে ফুটে উঠল। মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয় তখনও একনাগাড়ে কথা বলছিল এবং ম্যাথিলডার প্রফুল্ল ভাব দেখে তার মনে হল যে, সে বোধ হয় সফল হয়েছে …তাই দ্বিগুণ উৎসাহে সে বাচাল হয়ে উঠল।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল ম্যাথিলডা…আচ্ছা, আমার এই সরস মন্তব্যে কোন বদ মেজাজী লোক কি দোষ খুঁজে পাবে? আমার সমালোচককে তেমন হলে জবাব দেব : ব্যারন বা ভাইকাউণ্টের উপাধি কিনতে পাওয়া যায়…সম্মান-সূচক ক্রস চিহ্ন,…কেন, তাও পাওয়া যায়…এই ত আমার দাদা সম্প্রতি একটা পেয়েছে। কিন্তু সে কি বা করেছে? সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি, তাও ঘটানো সম্ভব, বছর দশেক সেনা-ছাউনিতে কাজ করলে কিংবা যুদ্ধ-মন্ত্রী আত্মীয় হলে অশ্বারোহী-বাহিনীর মেজরের পদ পাবে…ঠিক যেমন নরবারট পেয়েছে, বিশাল ধন-সম্পদ! এটি পাওয়া এখনও খুবই কষ্টের এবং এর জন্য যথেষ্ট মেধাবী হতে হয়। বিচিত্র কথা! বইতে যা' কিছু বলে এর জন্য ঠিক তার বিপরীত কাজই করতে হয়…বেশ, ধন-সম্পদ লাভ করতে হলে মঁসিয়ে রথচাইল্ডের মেয়েকে বিয়ে কর।

আমার মন্তব্য সত্যিই যথেষ্ট সরস…। কেননা মৃত্যুদণ্ডাদেশের সম্মান লাভ করার জন্য আজও পর্যন্ত কেউ ত প্রার্থনা করার কথা চিন্তা করে নি।

ম্যাথিলডা জানতে চাইল মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়ের কাছে—'কাউণ্ট আলটা-মিরাকে চেন?'

তার মন যেন বহু দূরে বিচরণ করছে, এবং পাঁচ মিনিট ধরে ক্রয়সিনয় তাকে যে সব কথা বলে চলেছে তার সঙ্গে এই প্রশ্নের পার্থক্য এত সীমাহীন যে, ক্রয়সিনয়ের অমায়িক শিষ্টাচার একেবারে ভণ্ডুল হয়ে গেল। তবুও ক্রয়সিনয়ের বুদ্ধি দ্রুত কাজ করে। সে ভাবল, ম্যাথিলডা একটা আস্ত পাগল। আর এটাই যা' অসুবিধা…তবে ও তার স্বামীকে সমাজে একটা উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তবে এটা ঠিক যে, সব দলের সেরা মাথাগুলোর সঙ্গে ক্রয়সিনয় পরিচিত, সে কখনও পরাস্ত হতে পারে না। তাছাড়া ম্যাথিলডার পাগলামি প্রতিভাধররা সহ্য করতে পারে। একদিকে সে অভিজাত বংশের কন্যা এবং অন্যদিকে ধনীর মেয়ে… তাই তাকে বিয়ে করে কোন প্রতিভাধর হাস্যাস্পদ হবে না। তার উপর রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য! তার স্বভাব সরস, কথাবার্তায় মাধুর্য্য… তাই সে হবে আনন্দময় সঙ্গিনী…।

কিন্তু কোন লোক ত দু'টো কাজ একসঙ্গে করতে পারে না, তাই মারকুইস ক্রয়সিনয় জবাব দিল ম্যাথিলডার প্রশ্নের…নিরাসক্ত তার কণ্ঠস্বর—'হতভাগ্য আলটামিরাকে কে না জানে?' এবং ওই লোকটার অসফল ষড়যন্ত্র প্রয়াসের আজগুবি কাহিনী বলতে লাগল।

যেন নিজেকেই নিজে বলছে এমনিভাবে ম্যাথিলডা আওড়াল—'ভারি আজ-গুবি ত! কিন্তু সে ত কিছু করেছে! ওই লোকটাকে আমি দেখতে চাই। ডেকে আন ওকে!'

মারকুইস ক্রয়সিনয় মনে আঘাত পেল।

কাউণ্ট আলটামিরা মুক্তকণ্ঠে মাদমোজায়েল ম্যাথিলডার উদ্ধত ও প্রগলভ

আচরণের প্রশংসা করল। তার ধারণা সে প্যারিসের সেরা সুন্দরীদের একজন। ক্রয়সিনয়ের সঙ্গে আসতে আসতে সে বলল—'সিংহাসনে বসলে তাকে কত সুন্দর না দেখাবে!' সমাজে এমন লোকের অভাব নেই যারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে না যে, উনিশ শতকে ষড়যন্ত্রের প্রয়াস একটা পাপ। জ্যাকোবিনদের মাথায় এই পাপ গজায়। আর অসফল জ্যাকোবিনের মতন আর কি ঘৃণ্য আছে?

মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়ের দিকে তাকিয়ে ম্যাথিলডার মনে হল যে, সে বুঝি আলটামিরাকে মৃদু উপহাস করছে, কিন্তু আনন্দিত মনে তার কথা শুনতে লাগল। ভাবল, বল-নাচের আসরে উপস্থিত একজন ষড়যন্ত্রকারী…বেশ একটা বৈষম্যের ব্যাপার। এই গুম্ফ-সমৃদ্ধ ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে সে একজন সিংহ-মানব আবিষ্কার করতে চাইছে। কিন্তু অচিরে দেখল যে, তার মনের মধ্যে কেবল একটা ভাবনারই রয়েছে অস্তিত্ব…উপযোগবাদের প্রতি প্রশংসা।

সহসা যুবক কাউণ্ট তার সেরা সুন্দরী সঙ্গিনীকে ছেড়ে চলে গেল।

এক দঙ্গল গুঁফো যুবক ম্যাথিলডাকে ঘিরে ধরল। কিন্তু কি আশ্চর্য! ম্যাথিলডার অনুপম লাবণ্য ওই মানুষটার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই আলটামিরা সরে যেতেই সে নিরাশ হয়ে পড়ল। সে ভাবছিল সদ্-বংশজাত হলে মানুষ শত-গুণের অধিকারী হয় এবং সে গুণগুলোর অভাব আমাকে আঘাত হানবে। যেমন জুলিয়ানের বেলায় হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডাদেশের সম্মান লাভ করলে দোষগুলো সব ধুয়ে মুছে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাছ থেকে একজন মন্তব্য করল—'এই কাউণ্ট আলটামিরা হচ্ছে সান নাজারো-পিমেনটেড রাজকুমারের মেজ ছেলে। এই পিমেনটেড চেষ্টা করেছিল কন্‌রাডিনকে বাঁচাতে। তাই বার শ' আটষট্টি সালে তার মাথা কেটে ফেলা হয়। তারা নেপলস্ শহরের একটি সেরা অভিজাত পরিবার।'

তাহলে আমার ধারণাই সঠিক…সদ্ বংশে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ নিজের মস্তক বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশের সম্মান লাভের আত্মশক্তি আহরণ করতে পারে। এটাই আমার ভাগ্য, আজ রাতে আমি যত সব আজগুবি চিন্তা করছি। আর সকলের মতন আমি সামান্য একজন নারী বৈ ত নয়…কাজেই আমার এখন নাচে যোগ দেওয়াই উচিৎ। ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে নাচের সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার জন্যে ক্রয়সিনয় খোসামোদ করছে…ভাবনার হাত থেকে নিজের মনকে মুক্ত করার জন্য তাই ম্যাথিলডা এবার রাজী হল এবং আনন্দে বিগলিত হল ক্রয়সিনয়। কিন্তু নাচ কিংবা রাজসভার একজন তরুণ অভিজাত পুরুষকে খুশি করার ইচ্ছা ম্যাথিলডার মনের ভার দূর করতে পারল না। আজকের নাচের আসরে সে রাণী…তা সে জানে তাই নিরাসক্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে আসনের পিঠে দেহ এলিয়ে দিয়ে সে ভাবছিল, ক্রয়সিনয়ের সাথে মিলিত হলে তার জীবন কত বর্ণহীন হয়ে উঠবে। ছ'মাস অনুপস্থিতির পর প্যারিসে হাজির হয়ে কোন বল-নাচের আসরে নারীদের কাছে যদি সেরা সুন্দরী

হিসাবে পরিগণিত না হতে পারি তবে আমার আনন্দ কোথায় থাকবে? তাদের মনে যদি ঈর্ষা জাগাতে না পারি তবে আমার কি হবে?

আর মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণ ওই জুলিয়ান। ঈশ্বর জানেন! ও কি নিখুঁত একজন আদর্শ পুরুষ নয়? এই আধুনিক যুগে সে কি পুরোপুরি একজন শিক্ষা-বিশারদ নয়? তবু অনুকম্পার দৃষ্টি ছাড়া ওর দিকে আমি তাকাতে পারি না, বলতে পারি না সরস কথা। সে সাহসী···কিন্তু জুলিয়ান এক আজব জীব··· ওর দৃষ্টিতে লালসার কোনও চিহ্ন নেই, আছে শুধু রাগের লক্ষণ। ওকে বলে-ছিলাম, তোমার সাথে আমার কথা আছে···কিন্তু ফিরে আসার মনোবৃত্তি ওর নেই।

৯: বল-নাচ

> **সাজ-পোশাকের অমিতব্যয়ী আড়ম্বর, মোমবাতির অফুরন্ত আলো, সুরাসার; কত সুন্দর সুন্দর পেলব বাহু, এবং সুষম স্কন্ধসমূহ; মদের তীব্র গন্ধ, মাতাল-করা রসিনির সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর সিসেরির চিত্রাঙ্কন। আমি সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেললুম।**
>
> **—উজেরির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত**

মারকুইস দ্য লা মোল বললেন,—'দেখ, তুমি খিটখিটে হয়ে উঠেছ। নাচের আসরে এটা অনুচিৎ।'

ম্যাথিলডা উদ্ধত কণ্ঠে বলল—'মাথা ধরার জন্যই এমন হয়েছে। এখানে বড্ড গরম।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন মাদমোজায়েলের মন্তব্য প্রমাণ করার জন্যই বৃদ্ধ ব্যারণ দ্য টলি চেতনা হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন এবং ওরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। সন্ন্যাস-রোগ বলে সবাই আলোচনা করতে লাগল, এমন একটা ঘটনা খুবই বিসদৃশ।

ম্যাথিলডা ওদিকে কান দিল না, এটা তার স্বভাবের একটা নির্দিষ্ট দিক, সে কখ্‌খনো বুড়োদের দিকে তাকায় না বা যাদের কথায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া তাদের কথায় থাকে না। সন্ন্যাস-রোগের আলোচনা এড়াবার জন্যই সে আবার নাচতে সুরু করল। অবশ্য এটা ওসব কিছু নয় কেননা দিন দুয়েক পরেই ব্যারণ আবার খাড়া হয়ে উঠবে।

নাচ থামিয়ে সে ভাবল, কিন্তু মঁসিয়ে সোরেল ত এখনও ফিরল না। তার নজর চারধারে তাকে খুঁজছে, ঠিক তখনি পাশের ঘরে সে তাকে দেখতে পেল। আশ্চর্য ত! ওর আচরণে আর সেই স্বাভাবিক শীতল উদ্ধতভাব নেই, আর ওকে ইংরেজ তরুণের মতন মনে হচ্ছে না।

কাউণ্ট আলটামিরা আমার কাছে অপরাধী মানুষ…আচ্ছা জুলিয়ান ওর সাথে কথা বলছে কেন! মনে মনে আওড়াল ম্যাথিলডা। জুলিয়ানের দু'চোখে বিষণ্ণ আগুনের ফুলকির ঝিলিক! ওকে ঠিক একজন ছদ্মবেশী রাজকুমার বলে মনে হচ্ছে। আর ওর দৃষ্টিতে আগের চেয়েও গর্বের ভাব। ম্যাথিলডা যেখানে দাঁড়িয়েছিল জুলিয়ান সেই দিকেই আসছিল আলটামিরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। ওরই দিকে চোখ তুলে ম্যাথিলডা ওর সারা দেহ নিরীক্ষণ করছিল, যে গুণ থাকলে মানুষ মৃত্যুদণ্ডাদেশের সম্মান লাভ করে সেই গুণের লক্ষণ ওর দেহে দেখতে চেষ্টা করছিল।

জুলিয়ান তখন বলছিল কাউণ্ট আলটামিরাকে—'হ্যাঁ, সত্যিই দাঁতন একজন সিংহ-পুরুষ ছিলেন।'

ম্যাথিলডা ভাবল, হায় ঈশ্বর! তবে কি ওরা আর একজন দাঁতনের কথা বলছে। কিন্তু ওর ত অমন সুন্দর অভিজাত-সুলভ মুখমণ্ডল, তবে ও কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত-দর্শন দাঁতন নামক লোকটার কথা বলছে। আমার ত বিশ্বাস, দাঁতন একটা কষাই। জুলিয়ান প্রায় তার কাছাকাছি পৌঁছেছে, কিন্তু ওকে ডাকতে ম্যাথিলডা এতটুকু দ্বিধা করল না। একটা মেয়ের পক্ষে একান্তভাবে অস্বাভাবিক হলেও সে বেশ সচেতনভাবে এবং গর্বভরে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

—'আচ্ছা দাঁতন কি একটা কষাই নয়?'

জুলিয়ান জবাব দিল—'কেন, নিশ্চয়। কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে তাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা অভিজাত পরিবারের লোকজনদের কাছে তিনি একজন আইন-ব্যবসায়ী বলে পরিচিত। আজ রাতে এখানে দেখা অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষের মতন তিনিও তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। এটা ঠিক যে, সুন্দরদের দৃষ্টিতে তাঁর অনেক অসুবিধা…কারণ তিনি অতিমাত্রায় অসুন্দর।' ঘৃণা-মিশ্রিত কণ্ঠস্বর চাপা দিতে পারল না জুলিয়ান। তার দুচোখ তখনও জ্বলজ্বলে। অস্বাভাবিক কণ্ঠে দ্রুত-কথিত কথাগুলোর মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। জুলিয়ান সামান্য দেহ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অহঙ্কারবিনম্র ভাব। যেন বলতে চাইছে: তোমার কথার জবাব দেওয়ার জন্য আমি বেতন পাই, বেতনভুক আমি। কিন্তু বারেকের জন্যও সে ম্যাথিলডার দিকে তাকাল না। অথচ ক্রীতদাসীর মতন ম্যাথিলডা তার বড় বড় দু'টো চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল।

জুলিয়ান তার কাছ থেকে সরে গেল।

আচ্ছা, যে নিজে এত সুন্দরদর্শন তরুণ সে কেন একজন অসুন্দরকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করছে, কুৎসিতের প্রশংসায় মুখর হচ্ছে। কই নিজের কথা ত ভাবছে না। সে ত ক্রয়সিনয়দের মতন নয়। আমার বাবা যেমন বল-নাচের আসরে নেপোলিয়নের অনুকরণ করেন এই জুলিয়ান সোরেলের আচরণও সেই রকম। ম্যাথিলডা এক সময় দাঁতনের কথা একেবারে ভুলে গেল। আজ রাতে সে বড়

একঘেয়েমিতে ভুগছে। দাদার হাত ধরে ম্যাথিলডা নাচের আসরটা প্রদক্ষিণ করতে সুরু করল। জুলিয়ানের সঙ্গে ওই দণ্ডিত মানুষটার কথা শোনাই তার মনের ইচ্ছা।

প্রচণ্ড ভিড়। তবু ম্যাথিলডা ঠিক আলটামিরার খুব কাছে গিয়ে হাজির হল। সে জুলিয়ানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বরফ-জল নেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আরও একজন অভিজাত-পুরুষ ঠিক তখনি বরফ-জল নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মৃদু কণ্ঠে জুলিয়ানকে বলল আলটামিরা—'ওই লোকটাকে দেখছ ত! ও হচ্ছে প্রিন্স আরাসেলি। রাষ্ট্রদূত। আজ সকালে ও ফরাসী বিদেশ-মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছে আমাকে সমর্পণ করার জন্য। ওই যে ও এখন তাস খেলায় মেতেছে। তোমাদের বিদেশ-মন্ত্রীরও তাই ইচ্ছে কারণ আঠার শ' ষোল সালে আমাদের দেশও কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীকে ফরাসী রাজার হাতে সমর্পণ করেছিল। তোমরা যদি আমাকে আমাদের রাজার হাতে সমর্পণ করো তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। আর ওই যে সুদর্শন গুঁফো ভদ্রলোককে দেখছ ওই আমাকে গ্রেপ্তার করবে।'

জুলিয়ান সামান্য জোরেই বলল—'নীচ অসভ্য সব!'

ওদের আলাপের একটা অংশও শুনতে ভুলল না। ওর একঘেয়েমি ভাব গেছে ঘুচে।

কাউণ্ট আলটামিরা জবাব দিল—'না, অতটা নীচ নয়। আমি ত সমস্ত ঘটনার সত্য-রূপ তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। এবার প্রিন্স আরসেলিকে দেখ। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সে নিজের বুকে ঝোলানো সোনালী পদকখানা দেখছে, ওই পদকখানা সবাইকে দেখিয়ে সে গর্বের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে ব্যগ্র। এই পদকখানা ছাড়া এই হতভাগ্য লোকটার আর কিছু নেই। এক শ' বছর আগে এই সোনালী পদক ছিল এক পরম সম্মানের বস্তু, কিন্তু তখন ওর মতন লোকের পক্ষে ওই সম্মান লাভ করা সম্ভব হত না। আজ আরসেলির মতন যে কোন বংশের ছেলেই এই পদক লাভ করছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে। এটা লাভ করার জন্য সে একটা গোটা শহরের লোকদের ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে।'

জুলিয়ান আন্তরিকভাবে জানতে চাইল—'এই কাজের জন্যই কি সে এই মূল্য পেয়েছে?'

আলটামিরা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল—'না, ঠিক তা নয়। ওর জেলাতে বোধ হয় জন তিরিশ ধনী জমির মালিক ছিল। লোকে বলে, তারা সবাই উদার-পন্থী ছিল। তাদের সবাইকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

—'কি জানোয়ার!' আওড়াল জুলিয়ান।

মাদমোজায়েল ওর দিকে এত ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল যে, তার মাথার চুল ওর কাঁধ স্পর্শ করছিল।

আলটামিরা বলল—'তোমার বয়স খুবই কম! তোমাকে ত বলেছি প্রভেন্স শহরে আমার এক বিবাহিতা বোন থাকে। সে সুন্দরী, দয়ালু আর শান্ত প্রকৃতির। পরিবারের কাছে সে স্নেহশীলা জননী, কর্তব্যে অচলা এবং অতিরিক্ত না হলেও ধর্মশীলা।'

ম্যাথিলডা ভাবছিল, কি বলতে চাইছে ও?

তখনও বলছিল আলটামিরা—'সে খুব সুখী এবং আঠার শ' পনের সালেও সুখী ছিল। সে সময় এ্যানটিবির কাছে ওর জমিদারীতে আমি লুকিয়ে ছিলাম। যে মুহূর্তে শুনতে পেল যে, মার্শাল নে'র ফাঁসি হয়েছে ও নাচতে সুরু করল।'

জুলিয়ান বিরক্ত-তিক্ত কণ্ঠে বলল—'ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

—'ওটাই দলীয় মনোভাব। উনিশ শতকে ও ছাড়া আর কোনও সত্যি-কারের আবেগের অস্তিত্ব নেই। তাই ফরাসীদেশের লোকেরা এত একঘেয়েমিতে ভোগে। সবসেরা নিষ্ঠুরতা প্রকাশের জন্য না হলেও সব চেয়ে জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ করা হয়।' জবাব দিল আলটামিরা।

জুলিয়ান বলল—'তবু তা' জঘন্য! নিষ্ঠুর কাজ করে অন্ততঃ লোকের আনন্দ পাওয়া উচিৎ। এ সব তাহলে তাদের কাছে মঙ্গলজনক হবে। কোন কারণ ছাড়া কৃত কাজের জন্য কেউ এতটুকু বিচার প্রার্থনা করতে পারবে না।'

মাদমোজায়েল ওদের দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

তার দাদা তখন বোনকে রেখে ওপাশে চলে গেছে।

আলটামিরা বলতে লাগল—'ঠিক বলেছ। আনন্দ-হীন প্রতিটি কাজ লোকেরা করছে। কৃত-কাজের কথা তাদের মনেও থাকছে না। এমন কি অপরাধের কথাও। বোধ হয় এই নাচ-ঘরে উপস্থিত জনা দশেককে আমি খুঁজে বার করতে পারব যারা খুনীর মত জঘন্য। কিন্তু তারা সে সব ভুলে গেছে, ভুলে গেছে অন্য সব লোকেরাও। কুকুরের পা ভেঙ্গে গেলে অনেকে কেঁদে ভাসায়, তাদের কবরের উপর ফুল ছড়ায়। পুরাকালের মল্লবীরদের মতন তারা কথা বলে, আলোচনা করে চতুর্থ হেনরীর আমলের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে। যদি প্রিন্স আরসেলির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমার ফাঁসি না হয় এবং আনন্দে প্যারিসে থাকবার অনুমতি আমি পাই তাহলে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করব। সেই আসরে নিমন্ত্রণ করব ন' দশজন খুনীকেও। দেখবে লোকে তাদের সম্মান করে এবং তারা নিজেরাও তাদের খুনের কথা মনে করে রাখে নি। কেবল তোমার এবং আমার হাতে রক্ত-কলঙ্ক নেই। তবু সবাই আমাকে রক্তপিপাসু দানব এবং জ্যাকোবিন-পন্থী বলে ঘৃণা করছে। আও তুমি নীচ বংশ-জাত হলেও অভিজাতদের দলে ভিড়তে চাইছ বলে অবজ্ঞা করছে।

এবার মাদমোজায়েল মন্তব্য করল—'এর চেয়ে আর কিছু সত্য নয়।'

আলটামিরা অবাক নয়নে তার দিকে তাকাল। আর জুলিয়ানের তাকাবার ইচ্ছাই হল না।

—'একটা কথা মনে রেখ। যে বিপ্লবের আমি পুরোধা ছিলাম তা' বিফল হয়েছে, কারণ দু'তিন জনের মাথা কেটে ফেলার হুকুম আমি দিই নি। যে সিন্ধুকে সাত-আট কোটি টাকা ছিল এবং যার চাবিও ছিল আমার কাছে তা' আমার সমর্থকদের দিই নি লুঠ করতে। আর এই যে আমার রাজা, যে আজ আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, বিপ্লবের আগে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। সেদিন যদি ওই তিনজনকে আমি হত্যা করতাম এবং সিন্ধুকের টাকাগুলো লুঠ করতে দিতাম তাহলে ওই রাজাই আমাকে রাজ্যের সব সেরা খেতাব দান করত। হয় ত আমি কিছুটা সফল হতাম এবং আমার দেশ এক ধরনের সনদ লাভ করত…সংসারের এটাই রীতি…এ যেন দাবা-খেলা।'

জুলিয়ান বলল—'তখন দাবা খেলা জানতেন না…কিন্তু এখন… ।'

বিষণ্নকণ্ঠে আলটামিরা বলল—'ওদের মাথা কেটে ফেলা উচিৎ ছিল, বলছ ? সেদিন যা আমি হতে পারি নি আজ তা' হতে বলছ ত ?…তোমার কথার জবাব দিচ্ছি। ঘাতককে দিয়ে কাউকে হত্যা করার চেয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কাউকে হত্যা করা অনেক কম জঘন্য।

জুলিয়ান বলল—'আমার মতে পরিণাম উপায় বিচার করে। এখন আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে চার জনকে বাঁচাবার জন্যে তিন জনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতাম।'

তার দু'চোখে শহীদ হওয়ার স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে যেন, মানবিক বিচার-ব্যবস্থার অহমিকার প্রতি সে ঘৃণা প্রদর্শন করছে। মাদমোজায়েল খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে ওর ভাবান্তর দেখছিল। সে মনে খুব আঘাত পেল, কিন্তু জুলিয়ানকে নিজের মন থেকে তাড়াবার ক্ষমতা আর তার নেই। সে তাই দাদার খোঁজে ওখান থেকে সরে গেল। নাচ-ঘরে ভোর পর্যন্ত নাচল এবং অবশেষে ক্লান্ত দেহে নাচ-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ীর মধ্যে সে বিষণ্ন মনে বসে রইল…দেহে যেন শক্তির এতটুকু অস্তিত্ব নেই। জুলিয়ানের দ্বারা সে ঘৃণিত, কিন্তু প্রতিদানে ঘৃণা করতে সে অক্ষম।

জুলিয়ানের আনন্দ কিন্তু শিখর-আশ্রয়ী। অবচেতন মনে এ সবই ও স্বপ্ন দেখত…সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, ফুলের সমারোহ, সুন্দরী রমণীর মেলা আর সাধারণ-ভাবে অফুরন্ত আড়ম্বর। এমনি পরিবেশে ও মানবজাতির মুক্তি কল্পনা করে। তাই আলটামিরাকে বলল—'সুন্দর বল-নাচের আসর। কোনও কিছুরই নেই কোন অভাব।'

—'আছে চিন্তার অভাব!' জবাব দিল আলটামিরা। ওর মুখমণ্ডলে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল, ভদ্রতার মুখোশ ঘৃণা চাপা দিতে পারল না।

—'আপনি ত রয়েছেন এখানে। এটা কি চিন্তার অস্তিত্ব নয় ? তবে আর কি চাই, চিন্তার ষড়যন্ত্র ?'

—'আমার নামের জন্যই আমি এখানে স্থান পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের

বসবার ঘরে চিন্তাকে ঘৃণা করা হয়। নাচ-ঘরের উপরে উঠবার তার ক্ষমতা নেই। ব্যস! সেটুকু সম্মানই সে পায়। কিন্তু যারা চিন্তা করে তাদের পাগল বল, যদি অবশ্য তার চিন্তার মধ্যে নতুনত্ব এবং মৌলিকত্বের শক্তি থাকে। তোমাদের একজন বিচারক এমনি ধরনের খেতাব পেয়েছে, তাই না? তোমরা তাকে গারদে বন্দী করেছ এবং বন্দী করেছ কবি বেরাঞ্জারকেও। তোমাদের মধ্যে যাদের মন বলে কোন বস্তু আছে তাদেরকে ধর্মসংস্থা বেঁধে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। কারণ তোমাদের প্রাচীন সমাজ শৃঙ্খলাকেই সব সেরা মনে করে। ···সমর প্রিয় জাতি হয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তোমাদের সমাজে মুরাতের মতন অনেক সেনা-নায়ক জন্মাবে, কিন্তু জন্মাবে না একজনও ওয়াশিংটন। ফরাসীদেশে অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু আমার নজরে পড়ল না। কেউ কোন মৌলিক কথা বললে সবাই তাকে প্রতিবাদ জানায় আর গৃহকর্তা মনে করে তাকে অপমান করা হল।'

কাউণ্টের গাড়ী হোটেল দ্য লা মোলে এসে থামল।

জুলিয়ান গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

বিদায়ের আগে আলটামিরা বলল—'ফরাসীদের মতন তোমার মন চঞ্চল আর কৌতুক-প্রিয় নয়, প্রয়োজনীবাদ তুমি বুঝতে পারবে।'

পরের দিন সকালবেলা লাইব্রেরিতে বসে চিঠির অনুলিপি তৈরী করতে করতে জুলিয়ান ভাবছিল কাউণ্ট আলটামিরার বক্তব্য। যদি সেদিন স্পেনীয় উদার-পন্থীরা দু'চারটে অপরাধ-মূলক কাজ করে জনসাধারণের সঙ্গে আপোষ করত তাহলে আজ তাদের এ অবস্থা হত না। এমন সহজে তারা ভেসে যেত না।

ম্যাথিলডা ঘরে ঢুকল। হাসল।

বলল—'মঁসিয়ে সোরেল, মনে হচ্ছে তুমি যেন কিছু একটা গভীরভাবে চিন্তা করছ! যে ষড়যন্ত্রের জন্য কাউণ্ট আলটামিরা আজ প্যারিসে নির্বাসিত তুমি কি সেই ষড়যন্ত্রের কথা ভাবছ? বল না আমাকে। শোনবার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠেছি।'

করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল ম্যাথিলডা এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হল। শরমে রাঙা হল মুখমণ্ডল। আবার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'সাধারণভাবে তোমার স্বভাব ত শান্ত, তবে কিসের জন্য তুমি বদলে গেছ? মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর আঁকা যীশুর মতন তোমার মুখ কেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে?'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল জুলিয়ান। প্রতিমুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর তীব্র হচ্ছিল।

—'দাঁতন কি চুরি করে ঠিক কাজ করেছিলেন? স্পেনের পিয়েদমন্ত শহরের বিপ্লবীরা সেদিন কয়েকটা অপরাধ-মূলক কাজ করে জনসাধারণের সঙ্গে আপোষ করলে কি সেটা উচিৎ কাজ হত? যারা উপযুক্ত নয় তাদেরকে সেনা-বাহিনীর পদ এবং সম্মান বিলিয়ে দিলে কি ভাল কাজ হত? যারা আজ পদক

লাভ করেছে তারা কি সেদিন রাজতন্ত্রের পুনরাগমনে ভীত হয় নি? টুরিন শহরের ধনাগার লুঠ হতে দেওয়া কি উচিৎ হত?' বলতে বলতে জুলিয়ান পায়ে পায়ে মাদমোজায়েলের দিকে এগিয়ে এল। তার মুখমণ্ডলে ভয়ানক আবেগের চিহ্ন।

বলল—'মাদমোজায়েল, এই পৃথিবীর বুক থেকে যারা অশিক্ষা এবং অপরাধ-প্রবণতা দূর করতে চাইবে, তাদের কি ঝঞ্ঝার মতন দুর্নিবার হতে হবে? নির্বিচারে অন্যায় কাজ করতে হবে?'

ম্যাথিলডা ভয় পেল। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারল না। পায়ে পায়ে এল পিছিয়ে। তারপর মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকাল, ভয়ের জন্য হল লজ্জিত। হালকা পায়ে ধীরে ধীরে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল।

১০: রাণী মার্গারিটা

প্রেম! কোন অপরাধের জন্য তুমি আমাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছ?
—একজন পর্তুগীজ সন্ন্যাসিনীর পত্র

জুলিয়ান তার চিঠিগুলো আবার পড়তে লাগল।

ডিনারের ঘণ্টা বাজল। মনে মনে বলল জুলিয়ান—এই প্যারিসের পুতুলের চোখে আমার কি হাস্যাস্পদ চেহারাই না হল! আমার মনের কথা ওর কাছে বলে কত না অন্যায় করলাম! তবু হয় ত এখনও যথেষ্ট অন্যায় কাজ করা হয় নি। এ ব্যাপারে সত্য কথা বলা আমার মতন লোকের উপযুক্ত কাজই হয়েছে। কিন্তু কেন সে এসব একান্ত ব্যাপার জানার জন্য আমার কাছে এসে প্রশ্ন করে! এসব প্রশ্ন ওর মুখ থেকে ঔদ্ধত্যের পরিচয় বহন করছে। এটা একেবারেই সদ-স্বভাবের লক্ষণ নয়। দাঁতন সম্পর্কে আমার চিন্তাধারার সঙ্গে যে কাজের জন্য ওর বাবা আমাকে বেতন দেন তার কোন সংশ্রব নেই।

খাওয়ার পর ঘরে ঢুকতেই জুলিয়ানের নজরে পড়ল, কালো শোকের পোশাক পরেছে ম্যাথিলডা। সে অবাক হয়ে গেল। কই পরিবারের আর ত কেউ শোকের পোশাক পরে নি। তার মেজাজ শান্ত হল।

ডিনারের পালা চুকল।

জুলিয়ান বুঝতে পারল তার মন থেকে উত্তেজনার ভাবটুকু একেবারে উবে গেছে।

ম্যাথিলডা তার দিকে তাকাল কৌতূহলের ভাব নিয়ে। পরিষ্কার ওর দু'চোখে মোহিনী দৃষ্টি। এদিককার রমণীদের চোখে এমন মোহিনী দৃষ্টি নজরে পড়ে··· মাদাম দ্য রেনলের দৃষ্টিও ছিল এমনি ধরনের। আজ সকালে ওর সাথে আমি ভাল ব্যবহার করি নি। এর জন্য আমাকে মূল্য দিতে হবে। যে নারীকে আমি

হারিয়েছি তার সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। তার ছিল অনুপম লাবণ্য! অপূর্ব সরলতা। সে নিজে জানার আগে তার মনের কথা আমি জানতে পারতাম। অমন ভালবাসার বস্তু পরিত্যাগ করে প্যারিসের মোহে চলে এসেছি। আমি বোকা!

কিন্তু এখন কি দেখছি এখানে? শীতল উদ্ধত অহঙ্কার, আত্ম-সচেতনতার প্রতিটি চিহ্ন…ব্যস। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

আজও সেই ল্যাটিন-বিশারদ ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সবাই ডিনার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

জুলিয়ান মনে মনে ঠিক্ করল ল্যাটিন-বিশারদ ভদ্রলোকের সঙ্গে সে কথা বলবে। তাই ভারজিলের কবিতার কয়েকটি ছত্র আওড়াল। আসলে জুলিয়ান তাঁকে তোষা-মোদ করছে। এক সময় সে বলল—'মাদমোজায়েলের কোনও আত্মীয় হয় ত মারা গেছেন। সে তার উত্তরাধিকারিণী…তাই হয় ত শোকের পোশাক পরেছে।'

ভদ্রলোক সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'সে কি! তুমি এই পরিবারের একজন, অথচ তুমি কিছুই জান না ওর এই পাগলামির? এটা একটা বিচিত্র ব্যাপার যে, ওর মা এই পাগলামিতে সায় দেন। অবশ্য এটা একটা দৃঢ় চরিত্রের লক্ষণ নয়, যদিও এ পরিবারের সকলের মধ্যেই এই বিশেষত্ব রয়েছে। মাদমো-জায়েল এ ব্যাপারে খুবই জেদি। আজই ত তিরিশে এপ্রিল!'

জুলিয়ান বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল, পরিবারের সকলের মতের বিরুদ্ধে শোকের পোশাক পরার জেদ আর তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে কোন ধরনের সংযোগ রয়েছে? দেখছি, নিজেকে আমি যত বোকা ভাবি আমি তার চেয়েও বেশী বোকা!

—'স্বীকার করছি…।' নিজের অজ্ঞতার কথা বলতে চাইল জুলিয়ান।

—'চল, আমরা বাগানের ওদিকটায় যাই!' ভদ্রলোক ওকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

—'কি! পনের শ' চুয়াত্তর সালের তিরিশে এপ্রিল কি ঘটনা ঘটেছিল তা' সত্যিই তুমি জান না?'

অবাক জুলিয়ান, বলল—'এবং কোথায় ঘটেছিল?'

—'গ্রিভ্ শহরে।'

জুলিয়ান এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এই নাম শুনে সে কিছু বুঝতে পারল না। কেবল কৌতূহল আর গল্প শোনার আগ্রহে তার দু'চোখ জ্বল জ্বল করতে লাগল। একজন আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে ভদ্রলোকও রোমাঞ্চিত হলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি বলতে লাগলেন।

—'পনের শ' চুয়াত্তর সালের তিরিশে এপ্রিল। সমবয়সী পুরুষদের মধ্যে সব সেরা যুবক ছিলেন বনিফেস দ্য লা মোল। তাঁরই এক সঙ্গী আনিবল দ্য লা ককোনাসো…পিয়েদমন্ত শহরে ছিল তাঁর বাড়ী। গ্রিভ্ শহরে এই

দু'জনের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল। লা মোল ছিলেন নাভারে রাজ্যের রাণী মার্গারিটার মনের মানুষ···প্রেমিক পুরুষ। তাই ম্যাথিলডার আসল নাম ম্যাথিলডা মার্গারিটা। এলেনকনের ডিউকের প্রিয়পাত্র ছিলেন লা মোল। নাভারের রাজকুমার অর্থাৎ লা মোলের প্রেমিকার স্বামী পরবর্তী কালে চতুর্থ হেনরী নাম গ্রহণ করেন। ওই বছরের সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। সেণ্ট জারমেইন শহরে রাজসভা বসেছিল। রাজা নবম চার্লস তখন মৃত্যুপথযাত্রী। লা মোল ঠিক করেছিলেন তিনি তাঁর বন্ধু নাভারের রাজকুমারকে হরণ করে নিয়ে যাবেন। রাজসভায় ক্যাথারিন স্ত মেডিসির নজরবন্দিনী ছিলেন রাজকুমার। দু' শ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লা মোল একেবারে সেণ্ট-মেইন শহরের সীমানায় হানা দিলেন। কিন্তু এলেনকনের ডিউক ভীত হয়ে লা মোলকে বলতে গেলে তুলে দিলেন ঘাতকের হাতে। এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই কাহিনী মাদমোজায়েলকে অভিভূত করেছে।'

জুলিয়ান একাগ্রমনে এই কাহিনী শুনছিল।

—'যেদিন গ্রিভ্ শহরে লা মোলের মাথা কাটে জহ্লাদ সেদিন ওখানে একখানা বাড়ীতে লুকিয়ে ছিলেন রাণী মার্গারিটা। তিনি গোপনে জহ্লাদের কাছে তাঁর প্রেমিকের কাটা মুণ্ডুটা চেয়ে পাঠালেন। পরের দিন মাঝ রাতে এই কাটা মুণ্ডু গাড়ীতে করে নিয়ে রাণী মার্গারিটা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত মন্তমাত্রে শহরের গীর্জায় হাজির হলেন। নিজের হাতে সে-রাতে তিনি সেই মুণ্ডুটা সমাধিস্থ করেন।'

দারুণ বিচলিত হয়ে জুলিয়ান বলে উঠল—'না, তা' সম্ভব নয়।'

ল্যাটিন-বিশারদ ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—'দেখছ ত মাদমোজায়েল তার দাদাকে মনে মনে ঘৃণা করে কারণ সে এ সব ঐতিহাসিক কাহিনী বিশ্বাস করে না এবং তিরিশে এপ্রিল তারিখে শোকের পোশাকও পরে না। কিন্তু এই বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এই পরিবারের সবাই সেই স্মৃতি মনে করে রেখেছে। এটা কি করে সম্ভব সোরেল যে তুমি এই বৃত্তান্ত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ?'

—'ও তাই ডিনার-টেবিলে মাদমোজায়েল তার দাদাকে দু'বার আনিবল নামে ডাকল। আমার মনে হয়েছিল শুনতে ভুল করেছি।'

—'এটা খুব দুঃখের কথা! মারকুইস এ সব পাগলামি সহ্য করছেন···ওই দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটা বিয়ের পর দেখছি তার স্বামীকে খুব জ্বালাতন করবে।'

এই সঙ্গে আরও কিছু সরস মন্তব্য করলেন ল্যাটিন-বিশারদ ভদ্রলোক।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা মাদমোজায়েলের এক ঝিয়ের মুখ থেকে আরও কিছু বৃত্তান্ত জানতে পারল জুলিয়ান। এই তরুণী ঝি ঠিক এলিসার মতন জুলিয়ানের ভালবাসার কাঙালিনী। সে বলল যে, মাদমোজায়েল এই লা মোলকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাঁর সমসাময়িক কালে লা মোল সব সেরা ও বুদ্ধিমতী সুন্দরী রাণীর ভালবাসা লাভ করেছিলেন। বন্ধুদের মুক্ত করতে গিয়ে তিনি

মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এবং বন্ধুর মতন বন্ধু! রাজবংশের প্রথম যুবরাজ··· পরবর্তী কালের রাজা চতুর্থ হেনরী।

মাদাম দ্য রেনলের কৌশলহীন সরল ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল জুলিয়ান, প্যারিসের রমণীদের প্রতি তাই তার কোন মোহ ছিল না, সে তাদের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাত···এবং কোন কারণের জন্য বিষণ্ণ হলেও সে তাদের কিছু বলতে পারত না। এদের মধ্যে মাদমোজায়েল আবার এক বিশেষ চরিত্রের রমণী।

একদিন ম্যাথিলডা বলল—'জাতিসমূহের মধ্যে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল সেই সময়টা ছিল ফরাসীদেশের বীরত্বের যুগ। তখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি লোক লড়াই করত, পদক লাভের জন্য নয়, দলকে বিজয়ী করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। তোমার সম্রাটের রাজত্বকালে ছিল পদক লাভের ইচ্ছা। নিশ্চয় স্বীকার করবে, আমিত্ব-ভাব এবং নীচতা তখন অনেক কম ছিল। ওই যুগটাকে তাই আমি ভালবাসি।'

—'আর বনিফেস দ্য লা মোল ছিলেন এ যুগের একজন বীরপুরুষ।' বলল জুলিয়ান।

—'অন্ততঃ তিনি ভালবাসা পেয়েছিলেন এবং ভালবাসা পাওয়া প্রীতিকর। আজকের দিনে এমন জীবন্ত রমণী কি আছে যে প্রেমিকের কর্তিত মস্তক স্পর্শ করে ভয়ে কুঁকড়ে যাবে না?'

প্রতিদিন বাগানের মধ্যে মিলিত হওয়ার অফুরন্ত অবসর তারা লাভ করে।

আত্ম-ধিক্কারের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল জুলিয়ান। তাই নিজের মনের ভাবনার কথা সে ম্যাথিলডাকে বলল। বলল তার দারিদ্র্যের কথা। অবশ্য আত্ম-গরিমা প্রকাশ করার জন্যই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল যে সে এর জন্য সাহায্য ভিক্ষা করছে না। জুলিয়ানকে এমন সুদর্শন আর কোন দিন মনে হয় নি ম্যাথিলডার। তার মুখমণ্ডলে সে আবেগ ও সারল্যের চিহ্ন দেখতে পেল···অথচ এমন ভাব তার মুখমণ্ডলে বিরল ছিল।

মাস খানেক পরে জুলিয়ান একদিন নিজের ভাবনায় ডুব দিয়ে একা একা বাগানে পায়চারি করছিল। নিরন্তর হীনমন্যতার জ্বালা সয়ে সয়ে তার মুখমণ্ডলে যে একটা বিরক্তিকর একঘেয়েমির ভাব ফুটে থাকে তা' এই মুহূর্তে নেই। খানিক আগে সে বসবার ঘর থেকে এসেছে। দাদার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে মাদমোজায়েল পায়ে আঘাত পেয়েছে···তাই তাকে ধরে জুলিয়ান বসবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছে।

ভাবছিল জুলিয়ান, কেমন অন্তরঙ্গের মতন তার বাহুতে দেহের ভার রেখে ঝুঁকে হাঁটছিল ম্যাথিলডা। এটা তার এক বিচিত্র ভঙ্গিমা। আচ্ছা আমি কি নির্বোধ গাধা, কিংবা ও আমার প্রতি অনুরাগিনী। মনের অহঙ্কার দলিত করে যখন আমার জীবনের সব কথা বলি সে কেমন নীরবে তা' শোনে। অথচ অপরের সঙ্গে সে উদ্ধত ব্যবহার করে। তার মুখমণ্ডলের সেই শান্ত ভাব দেখলে

বসবার ঘরের সবাই অবাক হয়ে যাবে। এটা নিশ্চিত যে, আমার সঙ্গে ছাড়া ম্যাথিলডা আর কারো সাথে এমন সদয় ও শান্ত আচরণ করে না।

কয়েকটা দিন ধরে সন্দেহের দোলায় দুলছে তার মন···মেয়েটা কি তাকে ভালবেসেছে! ব্যাপারটা কিন্তু তাহলে ভারি কৌতুককর হবে! তবে ভাল বাসুক বা না বাসুক একটা দুরন্ত বুদ্ধিমতী আর আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান একটা মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওর ভয়ে পরিবারের সবাই তটস্থ। এবং সবচেয়ে ভীত মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয়। ওই মার্জিত-রুচি যুবক যেমন শান্ত প্রকৃতির তেমনি সাহসী। বংশমর্যাদা এবং ধন গৌরবের সুবিধা তার রয়েছে। ওর একটা সুবিধাও যদি আমার থাকত তাহলে আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠত। ওই যুবক দারুণ ভালবাসে ম্যাথিলডাকে···তাদের বিয়ের কথাও পাকা। মারকুইস আমাকে দিয়ে দু'জন আইনজ্ঞের কাছে চিঠি লিখিয়েছেন চুক্তির শর্ত ঠিক করার জন্য। অথচ আমার মতন একজন মসীজীবি প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন বিজয়ী হতে চলেছে। ওই যুবক আশ্চর্য রকম সরল। বোধ হয় ম্যাথিলডা তাই ভবিষ্যৎ-স্বামী হিসাবে তাকে ঘৃণা করছে···এবং এর জন্যে তার মনে যথেষ্ট অহঙ্কার। আমি একজন বিশ্বস্ত সেবক বলে ও আমাকে এই অনুগ্রহ দেখাচ্ছে।

কিন্তু না, হয় আমার মাথা বিগড়ে গেছে, আর না হয় সত্যিই সে আমাকে ভালবাসতে চায়। যতই আমি ওকে এড়িয়ে চলি এবং নিরাসক্তি দেখাই ততই সে আমাকে খুঁজে বার করে আমার কাছে আসে। এটা হয়ত অবাধ্যতা অথবা খাম-খেয়ালী ভাব। কিন্তু আকস্মিকভাবে ওর সামনে আমি গেলে ওর দু'চোখে আলোর ঝিলিক ফুটে ওঠে। আচ্ছা, প্যারিসের মেয়েরা কি এতখানি ভণ্ডামি করতে শিখেছে? আমার তাতে কি এসে যায়। ঈশ্বর! কি সুন্দর ওর দেহ-লাবণ্য। ও যখন ওর বড় বড় নীল চোখ দু'টো তুলে আমার দিকে তাকায় আর খুব কাছ থেকে ওকে আমি দেখি তখন কি গভীর আনন্দে আমার মন ভরে যায়। গত বছরের বসন্তকাল ও এ বছরের বসন্তকালের মধ্যে কত না পার্থক্য। তখন শ' তিনেক ভণ্ডের মধ্যে স্রেফ মনের জোরে আমি আমার অস্তিত্ব বজায় রেখেছি। ওরা সবাই দুষ্ট আর ভণ্ড। ওদের সঙ্গে থেকে আমিও প্রায় বদমাইশ হয়ে গিয়েছিলাম।

সন্দেহ আর অবিশ্বাসের মুহূর্তগুলোতে জুলিয়ান ভাবতে থাকে: এই মেয়েটা আমাকে বোকা বানাচ্ছে, ওর দাদা আর ও আমাকে ঠকাতে চাইছে। তবু দাদার মনে উৎসাহের অভাব দেখে সে দাদাকে ঘৃণা করে। নরবারট সাহসী··· ব্যস! এর বেশী আর কিছু না। প্রচলিত চাল-চলনের বিপরীত কিছু করার সাহস বা কোন একটা মাত্র মতলবও তার নেই, কেবল আমিই নরবারটকে সমর্থন করি। মাত্র ত উনিশ বছরের মেয়ে! কিন্তু এই বয়সের একটা মেয়ে কি আত্মপ্রচারিত ভণ্ডামির প্রতি এত বিশ্বস্ত হতে পারে?

অথচ মাদমোজায়েল যখন তার নীল চোখ দু'টো তুলে আমার দিকে তাকায়

তখন নরবারট সেখান থেকে সরে যায়। আমার মনে হয় সন্দেহ এর কারণ। বাড়ীর একটা চাকরের সঙ্গে বোনকে প্রেম করতে দেখলে রাগ করাই ত তার উচিৎ?

যা' হোক সে অনুপম সুন্দরী কন্যা! বাঘের মতন জলজ্বলে চোখে সে ভাবতে লাগল। আমি ওকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালাব···আর যে আমার পলায়নে বাধা দেবে তার জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে।

এই চিন্তা জুলিয়ানের সারা মন জুড়ে বসল। আর কোন কিছু সে ভাবতে পারছিল না। তার জীবনের দিনগুলো যেন ঘণ্টায় রূপান্তরিত হল।

যখন কোন গুরুতর কাজে তার মন ডুবে থাকে, তখন এ চিন্তা তার মনে থাকে না। কিন্তু মিনিট পনের পরেই তার মনে জেগে ওঠে। তার বুকের গতি দ্রুত হয়। তার মাথার ভিতরটা যেন ঘুলিয়ে যায়। তখনও সেই একই স্বপ্নে তার মন বিভোর হয়ে থাকে: ও কি তাকে ভালবাসে?

১১: একটি মেয়ের শক্তি

আমি তার রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করি,
কিন্তু তার মনকে ভয় করি।

—মেরিমি

ম্যাথিলডার রূপ-লাবণ্য এবং তার প্রতি ম্যাথিলডার সপ্রেম আচরণ এসব কথা না ভেবে জুলিয়ান যদি বসবার ঘরের বাড়াবাড়ি কাণ্ড-কারখানা বোঝবার এবং জানবার চেষ্টা করত তাহলে এই মেয়েটার শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণা করা তার পক্ষে সম্ভব হত। জানতে পারত বসবার ঘরে উপস্থিত সকলের উপর কেমন করে মেয়েটা ছড়ি ঘোরায়। যে মুহূর্তে কেউ মাদমোজায়েল ম্যাথিলডাকে আঘাত হানে অমনি সে তাকে ফিরে আঘাত হানবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সে এমন সরস, বাছা বাছা, ভদ্র এবং সময়োপযোগী শব্দ আঘাত-কারীর বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেয় যে, সে ভাবতে থাকে যত ততই সেই বাক্যবাণগুলো তাকে যন্ত্রণা দেয়। যাদের অহঙ্কারে সে আঘাত হেনেছে ক্রমশঃ তাদের প্রতি সে অসহনীয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে থাকে।

তার পরিবারের অন্যরা যে সবের প্রতি অন্ধভাবে ভক্ত তার অনেকগুলো তার কাছে মূল্যহীন, তাই তাদের দৃষ্টিতে সব সময় সে শান্ত এবং আত্ম-সমাহিত। প্রস্থানের পর অভিজাতদের বসবার ঘরকে মনোরম বলে মনে হয়···কিন্তু সেটাই সব। প্রতিটি পরিচয় মুহূর্ত ছাড়া ভদ্রতার আর কোন অর্থ থাকে না। আনন্দের প্রথম চমকের পরই জুলিয়ান সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং সেটাই তার অবাক মনের প্রথম আঘাত। সে বুঝতে পেরেছে যে, ক্রোধপ্রবণতা, যা' নীচবংশজাত হওয়ার জন্য জন্ম নেয়, তারই অভাব হচ্ছে ভদ্রতা। প্রায়ই

একঘেয়েমিতে ভোগে ম্যাথিলডা এবং যে কোন জায়গায় এই একঘেয়েমি তার মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। এ সব সময় তার মধ্যে চিত্তবিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সরস ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের মাধ্যমে সে সত্যিকারের আনন্দ লাভ করে। কাউকে তখন সে ছেড়ে কথা কয় না। আত্মীয় এবং মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয়দের মতন বন্ধুদের প্রতি সে তার সরস মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। তার তীক্ষ্ণধার মন্তব্যের সামনে তারা এক একটা টাটকা শিকার-রূপে প্রতিভাত হয়। যুবক বন্ধুদের কাছ থেকে ম্যাথিলডা প্রায়ই চিঠি পায়…এ সব বন্ধু যুগের প্রচলিত ধারা বজায় রেখে তার কাছে চিঠি লেখে এবং ম্যাথিলডা সে-সব চিঠির কিছু কিছু জবাব দেয়…চিঠির মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব নজরে পড়ে না।

একদিন মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয় একখানা আপোষ-ধর্মী চিঠি ম্যাথিলডার হাতে দিল…চিঠিখানা সে গতকাল মাত্র লিখেছে। খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে এই চিঠিতে সে তার মনের কথা লিখেছে। কিন্তু ম্যাথিলডা চিঠিতে অবিচক্ষণতা প্রকাশ করতেই চায়…সে এর জন্য বিপদের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করে না। তাই পরবর্তী দেড় মাস সে কোন কথাই বলল না মারকুইসের সঙ্গে। যুবকদের এই সব চিঠি পড়ে সে মনে মনে দারুণ আনন্দ পায়…তার কাছে যুবকরা সবাই একরকম। এ সবই তার কাছে খুবই রহস্যময় এবং বিষণ্ণ আবেগের পরিচয় বহন করে আনে।

বোনের কাছে নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে ম্যাথিলডা বলে—'জান, এরা প্রত্যেকে নিখুঁত ভদ্রলোক। দরকারে পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে এদের দ্বিধা নেই। এর চেয়ে নীরস আর কিছু আছে ভাবতে পার? এই বাকি জীবন-টুকু এদের কাছ থেকে হয় ত আমি এমনি ধরনের চিঠি পাব! প্রতি বিশ বছর অন্তর এ রকম চিঠির ভাষা যুগের সাথে তাল রেখে লেখা হয়। সম্রাটের রাজত্ব-কালে এ সব চিঠির ভাষা অনেক বর্ণহীন ছিল। তখনকার যুবকরা এমন দু'চারটে কাজ করত যা' সত্য সত্যই ছিল মহান।'

অমনি তার বোন মাদমোজায়েল হেরিভিত্ জবাব দেয়—'তরবারির খোঁচা মারতে কি বা এমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়? তবু যখনই এসব তাদের জীবনে ঘটেছে তারা তা বলতে কসুর করে নি।'

—'ও সব কাহিনী শুনতে আমার খুব ভাল লাগে, যেন সত্যিকারের যুদ্ধ দেখা, নেপোলিয়নের যুদ্ধ, এমন যুদ্ধ যা'তে দশ হাজার সৈন্য হত হয়েছিল…নিঃসন্দেহে এ যুদ্ধ সাহসের পরিচায়ক। এমন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া আত্মার উন্নতি-বিধায়ক। একঘেয়েমির হাতের শিকার আমার সব যুবক স্তাবক বন্ধুরা এই বিপদে ঝুঁকি নিতে চায় মুক্তির জন্য। আর এই একঘেয়েমি ভাব ত সবার মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। সাধারণের মধ্য থেকে একটা অসাধারণ কাজ করার ধারণা কারই বা আছে? তারা ত কেবল আমাকে লাভ করার জন্য ব্যগ্র…একটা সুন্দর শোষণ করার ইচ্ছা। আমি ধনী-কন্যা, আমার বাবা তাঁর জামাইকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। আহা! তিনি যদি কম চিত্তবিনোদনকারী আর কাউকে

দেখতে পেতেন।'

ম্যাথিলডার প্রাণবন্ত, সতেজ এবং ছবি দেখতে অভ্যস্ত দৃষ্টি তার ভাবণকে বিশ্রীভাবে প্রভাবিত করল। তার ভদ্র-আচরণ-অভ্যস্ত বন্ধুদের কাছে তার মন্তব্য তাই স্বাদহীনরূপে প্রতিভাত হয়। যদি ম্যাথিলডা আধুনিক জীবন-চর্যায় কম পারঙ্গমা হত তাহলে তার বন্ধুরা প্রায় স্বীকার করেই নিত যে নারীসুলভ কমনীয়-তার মাপকাঠিতে তার ভাষা খুবই বর্ণবহুল।

আর কি চায় ম্যাথিলডা? ধনসম্পদ, উচ্চ বংশে জন্ম, মেধা এবং সৌন্দর্য? লোকে বলে এবং সে নিজেও বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য এ সব সম্পদ তাকে উজাড় করে দান করেছে। সেণ্ট জারমেইনের ফাউবুরজ শহরে জুলিয়ানের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এ সব কথাই তার মগজে ঘোরাফেরা করে। সে অবাক হয়ে যায় জুলিয়ানের গর্ববোধ দেখে, একজন সাধারণ বংশজাত যুবকের মধ্যে এত চাতুর্য দেখে সে প্রশংসা না করে পারে না। ফাদার মরির মতন জুলিয়ান নির্ঘাৎ এক-দিন বিশপের পদ লাভ করবে। জুলিয়ানের নাম তাই অচিরে ম্যাথিলডার সারা মন জুড়ে বসল। তার কথা সে মনে মনে ভাবে। তাদের দুজনের আলাপের খুঁটিনাটি বর্ণনা বোনকে শোনাতে সে দ্বিধা করে না। শুধু তাদের দু'জনের চরিত্রের বিশেষত্ব সে বুঝিয়ে বলতে অক্ষম।

সহসা একদিন একটা ভাবনা তার মাথায় ঝলসে উঠল…মহানন্দে সে মনে মনে আওড়াল আমার সৌভাগ্য আমি প্রেমে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। হাঁ, প্রেমে পড়েছি আমি। এবং এ ব্যাপারটা একেবারেই পরিষ্কার। প্রেমে না পড়লে আমার বয়সী যুবতী, সুন্দরী এবং মেধাবিনী জীবনে এত চমক কি করে লাভ করবে? অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ক্রয়সিনয়ের প্রতি এতটুকু প্রেম আমি অনুভব করি না। অন্যদের প্রতিও তাই। নিখুঁত ওদের চরিত্র, হয়ত একটু বেশী নিখুঁত; কিন্তু ওরা আমার মন নির্জীব করে তোলে। তার মতন বয়সের অভিজাত বংশের যুবতীর পক্ষে সাধারণভাবে প্রেমে পড়া খুবই অনুপযুক্ত কাজ। তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে প্রচলিত বীরত্বপূর্ণ প্রেমনিবেদন করার সে পক্ষ-পাতী। এমন প্রেম প্রাথমিক অবস্থায় কোন বাধাই মানে না। প্রেমে পড়লে মানুষ বড় কাজ করতে উৎসাহিত হয়। ম্যাথিলডা ভাবে, কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি, আজ ফরাসীদেশে ক্যাথারিন দ্য মেডিসির মতন রাণী বা ত্রয়োদশ লুইয়ের মতন রাজার রাজসভা নেই। যে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে মহান তার সাথে আমি নিজেকে সমগোত্রীয় বলে মনে করি। ত্রয়োদশ লুইয়ের মতন আত্মশক্তি-সম্পন্ন মানুষ আজ যদি আমার পায়ের কাছে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তবে তাঁর জন্যে আমি কি না করতে পারতাম। ব্যারণ দ্য টলি যে কাহিনী প্রায়ই বলে তেমনিভাবে আমিও তাঁকে ভেনেডিতে নিয়ে পালিয়ে যেতাম এবং সেখান থেকে তিনি তাঁর রাজত্ব উদ্ধার করতেন। এবং তাহলে বিশেষ অধিকারের দিনও শেষ হত…আর এ কাজে আমাকে সাহায্য করত জুলিয়ান। তার মধ্যে অভাব কিসের? সুনাম

আর ধনসম্পদের। নিজেই সে একদিন জীবনে সুনাম অর্জন করবে, আহরণ করবে ধনসম্পদ।

অভাব নেই ক্রয়সিনয়েরও কিছু। কিন্তু সারা জীবনে একজন ডিউক হওয়ার বেশী আর কিছু সে হতে পারবে না···অর্ধেক অতি আধুনিক আর অর্ধেক উদার-পন্থী। ও এমন একটা জীব যে মন স্থির করতে পারে না সব সময়, তাই সব কিছুর বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে দ্বিতীয় সারিতে স্থান গ্রহণ করে।

সুরুর প্রথম মুহূর্তে কোন মহান কর্মপ্রচেষ্টা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় না? কর্মপ্রচেষ্টা সফল হলে তবেই তা' সাধারণের কাছে সহজ মনে হয়। এ হচ্ছে প্রেমের যাদু যা' আমার সারা মন জুড়ে বসেছে। আমার ধমনীতে আগুনের স্রোতাবেগ অনুভব করছি। ঈশ্বর আমাকে এই অনুগ্রহ করেছেন। কোনও মানুষের জীবনে বৃথাই এই সুযোগ দান করা হয় না। আমার আনন্দ, সুখ আমার উপযুক্ত হবে। অতঃপর আমার জীবনের কোনও একটি দিনও ঠিক গত দিনের মতন উষ্ণতাহীন হবে না। আমার চেয়ে সমাজে অনেক নিম্ন-স্থানে অবস্থিত একজন পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হয়ে এর মধ্যেই আমি যথেষ্ট উদারতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছি। এবার নজর রাখব, ও আমাকে পাওয়ার উপযুক্ত কি-না? ওর মধ্যে দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ওকে ত্যাগ করব। আমার মতন অভিজাত-বংশজাত এবং সাহসী কন্যা এ ধরনের বোকামি করতে পারে না।

আচ্ছা, মারকুইস গু ক্রয়সিনয়কে ভালবাসলে আমাকে কি একই ভূমিকা পালন করতে হবে না? এটা হবে আমার বোনের সুখের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং এ-জীবন আমি ঘৃণা করি। আগে থেকেই আমি জেনে ফেলেছি ওই হতভাগ্য মারকুইস আমাকে কি বলবে এবং আমিই বা কি তার জবাব দেব। এটা কি ধরনের প্রেম যা' করলে মানুষের ঘুম পায়? অনেকে ত ধর্মকাজ করে। আমার বিয়ের চুক্তিপত্রে সই করার আগে আমার বোনের মতন এমন ঝামেলা পাকাবে যে, সবাই ভাববে আমার অভিজাত আত্মীয়দের জন্য আমি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছি···ফলে চুক্তিপত্রে শেষ ছত্র যোগ করার আগে সবাইকার মগজ বিগড়ে যাবে।

১২ : সে কি দ্বিতীয় দাঁতন ?

আমার কাকিমা সুন্দরী মারগারিট দ্য ভ্যালয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল কণ্ডুয়ন বা এক ধরনের উত্তেজনা, অল্পদিন পরে নাভারের রাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং এই রাজা চতুর্থ হেনরী নাম গ্রহণ করে ফরাসীদেশে রাজত্ব করেন। ষোল বছর বয়সে নিজের ভাইবোনদের সাথে খুনসুটি করার প্রবৃত্তি থেকে এই আমায়িকা রাণীর মনে বিপদসংকুল খেলা-ধুলার প্রতি একটা ঝোঁক গড়ে ওঠে। এমন একজন যুবতীর জীবনে বিপদ কি হতে পারে? তার জীবনে যা' কিছু অমূল্য তাই : তার সম্মান, তার সারা জীবনে সুনাম।

—নবম চার্লসের আত্মকথা

জুলিয়ান আর আমার মধ্যে কোন চুক্তিপত্র সই করতে হবে না, কোনও পারিবারিক আইনজ্ঞের দরকার হবে না। এখানে প্রতিটি কাজই সাহসিকতার তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে এবং সুযোগ এলে সবকিছু ঘটবে। কিন্তু আভিজাত্য, তার অভাব রয়েছে ওর। মারগারিট দ্য ভ্যালয় তাঁর কালের সুখ্যাত মানুষ বলে পরিগণিত যুবক লা মোলকে ভালবেসেছিলেন। এর জন্যে বিশেষ করে আমিই দায়ী, আমার কালের রাজসভার প্রচলিত আচরণের এমন গোঁড়া সমর্থক এবং সাধারণ পথের থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয়ে অভিযানে যোগ দিতে তাই কি তারা এত বিবর্ণ? গ্রীস অথবা আফ্রিকা অভিযান তাদের কাছে ভয়ানক অভিযান এবং সেখানে সেনাবাহিনী না নিয়ে তারা যেতে চায় না। একা হলেই তারা ভীত হয়ে পড়ে, বেদুইনদের বর্শার ভয়ে ভীত নয়—তাদের ভয় হাস্যাস্পদ হওয়ার, এই ভয়ে তারা পাগল হয়ে যায়।

কিন্তু আমার জুলিয়ান অন্যদিকে একা কাজ করতে ভালবাসে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মানবক সে তাই অপরের সমর্থন বা সাহায্যের লাভের কথা কখনও চিন্তা করে না। সে অপরকে অবজ্ঞা করে সেজন্যে আমি তাকে অবজ্ঞা করি না।

দরিদ্র হওয়া সত্বেও সে যদি অভিজাত-বংশজাত হত তাহলে তার প্রতি অনুরক্ত হওয়া আমার পক্ষে একটা অন্যায় কাজ হত। সেটা হত সাদৃশ্যহীন মিলনের প্রচেষ্টা। এমন অবস্থার প্রতি আমার মোহ নেই। এর ফলে প্রেমাকর্ষণ এবং আবেগের কোনও বিশেষত্ব জাহির হত না, অজস্র বাধা-বিঘ্ন জয় করার বা অনিশ্চয়তার গাঢ় অন্ধকার পার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত না।

নিজের এই সব যুক্তিজালে মাদমোজায়েলের মন এত প্রভাবিত হয়েছিল যে, পরের দিন কোনরকম পরিণাম চিন্তা না করেই সে মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয় এবং নিজের দাদার কাছে জুলিয়ানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করল। তার প্রচণ্ড বাকপটুতা

তাদের বিরক্ত করে তুলল।

তার দাদা বলল—'ওই উৎসাহী ছোকরা সম্বন্ধে সাবধান হও। আবার যদি দেশে বিপ্লব হয় তবে ও আমাদের সকলকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে।'

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে ম্যাথিলডা তার দাদা ও মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয়কে ধমক দিয়ে বলল যে এই উৎসাহকে ভয় করার অর্থ অকল্পিত এবং অভাবিত ঘটনাকে মুখোমুখি দেখে শঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তারা অভিভূত হয়ে পড়েছে তাই তাদের মনে এই শঙ্কা।

—'বুঝলে ভদ্রলোকেরা, তোমরা হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে ভীত। দুর্ভাগ্যক্রমে হাস্যাস্পদ নামক একটা দানব জন্মেছিল এদেশে, কিন্তু আঠার শ' ষোল সালে তার ভূত পালিয়েছে।'

মারকুইস দ্য লা মোলও প্রায়ই বলেন—'যে দেশে, দু'টো দলের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে আর হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয় থাকে না।' তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ে তা' ঠিক বুঝতে পেরেছিল।

তাই ম্যাথিলডা আবার জুলিয়ানের শত্রুদের বলল—'অতএব মহাশয়রা, তোমরা সারা জীবন ভয়ের মধ্যেই বাস করবে এবং অবশেষে তোমাদের বলা হবে, ওটা নেকড়ে নয় তার ছায়া মাত্র।'

অচিরে ম্যাথিলডা ওদের ছেড়ে সরে গেল। তার দাদার মন্তব্য শুনে তার মনে ভয় হল এবং অসোয়াস্তি দেখা দিল। কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে এর মধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা করার মতন বস্তু দেখল। এ যুগে যখন না-কি সব রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিভে গেছে তখন ওর মধ্যে উৎসাহ দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। আমার দাদা যা' বলেছে তা' ওকে বলব। দেখব, ও কি জবাব দেয়। এমন সময় বলব যখন ওর দৃষ্টি উদ্দীপনায় উজ্জ্বল। তখন ও আর আমার কাছে মিথ্যা বলতে পারবে না।

মনে মনে অনেক ভাবনা চিন্তা করে ও আওড়াল—আচ্ছা, ও কি দ্বিতীয় দাঁতন হতে পারে। ধরে নিলাম, দেশে আবার বিপ্লব দেখা দিল। তখন ক্রয়সিনয় আর আমার দাদা কি ভূমিকায় অভিনয় করবে? এর মধ্যেই ওদের জন্যে ব্যবস্থাপত্র হয়েই রয়েছে···মহান্ আত্মসমর্পণ। তারা হবে সাহসী মেষ, নীরবে কর্তিত হওয়ার জন্য নিজেদের গলা বাড়িয়ে দেবে। মরবার সময় তাদের একটাই ভয়, তা' হচ্ছে অভদ্র হওয়ার ভয়। কিন্তু আমার প্রিয়তম জুলিয়ান যদি পালিয়ে যাওয়ার এতটুকু আশা দেখতে পায় তবে যে জ্যাকোবিনপন্থী তাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে তার মাথা গুলি করে উড়িয়ে দেবে। অন্ততঃ অভদ্র হওয়ার চিন্তা তার মনে নেই।

এই শেষ চিন্তা তাকে বিষণ্ণ করে তুলল। মনে পড়ল এক যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি। তার মনের সাহস তাই কর্পূর হয়ে গেল। তার দাদা এবং তার বন্ধুরা জুলিয়ান সম্পর্কে একবাক্যে মন্তব্য করেছিল যে, ওই ছোকরার মধ্যে পুরোহিতসুলভ

নিরাসক্ত আর বিনীত ভণ্ডামি রয়েছে।

কিন্তু সহসা ম্যাথিলডার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সব কিছু বুঝতে পারল। ওদের এই মনের তিক্ততা এবং নিষ্ঠুরতার প্রবণতা অনেক কিছু প্রমাণ করছে। ওরা যেন একথাটাই ঘোষণা করছে যে, এবারকার শীতের মরশুমে জুলিয়ানই সেরা মানুষ। ওর অন্যায় এবং হাস্যাস্পদ ধারণায় কি এসে যায়? ওর মধ্যে যে মহানুভবতা আছে তাই দেখে ওরা বিচলিত···নইলে এমনিতে ওরা ত ভদ্র-স্বভাব আর প্রশ্রয়দানকারী। নিশ্চয় জুলিয়ান গরীব তাই সে পুরোহিত হওয়ার জন্য পড়াশুনা করেছে। আর এরা সব অফিসার, তাই পড়াশুনা করার দরকার হয় নি ···এদের কাছে জীবন খুব সহজ।

জুলিয়ানের চিরন্তন কালো পোশাক এবং পুরোহিতসুলভ মুখের আদল প্রমাণ করছে যে, সে গরীবের ছেলে কিন্তু অনাহারে শুকিয়ে মরার মতন ঘরের ছেলে নয়। অথচ এই সব ভদ্রলোকেরা যখন মৌলিক কোন সরস মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় তখন কি তারা জুলিয়ানের দিকে তাকায় না? তাকায়···আমি সরলভাবে তা' দেখেছি। অবশ্য ওরা ভালভাবেই জানে, ওকে কিছু প্রশ্ন না করা হলে ও কোন কথা বলে না। আমাকে ও উচ্চ-মনা মনে করে তাই কেবল আমার সঙ্গে কথা বলে। ওদের জবাবের প্রতিবাদে কিছু বলবার প্রয়োজন হলে ভদ্রভাবে বলে দূরে সরে যায়। আমি ত খুব কমই প্রতিবাদ করি তাই আমার সঙ্গে সে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করে। আমার বাবা তীব্র মেধাবী পুরুষ, পরিবারের ধনসম্পদ নানাভাবে তিনি বর্ধিত করেছেন। জুলিয়ানকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। আর সবাই তাকে ঘৃণা করলেও তাই অস্বীকার করে না।

পরের দিন নরবারট আর তার বন্ধুরা মাদাম মোলের আরাম-কেদারার চার-ধারে ঘিরে বসেছিল। মাদাম আরাম-কেদারায় শুয়ে ছিলেন। জুলিয়ান ছিল না সেখানে। জুলিয়ানের সম্পর্কে ম্যাথিলডার ভাল অভিমত নিয়ে তারা সরস আলোচনায় মেতে উঠেছিল। নরবারট বেশ আক্রমণ করেই কথা বলল। বেশ দূর থেকেই এই ফন্দিবাজী চেষ্টা দেখে ভারি খুশি হল ম্যাথিলডা। ভাবল, ব্যস! ওই ত সবাই একজোট্টা হয়েছে এমন একজনের বিরুদ্ধে যে না কি বছরে দশ লুই রোজগার করতে পারে না এবং জিজ্ঞাসিত না হলে যে কথা বলার অধিকারও পায় নি। ওর কালো পোশাক-পরা দেহ দেখে ওরা ভীত। ও যদি সামরিক পোশাক পরত তবে এরা কি করত?

এমন দীপ্তিমতী এর আগে আর কখনও হয়ে ওঠে নি ম্যাথিলডা।

প্রথম থেকেই সে পরিহাসতরল কণ্ঠে আক্রমণ সুরু করল। বলতে লাগল —'যদি ফরাসীভূমির কোনও পাহাড়-অঞ্চলের কোন কাদা-পা ভদ্রলোক এখানে হাজির হয়ে আবিষ্কার করে যে জুলিয়ান তার স্বভাবজাত সন্তান এবং তাকে নামের সঙ্গে হাজার কয়েক ফ্রাঙ্ক দান করে যায়···তাহলে ছ'সপ্তাহের মধ্যেই জুলিয়ানের মুখে তোমাদের মতন গোঁফ গজাবে। ছ'মাসের মধ্যে তোমাদের মতন হুসার

বাহিনীতে সেও একজন অফিসার হবে। তখন তার চরিত্রের মহানুভবতা আর পরিহাসের বস্তু হবে না। জানি, তোমরা তখন গ্রামীণ অভিজাতদের চেয়ে রাজ-সভার অভিজাতরা সেরা এই মতবাদ নিয়ে ঝগড়া সুরু করবে। কিন্তু তোমাদের তর্কে কোণঠাসা করার জন্য যদি আমি প্রমাণ করি যে, জুলিয়ানের পিতা ছিলেন একজন স্পেনদেশীয় ডিউক। নেপোলিয়নের রাজত্বকালে তিনি বেসানকন শহরে যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুশয্যায় চেতন-অবস্থায় তিনি জুলিয়ানকে স্বীকার করে গেছেন···তাহলে তোমরা কি বলবে?'

জারজত্ব সম্পর্কে ম্যাথিলডার এই সব অনুমিত সত্য ধারণা ওদের কাছে কুৎসিত লাগল।

মনে মনে ভাবল ম্যাথিলডা, তার বয়স অনুযায়ী জুলিয়ান যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে আমার সাথে কথা বলে। হীনমন্য এবং হতভাগ্য তার জীবন বিস্ময়কর উচ্চা-শায় উদ্দীপিত। এমন অবস্থায় তার জীবনে একজন নারীর প্রয়োজন যে তাকে ভালবাসবে। হয় ত আমি হব সেই নারী···কিন্তু ওর মধ্যে ত ভালবাসার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। স্বভাব সাহসী ও, ভালবাসলে ও নিশ্চয় আমাকে বলত।

এই অনিশ্চয়তা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব-ভাবনা ম্যাথিলডার প্রতিটা মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখল। যখনই জুলিয়ান তার কাছে আসে, তার সঙ্গে কথা বলে, অমনি নতুন নতুন যুক্তির ধারা খুঁজে পায় ম্যাথিলডা···তাই আগে তার জীবনে যে-একঘেয়েমির স্থান ছিল এখন সেই একঘেয়েমি দূর হয়ে গেল। যে মুহূর্ত থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে, সে জুলিয়ানের প্রতি অনুরক্ত সেই মুহূর্ত থেকে একঘেয়েমি তার জীবন থেকে সরে গেছে। তার মনে গভীর কাম-লালসা সৃষ্টি হয়েছে। এই আবেগের জ্বালা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু তবু এটা হাজার গুণ শ্রেয়। কেননা এই কাম-লালসার সৃষ্টি না হলে একঘেয়েমির বিষণ্ণতায় তার কুমারী জীবনের সেরা দিনগুলো নষ্ট হয়ে যেত। ষোল থেকে কুড়ি—কুমারী জীবনের এটাই ত সেরা সময়।

ম্যাথিলডার মন যখন দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে, কেন জুলিয়ান তার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারছে না···ঠিক তখনই কমেৎ নরবারটের উষ্ণতাহীন এবং অতিশয় উদ্ধত আচরণ দেখে জুলিয়ান মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। অন্যদের উদ্ধত আচরণ সহ্য করতে সে অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে জুলিয়ানের আচরণ যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনই তাকে এই উদ্ধত আচরণ সহ্য করতে হয়। সে বুঝতে পারে সে এখানে অনুপযুক্ত। কিন্তু ম্যাথিলডা এ দলের মধ্যে থেকেও বিশেষভাবে তাকে আমন্ত্রণ জানায় তার সঙ্গে থাকতে, তার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে। ম্যাথিলডা যে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সে কথা জুলিয়ানের কাছে অজানা নেই এবং থাকা অসম্ভব। কিন্তু ওই নীল চোখ দু'টো যখন তার দিকে নিবদ্ধ থাকে তখন ওর মধ্যে উষ্ণতাহীন আত্ম সচেতনতা। সমালোচনা-সুলভ দুষ্টুমির চিহ্নও দেখতে পায় জুলিয়ান। এ সব

সত্বে ওর দৃষ্টিতে কি প্রেমের কাজল রয়েছে? অথচ মাদাম রেনলের দৃষ্টি ছিল একেবারে অন্যরকম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিনার শেষে মারকুইস মোলের সঙ্গে জুলিয়ান তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকেছিল…খানিক পরে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে আসছিল …সাহসে ভর করে দৃঢ়পদে ম্যাথিলডাদের দলে যোগ দিতেই যাচ্ছিল। সোচ্চারে বলা কয়েকটা কথার টুকরো তার কানে গেল। দুবার তার নামও শুনল স্পষ্ট। সে উপস্থিত হল ওখানে। অমনি গভীর নীরবতা নেমে এল। সবাই চুপ। ম্যাথিলডা আর তার দাদা এত উত্তেজিত যে, তারা অন্য বিষয়ের অবতারণা করতে ভুলে গেল। অন্যান্যরা নিরাসক্ত এবং উষ্ণতা-হীন দৃষ্টিতে জুলিয়ানকে দেখল।

ওদের দল ছেড়ে জুলিয়ান চলে এল।

১৩: একটা চক্রান্ত

অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য, আকস্মিক উপস্থিতি রূপান্তরিত হয়ে কোন কল্পনাপ্রবণ মানুষের দৃষ্টিকে অবিসংবাদী প্রমাণ হিসাবে প্রকাশ করে যে, তার অন্তরে আগুন জ্বলছে।

—শিলার

পরের দিন সহসা আবার নরবারট এবং ম্যাথিলডাকে একসঙ্গে ও দেখতে পেল। ওরা তার সম্পর্কে আলোচনা করছিল। ঠিক আগের সন্ধ্যার মতন অনড় নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। ওরা নিশ্চুপ। ওর মনে সন্দেহের সীমা রইল না। এই মনোহর-দর্শন যুবক-যুবতীরা কি তাকে বোকা বানাবার জন্য চক্রান্ত করছে? হয় ত এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কিছু ভাবছে ওরা। একটা হতভাগ্য গরীব সেক্রেটারিকে ভালবাসার ভাণ করছে ওই সুন্দরী মাদমোজায়েল। এ ধরনের মানুষদের মনে কি প্রেমাবেগ আছে? ছল-চাতুরী এদের জীবনের বিশেষত্ব। আলাপ-আলোচনায় আমার উচ্চমন্য-ভাব দেখে ওরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। ঈর্ষা ওদের চরিত্রের দুর্বলতা। মাদমোজায়েল আর সকলের ভিতর থেকে আমাকে বেছে নিয়ে প্রেমাভিনয় করছে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর চোখে একটা আদর্শ খাড়া করার জন্য।

এই নিষ্ঠুর সন্দেহ জুলিয়ানের মনোভাব একদম বদলে দিল। এর ফলে তার মনের প্রেমের প্রাথমিক অবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলল। ম্যাথিলডার অনুপম দেহ-লাবণ্য, রাণীর মত আচরণ এবং সুন্দর পোশাকের প্রতি তার মনের পছন্দ এই প্রেম সৃষ্টি করেছিল। এ সব ব্যাপারে জুলিয়ান এখনও আনাড়ি। একজন গরীব চাষীর ছেলে হয়ে সে সুন্দরীদের মেলায় এবং অভিজাতদের বৃত্তে প্রবেশ করতে চাইছে। ম্যাথিলডার কয়েকদিনের আচরণ আজ জুলিয়ানকে কল্পনাপ্রবণ করে তুলেছে। এটুকু বুঝতে পারার মতন বিবেচনাশক্তি তার আছে

যে, সে ম্যাথিলডার চরিত্রের বিশেষত্ব জানে না। যা' কিছু সে দেখছে তা বাহ্যিক।

প্রতি রবিবার ম্যাথিলডা গীর্জার মা্‌সত প্রার্থনা সভায় হাজির থাকবেই। সংসারে কোন কিছুর জন্য তার কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না। তার আর একটা অভ্যাস, প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে একবার গীর্জায় যাবেই। রাজতন্ত্র বা গীর্জা সম্পর্কে কোন লোক সরস মন্তব্য করলে ম্যাথিলডা তার উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। অথচ জুলিয়ান জানে যে, ভলতেয়ারের কয়েকখানা গ্রন্থ ম্যাথিলডার সব সময়ের সঙ্গী।

মারকুইস মোল তাঁর বইয়ের দোকানদারের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন…কেননা সে তাঁর লাইব্রেরীর জন্য গাদা গাদা 'স্মৃতি কথা' পাঠায়। তাই তিনি জুলিয়ানের উপর বই নির্বাচন করে কিনে আনার ভার দিলেন। জুলিয়ান বই কিনে মার-কুইসের নিজের ঘরে একটা বুক কেসে রাখতে সুরু করল। অচিরে তার নজরে পড়ল যে, রাজতন্ত্র এবং গীর্জাবিরোধী বইগুলো বুক কেস থেকে কে সরিয়ে ফেলছে। কে সরিয়ে ফেলছে? নরবারট নয় নিশ্চয়, কেননা সে পড়ে না।

এই আবিষ্কার ম্যাথিলডার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক তার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হল। কপটতার অধিকারিণী ম্যাথিলডা…জুলিয়ান বিস্মিত হল। কপটতা এবং ধর্মের ভণ্ডামি তার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। প্রেমের স্রোতে ভেসে যাওয়ার চেয়ে সে বরং তার কল্পনাতেই আগুন ধরাবে, মনে মনে ঠিক করল জুলিয়ান। ম্যাথিলডার দেহসুষমা, পোশাক সম্পর্কে তার পছন্দ, শাঁখ-সাদা তার দু'খানা হাত, বাহুদ্বয়ের সৌন্দর্য, সাবলীল চলন ভঙ্গিমা—এসব কথা কল্পনা করতে করতে জুলিয়ান এক সময় নিজেই অনুভব করল যে, সেও প্রেমে পড়েছে। মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে সে ভাবতে সুরু করল যে, জুলিয়ান বুঝি রাণী ক্যাথারিন দ্য মেডিসি। তার সম্পর্কে ভেবে সে কোনও অপরাধ করছে না…কারণ ম্যাথিলডা তার কাছে মূর্তিমতী প্যারিস।

কিন্তু এই যুবক-যুবতীরা তার অভিজ্ঞতার অভাবের সুযোগ নিয়ে তাকে পর্যু-দস্ত করতে সর্বদা সচেষ্ট। তারা সবাই তাকে চাইছে বোকা বানাতে।

অবশেষে জুলিয়ান ঠিক করল যে, সে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবে। ভাবল, আমি চলে যাব, তাহলে এই প্রেমের খেলাও শেষ হবে। মারকুইস নিম্ন ফরাসী ভূমিতে কয়েকটা ছোট ছোট জমিদারী এবং বাড়ীর মালিক। সেগুলো দেখা-শুনার ভার তিনি জুলিয়ানকে দিয়েছিলেন। ওখানে একবার সরেজমিনে জুলিয়ানের যাওয়ার দরকার হল। মারকুইস অনিচ্ছা সত্বেও তাকে যেতে দিতে রাজী হলেন। কেবল উচ্চাশার বিষয় ছাড়া জুলিয়ান ঠিক তাঁর দ্বিতীয় রূপ হয়ে উঠেছে।

যাত্রার জন্যে তৈরী হতে হতে জুলিয়ান ভাবল, যাক, ওরা আর আমার সঙ্গে ফন্দিবাজী খেলতে পারবে না। ম্যাথিলডা এই সব ভদ্র-যুবকদের উপলক্ষ করে যে-সব ঠাট্টা বিদ্রূপ করে সেগুলো বোধ হয় সত্য কিংবা আমার বিশ্বাস লাভের

জন্য সে এ সব বলে…তবে যা হোক আমি এদের দয়ায় কিছু মজা লুটতে পেরেছি। যদি এই ছুতোর-সন্তানের বিরুদ্ধে তারা কোন চক্রান্ত না করে থাকে তবে এই ম্যাথিলডার চরিত্র আমার কাছে একটা রহস্য…কিন্তু এখন সে আমার কাছে ক্রয়সিনয়ের মতন। তবে গতকাল নিশ্চিতভাবে ম্যাথিলডার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল…আমি দেখে খুশি হয়েছিলাম যে, আমি যেমন কপর্দকহীন একজন সাধারণ লোক তেমনি ধনী অভিজাত এক যুবক আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য আমার কাছে হাত জোড় করতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই আমার জীবনে সুন্দরতম জয়। নিম্ন ফরাসীভূমির সমতলের বুকে ঘোরবার সময় এই স্মৃতি আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দেবে।

তার যাওয়ার কথা জুলিয়ান গোপন রেখেছিল।

কিন্তু ম্যাথিলডা তার চেয়েও বেশী জানে যে, সে প্যারিস ছেড়ে পরের দিন যাচ্ছে এবং বহুদিনের জন্য যাচ্ছে। বসবার ঘরের গুমোট বাতাসে তার মাথা ধরেছে এই অছিলায় সে তাই চলে গেল। সে কিছুক্ষণ বাগানে একা একা বেড়াল। আর নরবারট বন্ধুদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগল।

ডিনার টেবিলে মোহিনী দৃষ্টিতে ম্যাথিলডা তাকাল একবার জুলিয়ানের দিকে।

এই মোহিনী দৃষ্টিপাত হয়ত ওর অভিনয়ের অঙ্গবিশেষ, ভাবল জুলিয়ান—কিন্তু এই ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ আর উত্তেজনা! বোকামি! কার এসব আমি যাচাই করছি? প্যারিসের নারীরা এ ধরনের প্রেমের খেলা খেলতে খুবই দড়। এই যে দ্রুত শ্বাস গ্রহণ…এ দেখে ত আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ওর প্রিয় অভিনেত্রীকে দেখে ও এই আচরণ শিখেছে।

এক সময় ওরা দু'জনেই কেবল রইল। বিষণ্ণতাভরা আলাপ।

না! আমার জন্যে জুলিয়ান একটুও ভাবছে না…ভাবল ম্যাথিলডা। তার মানসিক অবস্থা করুণ হয়ে উঠল।

উঠে চলে যাচ্ছিল জুলিয়ান, সহসা ম্যাথিলডা তার বাহু জড়িয়ে ধরল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—তোমাকে রাতে একখানা চিঠি পাঠাব। এত মৃদু কথা যে জুলিয়ানের কানে সব-কথা ঢুকল না। তবে জুলিয়ান অভিভূত হল।

ম্যাথিলডা বলতে লাগল—'তুমি বাবার যে সব কাজ কর তার জন্যে তোমার উপর বাবার খুব বিশ্বাস। কাল তুমি অবশ্যই যেতে পারবে না। একটা কিছু ওজোড় দেখিও।' সে ছুটে চলে গেল।

মনোলোভা তার চেহারা। ওর চেয়ে সুন্দর পা হওয়া আর সম্ভব নয়। এমন সৌন্দর্য ছড়িয়ে ও ছুটে চলে গেল যে, জুলিয়ান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় ওর মাথায় যে দ্বিতীয় ভাবনাটা ঢুকল তা' কে আন্দাজ করবে? উদ্ধত কণ্ঠে ও বলে গেল—'তুমি অবশ্যই'…আর এই কথার জন্যে জুলিয়ান আঘাত পেল। প্রধান চিকিৎসকের মুখে এই 'অবশ্যই' শব্দটা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী পঞ্চদশ লুইও গভীর বিরক্তি উপলব্ধি করেছিলেন…এবং

পঞ্চদশ লুই ভুঁইফোড় ছিলেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে একজন চাকর জুলিয়ানের হাতে একখানা চিঠি এনে দিল।

সরলভাবে এই চিঠিতে প্রেম নিবেদন করা হয়েছে।

চিঠি পড়ে জুলিয়ানের গাল রক্তিম হয়ে উঠল। মনের তীব্র আবেগ সংযত করতে অপারগ হয়ে সজোরে বলে উঠল—'এবং তাহলে আমি, আমি এক গরীব চাষী এক মহান মহিলার প্রেম লাভ করলাম, পড়লাম তার প্রেম-নিবেদন।'

তারপর নিজের মনের আনন্দের আবেগ কিছুটা সংযত করে জুলিয়ান আবার কথার পিঠে কথা যোগ করল—'আমার দিক দিয়ে আমি খুব খারাপ কিছু করি নি। চরিত্রের মর্যাদা ঠিক বজায় রেখেছি। কখনো বলি নি, আমি তোমায় ভালবেসেছি।' তার মনে আনন্দের বন্যা কিন্তু বাঁধ মানছিল না।

'তুমি চলে যাবে শুনে কথা বলতে হচ্ছে আমাকে…তোমাকে আর দেখতে না পেলে…

আমি আর দুঃখ সহ্য করতে পারব না…।'

ম্যাথিলডার চিঠিখানা নিরীক্ষণ করবার সময় নতুন একটা ভাবনা তার মাথায় ঝিলিক দিল। এ যেন একটা আবিষ্কার। তার আনন্দের মাত্রা আরও বাড়ল… 'মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়ের চেয়ে আমি ওর কাছে অধিক বাঞ্ছনীয়, যে আমি গুরুতর বিষয় ছাড়া আলোচনা করি না। অথচ সে কত সুদর্শন যুবক। সে গোঁফ রাখে, মনোহর সামরিক পোশাক পরে। সব সময় সরস আর নিপুণ কথা বলতে পারে এবং বলে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি।'

এটা জুলিয়ানের জীবনের এক আনন্দ-ঘণ মুহূর্ত। আনন্দে উন্মত্ত হয়ে সে বাগানের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তারপর দোতলায় নিজের অফিস-ঘরে ছুটল। ভাগ্য ভাল, মারকুইস এখনও বেরিয়ে যান নি। কয়েকখানা স্ট্যাম্প লাগানো দলিল দেখিয়ে খুব সহজেই সে মারকুইসকে বোঝাতে পারল যে, তার এ সময় যাওয়া চলবে না, এগুলো নরম্যাণ্ডি থেকে এসেছে।

ব্যবসার কথা ফুরোলে মারকুইস বললেন—'তুমি যাচ্ছ না শুনে খুশি হলাম। আমি এখানে তোমাকে দেখতে ভালবাসি।' এই মন্তব্য শুনে লজ্জিত হল জুলিয়ান, সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আর আমি তার মেয়েকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে প্রলোভিত করছি। এর ফলে ক্রয়সিনয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের যে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন মারকুইস এবং যার উপর তাঁর ভবিষ্যৎ আশা নির্ভর করছে তা' বিফল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি নিজে ডিউক হতে না পারলেও হয়ত তাঁর মেয়ে রাজসভায় একদিন ডাচেসের আসনে বসতে পারত। ভাবল জুলিয়ান এবং ম্যাথিলডার চিঠি সত্ত্বেও সে ঠিক করল ফরাসী নিম্নভূমির দিকে সে যাত্রা করবে। মারকুইসকে যে ওজোড় সে নিজেই দেখিয়েছে তাও মানবে না।

কিন্তু মনের মধ্যে এই সৎ-চিন্তার বিদ্যুৎ-ঝলক অচিরে নিভে গেল।

আচ্ছা, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার এমন কি শক্তি আছে যে, এই অভিজাত পরিবারের প্রতি আমি অনুকম্পা দেখাব। আমি ত একজন পারিবারিক চাকর ছাড়া আর কিছু নই। মারকুইস কি ভাবে তাঁর বিশাল ধন-সম্পদ গড়ে তুলেছেন ? পল্লী-নিবাসে যখনই শুনেছেন যে, ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা রয়েছে, ব্যস! অমনি তিনি গচ্ছিত টাকার চুক্তি-পত্র বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি ফরাসী গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাই আমার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করা হয়েছে, আর ম্যাথিলডা আমাকে করে তুলেছে এক মহান হৃদয়সম্পন্ন মানবক··· কিন্তু আমার আয় কত ? হাজার ফ্রাঙ্কেরও কম···যাতে আমার দৈনন্দিন রুটির ব্যবস্থাটুকুও হয় না। হ্যাঁ, সংক্ষেপে তাই বলা যায়, আমার দৈনন্দিন রুটির জোগাড় হয় না। অথচ এমন আনন্দের সুযোগ পেয়েও আমি হাত ছাড়া করব! মধ্যবিত্ত অবস্থার দুস্তর মরুভূমি পার হওয়ার জন্য অফুরন্ত কষ্ট সহ্য করছি আমি···এখানে এই মরুভূমির বুকে ঠাণ্ডা জলের ঝরণা কানায় কানায় ভরে উঠেছে তবু আমি তৃষ্ণা মেটাব না! সত্যি বলছি, আমি এমন নিরেট গাধা নই। এই দাম্ভিক মানবকদের মরুভূমির মধ্যে প্রতিটি মানুষই বলে এটাই তার জীবন।

জুলিয়ানের স্মরণপথে উদয় হয়, মাদমোজায়েল এবং বিশেষ করে তার বান্ধবী মহিলারা কেউ কেউ তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু আজ মারকুইস দ্য ক্রয়সিনয়কে হারিয়ে দেওয়ার ভাবনা তার মন থেকে সব সৎ-চিন্তা নির্মূল করে দিল। আমার এই ভালবাসার জন্য আমি কি দারুণভাবে ক্রয়সিনয়কে রাগিয়ে দেব। এবং অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে আমি আমার তরবারির আস্ফালন করব ওকে লক্ষ্য করে। ও একটা ভঙ্গি করবে, দ্বিতীয় আঘাত হানার জন্যে। তার আগে অবশ্য আমি সর্দি টানা কচি শিশু ছিলাম ওর তুলনায়। কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার পর ও আর আমি সমান।

অপরিসীম আনন্দে ধীর কণ্ঠে জুলিয়ান আওড়াতে লাগল—'হ্যাঁ, মারকুইস আর আমার মেধা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়েছে। এবং জুরা থেকে আগত এই গরীব ছুতার-সন্তান আজ বিজয়ী। ভাল! আমার জবাব আমি লিখে স্বাক্ষর করে রেখেছি। যেও না এবং মাদমোজায়েলের কথা ভাব। আমি নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছি। মাদমোজায়েল শোন, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার মতন একজন ছুতার-সন্তানের জন্য তুমি আজ বিখ্যাত ধর্মযোদ্ধা গাই দ্য ক্রয়সিনয়ের উত্তরাধিকারীকে প্রতারিত করছ।'

জুলিয়ান আর মনের আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। এতক্ষণ নিজের বদ্ধ ঘরে সে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই নীচে বাগানে নেমে এল। তখন সে মনে মনে আওড়াচ্ছিল—'জুরার এক গরীব ছুতারের ছেলে আমি। দিনের পর দিন এই কালো পোশাক পরার শাস্তি আমার কপালে জুটেছে। হায়! বিশ বছর আগে ওদের মতন আমারও সামরিক পোশাক পরার কথা! সে সব দিনে আমার

মতন লোক হয় নিহত হত যুদ্ধে আর না হয় ছত্রিশ বছর বয়সেই সেনানায়ক হত। তবে যা'হোক! ওদের চেয়ে আমার বেশী বুদ্ধি। আজকের দিনে কি পোশাক পরতে হবে তা' আমি জানি।' হাতের চিঠিখানা সে মুঠো করে ধরে রাখল, এই চিঠিখানা তাকে বীরের পদে উন্নীত করেছে। আজকের দিনে এটা ঠিক যে, এই কালো পোশাক পরলে চল্লিশ বছর বয়সে হাজার ফ্রাঙ্কের বৃত্তি আর 'ব্লু রিবন' পাওয়া যায় ঠিক যেমন ব'ভয়েসের বিশপ পেয়েছেন।

কিন্তু এই চিঠিখানা ত একটা ছলও হতে পারে। এমন প্রেমপূর্ণ মধুর কথা-গুলো কি বিশ্বাস করা উচিৎ হবে! যতক্ষণ ওই কুমারী কন্যাকে আমি হাতে পাচ্ছি না ততক্ষণ কি করে বিশ্বাস করবো যে, সে মিথ্যে কথা বলছে না!

এবার ব্যাপারটার অন্ধকার সম্ভাবনার কথা জুলিয়ান ভাবতে লাগল।

এই চিঠিখানা ওকে বিপদে ফেলতে পারে। ঠিক আছে, চিঠিখানা আমি মুখ-আঁটা বন্ধ খামে ভরে ফাদার পিরার্দের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি রেখে দেওয়ার জন্যে। তিনি সৎলোক এবং জানসেনপন্থী। কাজেই টাকা দিয়ে কেউ তাঁকে বশ করতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে চিঠিখানা তিনি খুলে পড়তে পারেন···তাহলে চিঠিখানা আমি ফৌকের কাছে পাঠিয়ে দেব।

জুলিয়ানের দৃষ্টি ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠল—তার মুখের ভাব এমন হয়ে উঠল যেন সে নিখুঁতভাবে একটা অপরাধ করতে পারে। সে যেন সমস্ত সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ রত এক অসুখী হতভাগ্য মানবক।

'অস্ত্র হাতে তুলে নাও।'

মনে মনে আওড়াল জুলিয়ান। এক লাফে সব ক'টা সিঁড়ি পার হয়ে নীচে নেমে বাইরে রাস্তায় ছুটল চিঠির অনুলিপি তৈরী করার কেরাণীর ঘরে। মাদমোজায়েলের চিঠিখানার অনুলিপি লিখিয়ে নিল। ফৌকের নামে একখানা চিঠি লিখল, এইটি মূল্যবান সম্পত্তির মতন যত্ন করে রেখে দেবে। কিন্তু ডাকঘরের গোয়েন্দারা ত চিঠিখানা খুলতে পারে! তারপর চিঠিখানা যে খুঁজছে তার হাতে তুলে দিতে পারে! না, মহাশয়রা! সে সুযোগ দেব না!

তাই সে বিশাল এক খণ্ড বাইবেল কিনল। ম্যাথিলডার চিঠিখানা বাইবেলের মধ্যে রেখে মোড়ক তৈরী করল। তারপর ফৌকের একজন মজুরের নাম লিখে মোড়কটা ডাক-গাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। ও জানে, এই মজুরটার নাম প্যারিস শহরে কেউ জানে না।

তারপর সব কাজ যখন চুকল তখন সে চঞ্চল পায়ে হাল্কা-মনে হোটেল দ্য লা মোলে ফিরে এল।

১৪ : একটি মেয়ের চিন্তা-ভাবনা

কি বিস্ময় ! কি অনিদ্র রজনী !
মহান ঈশ্বর ! নিজেকে কি ঘৃণার বস্তু
করে তুলব ! সে নিজেই ত আমাকে ঘৃণা
করে কিন্তু সে যে চলে যাচ্ছে, চলে
যাচ্ছে বহু দূরে।

—আলফ্রেড ত্য মুসেত্

অন্তরে দ্বন্দ্ব না থাকলে ম্যাথিলডা কখনও তাকে চিঠি লিখত না। জুলিয়ান সম্পর্কে প্রথম দিকে তার মনে যে আগ্রহ ছিল তা' ক্রমশঃ প্রবল হয়ে তার মনের গর্বকে করেছে খর্ব এবং আত্ম-সচেতন তার হৃদয়ে এই আগ্রহ এখন রাজত্ব করছে। কাম-লালসার আবেগে তার এই উষ্ণতাহীন হেয় মনোভাব এক সময় ভেসে গেল। তার মনের অহঙ্কার এই লালসার দাপটে একেবারে নির্মূল হল না, তার অভ্যাস এবং আকার মনে অটুট রইল। দু'মাস ধরে এই দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ব আবেগ তার সমগ্র নৈতিক আদর্শ-বোধ নতুন করে গড়ে তুলেছে।

ম্যাথিলডার বিশ্বাস সুখকে সে চোখের সামনে দেখছে।

একদিন সকালবেলায় মায়ের ঘরে গিয়ে সে বলল যে, সে ভিলিকয়ারে কয়েক-দিনের জন্য বেড়াতে যাবে। মারকুইস তার অনুরোধের জবাবে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না···তাকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। ভয় হয়, সে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে বসবে, কিংবা তাদের সঙ্গে তার মতের মিল হবে না···কেননা ম্যাথিলডার মন বোঝবার মতন বুদ্ধিও তাদের নেই। তবে গাড়ী কিংবা জমিদারী কেনবার প্রয়োজন হলে ম্যাথিলডা ওদের অভিমত নিতে পারে। তার মনে সত্যিকারের ভয় পাছে জুলিয়ান তার উপর অসন্তুষ্ট হয়।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ম্যাথিলডা, সেও কি কেবল আকারের বিচারে সেরা জীব ? চরিত্রহীনতা তার কাছে সব চেয়ে বড় ভয়, তার চারধারের সুদর্শন যুবকদের সম্পর্কে তাই ত তার মনে জমাট বিরোধ। ফ্যাসান-বিরোধী আচার-আচরণ বা ফ্যাসান আয়ত্ত করতে গিয়ে হাস্যকর অবস্থা···এসব নিয়ে ওরা যত গম্ভীরভাবে রসিকতা করে ততই তারা তার অনুগ্রহ হারায়।

ওরা সাহসী, ব্যস ! এটাই সব। আচ্ছা, কোন যুদ্ধে তারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে ? দ্বৈরথে···কিন্তু আজকাল ত দ্বৈরথ একটা নিয়ম-মাফিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনায় কি ঘটবে তা' সবই জানা এবং আহত লোকটা পড়ে গিয়ে কি বলবে তাও। লোকটা ঘাসের উপর দেহ ছড়িয়ে পড়ে যাবে। বুকের উপর রাখবে একখানা হাত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সদাশয় ক্ষমা করবে নিশ্চয়, কোনও সুন্দরী রমণীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই নারী কল্পিত খবর

পাঠাবে…অথবা হয় ত সন্দেহের উদ্রেক করার ভয়ে সেই নারী তার মৃত্যুর দিনেই যোগ দেবে বল-নাচের আসরে।

ঝকঝকে ইস্পাতের অস্ত্রধারী একদল অশ্বারোহীর নায়ক হিসাবে যে কেউ সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু একাকী, অদ্ভুত, অপ্রত্যক্ষ ও সত্যিকারের গুপ্ত বিপদের সম্মুখীন হওয়া?

ম্যাথিলডা মনে মনে বলল—হায়! রাজা তৃতীয় হেনরীর রাজসভায় এ রকম অভিজাত বংশীয় মহান বীর চরিত্রের পুরুষ ছিল। আহা! জুলিয়ান যদি জারনাক্ বা মন্‌কনতুরে লড়াই করত তাহলে ওর সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ দেখা দিত না। সেদিনকার সেই প্রাণ-শক্তি ভরা দিনগুলোতে যে-ফরাসীরা ভয়ানক লড়াই করেছিল তারা কেউ দরজীর দোকানের নকল মূর্তি ছিল না। লড়াইয়ের দিনগুলোতে এতটুকু কম জটিলতা ছিল না।

তাদের জীবন মিশরের মমির মতন নিশ্চল মোড়কে মোড়া একই রকম দেখতে ছিল না। আজকের দিনে আলজিরিয়ায় অভিযানে যাওয়ার চেয়ে তখনকার দিনে ক্যাথারিন গু মেডিসির প্রাসাদ ছেড়ে একাকী ঘরে ফেরা অনেক বেশী সাহসের কাজ ছিল। আকস্মিক বিপদের পর বিপদের ঝুঁকি নিতে হত প্রত্যেক মানুষকে। এখন সভ্যতা এবং প্রধান পুলিশ-কর্তা দেশ থেকে আকস্মিক বিপদ দূর করে দিয়েছে…বিপদ এখন অভাবিত এবং আকস্মিকতা এখন নিয়েছে বিদায়। আমাদের ধারণায় যদি এই আকস্মিকতা গজিয়ে ওঠে, তাহলে মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক উক্তিকে যথেষ্ট বলে মনে করবে না…আর যদি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তবে ভয় হবে ভিত্তিহীন। অধঃপতিত এবং বিরক্তিকর যুগ! আচ্ছা, বনিফেস গু লা মোলের কর্তিত মস্তকটা সমাধি-স্তূপ থেকে উঁচু হয়ে দেখত যে মাত্র দু'দিন পরে তাঁর সতের জন বংশধর ভেড়ার মতন গিলোটিনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে বধ হওয়ার জন্য, তবে কি ভাবত? মৃত্যু ত তাদের কাছে সুনিশ্চিত, কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বা দু'একজন জ্যাকোবিনপন্থীকে হত্যা করা আরও বিশ্রী ব্যাপার। আহা! ফরাসীদেশে বীরদের যুগে এবং যে-যুগে বনিফেস গু লা মোল ছিলেন সে-যুগে জুলিয়ান নির্ঘাৎ মেজর হত এবং আমার দাদা হত মূর্তিমান নীতিবাদ যার দৃষ্টিতে মিতব্যয়িত এবং অধর-যুগলে বিচক্ষণতা এমন একজন যাজক।

কয়েক মাস আগে সাধারণ মানুষ থেকে সামান্য প্রভেদ এমন কারো সাথে মিশতে নৈরাশ্য বোধ করত। সমাজের মাত্র কয়েকজন যুবকের কাছে চিঠি লেখার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছিল আনন্দ। এ ধরনের অস্বাভাবিক সাহসিকতা যা' যুবতীজনের কাছে অবিবেচনা-সুলভ, তার জন্য মারকুইস গু মোল, ক্রয়সিনয় ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে নোংরামি বলে মনে হয়েছিল। এর ফলে যদি নির্ধারিত বিবাহ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেত তবে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। তখন কোন উপলক্ষে একখানা চিঠি লিখে পাঠাবার পর ম্যাথিলডা সারা রাত অনিদ্রায়

কাটাত। তবু এ চিঠিগুলো ছিল জবাবী।

এবং সে সাহস করে এখন বলতে পারে যে সে প্রেমে পড়েছে। এই প্রথম সমাজের নিম্নস্তরের এক পুরুষের কাছে সে চিঠি লিখল। এই সত্য প্রকাশিত হলে তার নামে চিরন্তন দুর্নাম রটবে। তার মায়ের সঙ্গে যে সব মহিলা দেখা করতে আসেন তারা কেউ কি আর তাকে পাশে বসতে দেবে? বসবার ঘরে সবাই তখন ইনিয়ে বিনিয়ে ভাষার তীরে তাকে বিদ্ধ করবে এবং কি ভয়ানক অনুকম্পা দেখাবে?

এমন কি একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলাও বীভৎস ব্যাপার…কিন্তু চিঠি লেখা! 'এমন কতকগুলো ঘটনা আছে যা' লিখতে পারা যায় না!' বেলেন শহর আত্মসমর্পণ করলে নেপোলিয়ন চিৎকার করে এই কথাগুলো বলে উঠেছিলেন। এবং জুলিয়ানই তাকে এই ঘটনাটা শুনিয়েছিল। যেন সে আগে থেকেই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখছিল।

কিন্তু এ সব একেবারে কিছুই না। ম্যাথিলডার চিন্তার অন্য কারণ ছিল। ক্রয়সিনয়দের থেকে ভিন্নতর মানুষদের কাছে চিঠি লেখার জন্য সমাজে তার নামে যে দুরপনেয় কলঙ্ক রটবে সমস্ত সমাজ তাকে ঘৃণা করবে তাই তার মনে চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আজ ম্যাথিলডার প্রেমিক, বোধ হয় তার স্বামী হতে চলেছে। একবার যদি সে পুরোপুরি দখল করতে পারে তাহলে কত কি সে দাবি করে বসবে? আচ্ছা ঠিক আছে, মিডিয়ার মতন নিজেকে বলব: 'এই সব বিপদ-আপদের মধ্যে আমার আত্মা অটুট আছে।'

ম্যাথিলডার বিশ্বাস, অভিজাত বংশের প্রতি কোন মর্যাদা দেখাতে জুলিয়ান এতটুকু ব্যগ্র নয়। তার চেয়েও খারাপ, তার জন্যে ম্যাথিলডা কোন প্রেম অনুভব করে না।

ভয়ানক সন্দেহের শেষ মুহূর্তগুলোতে মেয়েলি-মনের অহঙ্কারবোধ তীব্র হয়ে উঠল। অধীরকণ্ঠে ম্যাথিলডা বলল মনে মনে: আমার মতন মেয়ের জীবনে সব কিছু স্বাভাবিকতা ছাড়া। তার মনের সহজাত অহঙ্কার-বোধ আর তার ধর্ম-প্রবণতার সাথে সুরু হয়েছে বিরোধ। এবং এই সময় জুলিয়ানের প্রস্থান-প্রস্তাব তার মন থেকে সমস্ত বিরোধ দূর করে দিয়েছে।

পরদিন খুব ভোরে জুলিয়ান বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, কেউ তাকে দেখতে পেল না…কিন্তু আটটা বাজার আগে ফিরে এল। সে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় ম্যাথিলডার সঙ্গে তার দেখা হল। জবাবী চিঠিখানা সে ম্যাথিলডার হাতে দিল। সে তার সাথে কথা বলতে চাইল, কিন্তু ম্যাথিলডা না শুনে চলে গেল সেখান থেকে।

এ সব যদি নরবারটের মতলব অনুযায়ী না হয়ে থাকে তবে তার উষ্ণতা-হীন দৃষ্টি ওই অভিজাত বংশীয় মেয়েটির মনে ভালবাসার আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং সে তাই আমার প্রতি অনুরাগ অনুভব করছে। তবে ঐ মোটাসোটা

পুতুলটার প্রতি আমিও যদি অনুরক্ত হয়ে পড়ি তাহলে হয় ত সেটা আমার পক্ষে বোকামি হবে। এমনি ধরনের সব কথা জুলিয়ান ভাবতে লাগল। বিরোধ যখন আরও তীব্র হয়ে উঠবে তখন ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠবে এই বংশ-গৌরবের প্রশ্ন নিয়ে। এই ব্যবধানকে ধূলিসাৎ করতে পারলে তবেই আমরা মিলিত হতে পারব। এ সময় প্যারিসে থাকলে আমি মস্ত বড় ভুল করব। এ সব যদি খেলা হয় তবে এই না-যাওয়ার প্রস্তাবের জন্য আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। আমার প্রস্থানের মধ্যে কি বা ঝুঁকি আছে? ওরা যদি আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করে তাহলে আমিই ওদের বোকা বানাব। আমার প্রতি ওর অনুরাগ যদি সত্যি হয় তবে ওর সেই অনুরাগ শতগুণ বেড়ে যেত আমি চলে গেলে।

তখন ন'টা।

ম্যাথিলডা লাইব্রেরী ঘরে এসে হাজির হল। দরজার কাছ থেকে একখানা চিঠি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে গেল। জুলিয়ান চিঠিখানা কুড়িয়ে নিল। মনে হচ্ছে যেন চিঠির মাধ্যমে একখানা রম্যোপন্যাস লেখা হচ্ছে। শত্রুরা ভুল পথে চলছে, আমি কিন্তু খেলার মধ্যে উষ্ণতা-হীনতা এবং ধর্মপরায়ণতা বজায় রাখব।

উদ্ধত সুর চিঠির ছত্রে ছত্রে···পাকা কথা জানতে চাওয়া হয়েছে। তার অন্তরের উল্লাস বাধা-হীন হয়ে উঠল। জুলিয়ান চিঠির জবাব লিখতে বসল। পুরো দু'পৃষ্ঠায় সে মনের আবেগে অনেক কথা লিখে ফেলল। লিখল, কারা কারা তার সাথে শত্রুতা করছে। শেষে জানাল, পরের দিন সকালে সে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবে। চিঠি লেখা শেষ হলে সে মনে মনে ভাবল: বাগানে গিয়ে ওর হাতে চিঠিখানা দেওয়াই ভাল।

বাগানে বেরিয়ে এল জুলিয়ান। তাকাল ম্যাথিলডার ঘরের জানালার দিকে। দোতলায় ঘর। খুব উঁচু। চিঠি হাতে নিয়ে লেবু গাছের ঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। খিলান-করা ম্যাথিলডার ঘরের জানালাটা এখনও তার নজরের আড়ালে। লেবু গাছের সার যত বিপদে ফেলেছে কি! এখনও আমি বোকামি করছি! ওরা যদি আমার সাথে মজা করার জন্য ফাঁদ পেতে থাকে! আমার হাতে চিঠি···শত্রুদের কবলে এগিয়ে যাচ্ছি হয় ত!

নরবারটের ঘরখানা ওর বোনের ঘরের ঠিক উপরে। লেবু গাছের আড়াল রয়েছে তাই, নইলে এতক্ষণ নরবারট বা তার বন্ধুরা জুলিয়ানকে দেখে ফেলত।

ম্যাথিলডা জানালার কাঁচের আড়ালে এসে দাঁড়াল। হাতের চিঠিখানা তাকে দেখাল জুলিয়ান। সে মাথা নাড়ল। নিজের ঘরে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল জুলিয়ান। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিল সুন্দরী ম্যাথিলডা। হাসিমুখে চিঠিখানা নিয়ে ম্যাথিলডা চলে গেল।

আচ্ছা ছ'মাসের ঘনিষ্ঠতার পর আমার কাছ থেকে চিঠি পেলে মাদাম দ্য

রেনলের চোখ-মুখে কি ধরনের কাম-লালসা ফুটে উঠত! সে কখনও এমন হাসি হাসি চোখে আমার দিকে তাকায় নি।

ঠিক পাঁচটার সময় জুলিয়ান তৃতীয় চিঠি পেল। মাদমোজায়েল চিঠিখানা লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। হাসল জুলিয়ান। মনের কথা বলার এমন সহজ সুযোগ রয়েছে, তবু চিঠি লেখার কি দুরন্ত ইচ্ছা! এটাই স্পষ্ট যে, শত্রুরা আমার হাতে লেখা অনেক চিঠি এখনি হাতে পেতে চায়! এই চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খোলার জন্য তাই সে ব্যগ্র হল না। হয় ত আরও সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু একসময় চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চিঠিখানা খুবই ছোট:

> কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে; আজ রাতেই বলব কথা।
> রাত একটা বাজলেই বাগানে আসবে। পাতকুয়ার কাছে
> রাখা মালির লম্বা মইখানা নেবে: আমার ঘরের জানালায়
> মই লাগাবে এবং আমার ঘরে ঢুকবে। আজ রাতে কিন্তু
> চাঁদ উঠবে, তাতে কিছু এসে যাবে না।

১৫: এটা কি অভিসন্ধি?

> **আহা! মহান দুঃসাহসিকতা আর মৃত্যুদণ্ডের ধারণার মধ্যে ব্যবধান-মুহূর্তটুকু কি নিষ্ঠুর! কি নিরর্থক ভয়াবহতা! কি দ্বিধা-জড়িমা! জীবন ত বিপদাপন্ন! কিন্তু জীবনের চেয়ে অনেক বেশী…সম্মান!**
>
> **—শিলার**

জুলিয়ান ভাবল, ব্যাপারটা বড় সঙ্গীন হয়ে উঠেছে…একেবারেই সরল। একটু ভাবলেই সব বোঝা যাবে। কি! এই সুন্দরী তন্বী ত ইচ্ছে করলে লাইব্রেরী ঘরে আমার সাথে কথা বলতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিত না। পাছে আমি তাঁকে তাঁর হিসাবের খাতা দেখাই তাই কিছুতেই তিনি লাইব্রেরী ঘরে ঢোকেন না। একমাত্র নরবারট আর মাদমোজায়েল হামেশা এ ঘরে আসে সারা-দিন ধরে। তাদের প্রস্থানপর্বও সীমিত। আর সুন্দরী ম্যাথিলডা, রাজাও যার কাছে যথেষ্ট অভিজাত নয়…সেই ম্যাথিলডা আজ আমার কাছে ধরা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।

এটা পরিষ্কার যে ওরা আমার সর্বনাশ করতে চায়, অন্ততঃ চায় আমাকে বোকা বানাতে। প্রথমে আমার চিঠিগুলো সংগ্রহ করে আমার সর্বনাশ করবে… এগুলো ওদের সতর্ক করে তুলবে। তবে ওদের মনে যে একটা অভিসন্ধি আছে তা' দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। এই সুদর্শন ক্ষুদে ভদ্রলোকেরা আমাকে হয়

নির্বোধ আর না হয় খুব দাম্ভিক মনে করছে। চুলোয় যাক এ সব! তবে এমন ধবধবে চাঁদনী রাতে মই বেয়ে পঁচিশ ফুট উঁচুতে দোতলা ঘরে ঢুকতে হবে। লোকে আমাকে দেখবার যথেষ্ট সময় পাবে, এমন কি আশ-পাশের লোকদের নজরেও পড়ে যাব! মইয়ের উপর আমাকে চমৎকার দেখাবে, তাই না! নিজের ঘরে ঢুকে জুলিয়ান নিজের বাক্স গোছগাছ করতে লাগল। কাজ করতে করতে আপন মনে শিস্ দিচ্ছিল। তাই ঠিক করল চিঠির কোন জবাবই দেবে না।

কিন্তু মনের এই বিচক্ষণ মনোভাব তার অন্তরে শান্তি দিতে পারল না। বাক্স বন্ধ করে সে ভাবল, ধরলাম ম্যাথিলডা ভাল মনেই এসব করছে! আর তা' যদি হয় ত ওর চোখে আমি একটা মস্ত বড় কাপুরুষ! কাজেই আমাকে শৌর্যের পরিচয় রাখতে হবে, কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে জাহির করতে হবে··· ।

ঘণ্টাখানেক ধরে সে সব ব্যাপারটা ভাবল। মনে মনে বলল, এটা অস্বীকার করে কি ভাল হবে? ওর চোখে আমি হব একজন কাপুরুষ। আমি শুধু তার ফলে সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রয় হারাব না, ডিউকের ছেলে এবং একজন ভবিষ্যৎ ডিউক মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়ের পরাজয় দেখার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হব। সুন্দর, দর্শন, মনোহর যুবক···আমার নেই কিন্তু ওর সব গুণ রয়েছে··· উপস্থিত বুদ্ধি, বংশ-গরিমা···।

এর জন্য সারা জীবন আমাকে অনুশোচনা করতে হবে···অবশ্য ওর মতন সুন্দরী তরুণীর জন্য এই অনুশোচনা করতে হবে না, কেননা গণ্ডা গণ্ডা সুন্দরী রয়েছে সমাজে···অনুশোচনা করতে হবে আত্ম-সম্মানের জন্য। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাই মুচড়ে পড়ছে! এর তুলনায় ব'ভয়সিসের সঙ্গে দ্বৈরথ ছিল একেবারে ছেলেখেলা। এ অন্য বস্তু! আমাকে দেখেই চাকর-বাকর কেউ অতি কাছ থেকে নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারে। কিন্তু তা' তুলনায় সামান্য বিপদ··· আমার সম্মান হারাতে পারি!

সে এবারে সোচ্চারে বলে উঠল—'ওহে ছোকরা, ব্যাপারটা যে সঙ্গীন হয়ে উঠছে! সম্মান বিপন্ন। আমার মত সমাজের নিম্ন-স্তরে জাত কোনও লোকের পক্ষে সমাজের চুড়োয় উঠবার এমন একটা সুযোগ আর আসবে না। অন্য রমণীর সাহচর্য লাভে আমি সফল হলেও আমি হতে পারি কিন্তু সে হবে নিম্নস্তরের রমণী। এমন রমণী-রত্ন নয়।

দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজের ঘরের মধ্যে সে পায়চারী করতে লাগল···কখনও জোরে জোরে হাঁটছে···আবার কখনও থেমে পড়ছে। অবশেষে জুলিয়ান ভাবল, ধরলাম এটা একটা জঘন্য অভিসন্ধি! কিন্তু একটি সুন্দরীর পক্ষে এটা বিপজ্জনক কাজ। ওরা ত ভালভাবেই জানে যে, আমি চুপ করে থাকার পাত্র নই। কাজেই ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। এমন কাজ বনিফেস মোলের সময় শোভা পেত। কিন্তু সারকুইস একাজ করতে এখন সাহস করবেন না। এরা আর এখন আগের

মতন নেই। মাদমোজায়েলকে এখন সবাই কত ঈর্ষা করে। আগামীকাল শহরের সব বসবার ঘরে তার সম্বন্ধে দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়বে ··তার লজ্জা নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে সবাই খুশি হবে।

এ বাড়ীতে আমাকে যে খাতির দেখানো হয় তা' নিয়ে চাকর-বাকররা আলোচনা করে। জানি···নিজের কানে শুনেছি ওদের আলোচনা··।

অন্যদিকে তার চিঠিগুলো।···ওরা বিশ্বাস করতে পারে যে ওগুলো আমার কাছেই আছে। ওর ঘরের মধ্যে ওরা আমাকে পাকড়াও করতে পারলে চিঠিগুলো কেড়ে নেবে। দু' তিন চার কে জানে কত জনের সঙ্গে আমাকে লড়তে হবে? কিন্তু ওরা এত লোক এখানে পাবে কোথায়? কোন লোককে অসম্মান করতে পারে বা দুর্ণাম ছড়াতে পারে এমন ভাড়াটে লোক প্যারিতে কোথায় পাওয়া যাবে? ওরা আইন-আদালতকে বড় ভয় পায়···হায় ঈশ্বর! কেন ক্রয়সিনয় আর তার বন্ধুরা ত রয়েছে! যে ঘটনার আমি সূত্রপাত করব এবং যে বিশ্রী বোকার মতন অবস্থা আমার হবে তা' দেখেই ওরা এগিয়ে আসবে। ওহে সেক্রেটারি পুঙ্গব একটু সাবধান হও!

ঠিক আছে, চুলোয় যাক সব! আমার হাতেরও কিছু চিহ্ন পাবে, ফারসলিয়াতে সিজারের সৈনিকদের মতন আমি ওদের মুখে আঘাত হানব··· আর চিঠিগুলো কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখব।

জুলিয়ান শেষ চিঠি দু'খানার অনুলিপি বানাল, সে দু'খানা লাইব্রেরী ঘরে ভলতেয়ারের সুন্দরভাবে বাঁধানো রচনাবলীর মধ্যে রাখল লুকিয়ে। আর আসল দু'খানা ডাকে পাঠিয়ে দিল ফৌকের কাছে।

ফিরে এসে সে বিস্ময়ে ত্রাসে বলে উঠল—'এখন কি ভয়ানক পাগলামিতে আমায় পেয়ে বসেছে?' মন ঠাণ্ডা রেখে কোন কিছু গভীরভাবে ভাবতে পারছে না, কি করতে চলেছে সে আজ রাতে! মিনিট পনের সে চুপচাপ বসে রইল।

কিন্তু আজ রাতে যদি ভালভাবে ফিরে আসি তবে পরে এর জন্যে নিজেকে ঘৃণা না করে পারব না। সারা জীবন ধরে এই কাজ সন্দেহের কাঁটা হয়ে বিঁধবে আমার অন্তরে···আমার কাছে এই সন্দেহের অর্থ মনোবেদনা। আমানদার প্রেমিক সম্বন্ধেও এই সন্দেহ আমার অন্তরে ছিল না? আমার বিশ্বাস, প্রকাশ্যে কোন পাপ কাজ করলে একদিন নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব, পাপ স্বীকার করতেও সক্ষম হব। একদিন ভুলেও যাব।

কি! আমার ভাগ্য কি বিস্ময়করভাবে জনারণ্যের ভিতর থেকে আমাকে উঁচুতে টেনে তুলেছে, ফরাসীদেশের এক নামজাদা পুরুষের মুখোমুখি আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে···এবং এখন আমি কি হালকা গলায় বলতে পারি যে আমি তার তুলনায় নগণ্য! যাহোক, এখন না যাওয়া কাপুরুষতা! লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জুলিয়ান আওড়াল—'ব্যস! ওই একটা শব্দ সব কিছু সমস্যার সমাধান করল···তাছাড়া সে অত বড় সুন্দরী কন্যা!'

এর মধ্যে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না থাকে, তবে কি বোকামি না সে আমার জন্তে করছে!…হায় ঈশ্বর! এটা যদি বাস্তবে একটা রসিকতা হয়! ভদ্রলোকেরা, তখন তাহলে আমার পালা! প্রাণপণে এই রসিকতার প্রতিদান দেব…এবং তা' আমি দেবই।

কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ঘরে ঢুকব সেই মুহূর্তে ওরা যদি আমাকে চেপে ধরে বেঁধে ফেলে? ওরা ঘরের মধ্যে কোন রকম ফাঁদও পাততে পারে।

এ যেন এক দ্বৈরথ সমর…আঘাত যেমন আছে, তেমনি আছে প্রত্যাঘাত। কে আর চায় তার মরণ হোক…এই দু'জনের মধ্যে একজন আঘাত সামলায়। তাছাড়া ওদের জবাব দেওয়ার মতন হাতিয়ার ত রয়েছে আমার কাছে। পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা বার করল। চেম্বারে গুলি নেই দেখে আবার গুলি ভরে নিল।

হাতে এখনও অনেক সময় রয়েছে, তাই ফৌকেকে চিঠি লিখতে বসল:

> বন্ধু, একমাত্র দুর্ঘটনা ঘটলে তবে সঙ্গের বন্ধ খামখানা খুলবে, যদি শোন যে, আমার জীবনে বিস্ময়কর কিছু ঘটেছে তবেই। এবং তাহলে যে পাণ্ডুলিপি পাঠাচ্ছি তা' থেকে আমি শব্দটা সব জায়গায় বাদ দেবে, তারপর তোমার লেখার আটখানা অনুলিপি বানিয়ে আটটা শহরের খবরের কাগজের অফিসে পাঠাবে। দিন দশেক পরে এই পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে একখানা শুধু মহামান্য মারকুইস দ্য মোলকে পাঠাবে। আরও পনের দিন পরে অবশিষ্ট ছাপা কাগজগুলো ভেরিয়ার শহরের রাস্তায় বিলি করবে।

তারপর সে মাদমোজায়েলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কাহিনী সবিস্তারে লিখল, যতটা সম্ভব নিজের অবস্থা খুলে বলল…এ চিঠি তার জীবনে কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ফৌকে খুলে পড়বে না।

জুলিয়ান খামের মুখ আঁটছিল এমন সময় ডিনারের ঘণ্টা বাজল। বাড়ল তার বুকের গতি। এইমাত্র যে কাহিনী সে লেখা শেষ করেছে তারই রেশ তার মন ভরে রেখেছে, ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করছে সে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চাকররা তার গলা টিপে ধরেছে এবং মুখের মধ্যে কিছু পুরে দিয়ে চোর-কুঠরিতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন তার উপর নজর রেখেছে এবং সম্ভবত নজর রেখেছে এই পরিবারের সুনামের উপরও…তার জন্যে প্রয়োজন হলে বিষ প্রয়োগ করবে এবং সেই বিষের কোন চিহ্ন থাকবে না। তারপর ওরা তার দেহ তার ঘরে রাখবে, রটিয়ে দেবে যে, সে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে।

এ যেন নিজের কাহিনীর নাট্যরূপ দেখে জুলিয়ান নিজেই বিচলিত, সে তাই খাওয়ার ঘরে ঢুকতে ভীত হয়ে পড়েছে। চাকর-বাকররা তাদের পোশাক পরে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত…ওদের মুখের দিকে তাকাল জুলিয়ান।

আচ্ছা, আজকের রাতের অভিযানে কাকে কাকে বেছে নেওয়া হয়েছে? এই পরিবারের তৃতীয় হেনরীর রাজসভার স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে··· তাই কোন কারণে এদের কেউ কুপিত হলে সমাজের অন্যদের মতন সেই কোপ প্রকাশ না করে কঠিন শপথ নিয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে চায়। মাদমোজায়েলের দিকে তাকাল জুলিয়ান, তার পরিবারের লোকেরা কি মতলব করেছে তারই ইঙ্গিত বুঝি ওর দৃষ্টির মাঝে সে অন্বেষণ করছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মাদমোজায়েল, তাই তার মুখের আকৃতি কেমন মধ্যযুগীয় মনে হচ্ছে। ওর এমন সৌন্দর্য কখনও এর আগে জুলিয়ানের নজরে পড়ে নি। সত্যিই ও লাবণ্যময়ী, এবং মনোলোভা। মনে মনে সে আওড়াল, 'পল্লিদা মর্তে ফিউতুরা' (তার মুখের পাণ্ডুবর্ণ তার গভীর অভিপ্রায় জাহির করছে।)

খাওয়ার শেষে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে কিছুটা সময় বাগানে বসে রইল···কিন্তু মাদমোজায়েল এল। এ সময় ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলে বুকের ভার কিছুটা লাঘব হত।

একথা স্বীকার করছে না কেন? জুলিয়ান ভয় পাচ্ছে। এ কাজ যখন সে করতে চলেছে তখন কুণ্ঠাহীনভাবে এই কথা সে ভাবতে পারে। যেন কাজের সময় কাজ করবার মনের বল সে খুঁজে পায়···এ সময় কি ভাবছে না ভাবছে তাতে কি এসে যায়? সে সরেজমিনে জায়গাটা দেখার জন্যে এবং মইখানার ভার পরখ করার ইচ্ছায় এগিয়ে গেল।

হেসে ভাবল জুলিয়ান, এই একখানা হাতিয়ার ঘরে ব্যবহারের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে।···এখানেও যেমন, ভেরিয়ার শহরেও তেমন! তবু কত প্রভেদ! তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল···যার জন্যে আজ বিপদের ঝুঁকি নিতে চলেছি তাকে সন্দেহ করতে এর আগে বাধ্য হই নি। এবং বিপদের চেহারাতেও কত না প্রভেদ!

কোন রকম অসম্মানের ঝুঁকি না থাকলেও সে রাতে আমি মঁসিয়ে রেনলের বাগানে খুন হতে পারতাম। আমার মৃত্যু দুর্বোধ্য করে তোলা খুবই সহজ হত। অথচ এখানে বসবার ঘরে তারা কত না কাহিনী গড়ে তুলবে। আগামী দিনের মানুষদের কাছে আমি একটা দানব বলে পরিচিত হব!

অথবা দু'চার বছর লোকে তাকে দেখে হাসবে। তার এই ভাবনা তাকে বিচলিত করল। ভাবল, আমার অবস্থার সুবিবেচনা করবে এমন লোক কোথায় পাব? এমন কি আমার মৃত্যুর পর ফোঁকে যদি পুস্তিকা ছাপায় তাতে দুর্নাম আরও ছড়িয়ে পড়বে। বেইমানি করা হবে। কি! যে-বাড়ীতে আমি আশ্রয় পেয়েছি, ওরা সদয় ব্যবহারে আমার জীবন ভরে দিয়েছে···আর সেই অতিথি সৎকারের বিনিময়ে এই মূল্য দিলাম আমি···এখানে যা ঘটেছে তাই নিয়ে পুস্তিকা লিখলাম! নারীর সম্মানে আঘাত হানলাম! আহা! এর চেয়ে বরং আমি যেন হাজার বার বোকা বনে যাই!

সেই সন্ধ্যাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

১৬ : রাত একটা

এই উদ্যান খুবই বিশাল, এবং কয়েক বছর আগে নিখুঁত পছন্দ করে এটা বানানো হয়েছে। তবে এখানকার গাছগুলোর বয়স শত বছরের ওপর। তাই এখানে একটা গ্রাম্য ভাব।

—ম্যাসিনজার

তার আগের উপদেশ মতন কাজ না করার জন্য জুলিয়ান ফৌকেকে চিঠি লিখতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘড়িতে বাজল রাত এগারটা। সশব্দে তালায় চাবি ঘোরাল। যেন ঘরের ভিতর থেকে সে দরজার তালায় চাবি দিচ্ছে।... ঘরে সে বন্দী। তারপর চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় কি ঘটছে তা দেখবার জন্যে বাড়ীর চারধারে গুঁড়ি মেরে ঘুরতে লাগল। বিশেষ করে নজর রাখল বাড়ীর পাঁচতলায়, ওখানে চাকর-বাকররা থাকে। অস্বাভাবিক কোনও কিছু ত ঘটবে না। কেবল মাদাম মোলের ঝি একটু পান উৎসবের ব্যবস্থা করেছে, সবাই আনন্দে মদ পান করছে। জুলিয়ান ভাবল, যারা আজকের রাতের অভিযানে যোগদানের জন্য বাছাই হয়েছে তারা এভাবে হাসাহাসি করতে পারে না। তারা আরও গম্ভীর হত।

অবশেষে বাগানের একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে সে ঘাপটি মেরে বসল। ওদের যদি মতলব হয়, বাড়ীতে চাকরদের ঘরে লুকিয়ে থাকবে এবং সহসা আমাকে পাকড়াও করবে তবে নিশ্চয় ওরা একবার বাগানে বেরিয়ে আসবে আমার গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্যে। এবং এই পাকড়াও করবার কাজটার ভারটা যদি ক্রয়সিনয় নিয়ে থাকে তবে সে নির্ঘাৎ তার বিবাহের পাত্রীর সাথে আমি কিছু করবার আগে সে আমাকে ধরবে। কাজেই জুলিয়ান সামরিক কায়দায় সমস্ত অবস্থাটা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করল। সে ভাবছিল আমার সম্মান বিপন্ন। আমি যদি একাজ থেকে বিচ্যুত হই তবে নিজেকে ভোলাবার জন্যে আমি কোন রকম ওজোর খুঁজে পাব না, বলতে পারব না এ ব্যাপারটা ত আমি ভাবি নি।

আবহাওয়া নৈরাশ্যজনকভাবে পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত। রাত এগারটার সময় আকাশে চাঁদ উঠল। আর ঠিক সাড়ে বারটার সময় বাগানের দিকে বাড়ীর অংশ চাঁদের আলোয় আলোময় হল। জুলিয়ান ভাবল, মেয়েটার মাথা খারাপ। রাত একটা বাজল, কিন্তু তখনও নরবারটের ঘরে আলো জ্বলছে— জানালা খোলা। আজকের অভিযান সত্যিই বিপজ্জনক এবং মনে সে একটুও

উৎসাহ পাচ্ছে না। এমন ভয় সে জীবনে আর কখনও পায় নি।

দারুণ ভারি মইখানা সে আনতে গেল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করল। তাকে বাধা দেওয়ার জন্যে কাউকে হুকুম করা হচ্ছে কি না শুনতে চাইল এবং ঠিক একটা বেজে পাঁচ মিনিটে সে ম্যাথিলডার ঘরের জানালায় মই লাগাল। নিঃশব্দে মই বেয়ে উপরে উঠল। তার এক হাতে পিস্তল। কেউ আক্রমণ করতে আসছে না দেখে অবাক হল। সে জানালার ধারে পৌছুতে জানালাটা নিঃশব্দে খুলে গেল।

ম্যাথিলডা গভীর আবেগে বলে উঠল—'তাহলে তুমি এলে মশাই। ঘণ্টাখানেক ধরে তোমার গতিবিধির উপর নজর রেখেছি।'

গভীর লজ্জায় বিচলিত হয়ে পড়ল জুলিয়ান। জানে না এমন অবস্থায় কি করবে। তার অন্তরের কোথাও যেন ভালবাসার এতটুকু চিহ্ন নেই। বিচলিত অবস্থায় সাহস দেখাতে হবে এ কথাটা মনে হতেই সে ম্যাথিলডাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চেষ্টা করল।

তাকে সজোরে ঠেলে দিয়ে ম্যাথিলডা বলল—'না গো, না।'

এভাবে বাধা পেয়ে জুলিয়ান দারুণ সোয়াস্তি পেল, চারধারে নজর বুলিয়ে নিল। বাইরে ধবধবে জ্যোছনার আলো থাকলেও ম্যাথিলডার ঘরখানা অন্ধকারে ভরা। গাঢ় কালো অন্ধকার। ভাবল, আমি না দেখতে পেলেও এ ঘরে অনেকে হয় ত আত্মগোপন করে আছে।

—'তোমার কোটের পাশ পকেটে কি আছে গো?' ম্যাথিলডা জিজ্ঞাসা করল। কথা -সুরু করার একটা বিষয় পেয়ে সে দারুণ খুশি হল। সে বিস্ময়করভাবে মনে মনে বিষণ্ণ। তার মতন উচ্চ-বংশ-জাতা একজন তরুণীর মনে যতটুকু গাম্ভীর্য আর লাজুকতা থাকার কথা তা' তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, অস্থির করে তুলেছে।

কথা বলার সুযোগ লাভ করে তারও মনের ভার খুব একটা লাঘব হল না, জুলিয়ান কেবল জবাব দিল—'আমার পকেটে সব রকম অস্ত্র আর পিস্তল রয়েছে।'

—'মইখানা সরাও।'

—'এটা ভীষণ বড আর ভারি, নীচের বসবার ঘরের জানালার কাঁচ বা পাল্লা ভেঙ্গে যেতে পারে।'

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ফিরে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করে ম্যাথিলডা বলল—'দেখ, জানালার কাঁচ ভেঙো না। মইয়ের শেষ ধাপে দড়ি বেঁধে মনে হয় ওখানা তুমি নীচে নামাতে পারবে। আমার ঘরে অনেক দড়ি রাখা আছে।'

প্রেমে পড়লে মেয়েরা এমনি হয়। সাহস করে বলছে, আমি ভালবেসেছি! ওর এই উপস্থিত বুদ্ধি আর সতর্ক হওয়ার প্রচেষ্টা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বোকার মতন ভাবলে ক্রয়সিনয়কে আমি হারাতে

পারব না, বরং আমি তার পরবর্তী প্রেমিক হতে পেরেছি। তাই আমার ভাবনা যে, আমি তার পরবর্তী মনের মানুষ শুধু। কি ভয়ানক রাগত-চোখে কাল কাফে টরটনিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল! ভান করছিল যেন সে আমাকে চেনে না। আর যখন আমাকে এড়াতে পারে নি তখন কি কঠোর ভঙ্গিমায় সে আমাকে অভিবাদন জানিয়েছিল!

জুলিয়ান মইয়ের শেষ ধাপে দড়ি বাঁধল এবং যাতে জানালার কাঁচে ধাক্কা না লাগে তাই বারান্দা থেকে দেহ ঝুঁকিয়ে মইখানা বাগানে রাখল। ভাবল, আমাকে মারবার এই উপযুক্ত সময়। ম্যাথিলডার ঘরে কেউ লুকিয়ে থাকলে এই সুযোগ সে নিতে পারে। কিন্তু চারধারে ত গভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

মইখানা মাটিতে ঠেকল। দেওয়ালের ধারের ঝোপে জুলিয়ান মইখানা শুইয়ে রাখল।

ম্যাথিলডা বলল—'তাঁর সুন্দর গাছগুলো থেঁৎলে গেছে দেখলে আমার মা কাল কি বলবেন—এবার দড়ি ফেলে দাও। কেউ বারান্দায় উঠবার চেষ্টা করছিল এটা বোঝাতে অসুবিধা হবে না।' খুব ঠাণ্ডা গলায় সে কথা বলছিল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জুলিয়ান—'কেমন করে যাব আমি?'

—'দরজা দিয়ে যাবে।' জবাব দিল ম্যাথিলডা। নিজের প্রস্তাবে নিজেই খুশি হল। আহা! আমার প্রেমের পক্ষে এই পুরুষ কত যোগ্য!

জুলিয়ান দড়িটা বাগানে ফেলে দিল। এবার ম্যাথিলডা তার হাত জড়িয়ে ধরল। জুলিয়ান ভাবল, যেন কোন শত্রু তার হাত ধরেছে। অমনি হাতে ছোরা বাগিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। আর ম্যাথিলডার মনে হল যেন সে জানালার সার্সি খোলার আওয়াজ শুনেছে। ওরা দু'জনেই নিথরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, আর আওয়াজ হচ্ছে না। চারধারে ধবধবে জ্যোছনা। ওদের দেহে আলো লুটিয়ে পড়েছে। আর ত কোন আওয়াজ নেই···তাই ভয়েরও কোন কারণ নেই।

আবার দু'জনেই লজ্জায় অভিভূত হল। জুলিয়ানের ধারণা, দরজায় ভালভাবে খিল আটকানো হয়েছে। বিছানার তলাটা তার পরখ করার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না, দু' একজন চাকর ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে।

ম্যাথিলডার মন সব রকম লজ্জার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে। নিজের সঙ্গীন অবস্থার জন্য সে লজ্জিত।

অবশেষে সে জানতে চাইল—'আমার চিঠিগুলো কি করেছ?'

এই ভদ্রলোকদের সুযোগ ব্যর্থ করার কি সুন্দর সুযোগ এসেছে। ওরা যদি লুকিয়ে থেকে থাকে এখানে তবে আর লড়াই করতে হবে না! তাই বলল—'প্রথম চিঠিখানা একখানা প্রোটেস্টাণ্ট বাইবেলের মধ্যে পুরে অনেক দূরে ডাকে একজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

জুলিয়ান সতেজ আর স্পষ্ট গলায় সব কিছু বলল। ওই যে মেহগনি কাঠের দুটো বড় পোশাকের আলমারি রয়েছে ও দু'টোর আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকলে সে তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাবে···কিন্তু ওগুলো সে পরীক্ষা করে দেখার সাহস পায় নি মনে।

—'অন্য দু'খানাও ডাকে ফেলেছি, ওরাও একই জায়গায় যাচ্ছে।'

ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল ম্যাথিলডা—'কি ব্যাপার! এত সাবধানতা কেন?'

আচ্ছা ওর কাছে আমার মিথ্যা বলার কি কোনও কারণ আছে? ভাবল জুলিয়ান। তারপর সব সন্দেহের কথা স্বীকার করল।

—'ওগো, তাই বুঝি অমন রসকসহীন চিঠি লিখেছ?' ম্যাথিলডা সোচ্চারে বলল। তার কণ্ঠে কোমলতার চেয়ে বন্য উত্তেজনার অধিক স্পর্শ।

এমন সুন্দর কণ্ঠস্বরের পার্থক্য কিন্তু জুলিয়ান বুঝতে পারল না। একান্ত জনের মতন এখনি ম্যাথিলডা তাকে সম্বোধন করেছে···'ওগো!' আর তাই শুনে তার মাথা বিগড়ে গেছে। অন্ততঃ এক ফুঁয়ে তার মন থেকে সন্দেহের মেঘ গেছে ভেসে। তাই এই সুন্দরী তন্বীর অনুপম দেহ দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরতে সে সাহসী হল। তার ভালবাসার আঁচ পেয়ে সে উৎসাহিত হল। এবারে সে মৃদু বাধা পেল।

জুলিয়ান আতুরে গলায় বলল—'ওগো, দেখছি সাহসী পুরুষের হৃদয় তোমার! স্বীকার করছি, তোমায় পরখ করতে চেয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম তোমার মনের সাহস। তোমার প্রথম সন্দেহ আর দৃঢ়তা প্রমাণ করছে আমি তোমার সম্বন্ধে যা' ভেবেছিলাম তুমি তার চেয়েও সাহসী।'

ম্যাথিলডা অন্তরঙ্গ কণ্ঠে কথা বলতে চাইছিল। এমন কণ্ঠে কথা বলতে সে ত অভ্যস্ত নয়···তাই ঠিক কি বলা উচিৎ তা বুঝতে পারছে না। ওর এই আদরে তাই কোমলতার স্পর্শ নেই। প্রথম আদরের পর আর তেমন ভাল লাগছে না জুলিয়ানের, তার মনে আনন্দের সাড়া জাগছে না। আর তাই আনন্দের কমতি অনুভব করে অবাক হচ্ছে জুলিয়ান। অবশেষে আনন্দের সাগরে ভাসার জন্য সে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করল। এই অহঙ্কারী তন্বী ত জীবনে কখনও কাউকে লাগামহীনভাবে ভালবাসে নি, কাউকে আদর করে নি···তাই এই যুক্তিকে অবলম্বন করে আপন ভালবাসার বিনিময়ে আনন্দ উপভোগ করতে চাইল জুলিয়ান।

এটা সত্যি কথা, মাদাম রেনলের সঙ্গে সঙ্গমে যে অপার আনন্দ সে উপভোগ করেছিল এই আনন্দ তত তীব্র নয়। প্রথম দিনের সহবাসের মধ্যে সে কোমলতার কোন স্পর্শ লাভ করতে পারল না। এ যেন উচ্চাশার পরিতৃপ্তি-জনিত আনন্দ···অথচ এই মুহূর্তে জুলিয়ানের মনে কোনও উচ্চাশার স্থান নেই। সে যাদের সন্দেহ করে, যাদের সম্বন্ধে সে সাবধানতা অবলম্বন

করেছে সেই কথাই আবার সে বলতে লাগল। এবং বলতে বলতে ভাবছিল যে, কিভাবে এই জয়ের সুযোগ গ্রহণ করবে।

যে কাজ সে করেছে তারই বিস্ময়ে ম্যাথিলডা অভিভূত…এখন কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে সে দারুণ খুশি হয়ে উঠল। আবার তারা কোথায়, কিভাবে মিলিত হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল। নিজের বুদ্ধি এবং সাহসের পরিচয় দিয়ে জুলিয়ান দারুণ আনন্দিত, সে এখন আরো সাহসের পরিচয় দিতে প্রস্তুত। কেননা অত্যন্ত দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকদের সঙ্গে তাদের লড়তে হচ্ছে। তবে তাদেরও বুদ্ধি কম তীক্ষ্ন নয়। লাইব্রেরী ঘরে মিলিত হয়ে ব্যবস্থা করা কি সহজ হবে?

জুলিয়ান বলল—'দেখ, কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক না করে এ বাড়ীর যে কোন স্থানে আমার যাওয়ার সাহস আছে। এমন কি মাদাম মোলের শোবার ঘরেও ঢুকতে পারি।' এটা সত্য যে, ম্যাথিলডার ঘরে ঢুকতে হলে তার মায়ের ঘর পার হয়ে যেতে হয়। অবশ্য ম্যাথিলডা যদি চায় যে, প্রতিবার মই বেয়ে সে তার ঘরে ঢুকবে তাহলে অন্তরে বন্য উন্মত্ত আনন্দ লাভের জন্য এই সামান্য বিপদের ঝুঁকি নিতে জুলিয়ান সদা প্রস্তুত।

তার সাথে কথা বলতে বলতে ম্যাথিলডা বুঝতে পারল যে, সে তাকে জয় করেছে। তাহলে এখন সে তার স্বামী! মনে মনে ভাবল। ধীরে ধীরে তার মন থেকে বিষণ্ণতা লোপ পাচ্ছে। এটা কি তবে সম্ভব হল যে, সে নিজেকে এবং জুলিয়ানকে নষ্ট করল।

অনেকক্ষণ শৃঙ্গার করার পর ওদের মধ্যে যে ঘৃণার ভাবটুকু ছিল তা উবে গেল, জুলিয়ানের একান্ত চাওয়ার কাছে অবশেষে ম্যাথিলডা নতি স্বীকার করল। এবং জুলিয়ানের মনে হল এমন কন্যা তার প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী। তাদের দেহমিলন কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে ঘটল। কাম-লালসার চিহ্ন ছিল না, যেন তারা ভালবাসার অনুকরণ করল।

ম্যাথিলডার মনে হল তার নিজের এবং জুলিয়ানের প্রতি তার যে কর্তব্য ছিল তা' সে পালন করেছে। জুলিয়ান তার মনের মানুষ। এই গরীব ছোকরা তাকে পাওয়ার জন্য অজস্র সাহস দেখিয়েছে তাই তাকে আনন্দদান করা তার কর্তব্য। নইলে আমি চরিত্রবলের পরিচয় দিতে পারব না। আর তাই তার মনের বিষণ্ণ আবেগ ভয়ানক নিষ্ঠুরতাকে সে দমন করল। কোন রকম মানসিক অনুশোচনা বা দোষারোপ-প্রবণতা আজকের রাতের আনন্দ নষ্ট করতে পারল না, বরং আরও আনন্দঘন হয়ে উঠল…এবং এটাই বিচিত্র মনে হল জুলিয়ানের কাছে। হায় ঈশ্বর! ভেরিয়ারে শেষ চব্বিশ ঘণ্টা থাকার সময় থেকে এখনকার এই সময়টার কত না প্রভেদ! যেন নিজের উপর খানিকটা অবিচার করে ও ভাবল, প্যারির এই প্রথাসমূহ সব কিছুর গোপনতা নষ্ট করেছে…নষ্ট করেছে প্রেমের গোপনতাকেও।

ঠিক পাশের ঘরখানায় থাকেন মাদাম স্থ লা মোল। ওঘরে একটা আওয়াজ হতেই বিশাল মেহগনি কাঠের পোশাকের আলমারির একটার মধ্যে সে সেঁধিয়ে পড়ল এবং ওখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। স্বল্প পরেই ম্যাথিলডা তার মায়ের সঙ্গে প্রার্থনা সভায় চলে গেল। এ ঘর ছেড়ে ঝি চাকররা চলে গেল···এবং তারা ফিরে আসবার আগেই জুলিয়ানও সরে পড়ল।

ঘোড়ায় চড়ে প্যারি শহরের শহরতলিতে সবচেয়ে নির্জন বনাঞ্চলে ঘুরতে চলে গেল জুলিয়ান। আনন্দের চেয়েও সে বেশী বিস্ময় অনুভব করছে। এ কেমন ধরনের বিস্ময়! যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্ময়কর লড়াইয়ের পর সেনাপতি যখন ক্ষুদে অফিসারকে কর্ণেলের পদে নিযুক্ত করে তখন যেমন সেই ক্ষুদে অফিসার খুশি হয় তেমনি খুশি-খুশি ভাব মাঝে মাঝে মনে অনুভব করছে জুলিয়ান। সে যেন খুব উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠেছে···অথচ গতকাল সে ছিল পাহাড়টার একদম নীচে···পাদদেশে। প্যারি থেকে সে যত দূরে চলে যাচ্ছে তার মনে ততই আনন্দের অনুভূতি বাড়ছে।

কোমলতার ভাব মনে না থাকলেও ম্যাথিলডা আচরণের দ্বারা তার কর্তব্য-নিষ্ঠা প্রকাশ করেছে। কাল রাতের পর নিরানন্দ এবং লজ্জা ছাড়া আর কিছুই ম্যাথিলডার আচরণে অদৃশ্য নয়···আর উপন্যাসে ত এমনটাই লেখা হয়।

ম্যাথিলডা মনে মনে ভাবছিল, আমি কি ভুল করেছি? এমন কি হতে পারে যে, সে আমাকে ভালবাসে না?

১৭ঃ একখানা পুরনো তরোয়াল

> **এখন আমি আন্তরিকতা বোঝাচ্ছি···এই ত সময়,**
> **কেননা হাসি এখন অনেক বেশী আন্তরিক,**
> **পাপের প্রতি ধর্মের উল্লাস-কণ্ঠের তারিফ তাই অপরাধ।**
> **—ডন জুয়ান**

ম্যাথিলডা ডিনার-টেবিলে হাজির হল না।

সন্ধ্যার দিকে সে সামান্য ক্ষণের জন্য বসবার ঘরে ঢুকলেও জুলিয়ানের দিকে ক্ষণেকের জন্যও তাকাল না। ম্যাথিলডার এই আচরণ তার কাছে বিচিত্র মনে হল। কিন্তু ভাবল, এই সমাজের মানুষদের রীতি-প্রকরণ আমি জানি না। এর কারণ নিশ্চয় সে আমাকে বলবে। জানবার আগ্রহে অধীর হয়ে সে ম্যাথিলডার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করতে লাগল·· কিন্তু উষ্ণতাহীন নিষ্ঠুর-ভাব ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না। আগের দিন রাতে যে নারীর সঙ্গে দেহমিলনে সে অপার আনন্দ লাভ করেছে স্পষ্টতঃ এ নারী সে নারী নয়।

পরের দিন এবং তারও পরের দিন ম্যাথিলডার মুখে সেই একই ধরনের

শীতল অভিব্যক্তি···বারেকের জন্যও তার দিকে তাকাল না, যেন সে জুলিয়ানের উপস্থিতির কথা জানেই না। প্রথম দিনেই রমণীর মন সে জয় করেছে এই ধারণা জুলিয়ানের মন থেকে অন্তর্হিত হল। অবাক হয়ে সে ভাবল, ওর কি ধর্মে মন দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? কিন্তু ম্যাথিলডার মতন হঠকারিণীর পক্ষে সেটা মধ্যবিত্ত মনের বিলাসে পরিণত হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ধর্মের প্রতি ম্যাথিলডার অতি নগণ্য বিশ্বাস রয়েছে। তার শ্রেণীর স্বার্থে এর প্রয়োজন রয়েছে এটুকুই সে শুধু বিশ্বাস করে। তবে সে যা' করেছে এর জন্য এটা তার নারী-মনের অনুশোচনা নয় ত? জুলিয়ানের বিশ্বাস, সেই ম্যাথিলডার প্রথম প্রেমিক।

তবু এই মুহূর্তে জুলিয়ানের মনে হচ্ছে, তার আচরণে অবোধ্য কিছু নেই··· তার এমন হঠকারী আচরণ আর কখনও নজরে পড়ে নি, ওকি আমাকে ঘৃণা করে? আমার মতন একজন নগণ্য বংশজাত পুরুষের সঙ্গে সে যে আচরণ করেছে তার জন্যই কি তার মনে অনুশোচনা দেখা দিয়েছে?

আর ম্যাথিলডা মনে মনে ভাবছিল, আমার স্বামীর কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। এই চিন্তা তাকে বিষণ্ণ করে তুলল। আত্ম-সম্মানে সচেতন জুলিয়ান সং···কিন্তু আমি যদি ওর মনের অহমিকায় আঘাত হানি তবে ও আমাদের ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ করে দেবে। এর আগে ম্যাথিলডা কোনও পুরুষের প্রেমে পড়ে নি, তাই কোমল স্মৃতি তার মনকে অবিরাম দহন করছিল। আমার মনের উপর ও ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করেছে···এখন ওকে জ্বালাতন করলে ও আমাকে নিঘাৎ দারুণ শাস্তি দেবে। আর এই ধারণা থেকেই ওকে অসম্মান করার ঝোঁক দেখা দিল ম্যাথিলডার মনে···আর সাহস হচ্ছে ম্যাথিলডার মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমনি ধরনের নানা ধারণায় তার মনে অজস্র সমস্যা দেখা দিল।

তৃতীয় দিন। অবাধ্য মাদমোজায়েল একবারও তার দিকে তাকাল না। তাই ডিনারের শেষে ম্যাথিলডার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জুলিয়ান তার সঙ্গে সঙ্গে বিলিয়ার্ড ঘরে ঢুকল।

কোনরকমে রাগ সংযত করে ম্যাথিলডা বলল—'আচ্ছা মশায়, আপনার বোধ হয় ধারণা হয়েছে যে, আমার প্রবল ইচ্ছায় আপনি আমার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এবং এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে···কিন্তু জানেন কি, এতদূর পর্যন্ত এগোতে কেউ সাহস করে নি?'

এই দুই প্রেমিকের মধ্যে আলোচনা আরও চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত ছিল··· কিন্তু অজান্তে তাদের মধ্যে শুধু ঘৃণার পাহাড় সৃষ্টি হল। কেননা ওদের কারোরই মেজাজ শান্ত নয় এবং ওরা ভদ্র সমাজের চাল-চলনে অভ্যস্ত। তাই অচিরে তারা পরস্পরকে জানাল যে, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন টুটে গেছে; এবং গেছে চিরকালের জন্যে।

জুলিয়ান বলল—'দেখ, শপথ করছি তোমার কথা আমি চিরকালের জন্য গোপন রাখব। আমাদের আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন যদি তোমার সুনামে আঘাত না হানে তবে আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপও করব না।'

অতি সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে জুলিয়ান সরে গেল।

এই প্রস্থান জুলিয়ানের কাছে কর্তব্য···তাই সরে আসতে তার অসুবিধা হল না। মাদমোজায়েলকে সে ভালবেসেছে এ কথা সে বিশ্বাস করে না। তিন দিন আগে সে যখন ওই মেহগনি কাঠের আলমারির মধ্যে লুকিয়েছিল তখনও ত সে তাকে ভালবাসে নি। কিন্তু ওর সঙ্গে চিরকালের জন্য বিবাদ করার পর থেকেই জুলিয়ানের মনে এত পরিবর্তন দেখা দিল। সে রাতের অতি সামান্যতম ঘটনাও তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল···অথচ বাস্তবে সে এসব ঘটনার প্রতি নিস্পৃহ ছিল। চিরন্তন বিচ্ছেদের দ্বিতীয় রজনীতে জুলিয়ান মানসিক দ্বন্দ্বে প্রায় পাগল হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে ম্যাথিলডাকে ভালবাসে। এবং এই আবিষ্কারের ফলে তার মানসিক দ্বন্দ্ব দুর্বার হয়ে উঠল। তার মনের ভাব গেল একদম বদলে। অবিরাম নিরানন্দের প্রভাবে একদিন সে ঠিক করে ফেলল যে, সে নিম্ন ফরাসীভূমির জমিদারী দেখতে চলে যাবে। বাক্স গুছিয়ে ফেলে সে ছুটল ডাকঘরে।

কিন্তু ডাক গাড়ীর খবর শুনে তার মন দমে গেল। শুনল, আগামী কালের টুমো-গামী ডাক গাড়ীতে এখনও একটা আসন খালি আছে···এ এক বিচিত্র ঘটনা-সম্মেলন। টিকিট কেটে সে মারকুইসকে বলার জন্য বাড়ীতে ফিরে এল।

মারকুইস তখন বেরিয়েছেন।

জীবন্মৃত অবস্থায় জুলিয়ান লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সেখানে ম্যাথিলডাকে দেখে তার মনের ভাব কি হল?

তাকে দেখে ম্যাথিলডার মুখে এমন অনাগ্রহের ভাব ফুটে উঠল যে, জুলিয়ান তার কারণ বুঝতে পারল না। একদিকে দুর্ভাগ্য, অন্যদিকে বিস্ময়··· জুলিয়ানের মন এতই দুর্বল যে সে কোন কথাই বলতে পারছিল না। কেবল তার অন্তর থেকে কয়েকটা শব্দ উৎসারিত হল—'তাহলে তুমি আমাকে ভালবাস না।'

নিজের উপর রাগে কাঁদতে কাঁদতে ম্যাথিলডা বলল—'জীবনের প্রথম আগন্তুককে দেহদান করে আমি ভয়ানক ভুল করেছি।'

—'প্রথম আগন্তুককে!' চেঁচিয়ে উঠে জুলিয়ান। লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে পুরনো স্মৃতি হিসাবে ঝুলিয়ে রাখা মধ্যযুগীয় একখানা তরোয়ালের দিকে ছুটে গেল।

ম্যাথিলডার সঙ্গে কথা বলার সময় তার মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এখন তাকে লজ্জায় চোখের জল ফেলতে দেখে তার দুঃখের ভার আরও বাড়ল। এসময় ওকে যদি সে হত্যা না করতে সক্ষম হত তবে সে হত সবচেয়ে সুখী

মানুষ। পুরনো খাপ থেকে সে অতি কষ্টে তরোয়ালখানা টেনে বার করল… এবং এমন একটা অভিনব ঘটনা তাকে ঘিরে গড়ে উঠছে দেখে ম্যাথিলডা মনে মনে খুশি হল। তার চোখের জল আর পড়ছিল না।

জুলিয়ানের সরাসরি মনে পড়ল যে, মারকুইস তার অনেক উপকার করেছেন। আর আজ আমি তাঁর কন্যাকে হত্যা করতে চাইছি! কি ভয়ঙ্কর কথা! সে তরোয়ালখানা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ভঙ্গি করল। নিশ্চয় ম্যাথিলডা তার অতি-নাটকীয় ভঙ্গি দেখে হাসছে! ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্ম-সচেতন ভাব ফিরে এল। সে তরোয়ালখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল, যেন সে মরচে-ধরা দাগ পরখ করছে। তারপর ওখানা আবার পুরনো খাপে ভরল। এবং অতি শান্তভাবে সেখানা আবার সোনালী ব্রোঞ্জের পেরেকে ঠিক আগের মতন ঝুলিয়ে রাখল।

খুব ধীরে ধীরে সব কাজ শেষ করল জুলিয়ান। তার দিকে অবাক-নয়নে তাকিয়েছিল। তাহলে আমার প্রেমিকের হাতে আমি নিহত হচ্ছিলাম! ভাবল ম্যাথিলডা। সে যেন নবম চার্লস এবং তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে ভেসে গেল!

জুলিয়ান একটু আগে তরোয়ালখানা রেখে দিয়েছে।

আর ম্যাথিলডা তার সামনে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-ভরা চোখে তাকে দেখছিল। তার চোখে ঘৃণার চিহ্নটুকুও নেই। এই মুহূর্তে সে মন্ত্রমুগ্ধ। দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে…ঠিক যেন প্যারিসের একটা পুতুল।

ম্যাথিলডা ভাবছিল, ওর জন্যে মনে আবার প্রেমের উদ্রেক হচ্ছে। ও তাহলে আবার আমার উপর স্বামীত্ব ফলাবে…অথচ একটু আগেই ওকে আমি কড়া-কথা বলেছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাথিলডা।

হায় ঈশ্বর! কি অনুপম লাবণ্যবতী! ওকে ছুটে চলে যেতে দেখে মনে মনে আওড়াল জুলিয়ান। অথচ এক সপ্তাহ হয় নি কি গভীর কাম-লালসা নিয়ে সে আমার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিল।…ওই মুহূর্তগুলো আর ফিরে আসবে না! এর সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী! এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনার সময় আমার মন ছিল আগ্রহহীন…অথচ এই ঘটনার সঙ্গে আমার যোগ কত যে গভীর!…স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি নির্বোধ আর অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে জন্মেছি।

মারকুইস বাড়ী ফিরলেন। জুলিয়ান তার যাওয়ার কথা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে বলল।

—'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞাসা করলেন মারকুইস।

—'জমিদারী দেখতে।'

—'না, তোমার যাওয়া হবে না। তোমার ভাগ্য অন্য কাজের জন্য নির্ধারিত। তোমায় যেতে হবে উত্তরে…সাময়িক বাহিনীতে যোগ দিতে

হবে, তাই তোমাকে আমার বাড়ীতে বন্দী করে রাখছি। ঘণ্টা দু'তিন আমার বাড়ী ছেড়ে দয়া করে কোথাও যাবে না। যে কোন মুহূর্তে তোমাকে আমার দরকার হতে পারে।'

একটি কথাও না বলে মারকুইসকে অভিবাদন জানিয়ে জুলিয়ান চলে গেল। মারকুইস দারুণ অবাক হলেন। কথা বলার ক্ষমতা ছিল না জুলিয়ানের, তাই নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে সে বসে রইল। বসে বসে নিজের ভাগ্যের ক্রূরতা সম্পর্কে কেবল ভাবতে লাগল।

তাহলে আমি চলে যেতেও পারব না! ঈশ্বর জানেন, মারকুইস কতদিন আমাকে এই প্যারী শহরে ধরে রাখতে চাইছেন। হায় ঈশ্বর! আমার কি হবে? এমন কোন বন্ধু নেই আমার যার সঙ্গে আলোচনা করব। ফাদার পিরার্দ ত আমাকে কথা বলতেই দেবেন না। আর কাউণ্ট আলতামিরা ত আমাকে কোনও ষড়যন্ত্রকারী দলের সভ্য করে নিতে চাইবেন।

এবং ইতিমধ্যে আমার মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে যাব! কে আমাকে পথ দেখাবে? কি আমার হতে চলেছে?

১৮ : তিক্ত মুহূর্তগুলো

> **এবং সে ত আমার কাছে স্বীকার করেছে! খুঁটিনাটি সব কিছু বলেছে! তার প্রেম-ভরা দু'টি চোখ তুলে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়েছে, অপরের প্রতি তার যে প্রেম তারই ছবি আঁকে।**
>
> **—শিলার**

মরণের মুখোমুখি হওয়ার আশীর্বাদ লাভ করে মাদমোজায়েল দ্য লা মোল অন্তরে অপার আনন্দ লাভ করল। এতদূর পর্যন্ত সে ভাবতে লাগল: ও যখন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তখন ও আমার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। বিশ্বের কত জন সুদর্শন যুবকের সংমিশ্রণে একজনের মনে এমন তীব্র কাম-লালসার সৃষ্টি হয়?

স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, ও যখন তরোয়ালখানা দেওয়ালের ওই সুন্দর ছবির মতন জায়গাটায় টাঙাবার জন্য চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন ওকে অপূর্ব মনোহর মনে হচ্ছিল। আর ওই জায়গাটাতেই ডেকরেটাররা তরোয়ালখানা সাজিয়ে রেখেছিল। যা'হোক, ওকে ভালবাসা আমার পাগলামি নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনোমালিন্য মিটিয়ে নেওয়ার কোনও সম্মানজনক উপায় যদি সে দেখতে পেত তাহলে নির্ঘাৎ সে তা গ্রহণ করত আনন্দের সঙ্গে। হতাশায়

ভয়ঙ্কর শিকার হিসাবে জুলিয়ান নিজের ঘরে দরজায় চাবি বন্ধ করে আছে। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তার মন···সে ভাবছে, ম্যাথিলডার পদপ্রান্তে সে আছড়ে পড়বে। এই ঘরের কোণে নিজেকে বন্দী না করে রেখে সে যদি বাড়ীর মধ্যে কিংবা বাগানে ঘুরে বেড়ায় তবে হয়ত একটা সুযোগ সে পেয়ে যেতে পারে, হয় ত একটা ঘটনাতেই তার এই তিক্ত দুর্ভাগ্য দূর হবে এবং মন অপার আনন্দে ভরে যাবে।

জুলিয়ানের দোষ কারণ তার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ নয়···কিন্তু তেমন বুদ্ধি থাকলে সেই সুন্দর মুহূর্তে অপূর্ব ভঙ্গিতে পুরনো তরোয়ালখানা সে টেনে বার করতো না এবং তার সেই ভঙ্গি দেখে ম্যাথিলডারও মন মজতো না। জুলিয়ানের পক্ষে সারাদিন ধরে এই ভাবাবেগ কাজ করল। তার ভালবাসার মুহূর্তগুলো নিয়ে ম্যাথিলডা নানা রঙের ছবি আঁকল। মনে মনে আওড়াল—মাঝরাতে ওই ছোকরা যখন মই বেয়ে পকেটে ভরা-পিস্তল নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল তখন থেকেই ওর প্রতি আমার ভালবাসার সুরু আর তার শেষ সকাল আটটায়। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে গীর্জায় প্রার্থনা শুনতে শুনতে আমার মনে হল ও নিজেকে আমার স্বামী মনে করবে এবং ভয় দেখিয়ে আমাকে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য করবে।

ডিনার-পর্ব শেষ হল। ম্যাথিলডা এড়িয়ে ত গেলই না জুলিয়ানকে বরং তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাগানে ঢুকল···জুলিয়ানও গেল তার সঙ্গে। এই পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। আবার অজান্তে তার প্রতি তেমনি প্রেম অনুভব করছে ম্যাথিলডা। ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে খুশি হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে অপাঙ্গে ওর হাত দু'খানার দিকে তাকাচ্ছিল—ওই সুন্দর দু'হাতে সে সেদিন সকালে তরোয়ালখানা টেনে নিয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্য। এ ধরনের কাজের পর যা' কিছু ঘটল তারপর আর পুরনো আলোচনা করা যায় না।

তাই ধীরে ধীরে ম্যাথিলডা একান্ত গোপনে তার অন্তরের কথা বলতে লাগল। এ ধরনের কথা বলায় সে খুব আনন্দিত হচ্ছিল। এমন কি এক সময় ক্রয়সিনয়দের সম্বন্ধে তার ধারণার কথাও সে বলল জুলিয়ানকে।

আর তখন ঈর্ষার অনলে জ্বলছিল জুলিয়ানের মন।

ম্যাথিলডা তার অন্য প্রেমিকদের কথা সবিস্তারে বলছিল···তার অন্তরের সত্য প্রকাশ করছিল।

ঈর্ষার দুঃখ বেশীদূর বাড়তে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অধিক প্রেমের বার্তা মনে তিক্ততা সৃষ্টি করে ঠিকই···তার যে নারীকে ভালবাসা উজাড় করে দিতে চায় পুরুষ-মন সেই নারীর মুখ থেকে একথা শুনলে পুরুষের দুঃখের ভার বহু বহুগুণ বর্ধিত হয়। জুলিয়ানের অহঙ্কারী মন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাই তাকে এমন শাস্তি পেতে হচ্ছে। সে ভাবতে পারছে না কি করবে। কেমনভাবে নিজেকে ঘৃণা করবে তাও সে জানে না।

ম্যাথিলডার মতন কন্যা পূজা পাওয়ার যোগ্যা···তাকে প্রশংসা করার মতন ভাষাও তার নেই। তাই তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে চুরি করে তার রাণীর মতন অনুপম দেহ-লাবণ্য দেখতে দেখতে তার হৃদয় প্রেম আর দুঃখের বন্যায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আর তখন তার পদপ্রান্তে বসে বলতে ইচ্ছে হয় জুলিয়ানের —'ওগো, তুমি আমাকে করুণা করো!'

আবার মাঝে মাঝে ভাবে জুলিয়ান, এই যে সুন্দরী যুবতী, যে একদিন আমাকে ভালবাসত, অচিরে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভালবাসবে। নিঃসন্দেহে ও তার ভালবাসা সমর্পণ করবে।

ম্যাথিলডার আন্তরিকতাকে সন্দেহ করে না জুলিয়ান। ওর কথা বলার ধরণ থেকেই তা' সহজ-বোধ্য। তার দুঃখের ভার পরিপূর্ণ হল যখন সে তার পুরুষ-বন্ধুদের ভালবাসার কাহিনী এক বিশেষ কণ্ঠে বলতে লাগল···যেন সে তখন সত্যিই তাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

জুলিয়ানের নিদারুণ মনোবেদনা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই সেই লেবু-গাছের সার···এখানেই বেড়াতে বেড়াতে ম্যাথিলডা অপর পুরুষের সাথে তার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করছিল···অথচ ক'দিন আগে মাঝরাতে এই লেবু-কুঞ্জেই অপেক্ষা করছিল জুলিয়ান···কতক্ষণে রাত একটা বাজবে আর মই বেয়ে সে ঢুকবে তার প্রেমিকার ঘরে। কোন মানুষই এই তীব্র নিরানন্দকর পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে না।

পুরো এবং সপ্তাহ ধরে এই নিষ্ঠুর ঘনিষ্ঠতার অভিনয় চলল।

ম্যাথিলডা কখনও কখনও নিজেই তার খোঁজ করে আবার কখনও কখনও তাকে এড়াতে না পেরে কথা বলে। কথা সেই একই পুরনো খাত ধরে চলে। সেই যন্ত্রণাদায়ক আলোচনা। কেমনভাবে ম্যাথিলডা তার প্রেমিক পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে আচরণ করেছে। সে তাদের কাছে চিঠি লিখত, এবং কি লিখত তাও সে বর্ণনা করে। জুলিয়ান বুঝতে পারে তাকে এসব কথা শুনিয়ে ম্যাথিলডা আনন্দ পাচ্ছে। তার দুঃখ তার মনে গভীর আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করছে।

জীবন সম্পর্কে জুলিয়ানের অভিজ্ঞতা খুবই কম। তার মনে লজ্জাবোধ যদি কম থাকত তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় তার প্রেমিকাকে বলত : স্বীকার করছি এইসব ভদ্রলোকদের মতন আমি উপযুক্ত নই কিন্তু তবু তুমি ত আমাকে ভালবাস···। এবং তার এই আবেদন শুনে ম্যাথিলডা তার মনের অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে পারত, তার মনে প্রেম ফিরে আসত।

অবশেষে একদিন প্রেমে দুঃখে ক্ষত-বিক্ষত জুলিয়ান বলল—'তাহলে তুমি আর আমাকে ভালবাস না কিন্তু আমি তোমাকে পুজো করি।'

জীবনে এটাই সে সবচেয়ে বড় ভুল করল।

এই কথাগুলো শোনার পর থেকেই মাদমোজায়েলের মনে যেটুকু প্রেম

অবশিষ্ট ছিল তা উবে গেল। তার সঙ্গে কথা বলার মধ্যে যে আনন্দ ম্যাথিলডা আহরণ করছিল তা শেষ হল। এমন বোকার মতন কথা কেমন করে সে বলল অবাক হল ম্যাথিলডা। ভালবাসা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ না থাকলেও জুলিয়ানের প্রতি তার মনে এক ধরনের অনুকম্পা জন্মাল। ওদের দু'জনের মধ্যেকার আচরণের পরিবর্তন ঘটলো।

ওরা তখন বাগানে পায়চারি করছিল।

জুলিয়ানের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যাথিলডা বাগান থেকে চলে গেল।

ডিনার-টেবিলে ম্যাথিলডা একবারও তাকাল না জুলিয়ানের দিকে। পরের দিনও ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল তার মন। ক'দিন আগেও জুলিয়ান ছিল ম্যাথিলডার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু···কিন্তু আজ সে তাকে ঘৃণা করে। ওকে সামনে দেখলেই তার মন বিরক্তিতে ভরে যায়, এমন ঘৃণা এমন বিরক্তি যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

জুলিয়ান এত সব বুঝতে অক্ষম। সে শুধু ভাবে, পুরুষের মনে সাহসেরও একটা সীমা আছে। তাই নিজেকে সে সরিয়ে এনেছে ঘরের মধ্যে। সারাদিন সে খড়খড়ি-বন্ধ জানালার ধারে বসে থাকে। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বাগানের দিকে। ম্যাথিলডা বাগানে এলে অন্ততঃ দূর থেকে তাকে একবার দেখতে পাবে।

এমন তীব্র নিরানন্দের অভিজ্ঞতা এর আগে লাভ করে নি জুলিয়ান। ও দেখল, ডিনারের শেষে ম্যাথিলডা তার পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে বাগানে পায়চারি করছে। সে স্বীকার করেছে, অতীতে এই সব বন্ধুদের প্রতি তার মন কিছুটা ঝুঁকেছিল। তাহলে তার মনের কি নিদারুণ অবস্থাই না হল? প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। তার কঠিন, সাহসী হৃদয় আঘাত পেল। অবিশ্বাস্য রকম বিস্মিত হল। ম্যাথিলডা ছাড়া এখন আর কিছু সে চিন্তা করতেই পারে না··· আর সব চিন্তা যেন তার কাছে ঘৃণার সামগ্রী। তাই একখানা সাধারণ চিঠি লেখার ক্ষমতাও তার লোপ পেল।

একদিন মারকুইস বললেন—'দেখছি, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে!'

জুলিয়ান ভীত হল, এবার হয়ত সে ধরা পড়ে যাবে। অতি কষ্টে বোঝাল যে তার দেহ ভাল নয়। ডিনার-টেবিলে মারকুইস তার যাত্রা করার খুঁটিনাটি সব কিছু জানালেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল জুলিয়ানের। ম্যাথিলডা বুঝতে পারল যে এবার দীর্ঘদিনের জন্য আর তাদের দেখা হবে না। বেশ কিছুদিন ধরেই জুলিয়ান তাকে এড়িয়ে চলছে। অথচ এই ফ্যাকাসে আর বিষণ্ণ যুবককে একদিন সে ভালবেসেছিল। এই সব মেধাবী যুবকরা যারা জুলিয়ানের মতন নয় তারা আর তার স্বপ্নালু মনকে বিরক্ত করতে পারবে না। ম্যাথিলডা যদি সাধারণ চরিত্রের মেয়ে হত তাহলে বসবার ঘরের শোভা এই সব যুবকদের ভিতর থেকেই সে তার বর নির্বাচন করত···কিন্তু প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে সে কিছুতেই সাধারণের মত হতে পারে না।

জুলিয়ানের মত পুরুষ সঙ্গীর দিকেই আমার মন অহরহ নিবদ্ধ, যদিও জানি আমার মত তার ধনসম্পদ নেই ··ওর সঙ্গিনী হলে আমার দিকে আর কারো নজর পড়বে না। আর আমার বোনেদের মত সব সময় আমাকে বিপ্লবের ভয়ে ম্রিয়মান হতে হবে না···তারা এত ভীত যে, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান বেয়াড়া ভাবে গাড়ী চালালেও তারা তাকে ধমকাতে সাহস করে না। কিন্তু আমার যে মনের মানুষ···তার আছে চরিত্রবল, আছে মনে অফুরন্ত উচ্চাশা···তার জীবনের মুখ্য ভূমিকায় থাকব আমি। কি তার অভাব? বন্ধু? অর্থ? আমি তাকে তা' দিতে পারি। কিন্তু নিজের ভাবনায় বুত্তে ম্যাথিলডা জুলিয়ানকে হীনমন্য পুরুষ হিসাবে বিচার করছিল···বুঝি তার সঙ্গে নিজের মর্জি মত ভালবাসা নিয়ে খেলা করা যায়।

১৯ : ইতালীয় অপেরা

আহা! ভালবাসার বসন্ত-কালের কত না মিল
এই অনিশ্চিত এপ্রিল দিনের উজ্জ্বলতা।
তখন ত সূর্য ছড়িয়ে দেয় ভাস্বরতা,
ধীরে অতি ধীরে মেঘেরা হারায় আকাশ-নীল!
—সেকস্‌পীয়ার

ম্যাথিলডার মন অনুশোচনায় ভরে গেল।

ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন আর তার ভূমিকা যেন বিধ্বস্ত হতে চলেছে। জুলিয়ানের সঙ্গে যে আনন্দের ক্ষণগুলো সে অতিবাহিত করেছিল আজ তারই জন্যে তার মনে এই অনুশোচনা। শেষ স্মৃতি মনে পড়লে তার মনের বিষণ্ণতা আরও তীব্র হয়ে উঠছে, সে অভিভূত হয়ে পড়ছে।

ভাবতে লাগল ম্যাথিলডা, কেউ বলবে না যে আমি তার সুন্দর গোঁফ কিংবা ঘোড়ার পিঠে তার বসার অভিনব ভঙ্গিমা, দেখে কাম-লালসায় পীড়িত হয়েছি···ফরাসী দেশের ভবিষ্যৎ এবং ইংলণ্ডের মত এদেশেও যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার প্রচুর জ্ঞান দেখে ও আলোচনা শুনে আমি প্রলোভিত হয়েছি। নিজের মানসিক বিষণ্ণতা দূর করার জন্য সে মনে মনে বলল, আমি দুর্বল নারী তাই কাম-লালসায় প্রলুব্ধ হয়েছি, তবে একেবারে ভেসে যাই নি। যদি সত্যিই এদেশে বিপ্লব ঘটে তবে জুলিয়ান সোরেল কেন রোলাণ্ডের আর আমি নিজে মাদাম রোলাণ্ডের ভূমিকা গ্রহণ করব না? তবে আমি নিজে পছন্দ করি মাদাম দ্য স্টেইলের ভূমিকা। এ যুগে কলঙ্কিত চরিত্রের সমাজে কোন স্থান নেই। নিশ্চয় কেউ দুর্বলতার দ্বিতীয় রূপ দেখে আমাকে দোষ দেবে না···তবে আমি লজ্জায় মরে যাব। এটা ঠিক যে ওর মনে আমার

উপর স্বামীত্ব ফলাবার যে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছিল তা' আমি পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছি। ওই হতভাগ্য ছোকরা নিরানন্দ আর প্রচুর কাম-লালসায় পীড়িত হয়ে এক সপ্তাহ আগে আমাকে যা' বলেছিল সেটাই তার প্রমাণ। স্বীকার করছি, একটা সামান্য মন্তব্য শুনে অমনি অস্বাভাবিকভাবে রেগে ওঠা আমার পক্ষে সমীচিন হয় নি। আমি কি ওর স্ত্রী নই? এ ধরনের মন্তব্য খুবই স্বাভাবিক এবং স্নেহময়…একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। জুলিয়ান এখনও আমাকে সত্যিই ভালবাসে, যদিও আমি অফুরন্ত আলোচনা করেছি ওর সঙ্গে। তরল কণ্ঠে ওকে সমাজের সেই সব যুবকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কাহিনী ওকে শুনিয়েছি…বলেছি তাদের প্রেমের কথা…অথচ আমি জানি এই সব যুবকদের পছন্দ করে না জুলিয়ান, সে তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এক জঘন্য বিষণ্ণতায় আমার জীবন বন্দী তাই এমনি ধরনের কথা বলে আমি নিজেকে উৎসাহিত করতে চেয়েছি। আহা! ও যদি জানতে পারত যে ওদের সঙ্গে মেশামেশি করলেও আমার কোন বিপদ হবে না। ওর সঙ্গে তুলনায় ওই সব ছোকরারা হচ্ছে বিবর্ণদেহী রুগ্ন মূর্তি…এবং সবাই ওরা একই রকম।

এ সব কথা ভাবছিল ম্যাথিলডা আর তার হাতের পেন্সিল এ্যালবামের পাতায় এলোমেলো লাইন টেনে রেখা-চিত্র আঁকছিল। একখানা মুখ আঁকা সে এইমাত্র শেষ করল। ছবি দেখে অবাক হল, খুশি হল ম্যাথিলডা। আনমনে সে জুলিয়ানের মুখ এঁকেছে। এটাই বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা! এখানেই লুকিয়ে রয়েছে প্রেমের রহস্য! আশ্চর্য! আনমনে আমি ওর ছবি আঁকলাম।

নিজের ঘরে ছুটে চলে গেল ম্যাথিলডা। দরজা বন্ধ করে রঙ-তুলি নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে একখানা মুখ আঁকল। কিন্তু কই এ মুখের ছবি দেখে ত মনে হয় না এখানা জুলিয়ানের মুখ। আকস্মিকভাবে আঁকা ছবিখানাই হয়েছে সত্যিকারের ছবি। ম্যাথিলডা মন্ত্রমুগ্ধার মত বসে রইল…বুঝল, এটাই তার মনের কাম-লালসার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মারকুইস মেয়েকে ডেকে পাঠালেন তাঁদের সঙ্গে ইতালীয় অপেরা দেখতে যাওয়ার জন্য।

ম্যাথিলডার একটামাত্র ইচ্ছা জুলিয়ানের সঙ্গে দেখা করা।

কিন্তু জুলিয়ান গেল না।

অপেরা সুরু হল। ম্যাথিলডা বসে তার মনের মানুষের কথাই ভাবতে লাগল। কাম-লালসায় তার মন ভরপুর। প্রথম অঙ্ক শেষ হল। দ্বিতীয় অঙ্কে গান সুরু হল। নৃত্যনাট্যের নায়িকা গানের মাধ্যমে বলল—'ওর জন্যে আমি গভীর প্রেম অনুভব করি, শাস্তি পাওয়ার আমি উপযুক্ত, তবু আমি ওকে গভীরভাবে ভালবাসি।'

কথাগুলো কানে যেতেই একটা নতুন ভাবে উজ্জীবিত হল ম্যাথিলডার

মন···সংসারের আর সব ধারণাই তার মন থেকে মুছে গেল। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু ম্যাথিলডা কারো কথার জবাব দিল না। তার মা তাকে ধমক দিলেন, সে কানেই তুলল না। তার মনে চরম আনন্দের শিহরণ জাগল। জুলিয়ান আজ ক'দিন ধরে তাকে পাওয়ার জন্য যেমন কাম-লালসায় পীড়িত হয়েছে, তেমনি কাম-লালসায় ভরে গেছে ম্যাথিলডার মন। মস্তিষ্কে যে ভালবাসার জন্ম হয় তা' অন্তরে অনুভূত ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র। কিন্তু এই ভালবাসার জন্ম হয় বিরল মুহূর্তে। মন তখন উদাস হয়ে পড়ে। ভালবাসা গড়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর চিন্তাকে আশ্রয় করে।

সে রাতের উন্মত্ততা থেকে ম্যাথিলডা কল্পনা করল, সে তার ভালবাসা আবার জয় করেছে।

পরদিন। ম্যাথিলডা তার উন্মত্ত কাম-লালসাকে দমন করার সব সুযোগ গ্রহণ করল।

তার প্রধান উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত নিরানন্দের মূর্তি হিসাবে জুলিয়ানের সামনে প্রতিভাত হওয়া। জুলিয়ান তাকে অবহেলা করুক। কিন্তু জুলিয়ান তার প্রতিটি আচরণের উপর নজর রেখেছিল।

ওদিকে জুলিয়ানের অবস্থা হল সঙ্গীন। এমন তীব্র নিরানন্দ সে আর কখনও ভোগ করে নি। কাম-লালসায় পীড়িত তার মন···অথচ ম্যাথিলডার ভাব-আচরণ কিছুই সে বুঝতে পারছে না। প্রেমের এ এক বিচিত্র গতি। অন্ধ উত্তেজনায় ভরা মন। কাউকে জিজ্ঞাসা করবে, উপদেশ নেবে তারও জো নেই। জুলিয়ান বুঝতে পারছে, কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কেঁদে ফেলবে ··তাই নিজের ঘরে সে দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

জুলিয়ান দেখল, ম্যাথিলডা অনেকক্ষণ ধরে বাগানে পায়চারি করছে।

খানিক পরে ম্যাথিলডা বাগান থেকে চলে গেল। জুলিয়ান বাগানে নেমে এল। সে একটা গোলাপ ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যাথিলডা এখান থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলেছে। অন্ধকার রাত। এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই ত খানিক আগে ম্যাথিলডা তার যুবক অফিসার বন্ধুদের সঙ্গে এখানে বেড়াচ্ছিল। ওদের মধ্যে কোন একজনকে সে ভালবাসে।

একদিন তাকেও সে ভালবেসেছিল। কিন্তু এখন সে তার কোন মূল্য দিচ্ছে না।

জুলিয়ান বেশ জোর দিয়ে মনে মনে আওড়াল—বাস্তবিক ওর কাছে আমার মূল্য অতি নগণ্য। আমি নির্বোধ, অতি সাধারণ এবং অন্যলোকের কাছে বিরক্তিকর মানুষ। আর নিজের কাছেও অপদার্থ। এমন অনেক কথাই আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও সে আজ নিজের জীবনটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছে। উচ্চ গুণসম্পন্ন মানুষদের জীবনে এটাই সব চেয়ে বড় ভুল।

মাঝে মাঝে আত্মহননের ইচ্ছা জাগে তার মনে। এই চিন্তার, ইচ্ছার যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে। এ যেন আশীর্বাদের মত একটু বিশ্রাম করার ফুরসৎ ···মরুভূমিতে তাপদগ্ধ, তৃষ্ণার্ত, মৃতপ্রায় পদযাত্রীর সামনে এক গ্লাস বরফ-জল এগিয়ে দেওয়ার মত আশীর্বাদ।

আমার মৃত্যু ওর মনে আমার প্রতি যে ঘৃণা রয়েছে তাকে আরও বাড়াবে! কি স্মৃতি আমি রেখে যাব!

এমন গভীর দুঃখে আপতিত মানুষের কাছে মনের সাহস ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। নিজেই বলার মত যথেষ্ট বুদ্ধি নেই জুলিয়ানের যে, আমি সাহসী হব। কিন্তু ম্যাথিলডার ঘরের জানালার দিকে তাকাতেই জুলিয়ান বন্ধ সার্সির ওপাশে দেখল যে, ম্যাথিলডা তার ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। সে যেন ছবির মত সুন্দর সাজানো ঘরখানা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল। হায়! সে মাত্র একবারই ওই ঘরে ঢুকেছে। তার কল্পনা আর এগিয়ে যেতে পারছে না!

ঘড়িতে রাত একটা বাজল। আওয়াজ কানে যেতেই সে মনে মনে বলল: এই মুহূর্তের কাজ আমি মই বেয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করব।

এই হচ্ছে প্রতিভার বিকশিত আলোকচ্ছটা: কঠিন যুক্তি তার মনে ভিড় করে এল। এখনকার চেয়ে কি তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। মইখানা আনতে সে ছুটে গেল। মালী শিকল দিয়ে মইখানা বেঁধে রেখেছে। পকেট পিস্তল দিয়ে সে শিকল ভেঙ্গে ফেলল। তার দেহে মনে এখন অতিমানবের শক্তি। শিকলের বাঁধন সে খুলে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে সব বাধা দূর করল এবং মইখানা ম্যাথিলডার ঘরের জানালায় লাগাল।

হয় ত ম্যাথিলডা রাগ করবে, আমাকে কটুকথা বলবে···কিন্তু তাতে কি এসে যাবে? আমি ওর অধর চুম্বন করব, শেষ চুম্বন···তারপর নিজের ঘরে ঢুকে আমি আত্মহত্যা করব। মরবার আগে আমার অধর ওর অধর স্পর্শ করবে!

মই বেয়ে উপরে উঠল জুলিয়ান। জানালার সার্সিতে টোকা দিল। ম্যাথিলডা আওয়াজ শুনল। সার্সি খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু মইতে আটকে গেছে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জুলিয়ান জানালা থেকে মই সরিয়ে নিল, ম্যাথিলডা জানালাটা খুলে ফেলল।

জুলিয়ান জীবন্মৃত অবস্থায় ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

—'ওগো, তুমি এসেছ!' বলতে বলতে ওর আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাথিলডা।

জুলিয়ানের আনন্দের গভীরতা কে বর্ণনা করবে?

তারই মত আনন্দিতা ম্যাথিলডাও।

নিজের অপরাধের উল্লেখ করতে দ্বিধা করল না ম্যাথিলডা। তার কাছে অপরাধ স্বীকার করল। বলল—'ওগো, আমার মনের অহঙ্কারের জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও। তুমি আমার প্রভু, আমার স্বামী। আর আমি তোমার ক্রীতদাসী। তোমার বিরুদ্ধে গিয়েছি, হাঁটু গেড়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা করো।' জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিল ম্যাথিলডা।

প্রেমের দুর্নিবার আবেগে উন্মত্ত ম্যাথিলডা তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ল। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বলতে লাগল—'ওগো, প্রিয়তম সোনা আমার। তুমি আমার স্বামী। আমার এই দেহ তোমার রাজ্ঞী। যদি কখনও তোমার বিরুদ্ধে যাই, আমাকে কঠোর শাস্তি দিও।'

একটা মোমবাতি জ্বালাল ম্যাথিলডা।

জুলিয়ান অতিকষ্টে মাথার একপাশের একগোছা চুল কাটা থেকে ম্যাথিলডাকে বাধা দিল।

বলল ম্যাথিলডা—'ওগো, আমি মনে রাখতে চাই যে, আমি তোমার অধীনা। যদি কোনদিন আমার মনের ঘৃণ্য অহঙ্কার আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তখন এই চুলের গোছা দেখিয়ে আমাকে বলো: এটা আর এখন শুধু ভালবাসার প্রশ্ন নয়, এই মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে কি ভাবাবেগ উথলে উঠছে তাও জানার প্রয়োজন নেই, তুমি আমার কথা শুনবে বলে শপথ করেছ। তোমার সম্মান রাখার জন্য তুমি আমায় মান্য করবে।'

অপার আনন্দে অভিভূত হলেও নিজেকে সংযত করার ক্ষমতা আছে জুলিয়ানের। পূবের আকাশে ভোরের আলো ফুটছে। বাগানের গাছ-গাছড়ার মাথায় প্রথম আলোর ঝিকিমিকি। জুলিয়ান ম্যাথিলডাকে আদর করে বলল—'ওগো, এবার আমাকে মই বেয়ে নামতে হবে। যে বিপদের ঝুঁকি আমি নিয়ে এখানে এসেছি তুমি তার যোগ্য। মানব-জীবনের এই অফুরন্ত আনন্দ আহরণ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজেকে আমি বঞ্চিত করছি। তোমার সম্মানের জন্যই আমার এই আনন্দ বিসর্জন দিচ্ছি। আমার মন ত তোমার জানা তাই বুঝছ কি ভয়ানক আঘাত আমার মনে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে যেমন আছ এমনিভাবে কি চিরকাল তুমি আমার থাকবে? দেখ, তোমার ঘরে প্রথম রাতে আসার পর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাগানের উপরে গোপনে নজর রাখা হয়েছে···।

কথাটা ভাবতেই ম্যাথিলডা খিল খিল আওয়াজ তুলে হাসল।

এমন সময় পাশের ঘরে মাদাম মোল আর তাঁর ঝিয়ের জেগে ওঠার সাড়া পাওয়া গেল। ওরা দারুণ ভীত হয়ে পড়ল। জানালা খুললেই মইখানা ওদের নজরে পড়বে। জুলিয়ান তাকাল ম্যাথিলডার দিকে। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মায়ের কাছে সে কিছুই বলতে পারবে না।

জুলিয়ান তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর তর-তর করে মই বেয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাগানে নামল। আর তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সে মইয়ের জায়গায় মই রেখে এল। সম্মান বাঁচল ম্যাথিলডার। যখন হুঁশ হল তখন জুলিয়ান দেখল সে অর্ধ-উলঙ্গ এবং হাতে-পায়ে রক্তের দাগ। তাড়াতাড়ি মই বেয়ে নামার সময় তার হাত-পা কেটে গেছে।

অপার আনন্দ তার মনে হারানো সাহস ফিরিয়ে এনেছে। এই মুহূর্তে খালি হাতে জনা চারেকের সঙ্গে লড়াই করতেও সে প্রস্তুত···আনন্দ তাতে তার কম হবে না। মই বেঁধে রাখল। বাগানের মাটিতে মইয়ের দাগ মুছবার জন্য ফিরে আসতে ভুলল না।

অন্ধকারে সে ফুলের ঝাড়টা হাত বুলিয়ে ঠিকঠাক করছিল, এমন সময় উপর থেকে কিছু তার হাতের উপর পড়ল।

জানালায় দাঁড়িয়েছিল ম্যাথিলডা। সামান্য উচ্চস্বরে বলল—'ওগো দেখ, তোমার অধীনা কি পাঠিয়েছে। ওটা আমার চির-জনমের বাধ্যতার চিহ্ন। আমার যুক্তি বিবেচনা সব কিছু জলাঞ্জলি দিলাম। তুমি আমার স্বামী হও।'

আনন্দে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল জুলিয়ান যে সে আবার মইখানা আনতে যাচ্ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ওর ঘরে ঢুকবে। কিন্তু শেষে মনের বিবেচনাশক্তি ওকে বাধা দিল।

বাগানের দিক থেকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা খুব সহজ কাজ নয়।

বাড়ীর পিছনের একখানা কুঠরির দরজা সে জোর করে খুলে ফেলল। এবার বাড়ীতে প্রবেশ করতে তার অসুবিধা হল না। উত্তেজনায় ম্যাথিলডার ঘর থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবার আগে সে ঘরের চাবি ফেলে এসেছে। তাই নিজের ঘরের দরজাও তাকে জোর করে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতে হল। ও যেন তার ফেলে-আসা জিনিষগুলো লুকিয়ে ফেলে!

অবশেষে অফুরন্ত ক্লান্তিতে মনের আনন্দ চাপা পড়ল।

সূর্য উঠল। এবং গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল জুলিয়ান।

ঘুম ভাঙ্গল লাঞ্চের ঘণ্টাধ্বনিতে। জুলিয়ান খাবার টেবিলে হাজির হল। খানিক পরে এল ম্যাথিলডা। জীবন্ত এই আনন্দঘন মূর্তি দেখে খুশি হল জুলিয়ান। দেখল তার মুখে তৃপ্তির দ্যুতি। কিন্তু অচিরে শঙ্কিত হল তার মন। হাতে সময় খুব বেশী ছিল না। তাই ম্যাথিলডা কোনও রকমে মাথার চুল এমনভাবে বেঁধেছে যে, একপাশের কাটা চুল যাতে ঢাকা পড়ে। মাথার একপাশের সোনালী ছাই রঙের সুন্দর চুলগুলো আর নেই।

সারা দিনের মধ্যে জুলিয়ান একবারও ম্যাথিলডাকে একা পেল না। হয়ত মাদাম মোল এই ব্যবস্থা করেছিলেন। সন্ধ্যার দিকে একবার একা কথা বলবার সুযোগ হল। ম্যাথিলডা বলল—'ওগো, মনে করো না এটা আমার কাজ। আমার মা রোজ রাতে একজন ঝিকে আমার ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছে।'

চঞ্চল বিজলীর চমকের মত সারাটা দিন কাটল। আনন্দের তুঙ্গে বিচরণ করছে জুলিয়ানের মন। পরদিন সকালবেলা সাতটা থেকেই লাইব্রেরী ঘরে বসে রইল। আশা করছিল যে, একবার না একবার ম্যাথিলডা সে-ঘরে আসবেই। বসে বসে সে দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখল।

লাঞ্চের কয়েক ঘণ্টা পরে ম্যাথিলডার সঙ্গে তার দেখা হল।

খুব দক্ষতার সঙ্গে আর যত্নে কাটা চুলের পাশটা ঢেকেছে ম্যাথিলডা। বোঝবার উপায় নেই। দু'একবার তার দিকে অপাঙ্গে তাকাল ম্যাথিলডা। দু'চোখে শান্ত ভদ্রতার ঝিলিক। কিন্তু সেই অধীনা ভাবটুকু আর নেই।

বিস্মিত হল জুলিয়ান। কৃতকর্মের জন্য ম্যাথিলডা হয় ত অনুশোচনা করছে। তার মনে ভালবাসার কথা নেই···সে শুধু সেদিন রাতের দেহমিলনের কথাই ভাবছে। অথচ জুলিয়ানের মনের প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর··· সে শুধু স্বপ্ন দেখছে এক অনুপম লাবণ্যভরা ষোড়শী তন্বী-দেহের। দারুণ সন্দেহ, বিস্ময় আর হতাশা পর্যায়ক্রমে তার মনকে অধিকার করতে লাগল··· হয় ত এমনিভাবই চলবে চিরকাল ধরে।

কোনও রকমে ভদ্রতা বজায় রেখে খাবার টেবিল থেকে উঠে সে আস্তাবলে ছুটে গেল। ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাল এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। দুর্বলতা দেখিয়ে নিজেকে অসম্মান করতে সে চাইল না। বনের ভিতর দিয়ে খুব দ্রুত ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে সে ভাবছিল, নিজেকে ক্লান্ত করে আত্ম-হনন করব। এমনভাবে অসম্মানিত হওয়ার মতন কি করেছি আমি। কি বা বলেছি?

বাড়ী ফিরে এসে জুলিয়ান ভাবল, কিছু করব না বা বলব না আজ। মনের মতন দেহের দিক দিয়েও মৃত অবস্থায় থাকব। জুলিয়ান আর বেঁচে নেই, কেবল তার মৃতদেহ চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

২০ : জাপানী ফুলদানি

এই ভয়ানক হতাশার আঘাত প্রথমেই সে অন্তর থেকে বুঝতে পারে নি, সে তাই অভিভূত হওয়ার চেয়ে বিরক্ত হল বেশী। বিচার-শক্তি ফিরে আসার জন্য নিজের দুর্ভাগ্যের গভীরতা সে বুঝতে পারছিল আনন্দ যেন তার জীবনে কিছু নয়, সে শুধু হতাশার তীক্ষ্ণ থাবার আঘাত অনুভব করে। কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণার কথা বলে কি হবে? মনে যে বেদনা অনুভব করা যায় তার সঙ্গে এর কি তুলনা করা চলে?

ডিনারের ঘণ্টা বাজছিল। কোনও রকমে পোশাক পরার সময় পেল

জুলিয়ান।

ওখানে ম্যাথিলডার সঙ্গে তার দেখা হল। সে তখন মা, দাদা আর ক্রয়সিনয়দের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, আজ সন্ধ্যায় মার্শালের বিধবা মাদাম ফারভাকুইর বাড়ীতে যেতে পারবে না। এত ঘনিষ্ঠ এবং চিত্তাকর্ষক এর আগে কোনদিন ওদের কাছে হয় নি ম্যাথিলডা। ডিনারের শেষে আরও কয়েকজন বন্ধু এল। ওদের সকলের মধ্যে নিখুঁত ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। মনোরম আবহাওয়া, তবু ম্যাথিলডা বাগানে বেড়াতে যেতে চাইল না। তার ইচ্ছা মাদাম মোলের আরাম-কেদারা ঘিরে ওরা সবাই বসে থাকবে, কেউ যাবে না।

বাগানে বেড়ানোর ইচ্ছা আর নেই ম্যাথিলডার। যেন ওর মনে আর এতটুকু আগ্রহ নেই···ওখানে চারধারে জুলিয়ানের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

নিরানন্দ মনকে জড় পদার্থে পরিণত করে। জুলিয়ান বোকার মত সেই বেতের চেয়ারখানায় বসে রইল। সেই সন্ধ্যায় কেউ ওর সাথে একটা কথাও বলল না। ওর উপস্থিতি কেউ গ্রাহ্য করল না। এবং অবস্থা হয়ে উঠল খুবই সঙ্গীন। ম্যাথিলডার যে সব বন্ধুরা তার পাশে বসেছিল মনে হল তারা যেন ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে। ভাবল, রাজসভায় আমি রাজ-অনুগ্রহ হারিয়েছি। তাই ঘৃণা ছড়িয়ে যারা তার অসম্মান করছে তাদের উপর সে নজর রাখল।

ক্রয়সিনয়ের দৃষ্টি দুঃখ-ম্লান···এই সুদর্শন, সুন্দরস্বভাব যুবক সামান্য কারণে উত্তেজিত হচ্ছে। তাই সে বিষণ্ণ আর রগ-চটা হয়ে উঠেছে। জুলিয়ানের মনে হল, ওর মধ্যে পাগলামির ভাব দেখা দিয়েছে। প্রিন্স কোরাসোফের কাছ থেকে সে শুনেছে যে, সম্রাট আলেক্জাণ্ডারও ছিলেন এমনি।

সহসা তার মনে হল, এখানে সে অসম্মানিত জীবন যাপন করছে। কুৎসিত একটা অবস্থার সৃষ্টি না করে এখন চেয়ার ছেড়ে এখান থেকে চলে যাবে কিনা তাই ভাবতে লাগল। মন তার বিক্ষিপ্ত, তবু সে একটা উপায় ভাবতে লাগল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল, কিন্তু এমন অবস্থায় সে সব খুব সুখকর নয়। এই অভিজাত সমাজের আচার-আচরণ এখনও সে ভালভাবে রপ্ত করতে পারে নি। তার আচরণে নিরানন্দের ভাবই প্রবল। এই পৌনে এক ঘণ্টা ধরে সে এখানে ফালতু হীনমন্যতার অভিনয় করে চলেছে, কেউ তার অস্তিত্ব এতটুকু গ্রাহ্য করছে না।

অবশেষে সে বসবার ঘর ছেড়ে চলে এল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থা ভালভাবে নিরীক্ষণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের ছবিও অনুমান করতে পারছে। দু'টি রাত আগের স্মৃতি তার মনের অহঙ্কার এখনও অটুট রেখেছে। আমার চেয়ে ওদের যত বেশী সুযোগ সুবিধা থাক না কেন, ওদের কারো কাছে ম্যাথিলডা ধরা দেয় নি—কিন্তু ধরা দিয়েছে তার কাছে। সে আমার।

আর কিছু সে ভাবতে পারছে না। তার আনন্দের মূর্তি এই বিশেষ জীবটিকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

পরের দিন আবার ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল জুলিয়ান।

সন্ধ্যায় ম্যাথিলডাকে ঘিরে আড্ডা বসেছিল, কিন্তু জুলিয়ান ওদিকে গেল না। তার মনে পড়ল যে, খানিক আগে কাউন্ট নরবারটের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, কিন্তু কাউন্ট তাকে উপেক্ষা করে সরে গিয়েছিল—তার দিকে তাকায় নি। স্বাভাবিক ভদ্রতা বজায় রাখতে গিয়ে সে নিজেকে হত্যা করছে।

এ সময় ঘুম জুলিয়ানের কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারত। দৈহিক ক্লান্তি সত্ত্বেও তরল স্মৃতি তার কল্পনা-শক্তিকে অভিভূত করে রেখেছিল। এটুকু বোঝবার মতন বুদ্ধি তার মগজে ছিল না যে, প্যারিসের শহরতলিতে বনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ঘোড়া ছুটিয়ে সে ক্লান্ত, কিন্তু তার এই কাজ কোন ভাবেই ম্যাথিলডার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তাদের ভালবাসা তাই এখন ভাগ্যের হাতে ন্যস্ত।

তার মনে হচ্ছে যে, এসময় ম্যাথিলডার সঙ্গে কথা বলতে পারলে তার অসীম দুঃখের কিছুটা উপশম হত। কিন্তু সাহস করে কি বলবে তাকে?

সেদিন লাইব্রেরী ঘরে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসেছিল জুলিয়ান। সকাল তখন সাতটা। দেখল, ম্যাথিলডা লাইব্রেরী ঘরে ঢুকছে।

—'জানি মশাই, তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও!'

—'হায় ঈশ্বর! কে তোমায় বলল?'

—'জানি আমি, তাতে কি হল? তোমার সম্মানের জ্ঞান না থাকলে তুমি আমার সর্বনাশ করতে কিংবা সর্বনাশ করার চেষ্টা করতে পার। কিন্তু এধরনের বিপদ যা, আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি না সেই বিপদ আমাকে আন্তরিক হতে বাধা দিতে পারবে না। মশাই, আমি আর তোমাকে ভালবাসি না, আমার পাগলামি আমাকে ঠকিয়েছে।'

এমন ভয়ানক আঘাতে ভালবাসা এবং দুঃখ তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। সে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করতে চাইল। এমন অসংগত আর কিছু হয় না। আনন্দদানে অসফল হওয়ার জন্য কেউ কি সমর্থনের চেষ্টা করে? কিন্তু তার কাজের উপর যুক্তির আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তি তার ভাগ্য নিরূপণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তার মনে হল, যতক্ষণ সে কথা বলছে ততক্ষণ সব কিছু শেষ হবে না। ম্যাথিলডা তার কথা শুনছে না, তার কণ্ঠস্বর তাকে বিরক্ত করে তুলছে, সে ভাবতে পারছে না কোন ধৃষ্টতার বলে জুলিয়ান তার কথায় বাধা দিচ্ছে।

সেদিন সকালবেলায় অনুতপ্ত ধর্মবোধ এবং ক্রুদ্ধ অহঙ্কার ম্যাথিলডাকে নিরানন্দ করে তুলেছিল। একজন নগণ্য পুরোহিত, যে আবার একজন চাষীর ছেলে, তাকে নিজের জীবনের কিছু কিছু অধিকার অর্পণ করার চিন্তায় তার মন

খান্‌-খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভয়ানক দুঃখের জ্বালায় সে ভাবতে লাগল, একজন সহিসকে সে যেন পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে।

অহঙ্কারী এবং দুঃসাহসী চরিত্রের মানুষ এর পরই অন্যের উপর রাগে জ্বলে ওঠে। এমন অবস্থায় রাগের বিস্ফোরণ ঘটলে আনন্দ হয়।

মুহূর্তের মধ্যে ম্যাথিলডা জুলিয়ানের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করল। এ ব্যাপারে ম্যাথিলডা খুবই পারদর্শিনী। সে অপরের আত্ম-সচেতন মনে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে সক্ষম।

জীবনে জুলিয়ানও এই প্রথম দেখল যে, তার প্রতি ঘৃণায় ভরপুর মন একজন তার চেয়ে উন্নত-মনা নারীর হাতে সে শিকারে পরিণত হয়েছে। আত্মরক্ষার কথা তাই সে ভুলে গেল এবং আত্ম-ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল। তার নিষ্ঠুর ঘৃণা বর্ষণে জুলিয়ানের মন থেকে নিজের সম্পর্কে যে ভাল ধারণার অস্তিত্ব ছিল তা নস্যাৎ হয়ে গেল। তার মনে হল, ম্যাথিলডা ঠিকই বলছে, তার বলার মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই।

আর ম্যাথিলডা! কয়েকদিন আগে যাকে সে পুজো করত আজ তাকে নিষ্ঠুর কথার হুল ফুটিয়ে আনন্দ লাভ করল। নিজেকে এবং ওকে এমন শাস্তি দিয়ে সে খুব খুশি। জীবনে এই প্রথম এই যে সে নিষ্ঠুর বাক্যবাণ ছুঁড়ে আনন্দ উপভোগ করছে এসব তাকে আবিষ্কার করতে বা ভাবতে হচ্ছে না। এক সপ্তাহ ধরে তার অন্তরের বিচারক শাস্তি দানের জন্য যে সব অভিযোগ চিন্তা করেছে সেগুলোই সে এখন অনর্গল বলে যাচ্ছে। প্রতিটি শব্দ জুলিয়ানের ভয়ানক দুঃখের বোঝা শতগুণ বাড়াচ্ছে। সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করল জুলিয়ান···কিন্তু কর্ত্রীর ভঙ্গিতে ম্যাথিলডা তার হাত চেপে ধরেছিল।

এক সময় জুলিয়ান বলল—'দয়া করে মনে রেখ, বড় জোরে কথা বলছ। পাশের ঘর থেকে তোমার কথা ওরা শুনতে পাবে।'

ম্যাথিলডা গর্বিত ভঙ্গিতে বলল—'তাতে কি এসে যাবে! আমার কথা লুকিয়ে শুনেছে এমন কথা আমাকে বলার সাহস কার হবে? আমার সম্বন্ধে তোমার মনে একটা ধারণা হয়েছে তোমার সেই বৃথা অহঙ্কার-বোধ আমি সারাতে চাইছি।'

লাইব্রেরী ঘর থেকে যখন চলে যাওয়ার সুযোগ পেল জুলিয়ান তখন তার মনে নিরানন্দের তীব্রতা অনেক কমে গেছে। 'ও তাহলে কথাটা এই! সে আর আমাকে ভালবাসে না!' মনে মনে কথাগুলো আওড়াল সে। সজোরে বলতে চাইল বার বার যেন নিজের অবস্থাটা সে নিজেকে বোঝাতে চাইছে। অবস্থাটা হচ্ছে, সে আমাকে এক সপ্তাহ বা দশ দিনের জন্য ভালবেসেছিল আর আমি তাকে ভালবাসব সারা জীবনের জন্য। মাত্র ক'দিন আগে সে আমাকে যে সব কথা বলেছিল আমার কাছে আজ কি সে সবের কোন মূল্য নেই!

আর তৃপ্ত অহঙ্কার-বোধের জন্য আনন্দে ভরপুর ম্যাথিলডার মন…তাহলে ওর সঙ্গে চিরন্তন বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা গেল। এমন প্রবল প্রতিপক্ষকে এমন চূড়ান্তভাবে জয় করার জন্যই তার মনে এই আনন্দ। সুতরাং এবার ওই ক্ষুদে ভদ্রলোক বুঝতে পারবে যে কোনদিন সে আর আমার উপর অধিকার সাব্যস্ত করতে পারবে না, কখনও আমাকে অধিকার করতে পারেও নি। সে এত খুশি হয়ে উঠল যে সেই মুহূর্তে অনুভব করল তার ভালবাসার ডোর ছিঁড়ে গেছে।

এমন ভয়ানক এবং এমন অসম্মানজনক দৃশ্যের পর জুলিয়ানের চেয়েও কম কাম-লালসা পীড়িত মানুষের কাছে ভালবাসা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। নিজের প্রতি যে কতখানি সে ঋণী একথা মুহূর্তের জন্য না ভুললেও ম্যাথিলডা তার কাছে কয়েকটা নিরানন্দজনক কথা বলেছে, এবং প্রতিটি কথাই সত্য… এখন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সেই কথাগুলো মনে পড়ছে। তাই বিস্মিত জুলিয়ানের মনে সব প্রথম যে ধারণাটা বদ্ধমূল হল তা হচ্ছে ম্যাথিলডার মনে অহঙ্কারের সীমা নেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, তাদের মধ্যে ভালবাসার আর কোনও অস্তিত্ব নেই, তবু পরের দিন লাঞ্চের সময় ম্যাথিলডাকে দেখে সে লজ্জায় পড়ল। এই যে অপরাধ সে করেছে তার জন্য আজ পর্যন্ত কেউ তাকে দোষ দেয় নি, ধমকায় নি। সে পরিষ্কার জানে যে কি তার করা উচিৎ এবং কি সে করতে চায়…সে সেই কাজই করে।

ঘটনাটা সেদিনই ঘটল। মাদাম মোল একখানা রাজদ্রোহমূলক এবং বিরল পুস্তিকা তাকে দেখাতে আনলেন। এই পুস্তিকাখানা আজ সকালেই তাঁদের গীর্জার পুরোহিত তাঁকে গোপনে এনে দিয়েছে…জুলিয়ান পাশের টেবিল থেকে সেখানা টেনে নেওয়ার সময় চীনামাটির কুৎসিত একটা নীল-রঙ ফুলদানি ফেলে দিল। ফুলদানিটা উল্টে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

মাদাম মোল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, দুঃখে কেঁদে ফেললেন। তাঁর মন-পছন্দ ফুলদানিটার ভাঙা টুকরোগুলো দেখতে এগিয়ে এলেন। বললেন—'এটা জাপানে তৈরী পুরনো চীনামাটির ফুলদানি। আমার বড় মাসি এটা আমাকে দিয়েছিলেন। ডিউক অব্ অরলিয়ান্স যখন রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন তখন ওলন্দাজরা তাঁকে এই ফুলদানিটা উপহার দিয়েছিলো। তিনি আবার সেটা তাঁর মেয়েকে দেন…।'

ম্যাথিলডা তার মায়ের পিছনে পিছনে এসেছিল। এই বিকট কুৎসিত নীল-রঙ ফুলদানিটা ভেঙে গেছে দেখে সে খুব খুশি হল। জুলিয়ান চুপ করে রইল, সে খুব বেশী অভিভূত হয় নি। সে দেখল, ম্যাথিলডা তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাদাম মোলকে বলল জুলিয়ান—'এই ফুলদানিটা চিরকালের জন্য ভেঙ্গে গেছে, এবং আমার মনে দারুণ আঘাত হেনেছে, এ কাজের জন্য যে অপরাধ

আমি করেছি আমার সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।' এবং সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যেতে মাদাম বললেন—'ওর কথা শুনে লোকে বলবে যে এই সোরেল ছোকরা বড় অহঙ্কারী এবং কৃত-কর্মের জন্য সে আনন্দিত।'

তাঁর কথাগুলো সোজাসুজি ম্যাথিলডার অন্তরে আঘাত হানল। মনে মনে সে আওড়াল, আমার মা সত্য কথাটাই আন্দাজ করতে পেরেছে, বাস্তবিকই এটাই ওর মনের ভাব। গতকাল জুলিয়ানকে যে সব কথা বলে সে আনন্দ পেয়েছিল এখন তার মন থেকে সে ভাব বদলে গেল। আহা, ওদের মধ্যে সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। আমিই তার বড় উদাহরণ। আমার ভুল ভয়ানক আর অসম্মানজনক। অবশিষ্ট জীবনে এই শিক্ষা আমার মনে থাকবে।

কেন আমি সত্য কথা বললাম না? জুলিয়ান ভাবল, এই ক্ষ্যাপা মেয়েটার প্রতি যে ভালবাসা আমি অনুভব করি তা কেন আমাকে যন্ত্রণা দেবে?

এই যে ভালবাসা যা সে ভেবেছিল শেষ হয়ে গেছে তা কিন্তু দ্রুত বাড়তে লাগল। জুলিয়ান ভাবল ম্যাথিলডা পাগল কিন্তু তার জন্য সে কি কম কমনীয়? ওর চেয়ে কি আর কেউ বেশী লাবণ্যময়ী? সুসভ্য সমাজের প্রতিটি তীব্র আনন্দের ঝলক ম্যাথিলডার মধ্যে মিশিয়ে যায় নি? অতীত দিনের আনন্দের স্মৃতি জুলিয়ানের মন জুড়ে বসল, এবং সমস্ত যুক্তি-তর্কের অবসান ঘটাল, বৃথাই এই ধরনের স্মৃতির সঙ্গে তার বিচার শক্তি লড়াই করছিল। তার প্রবল প্রচেষ্টা শুধু আকর্ষণকে আরও তীব্র করল।

জাপানী ফুলদানিটা ভাঙ্গার চব্বিশ ঘণ্টা পরে জুলিয়ানের ধারণা হল সেই সব চেয়ে নিরানন্দ মানুষ।

২১ ঃ গোপন বৃত্তান্ত

যা' কিছু লিখছি তা' দেখেছি, তবে আমার দেখার ব্যাপারে ঠকলেও, আমি তোমাদের বলার মধ্যে ঠকাবো না।

—লেখকের কাছে চিঠি থেকে

মারকুইস তাকে ডেকে পাঠালেন। মনে হল, মারকুইস যেন তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন, তাঁর চোখ দু'টো খুব প্রোজ্জ্বল।

তিনি জুলিয়ানকে বললেন—'এস, তোমার স্মরণশক্তি নিয়ে দু'টো কথা বলি। শুনেছি তোমার স্মরণশক্তি অদ্ভুত। আজ চার পৃষ্ঠা লেখা মুখস্থ করে তা' লণ্ডনে গিয়ে বলতে পারবে? তবে একটা শব্দও বদলাতে পারবে না।'

সেদিনকার সংবাদপত্রখানা নিয়ে মারকুইস নাড়াচাড়া করছিলেন, তাঁর

মনটা খুঁতখুঁত করছিল। মারকুইসের এমন অধীরতা আর কখনও জুলিয়ানের নজরে পড়ে নি, এমন কি ফ্রিলেয়ারের মামলা নিয়েও তিনি এমন অধীর হন নি কোনদিন।

ভদ্র সমাজ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা জুলিয়ান ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। জানে, এসময় আকস্মিকতায় বিস্মিত হলেও তাকে মৃদুকণ্ঠে কথা বলতে হবে।

—'আজকের সংবাদপত্রখানা খুব চিত্তাকর্ষক নয়, তবে আপনি অনুমতি করলে কাল সকালে গোটা সংবাদপত্রের লেখাগুলো আমি মুখস্থ বলতে পারব।'

—'কি! বিজ্ঞাপনের লেখাগুলোও?'

—'হ্যাঁ, নির্ভুলভাবে বলব! একটা শব্দও বাদ যাবে না।'

সহসা বিষণ্ন মনে মারকুইস বলে উঠলেন—'কথা দিচ্ছ ত?'

—'হ্যাঁ, স্যার! তবে কথা রাখার ভয় দেখালে আমার স্মরণশক্তি আচ্ছন্ন হতে পারে।'

—'ঠিক এই কথাগুলোই কাল তোমায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। যে কথাগুলো এখন শুনলে তা' কোথাও বলবে না এমন শপথ তোমায় নিতে বলছি না। জানি সে কথা বললে তোমায় অপমান করা হবে। একখানা ঘরে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে আরও বার জন লোক হাজির থাকবে। প্রত্যেকে যা বলবে তুমি তা লিখে নেবে। ভয় পেয়ো না। একসাথে এলোমেলো কথা তারা বলবে না, প্রত্যেকে নিজের নিজের সুযোগ এলে তবে বলবে। আমরা যখন আলোচনা করব তুমি তখন খান কুড়ি কাগজে তা লিখে নেবে। তারপর আমার সঙ্গে এখানে ফিরে আসবে। ওই সব আলোচনা খান চারেক কাগজে সংক্ষেপে লেখা হবে। কাল সকালে গোটা সংবাদপত্রের বদলে এই চার পৃষ্ঠার লেখা তুমি আমার কাছে মুখস্থ বলবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বিদেশে পাড়ি দিতে হবে। এমনভাবে যাবে যেন একজন যুবক বিদেশে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছে। অপরের নজর এড়িয়ে যাবে। ওখানে হাজির হয়ে তোমাকে আরও দক্ষতা দেখাতে হবে। তোমার চারধারের লোককে ফাঁকি দেওয়াই হবে তোমার কাজ, কেননা সেখানে একজন নামকরা ব্যক্তির কাছে যেতে হবে তোমাকে। ওই ব্যক্তির সেক্রেটারি বা চাকর-বাকররা আমাদের শত্রুপক্ষের চর থাকতে পারে। তারা তোমাকে বাধা দিতে পারে।' বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে কথাগুলো বললেন মারকুইস।

জুলিয়ান মন দিয়ে সব কথা শুনছিল।

আবার বলতে লাগলেন মারকুইস—'দেখে চেনা যাবে না এমন একটা অভিজ্ঞানপত্র তোমায় দেব। মহামান্য ডিউক যখন তোমার দিকে তাকাবেন তখন আমার এই ঘড়িটা তাঁকে দেখাবে, এটা তোমাকে আমি দিচ্ছি। এই নাও এটা, তোমারটা আমায় দাও।'

ঘড়ি বদল করল জুলিয়ান।

—তোমার মুখস্থ-করা কথাগুলো যখন বলবে তখন ডিউক কাউকে তা' লিখে নিতে বলবেন। বলা শেষ হলে ডিউক জিজ্ঞাসা করলে আজকের যে সভায় তুমি যাচ্ছ সেই সভার বৃত্তান্ত তাঁকে বলো, তবে আগে বলবে না। একটা কথা, পথে তুমি বিপদে পড়তে পার। প্যারিস থেকে মন্ত্রীর বাড়ী যাওয়ার পথে শত্রুপক্ষের কেউ মঁসিয়ে সোরেলকে গুলি করে হত্যা করতে পারে। তাহলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও আমাদের দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু প্রিয় যুবক, তোমার হত্যার খবর আমরা কি করে তাহলে পাব? তোমার মনের জোর ত আর তখন আমাদের খবর পাঠাতে পারবে না।' থামলেন মারকুইস।

জুলিয়ান ভাবতে লাগল।

চিন্তিত মনে মারকুইস বললেন—'যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে পোশাক কিনে আন নিজের জন্য। ঠিক দু'বছর আগে যেমন পোশাক পরে এসেছিলে তেমনি পোশাক পরবে আজ। তোমাকে জঘন্য দেখাবে। তবে যাত্রাকালে তুমি স্বাভাবিক পোশাক পরবে। তুমি কি অবাক হচ্ছ? তোমার মনের সন্দেহ কি এর কারণ আন্দাজ করতে পারছে? হ্যাঁ, ক্ষুদে বন্ধু, হ্যাঁ। আজ রাতে যেসব মান্য-গণ্য ভদ্রলোকদের সাথে তোমার দেখা হচ্ছে, তাদের কেউ গোপন খবর পাঠাতে পারে। তাহলে কোনও পান্থশালায় ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলে চরেরা তোমার খাবারে অন্ততঃ আফিম মিশিয়ে দিতে পারে।'

অমনি জুলিয়ান বলে বসল—'তাহলে সোজা পথ ছেড়ে আরও ত্রিশ লীগ ঘুর পথে যাওয়া ভাল। ধরুন, রোম শহর থেকে যাত্রার কথা বলছি··· ।'

সহসা মারকুইসের মুখে চোখে অখুশির ভাব ফুটে উঠতে দেখল জুলিয়ান··· 'ব্রে-লা-হাউত শহরে ছাড়া মারকুইসের এমন নিরানন্দ-ভাব আর সে দেখে নি।

—'যখন উপযুক্ত মনে হবে তখন ঠিক তুমি জানবে, স্যার। প্রশ্ন শুনতে আমি চাই না।'

অবাধে জবাব দিল জুলিয়ান—'এটা প্রশ্ন নয়, আপনাকে শপথ করে বলছি, স্যার। তবে নিরাপদ রাস্তার কথা ভাবতে ভাবতে এটা আমার মাথায় এল, তাই বললাম।'

—'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তোমার মন বহু দূরে ঘুরছে। একটা কথা কখনো ভুলো না, কোন রাষ্ট্রদূত, বিশেষ করে তোমার বয়সী, জোর করে বিশ্বাসী হতে চায় না।'

ভুল করেছে, তাই জুলিয়ান দারুণ অপমান বোধ করল। তার আত্ম-সম্মানবোধ একটা ওজোড় খুঁজল—কিন্তু পেল না।

মারকুইস বললেন—'শেখবার চেষ্টা কর, মানুষ বোকামি করলে প্রথমেই নিজের মনের কাছেই আবেদন জানায়।'

ঘণ্টাখানেক পরে জুলিয়ান মারকুইসের ভিতরের ঘরে ঢুকল। তার পরনে

একটা জঘন্য পোশাক। তাকে দেখে ফেললেন মারকুইস এবং জুলিয়ান বুঝতে পারল যে, সে মারকুইসের সমর্থন লাভ করেছে।

মারকুইস তখন ভাবছিলেন, এই যুবক যদি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তবে তিনি আর কাকে বিশ্বাস করবেন? এবং কাজ যখন করতে হবে তখন একজনকে ত বিশ্বাস করতেই হবে। আমার ছেলে আর তার বুদ্ধিমান বন্ধুরা সবাই এক ধাঁচের···বিশ্বাসী এবং দুঃসাহসী। লড়াই করার প্রয়োজন হলে তারা সিংহাসনের বেদীমূলে জীবন দেবে। কি করে সব কিছু করতে হবে তা' তাদের জানা···শুধু জানে না এই মুহূর্তে কি করতে হবে। ওদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে চার পৃষ্ঠা মুখস্থ করে এবং শত্রুর চরদের নজর এড়িয়ে এক শ' মাইল ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে। নরবারট তার পূর্বপুরুষদের মত জানে কি করে জীবন বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত একজন সৈনিকও ত তা' জানে··· ।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মারকুইসের মন : এবং যদি মরবার দরকার হয় তবে এই সোরেল ছোকরাও তা পারবে···

মনের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক কোনও চিন্তাকে দূর করার জন্যই যেন মারকুইস বললেন—'চল, গাড়ীতে গিয়ে বসি··· ।'

জুলিয়ান বলল—'স্যার, ওরা যখন আমার কোটটা ঠিক করছিল তখন আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটা মুখস্থ করে ফেলেছি।'

মারকুইস কাগজখানা হাতে নিলেন এবং একটা শব্দও ভুল না বলে জুলিয়ান সারা কাগজখানা মুখস্থ বলে গেল। ভাবনায় আবার ডুব দিলেন মারকুইস। কূটনীতিজ্ঞের মতন তাঁর মনের অবস্থা।

তাঁরা একখানা ভাঙা-চোরা বাড়ীর পুরনো ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে একখানা বড় ডিনার-টেবিল। সেখানা সভার জন্য সাজানো হয়েছে।

বাড়ীর মালিক একজন ভীষণ বলশালী ভদ্রলোক। তার মুখের ভাব এবং কথা বলার জোরালো ভঙ্গি দেখে জুলিয়ান বুঝতে পারল যে, এ লোক সহজে রাগারাগি করে না। মারকুইসের ইঙ্গিতে জুলিয়ান টেবিলের এক প্রান্তে বসে পালকের কলম সরু করায় মন দিল। এক সময় বাঁকা চোখে দেখল জুলিয়ান জন সাতেক বক্তা এসেছে। তাদের কারো মুখ তার নজরে পড়ছিল না, কেবল তাদের পিঠ দেখতে পাচ্ছিল। তাদের দু'জন মারকুইসকে সাম্যের কথা বলছিল।

আরও একজন ঘরে ঢুকল···কিন্তু কেউ তার নাম ঘোষণা করল না। আশ্চর্য, এখানে ত কেউ নাম ঘোষণা করছে না! এই সাবধানতা কি ওরা আমার সম্মানে গ্রহণ করেছে? সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে সম্মান দেখাল। লোকটা বেঁটে আর মোটাসোটা···ঝকঝকে গায়ের রঙ আর উজ্জ্বল দৃষ্টি···যেন বুনো শুয়োরের মত হিংস্র-স্বভাব।

ঠিক তখনি আসা আর একজন লোকের উপর জুলিয়ানের নজর পড়ল। লোকটি একেবারে ভিন্ন-ধাতের মানুষ। ঢ্যাঙা আর খুব রোগা শরীর···তিন-চারটে-কোট পরেছে। দু'চোখে সদয়-ভাব আর ভাব-ভঙ্গি খুবই ভদ্র। লোকটার বেসানকনের বিশপের মত মুখ—ও নির্ঘাৎ একজন যাজক। বয়স পঞ্চাশের ওপর। এমন যাজক যাজক চেহারা আর কারো নয়।

আগদির তরুণ বিশপ ঘরে ঢুকল। জুলিয়ানের উপর নজর পড়তেই বিশপ অবাক হল। তার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে জুলিয়ান লজ্জিত হল, বিরক্তি বোধ করল। কি! আমি যখনই একটু অসুবিধার মধ্যে পড়ব তখনি এই পরিচিত লোকটা সেখানে হাজির হবে? এই যে সব অভিজাত জমিদার, এরা কেউ আমাকে আগে দেখে নি এবং ওরা আমাকে একেবারেই চেনে না···কিন্তু এই তরুণ বিশপের দৃষ্টি দেখে আমার দেহ হিম হয়ে যাচ্ছে। এটা মানতেই হবে, আমি এক অদ্ভুত আর ভাগ্যহীন লোক।

রীতিমত সাড়া শব্দ তুলে একজন কৃষ্ণকায় ছোটখাট মানুষ ঘরে ঢুকল। এবং প্রায় ঘরের দরজার কাছ থেকেই বক্-বক্ করতে সুরু করল। এই বাচাল লোকটা ঘরে ঢোকার পর থেকে ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কথা বলতে লাগল। বোধ হয় ওর একঘেয়ে বকবকানি এড়াবার জন্য ওরা এমনটা করল।

ওরা ক্রমে ক্রমে ফায়ার-প্লেস থেকে সরে টেবিলের এ-প্রান্তে জুলিয়ানের কাছাকাছি এসে বসল। জুলিয়ানের আচরণে লাজুক-ভাব বাড়ল। চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওদের কথা না শুনে সে পারল না। সমস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত জানা না থাকলেও ওরা যে একটা গুরুতর বিষয় গোপন না করে আলোচনা করছে তা' বুঝতে পারল। অথচ ওদের এই আলোচনা গোপন রাখা উচিৎ।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা পালকের কলম জুলিয়ান সরু করে কেটেছে।

মারকুইসের ইঙ্গিত জানার জন্য সে তাঁর দিকে তাকাল, কিন্তু তিনি তার কথা ভুলে গেছেন।

ভাবল জুলিয়ান, এখানে আমি যা' করছি তা' হাস্যকর। কিন্তু এই সাধারণ-মুখ লোকগুলো, যাদের উপর অন্যরা বিশ্বাস অর্পণ করেছে, তাদের আরও ভাবপ্রবণ হওয়া উচিৎ ছিল। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার দু'চোখে কৌতূহল এবং ওরা তা দেখে বিরক্ত হচ্ছে। আমি দৃষ্টি নত করলে ওরা ভাববে আমি ওদের কথা মনের মধ্যে জমা করছি।

তার বিব্রত-ভাব তীব্র হয়ে উঠল। সে বিস্ময়কর বিষয়ের কথা শুনল।

২২ ঃ আলোচনা

প্রজাতন্ত্র! এমন কেউ কেউ আছে যে সাধারণের কল্যাণে সব কিছু উৎসর্গ করবে···হাজার হাজার তেমন মানুষ আছে···না, আছে লক্ষ লক্ষ···তারা

কোন অধিকার স্বীকার করে না, কিন্তু তাদের মনে রয়েছে আনন্দ এবং গর্ববোধ। প্যারিসে লোকে সম্মান অর্জন করে তার ঘোড়া ও গাড়ীর দরুণ…তার গুণের জন্য সম্মান পায় না।

—নেপোলিয়ন : স্মৃতি-চিহ্ন

সহিস ঘোষণা করল—'মহামান্য ডিউক··· ।'

—'চুপ কর, আহাম্মক!' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডিউক তাকে ধমক দিলেন। এমন সুন্দর এবং মর্যাদাপূর্ণ বাচনভঙ্গিতে তিনি সহিসকে ধমকালেন যে জুলিয়ান না ভেবে পারল না যে, এত জ্ঞান থাকা সত্বেও কেন তিনি সহিসকে ধমকালেন। হয় ত এটাই স্বভাবের রীতি। তাঁর দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে জুলিয়ান দৃষ্টি নত করল। নতুন আগন্তুক যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আন্দাজ করেছিল এবং দৃষ্টি নত করে নিল পাছে অবাধ্যতা প্রকাশ পায়।

বছর পঞ্চাশ বয়স ডিউকের, সম্ভ্রান্ত পুরুষের মত পোশাক পরনে। হাঁটছেন যেন স্প্রিঙের উপর ভর দিয়ে। সঙ্কীর্ণ মাথার গড়ন, দীর্ঘ নাসা আর নিটোল রেখায়িত মুখমণ্ডল। একই দেহ একই সঙ্গে এমন সম্ভ্রান্ত এবং এমন নগণ্য প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাঁর উপস্থিতিই যেন ঘোষণা করল এবার সভার কাজ সুরু হবে।

সভার মানুষদের দেহ বিশ্লেষণের কাজে বাধা পড়ল।

সহসা মারকুইস বললেন—'এ্যাবি সোরেলের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই যুবকের স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজ করার সম্মান তাকে দেওয়া যেতে পারে। সে তা' পারবে। ঘন্টাখানেক আগে আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাখানা মুখস্থ বলে সে তার স্মৃতিশক্তির প্রমাণ দিয়েছে।'

বাড়ীর মালিক সংবাদ-পত্রখানা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিয়ে জুলিয়ানের দিকে তাকাল এবং বলল—'কই বলুন মশাই।'

ঘরের মধ্যে নিথর নিস্তব্ধতা। সকলের নজর জুলিয়ানের দিকে।

জুলিয়ান মুখস্থ বলতে সুরু করল। কুড়ি ছত্র বলবার পর ডিউক বলে উঠলেন—'এতেই হবে।' শুয়োর-চোখ ক্ষুদে লোকটা বসে পড়ল। সেই সভাপতি চেয়ারে বসে সে জুলিয়ানকে একখানা লেখার টেবিল দেখিয়ে দিল। জুলিয়ান লেখার সরঞ্জাম নিয়ে সেই টেবিলে গিয়ে বসল। গণনা করে দেখল সবুজ-রঙ টেবিল-ঢাকা ঘিরে বারো জন বসে আছে।

ডিউক বললেন—'ম'সিয়ে সোরেল এখন পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা

ডাকব আপনাকে।'

বাড়ীর মালিক পাশের লোকটিকে মৃদুস্বরে বলল—'ও ঘরের জানালার খড়খড়িগুলো ত বন্ধ নয়।' তারপর গলা চড়িয়ে বলল—'জানালার বাইরে তাকিও না, সেটা ভাল হবে না।' ওর কথাগুলো কেমন বোকা বোকা শোনাল।

জুলিয়ান ভাবতে লাগল, এখানে একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি। কোন বিপদ ঘটলেও আমি মারকুইসের কাছে ঋণী। আমার বোকামির ফলে উনি যদি কোন বিপদে পড়েন এবং আমি যদি তাঁকে সাহায্য করতে পারি তবে খুশি হব।

ওই ঘরে অনেকক্ষণ বসে নিজের অবস্থা চিন্তা করতে লাগল জুলিয়ান।

মাঝে মাঝে পাশের ঘরে ওদের কণ্ঠস্বর জোরালো হয়ে উঠছিল।

অবশেষে দরজা খুলে তাকে ডাকা হল।

সভাপতি বলতে লাগল—'ভদ্রলোকেরা মনে রাখবেন এই মুহূর্ত থেকে আমরা ডিউকের উপস্থিতিতে কথা বলছি। আর এই তরুণ পাদরীর পদ-প্রার্থী আমাদের পবিত্র কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তিনি তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।'

তারপর পাদরীর মতন দেখতে ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করে সভাপতি বলতে বলল।

রাজনীতি যেন সাহিত্যের গলায় বাঁধা একখানা পাথর, ছ'মাসের মধ্যেই ডুবিয়ে দেবে সাহিত্যকে···রাজনীতি যেন অনেক বস্তুর মধ্যে একটা কল্পিত বস্তু, কিংবা বলা যায় যন্ত্র-সঙ্গীতের মাঝখানে পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। কান-ফাটানো তার আওয়াজ, কোন যন্ত্র-সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে তার আওয়াজের মিল হয় না।

অনেক বাগাড়ম্বর এবং দর্শনের বয়ান আওড়াবার পর পাদরীর মতন ভদ্রলোক বলতে লাগল—'মহান দেশ ইংলণ্ড, সেই দেশের পরিচালক অমর পিট আমাদের দেশের বিপ্লবকে খতম করার জন্য চল্লিশ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক খরচ করেছিলেন। এই সভা যদি আমাকে বলবার অনুমতি দেয় তবে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, ইংলণ্ড পুরোপুরি বুঝতেই পারছে না যে বোনাপার্টের দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি···।'

বাড়ীর মালিক বিরক্ত-কণ্ঠে বলল—'ব্যস! হত্যাকারীর প্রশংসায় মুখর একটি কণ্ঠ।'

শুয়োর-দৃষ্টি সভাপতির রাগে দু'চোখ জ্বলতে লাগল। বলল—'তোমার ভাবপ্রবণ কপচানি থামাও, ওকে বলতে দাও। বল তুমি।'

ঢ্যাঙা একাধিক ওয়েস্ট-কোট পরা লোকটা আবার বলতে লাগল—'সেই মহান দেশ ইংলণ্ড ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতিটি ইংরেজ তার দৈনন্দিন রুটির দাম

দেওয়ার আগে চল্লিশ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঙ্কের সুদ মেটায়। অথচ সেই অর্থ জ্যাকোবিনপন্থীদের ধ্বংস করতে নিয়োগ করা হয়েছিল। আর পিট নেই ইংলণ্ডে…।

নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে সামরিক বাহিনীর ভদ্রলোক বলল—'কিন্তু আছে ডিউক অব অয়েলিংটন…।'

সভাপতি আবার ধমক দিল—'তোমরা এভাবে গোলমাল করলে মঁসিয়ে সোরেলকে ডেকে আনার কি দরকার ছিল।'

বক্তা আবার বলতে লাগল—'ওদেশে আর পিট নেই, থাকলেও ইংরাজ জাতের আর নষ্ট করার মত অত অর্থ নেই…।'

অমনি সামরিক বাহিনীর ভদ্রলোক বলে উঠল—'তাই ফরাসীদেশে বোনাপার্টের মত বিজয়ী একজন সেনাপতির আবির্ভাব অসম্ভব।'

এই মন্তব্য শুনে সভাপতি এবং ডিউকের প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকলেও কিছু বললেন না।

—'মোদ্দা কথাটা আপনাদের বলছি: ভাল কাজে আর আধ পেনি খরচ করার মত ক্ষমতা ইংলণ্ডের নেই। পিট নিজে ফিরে এলেও তাঁর সব প্রতিভা দিয়ে এ কাজ করতে পারতেন না। ওই ইংলণ্ডের ছোটখাট জমিদারদের চোখে আর ধূলো দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু ওয়াটারলু অভিযানের জন্য তাদের খরচ হয়েছে এক শ' হাজার মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। তাই বলছি: নিজেরা নিজেদের সাহায্য করো। তোমাদের কাজে ইংলণ্ড আর সাহায্য করতে পারবে না। আর ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য না দিলে অস্ট্রিয়া, রুশিয়া, প্রুশিয়া এরা কেউ সাহায্য করবে না কেননা এদের সাহস থাকলেও অর্থ নেই। তাই জ্যাকোবিনপন্থীদের বিরুদ্ধে কোন সেনাদল খাড়া করলে প্রথম অভিযানেই তারা খতম হবে। আর বিপ্লবীদের দলে পুরনো সৈনিকরাও এসে সামিল হবে।'

এবার সবাই মিলে নানা ধরনের মন্তব্য স্থরু করল।

জুলিয়ান পাশের ঘরে চলে গেল এই বক্তৃতার অনুলিপি করার জন্য।

আবার তার ডাক পড়ল।

মারকুইস নিজে এবার বক্তা।

—'এই অসুখী জাতের সকলের কাছে একটাই প্রশ্ন: ঈশ্বর, টেবিল কিংবা বেসিন কি হবে? বোকারা বলবে: আমি ঈশ্বর হব। এই প্রবাদটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। নিজেদের জন্যে কাজ করো, তাহলেই আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ের মত ষোড়শ লুইয়ের সময়ের মত ফরাসী দেশ আবার মহীয়ান হয়ে উঠবে। ইংলণ্ড অথবা তার জমিদারশ্রেণী ঠিক আমাদের মত জ্যাকোবিন-পন্থীদের ঘৃণা করে। ইংরেজদের অর্থ সাহায্য ছাড়া অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া বা রুশিয়া কেউ দু'তিনটের বেশী লড়াই চালাতে পারবে না। মঁসিয়ে রিচেলু বোকামি করে যে সুযোগ নষ্ট করেছে এই দু'তিনটে লড়াই করে সে

সুযোগ কি আমরা ফিরে পাব।'

আবার সবাই হৈ-হৈ করে উঠল, বাধা দিল ভাষণে।

মারকুইস বললেন—'কেবল বিদেশীদের সাহায্য নয়, নতুন করে আমাদের সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। যে সব যুবক গরম গরম প্রবন্ধ লেখে তাদের নিয়ে তিন চার হাজারের একটা সেনাবাহিনী তৈরী করা যাক। ফরাসী দেশে দু'টো মাত্র দল থাকবে। পরিষ্কার দুটো দল, পরস্পর-বিরোধী। আমাদের জানা দরকার কাদের ধ্বংস করব। একদিকে সাংবাদিকরা, তারা নির্বাচক, জনমত গঠন করে। সংক্ষেপে বলা যায় কম বয়সী ছোকরা যারা এসব প্রশংসা করে তাদের ধ্বংস করবে। আমাদের সুবিধাও আছে কারণ দেশের বাজেট আমরা নিয়ন্ত্রণ করি।'

আবার বাধা দিল একজন।

মারকুইস বাধাদানকারীকে উদ্দেশ করে বললেন—'দেখ, তুমি নিজেই ত ভালভাবে কাজ কর নি কেননা তোমার মনে লেগেছিল। তুমি ত চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক নষ্ট করেছ। বাজেট থেকে এ টাকা তোমায় দেওয়া হয়েছিল। আর চাঁদা হিসেবে তুলেছিলে আশী হাজার ফ্রাঙ্ক। তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করছ তাই দৃষ্টান্ত হিসাবে তোমার কথা বলছি। তোমার পূর্বপুরুষরা ত ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আচ্ছা তুমি কি এক লাখ কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে একটা সেনাদল কিংবা লড়াই করবার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশজন সৈনিক তৈরী করেছ। তার বদলে জনা কয়েক চাকর ভাড়া করেছ। বিপ্লব সুরু হলে ওদের জন্যে তুমি নিজেই ভয় পাবে। তুমি নিজেই যখন শ' পাচেক সৈনিককে শিক্ষিত করে তুলতে পার নি তখন রাজসিংহাসন, ধর্মবেদী এবং আভিজাত্য একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। হাঁ, তারা সবাই যেন অনুরক্ত আর নিবেদিত-প্রাণ হয়। তাদের মনে সাহস থাকবে ফরাসীদের মত কিন্তু জেদ হবে স্পেনীয়দের মত।'

আর কেউ মারকুইসের ভাষণে বাধা দিল না।

—'এই সেনাবাহিনীর অন্ততঃ অর্ধেক সেনা হবে আমাদের ছেলে আর ভাইপোরা। অর্থাৎ জন্মসূত্রে যারা ভদ্রলোক। তাদের সঙ্গে কেবল শহরের মধ্যবিত্তরা থাকবে না, থাকবে গ্রামের সরল চাষী যুবকরাও। তে-রঙা ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলবে। আমাদের ভদ্রলোকেরা তাদের এই সেনাদলের উদ্দেশ্যও শেখাবে। তারা হবে তাদের ভাই। আমাদের প্রত্যেকেই তার আয়ের এক পঞ্চমাংশ খরচ করে বিভাগে বিভাগে পাঁচ শ' সেনার সেনাবাহিনী গঠন করুক। তারপর তোমরা বিদেশী সাহায্য পাওয়ার কথা ভেব। প্রত্যেক বিভাগে যদি পাঁচ শ' করে সহযোদ্ধা দেখতে না পায় তবে কোন বিদেশী সেনাদল দিজন শহর পর্যন্ত এগিয়ে আসবে না। সশস্ত্র বিশ হাজার ভদ্রলোক সৈন্য নিয়ে তুমি ফরাসীদেশে প্রবেশের দরজা খুলে দেবে এই খবর না পেলে কোন বিদেশী রাজা তোমার কথা কানেই তুলবে না। তোমরা হয়ত বলবে যে, এই কাজ খুবই

শ্রম-সাধ্য। কিন্তু আমাদের জীবন দিয়ে এই মূল্য শোধ করতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে শুধু লড়াই করে মরার সুযোগ। হয় কারখানার মজুর আর না হয় চাষী হও…নতুবা হাতে তুলে নাও বন্দুক। ভীরু হতে চাও, হও। কিন্তু বোকা হয়ো না। চোখ খোল তোমরা।' মারকুইস থামলেন।

আর কেউ কথা বলল না। নীরব শ্রোতা।

—'জ্যাকোবিন-পন্থীদের গানের ভাষায় বলছি: সাজাও সৈন্য-ব্যূহ। তখন দেখবে রাজতন্ত্রের আসন্ন বিপদ দেখে তিন শ' মাইল দূর থেকে গুসতাভাস এ্যাডলফাসের মতন কোনও রাজা তোমাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে। গুসতাভাস এ্যাডলফাস যেমন প্রোটেস্টান্ট রাজকুমারদের জন্যে কাজ করেছিলেন তেমনিভাবে তোমাদের সাহায্য করবে। কাজ না করে তোমরা কি কেবল কথাই বলবে? বলছি শোন, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সারা ইউরোপে প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ছাড়া একজনও রাজার অস্তিত্ব থাকবে না। আর এই দু' অক্ষরের 'রা…জা' শব্দটার সঙ্গে পাদরী আর অভিজাতরাও শেষ হয়ে যাবে। আমি ত রাজসভায় প্রবল পক্ষের প্রার্থীদের চেহারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একথা বলে এখন আর কোনও লাভ হবে না যে রাজতন্ত্র এবং গীর্জার প্রভাব রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তে ফরাসীদেশে কোন নামকরা পরিচিত এবং সর্বজনমান্য সেনানায়ক নেই।' মারকুইস আবার বললেন।

—'কিন্তু দু' লক্ষ নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক লড়াই করার জন্য ত অধীর হয়ে উঠেছে…।'

কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং হাসিমুখে বললেন মারকুইস—'নিরানন্দ সত্য কথাগুলো মনে রেখেই আমাদের কাজ করতে হবে।' কথাগুলো বললেন জুলিয়ানকে ইঙ্গিত করে।

—'মহাশয়রা নিরানন্দ সত্য কথাগুলো মনে রেখেই অতএব কাজ সুরু করা যাক। পচা ঘায়ের দরুণ যার পা কেটে ফেলতে হবে সে লোক শল্য-চিকিৎসককে ভুল তথ্য বলে: খারাপ পা-খানা সবলই আছে। একথা বলার জন্য ক্ষমা করো তোমরা, ডিউক আমাদের শল্য-চিকিৎসক।' মারকুইস তাঁর বলা শেষ করলেন।

জুলিয়ান ভাবল—অবশেষে থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আর এই কাজের উদ্দেশ্যেই আজ রাতে আমাকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে।

২৩: ধর্ম-প্রচারক পাদরী, বনভূমি, স্বাধীনতা

> জীবের প্রাথমিক ধর্ম হচ্ছে আত্মরক্ষা করা, বেঁচে থাকা। বিষের দানা বপন করলে বিষের পাকা ফসল আহরণ করার আশা করতে পার।
>
> —মেকিয়াভেলি।

মহান ব্যক্তিরা তখনও বলছিল। তাদের বলবার বিষয় সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল।

সভায় আলোচিত সত্য কথাগুলো জুলিয়ানের মন ভারি করে তুলল: আমাদের সেবায় নিয়োগের জন্য ইংলণ্ডের হাতে একটা গিনিও নেই, অর্থনীতি আর হিউম ওখানে এখন একটা ফ্যাসান। এমন কি ধর্মগুরুরাও আর আমাদের একটা পয়সাও দেবে না এবং মিস্টার ব্রুহাম আমাদের দেখে হাসবে। ইংলণ্ডের অর্থ-সাহায্য না পেলে ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের সাহায্যে আমরা ছ'টো যুদ্ধও লড়তে পারব না! এবং একমাত্র যুদ্ধে আমরা খতম করতে পারব না মধ্যবিত্তদের। ফরাসীদেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র একটি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, নইলে ইউরোপের রাজা-রাজড়ারা ছ'টো যুদ্ধ করতেও এগিয়ে আসবে না। পাদরীদের সাহায্য ছাড়া ফরাসীভূমিতে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব। তাই পাদরীদের সব সুযোগ দিতে হবে। সীমান্ত থেকে শত শত মাইল দূরে শহরে-গ্রামে দিন রাত নিজেদের কাজ করেও উচ্চ-নিম্ন সব স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে।

বাড়ীর মালিক বলে উঠল—'রোম! রোম!'

এবার প্রধান ধর্মযাজক গর্বের সাথে বলল—'হাঁ, রোমের কথাই বলছি। কেননা বিপ্লবের সময়ও এই পাদরীরাই নিম্নস্তরের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। এবং এটাও মনে রেখ, তাদের নিয়োগের দিন থেকেই পঞ্চাশ হাজার পাদরী একই উপদেশ সাধারণ মানুষদের শোনায়। কবিতার চেয়ে সেনাবাহিনীর উপর তাদের প্রভাব বেশী জোরালো। তোমাদের চেয়ে পাদরীদের বুদ্ধিও বেশী। এই যে পঞ্চাশ হাজার যুবককে নিয়ে সশস্ত্র সেনাবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করছ এবং এটাই ত তোমাদের প্রধান কাজ··· আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে সে-কাজ সুরু করেছি। যেহেতু যুদ্ধের ঘোড়ার দিকেই পাদরীদের হাত থেকে বনভূমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাই আজ তারা নিঃস্ব। অথচ অর্থমন্ত্রী বলছে যে পাদরীরা ছাড়া আর কারও হাতে অর্থ নেই। অন্তর থেকেই বলছি, ফরাসী ভূমিতে ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই··· তারা শুধু যুদ্ধ ভালবাসে। যে তাদের যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেবে সেই হবে জনপ্রিয়। যুদ্ধ মানেই জেসুইট-পন্থীদের অনাহারে থাকা। যুদ্ধ করার অর্থ এই গর্বোদ্ধত ফরাসী জাতিকে বিদেশী হস্তক্ষেপের ও অধিকারের ভয় থেকে মুক্ত করা।'

সবাই প্রধান ধর্মযাজকের ভাষণ মন দিয়ে শুনছিল।

—'তাই মঁসিয়ে দ্য নারভালের মন্ত্রীত্ব ছাড়া প্রয়োজন। তার নাম শুনলে সবাই বিরক্ত হয়।'

এই কথাগুলো শুনেই আবার সবাই গোলমাল সুরু করল। সবাই একজনের দিকে তাকাল। জুলিয়ানও চিনতে পারল তাঁকে। তিনি প্রধান মন্ত্রী

নারভাল। ডিউক রেজের বাড়ীর বল-নাচের আসরে জুলিয়ান তাঁকে দেখেছিল।

সভার গোলমাল চূড়ান্ত আকার ধারণ করল।

এবার মঁসিয়ে নারভাল উঠে দাঁড়ালেন এবং উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন—আপনাদের কাছে বলতে না চাইলেও বলছি, শুনুন। আমি আর মন্ত্রী-দপ্তরের কাজ দেখি না। আমার নাম শুনলে জ্যাকোবিনপন্থীদের প্রাণে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চারিত হয়। মধ্যপন্থীদের তারা আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাই আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছি। তবে জীবনের একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমি ঈশ্বরের আদেশ লাভ করেছি: 'হয় তোমরা ফাঁসিকাঠে তোমাদের মাথা দেবে আর না হয় ফরাসীভূমিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালের মত দুই-কক্ষ বিশিষ্ট বিধান পরিষদ ছোট করে পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপন করবে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি তা' করবই।' তিনি থামলেন এবং ঘরের মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

জুলিয়ান ভাবল, কি শক্তিশালী অভিনেতা!

মাঝ রাতের ঘণ্টা বাজল। ঘরের নীরবতার মধ্যে একটা কথা যেন ঘুরছিল: আমি তা' করবই।

মারকুইস ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে বললেন ঘরের মধ্যে নতুন বাতি জ্বালিয়ে দিতে।

প্রধান মন্ত্রী নারভাল চলে গেলেন। খানিক পরে শরীর অসুস্থ হচ্ছে এই ছুতা ধরে বোনাপার্টের সময়কার সেনানায়কও ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ওয়েস্ট-কোট পরা লোকটা মন্তব্য করল—'বাজি ফেলে বলছি, সেনানায়ক মন্ত্রীর পিছনে ছুটল। ওকে রাস্তায় ধরে এখানে তাকে দেখতে পাওয়ার একটা বাজে কারণ বলবে। এবং মন্ত্রীর পছন্দ-মত কাজ সে আমাদের সঙ্গে করবে তাও বোঝাবে।'

চাকররা ঘরে নতুন বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

রাত দু'টো বাজল।

এবার বলতে উঠল আগদির বিশপ। এতক্ষণ সে নীরবে সব শুনছিল। জুলিয়ান কিন্তু দেখেছে তার চোখ দু'টো জ্বলছিল। আর তার অন্তর ভিসুভিয়াসের মত অগ্নুদ্গারের জন্য অধীর হয়ে উঠছিল।

—'ইংলণ্ড একটা ভুল করেছিল। কারণ সে সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে নেপোলিয়নের সাথে যোগাযোগ করে নি। কিন্তু ওই লোকটি যখন ডিউক আর প্রাসাদ-রক্ষকের পদ সৃষ্টি করল, ফিরিয়ে আনল রাজ-সিংহাসনের যুগ· তার অন্তিম সময় তখনই ঘনিয়ে এল। যেন তার পতনের সময় পুরো হল। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে অত্যাচারীর ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজ একজন মানুষের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াচ্ছি না, দাঁড়াচ্ছি প্যারিসের বিরুদ্ধে।

প্রত্যেক বিভাগে পাঁচ শ' করে লোককে সশস্ত্র করে কি লাভ হবে? একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া অভিযান, এর শেষ হবে না কোনদিন। যেটা কেবল প্যারিস শহরের নিজস্ব সমস্যা তার জন্য সমগ্র ফরাসীভূমিকে জড়িয়ে কি লাভ হবে? একা প্যারিস শহর তার সংবাদ-পত্র আর বসবার ঘর দিয়ে যত ক্ষতি করছে। এই আধুনিক ব্যাবিলনকে ধ্বংস করা যাক! গীর্জা এবং প্যারিসের মধ্যে এই বৈরীভাব ধ্বংস করতে হবে। এমনি নাটকীয় সমাধানেই রাজতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষিত হবে। বোনাপার্টের বিরুদ্ধে একটা নিঃশ্বাসও ত্যাগ করে নি কেন প্যারিস?' ভাষণ শেষ করল আগদির বিশপ।

রাত তিনটে বাজল।

মারকুইসের সঙ্গে জুলিয়ান ফিরে এল। তিনি বললেন—'দেখ, বিদেশে আমাদের বন্ধুদের কাছে আজকের এই সভার কথা বলো না। আমাদের তরুণ বন্ধুদের সম্বন্ধে জানতে চাইলেও বলবে না কিছুতে। রাজতন্ত্র ধ্বংস হলে ওদের কি হবে? ওরা ধর্মযাজকের পদ নিয়ে রোম শহরে আশ্রয় নেবে আর আমরা এখানে পড়ে পড়ে চাষীদের হাতে মার খাব।'

বাড়ী ফিরে মারকুইস ছাব্বিশ পাতার রিপোর্ট সংক্ষেপে লিখলেন।

তখন রাত পৌনে পাঁচটা।

জুলিয়ানকে বললেন মারকুইস—'বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি এটা এবার পড়ে মুখস্ত করে নাও। তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিও। তোমার ঘরে চাবি দিয়ে দিচ্ছি, নইলে কেউ তোমায় গুম করতে পারে।'

পরের দিন মারকুইস জুলিয়ানকে নিয়ে একখানা পোড়ো-বাড়ীতে হাজির হলেন। বাড়ীখানা প্যারিস থেকে কিছুটা দূরে। এ বাড়ীতে আর কয়েকজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে জুলিয়ানের দেখা হল—এরা সবাই পাদরি। তাকে অন্য নামের একখানা ছাড়পত্র দেওয়া হল···তাতে কোথায় যেতে হবে লেখা আছে।

মারকুইস বলে দিলেন—'দেখ, সাবধানে যাবে। কাল রাতে আমাদের মধ্যে দু'চারজন নকল লোক বন্ধু সেজে ছিল। তারা সময় নষ্ট করাতে চাইবে তোমার।'

একখানা গাড়ীতে চড়ে জুলিয়ান যাত্রা করল।

সংক্ষিপ্ত লেখাটি সে বার বার পড়ে মুখস্থ করে নিয়েছে। কিন্তু প্যারিসের শহরতলি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার মনে হল সে সব ভুলে গেছে। ম্যাথিলডার মুখখানা কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

মেজ শহর পার হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর গ্রাম্য ডাকবাবু রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাকে জানাল যে, একটাও ঘোড়া আস্তাবলে নেই। রাত তখন দশটা বেজে গেছে। দারুণ বিরক্ত হল জুলিয়ান। সে খাবার দিতে বলল। বাড়ীর সামনে বেড়াতে বেড়াতে একসময় সকলের নজর এড়িয়ে আস্তাবলে ঢুকল।

না, একটাও ঘোড়া নেই সেখানে। জুলিয়ান ভাবছিল, লোকটার আচরণ কিন্তু অদ্ভুত। রুক্ষ-দৃষ্টিতে সে আমার হাড়-হদিস বুঝতে চেষ্টা করছে। রাতের খাওয়ার পর সে এখান থেকে পালাবার কথা ভাবতে লাগল। ঘর ছেড়ে একটু গরম হওয়ার লোভে রান্নাঘরে ঢুকল জুলিয়ান।

সহসা বিখ্যাত গায়ক সিনর জেরোনিমোর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কি আনন্দ!

আগুনের ধারে আরাম-কেদারাখানা টেনে নিয়ে জেরোনিমো বক্‌বক্ করছে আর কয়েকজন জারমান চাষী ওর চারধারে বসে হাঁ করে ওর কথা গিলছে।

জেরোনিমো বলল জুলিয়ানকে—'জান, এরা আমার সর্বনাশ করল। কথা দিয়েছি আগামীকাল মেয়েন্স শহরে গান গাইবো। সাত সাতজন রাজা আমার গান শুনতে ওখানে আসবেন। আচ্ছা, চল, একটু বাইরে ফাঁকা হাওয়ায় যাই।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। অনেকটা দূরে এসেছে। এখান থেকে ওদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনা যাবে না। জেরোনিমো বলতে লাগল—'জান এখানে কি ঘটছে? এই ডাকবাবুটা একটা পাকা বদমাস। একটু আগে বাইরে পায়চারি করার সময় গ্রামের একটা লোককে একটা ফ্রাঙ্ক দিয়েছিলাম, তার কাছ থেকে সব শুনেছি। গাঁয়ের ওদিকে আর একটা আস্তাবলে বারোটা ঘোড়া বাঁধা আছে। ওরা একজন পত্রবাহকের না কি যাওয়া দেরী করিয়ে দিতে চায়!'

যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে জুলিয়ান জানতে চাইল—'তাই না-কি?'

এই চালাকিটা ধরতে পারাই সব সমস্যার সমাধান নয়। এখান থেকে তাদের পালাতে হবে। কিন্তু জুলিয়ান আর তার বন্ধু পালানোর ব্যবস্থা করতে পারছে না।

অবশেষে গায়ক জেরোনিমো বলল—'কাল সকাল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমাদের ওরা সন্দেহ করেছে। কাল সকালে মোটা রকম একটা প্রাতরাশের হুকুম করবো। ওরা যখন খাবার তৈরী করবে আমরা তখন পালাবো। বাইরে থেকে ঘোড়া ভাড়া করে পরের ডাকঘরে হাজির হব।

জুলিয়ানের মাথায় তখন অন্য চিন্তা: জেরোনিমো নিজেই হয়ত তার যাওয়া দেরী করিয়ে দিতে চায়। তাই জিজ্ঞাসা করল—'তোমার জিনিষপত্রের কি হবে?'

খাওয়া-দাওয়া করে ওরা শুতে গেল।

জুলিয়ান সবে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সহসা তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখল বিনা অনুমতিতে দুজন লোক তার ঘরে ঢুকে কথা বলছে। একজনকে সে চিনতে পারল···ডাকবাবু, হাতে তার কালি-পড়া একটা লণ্ঠন। জুলিয়ান সঙ্গে করে যে ট্রাঙ্কটা এনেছে তারই ওপর লণ্ঠনের আলো পড়েছে। ডাকবাবুর পাশে আর একজন লোক। জুলিয়ান শুধু লোকটার পরনের কালো কোটের হাতা-দুটো

দেখতে পাচ্ছে। ওটা পাদরীর বহির্বাস। বালিশের নীচে লুকিয়ে-রাখা পিস্তলটার বাঁট চেপে ধরল জুলিয়ান।

ডাকবাবু বলল—'গুরু, ওর জেগে ওঠার ভয় নেই। আপনি যে মদ পাক করে দিয়েছেন তাই ওদের একটু বেশী করে খাইয়ে দিয়েছি।'

পাদরি বলল—'কিন্তু কোন কাগজ-পত্র খুঁজে পাচ্ছি না ত! এ সব ত দেখছি আধুনিক এক ছোকরার শৌখিন জিনিষ-পত্তর। অন্য লোকটাই হয় ত পত্রবাহক, লোকটার কথায় আবার ইতালীয় টান।'

তার কোটের পকেট দুটো খোঁজার জন্যে লোক দু'টো কাছে এল। চোর বলে ওদের গুলি করে মারার দারুণ ইচ্ছে হল জুলিয়ানের। ভাবল, তাহলে, বোকামি করা হবে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। কোট-জামাটা খোঁজা শেষ করে পাদরী বলল—'না, এ লোকটা কূটনীতিক নয়।'

জুলিয়ান মনে মনে আওড়াল : ও যদি আমার দেহ তল্লাস করতে আসে তবে ওকে পস্তাতে হবে। ও আমাকে ছুরি মারতে পারে, কিন্তু আমি তা হতে দেব না।

পাদরী মাথা ঘোরাল। আধ-বোজা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হল জুলিয়ান! পাদরী কাস্তানেদ! লোক দু'টো গলা খাটো করে কথা বললেও কণ্ঠস্বর শুনে জুলিয়ানের মনে হচ্ছিল এদের একজনকে সে চেনে। জগতের একটা জঘন্য বদমাসকে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা কোন রকমে দমন করল জুলিয়ান।···কিন্তু আমার একটা উদ্দেশ্য আছে!

অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে পাদরী চলে গেল।

এ ধরনের সব ঘটনা ঘটতে পারে তাই প্যারিস থেকে অনেক চকোলেট এনেছিল জুলিয়ান। খাওয়ার শেষে এক গ্লাস সেই চকোলেট পান করেছিল। মিনিট পনের পরে জেগে ওঠার ভান করল জুলিয়ান। জেরোনিমোর অবস্থা দেখতে তার ঘরে ঢুকল। কিন্তু তাকে ভাল করে ঘুম থেকে জাগাতে পারল না।

বলল গায়ক—'এখন নেপলসের জমিদারি দিলেও এই ঘুমের আনন্দ ছেড়ে উঠতে আমি রাজী নই।'

—'কিন্তু সাতজন রাজার কি হবে?'

—'তারা অপেক্ষা করবে।'

জুলিয়ান একাই বেরিয়ে পড়ল এবং কাছেই ডিউকের বাড়ী হাজির হল। তাকে মারকুইসের ঘড়ির অভিজ্ঞান দেখাল। ডিউক বললেন—'আমার সঙ্গে এস!'

একটা কফি-হাউসে ওরা ঢুকল।

সব শুনে ডিউক বললেন—'পায়ে হেঁটে পরের ডাকঘরে চলে যাও। তোমার লাগেজ আর গাড়ী এখানে রেখে সোজা চলে যাও স্ট্রাসবুর্গ শহরে। এ মাসের

বাইশ তারিখে সাড়ে বারোটার সময় এই কফি-হাউসে আসবে। আধ ঘন্টার আগে এখান থেকে যাবে না। কাউকে কিছু বলবে না।'

স্ট্রাসবুর্গ পৌছতে দুদিন লাগল জুলিয়ানের।

২৪ : শহর স্ট্রাসবুর্গ

মোহিনী! তোমার মাঝে লুকিয়ে আছে প্রেমের গতিশক্তি, আছে দুঃখ অনুভবের ক্ষমতা। এর আকর্ষণীয় আনন্দ, কোমল আনন্দ শুধু ছড়িয়ে রয়েছে তোমার বৃত্তের বাহিরে। তাকে ঘুমন্ত দেখে আমি বলতে পারি নি : তার ওই দেবোপম সৌন্দর্য আর মধুর ত্রুটিভরা দেহ আমার। ওই ত আমার হাতের নাগালে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, যেমনভাবে ঈশ্বর দয়া করে মানুষের অন্তর মুগ্ধ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে...নারীকে।

—শিলার

একটা সপ্তাহ স্ট্রাসবুর্গে থাকতে বাধ্য হল জুলিয়ান।

তাই ঘুরে ঘুরে সে শহরটা দেখতে লাগল। নানা যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত এই শহর। তার জন্মভূমির গৌরব। তাহলে সে কি প্রেমে পড়েছে? প্রেম সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। আহত অন্তরে তার কল্পনারাজ্যের নায়িকা সুন্দরী ম্যাথিলডা কেবলই আনন্দের বারি সিঞ্চন করছে। যে ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই ম্যাথিলডা বিজড়িত নয় তেমন ঘটনা চিন্তা করার ক্ষমতাও তার নেই। মাদাম দ্য রেনল তার যে মনকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন উচ্চাশা এবং অহঙ্কারের ছোট-খাট জয় তার সেই মনকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ম্যাথিলডা তার সারা মন গ্রাস করেছে, তার ভবিষ্যৎ-জীবনের পটে কেবল তারই আলেখ্য ফুটে উঠছে।

জুলিয়ান তার আগামী দিনের প্রতিটি কাজের মধ্যে অকৃতকার্যতার আভাষ দেখছে। ভেরিয়ার শহরে এই মানুষটার মন আত্ম-বিশ্বাসে ভরা ছিল, আজ আত্ম-ধিক্কারে তার মন বিষণ্ণ।

তিনদিন আগে ফাদার কাসটিনেদের সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে খুন করতো, কিন্তু আজ স্ট্রাসবুর্গ শহরে একটা শিশুর সাথে বিবাদ বাধলে সে নির্ঘাৎ শিশুটির পক্ষ নেবে। জীবনে চলার পথে অতীতে যে-সব বিরোধী এবং শত্রুদের সঙ্গে সে লড়াই করেছিল আজ মনে হচ্ছে আসলে সে নিজে ছিল দোষী। তাই অতীতে যে-সব চমৎকার কল্পনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার সোপান গড়ে দিয়েছে আজ সে সব কল্পনা তার কাছে দুর্বার শত্রু বলে মনে হচ্ছে।

ভ্রমণকারীর জীবনের অফুরন্ত নির্জনতা তার মনের কল্পনাকে আরও মসীলিপ্ত করে তুলেছে। এ সময় একজন বন্ধু থাকলে কত না চমৎকার হত! কিন্তু জগতে কি এমন একজনও আছে আমার জন্যে যার অন্তর উতলা হয়ে উঠেছে? এবং আমার যদি কোন বন্ধু থাকত তাহলে কি সম্মান বজায় রাখার জন্য আমার চিরন্তন নীরবতা দরকার হত না?

সেদিন বিষণ্ণ মনে ঘোড়ায় চড়ে রাইন নদীর তীরে কেহল গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জুলিয়ান। যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই এলাকা। দূরে রাইনের বুকে ক্ষুদে একটা দ্বীপ। বামহাতে ঘোড়ার লাগাম আর ডানহাতে এই অঞ্চলের একখানা মানচিত্র। একজন জার্মান কৃষক জায়গাটার চারধার চিনিয়ে দিচ্ছিল জুলিয়ানকে। সহসা আনন্দিত কণ্ঠের ডাক শুনে জুলিয়ান মাথা তুলল।

রাজকুমার কোরাসফ...তার লণ্ডনের বন্ধু। কয়েক মাস আগে সে তাকে চমৎকার নির্বুদ্ধিতার রীত-করণ সম্পর্কে উপদেশ শুনিয়েছিল। এই শিল্পের বিশ্বস্ত শিল্পী এই কোরাসফ...সবেমাত্র সে স্ট্রাসবুর্গে এসেছে এবং মাত্র এক ঘণ্টা ঘুরছে কেহল গ্রামে, আঠার শতকে দখলের লড়াই সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস পড়ে নি...অথচ জুলিয়ানকে সব কিছু বোঝাচ্ছে। জারমান কৃষকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে···কেননা রাজকুমার যে প্রচুর ভুল বলছে তা সে বুঝতে পারছে। জুলিয়ান কিন্তু জার্মান কৃষকটির কথা ভাবছে না···তার মন অনেক দূরে বিচরণ করছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এই সুদর্শন তরুণকে অবাক হয়ে দেখছে।

কি সুখের চরিত্র! অশ্ব-চালনার পোশাক কেমন সুন্দর তার দেহে মানিয়েছে! কি চমৎকারভাবে মাথার চুল ছেঁটেছে! হায়! আমি যদি ওর মত হতাম, তাহলে বোধ হয় তিন দিন ধরে আমাকে ভালবাসার পর সে আমাকে অপছন্দ করতে পারত না।

কেহল শহর অধিকারের বর্ণনা শেষ করে রাজকুমার জুলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমাকে অসুখী মনে হচ্ছে কেন? লণ্ডনে তোমাকে গাম্ভীর্যের পাঠ দিয়েছিলাম তা' ভুলে গিয়েছ দেখছি। বিষণ্ণভাব কখনও ভাল নয়। তোমাকে বিষণ্ণ দেখার অর্থ তুমি কিছু চাইছ অথচ পাচ্ছ না। কিংবা কোন কাজে তুমি সফল হও নি। এর অর্থ হীনমন্যতা স্বীকার করা। অন্যদিকে তোমার বিরক্তি-ভাব প্রমাণ করবে যে, একটা লোক বৃথাই তোমাকে খুশি করতে চেয়েছে এবং সে তোমার চেয়ে হীনমন্য। এবার ভেবে দেখ বন্ধু, কি ভুল তুমি করছ।'

জার্মান কৃষকটি হাঁ করে তাদের কথা গিলছিল। জুলিয়ান তার দিকে একটা ক্রাউন ছুঁড়ে দিল।

—'ভালই করেছ!' বলল রাজকুমার এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

প্রশংসায় হতচেতন জুলিয়ান। রাজকুমারকে সে অনুসরণ করল।

আহা! আমি যদি রাজকুমারের মত সুদর্শন হতাম তাহলে কখনও সে আমাকে ছেড়ে ক্রয়সিনয়কে পছন্দ করতো না। রাজকুমারের আজগুবি কথা শুনে তার বিবেচনা-শক্তি যত চমকে উঠছিল ততই প্রশংসা না করতে পারার জন্য আত্ম-ধিক্কারে তার মন ভরে যাচ্ছিল এবং নিজেকে মনে হচ্ছিল দুর্ভাগা!

সেই বিষণ্ণভাব তার মনে। তাই রাজকুমার বলল আবার—'শোন বন্ধু, তোমার টাকা-পয়সা কি সব খোয়া গেছে, কিংবা তুমি কি কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছ?'

রুশীয়রা আচার-আচরণে কথা-বার্তায় ফরাসীদের নকল করতে চায়, কিন্তু ওরা এখনও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে রয়েছে। ওরা এখন যেন পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কালে রয়েছে।

প্রেম সম্বন্ধে এই উপহাস শুনে জুলিয়ান কেঁদে ফেলল। এই মনমাতানো লোকটার অভিমত নিই না কেন? নিজের মনেই সে সহসা ভাবল। তাই রাজকুমারকে বলল—'হাঁ বন্ধু, এই স্ট্রাসবুর্গ শহরে আমি প্রেমে পড়েছি, ব্যর্থ প্রেম আমার। শহরতলির এক সুন্দরী কন্যা আমার সাথে তিনরাত কাম-ক্রীড়া করেছে, তারপর ছেড়ে দিয়েছে আমাকে। ওর বিহনে আমার প্রাণ ফাটছে। আমি মরে যাচ্ছি।'

ছদ্মনামে ম্যাথিলডার আচরণ এবং চরিত্র রাজকুমারকে বলল জুলিয়ান।

রাজকুমার বলল—'আর তোমায় বলতে হবে না। তোমার চিকিৎসককে যাতে বিশ্বাস করতে পার তাই কাহিনীর শেষটা আমি বলছি। এই সুন্দরী যুবতীর স্বামীর নিশ্চয় বহু ধন-সম্পদ আছে অথবা এটাই সম্ভব যে, এই যুবতী নিজেই খুব ধনী এবং এই জেলার অভিজাত-বংশের কন্যা। গর্বিত হওয়ার নিশ্চয় তার কারণ আছে।'

জুলিয়ান মাথা নাড়ল, তার আর কথা বলার ইচ্ছে নেই।

রাজকুমার বলল—'বেশ! তাহলে এই তেতো বড়িগুলো দেরী না করে গিলে ফেল। প্রথম প্রতিদিন মাদাম-এর সঙ্গে দেখা করবে। কি নাম যেন?'

—'মাদাম দ্য ডিউবায়াস!'

দারুণ জোরে হেসে উঠল রাজকুমার। বলল—'কি নাম রে বাবা! মাপ করো, তোমার কাছে এ নাম খুব সম্ভ্রমের। প্রতিদিন তুমি মাদাম ডিউবায়াসের সাথে দেখা করবে। সাবধান, সে যেন বুঝতে না পারে যে, তুমি নিরুৎসাহ এবং ক্ষুব্ধ। মনে রেখ এ যুগের ধর্ম: লোকে যা চায় তার বিপরীত কাজ করবে। বিশেষ করে তাকে বোঝাবে যে, এক সপ্তাহ আগে তোমাকে অনুগ্রহ দেখিয়ে সে যেমন সম্মান লাভ করত তুমি ঠিক তেমনটাই চাও।'

হতাশ হয়ে বলল জুলিয়ান—'আহ! আমি ত তখনও শান্ত ছিলাম! মনে হচ্ছে, ওর উপর আমার সমবেদনা ছিল··· ।'

রাজকুমার তখনও বলছিল—'দেখ, বাতির শিখায় পুড়ে মরে প্রজাপতি। প্রবাদটা এই পৃথিবীর মতই প্রাচীন। প্রথম কথা, প্রতিদিন তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে। দ্বিতীয় কথা, ওর বান্ধবীদের সঙ্গেও করবে রসালাপ। তবে তোমার আচরণে যেন কাম-ভাব ফুটে না ওঠে, বুঝেছ? তোমার কাছে লুকোব না, তোমার পক্ষে এই অভিনয় করা কঠিন। তুমি ভান করছ, আর সেই ভান যদি ধরে ফেলে তবে তোমার শেষ।'

বলল জুলিয়ান—'যুবতীটি অনেক বুদ্ধি ধরে, আমার বুদ্ধি খুবই কম। তাই আমারই সর্বনাশ!'

—'না, মনে হচ্ছে, তুমি প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে-সব যুবতী খুবই উচ্চ বংশে জন্মেছে কিংবা বহু অর্থে সম্পদ-শালিনী মাদাম ডিউবায়াস তাদের মত নিজেকে নিয়েই মগ্ন। সে তোমার দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকায়, তাই তোমাকে চেনে নি। প্রথম দিকে দু'তিনবার তোমার সঙ্গে দেহ-মিলন ঘটিয়ে সে তোমাকে অনুগ্রহ দেখিয়েছে। সে কল্পনা করেছিল যে, তুমি তার স্বপ্নরাজ্যের নায়ক। কিন্তু বাস্তবে তুমি··· । কিন্তু এসব ত উপসর্গ, বন্ধু সোরেল! তুমি ত কচি খোকা নও? যাক গে, চল ওই দোকানটায় ঢুকি। ওখানে সুন্দর কালো মদ পাওয়া যায়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাজকুমার আবার বলল—'আচ্ছা মাদাম ডিউবায়াসের বন্ধু-বান্ধবরা কেমন প্রকৃতির? কি নাম রে বাবা! বন্ধু সোরেল, রাগ করো না। না বলে থাকতে পারছি না··· । প্রেমের আধারটি কেমন?'

—'আমার প্রেমিকা অফুরন্ত সম্পদের মালিক এক মোজা ব্যবসায়ীর সুন্দরী কন্যা। তার চোখ-জোড়ার মতন এমন চোখ সংসারে আর কারো নেই। ওই চোখ-জোড়া আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ জেলায় ওদের পরিবারের খুব নাম ডাক। ওর জাঁক-জমকের খুবই ঘটা, তবে ওর কাছে ব্যবসা বা দোকানের নাম করলেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অথচ ওর দুর্ভাগ্য ওর বাবা স্ট্রাসবুর্গের একজন সবচেয়ে পরিচিত ব্যবসাদার।'

রাজকুমার হেসে বলল—'তাহলে কেউ ব্যবসার কথা বললে নিশ্চিত সে নিজের কথা ভাবে, আর কারো কথা তার মাথায় ঢোকে না। এই হাস্যকর প্রবণতা স্বর্গীয় এবং প্রয়োজনীয়। এর জন্যই ওর চোখ-জোড়ার সামনে মুহূর্তের জন্যও তোমার মগজ বিগড়ে যায় না। নির্ঘাৎ তুমি সফল হবে।'

জুলিয়ান তখন মার্শালের বিধবা মাদাম দ্য ফারবাকের কথা ভাবছিল···যুবতী প্রায়ই মারকুইসের বাড়ীতে আসে। সুন্দরী বিদেশিনী। স্বামীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল। তার সারা জীবনের যেন এখন

একটাই প্রয়াস, লোককে সে ভোলাতে চায় যে, সে একজন ব্যবসায়ীর কন্যা। এবং নিজেকে প্যারিসের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে ধার্মিকদের সঙ্গে মেলামেশা করছে।

আন্তরিকভাবে রাজকুমারের প্রশংসা করছে জুলিয়ান। তার এই আজগুবি জীবনচর্যার জন্য তার কি নেই! দুই বন্ধুর মধ্যে বাক্যালাপ অনেকক্ষণ ধরে চলছে। কোরাসফ খুবই খুশি। এর আগে আর কোন ফরাসী এমন মন দিয়ে তার কথা শোনে নি। তাই আবার বলল— 'প্রেমিকাকে রোজ দু'খানা করে চিঠি লিখবে।'

—'কখ্খনো না! চিঠি লেখা আমার দ্বারা হবে না!' বলল জুলিয়ান।

—'কে তোমাকে লিখতে বলেছে? আমার কাছে অনেক চিঠির মুসাবিদা করা আছে। জান ত লণ্ডনে অনেক মেয়ের সাথে আমি প্রেম করতাম। প্রতিটি মেয়ের চরিত্র অনুযায়ী চিঠি লিখেছি। পাঠিয়ে দেব। তুমি শুধু চিঠির নীচে নিজের নামটি লিখে প্রেমিকাকে পাঠাবে।' রাজকুমার বলল।

রাত দু'টোর সময় খুশিমনে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জুলিয়ান চলে এল।

পরের দিন এক সেট চিঠির নকল করিয়ে রাজকুমার পাঠিয়ে দিল জুলিয়ানকে।

গোপন বার্তা পেয়ে জুলিয়ানকে তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরে যেতে হল। কিন্তু দিন দু'য়েক পরেই তাকে আবার ফরাসীভূমি ছাড়তে হল। যাওয়ার আগে সে ম্যাথিলডার সঙ্গে দেখা করেছিল। কিন্তু ম্যাথিলডার অবস্থা দেখে সে মরণের চেয়েও বেশী যন্ত্রণা লাভ করল। ম্যাথিলডা বদলে গেছে।

এবার সে ঠিক করল যে, নারী প্রলুব্ধ করার পেশা সে গ্রহণ করবে। তার বয়স এখন তিরিশ এবং বিগত পনের বছর ধরে সে নারী প্রলোভন করার কাজই করেছে। তার বুদ্ধি নেই একথা কেউ বলবে না। সে ধূর্ত এবং সাবধানী। উৎসাহী। এরকম লোকের মেজাজ কবিতা রচনার অনুপযোগী।

ভাবল, আমি নির্ঘাৎ মাদাম দ্য ফারবাকের সঙ্গে প্রেম করতে পারব, ঘটাতে পারব দেহ-মিলন। সে আমাকে কিছুটা আস্কারাও দেবে। ওই অনুপম সুন্দর চোখ-জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকব এবং ওই চোখ-জোড়াই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসবে। ও বিদেশিনী···তাই নতুন দৃষ্টিতে ওর চরিত্র আমাকে বুঝতে হবে।

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ডুবে যাচ্ছি। নিজের বিচার-শক্তির উপর নির্ভর না করে আমাকে একজন বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

২৫ : অফিসে ধর্ম

কিন্তু এই আনন্দ যদি আমি এমন সাবধানে এবং মিতব্যয়িতার সাথে উপভোগ করি তবে আমার কাছে এ আর আনন্দ হবে না।

—লোপ ড ভেগা

প্যারিসে ফিরে আসার সাথে সাথে এবং মারকুইসের বাড়ীর পড়বার ঘর ছাড়বার পর আমাদের নায়ক তাড়াতাড়ি কাউন্ট আলটামিরার সঙ্গে দেখা করল। মারকুইস যে চিঠি পেয়েছিলেন তার জন্যে তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছিল। এই সুদর্শন বিদেশী খুবই গম্ভীর প্রকৃতির এবং ভাগ্যগুণে ধর্মপরায়ণ, যদিও তার মাথার উপর মৃত্যু-দণ্ডাদেশের খাঁড়া ঝুলছে। এই দু'টো গুণ ছাড়াও কাউন্ট উচ্চবংশজাত বলে মাদাম ড ফারবাকের পছন্দসই মানুষ···তাই কাউন্ট প্রায়ই মাদাম ফারবাকের সঙ্গে দেখা করে।

জুলিয়ান তার কাছে স্বীকার করল যে সে গভীরভাবে মাদাম ফারবাককে ভালবেসেছে।

জবাব দিল আলটামিরা—'দেখ, ওই যুবতী পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণা। তবে অতিমাত্রায় সোচ্চার। একটা সময় ছিল যখন ওর প্রতিটা কথার অর্থ আমি বুঝতে পারতাম, কিন্তু, বুঝতে পারতাম না সমগ্র বাক্যটার মানে। ও আমাকে প্রায়ই বলত যে, আমি অন্য লোকের মত ফরাসী ভাষা বুঝতে পারি না। এই ঘনিষ্ঠতার কথা অনেক বলতে হবে। তাহলে এর গুরুত্ব বুঝবে। কিন্তু এখন চল বুসতোর কাছে যাই। সে কিছুদিন মাদাম ফারবাকের প্রেমে পড়েছিল।'

ডন দিয়েগো বুসতো। সে তাদের বিশদভাবে সব বুঝিয়ে বলল···সে যেন উকিলের অফিসে বসে সবকিছু বলছে। গোলগাল বাঁদরের মত মুখ···কালো গোঁফ। আচরণে অনন্যকরণীয় গাম্ভীর্য।

অবশেষে সে জুলিয়ানকে বলল—'বুঝেছি। আচ্ছা, মাদাম ফারবাকের আরও প্রেমিক আছে, তাই না? আহলে তোমার কি কোন আশা আছে? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তবে এটা বলতে পারি যে, আমার নিজের কোন আশা নেই। এ ব্যাপারে আমার কোন রাগও নেই। নিজেকে বোঝাই, ও বড় তাড়াতাড়ি চটে ওঠে। এখনি তোমাকে বলছি শোন, ও বড় প্রতিহিংসা-পরায়ণা। ও যে এমন রগ-চটা তা' প্রথম প্রথম ভাবি নি। তা' যদি হত তবে ওর সব কাজে একটা কামনা মিশিয়ে থাকত। ওর ঢিলা আর শান্তভাব থেকেই ও তার বিরল সৌন্দর্য আহরণ করেছে।'

স্পেনদেশীয় এই লোকটার শান্ত একটানা বর্ণনা শুনতে শুনতে ধৈর্য হারিয়ে

ফেলল জুলিয়ান।

—'তুমি কি আমার কথা শুনছ?' ডন দিয়েগো বুস্তো জানতে চাইল।

—'আমার অন্যমনস্কতা মাপ করবেন। শুনছি।'

—'মার্শাল-পত্নী ফারবাককে অনেকে ঘৃণা করে। যে সব ছোকরাদের সে চেনে না তাদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়, খেউড়-গানের কবিরা ওর মনের মানুষ।' বুস্তো একটা খেউড় গান গাইতে লাগল।

সমস্ত গানটা জুলিয়ানকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে হল।

ডন দিয়েগো বুস্তো বলতে লাগল—'এক কবি খেউড় গান লিখেছিল 'শুঁড়িখানায় একদিনের কিউপিড।' গান শুনে মার্শাল-পত্নী রেগে টঙ। বলেছিলাম, তোমার মত অভিজাত ঘরের যুবতীদের যে যা' প্রকাশ করছে তাই পড়া উচিৎ নয়। সমাজের সভ্যতা, পবিত্রতা যতই বাড়ুক এবং উন্নতি যতই হোক না কেন ফরাসী সাহিত্যে শুঁড়িখানার খেউড় কবিতা লেখা হবেই। কবির সঙ্গে মাদাম ফারবাকের দেখা হল। এক গরীব শয়তান··· মাদামের জন্য আট শ' ফ্রাঙ্কের চাকরি হারিয়েছে। আমি আবার বললাম, দেখ এই বদমাস কবিকে তুমি আঘাত করেছ এবার ও তোমাকে কবিতা দিয়ে আঘাত করবে। কাজেই সাবধান। তোমাকে নিয়ে এমন খেউড় বাঁধবে যে প্যারিসের সব বসবার ঘরে তাই নিয়ে ছিছিক্কার পড়ে যাবে। লোকে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। আমার কথা শুনে মার্শাল গিন্নী কি বললে জান? বললে—সারা শহর দেখবে ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে আমি শহীদ হয়েছি। ফরাসীভূমিতে এ হবে এক অভিনব দৃশ্য। সাধারণ লোকেরা তখন অভিজাতদের শ্রদ্ধা করতে শিখবে। সেটাই হবে আমার জীবনে সবচেয়ে রমণীয় দিন। সত্যিই সেদিন বলতে বলতে তার চোখ-জোড়ার সৌন্দর্য আরও মোহময় হয়ে উঠেছিল।'

—'এবং সত্যিই ওর চোখ-জোড়া বড় অপূর্ব।' বলল জুলিয়ান।

করুণ স্বরে বলল ডন দিয়েগো বুস্তো—'দেখছি তুমি সত্যিই ওর প্রেমে পড়েছ।···সে লোককে আঘাত করতে চায় কারণ সে নিজে অসুখী। মনে হয় ওর অন্তরে গোপন বেদনা আছে। সে হয়ত খুবই অমিতব্যয়ী, নিজের এই স্বভাবের জন্য সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে?'

প্রায় এক মিনিট ধরে দিয়েগো তার দিকে তাকিয়ে রইল।

—'এটাই হচ্ছে সব প্রশ্ন এবং এটাই একমাত্র তোমার আশা। বছর দুয়েক ধরে আমি ওর একান্ত অনুরক্ত অনুচর ছিলাম, তখন এসব নিয়ে অনেক ভেবেছি। ওহে তরুণ প্রেমিক তোমার ভবিষ্যৎ, এই গুরুতর সমস্যার উপর নির্ভর করছে। তার স্বভাবের জন্য হয় ক্লান্ত আর না হয় নিজের নিরানন্দ জীবনের জন্য সে অপরের উপর নিষ্ঠুর।'

অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে আল্টামিরা বলল—'এটাও বরং হতে পারে যা'

তোমাকে আমি বহুবার বলেছি। সরলভাবে বলা যায় এটা হচ্ছে তার ফরাসী-নারীমনের গর্ববোধ। এটা তার কাপড়-ব্যবসায়ী পিতার স্মৃতির ফল। এবং তাই স্বাভাবিকভাবেই কঠিন এবং শান্ত মনে নিরানন্দ গড়ে উঠেছে। ওর জীবনে সুখ তখনই আসবে যদি ও টলেডো শহরে বাস করার সুযোগ পায় এবং প্রতিদিন সকালে একজন কনফেসর ওর চোখের সামনে নরকের খোলা দরজাটা দেখিয়ে দেয়।'

জুলিয়ান চলে আসছিল। এমন সময় দিয়েগো আবার বলল—'দেখ, আলটামিরার কাছে শুনেছি তুমি আমাদের পক্ষের লোক। আমাদের দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কাজে তুমি একদিন আমাদের সাহায্য করবে তাই তোমার এই প্রেমের খেলায় আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই। মার্শাল গিন্নীর আচরণের সঙ্গে তোমার পরিচিত হওয়া দরকার। আমার কাছে ওর ক'খানা চিঠি আছে, তোমায় এনে দিচ্ছি।'

জুলিয়ান বলল—'বেশ! চিঠিগুলো নকল করিয়ে নিয়ে আমি এগুলো ফেরৎ দেব।'

—'তোমার আমার মধ্যে এই যে কথাবার্তা হল তা' নিশ্চয় কাউকে বলবে না?'

—'কথা দিচ্ছি, বলব না।'

—'তাহলে ঈশ্বর তোমায় সাহায্য করুন!' দিয়েগো ওদের সিঁড়ির মাথায় এগিয়ে দিল।

মনে এবার একটু বল পেল জুলিয়ান। হাসল। এই হচ্ছে ধার্মিক আলটামিরা! সে আমাকে ব্যভিচারের কাজে সাহায্য করছে।

ডিনারের সময় হল। আবার ম্যাথিলডার সঙ্গে তার দেখা হবে।

এখন সাড়ে পাঁচটা। ডিনার ছ টায়। বসবার ঘরে নেমে এল জুলিয়ান। না, কেউ নেই ঘরে। নীল সোফাখানা খালি, ওর কান্না পেল। দু'গাল জলতে লাগল। এই ভাব-প্রবণ বোকামি আমি ত্যাগ করব, এই স্বভাব একদিন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। নিজের মুখের ভাব গোপন রাখার জন্য সে একখানা সংবাদ-পত্র হাতে তুলে নিল। তারপর গুটি গুটি বাগানে বেরিয়ে এল। একটা বিশাল ওক গাছের আড়াল থেকে সে ম্যাথিলডার জানালার দিকে তাকাল। জানালাটা বন্ধ। ওক গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। একবার টলতে টলতে মালির মইখানার কাছে গেল। সে জোর করে শিকলটা ভেঙেছিল, শিকলটা তেমনি ভাঙা পড়ে আছে।

বসবার ঘর থেকে বাগান···আবার বাগান থেকে বসবার ঘর! অনেকবার হাঁটাহাঁটি করল জুলিয়ান। ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এমনিভাবে সে একদিন সফল হবে। সফলতা সম্বন্ধে সে সচেতন। ভাবল, দৃষ্টিতে আমার জীবনের কোন লক্ষণ নেই। তাই দৃষ্টি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

একে একে অতিথিরা ঘরে ঢুকল। আর প্রতিবার চমকে উঠতে লাগল জুলিয়ান।

সব শেষে ঘরে ঢুকল ম্যাথিলডা। টেবিলে জুলিয়ানকে দেখে সে লজ্জায় লাল হল।

জুলিয়ান তাকাল ম্যাথিলডার হাতের দিকে। তির-তির করে হাতখানা কাঁপছে। বিচলিত জুলিয়ান। ভাবপ্রকাশের শক্তিহারা হল এই অবস্থা আবিষ্কার করে। ক্লান্তি সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

মারকুইস জুলিয়ানের কাজের খুব প্রশংসা করলেন।

কিন্তু জুলিয়ান মনে মনে বলছিল, অত বেশী ম্যাথিলডার দিকে তাকাব না। অথচ ওকে নজরের আড়ালও করতে পারব না। আমার ফিরে আসার খবর সে আগে পায় নি। তাই ওর এই মনোবিকার। এক সপ্তাহ আগে নিরানন্দ জীবনের আগে আমি যেমন আচরণ করতাম, তেমনি আচরণ করব। বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে কথা বলব, তার চারধারের অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করব··· আলাপ আলোচনা জীবন্ত করে রাখব।

জুলিয়ানের ভদ্র-আচরণ পুরস্কৃত হল।

রাত আটটার সময় মাদাম দ্য ফারবাক এলেন। জুলিয়ান তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ধোপ দুরস্ত একটা পোশাক পরে এল। ওর ভদ্র বেশ দেখে দারুণ খুশি হলেন মাদাম দ্য মোল। তিনি জুলিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুশি হয়ে অতিথিদের কাছে বর্ণনা করতে লাগলেন। মাদাম ফারবাকের পাশে একখানা চেয়ারে বসল জুলিয়ান। এমনভাবে বসল যেন ম্যাথিলডা তার চাহনি দেখতে না পায়। এই মুহূর্তে মার্শাল গিন্নীর মন আকর্ষণ করতেই সে চায়।

খানিক পরে মার্শাল-পত্নী বললেন যে, তিনি ইটালিয়ান অপেরায় যাচ্ছেন।

জুলিয়ানও গেল অপেরায়। ব'ভয়সিসের চেষ্টায় সে বক্সের টিকিট পেল এবং একেবারে মাদাম ফারবাকের পাশের আসনে গিয়ে বসল। মাঝে মাঝে সে তাকিয়ে থাকছিল মাদামের মুখের দিকে। ভাবছিল, আমার এই দখলের বৃত্তান্ত আমি লিখে রাখব। নইলে ভুলে যাব।

কিন্তু জুলিয়ান যখন বাইরে চলে গিয়েছিল তখন প্রায় তাকে ভুলেই গিয়েছিল ম্যাথিলডা। যত যাই হোক আসলে জুলিয়ান ত একজন সাধারণ মানুষ, ওর নাম শুনলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলের কথা সব সময় আমার মনে পড়ে যায়। আমি আবার আমার স্তরের অভিজাত-মানুষদের জীবন-চর্যায় মন দেব···নারীমন সহজেই অতীত ভুলতে পারে। তাই ক্রয়সিনয়ের বিবাহের চুক্তি সম্পাদনে রাজী হল। এতদিন পরে হলেও আনন্দে আত্মহারা ক্রয়সিনয়। ম্যাথিলডার অন্তরের অন্তঃস্রোতের পরিবর্তনের কারণেই যে এটা ঘটছে এটা কেউ যদি এই মুহূর্তে ক্রয়সিনয়কে বলত তবে সে অবাক হয়ে যেত··· অথচ এর জন্যই সে গর্বিত ছিল।

জুলিয়ানকে দেখে কিন্তু ম্যাথিলডার মন আবার বদলে গেল। মনে মনে সে ভাবল, বাস্তবে সত্য সত্যই ওই লোকটা আমার স্বামী। আমি যদি ধর্মপথে থাকতে চাই তবে ওকেই আমি বিয়ে করতে বাধ্য।

জরুরি অভিযানে যাওয়ার সময় সে জুলিয়ানের মুখে দুঃখের ছায়া দেখেছিল এবং তার মনে সন্দেহ ছিল না যে, জুলিয়ান এবার তার সাথে কথা বলবে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। সে চুপ করে বাইরের ঘরে বসে রইল গোঁজ হয়ে...একবারও বাগানে উঠে গেল না। ঈশ্বর জানেন তার মনের ব্যথা! এখনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হওয়া প্রয়োজন। ম্যাথিলডা একাই বাগানে পায়চারি করতে গেল। কিন্তু না, জুলিয়ান গেল না, সে বসবার ঘরের জানালা থেকে চলে গেল। একটু আগে সে তাকে মাদাম ফারবাকের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিল···রাইনের তীরে দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে সে গভীর আলোচনা করছিল। তার সেই আবেগপ্রবণ কণ্ঠস্বর! দেখবার মত কথা বলার ভঙ্গি! কোন কোন বসবার ঘরে এসবই ত প্রশংসা অর্জন করে।

রাজসিংহাসনের অন্তরালে শক্তিচক্রের সক্রিয়তায় কিছু কিছু 'ব্লু রিবন' বিতরিত হল।

মাদাম ফারবাক জোর তদ্বির সুরু করেছিল যাতে তার বড় কাকা 'নাইট অব্ দ্য অর্ডার' লাভ করে। মারকুইস নিজেও চাইছিলেন তাঁর শ্বশুরমশায় যাতে এই উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায়ই তাই মাদাম ফারবাককে মারকুইসের বাড়ীতে আসতে হচ্ছিল। এদিকে জুলিয়ান জানতে পেরেছিল যে মারকুইস মন্ত্রীর পদ লাভ করছেন। আর মারকুইস যদি মন্ত্রী হন তবে জুলিয়ান নিশ্চয় বিশপের পদ লাভ করবে। কিন্তু এসব ইচ্ছা তার দৃষ্টির সামনে পর্দার আড়ালে ঢাকা। ওসব যেন অনেক দূরে রয়েছে···অস্পষ্টভাবে তার চোখে পড়ছে। এই ভয়ানক নিরানন্দ-ভাব তাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে···ম্যাথিলডার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাই এখন তার জীবনের প্রধান কামনা। সে ভেবে দেখল যে, এমনিভাবে চেষ্টা করতে থাকলে পাঁচ-ছ' বছর পরে সে আবার ম্যাথিলডার ভালবাসা লাভ করতে পারবে।

জুলিয়ানের মাথা খুবই ঠাণ্ডা হলেও কতকগুলো যুক্তিহীন কাজে সে জড়িয়ে পড়ল। তার স্বভাবের অতীত গুণগুলো লোপ পেল, শুধু রইল মানসিক দৃঢ়তা। রাজকুমার কোরাসফের কথা মত সে ঠিক ঠিক সব কাজ করছে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা মাদাম দ্য ফারবাকের পাশ ঘেঁষে বসছে, কিন্তু একটা কথাও তার সঙ্গে বলা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এই যে ম্যাথিলডার ভালবাসা ফিরে পাওয়ার জন্য সে আড়ষ্টভাবে বসে থাকছে এর ফলে তার হৃদয়ের, মনের সব শক্তি লোপ পেতে লাগল। প্রায় মৃত একটা জীবের মত সে মাদামের পাশে বসে থাকত। তার দু'চোখে যে বিরাগের চিহ্ন ছিল, তার আগুন এখন নিভন্ত।

ম্যাথিলডার স্বামী সম্পর্কে একটা মাত্রই ধারণা ছিল যে, স্বামীর জন্ম সে একদিন ডাচেস্‌ হওয়ার সম্মান লাভ করবে ··তাই জুলিয়ান সম্পর্কে তার কল্পনা কয়েক দিন ধরে আকাশ-চারী হল।

২৬ : নিষ্কাম প্রেম

এমন কিছু যা প্রকৃতিদেবী প্রকাশ করছে
ম্যাণ্ডারিনের মধ্যে আর কিছুই নেই সুন্দরতর
অন্ততঃ তার আচরণ দেখে যা অকল্পনীয়
যা কিছু তার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ তাই আনন্দময়।

—ডন জুয়ান

মাদাম ছ ফারবাক ভাবে এ পরিবারের জীবন-চর্যায় যেন এক ধরনের পাগলামির ছোঁয়া রয়েছে। ওরা একটা ক্ষুদে পাদরীকে নিয়ে মজে আছে, লোকটা কিছুই করতে পারে না শুধু তাকিয়ে থেকে শোনে···তবে সত্যি কথা, ওর চোখ দু'টো বড় সুন্দর।

জুলিয়ান কিন্তু মার্শাল-পত্নীর মধ্যে দেখছে অভিজাত-সুলভ প্রশান্তি। এবং এই ভাবকে বলা যায় ভদ্রতার অভিব্যক্তি ··কোন ভাবাবেগ এর ফলে তীব্র হতে পারে না। কোনও রকম আশাতীত ভঙ্গি বা আচরণ কোন রকম আত্ম-সংযমের অভাব মাদাম ফারবাকের রাণীর মর্যাদায় আঘাত লাগত বলে মনে হয়·· এর জন্য যে কেউ লজ্জিত হবে এবং কোনও উচ্চপদের মানুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা' বিচ্ছিন্ন করবে।

জুলিয়ান জানে এমন জায়গায় আলোটা বসানো যেখান থেকে মাদাম ফারবাকের দেহ-লাবণ্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে ওখানে গিয়ে আগে থাকতে বসবে, চেয়ারখানা এমনভাবে ঘুরিয়ে নেবে যাতে ম্যাথিলডার মুখ না চোখে পড়ে। কিন্তু সব সময় তাকে এড়াবার প্রয়াস দেখে ম্যাথিলডা অবাক হল···এবং অবশেষে নীল সোফা ছেড়ে মারকুইসের পাশে একখানা চেয়ারে এক সন্ধ্যায় উঠে এসে বসল। মাদাম ফারবাকের টুপির কানার আড়াল থেকে ম্যাথিলডার মুখ স্পষ্ট নজরে পড়ছে জুলিয়ানের। ওই যে দু'টো চোখ যার মধ্যে রয়েছে তার সৌভাগ্য রচনার শক্তি···সেই চোখ-দু'টো এত কাছ থেকে দেখে সে ভয় পাচ্ছে, এবং স্বাভাবিক বিষণ্ণ-ভাব থেকে সে চমকে উঠছে। জুলিয়ান সমানে কথা বলতে লাগল।

মার্শাল-পত্নীকে সম্বোধন করে সে কথা বলছে কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য ম্যাথিলডার অন্তরের কাছে আবেদন করা। জুলিয়ান কথা বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, মাদাম ফারবাক তার কথার মানে বুঝতে

পারছিল না।

তার দিকে এই প্রথম ঝোঁক দেখা দিল। জুলিয়ানের মাথায় যদি এমন একটা ইচ্ছা জাগত যে, সফল হওয়ার জন্য সে দু'চারটে রহস্য-ভরা জার্মান-শব্দ ব্যবহার কিংবা জেস্থইটস্থলভ আচরণ করবার চেষ্টা করত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাদাম ফারবাক তাকে বুঝতে পারত, বয়সের তুলনায় সে যে উচ্চ-গুণের মানুষ তা' উপলব্ধি করা সম্ভব হত।

ম্যাথিলডা মনে মনে বলল, দেখছি ওর অনেক বদ-রুচি রয়েছে তাই এতক্ষণ ধরে এবং এমন মন দিয়ে মাদাম ফারবাকের সাথে কথা বলছে। না, ওর কথা আর শুনব না। সেদিন সন্ধ্যায় বাকি সময়টুকু সে তার কথা রাখল, তবে খুব কষ্ট হল।

মাঝরাতে বাতি দেখিয়ে ম্যাথিলডা তার মা-কে শোবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল, মাদাম মোল তখন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে জুলিয়ানের স্বভাব-চরিত্রের খুব প্রশংসা করলেন। ম্যাথিলডার মনের অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। রাতে ঘুমোনো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একটা ভাবনা কেবল তার মনে খানিকটা সান্ত্বনা দিল : আমি যাকে ঘৃণা করি মার্শাল-পত্নীর দৃষ্টিতে সে উপযুক্ত পুরুষ।

আর জুলিয়ান! এবার সে কাজ স্থরু করল। তার মনের বিষণ্ণভাব কমে গেছে।

রাজকুমার কোরাসফের পাঠানো চিঠিগুলোর উপর তার নজর পড়লো। তিপ্পান্নখানা চিঠি সে পাঠিয়েছে। প্রথম চিঠিখানার উপর লেখা রয়েছে : দেখা হওয়ার এক সপ্তাহ পরে পাঠাবে।

মাদাম ফারবাকের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে···তার দেরী হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম প্রেমপত্রখানার অনুলিপি তৈরী করতে বসল। ধর্ম সম্পর্কে নানা কথা ঠাসা চিঠি, তবে বোকামিতে ভরা, দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অনুলিপি তৈরী করার আগেই ভাগ্যগুণে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল জুলিয়ানের। চড়া রোদ উঠেছে। টেবিলের উপর মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জুলিয়ান অবাক হল, প্রতিদিন সকাল বেলাটায় তার জীবনে আর একটা দুঃখময় দিনের স্থরু হয়। কিন্তু চিঠিখানার অনুলিপি শেষ করে সে হাসতে লাগল। মনে মনে ভাবল, এমন যুবক কি সত্যিই আছে যে, এ ধরনের চিঠি লিখতে পারে?

চিঠির নীচে ছোট একটা মন্তব্য লেখা রয়েছে : নিজে হাতে চিঠিখানা দেওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে যাবে। পরনে থাকবে কালো গলাবন্ধ কোট, তার উপর নীল-রঙ গ্রেট-কোট। লাজুক মুখে অনুচরের হাতে দেবে চিঠিখানা··· আর তোমার দু'চোখে থাকবে বিষণ্ণতার ছোঁওয়া। যদি কোন ঝিয়ের দেখা পাও তবে চোখ রগড়ে তার সঙ্গে দু'টো কথা বলবে।

এ সবই ঠিক-ঠাক করল জুলিয়ান।

ফারবাকের বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় জুলিয়ান ভাবছিল, যা কিছু করেছি সাহসের সঙ্গেই করেছি। কিন্তু এমন কাজ কোরাসফের পক্ষে করা অন্যায়। ধর্মপরায়ণা বলে পরিচিতা একজন নারীকে এমন দুঃসাহসী চিঠি লেখা! আমাকে ওরা যদি ঘৃণা করে দারুণভাবে তবে আমার খুব আনন্দ হবে। বাস্তবিকই আমি এমন একটা আজব জীব, যাকে আমি নিজেই করি ঘৃণা, সে যদি হাস্যাস্পদ হয় তবে ত আমি খুশি হবই। নিজের অভিমত নিলে চিত্তবিক্ষেপের দরুণ আমি খুনও করতে পারি।

বিগত এক মাস ধরে জুলিয়ানের জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হচ্ছে যখন সে ঘোড়ায় চড়ে আস্তাবলে ফিরে আসে। কারাসফ জোর দিয়ে বলেছে কোন ছলেই সেই কন্যার দিকে তাকাবে না যে তোমাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু এই ঘোড়ার পায়ের শব্দ এবং আস্তাবলে ঢুকে কোন একজনকে চাকরকে ডাকবার জন্যে যে ভঙ্গীতে চাবুক আছড়ায় জুলিয়ান তা' সবই ম্যাথিলডার কাছে পরিচিত···এসব শুনলেই ম্যাথিলডা মাঝে মাঝে তার ঘরের জানালার পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ায়। মসলিনের পাতলা কাপড়···সবই নজরে পড়ে জুলিয়ানের। টুপির আড়াল থেকে এক বিশেষ কায়দায় তাকিয়ে জুলিয়ান দেখল ম্যাথিলডার দেহের কিছুটা অংশ···কিন্তু তাকাল না তার দু'চোখের দিকে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাদাম ফারবাক এমনভাবে জুলিয়ানের সঙ্গে আচরণ করল যে, আজ সকালে বিষণ্ণবদনে অনুচরের হাতে জুলিয়ান যে ধর্মের রহস্য-ছোঁওয়া দার্শনিক পত্রখানা দিয়ে এসেছে তা' সে এখনও দেখে নি। গতকাল সন্ধ্যায় আরও বাকপটুতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছিল জুলিয়ান...সে এমনভাবে বসেছিল যে ম্যাথিলডার দু'চোখ ছিল তার দৃষ্টির সামনে। এবং ম্যাথিলডা ও মার্শাল-পত্নী ঘরে ঢোকবার পরেই নীল রঙের সোফাটা ছেড়ে উঠেছিল। তার মানে ক্রয়সিনয়রা তার ব্যবহারে খুব ক্ষুব্ধ হল। ওদের মনে এমন দুঃখ দিতে পারার আনন্দে খানিকটা সোয়াস্তি পেল জুলিয়ান।

আশাতীতভাবে তার সৌভাগ্যে জুলিয়ান ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে লাগল তার···আত্ম-অহমিকা এমন প্রবল হল যে ধর্মপরায়ণা এক নারীর মনোমন্দিরে সে চুরি করে প্রবেশ করল। তাই গাড়ীতে উঠবার আগে বারেক থেমে মাদাম ফারবাক মনে মনে বলল: মাদাম দ্য লা মোল ঠিকই বলে, ঐ যুবক পাদরী একটি প্রতিভা। আমার উপস্থিতি প্রথম প্রথম কয়েক দিন ওকে ভীত করে তুলেছিল। আসলে এ বাড়ীতে যাদের দেখা যায় তারা সবাই চপল স্বভাবের মানুষ। এখানে যে-সব ধর্ম আমার চোখে পড়ছে তা' যৌবনের ধর্ম। কালের অনুত্তাপ স্পর্শ এড়াবার জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই যুবকের দৃষ্টিতে সেই প্রভেদ ধরা পড়েছে। ভালই লেখে যুবক: জীবনে উৎসাহ পাওয়ার জন্য ও

আমার পরামর্শ চেয়েছে বলে ভীত হচ্ছি—কিন্তু চিঠিতে ও যা' লিখেছে ওর স্বভাবের সঙ্গে তা' খাপ খায় না।

সবই সমান, এমনিভাবে কতবার না রূপান্তর সুরু হয়েছে? যুবকদের লেখা যেসব চিঠি এর আগে আমার হাতে পড়েছে তার সঙ্গে ওর লেখা এই চিঠির পার্থক্য বিচার করে এর শুভাশুভ আমি ভালভাবে বুঝতে পারছি। যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আগামীদিনের এই পাদরী যুবক পত্র রচনা করেছে, তার মনের গভীরতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে এবং যে উত্তপ্ত বাকপটুতার পরিচয় দান করেছে তা' বুঝতে না পারা অসম্ভব ব্যাপার। ওর মনে নির্ঘাৎ ম্যাসিলনের মত ফলপ্রদ ধর্মভাব রয়েছে।

২৭ : গীর্জায় সবসেরা পদ

সেবা! প্রতিভা! মেধা! বা!···উপদলে যোগ দাও।
—টেলিম্যাক্

জুলিয়ানের বিশপ পদ লাভের ধারণাটা সর্বপ্রথম একটি নারীর মনে দেখা দিল এবং তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, আজই হোক বা পরেই হোক সে একদিন গীর্জার সবসেরা পদ লাভ করবে। এই সুখকর অবস্থা তাকে খুব সামান্যই আকর্ষণ করল। এই মুহূর্তে নিজের সম্বন্ধে তার চিন্তা কিছুতেই তার নিরানন্দ সাম্প্রতিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠতে পারল না। সব কিছুই তার অবস্থা সঙ্গীন করে তুলল। তার ঘরখানার দৃশ্য তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল বলা যায়। রাতে জ্বলন্ত বাতি হাতে নিয়ে যখন সে নিজের ঘরে ফিরে আসে তখন প্রতিটি আসবাবপত্র তার উপরকার কারুকাজ তাকে যেন একস্বরে কঠিনভাষায় তার নূতনতম দুঃখের কাহিনী শোনাতে থাকে।

সে রাতে ফুলো বেলুনের মত মন নিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এল : এবার আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বানাতে হবে দ্বিতীয় পত্রের অনুলিপি।

এখানাও আগের মত পত্র···এমন কি আরও খারাপ। অনুলিপি বানাবার সময় এই চিঠিখানার অর্থ তার কাছে এমন আজগুবি মনে হল যে, অর্থ বোঝবার চেষ্টা না করে সে শুধু শব্দগুলো লিখতে লাগল।

সহসা মাদাম ফারবাকের আসল চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ল জুলিয়ানের। এগুলো একদম আসল চিঠি। ডন ডিয়েগো বুসতোর কাছ থেকে এনেছিল—ফেরৎ দেওয়া হয় নি। সেগুলো খুঁজে বার করল জুলিয়ান। কোরাসফের দেওয়া চিঠিগুলোর মত সেগুলোও। একই রকম অস্পষ্ট। চিঠিতে অনেক কিছু বলবার চেষ্টা হয়েছে···কিন্তু কিছুই বলা হয় নি। নশ্বরতা, মৃত্যু, অসীম শূন্যতা এমনি ধরনের সব বিষয় লেখা, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই ফুটে উঠেছে

হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়।

দিন এল, দিন গেল। সেই একঘেয়ে জীবনচর্যা। চিঠির অনুলিপি বানানো, ম্যাথিলডার গাউন দেখার জন্য আস্তাবলে ঘোড়া রাখতে যাওয়া, মাদাম দ্য ফারবাক মারকুইসের বাড়ি না এলে সেই অপেরায় গিয়ে সময় কাটানো...এই সব কাজের মধ্যেই বিধৃত হল জুলিয়ানের দৈনন্দিন জীবন। তবে মাদাম ফারবাক যেদিন মারকুইসের বাড়ী আসে সেদিন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সেদিন সে মার্শাল-পত্নীর টুপীর নীচ থেকে ম্যাথিলডার দু'টো চোখ দেখে। সে বাকপটু হয়ে ওঠে। সেদিন তার বাচনভঙ্গী এবং সরস কথা আরও হৃদয়-গ্রাহী হয়।

সে পরিপূর্ণভাবে সচেতন যে সে যা' কিছু বলছে তা' ম্যাথিলডার কাছে আজগুবি ব্যাপার, তবে শব্দ নির্বাচনে সে মুগ্ধ করতে চায় ম্যাথিলডাকে। ভাবে, আমি যত মিথ্যা বলব তত সে খুশি হয়ে উঠবে। তারপর দারুণ সাহসে সে বলতে লাগল প্রকৃতির রহস্যকথা। অচিরেই সে বুঝতে পারল যে ম্যাথিলডার দৃষ্টিতে সে যদি সাধারণ একটা জীব হিসাবে পরিগণিত হতে না চায় তবে সব রকম সরল এবং যুক্তিবহ বিষয় তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাই এই দুই অভিজাত মহিলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে একই ধারায় কাজ করতে লাগল। বেকার জীবনের চেয়ে এই জীবন অনেক কম একঘেয়ে মনে হল।

এক সন্ধ্যায় মনে মনে বলল জুলিয়ান—এই আমি একঘেয়ে পনের নম্বরের চিঠিখানা লিখছি। এর আগের চৌদ্দখানা চিঠি আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে মাদাম ফারবাকের হাতে দিয়ে এসেছি। আমার চিঠিতে তার টেবিলের পায়রা-খোপ অচিরে ভরে যাবে। কিন্তু তবু সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন চিঠিগুলো আমার লেখা নয়! এ সবের পরিণাম কি হবে? আমার এই অবিরাম জেদ কি আমার নিজের মত তাকেও একদিন বিরক্ত করে তুলবে? বলতে আমি বাধ্য যে আমার রাশিয়ান বন্ধু রাজকুমার কোরাসফ নির্ঘাৎ একজন ভয়ানক লোক···সে তার দেশের নিরেটতম নির্বোধ।

সীমিত বুদ্ধির কোনও সৈনিক যখন আকস্মিকভাবে কোন নামকরা সেনানায়কের অধীনে কোন গুরুতর অভিযানে যোগ দেয় তেমনিভাবে জুলিয়ানও বুঝতে পারছে না কেমনভাবে ওই রাশিয়ান যুবক ওই ইংরাজ মহিলার হৃদয় আক্রমণ করেছে। প্রথম চল্লিশখানা চিঠিতে তার এই লেখার দুঃসাহসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। আসলে এই মধুর ও শান্ত স্বভাব মহিলা নিজের নিরানন্দ জীবনে সামান্যতম আনন্দের স্পর্শ আনতে চায়···ভরে তুলতে চায় দৈনন্দিন জীবনকে খুশির আলোকে।

এক সকালে জুলিয়ান একখানা চিঠি পেল। মাদাম দ্য ফারবাকের নামাঙ্কিত পত্র। সিল ভেঙ্গে চিঠি পড়ল জুলিয়ান। সাধারণ একখানা চিঠি ···তাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু তার মনে অফুরন্ত উৎসাহের

সঞ্চার হল। অথচ কয়েকদিন আগে এমন উৎসাহ একেবারে অসম্ভব ছিল।

জুলিয়ান তড়িঘড়ি রাজকুমার কোরাসফের কাছে ছুটে গেল। কিন্তু সব শুনে রাশিয়ান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠল। অথচ এসময় তার সরল এবং বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল। কিছুতেই বুঝতে পারল না জুলিয়ান···আজ মার্শাল-পত্নীর ডিনারের আমন্ত্রণে গিয়ে কি আচরণ করবে!

সুন্দর সাজানো বসবার ঘর। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্র। হালকা রং ব্যবহার করা হয়েছে।

বসবার ঘরে তিনজন নামকরা অভিজাত পুরুষকে সে গোপনে নোট লিখতে দেখল। একজন হচ্ছেন মার্শাল-পত্নীর কাকা। তিনি একজন নামজাদা বিশপ। ভাইঝিকে তাঁর পক্ষে অদেয় কিছু নেই। জীবনে আর এক পা এগিয়ে গেল জুলিয়ান···এ এক বিপুল পদসঞ্চারের সুযোগ। এমন একজন নামজাদা বিশপের পাশে বসে এক টেবিলে ডিনার খাবে তা' ভাবতেই পারেনি।

ডিনার নৈরাশ্যজনক...কথাবার্তার ধরন যেন ধৈর্যের পরীক্ষা হচ্ছে। এ যেন বাজে লেখা বইয়ে ভরা একখানা টেবিল। মানব-চিন্তার সবচেয়ে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু মিনিট তিনেক শোনার পরই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করবে, বক্তার তথ্যনির্ভর ভাষণ না তার নিরেট বোকামি বড়।

২৮ : ম্যানন লেসকান্ত

> **একবার যখন সে তার পূর্বসূরীর বোকামি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয় তখন সে ভালভাবেই বুঝতে পারে যে, কোনটা সাদা কোনটা কালো এবং কোনটা কালো, কোনটা সাদা।**
>
> **—লিসতেমবার্জার**

রাশিয়ান যুবকটির কড়া নির্দেশ ছিল যে, যাকে চিঠি লিখছ কখনও কোন কাজে তার প্রতিবাদ করবে না। কোনও ভাবেই তার প্রশংসা করা ছাড়া আর কোন পথ নেবে না। এবং এই মতবাদের উপর নির্ভর করেই প্রতিটি চিঠির বয়ান লেখা হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা অপেরা হাউসে মাদাম ফারবাকের পাশে বসে ম্যানন লেসকান্তের গীতিনাট্যের প্রশংসা হেসে উড়িয়ে দিল। এর জন্য সে কারণ দেখাল যে, নাটকখানা একদম বোকামিতে ভরা। আর মার্শাল-পত্নী মন্তব্য করল যে, এই গীতিনাট্য পাদরী প্রিভোসতের উপন্যাসের চেয়েও নিম্নমানের।

জুলিয়ান ভাবে অবাক বিস্ময়ে, কি! এমন উন্নত গুণের নারীও উপন্যাসের

প্রশংসা করছে! অথচ মাদাম ফারবাকের চরিত্রের একটা আচরণ হচ্ছে, সপ্তাহের দু'তিন দিন এই সব লেখকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা···কেননা এই সব লেখকরা তাদের অশ্লীল রচনা দ্বারা তরুণ সমাজের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। বিবেচনা-শক্তির কি ভয়ানক বিভ্রান্তি!

মাদাম ফারবাক বলতে থাকে—'এই নীতিহীন কদর্য সাহিত্যিকদের তালিকায় ম্যানন লেসকান্তের নাম সবার উপরে। অপরাধী মনের কাছে উপযুক্ত এই অবিশ্বাসীনীদের কাহিনী, বাস্তবভঙ্গীতে এই কাহিনীগুলো বর্ণিত। সেণ্ট হেলেনা থেকে বোনাপার্টের ক্ষমতা এসব কাহিনী লেখার বিরোধিতা করে ঘোষণা করা, এসব উপন্যাস অনুচরদের জন্য লেখা।'

এই মন্তব্য জুলিয়ানের মনকে আবার পূর্বের সতর্ক অবস্থায় ফিরিয়ে আনল। কেউ নিশ্চয় মার্শাল-পত্নীর সাহায্যে আমাকে নষ্ট করার চেষ্টায় আছে। নেপোলিয়ন সম্পর্কে আমার উৎসাহের কথা তাকে বলা হয়েছে। তাই মহিলা আমার প্রতি রাগ দমন করছে এবং আমার উপর বিরক্ত হওয়ার তার কারণও রয়েছে। সন্ধ্যার অবশিষ্ট সময়টুকু এই আবিষ্কারের জন্য সে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করল, খুশী হল। তাই অপেরা হাউস থেকে বেরিয়ে সে যখন মার্শাল-পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন বলল মহিলা—'দেখুন, আমাকে যারা ভালবাসে তারা বোনাপার্টকে শ্রদ্ধা করে না। কথাটা মনে রেখ মশাই। সামরিক কারণে সে আমাদের উপর চেপে বসেছিল, এটুকুই শুধু স্বীকার করে। লোকটার মহান সৃষ্টির প্রশংসা করার মত তার হৃদয় ছিল না।'

'আমাকে যারা ভালবাসে!' শব্দগুলো বার বার মনে মনে আওড়াল জুলিয়ান। এর অর্থ হয় কিছুই নয় অথবা সব কিছু। এ এক ধরনের গোপন ভাষা যা' আমরা গ্রামের লোকেরা জানি না। মার্শাল-পত্নীর কাছে পাঠাবার জন্যে একখানা চিঠির অনুলিপি বানাতে বানাতে তার মনের পটে ভেসে উঠল মাদাম দ্য রেনলের মূর্তি।

পরের দিন বেশ নিরুৎসাহ স্বরে এবং তার মনে হল বেশ আহতকণ্ঠে মাদাম ফারবাক তাকে বলল—'আচ্ছা এটা কেমন করে হল, কাল রাতে অপেরা থেকে ফিরে তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছ তাতে লণ্ডন এবং রিচমন্দের কথা এল কি করে?'

জুলিয়ান দারুণ লজ্জিত হল, চিঠি দেখে লিখেছে, কোনও রকম অর্থ ভাবে নি। পর পর বাক্যগুলো লিখে গেছে। তাই প্যারিস আর সেণ্ট ক্লাউদের বদলে লিখেছে লণ্ডন আর রিচমন্দ। বার দুই তিন এ সম্বন্ধে সে একটা যুক্তি খাড়া করতে গেল, কিন্তু বাক্য শেষ করতে পারল না। মনে হল সে দারুণভাবে হেসে উঠবে। অবশেষে তার মাথায় একটা ধারণা এল। বলল—'মানবমনের সবসেরা আগ্রহ ভক্তি নিয়ে আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বোধ হয় লেখার সময় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।'

মনে মনে বলল জুলিয়ান, ওর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করেছি, তাই আজ সন্ধ্যায় ওর একঘেয়েমি দূর হবে না। জুলিয়ান মাদাম ফারবাকের বাড়ী ছেড়ে চলে এল। ঘরে ফিরে সে চিঠির তাড়া নিয়ে বলল···রাশিয়ান যুবক লণ্ডন আর রিচমন্দের কথাই বলেছে। তবে চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে ভালবাসার কথা।

তার কথার আচরণে স্পষ্ট চপলতা, অথচ চিঠিতে ভক্তি এবং বাইবেলীয় তত্ত্বের কথা···দু'টি পরস্পর-বিরোধী ভাব, তাই সে এককভাবে বিশিষ্ট। তার বাক্যের দীর্ঘতা মার্শাল-পত্নীর খুব পছন্দ। এটা দুষ্ট-দানব ভলতেয়ারের লেখার অনুকরণ নয় তাই তার পছন্দসই। তবে তার লেখার মধ্যে যে ধর্মবিরোধী একটা সুর স্পষ্ট তা' মাদাম ফারবাকের নজর এড়িয়ে যায় নি। তার চারধারে অতীত দিনের নামজাদা পুরুষদের মেলা, তারা নীতিবাগীশ এবং তারা কোন সন্ধ্যায় কোন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না···তাই জুলিয়ানের মধ্যে অভিনবত্বের চিহ্ন দেখে এই মহিলার মন মুগ্ধ···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে যে, এর জন্য তাকে আঘাত লাভ করতে হচ্ছে। মাদাম এই অবস্থাকে চপল যুগের চিহ্ন বলে ধরে নিয়েছে।

কোনও রকম অনুগ্রহ লাভের আশায় এ ধরনের বসবার ঘরে দেখা দেওয়া আনন্দজনক। জীবনপথে এটাই যেন উষরভূমি অতিক্রম করা।

জুলিয়ানের জীবনে এবং সময়ে মাদাম ফারবাকের এই অনধিকার প্রবেশ দেখে ম্যাথিলডা মনে মনে ঠিক করল, না, জুলিয়ানের কথা আর সে ভাববে না। ভয়ানক দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ভাংচুর হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, এই নির্বোধ যুবকটাকে সে ঘৃণা করে। তবু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জুলিয়ানের কথাবার্তা তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যা' তাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তা' হচ্ছে জুলিয়ানের আন্তরিকতাশূন্য আচরণ। মার্শাল-পত্নীকে জুলিয়ান এমন কিছু বলে না যা' নিছক মিথ্যা নয় অথবা তার দৃষ্টিভঙ্গীবিরোধী নয়···এবং ম্যাথিলডার এসব সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রয়েছে। মেকিয়াভেলি যুগের এই আচরণ ম্যাথিলডাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। কি ভয়ানক চতুরতা! নির্বোধ আর সাধারণ সবজান্তাদের থেকে ওর ভাষার কি পার্থক্য!

জুলিয়ানের জীবনে দিনগুলো ক্রমে ক্রমে ভীতিজনক হয়ে উঠতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় মার্শাল-পত্নীর বসবার ঘরে হাজিরা দেওয়া এক যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য কাজ। তার মানসিক শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় এই প্রয়াসেরও ত শেষ! তাই প্রতি রাত্রে কেবলমাত্র চরিত্র ও বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করে কোনরকমে হতাশার হাত এড়িয়ে মাদাম ফারবাকের বিশাল অঙ্গন পার হয়ে আসে।

মনে মনে বলে জুলিয়ান, বিদ্যামন্দিরে আমি হতাশা জয় করেছিলাম কারণ তখন ভবিষ্যতের ভয়ানক ভীতিজনক সন্দেহ ছিল আমার সামনে। সৌভাগ্য আমি রচনা করে থাকি বা নষ্ট করে থাকি এই ঘৃণা অথচ বিপ্লবাত্মক সাহচর্যে আমি আজ দিন কাটাতে বাধ্য। এসব যুক্তিতর্ক কিন্তু ভয়ানক ভীতিপ্রদ,

বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কোন সুফল সৃষ্টি করতে পারল না। প্রতিদিন লাঞ্চ এবং ডিনারের সময় ম্যাথিলডার সঙ্গে তার দেখা হয়। মারকুইস তাকে রোজ গাদা গাদা চিঠির বক্তব্য বলেন তা' থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে ম্যাথিলডার সঙ্গে ক্রয়সিনয়ের বিবাহ আসন্ন, ইতিমধ্যেই ছোকরা রোজ দু'বেলা এ বাড়ীতে হাজিরা দিচ্ছে। ঈর্ষা-দগ্ধ প্রেমিকের নজর থেকে তার কোন একটা কাজও এড়িয়ে যায় না।

যখনই তার নজরে পড়ে যে ম্যাথিলডা গভীর প্রেমে মগ্ন হয়ে তার হবু-স্বামীর সাথে কথা বলতে বলতে তার ঘরের দিকে যাচ্ছে তখনই সে তার প্রিয় পিস্তলটার দিকে না তাকিয়ে পারে না। মনে মনে সে ভাবে, এটা কত না বুদ্ধির কাজ হবে যদি সে তার জামার এই পরিচয়-চিহ্নটা কেটে ফেলে প্যারিস থেকে বহু দূরে একটা নির্জন বনের মধ্যে চলে যায় এবং সেখানে তার এই ঘৃণ্য জীবন শেষ করে ফেলে! ওই জেলায় আমি অপরিচিত, আমার মৃত্যু অন্ততপক্ষে পনের দিন গোপন থাকবে। আর পনের দিন পরে কারই বা আমার কথা মনে পড়বে!

এ বড় যুক্তিপূর্ণ চিন্তা। কিন্তু পরের দিন ম্যাথিলডার বাহু দু'টো নজরে পড়তেই তার মনের ভাব গেল বদলে। মন থেকে নিষ্ঠুর স্মৃতি গেল মুছে, এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছা হল প্রবল। ভাবল, রাশিয়ান যুবকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু তার পরিণাম কি হবে?

মার্শাল-পত্নীর কাছে তিপ্পান্নখানা চিঠির নকল করে পাঠিয়েছি, না, আর লিখব না। আর ম্যাথিলডার সঙ্গে এই ছ'সপ্তাহ ধরে যন্ত্রণাদায়ক অভিনয় করেছি, এর ফলে হয় তার মানসিক বিরাগে কোন ছাপ পড়েনি আর না হয় আমার সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়ার একটা ইচ্ছা ওর মনে জেগেছে। হায় ঈশ্বর! আমি তাহলে আনন্দে মরে যাব! আর সে ভাবতে পারল না।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ সে মনের সাথে লড়াই করল। ওকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে আমি অক্ষম! তবু নতুন করে ওর মনে বিতৃষ্ণার ভাব গড়ে ওঠার আগে আমাকে একদিনের জন্যও সুখ উপভোগ করতে হবে। তারপর আমার থাকবে না কোন সম্বল, আমার সর্বনাশ ঘটবে চিরকালের জন্যে।

ওর মত চরিত্রের মেয়ে আমাকে কি আশ্বাস দিতে পারে? হায়! আমার আচরণ হারাবে তার পটুতা, আমার কথা বলার ঢঙ হয়ে উঠবে ধীর এবং একঘেয়ে। হায় ঈশ্বর! আমি যা' তাই হয়েছি কেন?

২৯ : বিরক্তিকর

কাম-লালসার কাছে আত্ম-বিসর্জন করা উত্তম⋯কিন্তু যার কাম-লালসার অনুভূতি নেই। হে দুর্ভাগা ঊনিশ শতক।

—গিরোডেভ

জুলিয়ানের প্রথম চিঠিখানা পড়ে কোন আনন্দ পায় নি মাদাম ছ ফারবাক। তারপর থেকে তার মন অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা জিনিষের জন্য সে দুঃখিত হল। ভাবল, কি দুঃখের ব্যাপার! মঁসিয়ে সোরেল পাদরী নন! তার এই ঘনিষ্ঠতার সময় সে কথা ত স্বীকার করা উচিৎ ছিল! তার বুকে ওই ক্রস চিহ্ন ঝোলানো, সাধারণ মানুষের মত পোষাক পরনে, এসব দেখে ত যে কেউ নিশ্চয় প্রশ্ন করতে পারে, তখন কি জবাব দেবে? চিন্তার শেষ হল না মাদামের। আমার কোন বন্ধু রটিয়ে দিয়েছে যে, সে আমার পিতৃ-বংশের একজন ব্যবসায়ীর সন্তান⋯সেই ব্যবসায়ী জাতীয় বাহিনীতে সেবার জন্য পদক লাভ করেছে।

জুলিয়ানের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার আগে মাদাম ফারবাকের ইচ্ছা ছিল নিজের নামের আগে মার্শাল-পত্নী শব্দটা জুড়ে দেবে। কিন্তু তখন থেকে ভুঁইফোড় অহঙ্কার এবং মানসিক অসুস্থতার জন্য তা' পারেনি⋯কেননা উন্নতি-কামী নানা স্বার্থের সাথে তাকে লড়তে হচ্ছিল।

মার্শাল-পত্নী মনে মনে বলল, প্যারিস শহরের কাছাকাছি কোন গীর্জায় ওকে প্রধান পুরোহিতের পদ পাইয়ে দেওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু মঁসিয়ে সোরেল বড় সরল। এবং তাছাড়া সে মারকুইসের সেক্রেটারী। এটা সত্যসত্যই জঘন্য ব্যাপার।

এই প্রথম সব কিছুকে ভয় করার প্রবণতা ও সামাজিক পদের শ্রেষ্ঠতা পরস্পরের সম্মুখীন হল এবং সংঘর্ষ বাধল। তাই মার্শাল-পত্নীর বুড়ো অনুচরের নজরে পড়েছে যে, ওই সুদর্শন অথচ বিষণ্ণ মুখমণ্ডল ও ভুলো-মন যুবকের দেওয়া চিঠি নিয়ে যখন ঘরে ঢোকে তখনই মার্শাল-পত্নীর মুখ থেকে নিরানন্দ ভাব মুছে যায়⋯কিন্তু অন্য সময় নিরানন্দ থাকেই।

তার একঘেয়ে জীবনের প্রধান উচ্চাশা বাইরের বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করা, অবশ্য তার জন্য অন্তরের অনুভূতি খোঁজ করার ইচ্ছা নেই। সফলতায় নেই সত্যিকারের আনন্দ। জুলিয়ানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এ সবই তার কাছে এখন অসহ্য। আগের সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক তার সঙ্গে কাটালেই তার মন এখন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে, সারাদিন ঝিয়েরা আর তাকে জ্বালাতন করতে পারে না। খুব চতুরতার সঙ্গে কতকগুলো বেনামী চিঠি লেখাই তার প্রশংসার

প্রমাণ। অথচ অন্যরা ওর সম্পর্কে দুর্ণাম ছড়ায়, আসল সত্যের খোঁজ করে না। মাদাম ফারবাক এই নোংরামি একেবারেই সহ্য করতে পারে না, তাই ম্যাথিলডাকে তার সন্দেহের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

একদিন বার তিনেক কোন চিঠি এসেছে কি না খবর নেওয়ার পর মাদাম ফারবাক ঠিক করল যে সে জুলিয়ানের চিঠির জবাব লিখবে। এই ইচ্ছা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থাকে পরাস্ত করল। দ্বিতীয় চিঠিতে মার্শাল-পত্নী নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিল ; মঁসিয়ে সোরেল। কেয়ার অফ মঁসিয়ে লা মারকুইস দ্য লা মোল।

আর এক সন্ধ্যায় মাদাম ফারবাক সংক্ষেপে জুলিয়ানকে বলল—'দেখ, তোমার ঠিকানা লেখা খান কয়েক খাম আমাকে দিও।'

গোপনে মাদাম ফারবাকের বুড়ো চাকরের মত মুখ-ভঙ্গি করে জুলিয়ান ভাবল তাহলে আমি একজন অনুচর-প্রেমিক হিসাবে নিযুক্ত হলাম।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা সে ঠিকানা লেখা খানকয়েক খাম এনে দিল এবং পরের দিন সকালেই পেল তৃতীয় চিঠি। জুলিয়ান চিঠির প্রথম পাঁচ-ছ' লাইন এবং শেষের দু'তিন লাইন পড়ে রেখে দিল। ছ'পৃষ্ঠার চিঠি এখানা। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে ঠাস-বুনোনিতে লেখা।

ক্রমে ক্রমে প্রতিদিন একখানা করে চিঠি লেখাই মাদাম ফারবাকের জীবনের প্রধান আনন্দ হয়ে উঠল। আর জুলিয়ান বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাশিয়ান যুবকের চিঠি নকল করে পাঠাতে লাগল···এমন বড় বড় শব্দে চিঠিগুলো লেখা যে আসল চিঠির সঙ্গে তার জবাবের মিল খুঁজে পাওয়া মাদাম ফারবাকের মধ্যে কুলোল না।

স্বেচ্ছা-নিযুক্ত গুপ্তচর টানবো যদি তাকে গিয়ে বলত যে তার সব চিঠি সিল-না-ভাঙা অবস্থায় জুলিয়ানের ড্রয়ারে পড়ে আছে তাহলে মাদাম ফারবাক কত না বিরক্তিবোধ করত।

একদিন সকালবেলায় মার্শাল-পত্নীর লেখা একখানা চিঠি জুলিয়ানকে দেওয়ার জন্য লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। ম্যাথিলডার সঙ্গে চাকরটার দেখা হল। জুলিয়ানের হাতে লেখা ঠিকানাওয়ালা খাম ম্যাথিলডার নজরেও পড়ল। চাকরটা বেরিয়ে আসতেই সে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। জুলিয়ান তখনও লেখায় ব্যস্ত তাই চিঠিখানা ড্রয়ারে রাখবার সময় পায় নি, সেখানা জুলিয়ানের জন্যই টেবিলের ধারে রাখা হয়েছে।

চিঠিখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ম্যাথিলডা বলল—'এসব আমি সহ্য করতে পারি না। ওগো তুমি আমাকে, তোমার স্ত্রীকে একেবারে ভুলে গেছ। তোমার আচরণে আমি কষ্ট পাচ্ছি।'

এই কথাগুলো ত তার কাজের বিরোধী অশিষ্ট-আচরণ, তাই তার অহমিকা উদ্বেল হয়ে উঠল, কণ্ঠ হল রুদ্ধ। এবং সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক মুহূর্ত পরেই জুলিয়ানের মনে হল শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ম্যাথিলডার।

এই দৃশ্য তার জীবনে যে সুখ, যে চমক সৃষ্টি করল তার অর্থ সম্যক বুঝতে পারল না জুলিয়ান। তাই সে বিস্মিত হল, অভিভূত হল। খানিক পরেই তার মনে প্রথম আনন্দের এক ঝড় বয়ে গেল। তারপরেই রাজকুমার কোরাসফের উপদেশ মনে পড়ল —এ সময় একটা বেচাল কথা বললে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সে ধীরে ধীরে ম্যাথিলডাকে তুলে বসাল এবং ম্যাথিলডা পুরো-পুরিভাবে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। জুলিয়ানের দু'বাহু এই ঘটনার আকস্মিকতায় এবং মানসিক আবেগ দমনের প্রচেষ্টায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। এই অনুপম দেহ আমি এ সময় কিছুতেই বুকে জড়িয়ে ধরব না, তাহলে সে আমাকে ঘৃণা করবে, নিষ্ঠুর ব্যবহার করে দূরে সরে যাবে। কি ভয়ানক চরিত্র!

মনে মনে ম্যাথিলডার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে করতে জুলিয়ানের মনে হল এই চারিত্রিক বিশিষ্টতার জন্যই ত সে ম্যাথিলডাকে শতগুণ বেশী ভালবাসে। তাই ত তার উপলব্ধি ঘটল যে, সে তার দু'বাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে তার হৃদয়ের রাণীকে।

জুলিয়ানের অননুভূত কাম-শীতলতা দেখে ম্যাথিলডার অন্তরের আহত অহমিকা এবার যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। আত্ম-দমনের ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলল, সে চেষ্টাও করল না···এই মুহূর্তে জুলিয়ানের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটে উঠল তা' স্পষ্ট চোখে পড়ল। আর সে তার দিকে তাকাতে পারল না, ওর ঘৃণার ভাব দেখে সে কাঁপতে লাগল।

লাইব্রেরী ঘরের সোফায় ম্যাথিলডা নিথরভাবে বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে রেখেছে জুলিয়ানের দিক থেকে। নিদারুণ মনস্তাপ আহত অহমিকা এবং প্রেমের জ্বালা একটি মানব-হৃদয় যতটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারে তা' সে সহ্য করছে। কি ভয়ানক হঠকারি কাজ করার জন্য সে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমি একটা অসুখী জীব, এমনিভাবে অশিষ্ট প্রবণতার জন্য আমি বিমুখ হলাম, এটা আমার জন্য তোলাই ছিল। কে আমাকে বিমুখ করল? দুঃখের জ্বালায় পাগলের মত সে আওড়াল—বিমুখ করল আমার বাবার একজন অনুচর।

—'না, এসব আমি সহ্য করব না।' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাথিলডা। দারুণ রোষে লাফিয়ে উঠল। জুলিয়ানের টেবিলের ড্রয়ারটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। মাত্র ফুট দু'য়েক দূরে ওই ড্রয়ারটা। অনুচরের হাতের লেখার মত ন দশটা একই রকম চিঠি দেখে তার দেহ বরফের মত নিথর হয়ে গেল। প্রতিখানা খামের উপর স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট জুলিয়ানের হাতের লেখা।

রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেলল ম্যাথিলডা। চেঁচিয়ে বলল—'তুমি ওকে কেবল অনুগ্রহ দেখাও নি, ঘৃণাও করেছ। তুমি একটা নামহীন মানুষ, ঘৃণা করেছ মার্শাল-পত্নী ফারবাককে!'

জুলিয়ানের পায়ের নীচে আছড়ে পড়ে ম্যাথিলডা আবার বলতে লাগল—

'ওগো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, পার যদি ঘৃণাও করো কিন্তু ভালবেসো। তোমার প্রেম হারিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে পারছি না গো।'

এবং চেতনা হারাল ম্যাথিলডা।

জুলিয়ান ভাবল, ওই ও পড়ে আছে, ওই সেই গর্বোদ্ধত জীব···লুটিয়ে আছে আমার পায়ের নীচে!

৩০ : অপেরা হাউসে একটা বক্স

> তুমি ওই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের
> মতই বার্তাবহ তীব্র ঝড়ের
>
> —ডন য়ুয়ান

এই তীব্র আবেগ-উদ্বেল দৃশ্যের মাঝে জুলিয়ান যত না খুশি হল তার চেয়েও বেশী হল বিস্মিত। রাশিয়ান যুবকের কথা যে কত জ্ঞান-গর্ভ তা' ম্যাথিলডার অপমানকর মন্তব্য শুনেই সে বুঝতে পারল। কাজেই আমার মুক্তির একটাই পথ: কম বল কম কর।

জুলিয়ান ম্যাথিলডাকে ধরে তুলে আবার সোফায় বসাল, মুখে সে একটা কথাও বলল না। আর চোখের জলের ধারা নামল ম্যাথিলডার।

মুখের ভাব ঠিক রাখার জন্য ম্যাথিলডা মাদাম ফারবাকের লেখা চিঠিগুলো হাতে নিল এবং ধীরে ধীরে চিঠিগুলোর সিল ভাঙলো। মার্শাল-পত্নীর হাতের লেখা চিনতে পারায় তার দেহ মন বিবশ হয়ে পড়ল। না পড়ে সে চিঠির পাতাগুলো উল্টাতে লাগল, বেশীর ভাগ চিঠি ছ' পৃষ্ঠার।

জুলিয়ানের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না, তবু করুণকণ্ঠে বলল ম্যাথিলডা —'ওগো, অন্ততঃ আমার প্রশ্নের একটা জবাব দাও। ভালভাবেই তুমি জান, আমি অহঙ্কারী। আমার চরিত্রের এবং আমার সামাজিক অবস্থার এ এক দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম। আমি তা স্বীকার করছি। 'তাই মাদাম ফারবাক আমার কাছ থেকে তোমার হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেছে···ভয়ানক কাম-লালসায় আমি তোমার জন্যে যা' বিসর্জন দিয়েছি সে কি তার চেয়েও বেশী দিয়েছে?'

বিষণ্ণ নীরবতা জুলিয়ানের একমাত্র জবাব। সে ভাবল, বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সম্মানীয় লোকের কাছে যা' অনুপযুক্ত এমন অন্যায় কথা আমার সম্পর্কে ভাববার অধিকার পেল কোথায় সে?

ম্যাথিলডা চিঠিগুলো পড়তে চেষ্টা করল কিন্তু জল-ভরা চোখে তা' সম্ভব হল না। বিগত একমাস ধরে সে দুর্দশা ভোগ করেছে, কিন্তু এমন গর্বিত হৃদয় কারো কাছে দুঃখের কথা স্বীকার করতে পারে নি। আকস্মিক সুযোগে বিস্ফোরণ ঘটেছে···অসূয়া এবং প্রেম মুহূর্তের জন্য অহমিকাকে পরাস্ত করেছে।

সোফার উপর জুলিয়ানের খুব কাছে বসে আছে ম্যাথিলডা। সে দেখছে তার চুলের গোছ, সমুদ্র-শকুনের ডানার মত সাদা কাঁধ। মুহূর্তের জন্য জুলিয়ান তার কর্তব্য ভুলে গেল। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল।

ধীরে ধীরে জুলিয়ানের দিকে ঘাড় ঘোরাল ম্যাথিলডা। ওর দু'চোখে দুঃখের ছায়া দেখে অবাক হল জুলিয়ান। স্বাভাবিক ভাবের কোন চিহ্নই নেই। জুলিয়ান বুঝতে পারছে তার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে, মনের সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য দুর্বার চেষ্টা করছে। অচিরে ওই দু'চোখ থেকে ঝরে পড়বে শীতল ঘৃণা যদি আমি আমার প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করি, জানাই আমার খুশির খবর। সজোরে কথা বলার শক্তি লোপ পেয়েছে ম্যাথিলডার। তাই ধীরে ধীরে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে যে কাজ করেছে তার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করছিল।

দৈহিক শ্রমে ক্লান্ত জুলিয়ান। সে খুব মৃদুস্বরে বলল—'আমারও ত অহঙ্কার আছে।'

ম্যাথিলডা সবেগে তার দিকে ঘুরল। তার কণ্ঠস্বর সে আবার শুনতে পাবে আশা করে তাই তার আনন্দ বাঁধ মানল না। সেই মুহূর্তে নিজের ঘৃণাপূর্ণ আচরণের কথা তার মনে পড়ল…যাকে তার হৃদয় পূজো করে সেই মানুষকে সে ঘৃণা করেছে মনের দুঃখের জ্বালায়।

জুলিয়ান বলতে লাগল—'হয় ত এই অহঙ্কার প্রদর্শন করার জন্য তুমি আমাকে বেছে নিয়েছিলে। নিশ্চয় এটা করেছিলে তোমার মানসিক শক্তির জোরে, যা' একমাত্র পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। আবার এই মুহূর্তে তুমিই আমাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছ। আমি ত মার্শাল-পত্নীর প্রেমে পড়তে পারতাম… ।'

ম্যাথিলডা চমকে উঠল…তার দু'চোখে বিচিত্র আবেগের ছোঁওয়া, সে যেন এখনি তার মৃত্যু-দণ্ডাদেশ শুনবে। ওর এই চমকানো-ভাব জুলিয়ানের দৃষ্টি এড়াল না…সে দুর্বল হল। ভাবল, আহা! বাইরের অস্পষ্ট ধ্বনির মত ওর মৃদু কণ্ঠের আওয়াজ আমার কানে এসে বাজছে! এখন এই মুহূর্তে ওর বিবর্ণ অধর-যুগল যদি চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিতে পারতাম!…

জুলিয়ানের কণ্ঠস্বর মৃদু থেকে মৃদুতর হচ্ছে। সে আবার বলল—'মার্শাল-পত্নীর প্রেমে আমি পড়তে পারতাম, তবে সে যে আমার প্রেমে পড়েছে তার কোনও প্রমাণ নেই।' সে আরও কথা বলতে সক্ষম। হায়! রাজকুমার কোরাসফ! তুমি এখন এখানে নেই কেন? আমাকে এ সময় তুমি কথা জুগিয়ে দিতে পারতে!

সোচ্চার কণ্ঠে আবার বলতে লাগল জুলিয়ান—'আমার অন্য আবেগের কথা ছাড়লেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মার্শাল-পত্নীর সাথে আমি ঘনিষ্ঠ হয়েছি। যখন আমি ঘৃণিত হয়েছি সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, দিয়েছে সাহচর্য। নিঃসন্দেহে বলতে পারি খোশামোদের কতকগুলো সুবিধা কিন্তু খোশামোদ করা

আমার ধাতে সহ্য হয় না।'

—'হায়! ঈশ্বর!' বলল ম্যাথিলডা।

এবার দৃপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল জুলিয়ান—'আচ্ছা, তুমি আমাকে কি আশ্বাস দিচ্ছ? এই মুহূর্তে তুমি আমার সাথে যে আচরণ করছ, এমন আশ্বাস কি দিতে পার যে, এমন আচরণ তুমি আমার সঙ্গে আরও কিছুদিন করবে?'

তার হাত ধরে তার দিকে ঘুরে বসে ম্যাথিলডা বলল—'আমার নিরানন্দ আমার তীব্র ভালবাসার বিমুখ হওয়ার হয়···তুমি যদি আর আমাকে না ভালবাস··· ।'

নড়া-চড়া করার জন্য ম্যাথিলডার কাঁধ থেকে জামা খসে পড়েছে, তার দেহের ঊর্ধাংশের অনুপম লাবণ্য জুলিয়ানের নজরে পড়ল। তার কেশ-গুচ্ছ এখন বিস্রস্ত···অমনি এক মধুর স্মৃতিতে তার মন ভরে গেল। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলছিল। কিন্তু তার মন বলে উঠল, এখন তাড়াতাড়ি কোন কথা বলে ফেললে আমার সেই নৈরাশ্যের দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। মাদাম দ্য রেনল তাঁর অন্তরের নির্দেশানুযায়ী যা' কিছু করেছিলেন তার পিছনে যুক্তি আছে···কিন্তু অভিজাত সমাজের এই সুন্দরী যুবতী যখন আবেগ অনুভবের যথেষ্ট কারণ খুঁজে পায় তখনই তার অন্তর সাড়া দেয়।

চোখের নিমেষে এই সত্য তার মনে সাড়া জাগাল, চোখের নিমেষে তার সাহস এল ফিরে। ম্যাথিলডা ওর যে হাত আঁকড়ে ধরে ছিল জুলিয়ান সে হাত ছাড়িয়ে নিল। এবং মনের বিতৃষ্ণা বোঝাবার জন্যে একটু সরে বসল। মানব-মনে এর বেশী সাহস দেখানো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে মাদাম ফারবাকের চিঠিগুলো গুছিয়ে রেখে জুলিয়ান লাইব্রেরী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মনে মনে আওড়াল ম্যাথিলডা, ওর মনের জানোয়ারটা এতটুকু বিচলিত হয় নি। কিন্তু কি বলেছি আমি! একটা জানোয়ার! সে জ্ঞানী, বিচক্ষণ এবং দয়ালু! আমিই কল্পনাতীতভাবে ভুল করছি।

এই মনের ভাবই বজায় রইল। সে দিন সুখেই কাটাল ম্যাথিলডা। ভালবাসায় ভরে রইল তার মন। একেবারেই মনে হল না যে, এই হৃদয় গর্বে উদ্ধত হয়ে ছিল এবং নিজেও ছিল গর্বিত।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বসবার ঘরে অনুচর যখন এসে ঘোষণা করল যে, মাদাম ফারবাক এসেছে, অমনি তার মনে ভয়ের সঞ্চার হল। কণ্ঠস্বর নয় যেন অশুভ ঘণ্টাধ্বনি। সে কিছুতে মার্শাল-পত্নীকে দেখতে পারবে না, তার ঘর ছেড়ে চলে গেল। বিজয়ী হয়ে গর্বিত জুলিয়ান মারকুইসের বাড়ী ছেড়ে বাইরে ডিনার সেরে এল। তার ভয় হল, তার চোখের ভাষায় অনেক কিছু প্রকাশ পাবে।

দ্বন্দ্বের মুহূর্তগুলো শেষ হল···জুলিয়ানের মনে প্রেম ও আনন্দের আবেগ বাড়তে লাগল। এর মধ্যেই নিজেকে সে নিজে দুষছে। ভাবছে, কি ভাবে

আমি তাকে প্রতিরোধ করেছি! আমাকে আর যদি সে ভাল না বাসত তবে কি বা হ'ত! একটিমাত্র মুহূর্ত ওই গর্বিত হৃদয়ে এনেছে পরিবর্তন···স্বীকার করছি, আমি তার সাথে ঘৃণ্য ব্যবহার করেছি।

সন্ধ্যায় জুলিয়ান ঠিক করল অপেরা-হাউসে যাবে। মাদাম ফারবাক তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এবং এ খবর ম্যাথিলডার কানেও যাবে। এই তর্কের যথেষ্ট যুক্তি আছে সত্য, কিন্তু তবু দলের সকলের সামনে যাওয়ার সাহস হল না। কেননা যদি সে কথা বলে অমনি তার মনের আনন্দের অস্তিত্ব যাবে হারিয়ে। তাই সন্ধ্যার প্রথম প্রহর অতিবাহিত হল।

রাত দশটা বাজল। এবার তাকে হাজির হতেই হবে অপেরা হাউসে।

তার ভাগ্য ভাল। দেখল মাদাম ফারবাকের বক্সে নারীর মেলা। দরজার পাশে একখানা চেয়ারে সকলের আড়ালে বসল জুলিয়ান। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

এক সময় মাদাম ফারবাক বলল—'মারকুইসের বাড়ীর মেয়েদের দেখতে পাচ্ছ? ওরা তৃতীয় সারিতে বসেছে।'

জুলিয়ান সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। ম্যাথিলডাকে সে দেখতে পেল। অশ্রু-ভেজা তার উজ্জ্বল দু'টো চোখ।

ভাবল জুলিয়ান, কিন্তু আজ ত ওদের অপেরায় আসবার দিন নয়! কি আগ্রহ!

ম্যাথিলডা জেদ করে মাকে নিয়ে এসেছে অপেরা-হাউসে। ভাল বক্স পেল না। একটি পরিচিত পরিবার তাদের আসন ছেড়ে দিল ওদের, ম্যাথিলডা দেখতে চায়, জুলিয়ান আজ সন্ধ্যাটা মার্শাল-পত্নীর সাহচর্যে কাটায় কি না!

৩১ : তাকে ভয় দেখাও

> **সুতরাং তোমাদের সভ্যতার এই হচ্ছে অদ্ভুত কাণ্ড!**
> **তোমরা প্রেমকে করে তুলেছ এক নীরস ঘটনা।**
>
> **—বারনেভ**

জুলিয়ান তাড়াতাড়ি মাদাম মোলের বক্সে হাজির হল এবং প্রথমেই তার নজরে পড়ল ম্যাথিলডার কান্নায় ভেজা দু'টো চোখ। সে কাঁদছিল। যারা তাদের বসবার আসন দিয়েছিল তারা সাধারণ স্তরের মানুষ। অপরিচিত। ম্যাথিলডা জুলিয়ানের হাত চেপে ধরল। মায়ের শাসানির ভয় নেই। ধরা গলায় বলল—'আশ্বাস দিচ্ছি!'

ভাবল জুলিয়ান, যাই ঘটুক না কেন ওর সাথে একটি কথাও বলব না। যেন রঙ্গমঞ্চের চড়া আলো থেকে নিজের চোখ বাঁচানোর জন্য ও হাত আড়াল

দিল। এখন যদি কথা বলতে যাই তবে আমার মনের গভীর আবেগ ও বুঝে ফেলবে, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। সকালের দিকে তার অন্তরের দ্বন্দ্ব অনেক বেশী প্রবল ছিল···এখন তার অন্তর আবেগে ভরা। সে ম্যাথিলডার মনের গর্বে খোঁচা দিতে সাহস করল না। ভালবাসা আর কাম-লালসায় পীড়িত তার মন···তবু কথা বলা থেকে নিজের মনকে তারা দমন করল।

মাদাম মোল চাইলেন জুলিয়ানকে তাঁর সঙ্গে বাড়ী নিয়ে যেতে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, দারুণ বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। কিন্তু তাকে সামনে বসিয়ে তিনি অবিরাম বক্‌বক্ করতে লাগলেন···মেয়ের সাথে জুলিয়ানকে কথা বলতে দিলেন না। আর অতিরিক্ত আবেগ দেখিয়ে সব কিছু হারাবার ভয় নেই তাই সে আত্মসমর্পণ করতে ইতঃস্তত করল না।

নিজের ঘরে ফিরে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল জুলিয়ান।

সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অর্ধেক বিজয়ী হয়েছে এমন একজন সেনানায়ক। জীবনে এই যে সুবিধা সে লাভ করেছে তা' মৌলিক, তা' অফুরন্ত। কিন্তু আগামীকাল কি ঘটবে? একটি সামান্য ঘটনাতেই তার সর্বনাশ হবে।

রাতে সে নেপোলিয়নের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বসে লেখা আত্মজীবনী খুলে পড়তে বসল। জোর করে সে পড়ায় মন দিল, তার দৃষ্টি বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ ছিল···কিন্তু মন আর মস্তিষ্ক দখল করে আছে ম্যাথিলডার আচরণ। মাদাম রেনলের আচরণের সাথে একটুও মিল নেই ম্যাথিলডার। একসময় জুলিয়ান তার হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার মস্তিষ্কে একটা ইচ্ছা চমকে উঠল—তাকে ভয় দেখাও, শত্রুকে বশ মানাতে হলে তাকে ভয় দেখাও···সে আর তোমায় ঘৃণা করবে না। ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করতে লাগল। মনে বন্য আনন্দের বন্যা তার এই আনন্দ গর্বের নয় প্রেমের।

তাকে ভয় দেখাও! গর্বিত মনে সে আওড়াল এবং গর্ব করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অফুরন্ত সঙ্গম-আনন্দে যখন তারা দুজনে আপ্লুত তখন মাদাম রেনল সন্দেহ করত যে, আমার প্রেম তার প্রেমের সমান নয়। কিন্তু এখানে এক দানবী-মনকে বশ মানাতে হচ্ছে, বশ করা নিশ্চয় আমার কাজ হবে।

সে জানে, আগামী কাল সকাল আটটার সময় ম্যাথিলডা আসবে লাইব্রেরী ঘরে। কিন্তু সে কিছুতেই ন'টার আগে ও ঘরে যাবে না। মনে তার প্রেমের আগুন জ্বলছে, কিন্তু মস্তিষ্ক তাকে করছে দমন। বার বার তার মনে একটা কথাই গুঞ্জন করতে লাগল; ওর মনে একটা সন্দেহ সব সময় জাগরুক রাখ, সে কি ভালবাসে আমাকে? তার বংশ-গরিমা এবং তার চারপাশে যে সব স্তাবকরা রয়েছে তারা সব সময় তাকে আত্ম-সচেতন করে রেখেছে।

সোফার উপর শান্ত আর বিবর্ণ মুখে নিথরভাবে বসে ছিল ম্যাথিলডা। জুলিয়ানের হাত ধরে সে বলল—'ওগো তোমার মনে আমি সত্যিই আঘাত

দিয়েছি। বোধ হয় তুমি আমার উপর রাগ করেছ?'

এমন সরল কণ্ঠস্বর শুনবে ভাবে নি জুলিয়ান। সে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে আবার বলতে লাগল—'ওগো, তুমি আশ্বাস চেয়েছিলে, হাঁ তোমার সে অধিকার আছে। আমাকে নিয়ে পালাও, চল লণ্ডনে। চিরদিনের জন্যে আমার সর্বনাশ ঘটবে, দুর্ণাম রটবে···' জুলিয়ানের হাত থেকে হাত টেনে নিয়ে সে মুখ ঢাকল। তার মনে নারীর নম্রতা ও ধর্মবোধ ফিরে এল।···তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'বেশ আমার অসম্মানই করো। তোমাকে দিলাম আশ্বাস।'

জুলিয়ান ভাবে, গতকাল আমি সুখী ছিলাম কারণ নিজের উপর কঠিন হওয়ার মত সাহস আমার ছিল। অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে নিজেকে দমন করল। তারপর বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল—'একবার তোমাকে নিয়ে লণ্ডনে পালালে, তোমার নামে একবার দুর্ণাম রটলে, তোমার ভাষায় বলছি তুমি যে আমায় আর ভালবাসবে তা' কে বলতে পারে? আমার অস্তিত্ব কি তোমার কাছে অনভিপ্রেত হবে না? হৃদয়হীন একটা জানোয়ার নই আমি। তোমার নামে দুর্ণাম রটলে তা' ত আমার কাছে নতুন করে একটা দুঃখের কারণ হবে। সমাজে তোমার স্থান আমার কাছে বাধা নয়, বাধা তোমার চরিত্র। নিজের কাছে তুমি কি শপথ করতে পার যে, অন্ততঃ সাতদিন ধরে তুমি আমাকে ভালবাসবে?'

মনে মনে বলতে লাগল জুলিয়ান—আহা! সাতদিন ও আমাকে ভালবাসুক, অন্ততঃ সাতদিন! আর তাহলে আনন্দে আমি মরে যাব। ভবিষ্যতের কথা কি ভাবি আমি? ভাবি কি জীবনের জন্য? আমি চাইলে এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনে স্বর্গীয় আনন্দ শুরু হতে পারে এবং তা' নির্ভর করছে আমারই উপর।

ম্যাথিলডা দেখল, গভীর চিন্তামগ্ন জুলিয়ান।

আবার তার হাত ধরে বলল ম্যাথিলডা—'তাহলে তুমি বলছ, আমি তোমার একেবারে অনুপযুক্ত?'

জুলিয়ান তাকে আলিঙ্গনে বাঁধল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কঠিন হাত তার হৃদয় পিষ্ট করল। ওকে আমি কতটা ভালবাসি তা' বুঝতে পারলেই ওকে আমি হারাব। তাই অত্যন্ত ভদ্রভাবে সে ওকে আলিঙ্গনমুক্ত করে উঠে দাঁড়াল।

সেদিন ম্যাথিলডার সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছিল জুলিয়ান।

এই সেই মল্লিকা ফুলের ঝাড়। এখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্যাথিলডাকে ক্ষণিক দেখবার আশায় তার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকত জুলিয়ান। আর ওই ত কাছেই বিশাল ওক গাছটা···আর যারা সেদিন তার উপর নজর

রেখেছিল তারা ওক গাছের কাণ্ডের আড়ালে তাকে দেখতে পেত না। জায়গাটা তাকে সে সব কথা স্মরণ করিয়ে দিল। বলল জুলিয়ান—'জান, এখানে দাঁড়িয়ে তোমার কথা কতদিন ভেবেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখান থেকে তোমার জানালার দিকে তাকিয়ে থেকেছি তোমাকে দেখব বলে। তোমার এই হাত জানালা খুলবে আর আমার হৃদয় আনন্দে ভরে যাবে।'

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল জুলিয়ান।

সহসা তার মতি যেন ফিরে এল, সম্বিৎ ফিরে পেল জুলিয়ান। ভাবল, এ কি করছি আমি? সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি? ম্যাথিলডার দৃষ্টি থেকে ভালবাসা এর মধ্যে উবে যাচ্ছে। এ তার ভ্রান্তি···তবু জুলিয়ানের মনের ভাব সহসা একদম বদলে গেল। মুখমণ্ডল হল মৃতের মত পাণ্ডুর, দৃষ্টির দীপ্তি গেল নিভে, সেখান জমা হল উদ্ধত নিষ্ঠুর অসৎ উদ্দেশ্যের একটা ইচ্ছা···মুছে গেল আন্তরিক ভালবাসার কামনাটুকু।

ম্যাথিলডা ব্যগ্র হয়ে কোমল কণ্ঠে জানতে চাইল—'ওগো, কি হয়েছে তোমার?'

রুক্ষকণ্ঠে বলল জুলিয়ান—'মিথ্যা বলেছি, তোমাকে মিথ্যা বলেছি। ঈশ্বর জানেন, তার জন্য আমি অনুশোচনা করেছি, তোমার কাছে আমার মিথ্যা বলা উচিৎ হয় নি। তুমি আমাকে ভালবাস, আমার প্রতি তুমি অনুরক্তা। তোমাকে খুশি করার জন্য আমার বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।'

—'হায় ঈশ্বর! ওগুলো কি কেবল তোমার মিষ্টি কথাই ছিল? এই দশ মিনিট ধরে কি কেবল তুমি আমাকে মোহিত করার জন্যই বলছিলে?'

—'ওগো, এসবের জন্য আমি দুঃখিত। যে নারী আমাকে ভালবাসত তাকেই এসব বলতাম। সে এসব সহ্য করতো···আমার চরিত্রে এটাই খারাপ দিক। নিজেকে এর জন্য দোষ দিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো।'

ম্যাথিলডার গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল।

সরলকণ্ঠে ম্যাথিলডা বলল—'অজান্তে আমি এমন কিছুর সঙ্গে কি ঠোক্কর খেয়েছি যাতে তুমি ক্ষুব্ধ?'

—'মনে পড়ছে, একদিন একটা মল্লিকা ফুল তুলে মঁসিয়ে লুজকে দিয়েছিলে, সে সেটা রেখে দিয়েছিল। তোমাদের কাছ থেকে একটু দূরে ছিলাম আমি।'

ম্যাথিলডা স্বাভাবিক উগ্র কণ্ঠে বলল—'মঁসিয়ে লুজ? কিন্তু তা' ত অসম্ভব। ও কাজ আমি করতেই পারি না।'

জোর দিয়ে বলল জুলিয়ান—'আমি নিশ্চিত, তুমি দিয়েছিলে।'

—'ওগো, তা' হতে পারে।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে দৃষ্টি নত করল ম্যাথিলডা।

আর জুলিয়ান কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। না, সে অপরের চেয়ে আমাকে কম ভালবাসে না।

সেদিন সন্ধ্যায় মাদাম ফারবাকের দিকে মন দেওয়ার জন্য ম্যাথিলডা হেসে

ভর্ৎসনা করল জুলিয়ানকে···একজন সাধারণ লোক প্রেমে পড়েছে এক নতুন অভিজাত মহিলার! জুলিয়ানের চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলল ম্যাথিলডা—'অমন একটা হৃদয়ে আমার জুলিয়ান বোধ হয় কখনো প্রেমের আগুন জ্বালাতে পারবে না। সে তোমাকে একটি পোশাকি বাবু করতো।'

যে সময়টা ম্যাথিলডার ঘৃণা জুটেছিল জুলিয়ানের কপালে সে সময়টায় পোশাকে-আশাকে জুলিয়ান প্যারিসের সেরা ফুলবাবু হয়ে উঠেছিল। তবু এ ধরনের ফুলবাবুদের তুলনায় তার একটা বেশী সুবিধা ছিল। একবার পোশাক পরা হয়ে গেলে আর পোশাকের দিকে তাকাতো না জুলিয়ান।

একটা ব্যাপার তখন বিরক্ত করছিল ম্যাথিলডাকে···জুলিয়ান তখনও রাশিয়ান যুবকের চিঠিগুলোর অনুলিপি বানিয়ে মাদাম দ্য ফারবাককে পাঠাচ্ছিল।

৩২ : বাঘ

হায়! কেন এগুলো এবং নয় অপরগুলো!
—ব'মারশেই

একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী লিখেছেন, কেমন করে এক বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তিনি বাস করতেন—তিনি তাকে লালন-পালন করতেন, আদর করতেন কিন্তু সব সময় টেবিলের উপর রেখে দিতেন একটা গুলিভরা পিস্তল।

ম্যাথিলডা যখন তার চোখে কোন কামাবেগের স্পর্শ দেখতে পায় না তখনই জুলিয়ান অপার আনন্দ অনুভব করতে ভোলে না। শুধু মাঝে মাঝে সে তাকে দু'একটা কঠিন কথা বলার কর্তব্য করে। যখন ম্যাথিলডার শান্তভাব তার মন থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব লোপ করে দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয় তখনই বিস্মিত হয় জুলিয়ান, তার কাছে ধরা দেওয়ার জন্য লালায়িত হয় তার বিস্মিত মন··· সেই মুহূর্তে ঝটিতি সে ম্যাথিলডাকে ছেড়ে চলে যায়।

আর ম্যাথিলডা এই প্রথম প্রেমে পড়েছে। তার যে জীবন এতদিন শম্বুক গতিতে ছিল বিচরণশীল, তা' এখন ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে। তার মনের অহমিকা-ভাব সব সময় বহিঃপ্রকাশের একটা পথ খোঁজে, অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নিয়ে সে তার প্রেম প্রকাশ করে। আর জুলিয়ান কিন্তু এ দিক দিয়ে খুবই সাবধানী এবং যখন বিপদের কোনও ঝুঁকি থাকে না তখনই সে নিজের লালসার কাছে ধরা দেয়। তবু তার কাছে বশ্যতা এবং নম্রতা স্বীকার করলেও ম্যাথিলডা বাড়ীর অপর কেউ তার কাছাকাছি এলে তার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করে···তা' সে আত্মীয়ই হোক বা কোন পরিচারক-পরিচারিকাই হোক।

সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে জন চল্লিশেক নর-নারী হাজির থাকে। ম্যাথিলডা

সকলের সামনে জুলিয়ানকে তার পাশে ডেকে বসিয়ে গল্প করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে সঙ্গোপনে কথা বলে।

একদিন তানবো ছোকরা তাদের পাশে বসেছিল। ম্যাথিলডা তাকে বলল লাইব্রেরী ঘর থেকে স্মলেটের লেখা বিপ্লবের ইতিহাসখানা তার জন্য আনতে। এখান থেকে চলে যেতে দ্বিধা করছিল তানবো। সে সোজা তার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধমক দিল—'যাও, তাড়াতাড়ি আনবার দরকার নেই।' তার এই আচরণ জুলিয়ানের অন্তরে শান্তির মলম লেপন করল যেন।

জুলিয়ান বলল তাকে—'ক্ষুদে অসভ্যটার ভাব দেখলে ?'

—'ওর কাকা এই বসবার ঘরে আজ দশ-বারো বছর ধরে যাতায়াত করছে, নইলে আমি আজ এখনি ওকে তাড়িয়ে দিতাম।'

মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়, লুজ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ম্যাথিলডা প্রকাশ্যে ভদ্র ব্যবহার করলেও বাস্তবে সে তাদের সঙ্গে নিস্পৃহ আচরণ করে। অতীতে জুলিয়ানের উপর যে বিশ্বাস অর্পণ করেছিল আজ তার জন্য ম্যাথিলডা অনুশোচনা করে···কারণ সে স্বীকার করতে সাহস করে না যে, এই সব অভিজাত যুবকদের সঙ্গে সে মাত্রাতিরিক্ত যে ঘনিষ্ঠতা রচনা করেছিল তা' সম্পূর্ণ নির্দোষ আগ্রহের চিহ্ন-সম্বলিত।

প্রতিদিনই নিজের মনের কথা জুলিয়ানের কাছে বলবার জন্য তৈরী হলেও তার নারী-মনের অহমিকা তাতে বাদ সাধছে। বলতে চাইছে: 'ওগো দেখ, আমি তোমার সাথে কথা বলছি যখন তখন শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর আমার হাতের পাশে হাত রেখে একটু স্পর্শ কামনা করে, আমি হাত সরিয়ে নিতে পারি না এটা আমার দুর্বলতা।'

আজকাল এই সব অভিজাত যুবকরা দু'একটা মুহূর্ত তার সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই ম্যাথিলডার মনে পড়ে যায় জুলিয়ানকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, অমনি ওই ছুতোয় সে তার কাছ থেকে সরে যায়।

ম্যাথিলডা বুঝতে পেরেছে যে সে অন্তঃসত্বা। আনন্দে সে খবরটা শোনায় জুলিয়ানকে।

—'এখনও কি তুমি আমাকে সন্দেহ করছো ? এটাই কি আশ্বাস ? ওগো, এখন আমি তোমার চিরদিনের স্ত্রী।'

খবরটা শুনে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল জুলিয়ান। সে তার চরিত্র নির্ধারক নিয়মকানুনের কথা প্রায় ভুলেই গেল। কি করে এই হতভাগিনী কন্যা যে আমার জন্যে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, তার প্রতি স্বেচ্ছায় কাম-শীতল হয়ে তাকে অপমান করব ? ওকে কি অসুস্থ দেখাচ্ছে ? তাই এই বিস্ময়কর খবরটা শোনবার পর জুলিয়ান তার প্রেম-প্রবাহ অটুট রাখার জন্য ওকে আর কোন নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে না।

একদিন ম্যাথিলডা বলল—'ওগো, বাবাকে আমি সব কথা লিখব। উনি ত

কেবল আমার বাবা নন…আমার বন্ধুও। মুহূর্তের জন্যও যদি আমি তাঁকে ঠকাই তবে মনে হয় তোমার আর আমার দিক দিয়ে সেটা অন্যায় করা হবে।'

জুলিয়ান ভয় পেয়ে বলে উঠল—'হায় ঈশ্বর! এ কি করতে চাইছ?'

জবাব দিল ম্যাথিলডা—'এটা আমার কর্তব্য!' খুশিতে তার দু'চোখ জ্বলছে যেন। তার মনে হচ্ছে যে, তার প্রেমিকের চেয়ে সে বেশী সাহস দেখাচ্ছে।

—'কিন্তু তিনি অপমান করে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন!'

—'তাঁর সে অধিকার আছে, তবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব। আমার হাত বাড়িয়ে দেব, তুমি পরিষ্কার দিনের আলোয় সদর দরজা দিয়ে আমার হাত ধরে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে।'

অবাক হল জুলিয়ান। তাকে অনুরোধ করল এক সপ্তাহ পরে তার সিদ্ধান্ত মত কাজ করতে। কিন্তু ম্যাথিলডা জবাব দিল—'ওগো, তা পারব না। সম্মানের ডাক এসেছে আমার কর্তব্য আমি জানি। এ কাজ আমি করবই এবং এখনি।'

এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলল জুলিয়ান—'বেশ! তোমাকে হুকুম করছি, অপেক্ষা করতেই হবে। আমি তোমার স্বামী, তোমার সম্মান অটুট রাখতে চাই। এই সঙ্গীন পদক্ষেপে আমাদের দুজনের অবস্থাই যাবে বদলে। আমারও ত অধিকার আছে। আজ মঙ্গলবার: এর পরের মঙ্গলবার ডুচে দ্য রেজের সম্বর্ধনা। সন্ধ্যায় মারকুইস যখন বাড়ী ফিরবেন তখন তাঁর খানসামা মারাত্মক চিঠিখানা হাতে তুলে দেবে…তাঁর একমাত্র আশা তোমাকে কোন ডিউকের পত্নী হিসাবে দেখতে চান। ভালভাবেই আমি তা' জানি। এবার বোঝ তাঁর কত দুঃখ হবে!'

—'বলছ তাঁর প্রতিহিংসার কথা ভাবব?'

—'আমার মঙ্গলকামীর জন্য গভীর সমবেদনা অনুভব করছি, তাঁকে আঘাত দেওয়ার জন্য আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু আমি ভীত নই, কাউকে ভয় পাই না।'

ম্যাথিলডা রাজী হল। জুলিয়ানকে তার অবস্থা বলার পর এই প্রথম সে ম্যাথিলডার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করল। এমন গভীরভাবে সে আর কখনও তাকে ভালও বসে নি। ম্যাথিলডার উপর করুণায় তার মন ভরে গেল, তার স্বভাবই এমন কোমল তাই ম্যাথিলডাকে মাঝে মাঝে যে সব কঠিন কথা বলেছে তার জন্যে তার মন আজ ক্ষমা চাইতে উন্মুখ। মারকুইসের কাছে সব কিছু স্বীকার করতে হবে তাই সে উদ্বিগ্ন। তাহলে কি ম্যাথিলডাকে ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে? তাকে চলে যেতে দেখলে ম্যাথিলডার নিশ্চয় খুবই দুঃখ হবে, কিন্তু একমাত্র চলে গেলেই কি সে তখনও ম্যাথিলডার কথা ভাববে? ম্যাথিলডা তাকে যেভাবে ধিক্কার জানাবে তা' ভাবতেও ভয় হয় জুলিয়ানের।

সেই সন্ধ্যাতেই জুলিয়ান তার দুঃখের কথা বলল ম্যাথিলডাকে।

বিবর্ণ হল ম্যাথিলডা। বলল—'আমার কাছ থেকে মাস ছয়েক দূরে থাকতে হলে কি তুমি দারুণ দুঃখ পাবে?'

—'দারুণ দুঃখ পাব, এবং জগতে এটাই আমার সবচেয়ে বড় ভয়।'

আনন্দে আত্মহারা হল ম্যাথিলডা।

এমন সুন্দরভাবে জুলিয়ান তার অভিনয় করল যে, ম্যাথিলডা ভাবছিল তাদের দু'জনের মধ্যে সে নিজে সবচেয়ে বেশী প্রেমে পড়েছে।

সেই মারাত্মক মঙ্গলবার এল। মাঝরাতে বাড়ী ফিরলেন মারকুইস। দেখলেন, তাঁর টেবিলে একখানা চিঠি। বলা হয়েছে, তিনি নিজে চিঠি খুলে পড়বেন, কেউ যেন সাক্ষী না থাকে।

বাবা,

আমাদের মধ্যে সব সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, রয়েছে শুধু স্বাভাবিক বন্ধন। আমার স্বামী ছাড়া এ জগতে একমাত্র তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছি তার জন্যে কান্নায় আমার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, কিন্তু আমার এই লজ্জার কথা ত সবাইকে বলতে পারি না, এবং তোমাকেও আমি এ নিয়ে ভাববার ও কাজ করবার সময় দিতে চাই। তোমাকে সবকিছু বলার এই কর্তব্য-কাজ পিছিয়ে রাখতে পারি না। তোমার কাছে যে আমি ঋণী। আমার প্রতি যদি তোমার স্নেহ বিশাল হয় তবে তুমি আমাকে সামান্য কিছু বৃত্তি দেবে, তুমি যেখানে বলবে আমি আমার স্বামীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বাস করব, ধর সুইজারল্যাণ্ডে। এত নগণ্য আর অপরিচিত মানুষ সে যে কেউ তোমার মেয়েকে মাদাম সোরেল বলে চিনতে পারবে না, পারবে না চিনতে ভেরিয়ার শহরের এক ছুতোরের ছেলের বউ হিসাবে, এই নামটা লিখতে আমার ভয় হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, …কেননা জুলিয়ান নামটা তোমার মনে দারুণ বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে। বাবা, আমি আর কোনদিন ডিউক-পত্নী হব না, যখন ওকে ভালবাসি তখন তা' আমার জানাই ছিল। আমিই প্রথম প্রেমে পড়ি এবং আমিই তাকে প্রলুব্ধ করেছি। তোমার আদর্শ দেখেই আমি যা' খারাপ তাকে ঘৃণা করতে শিখেছি। এখন আর বলে কোন ফল নেই যে, তোমাকে খুশি করার জন্যই আমি মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়কে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কেন তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এক প্রতিভাধরকে হাজির করেছিলে? হায়ারেস শহর থেকে ফিরে এলে তুমিই বলেছিলে—'এই সোরেল যুবক এমন এক মানুষ যাকে দেখলে আনন্দ হয়।' তোমাকে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে বলে ওই হতভাগ্য যুবক আমারই মত কষ্ট পাচ্ছে, তুমি রাগ করলেও আমি তোমাকে বাবা বলে বাধা দিতে পারি না…তবে আমাকে তুমি

বন্ধুর মত ভালবেসো।

জুলিয়ান আমাকে শ্রদ্ধা করে, মাঝে মাঝে সে আমাকে ধমক দেয়, কিন্তু তা' করে তোমার মুখ চেয়ে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য। তার মনের স্বাভাবিক গর্ববোধের জন্য একমাত্র কাজের ব্যাপারে তার উপরওয়ালা ছাড়া আর কারও কাছে সে জবাব দেয় না কখনও। সামাজিক পদ-বিন্যাসের পার্থক্য সম্পর্কে তার মনে তীক্ষ্ণ ও আন্তরিক সচেতনতা আছে। আমার প্রিয় বন্ধুর কাছে স্বীকার করতে আমি লজ্জায় রাঙা হচ্ছি যে, আমিই বাগানে একদিন তার বাহু সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেন তুমি তার উপর বিরক্ত হবে? আমার দোষ অপূরণীয়। তুমি যদি চাও ত এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য সে হতাশাগ্রস্ত। তাকে তোমার দেখবার প্রয়োজন নেই তবে সে যেখানে যেতে চাইবে আমি তার সঙ্গে সেখানে চলে যাব। এটা তার অধিকার, এটা আমার কর্তব্য·· সে আমার সন্তানের জনক। তুমি যদি দয়া করে খুশি হও এবং বেঁচে থাকার জন্য আমাদের ছ'হাজার ফ্রাঙ্ক দাও তবে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করবো। যদি না দাও জুলিয়ান চাইছে সে বেসানকনে থাকবে, সেখানে ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবে। যা হোক, সামান্য পদ থেকে জীবন সুরু করলেও আমি নিশ্চিত যে সে- একদিন আরও বড় পদ লাভ করবে। তার সঙ্গে থাকায় আমার প্রচ্ছন্নতার ভয় নেই। যদি বিপ্লব ঘটে আমি তার জীবনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবো। যারা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি তুমি এমন কথা বলতে পার? তাদের কি সুন্দর জমিদারি আছে? এমন একটাও কারণ ঘটে নি যার জন্য আমি তাদের প্রশংসা করতে পারি। এই সরকারের শাসনকালেও আমার জুলিয়ান উচ্চপদ লাভ করবে যদি আমার বাবা তাকে রক্ষা করে এবং তার দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক থাকে···।

ম্যাথিলডা জানে তার বাবা রাগের মাথায় কাজ করেন তাই সে আট পৃষ্ঠার চিঠিতে সব কথা খুলে লিখল।

মারকুইস যখন চিঠি পড়ছিলেন তখন জুলিয়ান ভাবছিল, কি করব আমি? প্রথমত এখন আমার কর্তব্য কি এবং আমার স্বার্থই বা কি? ওঁর কাছে আমি ভয়ঙ্করভাবে ঋণী। কিন্তু তার জন্য ত আমি একটা বদমাশে পরিণত হতে পারি না এবং আমার বদমায়েশির জন্য সবাই আমাকে ঘৃণা করবে তাও চাই না। উনি আমাকে তাঁর সংসারে মানুষ করেছেন। তাঁরই জন্য আমি

নষ্ট হয়ে যাই নি, হই নি নীচ-জঘন্য। উনি দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিলেও আমার সে উপকার হত না। উনি আমাকে এই ক্রস চিহ্ন পাইয়ে দিয়েছেন, দিয়েছেন কূটনৈতিক কাজ করার সম্মান। তিনি এখন আমার কর্তব্য লিখে জানাতে পারেন কিন্তু কি লিখবেন তিনি··?

সহসা মারকুইসের বুড়ো খানসামা ঘরে ঢুকতে জুলিয়ানের চিন্তায় বাধা পড়ল।

—'মারকুইস এখনি আপনাকে যেতে বললেন, তা' পোশাক ছাড়া আপনার হোক বা না হোক।' জুলিয়ানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে খানসামা আবার বলল ফিসফিস করে—'মহামান্য মারকুইস খুব রেগে আছেন। আপনার সতর্ক থাকা ভাল।'

৩৩ : অস্থির মনের নরক

অদক্ষ হীরক ছেদনকারীর দ্বারা ছেদিত এই হীরকখণ্ড তার সুন্দর দীপ্তির কিছুটা হারিয়েছে। মধ্যযুগে, না, এমন কি রিচেলুর যুগেও ফরাসীদের মনের জোর ছিল।

—মিরাবো

মারকুইসকে দারুণ ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখল জুলিয়ান। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এই অভিজাত জমিদার বদ-মেজাজী হলেন। তাঁর মুখে যত রকম অপমানকর কথা এল তা' জুলিয়ানের উপর বর্ষণ করতে লাগলেন। এই হতভাগ্য যুবকের মনে যত রকম ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনা দেখা দিয়েছিল তা' মুহূর্ত মধ্যে কেমনভাবে কুঁকড়ে গেল। কিন্তু মারকুইসের কথার একটা জবাব দিতে আমি বাধ্য, কেননা আমার নীরবতা তাঁর মনের রাগ আরও বাড়িয়ে দেবে।

—'আমি দেবদূত নই···সেবা করেছি ভালভাবে,' আপনিও আমাকে হাত খুলে দিয়েছেন···আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার বয়স মাত্র বাইশ। এ বাড়ীতে আপনি আর ওই ভালবাসার যোগ্য জীবটি ছাড়া আমার মনের কথা বুঝতে আর কেউ চায় নি।'

মারকুইস চেঁচিয়ে উঠলেন—'হতভাগা কোথাকার! ভালবাসার যোগ্য! ভালবাসার যোগ্য! তাকে যখন ভালবাসার যোগ্য মনে হয়েছিল তখন এ বাড়ী ছেড়ে তোমার পালানো উচিৎ ছিল।'

—'চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম আমাকে ফরাসী নিম্নভূমির জমিদারী দেখতে যেতে দিন।'

দারুণ রাগে মারকুইস পায়চারি করছিলেন। দুঃখে তাঁর মন ভরে উঠল।

একখানা আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লেন। জুলিয়ান তাঁকে ধীরে ধীরে বলতে শুনল:' 'ছোকরা আসলে একটা বদমাশ নয়।'

তাঁর পায়ের সামনে বসে পড়ে জুলিয়ান বলে উঠল—'না, আপনার সঙ্গে সে ব্যবহার করব না।'

কিন্তু এই রকম আকস্মিকভাবে অতিরিক্ত ভাবাবেগ দেখিয়ে লজ্জিত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

এবারে মারকুইস নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। ওকে এ ধরনের কাজ করতে দেখে তিনি আবার তাকে ভীষণ ধমকাতে লাগলেন। জুলিয়ান যেন ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। তাঁর মনের এই বিক্ষোভ একেবারে অভিনব।

কি! আমার মেয়েকে সবাই ডাকবে মাদাম সোরেল নামে! কি! আমার মেয়ে ডিউক-পত্নী হবে না! এই দু'টো চিন্তা মাঝে মাঝে তাঁর মনটাকে এমন খোঁচা দিচ্ছিল যে, মারকুইসের ভিতরটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তিনি তাঁর মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। জুলিয়ানের মনে হচ্ছিল তিনি হয় ত মারধোর করতে পারেন।

এই ধমকানিতে এক সময় ছেদ পড়লো। নিজের দুর্ভাগ্য যেন অনেকটা তাঁর কাছে সহনীয় হয়ে উঠল। জুলিয়ানকে তিনি যে সব গালি দিচ্ছিলেন তার মধ্যে যুক্তির স্পর্শ লাগল।

তিনি বললেন—'তোমার পালানো উচিৎ ছিল···চলে যাওয়াই ছিল তোমার কর্তব্য···কেননা তুমি সমাজের একদম নীচুস্তরের মানুষ··· ।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে জুলিয়ান লিখল:

'বহুদিন ধরে আমার জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, সেই জীবন আমি শেষ করে ফেলছি। তাঁর বাড়ীতে আমার মৃত্যুর জন্য যদি তাঁকে গভীর লজ্জায় পড়তে হয় তবে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আমি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

জুলিয়ান বলল—'মহামান্য মহাশয়, এই চিঠি পড়ার পর আপনি আমায় খুন করুন···অথবা আপনার খানসামাকে দিয়ে আমায় খুন করান। এখন রাত একটা। আমি বাগানের মধ্যে ওই কোণে গিয়ে পায়চারি করছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মারকুইস চেঁচিয়ে বললেন—'তুমি উচ্ছন্নে যাও!'

ভাবল জুলিয়ান, বুঝতে পেরেছি! তাঁর খানসামাকে দিয়ে আমাকে খুন করিয়ে তিনি একেবারেই দুঃখিত হবেন না। বেশ ত, তিনি আমাকে খুন করুন। তাঁকে আমি এই আনন্দটুকু দান করছি···কিন্তু হায় ঈশ্বর! জীবনকে যে বড় ভালবেসেছি। আমার সন্তানের কাছে যে আমি ঋণী··· ।

এই চিন্তা তার মন থেকে ভাবাবেগ দূর করল। এই ভয়ঙ্কর রাগী লোকটার সঙ্গে লড়তে হলে আমায় কারো সাথে পরামর্শ করতে হবে। সে নিজের মনে

কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। এ সময় ফৌকের কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু সে বড় দূরে থাকে।

কাউণ্ট আলটামিরা?···কিন্তু সে যদি নীরব থাকে? তাহলে যাওয়া যায় ফাদার পিরার্দের কাছে।···কিন্তু তিনি জানসেনপন্থী···আমার অপরাধের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মারতে সুরু করবেন।

অবশেষে সে ঠিক করল: বেশ, তাই হবে। আমি ফাদার পিরার্দের কাছেই যাব। তাঁর কাছে গিয়ে সব স্বীকার করব।

পরের দিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ল জুলিয়ান। প্যারিস থেকে কয়েক লিগ দূরে থাকেন ফাদার পিরার্দ। কড়া মতের জানসেনপন্থীর বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

সব শুনে রাগের চেয়ে বেশী অসোয়াস্তিতে পড়লেন ফাদার। বললেন—'দেখ, এর জন্যে আমিও খানিকটা দায়ী। তোমার এই প্রেমের ব্যাপার আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। বদমাশ কোথাকার, তোমার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বলেই মেয়েটার বাপকে সাবধান করে দিই নি···।'

জুলিয়ান সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—'কি করবেন আপনি?'

এই মুহূর্তে ফাদার পিরার্দের স্নেহ বুঝল জুলিয়ান, তাঁর সঙ্গে বিবাদ করা তার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হবে।

তাই চিঠি লিখে আসার কথা স্বীকার করে সে আবার বলল—'মারকুইস তিন রকমে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি নিজে হাতে আমাকে খুন করতে পারেন। অথবা কাউণ্ট নববারটকে বলতে পারেন আমাকে গুলি করে মারতে, সে তখন আমাকে ডুয়েল লড়তে আহ্বান করবে।'

দারুণ রাগে উঠে দাঁড়িয়ে ফাদার বললেন—'তুমি কি রাজী হবে?'

—'আমাকে সব বলতে দিন। এটা নিশ্চিত যে, আমি আমার কল্যাণকামীর ছেলের বুকে গুলি করতে পারব না। কিংবা তিনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। বলবেন, যাও এডিনবার্গ কি নিউইয়র্ক। তাঁর আদেশ আমি মেনে নেব। তারপর ওঁরা ম্যাথিলডার অবস্থার কথা গোপন রাখবেন। তবে আমার সন্তানকে ওঁরা খতম করবেন তা' হতে দেব না।'

—'তোমার সন্দেহ করার দরকার নেই। ওই নোঙরা লোকটা প্রথমেই ওই কাজ করবে।'

এদিকে প্যারিসে ম্যাথিলডা হতাশায় ভেঙে পড়ল। সকাল সাতটার সময় সে বাবার সঙ্গে দেখা করল। মারকুইস তাকে জুলিয়ানের চিঠি দেখালেন। এমনিভাবে মহান মৃত্যুকে সে বরণ করতে চেয়েছে দেখে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। দুঃখ থেকে রাগ জন্মাল তার মনে। সে আমার কাছে একটা অনুমতি পর্যন্ত নিল না!

বাবাকে বলল ম্যাথিলডা—'মনে রেখ, ওর মৃত্যু হলে আমিও মরব···এবং তার মৃত্যুর জন্য তুমিই হবে দায়ী···তুমি হয়ত খুশি হবে···। কিন্তু আমি শোকের পোশাক পরে সকলকে জানাব যে, আমি তার বিধবা···মাদাম সোরেল। সকলকে শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠাব···তুমি মনে করো না যে, আমি ভয় পাব কিংবা চেতনা হারাব।'

না, ভালবাসায় দেখছি মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে। মারকুইস নির্বাক হলেন। সমস্ত ঘটনার মধ্যে তিনি একটা যুক্তি খুঁজতে লাগলেন। খাওয়ার টেবিলে হাজির হল না ম্যাথিলডা। মারকুইসের মনে হল, তাঁর বুকের উপর থেকে একটা ভার নামল। সে তার মাকে কিছু বলে নি শুনে খুব খুশি হলেন।

মধ্যাহ্নে বাড়ি ফিরে এল জুলিয়ান।

তাকে ডেকে পাঠাল ম্যাথিলডা এবং পরিচারিকার সামনেই তার আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার এই স-কাম আচরণে খুব খুশি হল না জুলিয়ান। সে ফাদার পিরার্দের সঙ্গে গভীর পরামর্শ করে একটা নির্দিষ্ট মতলব নিয়ে ফিরে এসেছে। এই মতলবের সম্ভাবনার চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন।

ম্যাথিলডার দু'চোখে অশ্রু। বলল যে, সে তার আত্ম-হননের ইচ্ছা প্রকাশ করে লেখা চিঠি পড়েছে।

—'তুমি এখনি ভিলিকোয়ারে চলে যাও, বাবার হয় ত মন বদলাতে পারে। ওরা টেবিল ছেড়ে উঠবার আগে তুমি ঘোড়ায় চড়ে পালাও।'

জুলিয়ানের বিস্মিত মনের ভাব এতটুকু বদলাল না।

ম্যাথিলডা কাঁদতে কাঁদতে বলল—'ওগো, আমাদের ব্যাপারটা আমাদের মেটাতে দাও। ভালভাবেই ত জান, নিজের খুশিতে তোমায় আমি ছাড়তে পারব না। আমার পরিচারিকার নাম লেখা খামে তুমি আমাকে চিঠি পাঠাবে। আর আমি তোমাকে অজস্র চিঠি লিখব। যাও, এবার চলে যাও।'

শেষ কথাগুলো শুনে দুঃখিত হল জুলিয়ান। তবে ওর অনুরোধ রাখল। ভাবল, এটাই তার ভাগ্য! অত্যন্ত সুদিনেও এই লোকগুলো তাকে আঘাত হানতে চেষ্টা করেছে।

তার বাবার সব রকম পরিণামদর্শী মতলবের বিরুদ্ধে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অবাধ্যের মত আর কোন সর্তে রাজী হল না। তার সর্ত হচ্ছে: সে মাদাম সোরেল হিসাবে দারিদ্র্যের মধ্যে তার স্বামীর সঙ্গে থাকবে সুইজারল্যাণ্ডে অথবা তার বাবার সঙ্গে প্যারিসে। গোপনে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রস্তাব মানতে সে রাজী হল না···এর ফলে তার নামে দুর্নাম রটবে, অপমানের বোঝা বাড়বে। বিয়ের দু' মাস পরে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বেড়াতে যাব। তাহলে তখন বলা সহজ হবে যে, তার সন্তান ঠিক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই সব সর্ত শুনে মারকুইস দারুণ রেগে গেলেন প্রথমটায়···তারপর শান্ত হলেন।

এক কোমল ক্ষণে মারকুইস বললেন—'দেখ, বছরে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক আয়ের শেয়ার সারটিফিকেট দিচ্ছি। তোমার জুলিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেখবে। দেখবে বছর ফুরোবার আগেই ও সব নষ্ট করে ফেলবে।'

ম্যাথিলডার আদেশ মাথায় পেতে নিয়ে জুলিয়ান প্যারিস ছেড়ে এল। হাজির হল ভিলিকোয়ারে। চাষীদের হিসাব-পত্র রাখার কাজ নিল। কিন্তু মারকুইসের দান পেয়ে সে ফিরে এল ফাদার পিরার্দের আশ্রয়ে। ম্যাথিলডার বড় বন্ধু এখন ফাদার পিরার্দ।

মারকুইস জানতে চাইলেই ফাদার পিরার্দ বলেন—'জনসমক্ষে বিবাহ ছাড়া আর কোন পথ গ্রহণ করলে তা' ঈশ্বরের চোখে হবে অপরাধ। ধর্মের সঙ্গে মিল রেখেই সংসারের জ্ঞান যে গড়ে উঠেছে এটা ভাগ্যের কথা। ম্যাথিলডার মত এমন দৃঢ়-মন একটি মেয়ের কথা ভাবতে পারেন যে কোন কিছু গোপন রাখতে চায় না? আপনি যদি সোজাসুজি সামাজিক বিবাহের ব্যবস্থা না করেন তবে ওদের এই অদ্ভুত মেলামেশা সম্বন্ধে সমাজে দুর্ণাম রটবে। কোন রকম রহস্য সৃষ্টি না করে সোজাসুজি সত্যকে প্রকাশ করাই ভাল!'

মারকুইস বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন—'কথাটা ঠিক।'

দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবও ফাদার পিরার্দের কথায় সায় দিলেন। ম্যাথিলডার জেদ তাঁদের চোখে বড় হল। কিন্তু এসব সুন্দর সুন্দর যুক্তি সত্ত্বেও, তাঁর কন্যা ডিউক-পত্নী হতে পারবে না কিছুতেই এই অবস্থাটা মারকুইস তাঁর মনকে বোঝাতে পারছেন না। যৌবনে যে-সব চালাকি তাঁর মাথায় খেলত এসময় সে-সবও তাঁর মাথায় এল···প্রয়োজন বুঝলেও আইনের আশ্রয় নিতেও তাঁর মনে ভয়। কেননা তার ফলে তাঁর মতন পদমর্যাদার মানুষের পক্ষে তা' অসম্মানকর হবে। কে ওই মেয়েটা সম্পর্কে এসব আগে থেকে ভেবেছে? এমন হঠকারি স্বভাবের মেয়ে! এমন বুদ্ধিমতী! তাঁর চেয়েও বংশমর্যাদার জন্য বেশী অহঙ্কারী! তাঁর উচিৎ ছিল অনেক আগেই ফ্রান্সের কোনও নামকরা অভিজাত বংশে ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া!

এসব পরিণামদর্শী চিন্তা এখন ত্যাগ করতে হল! সব কিছুকে নস্যাৎ করে দেওয়ারই যুগ এটা! আমরা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছি!

৩৪ঃ এক মেধাবী মানুষ

এক শাসক ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে নিজের মনে বলল : আমি একজন মন্ত্রী, প্রিভি-কাউন্সিলের সভাপতি বা ডিউকের পদ পাব না কেন? এমনিভাবে সংগ্রাম করব···এমনিভাবে নূতন প্রথার প্রবর্তক সকলকে শৃঙ্খলে বন্দী করব।

—দি গ্লোব

দশ বছর ধরে দিবাস্বপ্ন যে আনন্দঘন মানসিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে কোন যুক্তিই তা ধ্বংস করতে সক্ষম হল না। রাগ করা যে অযৌক্তিক তা বুঝলেন মারকুইস, কিন্তু ক্ষমাও করতে পারলেন না। মাঝে মাঝে তিনি ভাবতে থাকেন, ওই জুলিয়ান ছোকরা যদি দুর্ঘটনায় মারা যায়···এমনি নীচ চিন্তায় তাঁর মনে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে···এ এক অলীক কল্পনা, তবু ফাদার পিরার্দের পরামর্শের প্রভাবকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

একটা মাস পার হল।

মারকুইসের এই বৃথা কালক্ষয়ের প্রবণতা জুলিয়ানকে হতভম্ব করে ফেলল। তবে এটাও সে ভাবল যে, কোন নির্দিষ্ট মতলব খুঁজে পাচ্ছেন না মারকুইস।

মাদাম মোল এবং বাড়ীর অন্যান্যদের ধারণা জুলিয়ান জমিদারীর শাসন-ব্যবস্থা দেখতে গেছে···কিন্তু আসলে জুলিয়ান গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ফাদার পিরার্দের বাড়ীতে। সেখানে প্রতিদিনই ম্যাথিলডার সঙ্গে দেখা হয়। অবশ্য প্রতিদিনই সকালে ঘণ্টাখানেক ম্যাথিলডা তার বাবার সঙ্গে কাটায়। তবে কখনও কখনও দিনের পর দিন তারা তাদের এই ব্যাপার নিয়ে কোন কথাই বলে না।

একদিন মারকুইস বললেন—'জানি না ওই ছোকরা কোথায় আছে। তাকে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।'

ম্যাথিলডা চিঠিখানা পড়ল :

> ফরাসী নিম্নভূমিতে আমার জমিদারীর আয় বিশ হাজার ছ'শ ফ্রাঙ্ক, এই আয়ের মধ্যে দশ হাজার ছ'শ ফ্রাঙ্ক পাবে আমার মেয়ে এবং অবশিষ্ট দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাবে মঁসিয়ে জুলিয়ান সোরেল। বলবার প্রয়োজন নেই এই জমিদারী আমি স্বেচ্ছায় দান করছি। আইন ব্যবসায়ীকে বল আলাদা আলাদা দানপত্র লিখে নিয়ে যেন আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করে। এরপর আমাদের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। এরপর আমি আর কি এধরনের কিছু আশা করতে পারি?

অপার আনন্দে উচ্ছল হয়ে ম্যাথিলডা বলল—'ধন্যবাদ। আমরা ওখানে

গিয়েই থাকব।'

এই দানপত্র লাভ করে বিস্মিত হল জুলিয়ান। ও আর এখন সেই নিরুত্তাপ, কঠিন হৃদয়ের মানুষ নয়। শৈশব থেকেই ভাগ্যের এই পরিবর্তন সম্পর্কে সে চিন্তা করত। তার মত হতগরীব একজন মানুষ অভাবিতভাবে এত সম্পদ লাভ করায় উচ্চাশায় মন গেল ভরে। সে বুঝতে পারল যে, সে আর তার স্ত্রী বছরে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আয় করবে।

আর স্বামীর গর্বে ভরপুর ম্যাথিলডার মন। তাদের বিবাহ সম্পন্ন হোক এটাই তার মনের একমাত্র উচ্চাশা। একজন অতি মেধাবী পুরুষের সঙ্গে সে নিজের ভাগ্য গ্রথিত করেছে এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে সারাটা দিন কাটায়। নিজের কথা তার মনে অবলুপ্ত।

দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে দূরে। প্রেমের ভাব বিনিময়ের সামান্য একটু সময় শুধু পায়। কিন্তু মিলনের জন্য তারা অধীর। অবশেষে ম্যাথিলডা চঞ্চলা হয়ে উঠল। একদিন রাগের মাথায় লিখল ঃ

> অভিজাত সমাজের মধ্যমণি মারকুইসের কন্যা হয়েও জুলিয়ানকে স্বামীরূপে বেছে নিয়ে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করেছি। সামাজিক সম্মান এবং নিছক গর্ববোধের কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। আজ দেড় মাস হল আমি আমার স্বামীর কাছ-ছাড়া। আগামী বৃহস্পতিবারের আগে আমি আমার পিতার বাড়ীও ছেড়ে দেব। তোমার দয়ার দান আমাদের ধনী করেছে। ফাদার পিরার্দ ছাড়া আমাদের গোপন কথা কেউ জানে না। তাঁর কাছে আমরা যাব, তিনি আমাদের বিয়ে দেবেন। আর বিবাহোৎসবের ঘণ্টাখানেক পরেই প্যারিস ছেড়ে আমরা আমাদের জমিদারীতে চলে যাব। তুমি না ডাকলে আর প্যারিসে ফিরব না। তবে একটা ভয়, দুর্ণাম রটাবে জানোয়াররা, আর তার ফলে নরবারটের সঙ্গে বিবাদ বাধবে জুলিয়ানের। আমি ওকে সামলাতে পারব না। তাই আমার অনুরোধ, আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের বিবাহসভায় তুমি উপস্থিত থাক। তাহলে সব রকম দুর্ণাম ভোঁতা হয়ে পড়বে, তোমার একমাত্র ছেলে এবং আমার স্বামী দুজনেরই জীবন হবে নিরাপদ।

মেয়ের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে মারকুইস আরও বেশী অসুবিধায় পড়লেন। এবার তাঁকে মনস্থির করতেই হবে। তাঁর স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা এবং বন্ধুদের পরামর্শ কোনও কিছুই তাঁকে পথ বাতলাতে পারল না, আজ বিশেষ করে তাঁর শৈশবের দিনগুলোর কথা, বাইশ বছর বয়সে নির্বাসিত জীবন যাপনের কথা মনে পড়তে লাগল। অনেক তাঁর বিত্ত, অনেক তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি। কিন্তু মনে হচ্ছে এসব তাঁকে ঘিরে রেখেছে, এসবের উপর প্রভুত্ব করার তাঁর ক্ষমতা নেই। মনে একটা প্রমত্ত আশা ছিল যে, তাঁর মেয়ে সমাজে

একটা উচ্চ মর্যাদাকর উপাধি পাবে···কিন্তু আজ তিনি নিরাশার হাতে শিকার। গত দেড় মাস ধরে মারকুইস ভাবছিলেন যে, জুলিয়ানকে তিনি বিত্তশালী করে তুলবেন। তাঁর মেয়ের স্বামী দরিদ্র হবে এ কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তাই দুহাতে তিনি টাকা ছড়াচ্ছেন।

পরের দিন তাঁর মাথায় আর একটা মতলব এল। ভাবলেন, তাঁর এসব অর্থদানের পিছনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে জুলিয়ান। সে হয়ত তার নাম বদলে আমেরিকায় চলে যাবে এবং সেখান থেকে সে ম্যাথিলডাকে লিখে জানাবে যে সে তার কাছে মৃত। মারকুইস এখন মেয়ের চিঠির ফলাফল বুঝতে, বিচার করতে চাইলেন··· ।

এক সময় মারকুইস মেয়ের প্রথম চিঠি পাওয়ার পর জুলিয়ানকে খুন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন চাইছেন তার জন্যে এক চমৎকার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে। তিনি তাকে নিজের একটা জমিদারী দিয়ে দেবেন, তখন সে কি মারকুইসের উপাধি গ্রহণ করতে পারে না? এই যে তাঁর শ্বশুরমশাই একমাত্র ছেলের স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে বলেছিলেন যে, তাঁর উপাধি তিনি নরবারটকে দান করবেন।···

ভাবলেন মারকুইস—এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ব্যবসা করার দিকে জুলিয়ানের খুব ঝোঁক আছে। মনে অফুরন্ত সাহস··। কিন্তু ওর চরিত্রের গভীরে এমন একটা বস্তু আছে যা' মনে শঙ্কা জাগায়। প্রত্যেকের মনেও গভীর ছাপ ফেলে, তাই ওর এই ক্ষমতা মৌলিক। তবে একটা ব্যাপার সূর্যালোকের মত স্পষ্ট: ঘৃণা সে সহ্য করতে পারে না। এবং এই জন্যেই তার উপর কর্তৃত্ব করতে পারছি। বংশমর্যাদার কোন মূল্য দেয় না জুলিয়ান, এটা সত্য কথা। আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোনও সহজাত প্রবৃত্তিও নেই তার মনে·· এটা তার দোষ। তবে একমাত্র আনন্দ ও অর্থের প্রভাবের জন্যই ওই শিক্ষার্থী মনে ধৈর্য হারায়। সে এক ভিন্ন ধরনের মানুষ···কোনও মূল্যেই ঘৃণার সঙ্গে সহবাস করবে না।

মেয়ের চিঠির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন মারকুইস···এবার তাঁকে মনস্থির করতেই হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন: জুলিয়ানের মনে কি নির্লজ্জতা এতই তীব্র যে, সে জানতে পেরেছে আমার আয় বছরে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, আমি আমার মেয়েকে সংসারের আর সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসি, তাই সে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে?

ম্যাথিলডা কিন্তু এর প্রতিবাদ করেছে···না। মাস্টার জুলিয়ান সম্পর্কে আমার মনে এমন ভ্রান্ত ধারণা নেই। তবে কি এটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রেম? কিংবা সমাজে পদমর্যাদা লাভের জন্য এ এক অশ্লীল প্রকাশ? কিন্তু ম্যাথিলডা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন···তাই সে বুঝতে পেরেছিল যে, এমন সন্দেহের সৃষ্টি হলে তার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে যাবে। সে সেজন্যেই

স্বীকার করেছে যে, সেই প্রথম তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল ···।

মারকুইস আলোচনা করার জন্য মেয়ের সামনে দাঁড়াতে সাহস করেন না। তাই চিঠি লিখলেন :

> সাবধান! আর কোনও নতুন করে বোকামি করো না। জুলিয়ান সোরেলের জন্য হুসার-বাহিনীতে একটি লেফটন্যান্টের পদ ব্যবস্থা করে দিলাম। ওর নাম হবে মঁসিয়ে লা চেভালিয়ার জুলিয়ান সোরেল ছ্য লা ভারনেরি। দেখ আমি তার জন্যে কি করছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেয়ো না বা প্রশ্ন করো না। সে যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্ট্রাসবুর্গে যায়, দেখ। তার বাহিনী এখন ওখানে রয়েছে। আমার ব্যাঙ্কের উপর এই চেক পাঠালাম। আর আমার কথা রেখো।

ম্যাথিলডার ভালবাসার এবং আনন্দেব সীমা রইল না। বিজয়িনী হওয়ার সুযোগ লাভ করে সে তথ্খুনি চিঠির জবাব লিখল :

> তুমি তার জন্য যা' করছ এসব খবর জানতে পারলে মঁসিয়ে ভারনেরি এখনি গিয়ে তোমার পায়ে পড়ে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবে। কিন্তু এসব সদাশয়তা দেখাবার সময় আমার বাবা আমার কথাটা ভুলে গেছে। তোমার মেয়ের সম্মান আজ বিপন্ন। একটি সামান্যতম অসম্মান তার জীবনে চিরকালের জন্য কলঙ্ক হয়ে থাকবে। বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার আয়ও সে কলঙ্ক মুছে ফেলতে পারবে না। মঁসিয়ে ছ্য লা ভারনেরিকে আমি এই চাকরিতে যেতে দেব না যদি না তুমি আমায় কথা দাও যে, ভিলিকোয়ারে আগামী মাসে জনসমক্ষে আমাদের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হবে। নইলে এই সময়-সীমার পর মাদাম ছ্য লা সোরেল নামে ছাড়া তোমার মেয়ে আর বাইরে বেরোতে পারবে না। ধন্যবাদ বাবা, তুমি আমাকে সোরেল নামের সাথে যুক্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছ ···।

এই চিঠির জবাব হল আশাতীত :

> আমার কথা শোন, নইলে সব ফিরিয়ে নেব। ভীতু, হঠকারী মেয়ে। এখনো আমি জানি না তোমার সোরেল কি ধরনের মানুষ, আর আমার চেয়েও তুমি কম জানো। তাকে এখনি স্ট্রাসবুর্গ যেতে বলো, এবং সে যেন খুব সাবধানে থাকে। পনের দিনের মধ্যে আমি তোমাকে আমার ইচ্ছা জানাব।

এই কঠিন জবাব হাতে পড়তে ম্যাথিলডা অবাক হল। 'আমি জুলিয়ানকে জানি না' এই শব্দগুলো তার দিবাস্বপ্নের বুকে আছড়ে পড়ল এবং অতি শীঘ্র তার মনকে সম্মোহিত করল···কিন্তু সে বুঝতে পারল, কথাগুলো সত্য। আমার জুলিয়ান বসবার ঘরে প্রচলিত কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে না এবং যার

উপর তার কর্তৃত্ব নেই এমন সব কিছুকে আমার বাবা অবিশ্বাস করে…।

যা'হোক এখন যদি বাবার এই বিশেষ ধরনের খেয়াল না মানি তাহলে লোকের কাছে আমার দুর্ণাম রটবে, সমাজে এই দুর্ণামের জন্য আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এবং এর ফলে হয় ত জুলিয়ানের চোখেও আমি হেয় হয়ে পড়ব। দুর্ণামের পর…দশ বছরের দারিদ্র্য। ঐশ্বর্যের ঝলকানির দ্বারাই মেধা দেখে স্বামী নির্বাচনের জ্বালা ভোলা সম্ভব। বাবার জীবিতকালের মধ্যে যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে গিয়ে বাস করি, তবেই তিনি একদিন আমাকে ভুলে যাবেন… তারপর নরবারট একটি সুন্দরী এবং চালাক মেয়েকে বিয়ে করবে। চতুর্দশ লুই বুড়ো বয়সে বুরগনের ডিউক-পত্নীকে দেখে মজেছিলেন…।

তাই ম্যাথিলডা ঠিক করল তার বাবার কথা সে শুনবে। তবে চিঠির বিষয়ে জুলিয়ানকে কিছুই বলবে না…তাহলে ও হয়ত আবার একটা বোকামি করে বসবে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ম্যাথিলডা জানাল যে, জুলিয়ান হুসার বাহিনীর লেফটন্যাণ্টের পদ পেয়েছে…শুনে জুলিয়ানের মন আনন্দের সীমা ছাড়াল। এটাই ত তার সারা জীবনের কামনা…এখন সন্তানের প্রতিও তার স্নেহ তীব্র হল। তবে সে অবাক হল নামের পরিবর্তনের জন্য।

অবশেষে সে ভাবল, আমার রোমাণ্টিক জীবনের কাহিনী এবার শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে এবং এর জন্য সব কৃতিত্বই আমার। ম্যাথিলডার দিকে তাকাল জুলিয়ান। এই দানবী-মনের অহঙ্কার জয় করে আমি ভালবাসা লাভ করেছি। ওর বাবা ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবেন না এবং ও নিজে পারবে না আমাকে ছেড়ে বাঁচতে।

৩৫ : ঝড়

ঈশ্বর! তুমি আমাকে মধ্যবিত্ত করো।

—মিরাবো

চিন্তায় নিমগ্ন তার মন, তাই ম্যাথিলডার ভালবাসার আবেদনে সে পুরোপুরি সাড়া দিতে পারল না। সে নির্বাক এবং বিষণ্ণ হয়ে রইল। ম্যাথিলডার দৃষ্টিতে সে এর আগে এত বেশী মহান এবং পূজনীয় হয়ে ওঠে নি। ওর মনের অন্তরে হয় অহঙ্কারের স্রোত বিচিত্র খাতে বইছে…সমস্ত অবস্থা বোধহয় এবার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

প্রায় প্রতিদিন সকালে ফাদার পিরার্দকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে ম্যাথিলডা। জুলিয়ান নিশ্চয় ফাদারের কাছ থেকে তার বাবার ইচ্ছার আন্দাজ পায় নি? কোন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তার বাবা নিশ্চয় জুলিয়ানকে কিছু

লিখে জানান নি? এত ধন-সম্পদ পাওয়ার পরও জুলিয়ানের মনের এই কাঠিন্যের ব্যাখ্যা কি হবে? ম্যাথিলডা কিন্তু তাকে প্রশ্ন করতে সাহস করল না।

সে সাহস করল না! সে ম্যাথিলডা! আর তখন থেকেই জুলিয়ান সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা তার মনে দেখা দিল...অস্পষ্ট ধারণাটা ভয়েরই সামিল।

পরদিন সকালবেলায় জুলিয়ান এসে হাজির হল ফাদার পিরার্দের বাড়ীতে।

কঠিন হৃদয় পাদরী বললেন—'আর আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। মঁসিয়ে মোল তোমাকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। এক বছরের মধ্যে খরচ করো। তিনি চান, তুমি যেন, হাস্যাস্পদ হয়ো না।'

জুলিয়ান চুপচাপ শুনতে লাগল।

পাদরী ফাদার পিরার্দ আবার বলতে লাগলেন—'মারকুইস বলে দিয়েছেন যে, জুলিয়ান ভারনেরি তার বাবার কাছ থেকে নিয়মিত পাবে! বাবার সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানবার দরকার নেই। তবে মঁসিয়ে ভারনেরি ভেরিয়ারের ছুতোর মঁসিয়ে সোরেলকেও উপহার দিতে চান কারণ সে জুলিয়ানকে মানুষ করেছে...মারকুইস জেসুইটপন্থী ফাদার ফ্রিলেয়ারের সঙ্গেও সমঝোতা করেছেন। তিনি এখন বেসানকনের শাসক। সর্ত ঠিক হয়েছে যে, তিনি তোমার জন্ম সম্বন্ধে সমর্থনপত্র দেবেন।

জুলিয়ান বিস্ময়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ভাবছ তুমি? এসব সাংসারিক গর্বের কি অর্থ? আমি আমার নামে সোরেল আর তার ছেলেদের নামে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক বৃত্তি পাঠাব। যতদিন তারা ভাল ব্যবহার করবে এই অর্থ তারা পাবে।'

জুলিয়ানের মন তখন সুদূরে বিচরণ করছিল: নেপোলিয়নের ভয়ে আমাদের পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন এমন একজন অভিজাত পুরুষের সে স্বাভাবিক সন্তান এটা কি সম্ভব? প্রতি মুহূর্তে এই ঘটনাটা তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে...বাবার প্রতি আমার ঘৃণাই তার প্রমাণ...না, আমি আর দানব-মানুষ নই।

কয়েকদিন পরেই হুসার বাহিনীর সৈনিকদের কুচকাওয়াজ হল স্ট্রাসবুর্গ শহরে। কেভালিয়র দ্য লা ভারনেরি তার সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে সেই কুচকাওয়াজে যোগ দিল ..তার ঘোড়াটা কিনতে দাম দিতে হয়েছে ছ'হাজার ফ্রাঙ্ক, তার ভাগ্য ভাল, সেকেণ্ড লেফটন্যান্ট না হয়েই সে একেবারে লেফটন্যান্টের পদ লাভ করেছে...সেনাবাহিনীর হাজিরা খাতায় তার নাম লেখা হয়েছে।

জুলিয়ানের আবেগহীন আচরণ, কঠিন প্রায়-নিষ্ঠুর দৃষ্টি পাণ্ডুবর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় আত্ম-সচেতনতার জন্য প্রথম থেকেই তার নাম সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, লাভ করল সকলের শ্রদ্ধা। তার নিখুঁত ভদ্রতা, পিস্তলে তার দক্ষতা এবং অসিচালনায় পারদর্শিতা সকলকে বিস্মিত করল—ফলে তাকে নিয়ে পরিহাস করার কথাই কেউ ভাবল না। পাঁচ-ছদিনের মধ্যে অন্যান্য সেনা-

নায়করা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'ছোকরার মধ্যে সবই আছে এক যৌবন ছাড়া।'

স্ট্রাসবুর্গ থেকে বৃদ্ধ মঁসিয়ে চেলানের কাছে চিঠি লিখল জুলিয়ান:

> জেনে আপনি নিশ্চয় আনন্দিত হবেন যে ঘটনা পরম্পরায় আমি একটি ধনী পরিবারের আশ্রয় লাভ করেছি। আপনাকে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পাঠালাম। একদিন আমার মত একটি গরীব ছাত্রকে আপনি সাহায্য করেছিলেন, তেমনি গরীব ছাত্রদের মধ্যে এই অর্থ দান করে দেবেন কিন্তু আমার নাম প্রকাশ করবেন না। অবশ্য আমি জানি এখনও গরীবদের আপনি সাহায্য করেন।

অহঙ্কার নয়, উচ্চাশায় ভরা জুলিয়ানের মন। নিজের আচার-আচরণের দিকে সে নজর দিল। তার ঘোড়া, সৈনিকের পোশাক, আরদালির পোশাক··· সবকিছুর প্রতি তার সতর্ক দৃষ্টি। তার উপর ইংরাজ অভিজাতদের মত সে সময়নিষ্ঠ। সে একজন সামান্য লেফটন্যাণ্ট···অনুগ্রহের মাধ্যমে তার এই পদোন্নতি হয়েছে···মাত্র দু'দিন হল সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে···তবু এর মধ্যে সবাই তাকে চিনে ফেলেছে। সবাই তাকে ভালবাসছে। অনেকের বিশ্বাস, অল্প বয়সেই সে প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করতে পারবে। কিন্তু জুলিয়ান এখন কেবল তার সুনাম এবং সন্তানের কথাই চিন্তা করে।

মারকুইসের বাড়ীর একজন চাকর একখানা চিঠি নিয়ে হাজির হতেই জুলিয়ান অবাক হল।

ম্যাথিলডা চিঠিতে লিখেছে :

> সর্বনাশ ঘটে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এস। যদি পালাবার দরকার হয় তবে সব ফেলে এস। এখানে পৌঁছে বাগানের ছোট দরজার বাইরে ঘোড়ার গাড়ীতে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তোমার সাথে কথা বলার জন্য আমি বেরিয়ে আসব। হয় ত তোমাকে বাগানেও আনতে পারব। আমার ভয়ানক ভয় করছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার উপর বিশ্বাস রেখ, দুঃখের মাঝেও তোমার পাশে অচল থাকব। তোমাকে ভালবাসি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কর্ণেলের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে জুলিয়ান ঘোড়ায় চড়ে স্ট্রাসবুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ল। মেজ শহরে এসে ডাক গাড়ীতে চড়ল। ভোর পাঁচটা। রাস্তায় লোকজন নেই। জুলিয়ান নির্ধারিত জায়গায় হাজির হল। ম্যাথিলডা বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লোক-লজ্জার কথা ভুলে গেল। জুলিয়ানের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—'সর্বনাশ হয়েছে। আমার কান্নার ভয়ে বাবা বাড়ী থেকে চলে গেছেন বৃহস্পতিবার রাতে। কোথায়? কেউ জানে না। এই চিঠি লিখে রেখে গেছেন। পড়।' গাড়ীতে জুলিয়ানের পাশে উঠে বসে তাকে চিঠিখানা দিল

ম্যাথিলডা।

মারকুইস লিখেছেন ঃ

তুমি ধনীর কন্যা তাই তোমাকে প্রলুব্ধ করার ইচ্ছা ছাড়া আর সব কিছু আমি ক্ষমা করতে পারি। ওই অসুখী নারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাই তোমাকে বলছি, ওই লোকটার সাথে তোমার বিয়েতে আমি কিছুতেই মত দেব না। ও যদি ফরাসী সীমান্তের বাইরে, অথবা ভাল হয় আমেরিকাতে চলে যায় তবে ওকে আমি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক আয়ের ব্যবস্থা করে দেব। খবর চেয়েছিলাম তার জবাবে যে চিঠি পেয়েছি পড়ে দেখ। লজ্জাহীন লোকটা আমাকে বলেছিল, মাদাম দ্য রেনলের কাছে চিঠি লিখতে। ওই লোকটা সম্বন্ধে লেখা তোমার কোন চিঠি আমি কখনও পড়ব না। প্যারিস এবং তোমার ভয়ে ভীত আমার মন। অচিরে যা' ঘটবে তা' গোপন রাখতে তোমায় অনুরোধ করছি। এই নোঙরা লোকটাকে এখনি ছাড়, তোমার বাবাকে আবার ফিরে পাবে।

জুলিয়ান ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল—'মাদাম রেনলের চিঠি কই ?'

—'এই যে। তোমার সাথে কথা বলার আগে ও চিঠি তোমায় দেখাই নি।'

চিঠিখানা এমনিভাবে লেখা ঃ

ধর্ম এবং নীতির প্রতি আমি ঋণী, তাই যন্ত্রণাদায়ক হলেও আর একটা লজ্জাজনক ঘটনা যাতে না ঘটে তাই আমার প্রতিবেশী সম্পর্কে এই দুঃখজনক কথাগুলো আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আমার কর্তব্য। যে লোকটি সম্পর্কে আপনি সত্য কথা জানতে চেয়েছেন তার জীবন কলঙ্কজনক এবং কলঙ্কের ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। ধর্ম এবং সম্মান রক্ষা করার জন্য এই ঘটনার একটা অংশ আমি গোপন রাখতে বাধ্য হচ্ছি। যার চরিত্র সম্পর্কে আপনি জানতে চান তার চরিত্র আমি যতটুকু বলতে পারছি তার চেয়েও জঘন্য। ওই হতভাগা জীবটা একজন নারীকে প্রলুব্ধ করে তার ধর্মনাশ করে উন্নতির শিখরে উঠবার ব্যবস্থা করেছিল। এটা শপথ করে বলতে পারি মঁসিয়ে জু...প্রতারক, ধর্ম ও ন্যায়নীতির বিরোধী। ওই লোকটার স্বভাব হচ্ছে, যে বাড়ীতে সে আশ্রয় গ্রহণ করে সে বাড়ীর সবচেয়ে সুন্দরী আর প্রভাবশালিনী নারীকে প্রলুব্ধ করে তার ধর্ম নষ্ট করে। এর জন্য সে অনাগ্রহের ভাব দেখায়, উপন্যাসের বড় বড় কথা মুখস্থ করে বলে। তার উদ্দেশ্য বাড়ীর কর্তা আর তার ধন-সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ লাভ করা। পালাবার পর সে পিছনে ফেলে যায় নিরানন্দ ও অনুশোচনা।

দীর্ঘ চিঠি। চোখের জলে জায়গায় জায়গায় লেখা অস্পষ্ট। এ চিঠি মাদাম রেনলের হাতে লেখা। স্বাভাবিক অবস্থা থেকেও অনেক বেশী সাবধানে লেখা হয়েছে চিঠিখানা।

চিঠি পড়া শেষ করে জুলিয়ান বলল—'মারকুইসকে আমি দোষ দিতে পারি না। তিনি ঠিক বিবেচকের মত কাজ করেছেন। কোন পিতা তার অতি প্রিয় কন্যাকে এমন একটা লোকের হাতে তুলে দিতে চাইবে! বি-দা-য়!'

ঘোড়ার গাড়ী থেকে এক লাফে নেমে পড়ে জুলিয়ান ডাক-গাড়ীতে গিয়ে উঠল। তখনও ওই গাড়ীখানা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। এমনভাবে ছুটল যেন ম্যাথিলডার অস্তিত্ব সে ভুলে গেছে। কয়েক পা ম্যাথিলডা ওর দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার দোকানদার দোকান থেকে মুখ বাড়াতে দেখে সে ফিরে এল।

ভেরিয়ার শহরের পথে যাত্রা করল জুলিয়ান। কোনও কথা সে ম্যাথিলডাকে লিখে জানাল না।

রবিবার সকাল। ভেরিয়ার শহরে পৌছল জুলিয়ান। সোজা ঢুকল আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর দোকানে। জুলিয়ানের অবস্থার উন্নতির কথা এখানে সবাই শুনেছে। তাই তারা তাকে সম্বর্ধনা জানাল।

জুলিয়ান এক জোড়া গুলিভরা পকেট-পিস্তল দোকান থেকে কিনল।

সমবেত প্রার্থনার আগে গীর্জায় তৃতীয় বার ঘণ্টাটা বাজছে তখন। ভেরিয়ারে নতুন তৈরী গীর্জায় ঢুকল জুলিয়ান। লম্বা লম্বা জানালাগুলো গোলাপী-রঙ পর্দায় ঢাকা। মাদাম দ্য রেনলের আসনের কয়েক ফুট পিছনে সে দাঁড়াল। মনে হল, মাদাম খুব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করছেন। এই নারীকে সে একদিন ভালবাসত, এখন তাকে দেখে তার হাত দু'খানা থর-থর করে কাঁপতে লাগল। সে যা' করতে এসেছে তা' আর করতে মন চাইছে না। মনে মনে আওড়াল—এ কাজ আমি করতে পারি না, একাজ করার মত শক্তি আমার দেহে নেই।

ঠিক তখনি আবার ঘণ্টা বাজল। এবার সুরু হবে প্রার্থনা সঙ্গীত।

মাদাম রেনল মাথা নোয়ালেন প্রণাম জানাতে…তাঁর সারা দেহ এখন শালের আড়ালে ঢাকা। এখন জুলিয়ান আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা পিস্তল থেকে তাঁর দেহ নিশানা করে জুলিয়ান গুলি ছুঁড়ল…ব্যর্থ হল আঘাত হানতে। দ্বিতীয়বার সে গুলি ছুঁড়ল। এবার মাদামের দেহ লুটিয়ে পড়ল।

৩৬ : বিষণ্ণ বৃত্তান্ত

আমার চরিত্রে কোন দুর্বলতা নেই, আমি প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছি। মৃত্যু আমার কাম্য এবং এই ত রয়েছি আমি। আমার জন্য প্রার্থনা করো।

—শিলার

জুলিয়ানের দেহ নিথর। দৃষ্টি অন্ধ। সম্বিৎ ফিরে আসতেই সে দেখল, প্রার্থনাকারীরা পালাবার জন্যে সবেগে দরজার দিকে ছুটছে। যাজক বেদী ছেড়ে পালিয়েছেন। একদল পলাতকা নারীর পিছনে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল জুলিয়ান···ওরা ভয়ে চিৎকার করছিল। অন্যদের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে একজন নারী তাকে সজোরে ধাক্কা মারল। পড়ে গেল জুলিয়ান। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝতে পারল একখানা উল্টে-পড়া চেয়ারে তার পা আটকে গেছে। অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল···কিন্তু তখন একজন পুলিশ এসে তার কাঁধ চেপে ধরেছে। যন্ত্রের মত জুলিয়ান পকেট থেকে তার পিস্তলটা বার করতে গেল কিন্তু আর একজন পুলিশ তার হাত চেপে ধরল।

ওকে জেলখানায় নিয়ে গেল। একখানা ঘরে তাকে হাতকড়া পরিয়ে ঢুকিয়ে দিল। সে এখন একা। দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল। এসব কাজগুলো ওরা খুব দ্রুত সারল···জুলিয়ান তখন অচেতনপ্রায়। কিছুই বুঝতে পারল না।

বাস্তবিকই সব শেষ হয়ে গেল···চেতনা ফিরে আসতে ও ভাবল, এর মধ্যে যদি আত্মহত্যা না করি তবে গিলোটিনে আমার মৃত্যু হবে। আর সে ভাবতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন তার মাথাটা কেউ থেঁৎলে দিয়েছে। তাকিয়ে দেখতে লাগল, কেউ কোথাও আছে কি না! না, নেই। একসময় আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মৃত্যু হওয়ার মত সাংঘাতিকভাবে আহত হন নি মাদাম দ্য রেনল। প্রথম বুলেটটা তাঁর মাথার টুপী ভেদ করেছিল এবং মাদাম ফেরবার আগেই দ্বিতীয় বুলেটটা ছুটল এবং তাঁর কাঁধের হাড়ে প্রতিহত হয়ে বুলেটটা ছিটকে গিয়ে লাগল দেওয়ালে। এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা···কতকগুলো লোহার টুকরো ছিটকে পড়ল।

আহত স্থানটায় ভালভাবে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে শল্যচিকিৎসক বললেন—'আর আপনার জীবনের ভয় নেই।' মাদাম রেনল বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। অনেক দিন ধরেই তিনি মরতে চেয়েছিলেন। তাঁর যাজকের অনুরোধে তিনি মঁসিয়ে মোলকে চিঠি লিখেছিলেম...সেই চিঠিখানা তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছে। তিনি দুঃখে বিষণ্ণ। দীর্ঘ দিন ধরে জুলিয়ানের অনুপস্থিতি এই বিষণ্ণতাকে আরও তীব্র করেছে।

মাদাম রেনল এখন ভাবতে থাকেন…আত্মহত্যা না করে এমনিভাবে মৃত্যু বরণ করার মধ্যে কোনও পাপ নেই। মৃত্যুর মধ্যে আনন্দ লাভ করলে ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন। এবং বলতে তিনি ভীতা হলেন, আর জুলিয়ানের হাতে মৃত্যু হলে সে মৃত্যু হবে আশীর্বাদ।

অনেকেই তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

মাদাম দ্য রেনল এলিসাকে ডেকে বললেন—'জেলার লোকটা নিষ্ঠুর। ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করলে আমি খুশি হব এই ভেবে হয়ত জেলার ওকে কষ্ট দেবে।…ও চিন্তা আমি করতে পারছি না। তুমি একবার গিয়ে জেলারকে এই ছোট প্যাকেটটা দেবে, এতে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা আছে। তাকে বলবে, ধর্ম বলে নি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে।…তবে সে যেন স্বর্ণমুদ্রার কথা কাউকে না বলে।

জেলখানায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সেদিন।

জুলিয়ান তাঁকে সোজা বলল—'হত্যার অপরাধে আমি অপরাধী। আমি নিজে গুলিভরা পিস্তল পকেটে করে এনেছিলাম। পেনাল কোডের ধারা পরিষ্কার। মৃত্যুদণ্ড আমার প্রাপ্য, আমি তাই আশা করছি।' অপরাধীকে এমনভাবে কথা বলতে শুনে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই অবাক হলেন। তিনি ভেবেছিলেন অপরাধী হয়ত তার দোষ অস্বীকার করবে।

কিন্তু জুলিয়ান আবার হেসে বলল—'দেখছেন না, আপনার মতে মত দিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করছি? শান্ত হন, শিকার আপনার হাতেই রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে রায়দান করে আপনি খুশি হবেন। এবার আপনি আসুন।'

ভাবতে লাগল জুলিয়ান, আমায় আর একটা বিরক্তিকর কাজ এখনও করতে হবে। ম্যাথিলডার কাছে চিঠি লিখতে হবে।

অবশেষে চিঠি লিখল জুলিয়ান:

> প্রতিশোধ নিয়েছি। দুর্ভাগ্য, কাগজে আমার নাম বেরোবে। সবার অজ্ঞান্তে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারব না। মাস দুয়েকের মধ্যে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। ভয়ানক আমার প্রতিহিংসা, তেমনি ভয়ানক আমার দুঃখ, কেননা তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে থাকতে হচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে তোমার কাছে চিঠি লেখা বা তোমার নাম উচ্চারণ করা বন্ধ করলাম। কারো কাছে আমার নাম করবে না, এমন কি আমার সন্তানের কাছেও না, তোমার নীরবতা আমার স্মৃতিকে অনেক বেশী সম্মান দেবে। সাধারণ লোকের চোখে আমি ত একজন খুনী…কিন্তু এই চূড়ান্ত মুহূর্তে তুমি আমাকে সত্য কথা বলতে দাও… ভুলে যাও আমাকে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা, যা'র সম্বন্ধে কারো কাছে মুখ খুলতে আমি তোমায় নিষেধ করছি, তা' কয়েক বছরের মধ্যে তোমার মনে যে রোমান্টিক ও দুঃসাহসিক চিন্তা-ভাবনা আমার নজরে

পড়েছে সেগুলো মুছে ফেলবে। মধ্য-যুগীয় বীরদের সাহচর্যে বাস করতে তুমি জন্মেছ, তাই তাদের মত চরিত্র-বল দেখাও। যা' কিছুই ঘটুক না কেন, কারো সাথে আপোষ করো না, কাউকে বিশ্বাস করো না। একটা ছদ্মনাম গ্রহণ করো এবং ফাদার পিরার্দকে বিশ্বাস করো। আর আমার মৃত্যুর এক বছর পরে ক্রয়সিনয়কে বিয়ে করো। তোমার স্বামী আমি, এই আদেশ তোমায় করছি। আমাকে চিঠি লিখো না। জবাব দেব না। খল-নায়ক আয়াগোর মত বলছি: এখন থেকে আর একটি কথাও বলব না। কেউ আর আমাকে লিখতে বা কথা বলতে দেখবে না।

চিঠিখানা লিখে পাঠিয়ে দিয়ে জুলিয়ান এই প্রথম পরিপূর্ণ সম্বিৎ ফিরে পেল এবং নিরানন্দ অনুভব করল। 'আমাকে মরতে হবে' এই চরম শব্দগুলো এখন থেকে তার মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল উৎপাটন করবে। মৃত্যু তার দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত হচ্ছে না। সারা জীবন ধরে এই দুর্ভাগ্য সহ্য করার জন্য যেন সে নিজেকে তৈরী করেছে।

হায় ঈশ্বর! মনে মনে ভাবতে লাগল জুলিয়ান, এমন যদি হয় আজ থেকে দুমাস পরে আমার চেয়েও পারদর্শী কোন যোদ্ধার সঙ্গে আমার অসি-যুদ্ধে আমাকে নামতে হয় তাহলে কি দিন-রাত আমি সে-কথা ভাবব? কেন আমি ভাবব? অত্যন্ত ভীতিজনকভাবে একজনকে আমি আঘাত করেছি, তার জীবন নিয়েছি। মৃত্যুই আমার প্রাপ্য। মানুষের সাথে আমার হিসাব-নিকাশ চুকে গেছে। পিছনে আমি কোনও অপূর্ণ কর্তব্য রেখে যাচ্ছি না, কারো কাছে আমি ঋণী নই। এই মৃত্যুর যন্ত্রণাটা ছাড়া আমার এই মরণে কোন লজ্জার স্পর্শ নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, ভেরিয়ার শহরের অধিবাসীদের কাছে আমার এমনিভাবে মৃত্যু লজ্জাজনক···একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কি হতে পারে? অবশ্য ওদের দৃষ্টিতে মহান হওয়ার একটা পথ এখনও খোলা আছে···বধ্যভূমিতে যাওয়ার সময় ওদের মধ্যে আমি স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিতে পারি। আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে স্বর্ণমুদ্রা···আর সেই স্মৃতি অনেকদিন ওদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল থাকবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে জুলিয়ান আবার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেল। মনে মনে বলল: এই পৃথিবীতে আমার আর কিছু করবার নেই।

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তখন ন'টা। জেলারের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল জুলিয়ানের। তার রাতের খাবার আনা হয়েছে।

—'আচ্ছা, ভেরিয়ার শহরে ওরা কি বলাবলি করছে?' জানতে চাইল জুলিয়ান।

—'মঁসিয়ে জুলিয়ান, রাজার নামে ক্রুশ-চিহ্নের সামনে শপথ করেছি যতদিন

এই কাজ করব ততদিন কোন কথা বলব না, চুপ করে থাকব।'

কিছুই বলল না জেলার তবে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতারক লোকটার ভান দেখে মজা পেল জুলিয়ান। ভাবল, লোকটাকে আরও দাঁড় করিয়ে রাখব। ওর এই মনোভাবের জন্য ও পাঁচ ফ্রাঙ্ক ঘুষ চাইছে।

কিন্তু জেলার যখন দেখল খাবার খাওয়া শেষ হয়ে আসছে অথচ ঘুষের নামও করছে না জুলিয়ান তখন মুরুব্বির ঢঙে সে বলল—'আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে তাই বলছি, লোকে অবশ্য বলবে এটা বিচারের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, তবু কথাগুলো আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে কাজে লাগবে…মঁসিয়ে, আপনি একজন খাসা ভদ্রলোক। মাদাম রেনল সুস্থ হয়ে উঠছেন শুনলে নিশ্চয় আপনি খুশি হবেন।'

দারুণ অবাক হয়ে জুলিয়ান চেঁচিয়ে উঠল—'কি! সে মারা যায় নি?'

বোকা বনে গেল জেলার। খুশি হয়ে বলল—'সে কি! আপনি কিছুই জানেন না? শল্য-চিকিৎসক কিছু বলতে চান নি, আপনাকে খুশি করার জন্যে আমি তাঁর কাছ থেকে সব জেনে এসেছি…।'

জুলিয়ান ধৈর্য হারাল। বলল—'ছোট করে বল, মারাত্মক আঘাত হয় নি? জীবনের ভয় নেই তার? জবাব দাও।'

জেলার ভয় পেয়ে সরে যেতে উদ্যত হল। জুলিয়ান বুঝল, সে ভুল করছে, তাই নেপোলিয়নের আমলের একটা স্বর্ণমুদ্রা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। এবার কাজ হল। জেলারের মুখ থেকে শুনতে পেল মাদাম রেনল মৃত্যু হওয়ার মত আঘাত পান নি। কান্নায় অভিভূত হল জুলিয়ান; চেঁচিয়ে উঠল—'যাও, বেরোও।'

ওর কথা শুনে জেলার চলে গেল।

জুলিয়ান আপন মনে বক্‌বক্ করতে লাগল, হায় ঈশ্বর! ও মারা যায় নি। তারপর হাঁটুতে মুখ রেখে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। এ সময় ঈশ্বরকে তার মনে পড়ছে। যাজকদের জীবন কত না শঠতায় ভরা। ওরা সত্যকে এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশান্ত অস্তিত্বকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে? এতক্ষণে অপরাধ করার জন্যে তার মনে অনুশোচনা দেখা দিল।

মনে মনে বলল—অতএব মাদাম রেনল বেঁচে থাকবে…সে আমাকে ক্ষমা করবে, আর ভালবাসবে…।

পরের দিন সকালবেলায় অনেক দেরীতে জেলার তার ঘরে এল।

বলল—'আপনার মন খুব কঠিন, তাই আপনি গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিলেন। এই দু'বোতল ভাল মদ আপনার জন্যে মঁসিয়ে ম্যাসলন এনেছিলেন। রেখে গেছেন।'

—'কি! বদমাসটা এখনও আছে না কি?' জানতে চাইল জুলিয়ান।

জেলার চুপি চুপি বলল—'হাঁ, চলে গেছেন। আস্তে কথা বলুন, নইলে

আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

প্রাণ খুলে হাসল জুলিয়ান, বলল—'এখন তুমি যদি আমার সাথে মানবিক ব্যবহার করো তবে বেশী ক্ষতি হবে।'

জেলার এবার মাদাম রেনলের সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলল।

এক সময় জুলিয়ানের মনে একটা চিন্তা উঁকি দিল: এই দানবাকার কুৎসিত লোকটা বড় জোর তিন চার শ' ফ্রাঙ্ক রোজগার করে। আর ওর জেলখানা ত কয়েদিতে ভরা। ও যদি আবার সুইজারল্যাণ্ড পালায় ত ওকে আমি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দেব। কিন্তু ওকে রাজী করানোই শক্ত। অবশ্য এ ধরনের একটা জঘন্য লোকের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে ওর মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

এবার স্থরু হবে বিচারের পালা। ওকে হাজির হতে হবে জনসমক্ষে। ছোট বড় নানা ধরনের লজ্জাকর ঘটনা ঘটবে, বাদ প্রতিবাদ চলবে। আদালতের নানা কায়দা-কানুনও আছে যা' বিচারের দিনেই শুধু জানা যাবে। মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কা তার এই চিন্তাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করতে পারল না। বরং এক নতুন খাতে তার চিন্তা গড়িয়ে চলল···তার উচ্চাশার কাল শেষ হয়েছে। তবু ম্যাথিলডার কথা তার মনে একবারও উদয় হচ্ছে না। মন বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে মাদাম গু রেনলের চেহারা দৃষ্টির সামনে ভাসছে। নীরব অন্ধকার। সুদৃঢ় লৌহ-কারাগার। সময় সময় সমুদ্র-শকুনের চিৎকারে রাতের নির্জনতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে তাকে খুন করতে পারে নি। কি বিস্ময়কর ঘটনা! মারকুইসকে লেখা ওর চিঠিখানা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সব আশা সব সুখ নষ্ট করে দিয়েছে···এবং পনের দিন পরে আমার অবস্থা এমন হবে যে, আমি সব চিন্তার অতীত হয়ে যাব···বছরে ছ'তিন হাজার ফ্রাঙ্ক রোজগার করে পাহাড় ঘেরা ভার্জিতে আমি সুখেই থাকতে পারতাম—তখন ত সুখেই ছিলাম···নিজের সুখ আমি নিজে বুঝতে পারি নি।

আবার এক সময় ভাবতে লাগল জুলিয়ান···মাদাম গু রেনলকে খুন করলে আমি নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করতাম···আমি কি এখন আত্মহত্যা করব? ওই সব বিচারকরা এবার নানা বিষয়ের অবতারণা করে আমার মত এক হতভাগ্যের অপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে, অশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় আইনের বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বইবে···সংবাদপত্রে সব বিবরণ ছাপা হবে···হয়ত এ সবের দরুণ আরও পাঁচ ছ' সপ্তাহ আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আত্মহত্যা! হায় ঈশ্বর না! মহান নেপোলিয়ন ত বেঁচেছিলেন···

তাছাড়া, জীবন ত আমার কাছে এখন মনোরম! আমার এই আশ্রয় ত নির্জন! হাসল! এখানে ত একঘেয়েমির অস্তিত্ব নেই। তাই প্যারিস থেকে আনাবার জন্য একটা বইয়ের তালিকা তৈরী করায় মন দিল জুলিয়ান।

৩৭ : জেলখানার ঘর

এক বন্ধুর সমাধিস্তূপ।

—স্টারনি

এখন দেখা করার সময় নয়···কিন্তু তবু বারান্দায় একটা চেঁচামেচির শব্দ শুনল জুলিয়ান। সমুদ্র-শকুনগুলো তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। বৃদ্ধ ফাদার চেলান কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন লাঠিতে ভর দিয়ে···তাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

—'হায় করুণাময় ঈশ্বর! এও কি সম্ভব, বাছা···দানব, আমার বলা উচিৎ!'

বৃদ্ধ আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। জুলিয়ানের ভয় হল, উনি হয় ত পড়ে যাবেন। ওঁকে ধরে চেয়ারে বসাল। আগে উনি কত সচল ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর দেহ বয়সের ভারে জীর্ণ। জুলিয়ানের মনে হল, তাঁর দেহ এখন ছায়ামাত্র।

শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হতে ফাদার বললেন—'গত পরশু স্ট্রাসবুর্গ থেকে পাঠানো তোমার চিঠি আর পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পেয়েছি। ওই অর্থ ত তুমি ভেরিয়ারের গরীব লোকদের জন্য দিয়েছ। পাহাড়ের উপর লিভেরুতে আমার ভাগ্নে জাঁয়ের কাছে ছিলাম, ওখানেই ডাক পিয়ন সব আমাকে দিয়ে এসেছে। গতকাল এই সর্বনাশা খবর শুনলাম···হায় ঈশ্বর! এও সম্ভব!' বৃদ্ধ আর কাঁদছিলেন না, শূন্যমনে তাকিয়েছিলেন, যান্ত্রিকভাবে বললেন—'তোমার এখন অর্থের দরকার, তাই সেই পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক সঙ্গে এনেছি।'

গভীরভাবে অভিভূত হয়ে বলল জুলিয়ান।—'আপনার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার, ফাদার। আরও কিছু অর্থ এখনও আমার আছে।'

কিন্তু আর কোনও জবাব পেল না জুলিয়ান। মাঝে মাঝে মঁসিয়ে চেলানের গাল বেয়ে দু'এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল, তিনি অবাক নয়নে তাকিয়েছিলেন জুলিয়ানের দিকে এবং তার হাতখানা তুলে নিয়ে তাঁর অধরে বুলোচ্ছিলেন। এই মুখমণ্ডল একদিন কত জীবন্ত ছিল। কত মহান ভাব তাতে ফুটে উঠত। আজ তা' মৃত। বিষণ্ণ।

জনা কয়েক চাষী ভিতরে প্রবেশ করল।

একজন বলল—'ওঁকে ক্লান্ত হতে দিতে পারি না।' জুলিয়ান বুঝল, ও ফাদারের ভাগ্নে।

অপরাধ করার পর এই তার জীবনের সবচেয়ে বিষণ্ণ মুহূর্ত। মৃত্যুর কুৎসিততম চেহারা তার নজরে পড়ল। ঝড়ের সামনে মেঘের মত উচ্চ-মনের সমস্ত সাহস আর আভিজাত্য-বোধ ছড়িয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে তার

মনে রইল এই অবস্থা। নিজেকে তার ভীরু বোধ হচ্ছিল। কি বোকা আমি! এই বৃদ্ধকে দেখে দুঃখের আন্দাজ করা আমার ভাগ্যের লিখন! নইলে যৌবনে মরে গেলে এ অবস্থা আমার হত না!

আর জুলিয়ানের মনে আড়ম্বর-প্রিয়তা বা রোমীয় আচরণের অস্তিত্ব নেই। মৃত্যুর খড়্গ তার মাথার উপর ঝুলছে···এবং এটাই যেন খুব সহজ অবস্থা।

পরের দিন সকালবেলায় জেগে উঠে আগের দিনের মনোভাবের জন্য সে লজ্জিত হল। ভাবল, আমার সুখ, আমার মনের শান্তি আজ বিপন্ন। তার সাথে কেউ যাতে দেখা করার অনুমতি না পায় তা' সে কারা-বিভাগের কর্তার কাছে লিখবে ভাবল। কিন্তু ফৌকে যদি আসে? অনেক কষ্ট করে সে বেসানকন এসে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে না পায় তবে দুঃখিত হবে। এই ত দু'মাস আগে সে ফৌকের কাছে তার ভাবনার কথা লিখেছিল। কিন্তু স্ট্রাসবুর্গে আমি বোকার মত কাজ করেছি। আমার মাথা কাটা যাবে তা' ভাবি নি। বার বার ফৌকের কথা মনে পড়ছে, ধীরে ধীরে তার মন নরম হচ্ছে। উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি করছে। এই দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে তবে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোন পথ থাকবে না।

ফৌকে হাজির হল। সরল, দয়ালু মনটা তার দুঃখের ভারে বিষণ্ণ। তার মতলব, সব সম্পত্তি বিক্রি করে সে জুলিয়ানের জীবন রক্ষা করবে। জেলারকে ঘুষ দিয়ে জেলখানা থেকে পালাবে।

জুলিয়ান বলল—'দেখ, তুমি আমাকে আরও দুঃখ দিচ্ছ। আমি অপরাধী। আর কোন কিছু ভাবতে চাই না···কিন্তু এটা কি সত্যি কথা? তুমি তোমার সব সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইছ?'

বন্ধু কিছুটা রাজী হয়েছে দেখে ফৌকে খুব খুশি হল।

মাঝে মাঝে সরকারি অফিসাররা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসছিল।

কিন্তু জুলিয়ানের এক জবাব—'আমি খুন করেছি অথবা আগে থেকে ভেবে চিন্তে খুন করার চেষ্টা করেছি।'

মৃত্যুদণ্ডের আগে এই নির্জন কারাবাসের জীবনে একটা ঘটনা জুলিয়ানের কাছে জঘন্য লাগল। একদিন তার বাবা তার সাথে দেখা করতে এল। ফৌকেকে বলল জুলিয়ান।

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল—'দেখ, এই নির্জন কারাবাসের নিষেধ তোমার বাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

৩৮ : প্রভাবশালী একজন মানুষ

কিন্তু ওর চলনে কত রহস্যের স্পর্শ, ওর দেহ কত লাবণ্যভরা! ও কে হতে পারে?

—শিলার

পরের দিন খুব ভোরে জেলখানার দরজাটা হু'হাট হয়ে খুলে গেল।

জুলিয়ান চমকে জেগে উঠল। ভাবল, হায় ঈশ্বর! ওই ত আমার বাবা আসছে। কি নিরানন্দ দৃশ্য!

ঠিক তখনি চাষী-মেয়ের পোশাক পরা একটি মেয়ে জুলিয়ানের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে জুলিয়ান তাকে চিনতে পারল। সে মাদমোজায়েল গু লা মোল···ম্যাথিলডা।

—'নিষ্ঠুর ভাগ্যহীন, তোমার চিঠি পড়ে কিছু বুঝতে পারি নি। যাকে তুমি অপরাধ বলেছ তা' তোমার মহান প্রতিশোধ গ্রহণ···তোমার মধ্যে এই মহান গুণের প্রকাশ আমি দেখলাম। ভেরিয়ারে এসে সব জানতে পেরেছি··· ।'

এই পরিবেশে ম্যাথিলডাকে দেখে মুগ্ধ হল জুলিয়ান। এমন আভিজাত্যপূর্ণ অথচ আগ্রহহীন আবেগ নিয়ে কি করে কথা বলা সম্ভব? কোনও নীচ এবং কুৎসিত-মন মানুষের পক্ষে তা' সম্ভব হত কি? সে বলল—'আমার ভবিষ্যৎ আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি। আমার মৃত্যুর পর তুমি মঁসিয়ে ক্রয়সিনয়কে বিয়ে করো। বিধবা হলেও তোমার মধ্যে রোমান্টিক্ ভাব রয়েছে, তাই তুমি আরো লাবণ্যময়ী হয়ে উঠবে। যে সুখের জন্য তোমার মন লালায়িত সে সব সুখও লাভ করবে···সুনাম, ধন দৌলত, সমাজে উচ্চ আসন সবই পাবে। কিন্তু বেসানকনে এসেছ তুমি, কেউ সন্দেহ করলে তোমার এই আগমনের ফলে মারকুইসের আত্ম-সম্মানে দারুণ আঘাত লাগবে। এবং এর জন্যে নিজেকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। এর মধ্যে অনেক দুঃখ তাঁকে দিয়েছি। বন্ধুরা মারকুইসকে বলে, বুকের মধ্যে তিনি একটা সাপ পুষেছেন।'

ম্যাথিলডা রেগে বলল—'স্বীকার করছি, ওসব যুক্তি আমি আশা করি নি। ভাবি নি ভবিষ্যতের কথাও। আমার ঝি আমার চেয়েও সাবধানী। সে আমার জন্যে মাদাম মিচেলেতের নামে ছাড়পত্র জোগাড় করে দিয়েছে।'

—'এবং মাদাম মিচেলেত্ কি অতি সহজে এই জেলখানায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে?'

—'তুমি ঠিক আগের মতই সেরা বুদ্ধিমান আছ, তাই তোমায় ভাল লাগে। প্রথমে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের একজন সচিবকে এক শ' ফ্রাঙ্ক ঘুষ দিয়েছিলাম কেননা এই জেলখানায় আমার প্রবেশাধিকার না-কি সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা হাতে পাওয়ার পর সে নিষেধ-আদেশ নিল তুলে···মনে হল টাকাটা সে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।'

জুলিয়ান বলল—'আচ্ছা?'

ম্যাথিলডা তখন জুলিয়ানকে আলিঙ্গনে বেঁধে আদর করল। বলল—'ওগো, আমার উপর রাগ করো না। সচিবকে আমার নাম বলতে হয়েছে, কেননা সে ভেবেছে যে, আমি প্যারিসের কোন সৌবনকারিণী, তোমার প্রেমিকা।···

সত্যি সে বলেছে যে, তুমি খুব সুন্দর। আরও বলেছি আমি তোমার বউ, তোমার সাথে আমি রোজ দেখা করব।'

জুলিয়ান ভাবল, ও বোকামি করে ফেলেছে। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। অবশ্য মারকুইস এত বড় আর প্রভাবশালী যে, তার সুন্দরী বিধবা কন্যাকে কর্ণেল বিয়ে করলে জনমত সব ভুলে যাবে। আমার মৃত্যু সব কিছু ঢাকা দিয়ে দেবে। ম্যাথিলডার ভালবাসার কাছে মহানন্দে সে নিজেকে ধরা দিল। এ এক বন্য, উন্মত্ত আনন্দের আবেগ। এক বিচিত্র অনুভূতি। খুব আন্তরিকভাবে ম্যাথিলডা বলল তারা একসাথে জীবন বিসর্জন দেবে।

ম্যাথিলডা শহরের বিভিন্ন আইন-ব্যবসায়ীর কাছে গেল। সোজাসুজি তাদের অর্থ দিতে চাইল। প্রথমটায় অখুশি হলেও পরে তারা অর্থ নিল। তবে একটা ব্যাপার ম্যাথিলডা বুঝতে পারল যে, এখানে এই বেসানকন শহরে কিছু করতে হলে এ্যাবি দ্য ফ্রিলেয়ারকে হাত করতে হবে। এই জেসুইট-পন্থী যাজক এখানে সর্বশক্তিমান।

সুন্দরী ম্যাথিলডা শহরের রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবার জন্য সারা শহরে আলোড়ন সৃষ্টি হল। সে মাদাম মিচেলেত্‌ নাম গ্রহণ করেছিল, ভেবেছিল কেউ তাকে চিনতে পারবে না। সে স্বপ্ন দেখছিল যে, তার জুলিয়ানকে বাঁচাবার জন্যে একদিন শহরের লোকেরা দাঙ্গা বাধাবে। তাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে বিষণ্ণ মূর্তিতে ঘুরতে লাগল।

অবশেষে সে একদিন পুরোহিত-প্রধান ফ্রিলেয়ারের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি লাভ করল।

ফ্রিলেয়ারের সাজানো বাড়ীঘর দেখে ম্যাথিলডা অবাক হল। সে যেন প্যারিসে বসে আছে।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্রিলেয়ার বুঝতে পারল যে, তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখদানকারী শত্রু মারকুইসের কন্যা ম্যাথিলডা।

তাই এক সময় স্বভাব-সিদ্ধ চড়া মেজাজেই বলল ম্যাথিলডা—'সত্য কথা বলতে কি আসলে আমি মাদাম মিচেলেত্‌ নই এবং এই স্বীকারোক্তির জন্য আমাকে কিছু মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে এসেছি মঁসিয়ে ভারনেই-য়ের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। বোকামির জন্য সে আজ শাস্তি পাচ্ছে। যে স্ত্রীলোকটিকে সে গুলি করেছিল সে সুস্থ আছে। তাছাড়া তার মুক্তির জন্য এই আমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিচ্ছি, শপথ করছি আরও দ্বিগুণ অর্থ দেব। যে ভারনেইয়িকে বাঁচাবে তাকে আমার বা আমার পরিবারের কিছুই অদেয় থাকবে না।'

মঁসিয়ে জুলিয়ান সোরেল দ্য লা ভারনেইয়ির নামে সমর-দপ্তরের লেখা অনেকগুলো চিঠি দেখে ফ্রিলেয়ার রীতিমত অবাক হল।

—'দেখছেন ত আমার বাবা তার উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করছেন। তাকে

আমি গোপনে বিয়ে করেছি। বাবার ইচ্ছে তাকে সমর-বিভাগে আরও বড় অফিসার করে তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।'

ক্রিলেয়ারের মুখের সদয় এবং রহস্য-প্রিয় ভাব উবে গেল। আন্তরিকতা-হীন কঠিন ভাব ফুটে উঠল। সন্দেহ দেখা দিল মনে। তাই চিঠিগুলো আবার পড়ল। তার উপর এই বিচিত্র বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কিছু সুবিধা সে লাভ করতে পারে তাই ভাবতে লাগল। সর্বশক্তিমান মহামান্য বিশপের ভাইঝি মাদাম ফারবাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ আজ আমি লাভ করেছি। এদের সাহায্যে আজ ফরাসী ভূমির একজন বিশপ হওয়া সম্ভব। অভাবিতভাবে এই সুযোগ এসেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে।

এবার ক্রিলেয়ারের মনের ভাব ধরা পড়ল ম্যাথিলডার কাছে। সবকিছু এখন জলের মত স্পষ্ট। বন্ধুর জন্য কোনও কিছু করা মাদাম ফারবাকের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই ম্যাথিলডা বলল যে, মাদাম ফারবাকের সঙ্গে জুলিয়ানের খুব হৃদ্যতা আছে।

ক্রিলেয়ার জানাল যে, অধিকাংশ জুরিকে হাত করার ক্ষমতা তার আছে। অনেক জুরি তার বন্ধু। আর এদের মতামতের উপর রায় নির্ভর করে। তাছাড়া শাস্তি হলেও ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থাও সে করতে পারবে।

ম্যাথিলডা অবাক হল যখন ক্রিলেয়ার বলল যে, বেসানকন সমাজের সঙ্গে এক বিচিত্র পরিবেশে জুলিয়ান মিশতে সুরু করে এবং মাদাম রেনলের প্রতি তার গভীর আসক্তি ছিল। বহুদিন ধরে সে তার কামনা চরিতার্থ করেছে।

তার কাহিনী ম্যাথিলডাকে দুঃখিত করে তুলল।

তাই ভাবল ক্রিলেয়ার, যাক, এতদিনে প্রতিহিংসা নিতে পেরেছি! তারপর গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল—'একদিন যে নারীকে সে ভালবাসত আজ হিংসার জ্বালায় সেই নারীকে সোরেল গুলি করেছে শুনে আমরা একটুও অবাক হই নি। মাদাম খুব একটা সুন্দরী যুবতী নয়, তার উপর আজকাল দিজনের এক ফাদারের সঙ্গে সে প্রেম করছে, লোকটা জানসেন-পন্থী।'

এই সুন্দরী কন্যা যে মনে মনে আঘাত পাচ্ছে তা' বুঝতে পারছিল ফাদার। আর এই দুঃখ দিয়ে তার লালসা পরিতৃপ্তি লাভ করছিল। তাই আবার বলতে লাগল—'কেন? মঁসিয়ে সোরেল গীর্জায় গেলেন কেন তিনি যখন জানতেন যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ওখানে প্রার্থনা সভা পরিচালনা করছেন? প্রত্যেকেরই ত বুদ্ধি খরচ করে চমকপ্রদ কাজ করা উচিৎ। তার উপর তিনি যখন আপনার আশ্রয় লাভ করে সুখী তখন কেন দুর্ণাম কিনলেন? মঁসিয়ে রেনলের বাগান ত তাঁর পরিচিত জায়গা, তবে সেখানে লুকিয়ে থাকলেন না কেন? সেখানে কেউ তাঁকে দেখতে পেত না, কেউ সন্দেহ করত না, যে নারী তাঁর জীবন হিংসার জ্বালায় দুর্ভর করেছে তাকে খুব সহজে সেখানে খুন করতে পারতেন।'

এমন অকাট্য যুক্তি ম্যাথিলডাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

অবশেষে ফাদার ফ্রিলেয়ার নিজের শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল। এবং জানাল যে, জুলিয়ানের মামলা যে সরকারি উকিলের হাতে আছে তার সঙ্গে সে সমঝোতা করতে পারবে। তারপর যে ছত্রিশ জন জুরিকে গোপন ভোটে নির্বাচন করা হবে তাদের অন্ততঃ ত্রিশ জনকে সে হাত করতে সক্ষম হবে। সে তাদের কাছে আবেদন জানাবে।

ম্যাথিলডা এমন সুন্দরী না হলে ফাদার ফ্রিলেয়ার তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ'বার সাক্ষাৎ না হলে কখনও এমন সোজাসুজি সব কিছু বলত না।

৩৯ : অবৈধ প্রণয়

> **৩১শে মার্চ ১৬৭৬···যে লোকটা তার বোনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল আমাদের বাড়ীতে সে তার আগে আর একটা লোককে খুন করেছিল, পরামর্শ-দাতাদের অনুগ্রহে তাকে মুক্ত করার জন্য তার বাবা পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক ঘুষ দিয়েছিল।**
>
> **—লক**

বিশপের প্রাসাদ থেকে ফিরে এসে মাদাম ফারবাকের কাছে চিঠি লিখল ম্যাথিলডা···তার সাথে মনোমালিন্য দূর করার চিন্তা তাকে দ্বিধায় ফেলল না। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনুরোধ জানাল বিশপকে নিয়ে ফ্রিলেয়ারকে একখানা চিঠি লিখতে। এমন কি মাদাম ফারবাককে একবার বেসানকনে আসতে অনুরোধ করল। এমন গর্বিতা এবং হিংসাপরায়ণ নারীর পক্ষে এটা সাহসিকতা-পূর্ণ কাজ।

ফৌকের নির্দেশে তার এসব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা জুলিয়ানকে জানাল না ম্যাথিলডা, এই শহরে তার উপস্থিতি জুলিয়ানকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আদর্শ-ন্যায়-নীতি আজ মারকুইস এবং বিশেষ করে ম্যাথিলডার জন্য বিবেকের দংশন-জ্বালা অনুভব করছে।

মাঝে মাঝে ভাবছে জুলিয়ান, আচ্ছা ম্যাথিলডা যখন আমার কাছেই রয়েছে তবে কেন আমি ভুলো-মন হচ্ছি, আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ছি? আমার জন্যে সে তার সর্বস্ব নষ্ট করছে আর আমি এভাবে তার ঋণ শোধ করছি? তবে কি আমি সত্যিই নিষ্ঠুর আর হৃদয়-হীন? যখন তার মনে উচ্চাশা ছিল তখন এসব চিন্তা তাকে বিচলিত করত, কেননা তখন নিজের ভবিষ্যৎ রচনায় অকৃতকার্য হয়ে সে লজ্জা অনুভব করত। কিন্তু এখন ম্যাথিলডার উপস্থিতিতে সে নিদারুণ অসোয়াস্তি ভোগ করছে, কেননা তাকে দেখে ম্যাথিলডার মনে লালসা উদ্বেল হয়ে উঠছে। এ এক বিচিত্র লালসা। তাকে বাঁচাবার জন্য অস্বাভাবিক

স্বার্থত্যাগের কল্পনা করছে ম্যাথিলডা। এক সময় যে অহঙ্কার-বোধ তার মন ভরে রেখেছিল তা সে জলাঞ্জলি দিয়েছে···সে এখন সব সময় একটা না একটা অসম্ভব কাজ করার কথাই শুধু ভাবছে। এই সব বিচিত্র মতলব আর বিপজ্জনক ঝুঁকির কথা সে জুলিয়ানকে শোনায়। জেলর তার কাছ থেকে অজস্র ঘুষ পেয়ে তার ইচ্ছা মতই সব কাজ করে দিচ্ছে। জেলখানায় কোন বাধা পাচ্ছে না ম্যাথিলডা। নিজের সম্মান বিসর্জনের ভয়ে সে একেবারেই কুন্ঠিতা নয়···তার অবস্থা দেখে সমাজের লোক কি ভাবছে তা সে গ্রাহ্যই করে না। এমন কি সে ভাবছে একদিন রাজার গাড়ীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে রাজার কাছে জুলিয়ানের প্রাণভিক্ষা চাইবে। অজস্র প্রাণের বিনিময়ে রাজার কাছে একটা প্রাণের ভিক্ষা···এ ত এক অসুস্থ কল্পনা। রাজপ্রাসাদের বন্ধুদের অনুগ্রহে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ রাজার প্রমোদ-কাননে একদিন প্রবেশ করবে ম্যাথিলডা।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জুলিয়ান নিজে অনুভব করে যে, এমন প্রাণ-ঢালা অনুরাগ পাওয়ার সে উপযুক্ত নয়। বীরত্বপূর্ণ মানসিকতায় সে ক্লান্ত। সরল কৌশলহীন আর নীরব অনুরাগে এখন তার মন সাড়া দেয়···কিন্তু ম্যাথিলডা যা কিছু করতে চায় তাতেই সে জনতার মাঝে একটা সোরগোল বাধাতে চায়। তার প্রেমিককে বাঁচানোর ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে তার ভাবনা-চিন্তা উদ্বেলিত···তার অনুরাগের অস্বাভাবিক রূপ সে জগতকে দেখাতে চায়। আর এই বীরত্বপূর্ণ মানসিকতায় সাড়া দিতে পারছে না বলে জুলিয়ান নিজেও বিব্রত। আর ফৌকের শান্ত মাথা থেকেই যে এই সব ক্ষ্যাপামি উদ্গত হচ্ছে এবং ম্যাথিলডার মাথায় প্রবেশ করছে তা জানতে পারলে জুলিয়ান কি রাগ করত?

অবশ্য ফৌকের মত ভালমানুষ ম্যাথিলডার এই অনুরাগের মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছে না। জুলিয়ানকে বাঁচাবার জন্যে সে নিজেও ত তার সর্বস্ব খোয়াতে তৈরী। ম্যাথিলডা যেভাবে দু'হাতে সোনা ছড়াচ্ছে তা' দেখে সে নিজেই হতভম্ব। এমনিভাবে অর্থ খরচ করতে দেখে তার অর্থলিপ্সু গ্রাম্য-মন মুগ্ধ।

একদিন ম্যাথিলডা যখন জেলখানা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন জুলিয়ান ভাবল, কি আশ্চর্য! অমন উষ্ণ লালসা-ময়ী এবং আমি যার প্রেমিক, সেই আমাকে আজ জড়-পদার্থে পরিণত করেছে! অথবা দু'মাস আগে আমি ওকে ধ্যান করতাম। তাহলে আমি ঠিকই পড়েছি যে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মানুষের মন সব কিছু থেকে সরে আসে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা হারানো ত ভয়ানক ব্যাপার তাহলে? নিজেকে তাই সে নিজে ধিক্কার দিল।

তার মনের উচ্চাশা আজ মৃত। সেই ভস্মস্তূপে জন্ম নিয়েছে আর এক

কামনা। মাদাম রেনলকে খুন করার চেষ্টার জন্যই এই বিষণ্ণতার কামনা জন্মেছে তার মনে। আসলে মাদাম রেনলকে দারুণভাবে ভালবেসেছিল জুলিয়ান। সে এক বিচিত্র আনন্দের অনুভূতি। তাই যখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এবং চিন্তায় বাধা পড়ার আশঙ্কা থাকে না তখনই ভেরিয়ার বা ভার্জিতে সুখের দিনগুলোর স্মৃতি তার মনের পটে ভেসে ওঠে। ছোটখাট ঘটনাগুলো, যা' না-কি অনেক আগেই পাখনা মেলে তার মন থেকে উড়ে গেছে, এখন সেগুলোও তার মনে পড়ছে। নতুন করে স্মৃতি তার মন আনন্দে ভরে তুলছে। প্যারিসের সফল দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ছে না··· ওই দিনগুলো সম্পর্কে তার মন ক্লান্ত।

দিন দিন জুলিয়ানের মনের এই পরিবর্তন ম্যাথিলডার হিংসা-পূর্ণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল। সে বেশ বুঝতে পারল যে, এই নির্জনতার ভালবাসা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনে মাঝে মাঝে ভয় দেখা দেয় ম্যাথিলডার, একদিন সে মাদাম রেনলের নাম করল। অমনি জুলিয়ানকে কেঁপে উঠতে দেখল। সেই মুহূর্ত থেকে ম্যাথিলডার লালসা আরও উৎকট হয়ে উঠল।

ম্যাথিলডার মনের আন্তরিক ভাবনা, ও যদি মারা যায় তবে ওর পরেই আমি মরব। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন অপরাধীর প্রতি আমার মত উচ্চ ঘরের মেয়ের অনুরাগ নিয়ে প্যারিসের বসবার ঘরে কি সরস আলোচনা চলছে তাতে আমার কি এসে যায়? এই ভাবাবেগের বিচার করতে গেলে বীরদের যুগে যেতে হবে। নবম চার্লস এবং তৃতীয় হেনরীর যুগে এ ধরনের মনোভাব ছিল স্বাভাবিক।

তাই অপার আনন্দের মুহূর্তে জুলিয়ানের মাথা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে ভীষণ আতঙ্কে ভাবে ম্যাথিলডা—এই মাথাটা যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তখন কি অবস্থা হবে আমার? তখন আর আনন্দ থাকবে না, এই কোঁকড়া চুলে আজ আমার যে অধর যুগল স্পর্শ করছে তাও সেদিন বরফের মত নিস্পন্দ হয়ে যাবে। ওর মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমিও মরব। আমার পূর্ব-পুরুষদের রক্ত যে আজও আমার ধমনীতে দুষিত হয় নি তার প্রমাণ দেব।

একদিন তার প্রেমিক তাকে বলল—'তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি, তোমার সন্তানকে দেখা-শোনা করার জন্য ভেরিয়ার শহরে রেখে দেবে। মাদাম রেনল তাহলে নজর রাখতে পারবে।'

ম্যাথিলডা বিবর্ণ হল। বলল—'ও কথা দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত···।'

যেন স্বপ্ন-ঘোর থেকে জেগে উঠল জুলিয়ান। ওর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলল—'তা' ঠিক। তাই হাজার বার তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি···।'

ম্যাথিলডা কাঁদছিল।

তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে জুলিয়ান বলতে লাগল—'ওগো, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, লালসা আমাদের জীবনের একটা দুর্ঘটনা এবং সেরা চরিত্রের

মানুষের জীবনেই ত ঘটে দুর্ঘটনা···আমার সন্তানের মৃত্যু তোমার পরিবারের লোকদের কাছে কাম্য তাই পরিচারক পরিচারিকারা জেনে-শুনে তার অযত্ন করবে। অবহেলা তার জীবনকে আরও দুঃখময় ও লজ্জা-জনক করে তুলবে।··· আমি দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে কোন একদিন আমার শেষ আদেশ অনুসারে তুমি ক্রয়সিনয়কে বিয়ে করবে।'

—'কি! আমার এত দুর্ণাম রটবার পরও!'

—'তোমার মত মেয়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে না। তুমি হবে বিধবা···এক ক্ষ্যাপা মানুষের বিধবা। ব্যস! আর কিছু নয়। আরও বলছি শোন: আমার অপরাধ অর্থ-ঘটিত নয় তাই এর মধ্যে কোনও অসম্মান নেই। হয় ত ততদিনে কোনও উৎসাহী বিধায়ক সময়ের দাবী মেনে নিয়ে দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড-রহিতের জন্য বিল আনবেন। কোনও বন্ধু-ভাবাপন্ন বক্তা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করবেন: কেন মাদমোজায়েল দ্য লা মোলের প্রথম স্বামীর কথা ভাবুন···লোকটা ক্ষ্যাপা ছিল, কিন্তু দুষ্ট ছিল না, ছিল না হীন-স্বভাবের লোক। তাই তার মাথা কাটা একদম অবাস্তব হয়েছিল। তাই তখন আমার স্মৃতি আর লজ্জা-জনক হবে না···তোমার সামাজিক অবস্থা, অর্থ এবং প্রভাব তোমার স্বামীকে উচ্চ পদ লাভে সাহায্য করবে। বংশ-গৌরব আর সাহস ছাড়া ওর আর কিছু নেই···তোমার সাহায্য তাকে জীবনে সাফল্য এনে দেবে। হয় ত এই ফরাসীভূমির তরুণদের নেতা হয়ে উঠবে। তুমিই তোমার স্বামীকে রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করার জন্য উৎসাহ দেবে। বছর পনের পরে আমার প্রতি তোমার এই অনুরাগ বোকামি বলে মনে হবে, এবং এই বোকামি মনে হবে ক্ষমার যোগ্য ··।'

সে সহসা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে স্বপ্ন-সাগরে যেন ডুব দিল।

আর জুলিয়ানের এই চিন্তার সাথে আর এক চিন্তার মিল খুঁজে পেয়ে দুঃখিত হল ম্যাথিলডা: আর পনের বছর ধরে মাদাম রেনল আমার সন্তানকে মানুষ করে তুলবে এবং তুমি তাকে ভুলে যাবে।

৪০: মনের শান্তি

> **যেহেতু একদিন আমি নির্বোধ ছিলাম তাই আজ বুদ্ধিমান হয়েছি। ওহে দার্শনিক, তাৎক্ষণিক বিষয় ছাড়া তোমাদের দৃষ্টিতে আর কিছুই ধরা পড়ে না, কত না সীমিত তোমাদের দৃষ্টি। লালসার অন্তর্নিহিত বস্তু তোমাদের নজরে পড়ে না।**
>
> **—ফ্রাই ভন গ্যেটে**

বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য এই বাক্যালাপে ছেদ পড়ল। তার পক্ষ

সমর্থনকারী উকিল এলেন জেলখানায়। তার জীবন এখন সব রকম দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা থেকে মুক্ত, স্বপ্ন-ভরা জীবন। শুধু এই ধরনের মুহূর্তগুলো বিশ্রী লাগে।

ম্যাজিস্ট্রেট এবং উকিলকে বলল জুলিয়ান—'এটা খুন এবং আগে থেকে ভেবে-চিন্তে এই খুন করা হয়েছে।' তারপর আবার হেসে বলল—'মহাশয়গণ, আমি দুঃখিত। তবে এবার আপনাদের কাজ খুব হালকা হয়ে যাবে।'

ওই দু'জনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জুলিয়ান ভাবল, আমাকে এবার আরও সাহসী হতে হবে, অন্তত এই দু'জন লোকের চেয়ে হতে হবে সাহসী। অত্যাচারীদের রাজার মত এদের ধারণা, এটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ। এই দ্বন্দ্বের এক দুঃখময় পরিসমাপ্তি। কিন্তু অন্তিম দিনে ওই দুঃখের কথা আমি ভাবব। জীবনে এর চেয়েও বড় দুঃখ আমি পেয়েছি। প্রথমবার যখন স্ট্রাসবুর্গে যাই তখন ভেবেছিলাম, ম্যাথিলডা আমাকে ত্যাগ করেছে…সেদিনকার পরিত্যাগের কথা কাম-লালায়িত মনে ভাবতাম, অথচ আজকের ঘনিষ্ঠতা আমাকে কাম-শীতল করে তুলেছে · আজকের নির্জনতার সঙ্গিনী হিসাবে ওকে পেলেও সেদিন আমি আরও বেশী আনন্দিত ছিলাম…

অনুশাসন এবং রীত-প্রকরণ-প্রেমী উকিল ভদ্রলোক জনমতেই বিশ্বাস স্থাপন করে ভাবলেন যে, লোকটা বদ্ধ পাগল এবং প্রেম-ঘটিত ঈর্ষার জন্যই সে পিস্তল হাতে নিয়েছিল। একদিন ভদ্রলোক সাহস করে জুলিয়ানকে বললেন যে, এই অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাই-হোক না কেন এটা তার পক্ষ সমর্থনে সহায়ক হবে। কিন্তু নিমেষে জেল-বন্দীর আচরণ গেল বদলে, সে রেগে গালাগালি দিতে লাগল। বলল—'দেখুন মশাই, জীবনের ভয় থাকলে এমন ডাহা মিথ্যার অবতারণা আর কখনো করবেন না।'

সাবধানী উকিল ভদ্রলোক নিজের জীবনের ভয়ে ভীত হল।

অন্তিম সময় আসন্ন…তাই আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য সে নিজেই তৈরী হল।

বেসানকনে এবং সারা আদালতে এই বিখ্যাত বিচার ছাড়া আর কোন আলোচনা কেউ করে না। এসব কোন খবর কেউ জুলিয়ানকে জানায় না।

সেদিন কৌকে এবং ম্যাথিলডা জনরব সম্পর্কে তাকে কিছু বলতে চেষ্টা করল, এই জনরব তার মামলার পক্ষে সহায়ক হবে…কিন্তু প্রথমেই জুলিয়ান তাদের থামিয়ে দিল।

বলল—'আমাকে আমার স্বপ্নের মাঝে ডুবে থাকতে দাও। তোমাদের এই সব চুপি চুপি শলা-পরামর্শ আর উদ্বিগ্নতা আমার মনে আঘাত হানছে, আমার কল্পনার স্বর্গ থেকে আমাকে টেনে নামাচ্ছে। উত্তম অবস্থা যতটা সম্ভব তেমনিভাবে লোকের মরা উচিৎ। আমিও আমার দৃষ্টিকোণ দিয়ে মৃত্যুকে চিন্তা করতে চাই। অন্য লোককে কি আমি গ্রাহ্য করি? অন্য লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একদিন হঠাৎই ছিঁড়ে যাবে। দয়া করে এসব

লোকদের কথা আর আমার সামনে বলো না, ম্যাজিস্ট্রেট এবং উকিলের সঙ্গে যথেষ্ট দেখা করা হয়েছে।'

মনে মনে আওড়াল জুলিয়ান, সত্যিই একজন ভাবুকের মতন আমার মৃত্যু হবে মনে হচ্ছে। স্বীকার করছি, আর পনের দিনের মধ্যেই যার জীবন চুকেবুকে যাবে তার কোন অভিনয় করা সাজে না। এটা বিচিত্র, তবু এখন আমি বাঁচতে শিখেছি, দেখছি জীবনের শেষ অতি নিকটে।

তাই মাঝে মাঝে সে তার বন্দীখানার বারান্দায় পায়চারি করে আর মূল্যবান সিগারে ধূমপান করে…ম্যাথিলডা লোক পাঠিয়ে হল্যাণ্ড থেকে এই সিগারগুলো তার জন্য আনিয়ে দিয়েছে। এবং এর মধ্যেও কোন সন্দেহ নেই যে, শহরের অনেক জোড়া চোখ তাকে দেখবার জন্তে শহরের রাস্তায় ওৎ পেতে থাকে। ভার্জির দিনগুলোর কথা ভাবে জুলিয়ান। ফৌকের কাছে কোন দিন মাদাম রেঁনলের কথা বলে না সে…তবে এই ভাল লোকটি দু'একবার তার কাছে বলতে চেষ্টা করেছে যে, মহিলাটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে…আর এই খবর তার মনের তন্ত্রীতে সুরের ঝঙ্কার তোলে।

জুলিয়ানের মন যখন কল্পনা-সাগরে ডুব দিয়েছে, ম্যাথিলডা তখন অভিজাত-সুলভ নারীর মত বাস্তব কাজে মগ্ন। চিঠি লিখে সে মাদাম ফারবাক আর মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ারের পরিচয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এমন কি বিশপ পদ পাইয়ে দেওয়ার কথাও হয়েছে।

অভিজ্ঞ প্রশাসক চিঠি লিখে জানিয়েছে যে এই হতভাগ্য সোরেল ছোকরা মাথা গরম একটা পাগল। আশা করছি, তার জীবন রক্ষা পাবে।

প্রশাসকের লেখা এই ছত্র ক'টা দেখে মঁসিয়ে ফ্রিলেয়ার আনন্দে আত্মহারা হল। তার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না সে তাকে নিশ্চয় বাঁচাতে পারবে।

খুনের বিচারের জন্য গোপন ভোটে ছত্রিশ জন জুরিকে নির্বাচিত করার আগের দিন সে ম্যাথিলডাকে বলল—'কিন্তু জ্যাকোবিন অনুশাসন অনুযায়ী বিশাল একটা তালিকা তৈরী করতে হবে জুরিদের, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রায়ের বিরুদ্ধে কোন উচ্চ বংশজাত, বুদ্ধিমান মানুষ না প্রতিবাদ করতে পারে, তবে আমি ওর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারব।'

পরের দিন জুরিদের তালিকা বেরোল। ফাদার ফ্রিলেয়ার দেখল বেসানকনের ধর্ম-সংস্থার পাঁচজনের নাম রয়েছে তালিকায়। আর অন্যরা এ শহরে অপরিচিত। খুশি হল ফাদার। তাই সে ম্যাথিলডাকে বলল—'কয়েক জন আমার কথায় ওঠে বসে। ভ্যালেনদ আমার দালাল, ময়রদ তার সব কিছু আমার সাহায্যে লাভ করেছে। আর চোলিন লোকটা নির্বোধ, সবাইকে ভয় পায়।'

সংবাদপত্রে সব জুরিদের নাম প্রকাশ করা হল।

মাদাম রেনল তাঁর স্বামীকে অবাক করে জানালেন যে, বেসানকনে

আসবেন। তবে জানালেন যে, কোন কারণেই বিছানা ছেড়ে উঠবেন না এবং আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর দায় থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন।

ভেরিয়ারের প্রাক্তন মেয়র বললেন—'আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। আমি এখন দলত্যাগী উদারনীতিক বা এমনি ধরনের একটা কিছু ওরা আমার সম্পর্কে রটায়। ওই বদমাস ভ্যালেনদ আর ফ্রিলেয়ার বিচারক আর ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নিকে দিয়ে এমন কিছু একটা করাতে চেষ্টা করবে যাতে আমি দুঃখ পাই।'

মাদাম রেনল সহজেই স্বামীর আদেশ পেলেন। মনে মনে আওড়ালেন যে, যদি আমাকে আদালতে হাজির হতেই হয় তবে মনে হবে আমি প্রতিহিংসা নিতেই এসেছি।

ধর্মগুরু এবং স্বামীর সমস্ত রকম নিষেধ সত্ত্বেও বেসানকনে হাজির হয়েই মাদাম রেনল সব জুরিদের কাছে চিঠি লিখলেন:

> স্যার, বিচারের দিন আমি আদালতে হাজির থাকব না, তাহলে মঁসিয়ে সোরেলের বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংসারে আজ শুধু আমি একটি জিনিষই চাই এবং চাই আন্তরিক ভাবেই···চাই মঁসিয়ে সোরেলের মুক্তি। প্রার্থনা করছি সন্দেহ করবেন না, আমার জন্যে একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ড হবে এই চিন্তা আমার অবশিষ্ট জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবে, আমার আয়ু কমে যাবে। আমি বেঁচে রইলাম অথচ কি করে আপনারা তার প্রাণদণ্ড দেবেন? না, সন্দেহের কোনও সম্ভাবনা নেই, সমাজের কোন অধিকার নেই কোন মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার, বিশেষ করে জুলিয়ান সোরেলের মত মানুষের। ভেরিয়ারের সবাই জানে মাঝে মাঝে তার মাথা বিগড়ে যায়। এই গরীব যুবকের অনেক শত্রু আছে এবং এমন কি এই শত্রুদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার পাণ্ডিত্যের এবং প্রতিভার প্রশংসা করবে না, তাই নয়? একজন সাধারণ মানুষের মত আপনি বিচারাসন অধিকার করছেন না, স্যার। দীর্ঘ আঠার মাস ধরে ঘনিষ্ঠভাবে আমরা তাকে জানি, সে একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, সদ আচরণশীল এবং কর্তব্যকর্মে দক্ষ। কিন্তু বছরে দু'তিনবার তার মন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়, আর সেটা হয় ক্ষ্যাপামির সমগোত্র। সারা ভেরিয়ার শহরের মানুষরা, আমাদের ভার্জির পড়শীরা এবং সরকারি কর্মচারীরা তাকে ধার্মিক বলেই জানে, পবিত্র বাইবেল গ্রন্থখানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সে মুখস্থ বলতে পারে। ধর্ম-পরায়ণ না হলে কি কোন লোক পবিত্র ভাষায় পণ্ডিত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করতে পারে? আমার ছেলেরা এই চিঠি আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকেও ওর সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। প্রতিহিংসা নেওয়ার বদলে

আপনারা আমারই প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করছেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তার শত্রুরা কি যুক্তি দেখাতে পারে? ক্ষ্যাপামির বশে সে যে আঘাত আমার দেহে হেনেছে,—আমার ছেলেরা তাদের গৃহশিক্ষকের ক্ষ্যাপামির প্রমাণ কিছু কিছু বলতে পারবে···সে-আঘাত মাত্র দু'মাসের মধ্যে এমনভাবে সেরে গেছে যে, ভেরিয়ার থেকে বেসানকনে আমি ঘোড়ার গাড়ীতে আসতে পেরেছি। স্যার, তাই আমি আশা করছি, আইনের বর্বরতা থেকে অতি সামান্য অপরাধী একজন লোককে কোন রকম দ্বিধা না করে বাঁচাতে পারেন। বিছানা থেকে উঠতে আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করেছেন নইলে আমি নিজে গিয়ে আপনাদের পায়ে ধরতাম।

স্যার, এই অপরাধ যে পূর্ব-কল্পিত নয় তা' আপনারা ঘোষণা করুন। তাহলে একজন নিরপরাধের প্রাণ-দণ্ড দেওয়ার জন্য আপনাদের আর অনুশোচনা করতে হবে না।

৪১ : বিচার

> **সারা জেলা এই বিখ্যাত মামলার কথা বহুদিন মনে রাখবে। আসামী সম্পর্কে দারুণ আগ্রহ এবং দুর্ভাবনা উত্তেজনা ছড়াল, কেননা আসামীর অপরাধ বিস্ময়কর হলেও অসদ এবং নিষ্ঠুর নয়।**
>
> —সেণ্ট বভ্

মাদাম রেনল এবং ম্যাথিলডার কাছে ভয়ঙ্কর সেই দিনটা অবশেষে এসে পড়ল।

ফৌকের কঠিন হৃদয় অবিচলিত। সে শহর ছেড়ে গেল না।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার দেখার জন্য সারা জেলা থেকে লোক এসে ভিড় করল বেসানকনে। কোন সরাইখানায় আর থাকবার জায়গা নেই। বিচার-কক্ষের প্রবেশপত্রের জন্যে লোকে আদালতের সভাপতির কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। শহরের সব মহিলারা বিচারের সময় হাজির থাকতে চায়।

রাস্তায় রাস্তায় জুলিয়ানের ছবি বিক্রি হচ্ছে।

ম্যাথিলডা গিয়েছিল ফাদার ফ্রিলেয়ারের কাছে।

সে তাকে আশ্বস্ত করে বলল—'জুরিরা আমাদের দিকেই যাবে। অপরাধ পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা তারই উপর বিচার নির্ভর করছে। জুরিদের মধ্যে আমার ছ'জন বন্ধু আছে। তাদের বলেছি, এই বিচারের উপর আমার বিশপ পদ পাওয়া নির্ভর করছে। ভ্যালেনদকে আমি ভেরিয়ারের মেয়র করেছি।

সে আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করছে।'

ম্যাথিলডা জানতে চাইল—'কে এই ভ্যালেনদ ?

—'তাকে জানলে আপনার সফলতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ মনে থাকত না। অপ্রিয় সত্য কথা বলার ক্ষমতা আছে লোকটার। নির্লজ্জ এবং অভদ্র। আর জন্ম থেকেই নির্বোধদের সর্দার। তার কথা না শুনলে সে জুরিদের মারধোর করারও ক্ষমতা রাখে।'

কিছুটা আশ্বস্ত হল ম্যাথিলডা।

জুলিয়ান বলল ম্যাথিলডাকে—'আমার পক্ষে যা কিছু বলবার সব আমার উকিল বলবে। আমি কেবল ছবির মত আমার শত্রুদের সামনে বসে থাকব। এখানকার গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা আমার দ্রুত উত্থানের খবর শুনে মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলছিল। ওদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমার শাস্তি চায় না। অথচ আমাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে তখন ওরাই কুমীরের মত চোখের জল ফেলবে।'

—'জানি, ওরা চায় তুমি অপমানিত হও। তবে আমি বিশ্বাস করি না ওরা সবাই নিষ্ঠুর। এখানে আমার উপস্থিতি এবং আমাকে দেখে শহরের মহিলারা তোমাকে সমর্থন করছে। তোমার সুন্দর মুখের চেহারা বাকি কাজটুকু করবে। তোমার মুখের একটা কথা শুনলে আদালতের সব লোক তোমাকে সমর্থন জানাবে।' বলল ম্যাথিলডা।

পরের দিন···সকাল বেলা। ন'টা বাজল।

জুলিয়ান কারাগার ছেড়ে আদালতের বিচার-কক্ষে প্রবেশ করল।

বিশাল দরদালান। গোথিক শিল্পের কারুকার্য চারধারে।

বিচারকের বসবার উচ্চ মঞ্চ। চারধারে এ্যাম্পি থিয়েটারের মত দর্শকদের বসবার আসন। সামনের আসনগুলোতে শহরের মহিলারা বসে আছে। পুরুষদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলোতেও দর্শকরা বসেছে। তবু এখনও আদালতে প্রবেশের জন্য দরজার সামনে অনেকে ভিড় করেছে।

কাঠগড়ায় উঁচু টুলের উপর বসল জুলিয়ান।

সকলের নজর তার দিকে। তাকে দেখবার জন্য তাদের আগ্রহ।

অনেকেই বলাবলি করছে, হায় ঈশ্বর! এ ত ছেলেমানুষ! ছবির চেয়েও ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

আদালতে আসবার আগে আজ তাকে সাজিয়ে দিয়েছে ম্যাথিলডা।

জুলিয়ানের পাশে দণ্ডায়মান রক্ষী বলল—'ওহে বন্দী, সামনের আসনের ওই ছ'জন মহিলাকে চেন? ওই দেখ প্রশাসকের স্ত্রী, তাঁর পাশে মহান মারকুইস-পত্নী। তোমার বন্ধু। দেখলাম, উনি তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে কথা বলছেন। তাঁর পাশে মাদাম দারভিল···।

—'মাদাম দারভিল!' আওড়াল জুলিয়ান। লজ্জারুণ হল তার মুখমণ্ডল।

ভেবেছিল, মাদাম রেনলের কাছে সে চিঠি লিখবে কিন্তু তিনি যে বেসানকনে এসেছেন তা সে জানত না।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য-গ্রহণ শেষ হল। এবার সওয়াল-জবাব।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলতে উঠলেন। এই জঘন্য আর নিষ্ঠুর অপরাধের বর্ণনা দিলেন তিনি। জোরালো আর বড় বড় কথার ঝুড়ি…তবে অশুদ্ধ ফরাসীতে বলছিলেন। মাদাম দারভিলের পাশে বসা তাঁর বন্ধু যেন মাথা নাড়লেন। এই বক্তব্য যেন তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। জন কয়েক জুরি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

সহসা জুলিয়ানের নজর পড়ল ব্যারণ দ্য ভ্যালেনদের উপর। ও একজন জুরি। ওই জঘন্য প্রকৃতির লোকটার চোখদু'টো কেমন জলছে! ছোট লোকটা কেমন বিজয়ী হল। আমার অপরাধের যদি এই পরিণাম হয় তবে আমাকে অনুশোচনা করতেই হবে। ঈশ্বর জানেন, আমার সম্বন্ধে সে মাদাম রেনলকে কি বলবে।

এই ভাবনা জুলিয়ানের মন থেকে আর সব ভাবনা মুছে দিল।

সহসা দর্শকরা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেল জুলিয়ান। তার উকিলের জবাবী ভাষণ শেষ হয়েছে। যুক্তিপুর্ণ ভাষণ শুনে দর্শকরা উল্লসিত।

উকিল এবং আসামীর জন্য খাবার আনল পরিচারকরা।

তাকে বলল উকিল—'বড় ক্ষিদে পেয়েছে। তোমার?'

—'আমারও।' জবাব দিল জুলিয়ান।

সামনের সারির আসনগুলো দেখিয়ে তার উকিল আবার বলল—'ওই দেখ, প্রশাসকের স্ত্রীর জন্য এখানে খাবার নিয়ে আসা হল। সাহস রাখ। সব কিছুই ঠিক ঠিক হচ্ছে।'

খাবার পালা চুকল। আবার বিচার সুরু হল।

বিচারক জুরিদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

মাঝ রাতের ঘণ্টা বাজতে লাগল। বিচারকক্ষ নিঃশব্দ। ঘণ্টার ধ্বনি শুধু ছড়িয়ে পড়ছে।

জুলিয়ান ভাবছিল, তার জীবনের শেষদিন সুরু হচ্ছে। সহসা তার মনে কর্তব্যের আহ্বান ধ্বনিত হল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল। একটা কথাও বলব না ঠিক করেছিল…কিন্তু বিচারক তাকে কিছু বলার নির্দেশ দিতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টির সামনেই মাদাম দারভিলের মুখমণ্ডল…বাতির আলোয় বিচিত্রভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওকি কাঁদছে?

বলতে সুরু করল জুলিয়ান:

—'জুরি ভদ্রমহোদয়গণ, ঘৃণার যে ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি আমার নজরে পড়ছে,

নে হয় মৃত্যুর মুহূর্তে আমি তা' অগ্রাহ্য করতে পারব, এই ঘৃণার জবাব আমি দিতে চাইছি। সমাজের যে শ্রেণীর মানুষ আপনারা আমি সে শ্রেণীর মানুষ নই। দেখছেন ত আমি একজন চাষী, দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমার মনে কোন ভ্রান্তি নেই, তাই আমি আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি না। মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বিচার জানি সুবিচারই হবে। শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যা এক নারীর জীবন নেওয়ার চেষ্টায় আমি অপরাধী। নিষ্ঠুর আমার অপরাধ এবং আমার এই অপরাধ পূর্ব-পরিকল্পিত। কাজেই মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য আমি। কিন্তু এর চেয়েও কম অপরাধ আমি করলেও আমার সামনে যাঁদের দেখছি তাঁরা আমার মত একজন যুবককে শাস্তি দিতেই চান, চান নিরুৎসাহ করতে যাতে সমাজের নীচ স্তরে জন্মেও কোন যুবক যথেষ্ট পড়াশুনা করে সমাজের উচ্চ স্তরে উঠবার ধৃষ্টতা না দেখায়। এটাই আসলে আমার অপরাধ। আমাকে শাস্তি দিতেই হবে। তাই আমার স্তরের কোন মানুষকে আমি জুরিদের মধ্যে দেখছি না যিনি কৃষক হয়েও ধনবান হয়েছেন···শুধু দেখছি আমার উপর কুপিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মানুষদের···'

এমনি ভাষায় এবং ভঙ্গিতে কুড়ি মিনিট ধরে ভাষণ দিল জুলিয়ান। তার হৃদয়ের সমস্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করল। অভিজাত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সব কথা বলা হচ্ছে শুনে সরকারি উকিল মাঝে মাঝে নিজের আসন থেকে লাফিয়ে উঠছিল। জুলিয়ানের ভাষণ কিন্তু সমস্ত পরিবেশকে দিল বদলে। মহিলারা অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মাদাম দারভিল রুমালে চোখ ঢাকলেন। অপরাধ পূর্ব-পরিকল্পিত এ কথা আবার বলে জুলিয়ান তার ভাষণ শেষ করল। সুখের দিনে এই মাদাম রেনলের প্রতি যে তার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তাকে সে ধ্যান করত এ কথা বলে সে তার মনের অনুশোচনা প্রকাশ করল।

আর্তনাদ করে উঠে মাদাম দারভিল চেতনা হারালেন।

একটা বাজল।

জুরিরা পরামর্শ করার জন্য নিজেদের ঘরে ঢুকলেন।

কোন মহিলা তাদের আসন ছেড়ে উঠল না। কয়েকজন পুরুষের চোখেও জল।

জুরিরা বিচার করতে দীর্ঘ সময় নিচ্ছেন। দর্শকরা মৃদুকণ্ঠে সময়ের দীর্ঘতা ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাই নিয়ে আলোচনা করছে। ক্লান্তিতে অবসন্ন জুলিয়ান। দর্শকদের মৃদুকণ্ঠের আলোচনা তার কানে আসছে। দর্শকরা সবাই তার মঙ্গল কামনা করছে।

বিচার-কক্ষের বাতিগুলোর আলোর সেই তেজ আর যেন নেই।

ঘড়িতে দু'টো বাজল।

জুরি-কক্ষের ছোট্ট দরজাটা খুলে গেল। জুরিরা বেরিয়ে এলেন।

ব্যারণ দ্য ভ্যালেনদ অভিনেতার ভঙ্গিতে হেঁটে এসে নিজের আসনে বসল।

তার পিছনে অন্য জুরিরা। ভ্যালেনদ উঠে দাঁড়াল। কাসল। তারপর ঘোষণা করল যে অপরাধ পূর্ব-পরিকল্পিত। তাই মহামান্য জুরিরা একমত হয়ে জুলিয়ান সোরেলকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন।

আর কয়েক মুহূর্ত পরে বিচারক জুলিয়ানের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করলেন।

জুলিয়ান দেখল, তার ঘড়িতে দুটো বেজে পনের মিনিট। এবং আজ শুক্রবার।

হাঁ, আজ ভ্যালেনদের সৌভাগ্য সে আমার দণ্ডের আদেশ ঘোষণা করেছে ···আর ম্যাথিলডা আন্তরিকভাবে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল···যেন ও মাদাম লাভালিত···কাজেই তিন দিন পরে ঠিক এই সময়ে আমি সত্যকে, মহান অজানাকে জানতে পারব।

একটা আর্তনাদ শুনে জুলিয়ান আবার মাটির পৃথিবীতে যেন ফিরে এল।

জুলিয়ান আবার ভাবনায় ডুব দিল···না, আমি এমন কিছু করব না যাতে ওই বদমাস ভ্যালেনদ হাসবার সুযোগ পায়। কেমন একটা ধূর্ত অথচ বিষণ্ণ ভাব নিয়ে সে জুরির রায় আওড়াল···এবং ওর রায় আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। এতদিন ধরে কত বিচার করেছেন ওই বিচারক···কিন্তু মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণার সময় তাঁর দু'চোখে অশ্রুর অস্তিত্ব। মাদাম রেনলের প্রেমের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী তারা···আজ ভ্যালেনদ তার উপর প্রতিহিংসা নিল···আর কোনদিন আমি মাদাম রেনলকে দেখতে পাব না···আঃ, আমার কৃত অপরাধের জন্য আমি মনে কত না কষ্ট পাচ্ছি এটা যদি একবার তাকে বলতে পারতাম!

শুধু এই কথাগুলো : মনে হয় আমার শাস্তি ঠিকই হয়েছে।

৪২ ; অন্তিম মিলন

জুলিয়ানের মনে হচ্ছিল তার ছোট্ট ঘরখানা এক ধরনের দুর্গন্ধে ম ম করছে। অসহ্য। সেদিন ওকে জানিয়ে দেওয়া হল আজ তার প্রাণদণ্ডের দিন। বাইরে রোদ ঝরে পড়ছে। সব কিছুতে আনন্দের ছোঁওয়া। জুলিয়ানের মনেও সাহস ফিরে এসেছে। বহুদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে নাবিক সে যেমন শুকনো জমিতে পা রাখার জন্য লালায়িত হয় তেমনি এই মুহূর্তে সেও যদি মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে পারত তবে আনন্দে তার মন ভরে যেত। যাক, সব কিছু ভালয় ভালয় কাটছে···আমার মন একটুও দমে নি।

দুদিন আগে সে ফোকেকে বলেছিল—'দেখ, অন্তিম সময়ে আমার মনের অবস্থা কেমন হবে তা আগে থেকে বলতে পারছি না। এই বিশ্রী ছোট অন্ধকার ঘরখানায় আমার জ্বর আসছে। না, এসময় কেউ আমার বিবর্ণ গাল দেখবে না।'

আর এই জন্যেই সে আগে থেকেই ফৌকেকে বলেছিল—'আজ আমার অন্তিম দিন। তুমি মাদাম রেনল এবং ম্যাথিলডাকে এ শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এই ভয়ঙ্কর দুঃখের দৃশ্য ওরা যেন না দেখে।

জুলিয়ান মাদাম রেনলকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে তিনি ম্যাথিলডার সন্তানকে মানুষ করবেন।

একদিন ফৌকেকে বলেছিল জুলিয়ান—'কে জানে? হয় ত মৃত্যুর পরেও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব থাকে। ভেরিয়ারমুখী যে পাহাড়টা আছে ওর গুহায় এখন আমি বিশ্রাম করতে চাই। অনেক অনেক দিন রাতে ওই গুহায় আমি বসে ফরাসীভূমির শস্যভরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি আর উচ্চাশায় আমার মন ভরে উঠেছে। সে সময় ওটাই ছিল আমার কামনা…ওই গুহাটা আমার খুব প্রিয়…দার্শনিকের কাছেও ওই জায়গাটা কাম্য…জান ত আজকাল জেসুইটপন্থীরা সব কিছু বেচে টাকা নেয়। আমার মরদেহ হয় ত তোমাকে বেচতে পারে…।'

এই দুঃখজনক লেন-দেনে সফল হল ফৌকে।

রাত ভর বন্ধুর মৃতদেহ নিজের ঘরে শুইয়ে রেখে বসে রইল সে।

সকালে ম্যাথিলডাকে আসতে দেখে ফৌকে অবাক হল। এই ত ক' ঘণ্টা আগে সে তাকে বেসাকন থেকে দশ মাইল দূরে রেখে এসেছিল, ম্যাথিলডার মুখে বন্য ভাব, দুচোখ জ্বলছে।

—'আমি ওকে দেখতে চাই।' ম্যাথিলডা বলল।

কথা বলার বা চেয়ার থেকে উঠবার মত সাহস বা ক্ষমতা নেই ফৌকের। সে আঙুল তুলে মেঝের উপর বিছানো একখানা নীল চাদর দেখাল—ওর নীচে জুলিয়ানের শব জড়ানো রয়েছে।

হাঁটু গেড়ে বসল ম্যাথিলডা।

বনিফেস দ্য লা মোল এবং মারগারিট দ্য নাভারের স্মৃতি তার মনে অতি-মানবিক সাহস সঞ্চার করল। কম্পিত হাতে সে চাদর সরাল। নজর ঘুরিয়ে নিল ফৌকে।

ম্যাথিলডা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। ঘরে অনেক বাতি জ্বলছে।

এক সময় মনে সাহস ফিরে পেল ফৌকে। ফিরে তাকাল। দেখল, ম্যাথিলডা জুলিয়ানের কর্তিত মস্তক সামনের একটা শ্বেত-পাথরের টেবিলে বসিয়ে তার কপালে চুম্বন এঁকে দিচ্ছে…।

জুলিয়ান নিজের সমাধিস্থান চিহ্নিত করে গেছে।

পাহাড়ের উপর সেই গুহাটায় তাকে সমাধি দেওয়া হবে।

রাত গভীর। গুহার মধ্যে অসংখ্য বাতি জ্বলছে।

ম্যাথিলডা একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে শবানুগমন করছিল। যে মানুষটাকে সে ভয়ঙ্কর ভালবাসত তারই কর্তিত মাথাটা কালো কাপড়ে মুড়ে

নিজের কোলের উপর নিয়েছে। কেউ জানে না একথা। অসংখ্য যাজক চলেছেন শবের সঙ্গে। আর চলেছে আশ-পাশের গ্রাম ও পাহাড়ের অধিবাসীরা। সবাই এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়।

সমাধি দেওয়ার কাজ শেষ হল।

পাহাড়ের উপর এখন শুধু ফৌকে আর ম্যাথিলডা।

আর সবাই চলে গেছে।

ম্যাথিলডা বলল যে সে তার প্রেমিকের মস্তক এবার নিজের হাতে কবর দেবে।

বিষাদে যেন পাগল হয়ে গেল ফৌকে।

তারপর…।

ম্যাথিলডার যত্নে ভালবাসার এই বন্ধুর পাহাড়ী গুহায় সুন্দর একটি শ্বেত-পাথরের সমাধিস্তূপ তৈরী হল।

মাদাম স্থ রেনল তাঁর কথা রেখেছিলেন। আত্মহত্যা করেন নি। তবে জুলিয়ানের প্রাণদণ্ডের তিন দিন পরে ছেলেদের শেষবারের মত আলিঙ্গন করে দেহত্যাগ করলেন।

অনুবাদ : ভৈরবপ্রসাদ হালদার

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥